আল-হিদায়া

তৃতীয় খণ্ড

শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী
ইব্ন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র)

তরজমায়

মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-হিদায়া (তৃতীয় খণ্ড)
শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ বকর আল-ফারগানী
আল-মারগীনানী (র)
মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্ অনূদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৬৪
গ্রন্থস্বত্ব ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৮৭
ইফাবা প্রকাশনা : ২০২১/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-0619-X

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০১

তৃতীয় সংস্করণ
জানুয়ারী ২০০৭
পৌষ ১৪১৩
যিলহজ্জ ১৪২৭

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ৪০০ টাকা

AL-HIDAYA (3rd Volume) (A Commentary on the Islamic Laws) : Written by Shaikhul Islam Burhan Uddin Abul Hassan Ali Ibn Abu Bakar Al-Farganee Al-Marginanee (Rh.) in Arabic, translated into Bangla by Maulana Abu Taher Mesbah. Edited by the Al-Hidaya Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh. Agargaon Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 January 2007
E-mail info@islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

সূচিপত্র

শিরোনাম			পৃষ্ঠা
		অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয় - ১৭	
অনুচ্ছেদ		ঃ	২৭
	পরিচ্ছেদ	ঃ ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপ	৩২
	পরিচ্ছেদ	ঃ দর্শন ভিত্তিক ইখতিয়ার	৪৩
	পরিচ্ছেদ	ঃ দোষের কারণে ইখতিয়ার	৪৯
	পরিচ্ছেদ	ঃ ফাসিদ বিক্রয় প্রসংগ	৬২
অনুচ্ছেদ		ঃ ফাসিদ বিক্রির হুকুম	৮১
অনুচ্ছেদ		ঃ এমন ক্রয়-বিক্রয় যা মাকরূহ	৮৬
		ঃ মাকরূহ বিক্রয়ের বিশেষ প্রকার	৮৭
	পরিচ্ছেদ	ঃ ইকালাহ	৮৮
	পরিচ্ছেদ	ঃ বায় মুরাবাহ ও তাওলিয়া	৯২
অনুচ্ছেদ		ঃ	৯৮
	পরিচ্ছেদ	ঃ রিবা	১০২
	পরিচ্ছেদ	ঃ অধিকার সম্পর্কীয়	১১৩
	পরিচ্ছেদ	ঃ অধিকার অর্জন সম্পর্কীয়	১১৪
অনুচ্ছেদ		ঃ নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়	১১৮
	পরিচ্ছেদ	ঃ বায় সালাম প্রসংগে	১২৩
		ঃ বিক্ষিপ্ত কিছু মাসআলা	১৪০
		অধ্যায় ঃ সারফ (স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিময়)-১৪৭	
		অধ্যায় ঃ কাফালাহ - ১৬১	
অনুচ্ছেদ		ঃ জামানত প্রসঙ্গ	১৮০
	পরিচ্ছেদ	ঃ দুই ব্যক্তির কাফালাহ	১৮২
	পরিচ্ছেদ	ঃ গোলামের কাফীল হওয়া এব গোলামের ----	১৮৫

শিরোনাম পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ হাওয়ালাহ-১৮৯

অধ্যায় ঃ বিচারকের শিষ্টাচার-১৯৫

অনুচ্ছেদ ঃ আটক করা প্রসঙ্গ ২০২
পরিচ্ছেদ ঃ কাজীর পত্র প্রেরণ ২০৪
অনুচ্ছেদ ঃ ২০৮
পরিচ্ছেদ ঃ সালিশ নিয়োগ প্রসঙ্গ ২১০
বিচার পর্বের মাসআলা ২১২
অনুচ্ছেদ ঃ মীরাছ সংক্রান্ত ফায়সালা প্রসংগে..........২১৯
অনুচ্ছেদ ঃ ২২৭
পরিচ্ছেদ ঃ যার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার সাক্ষ্য ----..........২৪৩

অধ্যায় ঃ সাক্ষ্য-২৩১

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩৮
পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষের মধ্যে পার্থক্য ২৫৩
অনুচ্ছেদ মীরাছ সম্পর্কে সাক্ষ্য ২৫৮
পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান ২৫৯
অনুচ্ছেদ ঃ ২৬৪

অধ্যায় ঃ সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসঙ্গ-২৬৭

অধ্যায় ঃ ওয়াকালাহ-২৭৫

অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রয় ও ক্রয় সম্পর্কে ওকীল নিযুক্ত করা ২৮১
অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম কর্তৃক আপন সত্তা ক্রয় করার জন্য ওকীল --..........২৯৩
অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত ওকীল ২৯৫
অনুচ্ছেদ ঃ ৩০১
পরিচ্ছেদ ঃ দাবী উত্থাপন এবং কজা করার জন্য ওকীল --..........৩০৪

শিরোনাম			পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ	ঃ ওকীলের অপসারণ		৩১১

অধ্যায় ঃ দাবী উত্থাপন প্রসঙ্গে-৩১৭

	পরিচ্ছেদ	ঃ কসম প্রসঙ্গ	৩২০
অনুচ্ছেদ		ঃ কসম করা এবং কসম করানোর পদ্ধতি প্রসংগে	৩২৭
	পরিচ্ছেদ	ঃ উভয় পক্ষ থেকে কসম নেওয়া প্রসঙ্গে	৩৩১
অনুচ্ছেদ		ঃ যারা মামলায় প্রতিপক্ষ হতে পারে না	৩৪৩
	পরিচ্ছেদ	ঃ দু'জন যদি একই জিনিসের দাবীদার হয়	৩৪৫
অনুচ্ছেদ		ঃ কবজার মাধ্যমে বিবাদ	৩৫৭
	পরিচ্ছেদ	ঃ বংশ প্রসঙ্গে দাবী	৩৬০

অধ্যায় ঃ স্বীকারোক্তি-৩৭১

অনুচ্ছেদ		ঃ	৩৮০
	পরিচ্ছেদ	ঃ ব্যতিক্রম সম্পর্কে	৩৮১
	পরিচ্ছেদ	ঃ রোগীর স্বীকারোক্তি	৩৯১
অনুচ্ছেদ		ঃ নসব সম্পর্কে স্বীকারোক্তি	৩৯৫

অধ্যায় ঃ সন্ধি-৪০১

অনুচ্ছেদ		ঃ মালের দাবীর বিপরীতে সন্ধি করা জায়িয	৪০৫
	পরিচ্ছেদ	ঃ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সন্ধি করা এবং উকীল হয়ে --	৪১০
	পরিচ্ছেদ	ঃ ঋণের বিপরীতে সমঝোতা	৪১২
অনুচ্ছেদ		ঃ শরীকানার ঋণ	৪১৬
অনুচ্ছেদ		ঃ তাখারুজ (হক থেকে খারিজ হওয়া) প্রসঙ্গে	৪১৯

অধ্যায় ঃ মোদারাবা-৪২৩

	পরিচ্ছেদ	ঃ মোদারিবের অন্য কারো সাথে মোদারাবা চুক্তি করা	৪৩২
অনুচ্ছেদ		ঃ	৪৩৭
অনুচ্ছেদ		ঃ অব্যাহতি দান ও মুনফা বণ্টন	৪৩৮
অনুচ্ছেদ		ঃ মোদারিব যা করতে পারবে	৪৪১

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ	:	৪৪৬
অনুচ্ছেদ	: মতবিরোধ সম্পর্কে	৪৪৯

অধ্যায় : আমানত-৪৫৩

অধ্যায় : 'আরিয়া (সাময়িক ধার) প্রদান-৪৬৫

অধ্যায় : হেবা প্রসঙ্গ-৪৭৫

পরিচ্ছেদ	: যে হেবা রুজু করা যায় এবং যে হেবা রুজু	৪৮৩
অনুচ্ছেদ	:	৪৮৮
পরিচ্ছেদ	: ছাদাকা প্রসঙ্গ	৪৯০

অধ্যায় : ইজারা প্রসঙ্গ-৪৯৩

পরিচ্ছেদ	: কখন ভাড়ার হকদাব হবে	৪৯৫
অনুচ্ছেদ	:	৫০০
পরিচ্ছেদ	: কোন্ ইজারা চুক্তি বৈধ, আর কিসে চুক্তি লঙ্ঘন হবে	৫০১
পরিচ্ছেদ	: ফাসিদ ইজারা	৫০৭
পরিচ্ছেদ	: মজদূরের দায় বহন	৫১৮
পরিচ্ছেদ	: দুই শর্তের একটির ভিত্তিতে ইজারা চুক্তি	৫২১
পরিচ্ছেদ	: গোলামকে ইজারা প্রদান	৫২৪
পরিচ্ছেদ	: ইজারা দাতা ও ইজারা গ্রহণকারীর মাঝে মতপার্থক্য	৫২৬
পরিচ্ছেদ	: ইজারা রহিতকরণ	৫২৭
	: কতিপয় বিক্ষিপ্ত মাসআলা	৫৩১

অধ্যায় : মোকাতাব-৫৩৫

অনুচ্ছেদ	: ফাসিদ কিতাবাত চুক্তি প্রসঙ্গে	৫৩৯
পরিচ্ছেদ	: মোকাতাব যা করার অধিকার রাখে	৫৪৪

মহাপরিচালকের কথা

আল-হিদায়া হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং জনপ্রিয় প্রামাণ্য ফিকাহ্ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর ৫১১ হিজরী মোতাবেক ১১১৭ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের মারগীনান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৯৩ হিজরী মোতাবেক ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

অসাধারণ প্রতিভাধর বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর (র) ছিলেন একাধারে হাফেজে কুরআন, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ এবং নীতিশাস্ত্রবিদ।

হিজরী ষষ্ঠ (দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ) শতকে রচিত এই গ্রন্থটির বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লেখকের ব্যাপক ও গভীর পাণ্ডিত্য, ফিকাহ্ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে। বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর (র)-এর সুদীর্ঘ ১৩ বছরের পরিশ্রমের ফসল এই 'আল-হিদায়া'ই তাঁকে বিশ্বের দরবারে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। তিনি তাঁর এই গ্রন্থটিতে অতি নিপুণভাবে সংক্ষিপ্ত বাক্যে গভীর ও ব্যাপক ভাব প্রকাশ করেছেন।

আল-হিদায়া ইসলামী আইন শাস্ত্রের একখানি নির্ভরযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর (র) তাঁর এই গ্রন্থখানিতে ইসলামী আইনের বিভিন্ন ধারা ও উপধারায়, ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য ইমামের মতামত দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন।

হানাফী মাযহাবের রায় ও সিদ্ধান্তসমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করে এ সবের সমর্থনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এমন সব অকাট্য প্রমাণ পেশ করেছেন, যাতে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এবং রায়সমূহই সঠিক, অধিক গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে।

গ্রন্থখানিতে কোথাও ইমাম আবূ হানীফা (র), কোথাও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং কোথাও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সিদ্ধান্তকে যুক্তি-প্রমাণসহ প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই মূল্যবান গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেছে। এর তৃতীয় খণ্ডটি ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের সাথে সাথে এর সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এ মূল্যবান গ্রন্থটির বিজ্ঞ অনুবাদক, সম্পাদক এবং গ্রন্থখানি প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই অসাধারণ কাজের জন্য বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর (র)-কে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত নসীব করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫৪৭
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫৫০
পরিচ্ছেদ	ঃ কোন গোলামের পক্ষ থেকে কারো কিতাবাত চুক্তি......	৫৫৬
পরিচ্ছেদ	ঃ শরীকানা গোলামের কিতাবাত	৫৫৮
পরিচ্ছেদ	ঃ মোকাতাবের মৃত্যু এবং তার অপারগতা আর	৫৬৬

অধ্যায় ঃ ওয়ালা-৫৭৫

অনুচ্ছেদ	ঃ সৌহার্দমূলক মাওয়ালীদের ওয়ালা সম্পর্ক...............	৫৮৩

অধ্যায় ঃ বল প্রয়োগ-৫৮৭

পরিচ্ছেদ	ঃ	৫৯০

অধ্যায় ঃ হাজর বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ-৫৯৯

পরিচ্ছেদ	ঃ নির্বুদ্ধিতা ও অপব্যয়জনিত নিষেধাজ্ঞা..................	৬০২
পরিচ্ছেদ	ঃ বালেগ হওয়ার সীমা..................................	৬০৮
পরিচ্ছেদ	ঃ ঋণ গ্রস্থতার কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ..................	৬১০

অধ্যায় ঃ অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম-৬১৭

পরিচ্ছেদ	ঃ	৬৩৩

অধ্যায় ঃ গসব সম্পর্কে-৬৩৭

পরিচ্ছেদ	ঃ গসবকারীর কর্ম দ্বারা গসবকৃত বস্তুর পরিবর্তন	৬৪৩
পরিচ্ছেদ	ঃ	৬৫০
পরিচ্ছেদ	ঃ মূল্যমান রহিত বস্তুর গসব............................	৬৫৬

প্রকাশকের কথা

আল-হিদায়া হানাফী মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ফিকাহ্ গ্রন্থ। এটিকে হানাফী ফিকাহ্র বিশ্বকোষও বলা যেতে পারে। ইমাম বুরহান উদ্দীন আলী ইবনে আবূ বকর (র) কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণীত এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি ইসলামী আইনের একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে আদৃত হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম আইনের নির্ভরযোগ্য পাঠ্যবই হিসেবে পঠিত হচ্ছে।

আমাদের জানামতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ পর্যন্ত গ্রন্থটির ৩৬টি ভাষ্য, ৯টি টীকা ভাষ্য, ৫টি সার-সংক্ষেপ এবং ১৬টি পরিশিষ্ট রচিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনামলে মুসলিম আইন প্রণয়ন এবং আইন শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বাংলার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে জর্জ হ্যামিল্টন এ মূল্যবান গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

বিশ্বের বহু ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অনুবাদ কার্যক্রম গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা ইতিমধ্যে এর অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করে ৪ খণ্ডে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। তৃতীয় খণ্ডটি ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে এর সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

গ্রন্থটির এই খণ্ডের অনুবাদক মাওলানা আবূ তাদের মেছবাহ্, সম্পাদনা পরিষদের সদস্য মাওলানা ওবায়দুল হক ও ড. কাজী দীন মুহম্মদ এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের প্রচেষ্টায় আমাদের কোন প্রকার ত্রুটি ছিল না, তবুও সম্মানিত পাঠকদের কাছে কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে আমাদের তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ভাল বই প্রকাশের তওফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	সদস্য
মোহাম্মদ আব্দুর রব পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ	সদস্য সচিব

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয়

আল-হিদায়া

তৃতীয় খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয়

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ঈজাব ও কবুল (প্রস্তাব করণ ও প্রস্তাব গ্রহণ) দ্বারা বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়, যদি উভয়টি অতীতকাল বাচক শব্দ দ্বারা হয়।

যেমন দুজনের একজন বললো : আমি বিক্রি করলাম আর অপর জন বললো : আমি খরিদ করলাম। কেননা ক্রয়-বিক্রয় হলো ব্যবহারের অস্তিত্ব দান। আর শরীয়ত দ্বারাই অস্তিত্ব দানের পদ্ধতি জানা যাবে। আর সংবাদ প্রদানের জন্য নির্ধারিত শব্দকে কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং সংবাদ প্রদানমলূক শব্দ দ্বারা বিক্রয় সংঘটিত হবে।

দুটি শব্দের একটি যদি ভবিষ্যৎ সূচক হয় তাহলে তা দ্বারা বিক্রয় সংঘটিত হবে না। বিবাহ বিষয়টি ভিন্ন। (এ ধরনের শব্দযোগে বিবাহ সম্পন্ন হবে) উভয় ক্ষেত্রের পার্থক্যের হেতু 'বিবাহ পর্বে' বর্ণিত হয়েছে।

বিক্রয় চুক্তির এক পক্ষ যদি বলে : আমি এত টাকার বিনিময়ে সম্মত হলাম। কিংবা এত টাকার বিনিময়ে তোমাকে দিলাম কিংবা তুমি তা এতটাকার বিনিময়ে গ্রহণ কর, তাহলে এগুলো, 'আমি বিক্রি করলাম' 'আমি খরিদ করলাম' -এর সমার্থক হবে। কেননা এগুলো -এর অর্থই বহন করে। আর এ ধরনের চুক্তিসমূহের মর্মই বিবেচিত হয়ে থাকে। একারণেরই উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় প্রকার পণ্যের ক্ষেত্রে লেনদেন দ্বারাও বিক্রয় সম্পন্ন হয়। বিশুদ্ধ মত পারস্পরিক সম্মতি থাকার কারণে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, চুক্তির দুই পক্ষের এক পক্ষ যদি বিক্রয়ের প্রস্তাব করে তখন অপর পক্ষের অধিকার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে সেই মজলিসে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করবে, আর ইচ্ছা করলে তা প্রত্যাখ্যান করবে।

একে خيار القبول (গ্রহণের ইচ্ছাধিকার) বলে। কেননা তার অনুকূলে যদি ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত না হয় তাহলে তো তার সম্মতি ছাড়াই চুক্তির বিধান তার উপর সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

আর যখন অপর পক্ষের গ্রহণ ব্যতীত চুক্তির বিধান কার্যকরী হলো না, তখন প্রস্তাবকারীর অধিকার রয়েছে যে, সে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিবে। কেননা এই প্রত্যাহার অন্যের হক নষ্ট করা থেকে মুক্ত।

গ্রহণের অধিকার মজলিসের শেষ সময় পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়ার কারণ এই যে, মজলিস হলো বিভিন্ন বিষয় সমন্বয়কারী। তাই মজলিসের মুহূর্তসমূহকে একই মুহূর্ত গণ্য করা হবে, যাতে জটিলতা দূরীভূত হয় এবং সহজীকরণ সাব্যস্ত হয়।

আর লিখিত পত্র সম্বোধনের সমতুল্য। দূত প্রেরণের বিষয়টি তদ্রূপ। সুতরাং পত্র পৌঁছার এবং বার্তা প্রদানের মজলিস বিবেচ্য হবে।

আর পণ্যের অংশ বিশেষের মধ্যে প্রস্তাব গ্রহণের অধিকার তার নেই। তদ্রূপ আংশিক মূল্যের বিনিময়ে বিক্রিত দ্রব্য পণ্য গ্রহণের অধিকারও তার নেই।

কেননা এতে অপর পক্ষের সম্মত নেই চুক্তি খণ্ডিত হয়ে যাওয়ার কারণে। তবে প্রতিটি পণ্যের মূল্য আলাদা বর্ণনা করা হলে অংশ বিশেষের মধ্যে তার গ্রহণের অধিকার থাকবে। কেননা গুণগতভাবে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি।

প্রস্তাব গ্রহণের আগে দু'জনের যে কোন একজন মজলিস থেকে উঠে গেলে উক্ত প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা মজলিস থেকে উঠে যাওয়া প্রস্তাবকে উপেক্ষা করার কিংবা প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করার প্রমাণ। আর আমাদের পূর্ববর্ণিত বক্তব্য মতে তার সে অধিকার রয়েছে।

আর যখন ঈজাব ও কবুল সম্পন্ন হবে তখন বিক্রয় চুক্তি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। দু'পক্ষের কারোই আর ইচ্ছাধিকার থাকবে না। তবে দোষের কারণে কিংবা না দেখার কারণে (ইচ্ছাধিকার থাকবে)।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মজলিস থাকাকালীন সময় পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্য ইচ্ছাধিকার থাকবে।

কেননা নবী (সা) বলেছেন,

المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا (رواه الائمة الستة)

ক্রয়কারী ও বিক্রয়কারী ইচ্ছাধিকারী হবে যতক্ষণ তারা (মজলিস থেকে) পৃথক না হয়।

আমাদের দলীল এই যে, চুক্তি রহিত করার মধ্যে অন্যের হক নষ্ট করা হয়। সুতরাং তা জায়িয হবে না। আর উক্ত হাদীসটি خيار القبول (প্রস্তাব গ্রহণের ইচ্ছাধিকার)-এর উপর প্রযোজ্য। আর হাদীসের শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইংগিত রয়েছে। কেননা চুক্তি সম্পাদন অবস্থায় থাকাকালেই শুধু তাদেরকে متبايعان (ক্রয় বিক্রয়কারী) বলা যায়, এর পরে নয়।

কিংবা (পূর্বোক্ত অর্থের ন্যায়) এই অর্থেরও সম্ভাবনা রয়েছে; সুতরাং এ অর্থেই তাকে প্রয়োগ করা হবে। আর (উল্লেখিত) পৃথক হওয়ার অর্থ হলো বক্তব্য সমাপ্তির দ্বারা পৃথক হওয়া

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে বিনিময় দ্রব্যের প্রতি ইংগিত করা হয় (পণ্য হোক বা মূল্য হোক) ক্রয় বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য তার পরিমাণ জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

কেননা পরিচয় দানের জন্য ইংগিতই যথেষ্ট; আর এক্ষেত্রে পরিমাণ গুণের অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় না।

আর ইংগিতহীন মূল্য পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে পরিচিত ও নির্ধারিত না হলে চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

কেননা চুক্তি হওয়ার কারণে (বিনিময় দ্রব্যের) অর্পণ ও গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য আর এ জাতীয় অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়। সুতরাং অর্পণ ও গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হবে। আর এ প্রকারের যে কোন অজ্ঞতা বৈধতাকে রহিত করে। (বিক্রয়ের বৈধতার ক্ষেত্রে) এই হলো মূলনীতি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নগদ মূল্যে এবং মেয়াদী মূল্যে বিক্রয় বৈধ, যদি মেয়াদ নির্ধারিত হয়।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীটি শর্তমুক্ত :

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"আল্লাহ্ বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

আর নবী (সা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে মেয়াদী মূল্যে কিছু খাদ্য খরিদ করেছিলেন এবং আপন বর্ম তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। আর মেয়াদ নির্ধারিত হতে হবে, কেননা মেয়াদের অজ্ঞতা চুক্তির মাধ্যমে সাব্যস্ত মূল্য অর্পণকে বাধাগ্রস্ত করে। কেননা একজন তার নিকটবর্তী সময়ে দাবী করবে, আর অন্যজন বিলম্বে তা অর্পণ করতে চাইবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রার গুণ উল্লেখ না করে, তাহলে দেশের অধিক প্রচলিত মুদ্রার উপর প্রযোজ্য হবে।

কেননা সেটাই তো পরিচিত। আর তাতে বৈধতার প্রয়োগ রয়েছে। সুতরাং ঐ মুদ্রার সাথেই বিক্রয়কে সম্পৃক্ত করা হবে।

আর যদি দেশে প্রচলিত মুদ্রার মূল্য বিভিন্ন হয় তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে যদি মুদ্রার কোন এক গুণ উল্লেখ করে দেয় তাহলে জায়িয হবে।

এটা তখন হবে যখন প্রচলনের ক্ষেত্রে সবকটি মুদ্রা সমান হবে। কেননা এই অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়াবে; তবে যদি (পরবর্তিতে) বর্ণনা করা দ্বারা অজ্ঞতা বিদূরিত হয় কিংবা একটি মুদ্রা অধিক প্রচলিত হয়, তখন বৈধতা লাভের প্রয়োগ হিসাবে বিক্রয়কে এ মুদ্রার সাথেই সম্পৃক্ত করা হবে।

এই হুকুম তখন হবে যখন অর্থ মূল্যের ক্ষেত্রে মুদ্রাগুলো বিভিন্ন হয়। অর্থ মূল্য যদি সমান হয়, যেমন ছুমায়ী (দুই বাটা এক) দ্বয়ী দিরহাম, আর ছুলাছী (তিন বাটা এক) ত্রয়ী দিরহাম এবং বর্তমানে সামারকান্দে প্রচলিত নুছরতী দিরহাম এবং ফারগানা

অঞ্চলে প্রচলিত আদানী দিরহামের পার্থক্য। আর দিরহাম যদি নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করে তবে বিক্রয় চুক্তি বৈধ হবে। মাশায়েখগণ এরূপ বলেছেন। আর যে কোন প্রকার দিরহাম দ্বারাই মূল্য পরিশোধ করা হোক ঐ পরিমাণের সাথে বিক্রয় চুক্তি সম্পৃক্ত হবে, যা উল্লেখ করা হয়েছে।

কেননা অর্থ মূল্য বিভিন্ন না হওয়ার কারণে বিবাদের অবকাশ নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গম ও অন্যান্য শস্যদানা পাত্র দ্বারা মেপে কিংবা অনুমানের দ্বারা বিক্রি করা বৈধ হবে।

আর তা ঐ সময় বৈধ হবে যখন বিপরীত দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করে। কেননা নবী (সা) বলেছেন, اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد -যদি বিনিময় দ্রব্য দুটি ভিন্ন প্রকারের হয় তাহলে হাতে হাতে হলে (পাত্র দ্বারা পরিমাপ করে কিংবা অনুমান করে) যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করতে পারো; পক্ষান্তরে অভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে অনুমানে বিক্রয় হলে বৈধ হবে না, কেননা সেক্ষেত্রে সুদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আর এ জন্য যে, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যের পরিমাণগত এই অজ্ঞতা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। সুতরাং তা বাজার মূল্য না জানার সদৃশ হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নির্ধারিত কোন পাত্র দ্বারা এবং নির্ধারিত কোন প্রস্তর দ্বারা— যার পরিমাণ জানা নেই, তার দ্বারা বিক্রি করা বৈধ।

কেননা এক্ষেত্রে পরিমাণের অজ্ঞতা বিবাদের দিকে গড়ায় না। এই জন্য যে, এরূপ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্পণ ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং অর্পণ এর পূর্বে পাত্র বা প্রস্তর বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বিরল। 'বাইয়ে সালাম' বা দাদন বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এতে অর্পণ মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত হয়, আর সেক্ষেত্রে অর্পণের পূর্বে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বিরল নয়, সুতরাং বিবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে।

ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত একটি মতে নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তা বৈধ হবে না। তবে প্রথমোক্ত মতটি প্রমাণগতভাবে অধিক বিশুদ্ধ এবং বর্ণনা সূত্রগতভাবে অধিকতর সুস্পষ্ট।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি খাদ্য শস্যের স্তূপ প্রতি কাফীয[১] এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে শুধু এক কাফীযে বিক্রয় বৈধ হবে; তবে যদি সর্বমোট কাফীয সংখ্যা উল্লেখ করে দেয় (তাহলে সবটুকুতেই বৈধ হবে)।

আর ছাহেবায়ন বলেন, (সর্বমোট কাফীয সংখ্যা উল্লেখ করুক বা না করুক) উভয় অবস্থায় বিক্রি বৈধ হবে

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, বিক্রীত সমগ্র স্তূপের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা বিক্রীত পণ্য ও মূল্য অজ্ঞাত। সুতরাং সর্ব নিম্ন পরিমাণের সাথে

---

১ কাফীয ইরাকে প্রচলিত একটি পরিমাপ— যা বার সা'র সমান

সম্পৃক্ত করা হবে যা পরিজ্ঞাত। তবে যদি সমগ্র কাফীয সংখ্যা উল্লেখ করার মাধ্যমে কিংবা মজলিসে পরিমাপ করার মাধ্যমে অজ্ঞতা বিদূরিত হয় তখন বৈধ হয়ে যাবে।

বিষয়টি এমন হলো, যেন কেউ অস্বীকার করে বলল যে, অমুক আমার কাছে সকল দিরহাম পাবে। তখন তার উপর সর্ব সম্মতিক্রমে এক দিরহাম লাযিম হবে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, এই অজ্ঞতার নিরসন করা তাদের সাধ্যাধীন। আর এ ধরনের অজ্ঞতা বিক্রির বৈধতার প্রতিবন্ধক নয়। যেমন এই শর্তে দুটি গোলামের একটি বিক্রি করলো যে, ক্রেতার নির্ধারণের ইচ্ছাধিকার থাকবে।

যাই হোক ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে যখন একটিমাত্র কাফীযের ক্ষেত্রে বিক্রি বৈধ হলো তখন ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। কেননা তার কৃত চুক্তিটি খণ্ডিত হয়ে গেছে।

তদ্রূপ যদি মজলিসে পরিমাপ করা হয় কিংবা সমগ্র কাফীয সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। (তখনও ইচ্ছাধিকার থাকবে)।

কেননা পরিমাপ বা উল্লেখ এর মাধ্যমে এখন সে বিক্রয় দ্রব্যের পরিমাণ জ্ঞাত হয়েছে। সুতরাং এখন তার অনুকূলে ইচ্ছাধিকার থাকবে। যেমন ক্রয়ের সময় বিক্রয় দ্রব্যটি দেখেনি, পরে দেখলো।

কেউ যদি একপাল বকরী বিক্রি করে প্রতিটি এক দিরহাম করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সমগ্র পালের ক্ষেত্রেই বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। তদ্রূপ যদি কেউ কাপড়ের থান গজমাপে বিক্রি করে যে, প্রতি গজ এক দিরহাম, আর সমগ্র গজের সংখ্যা উল্লেখ না করে। এবং তদ্রূপ হুকুম ঐসকল জিনিসের, যা গণনায় বিক্রি হয়; কিন্তু এদের মধ্যে ব্যবধান থাকে।

আর ছাহেবায়নের মতে আমাদের পূর্বোল্লেখিত কারণে সমগ্রের ক্ষেত্রেই বিক্রয় বৈধ হবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে আমাদের পূর্বোল্লেখিত কারণে সর্বনিম্ন একটির সাথে বিক্রয় সম্পৃক্ত হবে। তবে এককগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণে পালের একটি বকরীতে এবং কাপড়ের একটি গজে বিক্রি করা বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে সমগ্র স্তূপ থেকে এক কাফীযে বিক্রি বৈধ হবে, পার্থক্য না থাকার কারণে। কেননা এ অবস্থায় অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়াবে না। অথচ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়াবে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, একশ দিরহামের বিনিময়ে গমের একটি স্তূপ যদি এই শর্তে খরিদ করে যে, এখানে একশ' কাফীয গম রয়েছে। এরপর ক্রেতা স্তূপে একশ' কাফীযের কম পেলো, তাহলে ক্রেতার অনুকূলে ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে। ইচ্ছা করলে সে বিদ্যমান পরিমাণকে তার বিপরীতে সাব্যস্ত মূল্যাংশের বিনিময়ে খরীদ করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে বিক্রয় চুক্তি রহিত করতে পারে।

কেননা চুক্তিটি সম্পূর্ণতা লাভ করার পূর্বেই তার কৃত চুক্তি খণ্ডিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং বিদ্যমান পরিমাণের ব্যাপারে তার সম্মতি পূর্ণ নয়।

আর যদি একশ' কাফীযের বেশী বিদ্যমান পায় তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণটুকু বিক্রেতার হবে।

কেননা একটি নির্ধারিত পরিমাণের উপর বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে আর পরিমাণ বিক্রিত দ্রব্যের গুণ নয়।

কেউ যদি দশ দিরহামের বিনিময়ে একটা কাপড় খরীদ করে এই শর্তে যে, কাপড়টি হলো দশগজ। কিংবা একশ' দিরহাম দ্বারা কোন জমি খরিদ করে এই শর্তে যে, তা একশ' গজ হবে, পরে সে পরিমাণে কম পেলো তখন ক্রেতার ইচ্ছাধিকাব থাকবে। ইচ্ছা করলে সে পূর্ণ মূল্য দ্বারা তা নেবে। আর ইচ্ছা করলে তা ছেড়ে দেবে।

কেননা গজ হলো বস্ত্রের মাঝে একটি গুণ. দেখুন না, গজ অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। আর দ্রব্যের গুণের বিপরীতে মূল্যের কোন অংশ সাব্যস্ত হয় না। যেমন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এজন্যই বিদ্যমান দ্রব্যটি নিতে হলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে নেবে. প্রথম ক্ষেত্রটি (অর্থাৎ পাত্রে পরিমাপিত দ্রব্যের ক্ষেত্রটি) এর বিপরীত। কেননা এখানে দ্রব্যের পরিমাণের বিপরীতে মূল্যের পরিমাণ সাব্যস্ত হয়. সুতরাং বিদ্যমান দ্রব্যকে তার সমপরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

তবে উল্লেখকৃত গুণ অবিদ্যমান হওয়ার কারণে যেহেতু চুক্তিকৃত দ্রব্যটিতে পরিবর্তন ঘটেছে. সেহেতু সম্মতি ক্ষুণ্ন হয়েছে. সুতরাং সে ইচ্ছাধিকার লাভ করবে।

আর যদি যত গজের কথা উল্লেখ করেছে তার চেয়ে বেশী পায় তাহলে সেটা ক্রেতার হবে। বিক্রেতার তাতে কোন ইচ্ছাধিকার থাকবে না।

কেননা গজ হচ্ছে দ্রব্যের গুণগত বিষয়, সুতরাং এটা কোন দ্রব্য দোষযুক্ত বলে খরিদ করার পর দোষমুক্ত পাওয়ার মত হলো।

যদি বলে যে, এটা তোমার কাছে প্রতিগজ এক দিরহাম দরে একশ' দিরহামে বিক্রি করলাম এই শর্তে যে, তা একশ' গজ; কিন্তু সেটাকে সে একশ' গজের কম পেলো; তাহলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে দ্রব্যটিকে সে তার অংশের অনুপাতে মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে ছেড়েও দিতে পারে।

কেননা দ্রব্যের গুণ যদিও দ্রব্যের অনুবর্তী, কিন্তু মূল্য উল্লেখ করার মাধ্যমে গুণকে স্বাতন্ত্র্য দান করার কারণে তা মূল দ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। তাই প্রতিটি গজ একটি স্বতন্ত্র বস্ত্রের পর্যায়ে রয়েছে।

আর এটি (অর্থাৎ আনুপাতিক মূল্যে গ্রহণের বিধান) একারণে যে, যদি সম্পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করে তাহলে প্রতি গজ এক দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করা হবে

আর যদি একশ' গজের অতিরিক্ত পায় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে প্রতিগজ এক দিরহাম দরে সমগ্র দ্রব্যটা সে নেবে। আর ইচ্ছা করলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করবে।

কেননা একদিকে যদি দ্রব্যটিতে সে অতিরিক্ত গজ লাভ করেও থাকে তাহলে অন্যদিকে তার উপর অতিরিক্ত মূল্যও লাযিম হবে। সুতরাং এটা হলো এমন লাভ, যাতে ক্ষতি মিশ্রিত রয়েছে। তার উপর অতিরিক্ত মূল্য ধার্য হওয়ার কারণ আমরা বলে এসেছি, যে (মূল্য উল্লেখের মাধ্যমে গুণকে স্বাতন্ত্র্য দান করার কারণে) গুণ এখানে সত্তার মর্যাদা পেয়ে গেছে।

আর যদি কম মূল্যে গ্রহণ করে তাহলে সে (প্রতিগজ এক দিরহামের) নির্ধারিত শর্তে গ্রহণ করা হলো না।

কেউ যদি কোন বাড়ীর কিংবা কোন গোসলখানায় একশ' গজ পরিমাণ থেকে দশগজ খরীদ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রয় ফাসিদ (নষ্ট) হবে। আর ছাহেবায়নের মতে এই বিক্রি জায়িয।

পক্ষান্তরে যদি একশ' হিস্‌সা (বা শেয়ার) থেকে দশ হিস্‌সা খরিদ করে তাহলে সবার মতেই তা জায়িয হবে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, একশ গজ থেকে দশ গজ এর অর্থ হলো ঘরের (এবং গোসলখানার) দশভাগের একভাগ। সুতরাং এটা (একশ' হিস্‌সা থেকে) দশ হিস্‌সার সমতূল্য হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, গজ ঐ পরিমাপের নাম, যদ্দারা গজ মাপা হয়। আর রূপকভাবে ঐ গজ বলা হয়, যাতে গজ ব্যবহার করা রয়েছে। আর তা হবে নির্দিষ্ট, বাস্তবতায় আর ঐ নির্ধারিত স্থানটি এখানে পরিজ্ঞাত নয়।

আর হিস্‌সার বিষয়টি ভিন্ন।

আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্থানটির সমগ্র গজ সংখ্যা জানা থাকা হোক এবং জানা না থাকা হোক, এতে হুকুমের কোন পার্থক্য নেই; অজ্ঞতা বিদ্যমান থাকার কারণে এটা বিশুদ্ধ মত।

ইমাম খাচ্ছাফ ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ যদি এক গাইট কাপড় খরিদ করে এইশর্তে যে, তাতে দশটি কাপড় আছে, কিন্তু দেখা গেলো যে,তাতে নয়টি বা এগারটি কাপড় রয়েছে; তাহলে বিক্রীত দ্রব্য কিংবা মূল্য অজ্ঞাত হওয়ার কারণে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি প্রতিটি কাপড়ের মূল্য আলাদা বর্ণনা করে তাহলে কাপড় কম হওয়ার ছূরতে আনুপাতিক মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় বৈধ হবে এবং তার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

আর বেশী হওয়ার ছূরতে বিক্রয় বৈধ হবে না। কেননা বিক্রীত দশটি বস্ত্র অপরিজ্ঞাত। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কমের ছূরতেও বৈধ হবে না। কিন্তু তা ঠিক নয়।

পক্ষান্তরে যদি দুটি কাপড় খরীদ করে এই শর্তে যে, তা হারাবী কাপড়; কিন্তু পরে দেখা গেলো যে, দুটির একটি হলো মারবী, তাহলে হুকুম ভিন্ন হবে। অর্থাৎ উভয় বস্ত্রের ক্ষেত্রেই বিক্রয় বৈধ হবে না, এমনকি উভয় কাপড়ের আলাদা মূল্য বর্ণনা করে থাকলেও। কেননা বিক্রেতা এখানে হারাবী কাপড়ের বিক্রয় চুক্তির মধ্যে মারবী কাপড়ের গ্রহণ করাকে শর্ত করেছেন। আর এ হলো ফাসিদ শর্ত।

পক্ষান্তরে অবিদ্যমান বস্তুটির ক্ষেত্রে গ্রহণের শর্ত আরোপিত হতে পারে না। সুতরাং উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেলো।

যদি প্রতি গজ এক দিরহাম দরে একটা কাপড় খরিদ করে এই শর্তে যে, তা দশ গজ হবে। পরে দেখা গেলো যে, তা সাড়ে দশগজ বা সাড়ে নয় গজ হয়েছে। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, প্রথম ছূরতে বিনা ইচ্ছাধিকারে দশ দিরহাম মূল্যে খরিদ করবে। আর দ্বিতীয় ছূরতে ইচ্ছা করলে নয় দিরহামের মূল্য নেবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, প্রথম ছূরতে ইচ্ছা করলে এগার দিরহামের বিনিময়ে নেবে। আর দ্বিতীয় ছূরতে ইচ্ছা করলে দশ দিরহাম মূল্যে নেবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, প্রথম ছূরতে ইচ্ছা করলে সাড়ে দশ দিরহামের বিনিময়ে নেবে, আর দ্বিতীয় ছূরতে ইচ্ছা করলে সাড়ে নয় দিরহামের বিনিময়ে নেবে।

কেননা এক গজকে এক দিরহামের বিপরীতে সাব্যস্ত করার অনিবার্য দাবী হলো অর্ধেক গজকে অর্ধেক দিরহামের বিপরীতে সাব্যস্ত হওয়া। সুতরাং অর্ধেকের ক্ষেত্রেও বিনিময়ের বিধান কার্যকর এই যে, প্রতি গজের বিনিময় যখন আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে তখন প্রতিটি গজ স্বতন্ত্র কাপড় বলে গণ্য হবে। আর একটি কাপড় পরিমাণে কম হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, গজ হলো মূল দ্রব্যের গুণ, কিন্তু এখানে শর্তারোপের কারণে পরিমাণের হুকুম গ্রহণ করেছে। আর তা পূর্ণ গজ এর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং শর্ত অবিদ্যমান হওয়ার কারণে হুকুমটি মূল অবস্থায় ফিরে যাবে

কারো কারো মতে সাধারণ কাপড়ের ক্ষেত্রে যার বিভিন্ন প্রান্ত মানগতভাবে তারতম্যপূর্ণ নয়, সে ক্ষেত্রে শর্তের অতিরিক্তটুকু ক্রেতার জন্য হালাল হবে না। কেননা বিচ্ছিন্নকরণ ক্ষতিকর না হওয়ার কারণে সেটা ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত হবে। এই ভিত্তিতেই মাশায়েখগণ বলেছেন যে, উক্ত কাপড় থেকে একগজ বিক্রি করা জায়িয হবে

অনুচ্ছেদ

কেউ যদি কোন বাড়ী বিক্রি করে তাহলে উল্লেখ না করা সত্ত্বেও ঐ বাড়ীর ঘরসমূহ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।

কেননা دار বা বাড়ী শব্দটি লোক প্রচলনে খালি জায়গা ও ঘর অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া ঘরগুলো ভূমির সাথে স্থায়ী রূপে যুক্ত। সুতরাং তা ভূমির অনুবর্তী হবে।

কেউ যদি কোন জমি বিক্রি করে তাহলে উল্লেখ না করা সত্ত্বেও জমির খর্জুর বৃক্ষ ও অন্যান্য গাছ-পালা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।

কেননা গাছ-পালা জমির সাথে স্থায়ী রূপে যুক্ত। সুতরাং এটা ঘরের সদৃশ হলো।

কিন্তু ফসল উল্লেখ না করলে ফসল জমির বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কেননা এটা বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই যুক্ত রয়েছে। সুতরাং জমিতে রক্ষিত অন্যান্য সামানের সদৃশ হলো।

কেউ যদি এমন খেজুর বা অন্য গাছ বিক্রয় করে যাতে ফল রয়েছে, তাহলে ঐ ফল বিক্রেতার হবে। তবে ক্রেতা যদি শর্ত আরোপ করে (তাহলে তার হবে)।

কেননা নবী (সা) বলেছেন,

من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع

কেউ যদি খেজুর গাছওয়ালা কোন জমি খরিদ করে তাহলে গাছের ফল বিক্রেতার হবে। কিন্তু ক্রেতা যদি শর্ত আরোপ করে তবে তার হবে।

তাছাড়া এ কারণে যে, গাছের ফলের সংযুক্তি যদিও জন্মগত, তবু তা কর্তনের জন্য, স্থায়ী রাখার জন্য নয়, সুতরাং তা ফসলের সদৃশ হলো।

বিক্রেতাকে বলা হবে যে, তুমি ফল পেড়ে বিক্রীত গাছ অর্পণ করো। একই হুকুম যদি বিক্রীত জমিনের ফসল থাকে। কেননা ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু দ্বারা আবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং সেটাকে মুক্ত করে অর্পণ করা তার কর্তব্য হবে। **যেমন** বিক্রিত স্থানে (বিক্রেতার) কোন সরঞ্জাম থাকলে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ফল উপযোগিতা লাভ করা পর্যন্ত এবং ফসলের কাটা [illegible]য় হওয়া পর্যন্ত সেখানেই তা রেখে দেয়া হবে।

কেননা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ীই অর্পণ করা ওয়াজিব। আর এ অবস্থায় কর্তন না করাই হলো প্রচলিত নিয়ম। আর এটা জমিতে ফসল থাকা অবস্থায় ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার মত হলো। আমরা বলি যে, ইজারার ক্ষেত্রেও অর্পণ করা কর্তব্য

ছিলো। তবে বর্ধিত ভাড়ার বিনিময়ে এ ক্ষেত্রে ফসল রাখা হয়। আর ভাড়া অর্পণ করা মূল বস্তুটি অর্পণ করার সমার্থক।

আর বিশুদ্ধ মতে বৃক্ষস্থ ফল মূল্য সম্পন্ন অবস্থায় হওয়া এবং না হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই; উভয় অবস্থায় তা বিক্রেতার হবে।

কেননা, আমরা সামনে বর্ণনা করবো যে, দুইটি বর্ণনার বিশুদ্ধতম বর্ণনা মতে মূল্য সম্পন্ন নয় এমন ফলও বিক্রি করা জায়েয রয়েছে। সুতরাং উল্লেখ করা ছাড়া সেটা বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর যদি জমির মালিক বীজ ফেলার পরে অংকুরিত হওয়ার পূর্বেই জমি বিক্রি হয়ে যায় তাহলে ঐ বীজ বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, আলগা সামান পাত্রের মত সেটা তাতে গচ্ছিত বলে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি অংকুরিত হয় আর মূল্য সম্পন্ন না হয় তাহলে কারো কারো মতে তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না, আর কারো কারো মতে তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

সম্ভবত: এই মতপার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে কাস্তের নাগালে আসার পূর্বে এই ফসলে বিক্রির বৈধতা সম্পর্কে বিদ্যমান মতপার্থক্যের উপর। বিক্রয় চুক্তিতে যাবতীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করার কারণে ফল ও ফসল তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, ফল ও ফসল জমির অধিকার বা সুবিধার অন্তর্গত নয়।

আর যদি বলে, ভূমিস্থ এবং ভূমি হতে নির্গত অল্প-বিস্তর সমস্ত অধিকার ও সুবিধাসহ বিক্রি করলাম; তাহলে আমাদের বর্ণিত একই কারণে এদুটি জিনিস বিক্রয়ভুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি অধিকার বা সুবিধা কথাটা উল্লেখ না করে তাহলে তা বিক্রয়ভুক্ত হবে।

আর জমিতে রক্ষিত কর্তিত ফল-ফসল প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়া শুধু উপরোক্ত কথার কারণে বিক্রয়ভুক্ত হবে না। কেননা এটা জমিতে রক্ষিত অন্যান্য সামানের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, উপযোগিতা প্রকাশ পায়নি কিংবা পেয়েছে এমন ফল যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে বিক্রয় বৈধ হবে।

কেননা বর্তমানে কিংবা পরবর্তীতে উপকার লাভের যোগ্য হওয়ার কারণে তা মূল্য সম্পন্ন মাল রূপে বিবেচ্য।

কোন কোন মতে ফসলে উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে বিক্রি করা জায়িয নয়। তবে প্রথমোক্ত মত অধিক বিশুদ্ধ।

ক্রেতার কর্তব্য হলো বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তুকে খালি করে দেয়ার জন্য সংগে সংগে ঐ ফল কেটে ফেলা।

বিক্রয়ের এ বৈধতা হবে তখন যখন নিঃশর্তভাবে কিংবা কর্তনের শর্তে খরিদ করে

আর যদি ফল খেজুর গাছে রেখে দেয়ার শর্তে খরিদ করে তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে।

কেনেনা এটি এমন শর্ত যা বিক্রয় চুক্তি চাহিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে শর্তটা হচ্ছে অন্যের মালিকানাকে আবদ্ধ রাখার শর্ত, কিংবা চুক্তির ভিতরে উপচুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত। উপচুক্তিটা হলো বিক্রয় চুক্তিতে ধার দেয়ার কিংবা ভাড়া দেয়ার চুক্তি।

একই কারণে জমিতে রেখে দেয়ার শর্তে ফসল বিক্রয় জায়িয নয়। আমাদের বর্ণিত একই কারণে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ফসলের বর্ধণ পূর্ণ হওয়ার পরও এই হুকুম।

ইমাম মুহাম্মদ (র) লোক প্রচলনের কারণে এটাকে অনুমোদনযোগ্য বলেছেন। পক্ষান্তরে ফলের বর্ধন পূর্ণ না হয়ে থাকলে বিষয়টি ভিন্ন, কেননা তখন অর্থ দাঁড়াবে বিক্রয় চুক্তিতে অবিদ্যমান অংশের শর্ত আরোপ করা। অর্থাৎ যে অংশটা বিক্রয়ের পর ভূমি বা বৃক্ষের উপাদান দ্বারা বর্ধিত হবে।

আর যদি নিঃশর্ত রূপে তা খরিদ করে থাকে এবং বিক্রেতার অনুমতিক্রমে গাছে রেখে দেয়, তাহলে পরবর্তীতে বর্ধিত অংশ তার জন্য হালাল হবে। আর যদি বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া রেখে থাকে তবে ঐ ফলের মূল অংশে যে বর্ধিত হয়েছে, তা মূল্য ধরে ছাদাকা করে দেবে। কেননা তা নিষিদ্ধ উপায়ে অর্জিত হয়েছে।

আর যদি বর্ধন সম্পন্ন হওয়ার পর (বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া) রেখে দেয় তাহলে কিছু সাদাকা করতে হবে না। কেননা এটা হলো ফলের অবস্থার পরিবর্তন, বর্ধণ সম্পন্ন হওয়া নয়।

আর যদি নিঃশর্তভাবে খরিদ করে তাতে ফল গাছে রেখে দেয় খেজুর পাকার সময় পর্যন্ত গাছ ভাড়া নেয়। তাহলে বর্ধিত অংশ তার জন্য হালাল হবে।

কেননা, এর লোক প্রচলন ও প্রয়োজন না থাকার কারণে গাছ ভাড়া নেয়া বাতিল হবে, তবে অনুমতি বিবেচ্য থাকবে।

পক্ষান্তরে ফসল খরিদ করার পর যদি পাকার সময় পর্যন্ত জমি ভাড়া নিয়ে তাতে ফসল রেখে দেয় তাহলে বর্ধিত অংশ তার জন্য হালাল হবে না। কেননা পাকার সময়কাল অজ্ঞাত হওয়ার কারণে ইজারা ফাসিদ হবে, ফলে তাতে অবৈধতা সৃষ্টি হবে।

আর যদি ফল নিঃশর্তভাবে খরিদ করার পর দখল বুঝে নেয়ার পূর্বে তাতে আরো নতুন ফল ধরে তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা নতুন ও পুরোনো ফলের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভব না হওয়ার কারণে বিক্রেতার পক্ষে বিক্রীত ফল অর্পণ করা সম্ভব হবে না।

আর যদি দখল বুঝে নেয়ার পর নতুন ফল আসে তাহলে দুই মালিকানার ফল মিশে যাওয়ার কারণে উভয়ে ঐ ফলের মধ্যে শরীকদার হবে এবং পরিমাণের ব্যাপারে ক্রেতার মতই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা ফল তার দখলে রয়েছে। বেগুন, তরমুজ

ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই হুকুম। আর সমস্যা নিরূপণের উপায় হলো মূল বৃক্ষটাই কিনে ফেলা, যাতে বর্ধণ তার মালিকানায় অর্জিত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নির্ধারিত কয়েক সের বাদ দিয়ে ফল বিক্রয় করা বৈধ নয়।

ইমাম মালিক (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। (আমাদের দলীল হল) কেননা বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট ফলের পরিমাণ অজ্ঞাত।

নির্দিষ্ট একটি খেজুর গাছ বাদ দিয়ে খেজুর বাগান বিক্রি করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে চাক্ষুষভাবে অবশিষ্টগুলোর সংখ্যা জানা হয়ে যায়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাশায়েখগণ বলেছেন যে, এটা হলো (আবু হানীফা (র) থেকে) হাসান বিন যিয়াদের বর্ণনা এবং তা ইমাম তাহাবী (র)-এর মত।

কিন্তু যাহিরে রিওয়ায়েত অনুযায়ী বৈধ হওয়াই মুনাসিব। কেননা মূলনীতি এই যে, যে দ্রব্যের উপর স্বতন্ত্রভাবে চুক্তি হতে পারে, তাকে চুক্তি থেকে বাদ দেওয়াও জায়িয হবে। আর গমের স্তূপ থেকে আলাদাভাবে এক কাফীয গম বিক্রি করা যায়। সুতরাং এক কাফীয বাদ রেখে পুরো স্তূপ বিক্রি করাও বৈধ হবে।

প্রাণীর গর্ভ এবং প্রাণীর অংগ প্রত্যংগ বাদ রেখে প্রাণী বিক্রি করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা বৈধ নয়। সুতরাং এগুলোকে বাদ রেখে বিক্রয় করাও বৈধ হবে না।

গম শীষের মধ্যে থাকা অবস্থায় এবং শিষ জাতীয় বীজ খোসার মধ্যে থাকা অবস্থায় বিক্রি করা বৈধ।

চাউল ও তিল সম্পর্কেও একই হুকুম। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সবুজ ও তাজা শিষ জাতীয় শীমের বীজ বিক্রি করা জায়িয নেই। তদ্রূপ আখরোট, বাদাম ও পেস্তাকে উপরের খোসার ভিতরে থাকা অবস্থায় বিক্রি করা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে জায়িয নেই। শীষসহ শস্য বিক্রি করা সম্পর্কে তাঁর দুটি মত রয়েছে। আমাদের মতে এগুলো সবই বিক্রি করা জায়িয আছে।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীল এই যে, চুক্তিকৃত বস্তু এমন বস্তু দ্বারা ঢাকা রয়েছে, যাতে ক্রেতার কোন ফায়দা নেই। সুতরাং এটা স্বর্ণকারের ছাইকে সমশ্রেণীর ছাইয়ের বিনিময়ে বিক্রি করার সদৃশ হলো।

আমাদের দলীল হলো নবী (সা) থেকে বর্ণিত হাদীস যে, তিনি পোক্ত না হওয়া পর্যন্ত গাছের খেজুর বিক্রি করতে আর সাদা না হওয়া এবং আসমানী বালা থেকে নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত শস্যের শীষ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, এগুলো উপকার লাভযোগ্য শস্য দানা, সুতরাং এগুলোকে শীষে থাকা অবস্থায় বিক্রি করা বৈধ হবে, যেমন যব। উভয়ের মাঝে যোগসূত্র হলো মূল্য সম্পন্ন মাল হওয়া।

স্বর্ণকারের মাটির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা রিবা এর সম্ভাবনা থাকার কারণে সমশ্রেণীর ছাইয়ের বিনিময়ে তা বিক্রি করা জায়িয নেই। সুতরাং অন্য শ্রেণীর কিছুর বিনিময়ে বিক্রি জায়িয হবে।

আমাদের বিরোধপূর্ণ মাসআলায়ও যদি শীষের মধ্যে বিদ্যমান শস্যকে সমশ্রেণীর শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে রিবার সম্ভাবনার কারণে জায়িয হবে না। কেননা শীষের ভিতরে কী পরিমাণ শস্য রয়েছে তা জানা নেই।

কেউ যদি বাড়ী বিক্রি করে তাহলে বাড়ীর (দরজার সাথে যুক্ত) তালার চাবিগুলো বিক্রির অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কেননা দরজার সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত হওয়ার কারণে তালাগুলো বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যেহেতু চাবি ছাড়া তালা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভব নয়, সেহেতু তা তালার অংশরূপে গণ্য। সুতরাং উল্লেখ করা ছাড়াই তালার বিক্রয় চুক্তিতে চাবি অন্তর্ভুক্ত থাকে। কারণ চাবি তালার অংশ বিশেষ। কেননা চাবি ছাড়া তালার উপকার হাসিল করা যায় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা এবং মূল্য মুদ্রা পরখ মুজুরি বিক্রেতার যিম্মায় থাকবে।

পরিমাপকারীর বিষয়টি এজন্য যে, অর্পণের জন্য পরিমাপ করা অপরিহার্য। আর অর্পণ করা বিক্রেতার দায়িত্ব।

এর অর্থ হলো বিক্রীত দ্রব্য যদি পাত্রের পরিমাপে বিক্রি করা হয়। তদ্রূপ দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপকারী এবং গজে পরিমাপকারী এবং গণনাকারীর মজুরিও বিক্রেতার যিম্মায় থাকবে।

আর উল্লেখিত মুদ্রা পরখকারীর বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে ইবনে রুস্তমের বর্ণনা।

কেননা মুদ্রা পরখ করার প্রশ্ন আসে বিক্রেতার হাতে মূল্য অর্পণ করার পর। দেখুন না পরখ করা হয় মুদ্রা ওজন করার পর।[1]

আর পরখ করে দেখার প্রয়োজন হলো বিক্রেতার; যাতে সে যে মুদ্রার সাথে তার হক সম্পৃক্ত হয়েছে (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মুদ্রা) সেগুলোকে অন্য মুদ্রা (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মুদ্রা) থেকে পৃথক করে নিতে পারে। কিংবা যাতে দোষযুক্ত মুদ্রাগুলো ফেরত দেয়ার জন্য চিহ্নিত করতে পারে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত ইবনে সামা'আহ্ এর অন্য বর্ণনা মতে এটা ক্রেতার উপর ধার্য হবে। কেননা তার প্রয়োজন হলো নির্ভেজাল নির্ধারিত মুদ্রা অর্পণ করা। আর নির্ভেজাল হওয়া জানা যায় পরখ করার মাধ্যমেই। যেমন ওজনের দ্বারা পরিমাপ জানা যায়। সুতরাং সেটা তার দায়িত্বে হবে।

১. স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রা লেনদেনের সময় প্রথমে ওজন করা হতো তারপর পরখ করে দেখা হতো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুদ্রা ওজনকারীর মজুরি ক্রেতার উপর ধার্য হবে।

কারণ আমরা বর্ণনা করেছি যে, মুদ্রা অর্পণ করা তারই প্রয়োজন আর ওজন করার মাধ্যমেই অর্পণ করা সম্পন্ন হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি মূল্যের বিনিময়ে দ্রব্য বিক্রি করে তাহলে ক্রেতাকে বলা হবে যে, প্রথমে তুমি মূল্য পরিশোধ করো।

কেননা পণ্যের মাঝে ক্রেতার হক নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং মূল্য পরিশোধকে অগ্রবর্তী করতে হবে, যাতে হস্তগত করার মাধ্যমে মূল্যের মাঝে বিক্রেতার হক নির্ধারিত হয়ে যায়। কেননা মূল্য তো নির্ধারিত করলেও নির্ধারিত হয় না (যতক্ষণ হস্তগত করা হয়)। এর উদ্দেশ্যে হলো (উভয়ের মাঝে হকের ক্ষেত্রে) সমতা বিধান করা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রি করে কিংবা মূল্য মুদ্রার বিনিময়ে মূল্য মুদ্রা বিক্রি করে তাহলে উভয়কে বলা হবে তোমরা এক সাথে অর্পণ করো।

কেননা নির্ধারিত হওয়া ও না হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ে সমান। সুতরাং পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন একজনকে অগ্রবর্তী করার প্রয়োজন নেই।

পরিচ্ছেদ ঃ ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপ

বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অনুকূলে ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপ করা জায়িয রয়েছে। আর উভয়ের তিনদিন কিংবা তার কম সময়ের জন্য এখতিয়ার হাসিল করার অধিকার রয়েছে।

এ বিষয়ে মূল প্রমাণ হলো, এই মর্মে বর্ণিত হাদীস যে, হযরত হিব্বান ইবনে মুনকিয বিন আমর আল আনছারী (রা) বেচাকেনায় ঠকে যেতেন। তখন নবী (সা) তাকে বলে দিলেন ঃ

إذا بايعت فقل لا خلابة ولى الخيار ثلثة أيام

যখন বেচা-কেনা করবে তখন বলে নিও, কোন ধোকা নয়, আমার জন্য তিন দিনের ইচ্ছাধিকার থাকবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তিন দিনের অধিক জায়িয হবে না। আর ইহা ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত। ছাহেবায়ন বলেন, নির্ধারিত কোন সময় উল্লেখ করলে জায়িয হবে। কেননা হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দুই মাস পর্যন্ত ইচ্ছাধিকার অনুমোদন করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, চিন্তাভাবনার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইচ্ছাধিকার শরীয়ত অনুমোদন করেছে, যাতে প্রতারণা রোধ করা যায়। আর কখনো কখনো অধিকতর সময়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং তা মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারণের অনুরূপ হলো।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, ইচ্ছাধিকারের শর্তটি বিক্রয় চুক্তির স্বাভাবিক দাবীর পরিপন্থী। স্বাভাবিক দাবী হলো অবশ্য সাব্যস্ত হওয়া। কিন্তু আমরা যে 'নাছ' টি বর্ণনা করেছি, তার প্রেক্ষিতে কিয়াসের বিপরীত এটি জায়িয রেখেছি। সুতরাং 'নাছ' -এ যে সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর তিন দিনের অতিরিক্ত সময়কাল নিষিদ্ধ থাকবে। তবে (অতিরিক্ত মেয়াদ উল্লেখের পর) যদি তিন দিনের ভিতরে বিক্রয়কে অনুমোদন করে নেয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা বৈধ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এই চুক্তিটি ফাসিদ অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা বৈধ রূপে পরিবর্তিত হতে পারে না।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, (যার অনুকূলে ইচ্ছাধিকারের শর্ত ছিলো)সে ফাসাদকারী বিষয়টিকে স্থির হওয়ার পূর্বেই রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং বিক্রয় চুক্তিটি বৈধ রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

যেমন (ব্যবসায়ীদের) নম্বর উল্লেখ করে বিক্রি করলো এবং ঐ মজলিসেই মূল্যে পরিমাণ জানিয়ে দিলো। তা ছাড়া ফাসাদ সাব্যস্ত হয় চতুর্থ দিনের হিসাবে। সুতরাং যখন সে তার পূর্বেই অনুমোদন করে দিলো তখন ফাসাদ সৃষ্টিকারী গুণটি বিক্রয় চুক্তির সাথে যুক্ত হয় না।

একারণেই বলা হয়েছে যে, চতুর্থ দিনের প্রথম অংশটি অতিবাহিত হওয়া দ্বারা বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, চুক্তিটি ফাসিদ অবস্থায় সংঘটিত হয়। অত:পর শর্ত রহিতকরণে ফাসাদ দূরীভূত হয়ে যাবে।

এই শেষোক্ত মতটি প্রথমোক্ত দলীলের উপর নির্ভরশীল। যদি এই শর্তে খরিদ করে যে, তিন দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করলে উভয়ের মাঝে কোন বিক্রয় চুক্তি থাকবে না। তাহলে তা বৈধ হবে। আর যদি চারদিন পর্যন্ত সময়ের শর্ত করলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়িয হবে না।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, চার বা তার বেশীর শর্ত আরোপ করলেও জায়িয হবে। অত:পর যদি তিন দিনের মধ্যেই মূল্য পরিশোধ করে ফেলে তাহলে সকলের মতেই বিক্রয় চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, (প্রয়োজনের দিক থেকে) এটা ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপের সমার্থক। কেননা মূল্য পরিশোধ না করা অবস্থায় চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রহিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যাতে চুক্তি রহিত করার ব্যাপারে অপর পক্ষের গড়িমসি থেকে বাঁচা যায়। সুতরাং মূল্য পরিশোধের সংক্রান্ত ইচ্ছাধিকার শর্তকৃত ইচ্ছাধিকারের সাথে যুক্ত হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) যোগকৃত মাসআলার ক্ষেত্রে আপন মূলনীতি অনুসরণ করেছেন এবং তিন দিনের অধিক সময়কে বাতিল করে দিয়েছেন। তদ্রূপ ইমাম মুহাম্মদ (র) ও অধিক সময়কালকে অনুমোদন দানের ক্ষেত্রে আপন মূলনীতি অনুসরণ করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) মূল মাসআলায় সাহাবীর বাণীর উপর আমল করেছেন। আর এই যোগকৃত মাসআলায় কিয়াসের ওপর আমল করেছেন।

এই মাসআলার অন্য একটি কিয়াস রয়েছে। ইমাম যুফার (র) সেদিকেই ঝুঁকেছেন। তা এই যে, এটা এমন বিক্রয় চুক্তি, যাতে ফাসিদরূপে বিক্রয় প্রত্যাহারের শর্তারোপ করা হয়েছে। কেননা প্রত্যাহারকে মূল্য পরিশোধ না করার সাথে শর্তায়িত করা হয়েছে। অথচ বিশুদ্ধ প্রত্যাহারের শর্তারোপও বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে। সুতরাং ফাসিদরূপে প্রত্যাহারের শর্তারোপ তো আরো স্বাভাবিকভাবেই বিক্রয় চুক্তিকে নষ্ট করবে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম-কুদূরী (র) বলেন, বিক্রেতার পক্ষ থেকে ইচ্ছাধিকারের শর্তারোপ বিক্রীত পণ্যকে তার মালিকানা থেকে বহির্ভূত হওয়া রোধ করে।

কেননা (মালিকানা থেকে বহির্ভূতকারী) এই হেতুটির সম্পৃক্ততা হয় সম্মতি দ্বারা আর ইচ্ছাধিকার থাকা অবস্থায় সম্মতি পূর্ণ হয় না। একারণেই বিক্রেতার আযাদ করা কার্যকর হয়। আর মালিকের অনুমতিক্রমে হস্তগত করলেও তাতে ক্রেতা হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ করে না।

আর ক্রেতা যদি তা হস্তগত করে এবং ইচ্ছাধিকারের সময়কালে তার কবজায় থাকা অবস্থায় তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে তার বাজার মূল্যের ক্ষতিপূরণ দান করবে।

কেননা বিক্রীত দ্রব্য বিনষ্ট হওয়ার কারণে বিক্রয় চুক্তি রহিত হয়ে যায়। রহিত হওয়ার অনিবার্যতা এই জন্য যে, ইচ্ছাধিকার বিদ্যমান থাকায় বিক্রয় চুক্তিটি স্থগিত ছিলো। আর বিক্রয় চুক্তি প্রয়োগের পাত্রের (বিক্রীত দ্রব্যের) উপস্থিত ছাড়া বিক্রয় কার্যকর করার উপায় নেই। সুতরাং মুলামুলির পর্যায় তার কবজার অধীনে রয়েছে বলে ধরা হবে। এবার সে ক্ষেত্রে বাজার মূল্যই সাব্যস্ত হয়।

আর যদি বিক্রেতার হাতে খোয়া যায়, তাহলে বিক্রয় চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। এবং ক্রেতার উপর কোন ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না, নিঃশর্ত ও বিশুদ্ধ বিক্রয় চুক্তির ওপর কিয়াস করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ক্রেতার পক্ষ থেকে ইচ্ছাধিকারের শর্তারোপ বিক্রীত দ্রব্যকে বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যেতে বাধা দান করবে না।

কেননা অপর পক্ষের দিক থেকে তো বিক্রয় অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এটা এজন্য যে, ইচ্ছাধিকার বিনিময় বস্তুটিকে ঐ ব্যক্তির মালিকানা থেকে বিচ্যুত হতে বাধা দেয় যার অনুকূলে ইচ্ছাধিকার আরোপ করা হয়েছে। কেননা এটা তো তার কল্যাণ বিবেচনা করে অনুমোদন করা হয়েছে। অপর পক্ষের কল্যাণ বিবেচনা করে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ক্রেতাও দ্রব্যটির মালিক হবে না।

আর ছাহেবায়ন বলেন, সে তার মালিক হয়ে যাবে। কেননা দ্রব্যটি যখন বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেলো, তখন যদি তা ক্রেতার মালিকানাভুক্ত না হয় তাহলে তা মালিকানা বিচ্যুত হয়ে যাবে, কোন মালিকের মালিকানায় আসা ছাড়াই। আর শরীয়তে এর কোন নযীর নেই। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, মূল্যদ্রব্য যখন ক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়নি তখন আমরা যদি বিক্রীত দ্রব্য তার মালিকানাভুক্ত হওয়ার কথা বলি তাহলে দুই বিনিময় দ্রব্য বিনিময়ের ভিত্তিতে একই ব্যক্তি মালিকানায় একত্র হয়ে যাবে। অথচ শরীয়তে এর কোন প্রমাণ নেই। কেননা বিনিময় চুক্তি সমতা দাবী করে।

তাছাড়া এই ইচ্ছাধিকার অনুমোদিত হয়েছে ক্রেতার কল্যাণ বিবেচনা করে; যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের সুবিধা বুঝতে পারে। অথচ যদি তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে হতে পারে যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ক্রীত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। যেমন এই অবস্থায় গোলাম তার নিকট আত্মীয় হলো তখন তার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার কবজায় বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় মূল্যের বিপরীতে বিনষ্ট হবে।

একই বিধান হবে যদি বিক্রীত দ্রব্য দোষগ্রস্ত হয়ে যায়।

ইচ্ছাধিকার যদি বিক্রেতার হয়ে থাকে তাহলে বিধান বিপরীত হবে। (নষ্ট হলে বাজার মূল্য দিতে হবে।)

পার্থক্যের কারণ এই যে, বিক্রীত দ্রব্যে দোষ দেখা দিলে তো ফেরত দেয়া সম্ভব হবে না। আর মারা যাওয়া কোন না কোন পূর্ব দোষ থেকে মুক্ত হয় না। তাই মৃত্যুর এমন অবস্থা হবে যে, (দোষজনিত কারণে ফেরত দিতে না পারায়) চুক্তি অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে। আর পূর্বোক্ত মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা বিক্রেতার ইচ্ছাধিকারের বিধান হিসাবে দোষ যুক্ত হওয়ার কারণে ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বিক্রীত দ্রব্য হালাক হবে (বা মারা যাবে) এমন অবস্থায় যে, চুক্তিটি স্থগিত রয়েছে।[১]

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি আপন স্ত্রীকে খরীদ করে তিন দিনের ইচ্ছাধিকারের শর্তে তাহলে বিবাহ ফাসিদ হবে না।

কেননা তার অনুকূলে ইচ্ছাধিকার থাকার কারণে সে এখনো স্ত্রীর মালিক হয়নি।

এ অবস্থায় যদি সে তার সাথে সহবাস করে তাহলে এর পরেও সে তাকে ফেরত দিতে পারে।

কেননা এই সহবাস বিবাহ সূত্রে হয়েছে।

কিন্তু স্ত্রী কুমারী হলে ভিন্ন কথা। কেননা সহবাস (কুমারিত্ব নষ্ট করার মাধ্যমে) তাকে দোষযুক্ত করে দেয়। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত।

---

১. বিক্রয়ের পাত্র না থাকায় চুক্তি নিজে নিজেই বাতিল হয়ে যাবে। ফলে বিক্রয় মূল্যের পরিবর্তে বাজার মূল্য সাব্যস্ত হবে।

ছাহেবায়ন বলেন, বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা সে স্ত্রীর মালিক হয়ে গেছে। এখন যদি সহবাস করে তাহলে ফেরত দিতে পারবে না। কেননা দাসত্বের মালিকানার ভিত্তিতে সে তার সাথে সহবাস করেছে। সুতরাং অকুমারী হলেও তাকে ফেরত দেয়া নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

এই মাসআলাটির আরো কতিপয় সমশ্রেণীর মাসআলা রয়েছে। সবগুলোর ভিত্তি হলো ক্রেতার অনুকূলে ইচ্ছাধিকারের শর্ত থাকা অবস্থায় ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এবং না হওয়ার উপর। তন্মধ্যে একটি মাসআলা হলো, খরিদকৃত গোলাম যদি ক্রেতার নিকটাত্মীয় হয় তাহলে ইচ্ছাধিকারের সময়কালে ক্রেতার পক্ষ থেকে তার আযাদ হয়ে যাওয়া।

আরেকটি মাসআলা হলো ক্রেতা যদি শর্তবাচক বাক্য বলে যে, আমি যদি কোন গোলামের মালিক হই তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। (এ অবস্থায় ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে তার আযাদ হওয়া না হওয়া)। পক্ষান্তরে যদি বলে যে, আমি যদি কোন গোলাম খরিদ করি তাহলে তার হুকুম ভিন্ন। (তবে সবার মতেই সে আযাদ হয়ে যাবে) কেননা একথা দ্বারা সে যেন ক্রয়ের পর 'মুক্তি' সম্পর্কিত করল। সুতরাং (ক্রয় করা মাত্র) তার ইচ্ছাধিকার রহিত হয়ে যাবে।

আরেকটি মাসআলা হলো ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে গর্ভমুক্ত পরিচিতির ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত দাসীর ঐ ঋতুস্রাব বিবেচ্য নয়, যা ইচ্ছাধিকারের সময়কালে দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তরে ছাহেবায়নের মতে তা বিবেচ্য হবে।

তদ্রূপ এই খরিদকৃত দাসীকে যদি ইচ্ছাধিকার বলে বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতার ওপর গর্ভ মুক্তির বিধান কার্যকরী করা ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে ছাহেবায়নের মতে ওয়াজিব হবে, যদি ক্রেতা কবজা করার পর ফেরত দেওয়া হয়।

আকেরটি মাসআলা এই যে, ইচ্ছাধিকার সময়কালে খরিদকৃত দাসী যদি বিবাহ সূত্রে (ক্রেতার ঔরসে) সন্তান প্রসব করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে ক্রেতার উম্মে ওয়ালাদ হবে না। ছাহেবায়ন ভিন্নমত পোষণ করেন।

আরেকটি মাসআলা এই যে, ক্রেতা যদি বিক্রেতার অনুমতিক্রমে ক্রয়কৃত পণ্য কব্জা করে দেয়, এরপর বিক্রেতার নিকট তা আমানত রাখেন আর বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় মেয়াদের মধ্যে (কিংবা তারপর) তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা বিক্রেতার মাল হিসেবেই বিনষ্ট হবে।

কেননা ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে বিক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে ক্রেতার দখল প্রত্যাহৃত হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে ছাহেবায়নের মতে ক্রেতার মাল হিসাবেই হালাক হবে। কেননা মালিকানা বিদ্যমান থাকার বিবেচনা আমানত রাখা সহীহ হয়েছে।

আরেকটি মাসআলা এই যে, ক্রেতা যদি অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হয় আর বিক্রেতা ইচ্ছাধিকারের সময়কালে ক্রেতাকে মূল্য মাফ করে দেয় তাঁহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার ইচ্ছাধিকার অটুট থাকবে। কেননা এমতাবস্থায় পণ্য ফেরত দেয়ার অর্থ হবে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের পক্ষ থেকে কোন কিছুর মালিকানা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা; আর অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের সে অধিকার রয়েছে।

আর ছাহেবায়নের মতে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যখন সে ক্রয় সূত্রে মালিক হয়ে গেছে তখন ফেরত দেয়ার অর্থ বিনিময় গ্রহণ ছাড়া বিক্রেতাকে মালিকানা দান করা; অথচ সে এ কাজের অধিকার প্রাপ্ত নয়।

আকেরকটি মাসআলা এই যে, যিম্মি যদি কোন যিম্মির কাছ থেকে ইচ্ছাধিকারের শর্তে মদ ক্রয় করে, অত:পর ইসলাম গ্রহণ করে; তাহলে ছাহেবায়নের মতে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে তো ক্রয় সূত্রে মালিক হয়ে গেছে। সুতরাং মুসলমান অবস্থায় সে তা ফেরত দেয়ার অর্থাৎ মালিকানা হস্তান্তরের অধিকারী হবে না।

আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে তো এখানো মালিক হয়নি। সুতরাং মুসলমান অবস্থায় ইচ্ছাধিকার রহিতকরণের মাধ্যমে সে মদে মালিকানা গ্রহণ করতে পারে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যার অনুকূলে ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, ইচ্ছাধিকারের মেয়াদের ভিতরে সে বিক্রয় চুক্তি রহিত করতে পারে আবার তা বহাল রাখতে পারে। যদি সে অপর পক্ষের অনুপস্থিতিতে বহাল রাখে তবে বৈধ হবে। পক্ষান্তরে অপরজনের উপস্থিত ছাড়া বিক্রয় চুক্তি রহিত করলে তা বৈধ হবে না।

এটা হল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, বৈধ হবে ইমাম শাফেয়ী (র)-এরও এই মত। আসল শর্ত হলো বিষয়টির অবগতি। উপস্থিতি দ্বারা সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রা)-এর দলীল এই যে, সে তো অপর পক্ষের দিক থেকে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করার একক ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং তা তার অবগতির উপর নির্ভর করে না। যেমন অনুমোদনের বিষয়টি। একারণেই তো তার সম্মতির শর্ত আরোপ করা হয় না।

ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি বিক্রয়ের উকিলের ন্যায় হলো।

তারফায়নের দলীল এই যে, চুক্তি রহিতকরণ অর্থ অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ। আর তা ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। কেননা হতে পারে যে, বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকা অবস্থায় ক্রেতা পূর্বের বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার উপর ভরসা করে বিক্রীত পণ্যে কোন হস্তক্ষেপ করবে। ফলে তা বিনষ্ট হওয়ার কারণে তার ওপর মূল্য দন্ড সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তদ্রূপ ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকা অবস্থায় বিক্রেতা তার পণ্যের জন্য নতুন ক্রেতা

তালাশ করবে না। এটাও এক ধরনের ক্ষতি বটে। সুতরাং বিষয়টি তার অবগতির উপর নির্ভর করবে। তাই বিষয়টি (ক্রয় বা বিক্রয় সংক্রান্ত) উকিলকে অপসারণ করার মত হলো।[১]

অনুমোদন করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা অপর পক্ষের উপর কোন দায় আরোপিত হয় না।

আর একথা আমরা বলতে পারি না যে, (অপর পক্ষের দিক থেকে সে রহিত করণের) একক অধিকারী। কিভাবে তা বলা যায়, যেখানে অপর পক্ষ নিজে চুক্তি রহিতকরণের অধিকারী নয়। আর অধিকার প্রদানকারী যে বিষয়ের অধিকারী নয়, সে বিষয়ে অধিকার প্রদান গ্রহণযোগ নয়।

যদি অপর পক্ষের অনুপস্থিতির অবস্থায় চুক্তি রহিত করে আর (ইচ্ছাধিকারের) সময়কালের মধ্যেই তার কাছে খবর পৌছে যায় তাহলে অবগতি হাসিল হওয়ার কারণে রহিতকরণ কার্যকর হবে।

আর যদি মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার কাছে খবর পৌছে তাহলে রহিত হওয়ার পূর্বেই মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মারা যায়, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সেটা তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার লাভ করবে। কেননা এটা এমন হক, যা বিক্রয় চুক্তিতে অনিবার্যরূপে স্যবস্ত হয়েছে। সুতরাং তাতে উত্তরাধিকার সাবস্ত্য হবে। যেমন দোষজনিত ইচ্ছাধিকার এবং নির্ধারণ সংক্রাত ইচ্ছাধিকারের ক্ষেত্রে হয়।

আমাদের দলীল এই যে, ইচ্ছাধিকার আপন ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর ইচ্ছা স্থানান্তরিত হতে পারে না। আর উত্তরাধিকার এমন ক্ষেত্রে কার্যকর হয়, যা স্থানান্তর গ্রহণ করে। দোষজনিত ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মৃত ব্যক্তি দোষমুক্ত পণ্যের অধিকারী হয়েছিলো; সুতরাং ওয়ারিসও দোষমুক্ত পণ্যের অধিকারী হবে। শুধু ইচ্ছাধিকারের উত্তরাধিকার হয় না।

পক্ষান্তরে নির্ধারণ সংক্রান্ত ইচ্ছাধিকার ওয়ারিসদের জন্য নতুনভাবে ও পৃথকভাবে সাব্যস্ত হয়। কেননা তার মালিকানা অন্যের মালিকানার সাথে মিশে গেছে ইচ্ছাধিকারের উত্তরাধিকারী হিসেবে নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন কিছু খরিদ করে আর অন্য কারো নামে ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপ করে তাহলে দুজনের যে কেউ অনুমোদন করলে তা বৈধ হবে। আর যে কেউ রহিত করলে তা রহিত হয়ে যাবে। এর মূলনীতি এই যে, তৃতীয়

১. ক্রয় সংক্রান্ত উকিলকে যদি তার অজান্তে অব্যাহতি প্রদান করে, আর সে মুআক্কিলের পক্ষে কোন কিছু খরীদ করে, তাহলে ক্রয় মূল্য উক্ত উকিলের উপর সাব্যস্ত হবে। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কোন ব্যক্তির অনুকূলে ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপ করা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে বৈধ। কিন্তু সাধারণ কিয়াসের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। আর ইমাম যুফার (র)-এর মতও তাই। কেননা ইচ্ছাধিকার হলো চুক্তি সম্পৃক্ত অনিবার্য বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। সুতরাং চুক্তি বহির্ভূত অন্য কারো জন্য ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপ করা বৈধ হবে না। যেমন ক্রেতার পরিবর্তে অন্য কারো উপর মূল্য পরিশোধের শর্ত আরোপ করা (বৈধ হবে না)।

আমাদের দলীল এই যে, চুক্তিকারীর স্থলাভিষিক্ততার ভিত্তিতেই শুধু অন্যের জন্য ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হচ্ছে, সুতরাং অনিবার্যতার ভিত্তিতে চুক্তিকারীর অনুকূলে ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে। অত:পর তৃতীয় ব্যক্তিকে তার স্থলবর্তী করা হবে, যাতে তার পদক্ষেপকে শুদ্ধরূপ দেয়া সম্ভবপর হয়। আর তখন উভয়ের প্রত্যেকের অনুকূলে ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে। ফলে তাদের দুজনের যে কেউ অনুমোদন করবে তা অনুমোদিত হবে। তদ্রূপ যে কেউ রহিত করবে তা রহিত হয়ে যাবে।

আর যদি দুজনের একজন অনুমোদন করে এবং অন্যজন রহিত করে তাহলে অগ্রবর্তীজনকে বিবেচনা করা হবে। কেননা অগ্রবর্তীজনের হস্তক্ষেপ ঐ সময়কালে বিদ্যমান ছিলো, যখন অপরজন ঐ বিষয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

আর যদি দুজনের বক্তব্য একই সময়ে উচ্চারিত হয় তাহলে এক বর্ণনা মতে চুক্তিকারীর হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে। আর অন্য বর্ণনা মতে রহিতকারীর হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে। প্রথম বর্ণনার কারণ এই যে, চুক্তিকারীর পদক্ষেপ অধিকতর প্রবল। কেননা স্থলবর্তী ব্যক্তি তার মাধ্যমেই কর্তৃত্ব লাভ করছে।

দ্বিতীয় বর্ণনার দলীল এই যে, রহিতকরণ হস্তক্ষেপটি অধিকতর শক্তিশালী। কেননা অনুমোদনকৃত বিষয়ের সাথে রহিতকরণ যুক্ত হতে পারে। কিন্তু বাতিলকৃত বিষয়ের সাথে অনুমোদন যুক্ত হতে পারে না।

এমতাবস্থায় উভয়ে যখন পদক্ষেপের অধিকারী হলো তখন পদক্ষেপের গুণগত অবস্থার ভিত্তিতে আমরা অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবো।

আর কেউ কেউ বলেছেন, প্রথমটা হলো ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত, আর দ্বিতীয়টা হলো ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। এই অনুসিদ্ধান্ত আহরণ করা হয়েছে ঐ মাস'আলা থেকে যে, বিক্রয়ের উকিল যদি একজনের কাছে বিক্রি করে আর মুআক্কিল অন্যজনের কাছে একই সময়ে বিক্রি করে, সেক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র) মুআক্কিলের পদক্ষেপ বিবেচনা করেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) উভয়ের পদক্ষেপ বিবেচনা করেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে দুটি গোলাম বিক্রি করে এই শর্তে যে, দুটির একটির মধ্যে ক্রেতার তিন দিনের এখতিয়ার থাকবে, তাহলে এ বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। পক্ষান্তরে যদি দুটির প্রতিটিকে পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে এই শর্তে যে, দুটির নির্দিষ্ট একটির মধ্যে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে, তাহলে বিক্রয় বৈধ হবে।

আলোচ্য মাসআলার চারটি ছূরত। প্রথমত: মূল্যের তাফসীল না করা এবং ইচ্ছাধিকার সম্পৃক্ত গোলাম নির্ধারণ না করা। এটি হচ্ছে কিতাবে বর্ণিত প্রথম ছূরত। এই ছূরত ফাসিদ হওয়ার কারণ হলো মূল্য এবং বিক্রীত পণ্য অজ্ঞাত হওয়া। কেননা ইচ্ছাধিকারযুক্ত বিক্রয় দ্রব্য চুক্তিবহির্ভূত দ্রব্যের মত। কারণ ইচ্ছাধিকারসহ সম্পন্ন বিক্রয়চুক্তি তার অনিবার্য বিধান তথা মালিকানার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং দুটির একটি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। অথচ তা অজ্ঞাত। দ্বিতীয় ছূরত এই যে, মূল্যে তাফসীল করা হয় এবং যে গোলামটির মধ্যে ইচ্ছাধিকার রয়েছে তা নির্ধারণ করা হয় আর এটিই কিতাবে বর্ণিত দ্বিতীয় ছূরত।

এটি জায়িয হওয়ার কারণ এই যে, বিক্রয় দ্রব্য জ্ঞাত এবং মূল্যও জ্ঞাত। আর ইচ্ছাধিকার সম্পৃক্ত গোলামটির ক্ষেত্রে চুক্তি গ্রহণকে যদিও অন্যটির ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্য শর্ত করা হয়েছে; তবু এটা চুক্তিকে নষ্ট করবে না। কেননা ইচ্ছাধিকার সম্পৃক্ত দ্রব্যটি বিক্রয় পাত্র হওয়ার যোগ্য; যেমন যদি একটি গোলামও একটি মুদাব্বারকে বিক্রয় চুক্তিতে একত্র করা হয়।

তৃতীয় ছূরত এই যে, মূল্যের তাফসীল করা হয় এবং যে গোলামটির ইচ্ছাধিকার রয়েছে তা নির্ধারিত না করা হয়। আর চতুর্থ ছূরত এই যে, নির্ধারণ করা হয় এবং মূল্যের তাফসীল না করা হয়। এ দুই ছূরতে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে; হয় দ্রব্য অজ্ঞাত হওয়ার কারণে কিংবা মূল্য অজ্ঞাত হওয়ার কারণে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি দশ দিরহাম দ্বারা দুটি কাপড়ের একটি খরিদ করে এই শর্তে যে, যেটি ইচ্ছা সেটি সে গ্রহণ করবে আর তার তিন দিনের ইচ্ছাধিকার থাকবে, তাহলে বিক্রয় বৈধ হবে। তিনটি কাপড়ের ক্ষেত্রে একই কথা। কিন্তু চারটি কাপড় হলে বিক্রয় ফাসিদ হবে।

কিয়াসের দাবী হলো, বিক্রীত পণ্য অজ্ঞাত হওয়ার কারণে সবকটি ক্ষেত্রে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, শরীয়ত কর্তৃক ইচ্ছাধিকারের অনুমোদন করা হয়েছে ঠকা রোধ করার জন্য; যাতে সে অধিকতর লাভজনক ও সুবিধাজনক বস্তুটি নির্বাচন করতে পারে আর এ ধরনের বিক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা সুসাব্যস্ত। কেননা ক্রেতা এমন ব্যক্তির পণ্য নির্বাচনের মুখাপেক্ষী হতে পারে, যার প্রতি তার আস্থা রয়েছে। কিংবা (স্ত্রী কন্যা) যার জন্য ক্রয় করছে, তার নির্বাচনের মুখাপেক্ষী হতে পারে। অথচ বিক্রেতা বিনা বিক্রয়ে তাকে ঐ ব্যক্তি পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাওয়ার অধিকার দেবে না। সুতরাং শরীয়ত যে তিনদিন মেয়াদী শর্তভিত্তিক ইচ্ছাধিকার অনুমোদন করেছে, এটা তারই সমপর্যায়ের। আর এ প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় তিনটির দ্বারা। কেননা এতে রয়েছে উত্তম মধ্যম ও নিকৃষ্ট। আর তিনের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার বিবাদ পর্যন্ত গড়াবে না। কেননা, যার জন্য ইচ্ছাধিকার, সে হলো নির্দিষ্ট। তেমনি পরের ব্যাপারেও। তবে পরের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান নেই। আর অনুমতি সাব্যস্ত হয়েছে প্রয়োজনীয়তার কারণে এবং

অজ্ঞতা বিবাদমুখী না হওয়ার কারণে। সুতরাং দুটির শুধু একটি দ্বারা অনুমোদন সাব্যস্ত হবে না।

আর কেউ কেউ বলেছেন, এধরনের চুক্তিতে নির্ধারণের ইচ্ছাধিকারের পাশাপাশি ইচ্ছাধিকারের শর্ত থাকারও শর্ত রয়েছে। 'জামে ছাগীর' কিতাবে এই উল্লেখিত হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন, তা শর্ত নয় 'জামে কবীর' কিতাবে এই উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং এই মতের বিবেচনায় ইচ্ছাধিকারের শর্তের উল্লেখ শর্ত রূপে নয়; বরং ঘটনা ক্রমে।

আর যদি ইচ্ছাধিকারের শর্তের উল্লেখ না থাকে তখন ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে নির্ধারণের ইচ্ছাধিকারকে তিন দিনের মেয়াদযুক্ত করা জরুরী। আর ছাহেবায়নের মতে যে কোন মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে। 'জামে ছাগীরের' কোন কোন অনুলিপিতে দুটি কাপড় খরিদ করার কথা রয়েছে, পক্ষান্তরে কোন কোন অনুলিপিতে দুটির একটি খরিদ করার কথা রয়েছে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা বিক্রীত পণ্য মূলতঃ একটি; অন্যটিতো (ক্রেতার যিম্মায়) আমানত থাকবে।

আর প্রথম অনুলিপির এবারতটি রূপক ও ইঙ্গিত অর্থে হবে।

আর দুটির একটি যদি বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা দোষযুক্ত হয়ে যায়, তাহলে সেটিতে তার অংশের মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে এবং অন্যটি আমানত রূপে নির্ধারিত হবে।

কেননা দোষযুক্ত হওয়ার কারণে সেটি ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হবে।

আর যদি দুটি একসাথে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে প্রতিটির অর্ধেক মূল্য তার যিম্মায় সাব্যস্ত হবে।

কেননা বিক্রয় চুক্তি ও আমানত দুটোতেই ব্যাপ্ত রয়েছে।

আর যদি ঐ চুক্তিতে ইচ্ছাধিকারের শর্ত থাকে তাহলে দুটোতেই তার ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে।

যার অনুকূলে ইচ্ছাধিকার রয়েছে, সে যদি মারা যায় তাহলে দুটির যে কোন একটি ফেরত দেয়ার অধিকার তার ওয়ারিছদের থাকবে।

কেননা অন্যের মালিকানার সাথে নিজের মালিকানা মিশ্রিত হওয়ার কারণে শুধু নির্ধারণের ইচ্ছাধিকারই এখানে অবশিষ্ট রয়েছে। একারণেই ওয়ারিছের ক্ষেত্রে এটা সময়ে আবদ্ধ থাকবে না।

পক্ষান্তরে ইচ্ছাধিকারের শর্তের তো উত্তরাধিকার হয় না। ইতিপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করে এসেছি।

কেউ যদি ইচ্ছাধিকারের শর্তে কোন বাড়ী খরিদ করে আর মেয়াদের ভিতরে তার পার্শ্ববর্তী অন্য কোন ঘর বিক্রি হয়, আর সে শোফা এর অধিকার বলে তা খরিদ করে তাহলে এটা বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে তার সম্মতি বলে গণ্য হবে।

কেননা শোফার দাবী প্রমাণ করে যে, বিক্রীত বাড়ীর ক্ষেত্রে সে মালিকানা গ্রহণ করেছে। কেননা প্রতিবেশিতার ক্ষতিরোধ করার জন্যই শোফফার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মালিকানার স্থায়িত্বের কারণেই প্রতিবেশিতার ক্ষতি হতে পারে।

সুতরাং শোফার অধিকার দাবী করা দাবীর পূর্ববর্তী সময়ে ইচ্ছাধিকার রহিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করবে। ফলে ক্রয়ের সময় থেকেই বাড়ীর মালিকানা সাব্যস্ত হবে। এবং প্রকাশ থাকে যে, প্রতিবেশি (পূর্ব থেকেই) সাব্যস্ত ছিলো।

বিশেষভাবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতের প্রেক্ষিতেই এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, দুজন লোক যদি একটি গোলাম খরিদ করে এই শর্তে যে, উভয়ের ইচ্ছাধিকার থাকবে। অত:পর দু'জনের একজন সম্মত হলো তখন অপরজনের তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে না।

এটি ইমাম আবু হানীফার (র) মত। আর ছাহেবায়ন বলেন, তার ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। আর দোষজনিত ইচ্ছাধিকার এবং ইচ্ছাধিকারের ক্ষেত্রেও একই মতানৈক্য হবে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, উভয়ের জন্য এখতিয়ার হাসিল হওয়ার অর্থ হলো উভয়ের প্রত্যেকের জন্য এখতিয়ার হাসিল হওয়া। সুতরাং অপর জনের এখতিয়ার রহিত করার দ্বারা তার এখতিয়ার রহিত হবে না। কেননা এতে তার হক বাতিল করা হয়।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, বিক্রীত পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে অংশীদারিত্বের দোষ থেকে মুক্ত অবস্থায় বের হয়েছে। এখন যদি দুজনের একজন তা ফেরত দেয় তাহলে উক্ত দোষে দূষিত অবস্থায় ফেরত দেয়া হবে, আর তাতে 'অতিরিক্ত ক্ষতি' আরোপ করা হয়।

আর ফেরত দেয়ার ব্যাপারে দু'জনের একজনের সম্মতি উভয়ের জন্য ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত করার অনিবার্য ফলশ্রুতি নয়। কেননা ফেরত দেয়ার ব্যাপারে উভয়ের একত্র সম্মতি ধারণা করা যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি এই শর্তে কোন গোলাম বিক্রি করে যে, সে রুটি তৈরি করতে জানে কিংবা সে লিখতে জানে। কিন্তু পরে তার বিপরীত দেখা গেলো, তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে পুরো মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে আর ইচ্ছা করলে ক্রয় পরিত্যাগ করবে।

কেননা এটা হলো আগ্রহজনক একটি গুণ। সুতরাং বিক্রয় চুক্তিতে শর্তরূপে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এরপর ঐ গুণের অনুপস্থিতি ইচ্ছাধিকার প্রদানকে অনিবার্য করবে। কেননা ক্রেতা তো ঐ গুণ ব্যতিরেকে 'বিক্রীত দ্রব্যের' ব্যাপারে সম্মত ছিলো না।

তবে (চুক্তি ফাসিদ না হওয়ার কারণ এই যে, বিশেষ কোন গুণ থাকা না থাকার এই ভিন্নতা) এটি উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্যের স্বল্পতার কারণে শ্রেণীগত পার্থক্যের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং এর অনুপস্থিতির কারণে চুক্তি ফাসিদ হবে না। যেমন- পশু-প্রাণীতে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব গুণের ক্ষেত্রে। সুতরাং এটি নিখুঁত হওয়া গুণের অনুপস্থিতির মত হলো।

আর যদি সে তা নিতে চায় তাহলে পূর্ণ মূল্য দিয়েই নেবে। কেননা পূর্বে বর্ণিত নীতি অনুযায়ী যেহেতু বিক্রয় চুক্তিতে গুণ সত্তার অনুবর্তী হয়ে থাকে, সেহেতু গুণাবলীর বিপরীতে মূল্যের কোন অংশ সাব্যস্ত হয় না।

পরিচ্ছেদ ঃ দর্শন ভিত্তিক ইখতিয়ার

কেউ যদি কোন জিনিস না দেখে খরিদ করে, তাহলে বিক্রয় বৈধ। আর যখন সে তা দেখবে তখন তার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে পুরোমূল্য দ্বারা নেবে। আর চাইলে ফেরত দেবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বিক্রীত পণ্য অজ্ঞাত হওয়ার কারণে মূলতঃই বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (স) বলেছেন :

من اشترى شيئا لم يره فله الخيار اذا راه .

কেউ যদি এমন কোন জিনিস খরিদ করে যা সে দেখেনি, তাহলে যখন দেখবে তখন তার ইখতিয়ার থাকবে।

তাছাড়া এই কারণ যে, না দেখার কারণে যে অজ্ঞতা তা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় না। কেননা যদি সেটা তার মনপুত না হয় তাহলে সে তা ফেরত দিতে পারে। সুতরাং এটা চোখে দেখা ও ইংগিতকৃত বস্তুর গুণ অজ্ঞাত হওয়ার মত হলো।[১]

তদ্রূপ যদি বলে যে, আমি সম্মত আছি। তারপর বস্তুটি দেখল। সে ক্ষেত্রেও তার ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে।

কেননা আমাদের বর্ণিত হাদীসের কারণে ইচ্ছাধিকারের সম্পর্ক হলো দেখার সাথে। সুতরাং দেখার আগে ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে না।

আর চুক্তি রহিত করার অধিকার আলোচ্য হাদীসের প্রেক্ষিত হিসাবে নয়, বরং এই হিসাবে যে, এটা অবশ্য সাব্যস্ত চুক্তি নয়।

তাছাড়া কোন বস্তুর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে ঐ বস্তু সম্পর্কে সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং দেখার আগে 'সম্মত আছি' বলা গ্রহণযোগ্য নয়, 'ফেরত দিলাম' কথাটি এর বিপরীত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি না দেখা কোন জিনিস বিক্রি করে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে না।

---

১. যেমন ইশারা দ্বারা নির্ধারণ করে এবং চোখে দেখে কোন কাপড় খরিদ করল; কিন্তু তা কত গজ সেই সংখ্যা অজ্ঞাত থাকল। এমতাবস্থায় মূল সত্তা জ্ঞাত হওয়ার কারণে বিক্রয় বৈধ হবে। যদিও এখানে গুণ সম্পর্কিত অজ্ঞতা রয়েছে। কেননা তা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় না।

প্রথম দিকে ইমাম আবু হানীফা (র) দোষজনিত ইচ্ছাধিকার এবং শর্ত ভিত্তিক ইচ্ছাধিকারের ওপর কিয়াস করে বলতেন যে, এক্ষেত্রেও তার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

এটি এ কারণে যে, (বিক্রেতার ক্ষেত্রে মালিকানার) বিলুপ্তি এবং (ক্রেতার ক্ষেত্রে মালিকানা) সাব্যস্ত সম্পর্কে পূর্ণ সম্মতি ছাড়া চুক্তি অবশ্য সাব্যস্ত হয় না।

আর বিক্রীত পণ্যের গুণাবলী সম্পর্কে অবগতি ছাড়া পূর্ণ সম্মতি সাব্যস্ত হয় না। আর গুণাবলীর অবগতি হয় দেখা দ্বারা। সুতরাং দেখার আরো মালিকানায় বিলুপ্তি সম্পর্কে বিক্রেতা সম্মত নয়।

'প্রত্যাবর্তিত' মতের কারণ এই যে, আমাদের বর্ণিত হাদীসের আলোকে এ ইচ্ছাধিকারের সম্পর্ক হলো ক্রয়ের সাথে। সুতরাং ক্রয় ছাড়া তা সাব্যস্ত হবে না।

আর বর্ণিত আছে যে, হযরত উছমান বিন আফফান (রা) বসরায় অবস্থিত একখন্ড জমি হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রা)-এর নিকট বিক্রি করেছিলেন। পরে তালহাকে বলা হলো যে, তোমাকে ঠকানো হয়েছে। তখন তিনি বললেন, আমার ইচ্ছাধিকার রয়েছে; কেননা আমি না দেখা জিনিস খরিদ করেছি। আবার উছমান (রা) কে বলা হলো যে, তোমাকে ঠকানো হয়েছে। তখন তিনি বললেন, আমার ইচ্ছাধিকার রয়েছে। কেননা আমি না দেখা জিনিস বিক্রি করেছি। পরে তারা জোবায়র ইবনে মুতইম (রা)-কে তাদের মাঝে ফায়সালাকারী নিযুক্ত করলেন এবং তিনি হযরত তালহা (রা)-এর অনুকূলে ইচ্ছাধিকারের ফায়াসালা করলেন। আর এ ফায়সালা ছাহাবা কেরামের উপস্থিতিতে হয়েছিলো।

আর দেখার ইখতিয়ার নির্ধারিত সময় দ্বারা আবদ্ধ নয়; বরং বাতিলকারী কারণের উপস্থিতি পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

আর যে বিষয় 'খিয়ারে শর্ত'কে বাতিল করে, যেমন দোষযুক্ত হওয়া কিংবা কোন হস্তক্ষেপ করা, সে বিষয়ে দেখার ইচ্ছাধিকারকেও বাতিল করে দেয়।

আর যে হস্তক্ষেপ প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, যেমন গোলামকে আযাদ করে দেয়া বা মোদাব্বার বানানো, তদ্রূপ যে হস্তক্ষেপ অন্যের হক অবশ্য সাব্যস্ত করে, যেমন নিঃশর্ত বিক্রি বা বন্ধক রাখা কিংবা ইজারা দেয়া-এসকল হস্তক্ষেপ দেখার পূর্বে হোক বা পরে তা দেখার ইচ্ছাধিকার বাতিল করে দেয়।

কেননা হস্তক্ষেপটি যখন অবশ্য সাব্যস্ত হলো তখন চুক্তি রহিত করা অসাধ্য হয়ে গেলো। তাই ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি এমন হস্তক্ষেপ হয় যা অন্যের হক অবশ্য সাব্যস্ত করে না। যেমন নিজের ইখতিয়ারের শর্তে বিক্রি করা, দরদাম নির্ধারণ করা এবং অর্পণ না করে হেবা করা; এ ধরনের হস্তক্ষেপ দেখার আগে হলে ইচ্ছাধিকার বাতিল করে না।

কেননা এটা তো স্পষ্ট সম্মতির চেয়ে বেশী নয়। আর যদি দেখার পরে হয় তাহলে তা ইচ্ছাধিকার বাতিল করবে। কেননা সম্মতির ইঙ্গিত বিদ্যমান হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি গমের স্তূপের বাইরের অংশ কিংবা ভাজ করা কাপড়ের বাইরের অংশ কিংবা দাসীর মুখমন্ডল কিংবা পশুর মুখমন্ডল ও পশ্চাদ্ভাগ অবলোকন করে তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে না।

এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, বিক্রীত পণ্যের সমগ্রটুকু অবলোকন করা শর্ত নয়। কেননা তা অসাধ্য। সুতরাং ঐ পরিমাণ অবলোকনকেই যথেষ্ট মনে করা হবে, যা দ্বারা উদ্দেশ্যের অবগতি অর্জিত হয়ে যায়।

বিক্রয় চুক্তিতে যদি বহু জিনিস অন্তর্ভুক্ত হয় আর তার একেকটির মধ্যে পার্থক্য না থাকে; যেমন, পরিমাপের বা ওজনের বস্তু, যার আলামত হলো যা নমুনা হিসাবে পেশ করা যায়, তা হলে তার একটিকে দেখাই যথেষ্ট মনে করা হবে। তবে অবশিষ্টগুলো যদি দেখা জিনিসটির চেয়ে নিকৃষ্ট হয় তাহলে তখন তার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

পক্ষান্তরে তার এককগুলোর মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে, যেন কাপড় বা পশু, তাহলে প্রতিটিকে দেখা আবশ্যক। আখরোট এবং ডিমও এই পর্যায়ভুক্ত, যেমন ইমাম কারখী (র) উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো গম ও যবের মত বিবেচ্য হওয়াই সমীচীন ছিলো। কেননা এগুলো পরস্পর কাছাকাছি।

এই মূলনীতি সাব্যস্ত হওয়ার পর আমরা বলবো, গমের স্তূপের বাইরের অংশ দেখাই যথেষ্ট। কেননা তা অবশিষ্টের গুণ সম্পর্কে অবগতি দান করে। কেননা এটা হলো পরিমাপিত দ্রব্য, যা নমুনারূপে পেশ করা যায়।

তদ্রূপ কাপড়ের বাইরের অংশ দেখা অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে অবগতি দান করে, তবে যদি ভাঁজের ভিতরে এমন অংশ থাকে, যা উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য। যেমন কারুকাজের স্থান।

আর মানুষের ক্ষেত্রে মুখমন্ডলই প্রধান উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে পশুর ক্ষেত্রে মুখমন্ডল ও পশ্চাদ্ভাগ হলো প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং উদ্দিষ্ট অংশ দেখাই বিবেচ্য হবে। অন্যান্য অংশ দেখা বিবেচ্য হবে না।

কেউ কেউ পশুর পা দেখারও শর্ত আরোপ করেছেন। প্রথমোক্ত মত ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

গোশতের বকরীর ক্ষেত্রে ধরে টিপে দেখাও আবশ্যক। কেননা মূল উদ্দেশ্য হলো গোশ্‌ত। আর তা এভাবেই জানা যায়। পক্ষান্তরে পালার বকরীর ক্ষেত্রে ওলান দেখা আবশ্যক।

আর স্বাদ বিশিষ্ট জিনিস চোখে দেখা আবশ্যক। কেননা এটাই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগতি দান করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি বাড়ির প্রাঙ্গণ দেখে থাকে তাহলে ঘরগুলো (এবং কক্ষগুলো) না দেখলেও তার ইচ্ছাধিকার থাকবে না।

অনুরূপ হুকুম যদি বাড়ির বাইরের অংশ দেখে থাকে কিংবা বাইরে থেকে বাগানের গাছগুলো দেখে থাকে।

ইমাম যুফার বলেন, ঘরগুলোর ভিতরে প্রবেশ করে দেখাও আবশ্যক। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, ইমাম কুদূরী (র) এর সিদ্ধান্ত ঘর-বাড়ীর ক্ষেত্রে তৎকালীন লোকের প্রচলিত অভ্যাসের ভিত্তিতে। কারণ সে সময় তাদের বাড়ীগুলো ভিতরে ও বাইরে পার্থক্যপূর্ণ হতো না। কিন্তু বর্তমানে পার্থক্যপূর্ণ হওয়ার কারণে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করাও আবশ্যক। কেননা বাইরের অবলোকন ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে অবগতি দান করে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ওয়াকীলের অবলোকন ক্রেতার অবলোকনের মত। তাই দোষজনিত কারণ ছাড়া ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। তবে বার্তাবাহকের অবলোকন ক্রেতার অবলোকনের ন্যায় হবে না।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। সাহেবায়ন বলেন, তারা উভয়ে সমপর্যায়ের। আর (উভয় ক্ষেত্রেই) ক্রেতার ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এখানে ওয়াকীল অর্থ কব্জা হাসিলের ওয়াকীল। পক্ষান্তরে ক্রয় সংক্রান্ত ওয়াকীল হলে সকলের মতেই তার অবলোকন ক্রেতার ইচ্ছাধিকার রহিত করবে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, সে তো কবজা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, ইচ্ছাধিকার রহিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়নি। সুতরাং যে বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়নি, সে তা সম্পন্ন করার অধিকারী হবে না। এটা দোষজনিত ইচ্ছাধিকার, শর্তভিত্তিক ইচ্ছাধিকার এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ইচ্ছাধিকার রহিত করার মত হলো।[১]

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, 'কবজা' দুই প্রকার। পূর্ণভাবে কবজা আর তা হলো দেখেশুনে কবজা করা এবং অপূর্ণ কবজা আর তা হলো গুপ্ত অবস্থায় কবজা করা। কবজা দুই প্রকার হওয়ার কারণ এই যে, কবজা পূর্ণ হয় চুক্তির পূর্ণতা দ্বারা, আর অবলোকনকালীন ইচ্ছাধিকারের বিদ্যমানতায় চুক্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না।

আর দায়িত্ব প্রদানকারী মোয়াক্কেল উভয় প্রকার কবজার অধিকারী। সুতরাং ওয়াকীলও উভয় প্রকার কবজার অধিকারী হবে।

আর মোয়াক্কেল যখন অবলোকনপূর্বক কবজা করে তখন ইচ্ছাধিকার রহিত হয়ে যায়।

---

১. যেমন কেউ কোন জিনিস খরিদ করল, এরপর কাউকে তার দখল গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করল। আর সে দেখে-শুনে দোষযুক্ত অবস্থায় উক্ত পণ্য গ্রহণ করল। এতে ক্রেতার দোষজনিত ইচ্ছাধিকার রহিত হয় না।

তদ্রূপ কেউ ইচ্ছাধিকারের শর্তে খরিদ করল এবং কাউকে তার দখল গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করল, আর সে অবলোকনপূর্বক তা গ্রহণ করল। এমতাবস্থায় ক্রেতার ইচ্ছাধিকার রহিত হবে না।

তদ্রূপ দখল গ্রহণের ওয়াকীল যদি আবৃত ও ঢাকা অবস্থায় কোন কিছুর দখল গ্রহণ করে অতঃপর ক্রেতার অবলোকনকালীন ইচ্ছাধিকার রহিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত পণ্য অবলোকন করে তাহলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার রহিত হবে না।

সুতরাং ওয়াকীলের ক্ষেত্রেও তাই হবে। কেননা ওয়াকীল বানানো নিঃশর্ত ছিলো।

পক্ষান্তরে যখন সে গুপ্ত অবস্থায় কবজা করে তখন অপূর্ণ কবজা করার মাধ্যমে তার ওয়াকালাত সমাপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং এর পরে সে ইচ্ছাকৃতভাবে ইচ্ছাধিকার রহিত করার অধিকার রাখে না।

দোষজনিত ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা চুক্তির পূর্ণতাকে বাধাগ্রস্ত করে না। সুতরাং তার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও কবজা পূর্ণ হতে পারে।

আর শর্তভিত্তিক ইচ্ছাধিকারের বিষয়টিতে মত-বিরোধ রয়েছে। যদি (প্রতিপক্ষের বক্তব্য) স্বীকারও করে নেওয়া হয় তাহলে বক্তব্য এই যে, মোয়াক্কেল নিজেও তো পূর্ণ কবজা করার অধিকারী নয়। কেননা তার কবজা করার কারণে শর্তগত ইচ্ছাধিকার রহিত হয় না। কারণ ইচ্ছাধিকারের মূল উদ্দেশ্য তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো সম্ভব হবে কবজা করার পর। সুতরাং তার নিযুক্ত ওয়াকীলও পূর্ণ কবজা করার অধিকারী হবে না।

বার্তাবাহকের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সে পূর্ণ ও অপূর্ণ কোন প্রকার কবজার মালিক নয়। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব শুধু বার্তা পৌছে দেয়া। এ কারণেই বিক্রয় চুক্তির বার্তাবাহক হওয়ার ক্ষেত্রে সে কবজা করার এবং অর্পণ করার অধিকারী নয়।

ইমাম কুদূরী, (র) বলেন, অন্ধের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ এবং ক্রয় করার ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

কেননা সে না দেখা জিনিস খরিদ করেছে। আর ইতিপূর্বে বিষয়টি আমরা আলোচনা করে এসেছি।

অতঃপর তার ইচ্ছাধিকার রহিত হবে বিক্রীত পণ্য স্পর্শ করার কারণে; যদি স্পর্শ দ্বারা তার গুণ বোঝা যায় এবং ঘ্রাণ নেয়ার কারণে; যদি ঘ্রাণে তার গুণ বোঝা যায় এবং চেখে দেখার কারণে যদি চেখে দেখার মাধ্যমে তার গুণ বোঝা যায়।

যেমন চক্ষুষ্মানের ক্ষেত্রে।

আর জমির ক্ষেত্রে তার সামনে পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা ছাড়া তার ইচ্ছাধিকার রহিত হবে না।

কেননা গুণ বর্ণনা দেখার স্থলবর্তী হয়। যেমন 'বায় সালামের' ক্ষেত্রে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি সে এমন স্থানে দাঁড়ায় যেখান থেকে চক্ষুষ্মান হলে সে দেখতে পেতো আর যদি বলে যে, আমি সম্মত হলাম তাহলে ইচ্ছাধিকার রহিত হবে।

কেননা অপারগতার ক্ষেত্রে সদৃশ্যকে মূলের স্থলবর্তী বিবেচনা করা হয়। যেমন সালাতে বোবা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঠোঁট নাড়াকে কেরাতের স্থলবর্তী ধরা হয়। তদ্রূপ হচ্ছে কেশহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষুর চালনাকেই চুল মুড়ানোর স্থলবর্তী ধরা হয়।

আর ইমাম হাসান (র) বলেন, সে এমন একজন ওয়াকীল নিয়োগ করবে, যে তা দেখে কবজা করবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতামতের সাথে অধিক

সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ওয়াকীলের দেখা মোয়াক্কেলেরই দেখার মত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি দুই কাপড়ের একটি দেখে উভয়টি খরিদ করে এরপর অন্যটা দেখে, তাহলে উভয়টি ফেরত দেয়া তার জন্য বৈধ হবে।

কেননা কাপড়ে কাপড়ে পার্থক্য থাকার কারণে একটি কাপড় দেখলে অন্যটি দেখা হয় না। সুতরাং যেটা দেখেনি সেটার ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। এরপর শুধু সেটাকে ফেরত দিতে পারবে না; বরং দু'টোকেই ফেরত দিবে, যাতে পূর্ণতা লাভের পূর্বেই চুক্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি না হয়।

আর তা এ জন্য যে, দেখার ইচ্ছাধিকার থাকা অবস্থায় কবজা করার আগে ও পরে চুক্তি পূর্ণতা লাভ করবে না। একারণেই ক্রেতা আদালতের ফায়সালা এবং বিক্রেতার সম্মতি ব্যতিরেকেই ফেরত দেওয়ার অধিকার রাখে। আর গোড়া থেকেই তা চুক্তির বিলোপ বলে বিবেচিত হবে।

দেখার ইখতিয়ার থাকা অবস্থায় যে মারা যায় তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা, আমাদের মতে এ ব্যাপারে উত্তরাধিকার চলে না, খিয়ারে শর্ত এর প্রসংগে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

কেউ যদি কোন জিনিস দেখে থাকে এবং কিছুকাল পর তা খরিদ করে, তবে বস্তুটি যেমন দেখেছিল সেই অবস্থায় থাকে তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে না।

কেননা পূর্ববর্তী দেখার দ্বারাই বস্তুটির গুণাবলী সম্পর্কে তার অবগতি অর্জিত হয়েছে। অথচ তা না থাকলে ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে। অবশ্য ক্রেতা যদি সেটাকে পূর্বের দেখা জিনিস বলে চিনতে না পারে (তাহলে ইচ্ছাধিকার থাকবে)। কেননা এর প্রতি সম্মতি নেই।

আর যদি বস্তুটিকে পরিবর্তিত অবস্থায় পায় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

কেননা ঐ দেখা বস্তুটির গুণাবলী সম্পর্কে অবগতকারী সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং যেন সে দেখেনি। আর যদি উভয়ের মধ্যে পরিবর্তন সম্পর্কে মতবিরোধ হয় তাহলে বিক্রেতার কথাই গৃহীত হবে।

কেননা পরিবর্তন হলো নতুন বিষয়। আর (চুক্তি) অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণ স্পষ্ট। তবে পরবর্তী ফকীহগণ বলেছেন যে, সময়ের ব্যবধান বেশী হলে ভিন্ন কথা। কেননা সে ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থা ক্রেতার দাবীর সমর্থক।

পক্ষান্তরে দু'পক্ষের মধ্যে যদি দেখার বিষয়ে মতবিরোধ হয় (তাহলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য) কেননা দেখা (এবং সেই সূত্রে বস্তুর গুণ সম্পর্কে অবগত হওয়া) একটি নতুন বিষয়, আর ক্রেতা অস্বীকার করছে, সুতাং তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি না দেখা অবস্থায় এক গাঁট 'যুত্বী[১]' কাপড় খরিদ করে আর তা থেকে একটি কাপড় বিক্রি করে কিংবা হেবা করে এবং অপছন্দ করে তাহলে দোষের কারণ ছাড়া ঐ গাঁটের কোন কাপড় ফেরত দিতে পারবে না।

খিয়ারে শর্তের ব্যাপারেও একই হুকুম।

কেননা যা তার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছে তা ফেরত দেয়া অসাধ্য আর অবশিষ্টগুলো ফেরত দেয়ার অর্থ হলো পূর্ণতা লাভ করার পূর্বে চুক্তিকে খণ্ডিতকরণ। কেননা দেখার ইখতিয়ার এবং শর্তগত ইখতিয়ার উভয়টি চুক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তিকে বাধাগ্রস্ত করে; দোষজনিত ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা কবজার পর দোষজনিত ইচ্ছাধিকার বহাল থাকা সত্ত্বেও চুক্তিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যদিও কবজার পূর্বে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না, আর কবজাকৃত বস্তুর ক্ষেত্রেই মাসআলা ধার্য হয়েছে।

এরপর যদি উক্ত কাপড় তার কাছে এমন কোন কারণে ফেরত আসে, যা চুক্তি বিলোপ বলে গণ্য হয় তাহলে তার দেখার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। শামসুল আইম্মাহ সারাখসী এমনই উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, শর্তগত ইচ্ছাধিকারের ন্যায় এটাও একবার রহিত হওয়ার পর প্রত্যাবর্তিত হবে না। ইমাম কুদূরী (র) এ মতের ওপরই নির্ভর করেছেন।

পরিচ্ছেদ ঃ দোষের কারণে ইখতিয়ার

ক্রেতা যদি বিক্রীত পণ্যের কোন দোষ সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে পূর্ণতা গ্রহণ করবে, আর ইচ্ছা করলে তা ফেরত দেবে।

কেননা নিঃশর্ত চুক্তি নিখুঁত হওয়ার গুণ দাবী করে। সুতরাং তার অবিদ্যমানতায় সে ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। যাতে যে বিষয়ে সে সম্মত নয়, তা গ্রহণে বাধ্য হওয়ার মাধ্যমে সে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

আর ক্রেতার এ অধিকার নেই যে, সে বিক্রীত দ্রব্য রেখে দিবে এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে। কেননা সাধারণ চুক্তিতে গুণাবলীর বিপরীতে মূল্যের কোন অংশ সাব্যস্ত হয়না।

তাছাড়া এই কারণে যে, বিক্রেতা তো নির্ধারিত মূল্যের কমে আপন মালিকানা ত্যাগে সম্মত হয়নি। সুতরাং এ দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেও ফেরত দানের মাধ্যমে ক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করা সম্ভব।

মূল পাঠ (বা 'মতনে') উল্লেখকৃত দোষ দ্বারা ঐ দোষ উদ্দেশ্য, যা বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় ছিলো; কিন্তু বিক্রয়ের সময় এবং কব্জা করার সময় ক্রেতা তা দেখতে পায়নি। কেননা ঐ দুই সময়ের কোন এক সময় দোষ দেখতে পাওয়া তাতে সম্মত হওয়ার প্রমাণ।

---

১. একটি অঞ্চল জনগোষ্ঠীর নাম।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ব্যবসায়ীদের রীতি ও প্রচলনে যা কিছু মূল্যের ক্ষতি ঘটায় তা-ই দোষ বলে গণ্য হবে।

কেননা ক্ষতিগ্রস্ততা হয় মূল্যমান হ্রাস পাওয়ার কারণে। আর তা হয় মূল্য কমে যাওয়ার কারণে। আর মূল্য জানার মানদন্ড হলো ব্যবসায়ীদের রীতি ও প্রচলন।

প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত ছোটদের বেলায় পলায়ন, বিছানায় প্রস্রাব এবং চুরি করা দোষ বলে গণ্য হবে।

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর পিছনের এগুলো দোষ হবে না; যতক্ষণ না প্রাপ্ত বয়স্কতার পর পুনরায় তা করে।

অর্থাৎ শৈশবে বিক্রেতার কাছে থাকার সময় যদি এ দোষগুলো দেখা দেয়, অতঃপর শৈশবেই ক্রেতার কাছে যদি এর পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে ক্রেতা ফেরত দিতে পারে। কেননা এটা হুবহু সেই দোষই। আর যদি ক্রেতার নিকট প্রাপ্ত বয়স্কতার পরে তা দেখা দেয় তাহলে ফেরত দিতে পারবে না। কেননা এগুলো পূর্বের দোষ থেকে ভিন্ন।

এটা এজন্য যে, শৈশবে ও বয়স্ক অবস্থায় এই দোষগুলোর কারণ ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, শৈশবে বিছানায় প্রস্রাবের কারণ হলো মূত্রথলির দুর্বলতা, পক্ষান্তরে বয়স্ক অবস্থায় আভ্যন্তরীণ কোন রোগের কারণে হয়ে থাকে। তদ্রূপ শৈশবে পলায়নের কারণ হলো খেলাধূলার প্রতি আসক্তি এবং চুরির কারণ হলো দায়িত্ববোধের স্বল্পতা। পক্ষান্তরে বয়স্ক অবস্থায় এ দু'টোর কারণ হলো ভিতরের মন্দ স্বভাব।

এখানে ছোট দ্বারা ঐ বালক উদ্দেশ্য, যার বোধশক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে যার বোধশক্তি নেই, সে তো হারিয়ে যাওয়া বালক, পলাতক নয়। সুতরাং এটা দোষ বলে সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, শৈশবে পাগল হওয়া হলো চিরস্থায়ী দোষ।

অর্থাৎ শৈশবে বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় যদি মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয় এরপর ক্রেতার হাতে শৈশবে বা বয়স্ক অবস্থায় পুনরায় দেখা দেয় তাহলে সে ফেরত দিতে পারবে। কেননা যেহেতু উভয় অবস্থার কারণ অভিন্ন; সেহেতু এটা প্রথমটারই অভিন্ন রূপ। আর সেই কারণটি হচ্ছে বোধশক্তি বিনষ্ট হওয়া।

এর অর্থ এ নয় যে, ক্রেতার হাতে পুনরায় দেখা দেয়ার শর্ত নেই। কেননা মস্তিষ্ক বিকৃতির রোগ দূর হওয়া বিরল হলেও আল্লাহ তো তা দূর করতে সক্ষম। সুতরাং ফেরত দেয়ার জন্য তা পুনরায় দেখা দেয়া আবশ্যক।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দাসীর ক্ষেত্রে মুখের দুর্গন্ধ এবং বগলের দুর্গন্ধ দোষ বলে গণ্য।

কেননা দাসী ক্রয়ের উদ্দেশ্য শয্যা সংগিনী করাও হতে পারে। আর এ দু'টো দোষ তাতে বিঘ্ন ঘটাবে।

কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে তা দোষ নয়।

কেননা গোলাম খরিদ করার উদ্দেশ্য হলো কাজে নিয়োগ করা। আর এ দুটো দোষ তাতে বাধা সৃষ্টি করে না।

তবে কোন রোগবশতঃ হলে ভিন্ন কথা।

কেননা রোগ তো আলাদা দোষ।

আর যিনা এবং যিনার সন্তান হওয়া দাসীর বেলায় দোষ, দাসের বেলায় নয়।

কেননা এটা দাসীর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যে বিঘ্ন ঘটায়, আর উদ্দেশ্য হলো শয্যাসঙ্গিনী করা এবং সন্তান উৎপাদন করা।

পক্ষান্তরে দাসের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যে বিঘ্ন ঘটায় না; আর উদ্দেশ্য হলো খিদমত গ্রহণ করা। তবে ফকীহগণের মতে, যিনা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। কেননা মেয়েদের অনুসন্ধানে থাকা কাজে বিঘ্ন ঘটাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আর কাফির হওয়া উভয়ের ক্ষেত্রে দোষ।

কেননা মুসলিম রুচি কাফিরের সংগ-কে ঘৃণা করে থাকে।

তাছাড়া এ কারণে যে, কোন কোন কাফফারায় অমুসলিম গোলামকে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ফলে তার প্রতি তার আগ্রহ বিঘ্নিত হবে। আর যদি কাফের হওয়ার শর্তে গোলাম খরিদ করে আর পরে দেখে যে সে মুসলিম, তাহলে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কেননা এটা তো হলো দোষ মুক্ত হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তাকে ফেরত দিতে পারবে। কেননা কাফেরকে এমন সব ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়, যেখানে মুসলিমকে কাজে লাগানো হয়না। আর নির্ধারিত শর্ত পাওয়া না পাওয়া দোষের পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, প্রাপ্ত বয়স্কা দাসীর যদি হায়েয না হয় কিংবা দাসী যদি ইসতিহাযাগ্রস্ত হয়, তাহলে তা দোষ হবে।

কেননা রক্তস্রাব বন্ধ থাকা এবং রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা দু'টোই রোগের লক্ষণ। রক্তস্রাব বন্ধের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সর্বোচ্চ সময় সীমা বিবেচ্য হবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বালিকার ক্ষেত্রে তা হলো সতের বছর। আর (রক্তস্রাব বন্ধ থাকা বা অব্যাহত থাকার) বিষয়টি খরিদকৃত দাসীর বক্তব্য দ্বারাই বোঝা যাবে। সুতরাং দাসীর বক্তব্যের সাথে যদি বিক্রেতার কসম সম্পর্কে অস্বীকৃতি যুক্ত হয়[১] তখন দাসীকে ফেরত দেয়া হবে। কবজা করার পূর্বে হোক বা পরে, একই সিদ্ধান্ত হবে। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় যদি নতুন কোন দোষ দেখা দেয় আবার বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় কোন দোষ সম্পর্কে অবগত হয়

---

১. কেননা দাসীর বক্তব্য শুধু দাবী উত্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং প্রমাণ আবশ্যক, আর তা হলো প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য কিংবা প্রতিপক্ষের কসম করতে অস্বীকৃতি।

তাহলে সে দোষজনিত ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। বিক্রীত পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। কেননা ফেরত দেয়াতে বিক্রেতার ক্ষতি করা হয়।

কেননা পণ্যটি নতুন সৃষ্ট দোষ থেকে মুক্ত অবস্থায় তার মালিকানা থেকে বের হয়েছে; অথচ এখন দোষযুক্ত অবস্থায় ফেরত আসবে। তাই এটা নিষিদ্ধ হবে। কিন্তু ক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করাও আবশ্যক। সুতাং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা নির্ধারিত হয়ে গেলো।

অবশ্য বিক্রেতা যদি নতুন দোষসহ গ্রহণ করতে রাজী হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

কেননা সে ক্ষতিগ্রস্ততা মেনে নিতে সম্মত রয়েছে,

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কাপড় খরিদ করে কেটে ফেলে এরপর তাতে কোন দোষ দেখতে পায় তাহলে সে দোষজনিত ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে।

কেননা কর্তন যেহেতু একটি নতুন দোষ, সেহেতু কর্তনের কারণে ফেরত দেয়া নিষিদ্ধ হবে।

তবে বিক্রেতা যদি বলে যে, **কর্তিত অবস্থায়ই** আমি তা (ফেরত) **গ্রহণ করবো,** তাহলে তার সে অধিকার রয়েছে।

কেননা তার হক রক্ষার জন্য ফেরত দানের নিষিদ্ধতা ছিলো, অথচ সে তার হক পরিত্যাগে সম্মত রয়েছে।

আর ক্রেতা যদি (কর্তিত কাপড়ের দোষ জানার পর) তা বিক্রি করে ফেলে তাহলে কোন ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা বিক্রেতার সম্মতি সাপেক্ষ ফেরত দেয়া নিষিদ্ধ ছিল না। সুতরাং বিক্রয়ের মাধ্যমে সে-ই বরং বিক্রীত পণ্য আবদ্ধকারী হলো, সুতরাং সে কোন ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

আর যদি কাপড় কর্তনের পর সেলাই করে কিংবা লাল রং দ্বারা রঞ্জিত করে কিংবা ছাতুতে ঘী মেখে ফেলে এরপর কোন দোষ দেখতে পায় তাহলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে।

কেননা অতিরিক্ত জিনিস যোগ করার কারণে ফেরত দেয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে গেছে।

আর যুক্ত জিনিসটি যেহেতু পৃথক করা সম্ভব নয় সেহেতু সেটিকে বাদ দিয়ে মূল বস্ত্র ও ছাতুতে চুক্তি রহিতকরণ সম্ভব নয়। তদ্রূপ যুক্ত বস্তুসহ রহিত করাও সম্ভব নয়। কেননা যুক্ত বস্তু বিক্রীত পণ্য নয়। সুতরাং মূল থেকেই তা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

আর বিক্রেতার অধিকার নেই (যুক্ত বস্তুসহ) বিক্রীত পণ্য ফেরত নেয়ার।

কেননা এই নিষিদ্ধতা (সুদজনিত কারণে) শরীয়তের অধিকারের প্রেক্ষিতে, তার অধিকারের প্রেক্ষিতে নয়। আর ক্রেতা যদি দোষ দেখার পর (ঐ কর্তিত ও সেলাইকৃত বা রঞ্জিত বস্ত্র এবং ঘী মাখা ছাতু) বিক্রি করে তাহলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে। কেননা বিক্রয়ের পূর্বেই মূল্য থেকেই ফেরত প্রদান নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং বিক্রয়ের মাধ্যমে বিক্রীত পণ্যকে সে আবদ্ধকারী হয়নি। এ প্রেক্ষিতেই আমরা বলি যে, যদি কেউ কাপড় খরিদ করে তার ছোট বাচ্চার জন্য পোশাকের মাপে কাটে এবং

সেলাই করে ফেলে, এরপর কোন দোষ দেখতে পায় তাহলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। পক্ষান্তরে সন্তান বড় হলে ফেরত নিতে পারবে। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে সেলাইয়ের পূর্বেই মালিকানা প্রদান করা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেলাইয়ের পর সন্তানের হাতে অর্পণের মাধ্যমে মালিকানা প্রদান করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন গোলাম খরিদ করার পর আযাদ করে দেয় কিংবা তার কাছে মারা যায়; এরপর কোন দোষ সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে কারণ এই যে, মৃত্যুর মাধ্যমে মালিকানার পরিসমাপ্তি ঘটে। আর বাধা এসেছে শরীয়তের বিধানগত কারণে, তার নিজস্ব কোন 'কর্মের' কারণে নয়।

আর আযাদ করার ক্ষেত্রে কেয়াসের দাবী ছিল ক্ষতিপূরণ ফেরত না পাওয়া। কেননা এখানে বাধা সৃষ্টি হয়েছে তার নিজস্ব কর্মের কারণে। সুতরাং এটা গোলামকে হত্যা করার অনুরূপ হলো।

সূক্ষ্ম কেয়াস মতে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। কেননা আযাদ করা অর্থ হলো মালিকানাকে সমাপ্ত করা। কেননা মূলতঃ মানুষকে মালিকানা আরোপের পাত্র রূপে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং আযাদ করার সময়কাল পর্যন্ত তাতে মালিকানা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আযাদ করার অর্থ হলো মালিকানার পরিসমাপ্তি। সুতরাং তা মৃত্যুর মত হলো এটা এজন্য যে, কোন জিনিস সমাপ্তিতে উপনীত হওয়ার মাধ্যমে স্থিতি লাভ করে। সুতরাং ধরে নেয়া হবে যে, মালিকানা বাকি রয়েছে, কিন্তু ফেরত দেয়া অসাধ্য হয়ে পড়েছে।

মোদাব্বার করা এবং উম্মে ওয়ালাদ বানানো আযাদ করার সম পর্যায়ের। কেননা মালিকানা আরোপের পাত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মালিকানা হস্তান্তরের নিষিদ্ধতা শরীয়তের বিধানগত কারণে, (তার নিজস্ব কর্মের কারণে নয়)।

আর যদি অর্থের বিনিময়ে তাকে আযাদ করে তাহলে কোন ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কেননা সে গোলামের বিনিময় আবদ্ধ রেখেছে; আর বিনিময় আবদ্ধ রাখা মূলবস্তু আবদ্ধ রাখারই মত।

ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। কেননা বিনিময় গ্রহণের মাধ্যম হলেও এটাও মালিকানাকে সমাপ্ত করার অন্তর্ভুক্ত।

আর ক্রেতা যদি গোলামকে হত্যা করে কিংবা খাদ্যদ্রব্য হলে তা যদি খেয়ে ফেলে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে কোন ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না।

হত্যার ক্ষেত্রে উল্লেখিত সিদ্ধান্তটি হলো যাহিরে রিওয়ায়েতের বর্ণনা।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা মতে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। কেননা মনিব কর্তৃক গোলামকে হত্যা করার সাথে (কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি) জাগতিক কোন হুকুম সম্পৃক্ত হয় না। তাই (এদিক থেকে) এটা স্বাভাবিক মৃত্যুর মত হলো। সুতরাং হত্যা করার অর্থ হলো মালিকানাকে সমাপ্ত করা।

যাহিরে রিওয়ায়েতের কারণ এই যে, কোন হত্যা দায়মুক্ত হতে পারে না। এখানে অবশ্য মালিকানার দিক বিবেচনার দায় রহিত হয়েছে, সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হলো যে মালিকানার পরিবর্তে বিনিময় লাভ করেছে।

আযাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা কোন অবস্থায়ই দায়বদ্ধতা সাব্যস্ত করে না। যেমন অসচ্ছল ব্যক্তি শরীকানায় গোলাম আযাদ করলে (তখন গোলামকেই উপার্জনের মাধ্যমের অপর মালিকের দায় পরিশোধ করতে হয়।)

খাদ্যদ্রব্য খেয়ে ফেলার বিষয়টিও মতবিরোধপূর্ণ। ছাহেবায়নের মতে ক্ষতিপূরণ পাবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সুক্ষ্ম কিয়াসের আলোকে ক্ষতিপূরণ নিতে পারে না।

একই মতপার্থক্য হবে যদি কাপড় পরিধান করে ছিড়ে ফেলে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, বিক্রীত দ্রব্যের সাথে ঐ আচরণেই করেছে. যা ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছিলো এবং যে আচরণ করার রেওয়াজ রয়েছে। সুতরাং এটা আযাদ করার সদৃশ হলো।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, বিক্রীত দ্রব্যটি ফেরত দেয়া অসাধ্য হয়েছে বিক্রীত দ্রব্যের মাঝে দায়বদ্ধ কর্মের কারণে।

সুতরাং এটা বিক্রয় ও হত্যার সদৃশ হলো। আর কৃত কর্মটি উদ্দেশ্যভুক্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য নয়। দেখুন না, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেও তো ক্রয় করা হয়। অথচ তা ক্ষতিপূরণ নেওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

যদি কিছু অংশ আহার করার পর দোষ সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে একই হুকুম।

কেননা সবটুকু খাবার অভিন্ন বস্তুর মত। সুতরাং এটা কিছু অংশ বিক্রয় করার মত হলো।

ছাহেবায়ন (র) থেকে একটি বর্ণনা মতে সমগ্র দ্রব্যের দোষজনিত ক্ষতিপূরণ নেবে।

ছাহেবায়ন থেকে আরেক বর্ণনা মতে অবশিষ্টটুকু ফেরত দেবে (এবং ভক্ষিত অংশের ক্ষতিপূরণ নেবে) কেননা খন্ডিতকরণ দ্বারা বস্তুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি ডিম, তরমুজ, শসা, ক্ষিরা বা আখরোট খরিদ করার পর ভেংগে দেখতে পেল যে তা নষ্ট। এখন যদি তা উপকৃত হওয়ার যোগ্য না থাকে তাহলে সমগ্র মূল্য ফেরত পাবে।

কেননা এটা মালই নয়। সুতরাং বিক্রয় চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

একমতে আখরোটের খোসার উপযোগিতা বিবেচ্য হবে না। কেননা ভিতরের শাঁসের উপরই সেটা মাল হওয়া নির্ভর করে।

আর যদি নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয় তাহলে ফেরত দিতে পারবে না।

কেননা ভেংগে ফেলাটা এর উদ্ভূত দোষ।

তবে দোষজনিত ক্ষতিপূরণ সে পাবে।

যাতে যথাসম্ভব (উভয় পক্ষের) ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করা যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সে তা ফেরত দিবে। কেননা ভেংগে ফেলা বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের কারণে হয়েছে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, ভাংগার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ক্রেতার মালিকানায়, বিক্রেতার মালিকানায় নয়। সুতরাং এটা বস্ত্রের মতই হলো, যা কেটে ফেলেছে। আর যদি কিছু নষ্ট হয় এবং তা সামান্য হয় তাহলে সুক্ষ্ম কিয়াস মতে বিক্রয় বৈধ হবে। কেননা, পণ্য সামান্য পরিমাণ নষ্ট থেকে মুক্ত থাকেনা। আর আখরোট তো সাধারণত সামান্য নষ্ট থেকে মুক্ত থাকেই না : যেমন একশতে একটি দু'টি।

আর যদি নষ্টের পরিমাণ বেশী হয়, তাহলে (সমগ্র পণ্যের ক্ষেত্রেই) বিক্রয় বৈধ হয় না। বরং সমগ্র মূল্য ফেরত পাবে। কেননা বিক্রেতা এখানে মাল এবং যা মাল নয় তা একত্র করেছে, সুতরাং এটা স্বাধীন মানুষ ও দাস একত্র করার মত হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন গোলাম বিক্রি করে, এরপর ক্রেতা আবার তা বিক্রি করে, এরপর দোষজনিত কারণে তার কাছে তা ফেরত আসে এখন যদি সে এই ফেরত গ্রহণ করে থাকে আদালতের ফয়সালার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি, কিংবা সাক্ষ্য প্রমাণ কিংবা কসমে অস্বীকৃতির ভিত্তিতে, তাহলে তার (অর্থাৎ প্রথম ক্রেতার) অধিকার থাকবে বিক্রেতার কাছে তা ফেরত প্রদানের।

কেননা এটা হলো মূল থেকে বিক্রয় চুক্তির বিলোপ। সুতরাং ধরে নেয়া হবে যেন দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটি অস্তিত্বই লাভ করেনি। বেশীর চেয়ে বেশী এই যে, দোষ বিদ্যমান থাকার বিষয়টি সে অস্বীকার করেছে। কিন্তু আদালতের ফায়সালার মাধ্যমে শরীয়ত কর্তৃক সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছে।

আর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালার অর্থ এই যে, সে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছে অতঃপর সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়েছে।

এটা বিক্রয় ওয়াকীলের মাসআলা থেকে ভিন্ন। যখন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কোন দোষের কারণে বিক্রীত পণ্য বিক্রয় ওয়াকীলের কাছে ফেরত প্রদান করা হয়। তখন এই ফেরত প্রদানকে মোয়াক্কেলের কাছে ফেরত প্রদান বলে গণ্য করা হয়। কেননা সেখানে বিক্রয় চুক্তি একটি, পক্ষান্তরে এখানে বিক্রয় চুক্তি দু'টি। সুতরাং দ্বিতীয়টি বিলুপ্ত হওয়ার কারণে প্রথমটি বিলুপ্তি হবে না।

আর যদি (প্রথম ক্রেতা) কাযীর ফায়সালা ছাড়াই ফেরত গ্রহণ করে নেয় তাহলে (প্রথম বিক্রেতার কাছে) তার ফেরত প্রদানের অধিকার থাকবে না।

কেননা তাদের দুজনের ক্ষেত্রে এই ফেরত প্রদানের অর্থ যদিও বিক্রয় যুক্তি বিলোপ, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা হলো নতুন বিক্রয় চুক্তি। আর এক্ষেত্রে তাদের দু'জনের জন্য প্রথম বিক্রেতা হচ্ছে তৃতীয় ব্যক্তি।

'জামে সাগীর' কিতাবে বলা হয়েছে; যদি প্রথম ক্রেতার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আদালতের ফায়সালা ছাড়াই এমন কোন দোষের কারণে তার কাছে দ্রব্যটি ফেরত প্রদান করা হয়, যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। (যেমন অতিরিক্ত আংগুল থাকা) তাহলে তার কাছে যে বিক্রি করেছে তার বিরুদ্ধে সে দাবী উত্থাপন করতে পারবে না।

এই মাসআলা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারেনা এবং যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে, উভয় ক্ষেত্রের হুকুম অভিন্ন হবে।[১]

বিক্রয় পর্বের কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না, সে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পাবে। কেননা এটা নিশ্চিত যে, প্রথম বিক্রেতার নিকট এ দোষ বিদ্যমান ছিলো।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন গোলাম খরিদ করার পর কবজা করে নেয়। এরপর কোন দোষের দাবী করে তাহলে তাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা যাবে না, যতক্ষণ না বিক্রেতার (দোষ না থাকা সম্পর্কে) কসম করবে কিংবা ক্রেতা দোষ থাকার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করবে।

কেননা যেহেতু সে দোষ দাবী করার মাধ্যমে (বিক্রীত পণ্যে) তার হক নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। সেহেতু (এই সূত্রে) সে (নিজের উপর) মূল্য পরিশোধ ওয়াজিব হওয়া অস্বীকার করেছে। আর প্রথমে মূল্য পরিশোধের আবশ্যকতা এজন্য যে, বিক্রীত পণ্য নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার বিনিময়ে (মূল্যের ক্ষেত্রে) বিক্রেতার হক যেন নির্ধারিত হয়ে যায়।

তাছাড়া কাযী যদি মূল্য পরিশোধের ফায়সালা করে দেন তাহলে হতে পারে যে, দোষ প্রকাশ পেলো আর আদালতের ফায়সালা ক্ষুণ্ন হয়ে গেলো। সুতরাং নিজের ফায়সালা রক্ষার উদ্দেশ্যে এখনই তিনি মূল্য পরিশোধের ফায়সালা করবেন না।

আর ক্রেতা যদি বলে যে, আমার সাক্ষীরা শাম দেশে (অর্থাৎ সফরের দূরত্বে) রয়েছে, তাহলে বিক্রেতাকে কসম করানো হবে। এবং যদি কসম করে তাহলে তাকে মূল্য প্রদান করা হবে।

সাক্ষীদের উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষা করা হবে না। কেননা অপেক্ষা করার মধ্যে বিক্রেতার ক্ষতি। অথচ মূল্য পরিশোধ করায় ক্রেতার বিরাট কোন ক্ষতি নেই। কেননা সে তো নিজের প্রমাণে বলীয়ান রয়েছে।

আর যদি বিক্রেতা কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে দোষ সাব্যস্ত করা হবে। কেননা অস্বীকৃতি এক্ষেত্রে প্রমাণ।

---

১. কেননা যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না, সে সম্পর্কে তো এটা নিশ্চিত যে, প্রথম বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায়ই সেটা বিদ্যমান ছিলো, অথচ তা সত্ত্বেও প্রথম বিক্রেতার কাছে ফেরত দেয়া যাবেনা। তাহলে যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে সে দোষ তো প্রথম ক্রেতার কাছে এসে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে তো প্রথম বিক্রেতার কাছে ফেরত প্রদান নিষিদ্ধ হওয়া আরো স্বাভাবিক।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন গোলাম খরিদ করে, অতঃপর পলায়নের দোষ দাবী করে তাহলে বিক্রেতাকে কসম করানো হবে না, যতক্ষণ না ক্রেতা এই মর্মে সাক্ষী পেশ করে যে, গোলাম তার কাছে এসে পলায়ন করেছে।

কসম করানোর অর্থ হলো এই মর্মে কসম যে, বিক্রেতার কাছে গোলাম পলায়ন করেনি। কেননা (অস্বীকারকারী হওয়ার সুবাদে) যদিও তার কথাই গ্রহণযোগ্য; কিন্তু ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় গোলামের মাঝে দোষ পুনরায় প্রকাশ পাওয়ার পরই তার অস্বীকৃতি বিবেচনায় আসবে। আর (ক্রেতার কাছে দোষ দেখা দিয়েছে কিনা) তা প্রমাণের ওপর নির্ভর করে।

যদি ক্রেতা সাক্ষী পেশ করে তাহলে বিক্রেতাকে এই মর্মে আল্লাহর নামে কসম করানো হবে যে, গোলামটি সে তার কাছে বিক্রি করেছে এবং তার হাতে অর্পণ করেছে এমন অবস্থায় যে, তার কাছ থেকে গোলাম কখনো পলায়ন করেনি। মাবসূত কিতাবে এমনই বলা হয়েছে।

আর যদি কাযী ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে এই মর্মে কসম করাতে পারেন যে, (বলো) আল্লাহ্র কসম যেই সূত্রে সে দাবী করেছে সেই সূত্রে তোমার কাছে ফেরত দেয়ার অধিকার তার নেই। কিংবা আল্লাহর কসম তোমার কাছে সে কখনো পলায়ন করেনি।

এই মর্মে কাযী তাকে কসম করাবে না যে, আল্লাহর কসম, বিক্রি করার সময় তাতে এই দোষ ছিলো না। কিংবা আল্লাহর কসম বিক্রির সময় এবং অর্পণ করার সময় তাতে এই দোষ ছিলো না।

কেননা এ ধরনের কসমী বাক্যে ক্রেতার কল্যাণ উপেক্ষিত হয়। কারণ বিক্রির পর অর্পণের পূর্বেও এ দোষ দেখা দিতে পারে এবং তা ফেরত প্রদানের অধিকার অবশ্য সাব্যস্ত করে। অথচ প্রথম বক্তব্যে তা উপেক্ষিত হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বক্তব্য এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, দোষ না থাকার বিষয়টি (যুগপৎ) উভয় শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে বিক্রয়কালের পরিবর্তে অর্পণকালে দোষ থাকা অবস্থায় কসম করতে গিয়ে বিক্রেতা এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারে।

আর যদি ক্রেতা তার কাছে থাকা অবস্থায় দোষ দেখা দেয়ার অনুকূলে সাক্ষী পেশ করতে না পারে আর বিক্রেতাকে এই মর্মে কসম করাতে চায় যে, আল্লাহর কসম, ক্রেতার কাছে সে পলায়ন করেছে বলে আমার জানা নেই, তাহলে ছাহেবায়নের মতে তাকে কসম করানো হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতের ব্যাপার তাকে কসম করানো হবে কিনা, এ বিষয়ে মাশায়েখগণ মতবিরোধ করেছেন।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, ক্রেতার দাবীটি গ্রহণযোগ্য। একারণেই উক্ত দাবীর ওপর বাইয়েনা বা সাক্ষী উপস্থাপিত করার দায়িত্ব বর্তায়। সুতরাং হলফ করানোর বিষয়টিও বর্তাবে।

আর কারো কারো মত অনুসারে ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, বিশুদ্ধ দাবীর ওপর হলফের দায়িত্ব বর্তায় এবং বাদীর অস্তিত্ব ছাড়া দাবী বিশুদ্ধ হয় না। আর দোষ সাব্যস্ত হওয়া ব্যতীত ক্রেতা বাদীরূপে গণ্য হবে না।

আর বিক্রেতা যদি এই মর্মে হলফ করতে অস্বীকার করে তাহলে ছাহেবায়নের মতে ফেরত প্রদানের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে আমাদের পূর্ব বর্ণিত শব্দে ও বাক্যে কসম করানো হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি প্রাপ্ত বয়স্ক গোলামের পলায়নের দাবী উত্থাপিত হয় তাহলে বিক্রেতাকে এই মর্মে কসম করানো হবে যে, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সময় থেকে সে পলায়ন করেনি, কেননা-শৈশবকালের পলায়ন প্রাপ্ত বয়স্কতার পর ফেরত দেওয়া অনিবার্য করে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি দাসী ক্রয় করে এবং উভয় পক্ষ (বিক্রীত দ্রব্য ও মূল্যের) কবজা করে নেয়, এরপর ক্রেতা দাসীর মাঝে কোন দোষ দেখতে পেল। আর বিক্রেতা বলে যে, এটি এবং তার সাথে আরেকটি দাসী আমি তোমার কাছে বিক্রি করেছিলাম, আর ক্রেতা বলে যে, একমাত্র এই দাসীটিই তুমি আমার কাছে বিক্রি করেছো, এক্ষেত্রে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা বিরোধ হচ্ছে কবজাকৃত বস্তুর পরিমাণের ক্ষেত্রে। সুতরাং কবজাকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে, যেমন--গাছবের ব্যাপারে।

একই সিদ্ধান্ত হবে যদি বিক্রীত দ্রব্যের ক্ষেত্রে উভয়ে একমত হয়; কিন্তু কবজাকৃত দ্রব্যের পরিমাণ সম্পর্কে মতবিরোধ হয়। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি একই বিক্রয় চুক্তির অধীনে দুটি গোলাম খরিদ করে এবং দু'টির একটি কবজা করে এরপর অন্যটির মধ্যে দোষ দেখতে পায় তাহলে উভয়টিকে গ্রহণ করবে। কিংবা উভয়টিকে পরিত্যাগ করবে।

কেননা উভয়টির কবজার মাধ্যমেই বিক্রয় চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং (একটিকে ফেরত প্রদানের) অর্থ হবে পূর্ণতা লাভ করার পূর্বেই উভয়কে পৃথক করা হয়ে যাবে। আর বিষয়টি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

আর কবজা করার ক্ষেত্রে উভয়কে পৃথক করা (অর্থাৎ একটি গ্রহণ করা এবং অন্যটিকে ফেরত প্রদান করা) এজন্য বৈধ নয় যে, বিক্রয় চুক্তির সাথে কবজা করার সাদৃশ্য রয়েছে।[১] সুতরাং কবজার ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ চুক্তির ক্ষেত্রে পৃথকীকরণের মতই হবে।

পক্ষান্তরে যে গোলামটি কবজা করেছে তাতে যদি দোষ দেখতে পায় তাহলে সে বিষয়ে ফকীহগণের মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, শুধু ঐ গোলামটিকেই ফেরত দেবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মত এই যে, হয় দু'টোকে গ্রহণ করবে, নয়ত দু'টোকেই ফেরত দেবে। কেননা বিক্রীত বস্তু কবজা করার সাথে

১. এই হিসাবে যে, দখল দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মালিকানা এবং হস্তক্ষেপের মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আর চুক্তি দ্বারা সত্তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়. আর সত্তার মালিকানার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের মালিকানা অর্জন।

চুক্তির পূর্ণতা সম্পৃক্ত হয়েছে, আর বিক্রীত বস্তু হল চুক্তিভুক্ত সমগ্র দ্রব্য। সুতরাং চুক্তির পূর্ণতার বিষয়টি (মূল্য উশুল করার জন্য) বিক্রীত বস্তু[১] আটকে রাখার অনুরূপ হলো। বিক্রীত বস্তু আটকে রাখার অধিকার বিলুপ্ত হওয়ার সম্পর্ক যেহেতু মূল্য উশুল করার সংগে সম্পৃক্ত, সেহেতু পূর্ণ মূল্য উশুল করা ছাড়া আটক রাখার অধিকার বিলুপ্ত হয় না।

যদি উভয় দাসের কবজার পর তাদের একটিতে দোষ দেখতে পায় তাহলে শুধু সেটাকেই ফেরত দিতে পারবে।

ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এতে চুক্তিকে খণ্ডিতকরণ হয়। আর তা ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। কেননা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টকে মিলিয়ে বিক্রয় করাই প্রচলিত নিয়ম। সুতরাং তা কবজা করার পূর্বে দোষ পাওয়ার সদৃশ হলো এবং দেখার ইচ্ছাধিকার এবং শর্তগত ইচ্ছাধিকারের সদৃশ হলো।

আমাদের দলীল এই যে, এটা হলো চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করার পর চুক্তি খন্ডিতকরণ। কেননা দোষজনিত ইচ্ছাধিকারের ক্ষেত্রে কবজা করার মাধ্যমেই চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে। পক্ষান্তরে দেখার ইচ্ছাধিকার এবং শর্তগত ইচ্ছাধিকারের ক্ষেত্রে তাতে চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে না, যেমন পিছনে বর্ণিত হয়েছে।

একারণেই যদি (দখল গ্রহণের পর) দুই গোলামের একজনের দাবীদার প্রমাণিত হয় তাহলে ক্রেতা অপরটিকে ফেরত দিতে পারে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি পাত্র পরিমাপিত কিংবা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত কোন দ্রব্য খরিদ করে এবং তার অংশ বিশেষে দোষ দেখতে পায় তাহলে সমগ্র দ্রব্য ফেরত দেবে কিংবা সমগ্রটা রেখে দেবে।

অর্থাৎ কবজা করার পর যদি দোষ দেখতে পায়। কেননা পাত্র পরিমাপিত (এবং পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত) বস্তু যদি একই শ্রেণীভুক্ত হয় তাহলে সমগ্রটাই অভিন্ন বস্তুরূপে বিবেচিত হয়। তাই তো সবটুকুর উপর একই নাম আরোপিত হয়। যেমন এক 'কুর' এবং অনুরূপ শব্দ (ওয়াসাক কবজা, ছা'য় ইত্যাদি)

আর কেউ কেউ বলেছেন, এই বিধান হবে তখন, যখন তা এক পাত্রে থাকবে। পক্ষান্তরে দুই পাত্রে হলে দুই গোলামের সমপর্যায়ভুক্ত হবে। অর্থাৎ যে পাত্রের বস্তুতে দোষ পাওয়া গেছে, সেই পাত্রটা ফেরত দেবে, অন্যটা নয়।

আর যদি ঐ দব্যের অংশ বিশেষের কোন দাবীদার বের হয়, তাহলে অবশিষ্ট ফেরত দেয়ার ইচ্ছাধিকার থাকবেনা।

কেননা এক্ষেত্রে ভাগ করা দ্বারা ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। আর দাবীদার এক হওয়া দ্বারা চুক্তির সম্পূর্ণতা ব্যাহত হয় না। কেননা চুক্তির সম্পূর্ণতা চুক্তিকারীর সম্মতি দ্বারা সাব্যস্ত হয়, মালিকের সম্মতি দ্বারা নয়।

(দাবীদার সাব্যস্ত হওয়ার পর ইচ্ছাধিকার না থাকার) এই বিধান তখন হবে, যখন দখল কবজার পর দাবীদার বের হয়। পক্ষান্তরে কবজার পূর্বে হলে অবশিষ্ট তার ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। কেননা পূর্ণতা লাভের পূর্বেই চুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

---

১. مبيع অর্থ বিক্রীত দ্রব্য।

আর যদি বিক্রীত দ্রব্যটি বস্ত্র হয় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

কেননা বস্ত্রের ক্ষেত্রে খন্ডিতকরণ হচ্ছে দোষ। আর দাবীদার বের হওয়া দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, দোষটি বিক্রির সময়ই বিদ্যমান ছিলো। পাত্র পরিমাপিত এবং পাল্লা দ্বারা পরিসংখ্যাপিত বস্তুর বিষয়টি ভিন্ন। (অর্থাৎ এক্ষেত্রে খন্ডিতকরণ দোষ বলে গণ্য নয়)।

কেউ যদি দাসী ক্রয় করে আর তাতে কোন জখম দেখে এবং চিকিৎসা করে, কিংবা আরোহণের পশু ক্রয়ের পর যদি সে নিজের প্রয়োজনে তাতে আরোহণ করে তাহলে তা সম্মতি বলে বিবেচিত হবে।

কেননা তার এ কর্ম ক্রয়কৃত দ্রব্যটি রেখে দেওয়ার ইচ্ছার প্রমাণ। শর্তগত ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য। আর তা ব্যবহার করার মাধ্যমেই হবে। সুতরাং আরোহণ বা (চিকিৎসাকরণ) ইচ্ছাধিকার রহিতকারী হবে না।

আর যদি বিক্রেতার কাছে ফেরত দিতে কিংবা পানি পান করাতে কিংবা পশুর জন্য খাদ্য খরিদ করতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরোহণ করে তা হলে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে না।

ফেরত প্রদানের উদ্দেশ্যে আরোহণের ব্যাপারটি হলো এই জন্য যে, এ হল ফেরত প্রদানের মাধ্যম। পক্ষান্তরে পানি পান করানো এবং খাদ্য খরিদ করা প্রসংগে বিধানটি ঐ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, যখন আরোহণ ছাড়া কোন উপায় না থাকে, হয় পশুটি অবাধ্য হওয়ার কারণে কিংবা নিজের অক্ষমতার কারণে কিংবা খাদ্যের বোঝা একপার্শ্বে হওয়ার কারণে তখন (অন্যপার্শ্বে আরোহণ করা অনিবার্য হয়ে যায়)।

পক্ষান্তরে আমাদের উল্লেখকৃত কারণগুলো না থাকায় যদি আরোহণ করা ছাড়াও উপায় থাকে তাহলে আরোহণ সম্মতি বলে বিবেচিত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি না জেনে এমন গোলাম খরিদ করে যে চুরি করেছিল, আর ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় তার হাত কাটা যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে গোলাম ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত নিতে পারবে।

আর ছাহেবায়ন বলেন, চুরি দোষে দূষিত গোলাম আর চুরি দোষে দূষিত নয় এমন গোলামের মূল্যের মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ সে ফেরত নিতে পারবে।

যদি বিক্রেতার নিকট সংঘটিত কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও একই মতপার্থক্য হবে।

মূলকথা এই যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এটা হলো মালিকানার দাবীদার বের হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। আর ছাহেবায়নের মতে দোষ যুক্ত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় হস্তকর্তন বা প্রাণদন্ড সাব্যস্তকারী কারণ বিদ্যমান হয়েছে; আর তা গোলামের সম্পদগুণ ও অর্থমূল্যতার পরিপন্থী নয়। সুতরাং ঐ অবস্থায় গোলামের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পন্ন হবে। তবে ফেরত

দেওয়া অসম্ভব হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী দোষের ভিত্তিতে ক্ষতির পরিমাণ মূল্য ফেরত নেবে।

বিষয়টি এমন হলো যে, গর্ভবতী কোন দাসীকে খরিদ করলো আর ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় প্রসবজনিত কারণে মারা গেলো, তখন সে গর্ভবতী এবং গর্ভবতী নয় এমন দাসীর মধ্যবর্তী মূল্যটুকু ফেরত নিতে পারবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, কর্তন বা প্রাণদন্ড অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণটি বিক্রেতার কবজায় থাকতে বিদ্যমান হয়েছে, আর অবশ্য সাব্যস্ত হওয়া অস্তিত্ব লাভ করাকে অনিবার্য করে, সুতরাং (কর্তন ও প্রাণদন্ডের) অস্তিত্ব পূর্ববর্তী কারণের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

বিষয়টি এমন হলো যে, অপহরণকৃত গোলামকে ফেরত প্রদানের পর অপহরণকারীর কবজায় থাকা অবস্থায় কৃত অপরাধের কারণে কতল করা হলো কিংবা তার হাত কাটা হলো।

আর (ছাহেবায়ন কর্তৃক) উল্লেখকৃত মাসআলাটির সিদ্ধান্তেও আপত্তি রয়েছে। (অর্থাৎ সেখানেও মতভিন্নতা রয়েছে। সুরতং নজীর হিসাবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।)

আর যদি বিক্রীত গোলাম বিক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় চুরি করে, অতঃপর ক্রেতার কবজায় আসার পর চুরি করে এবং উভয় অপরাধের শাস্তিরূপে তার হস্তকর্তন করা হয় তাহলে ছাহেবায়নের মতে আমাদের উল্লেখকৃত নিয়মে ক্ষতির পরিমাণ অর্থ পাবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উদ্ভূত দোষের কারণে বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া গোলামকে ফেরত দিতে পারবে না। তবে চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত পাবে। আর যদি বিক্রেতা গোলামকে ফেরত গ্রহণ করে তাহলে তিন চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত দিবে।

কেননা হাত মানুষের অর্ধেকের সমতুল্য। আর তা দুটি অপরাধের কারণে বিনষ্ট হয়েছে; তন্মধ্যে একটিতে মূল্য ফেরত গ্রহণের অধিকার হয়েছে। সুতরাং অর্ধেক মূল্য দুই অর্ধেকে বিভক্ত হবে।

আর যদি (বিক্রেতার হস্তাধীনে) চুরি করার পর কয়েক হাত বদল হয়। অতঃপর সর্বশেষ জনের কবজায় তার হাত কাটা হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতাগণ পরস্পরের নিকট থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণ করবে। যেমন দাবীদার প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে হয়।

ছাহেবায়নের মতে, শুধু সর্বশেষ জন তার বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্য ফেরত পাবে। কিন্তু এই বিক্রেতা তার বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে না। কেননা এটা হলো দোষ-এর পর্যায়ভুক্ত।

কিতাবে উল্লেখিত ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্য, যদি ক্রেতা না জানে, তা সাহেবায়নের মাযহাব মতে কার্যকরী হবে, কেননা দোষ সম্পর্কে জানা (এবং তারপর হস্তক্ষেপ করা) দোষের প্রতি সম্মতির প্রমাণ।

পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ মতে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব অনুযায়ী তা কার্যকরী নয়। কেননা দাবীদার সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে অবগতি ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন গোলাম বিক্রি করে এবং সকল দোষ থেকে দায়মুক্তির শর্ত আরোপ করে তাহলে কোন দোষের কারণে গোলামকে ফেরত প্রদানের অধিকার ক্রেতার থাকবে না। যদিও সংখ্যা ধরে সমস্ত দোষের উল্লেখ না করে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, দায়মুক্তির শর্ত বৈধ নয়। কেননা তার মাযহাব মতে অজ্ঞাত অধিকার থেকে দায়মুক্তি বৈধ হয় না।

তিনি বলেন যে, দায়মুক্ত করার অর্থ হলো মালিক বানানো। একারণেই দায়মুক্তির সুবিধা প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। আর অজ্ঞাত জিনিসের মালিক বানানো বৈধ নয়।

আমাদের দলীল এই যে, (দায়মুক্ত করার অর্থ হলো অধিকার প্রত্যাহার করা আর) অধিকার রহিত করার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় না। যদিও তাতে পরোক্ষভাবে মালিকানা প্রদানের দিক রয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে কোন কিছু অর্পণের প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং এই অজ্ঞতা চুক্তিকে বিনষ্টকারী হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে (চুক্তিকালে) বিদ্যমান দোষ এবং কবজা করার পূর্বে সৃষ্ট দোষ সবই এই দায়মুক্তির অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কবজা করার পূর্বে উদ্ভূত দোষ-এর অন্তর্ভুক্ত হবেনা। এটা ইমাম যুফার (র)-এরও মত, কেননা দায়মুক্তকরণ তৎকালীন বিদ্যমান দোষকেই শুধু অন্তর্ভুক্ত করবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, (দায়মুক্ত করণের) উদ্দেশ্য হলো ক্রেতা কর্তৃক নিজের দোষমুক্ত দ্রব্য লাভের অধিকার রহিত করার মাধ্যমে চুক্তিতে বাধ্য-বাধ্যকতাকরণ। আর তা সম্ভব হয় বিদ্যমান ও (পরবর্তীতে) উদ্ভূত দোষ থেকে দায়মুক্ত করার মাধ্যমে।

পরিচ্ছেদ ঃ ফাসিদ বিক্রয় প্রসংগ

দুই বিনিময় বস্তুর একটি কিংবা যদি (শরীয়তের নাছ বা ইজমা দ্বারা) হারাম হয় তাহলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। যেমন, মৃত রক্ত, মদ ও শূকরের বিনিময়ে (কোন কিছু) বিক্রি করা। অদ্রূপ বিনিময় দ্রব্যটি যদি মালিকানাযোগ্য না হয়। যেমন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করা।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এখানে ইমাম কুদূরী (র) কয়েকটি ভিন্ন মাসআলা একত্রিত করেছেন এবং তাতে বিশদ বিবরণ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ এখানে আমরা তা বর্ণনা করবো আমাদের বক্তব্য এই যে, মৃতের ও রক্তের বিনিময়ে কিছু বিক্রি করলে

বিক্রয় চুক্তি বাতিল হবে। তদ্রূপ স্বাধীন ব্যক্তিকে বিনিময় বানালেও তা বাতিল হবে। কেননা বিক্রয় এর মূল রোকন এখানে অনুপস্থিত। আর তা হলো মালের বিনিময়ে মালের আদান প্রদান আর এগুলোকে কারো মতেই মাল বিবেচনা করা হয় না।

পক্ষান্তরে মদের এ শূকরের বিনিময়ে বিক্রয় ফাসিদ হবে। (বাতিল হবে না) কেননা বিক্রয়-এর মূল হাকীকত (ও প্রতিপাদ্য বিষয়) তথা মাল দ্বারা মালের বিনিময় এখানে বিদ্যমান রয়েছে। কারণ কোন কোন ধর্ম মতে এগুলো মাল রূপে বিবেচিত।

বাতিল বিক্রয় (দ্রব্য সত্তার মালিকানা এবং) হস্তক্ষেপের মালিকানা সাব্যস্ত করে না। আর বিক্রীত বস্তু যদি ক্রেতার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, এ ধরনের ক্ষেত্রে কোন কোন মাশায়েখের মতে ঐ বস্তুটি ক্রেতার হাতে আমানতরূপে বিবেচ্য হবে। কেননা বিক্রয় চুক্তিটি বিবেচনাযোগ্য নয়। সুতরাং মালিকের অনুমতিক্রমে কবজা করা সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে কোন কোন মাশায়েখের মতে বস্তুটি আর্থিক দায়যুক্ত হবে।

কেননা যে বস্তু শুধু মূল্য উল্লেখপূর্বক কবজা করে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা তো তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের নয়।[১] (অথচ সেখানেই গৃহীত বস্তুটি দায়যুক্ত হয়।)

কেউ কেউ প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত আর দ্বিতীয়োক্ত সিদ্ধান্তটি ছাহেবায়নের মত বলে উল্লেখ করেছেন।

যেমন উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারের বিষয়টি, যা পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

আর বাইউল ফাসিদের হুকুম হল বিক্রয় চুক্তির সংগে যখন কবজা করা যুক্ত হয় তখন মালিকানা সাব্যস্ত হয়। এ ধরনের বিক্রয়ে বিক্রীত দ্রব্যটি ক্রেতার হাতে দায়যুক্ত অবস্থায় থাকে। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী' (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। ইনশাআল্লাহ এ অধ্যায়ের পর আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

তদ্রূপ মৃত রক্ত ও স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হবে।

কেননা এগুলো মাল না। সুতরাং তা বিক্রয়-পাত্র হতে পারে না।

আর মদ ও শূকরের বিক্রয় যদি 'দায়ন' (অনির্ধারিত দ্রব্য) তথা দিরহাম-দীনার এর বিনিময়ে হয়, তাহলে বিক্রয় বাতিল হবে। আর যদি নির্দিষ্ট দ্রব্যের বিনিময়ে হয়।[২] (যেমন বস্ত্রের বিনিময়ে হলো) তাহলে বিক্রয় ফাসিদ বলে বিবেচিত হবে।

সুতরাং এর বিনিময়রূপে নির্ধারিত বস্তুটিতে (মূল্য আদায় সাপেক্ষে) মালিকানা সাব্যস্ত হবে, যদিও মদ বা শুকরের সত্তায় মালিকানা সাব্যস্ত হয় না।

---

১. কেননা এখানে তো অন্ততঃ দৃশ্যতঃ ক্রয় হয়েছে, পক্ষান্তরে সেখানে শুধু ক্রয়ের নাম করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

২. স্বর্ণ ও রৌপ হল অনির্ণয়যোগ্য ধাতু। অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবে এগুলোকে মূল্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া অন্য সবকিছু নির্ণয়যোগ্য দ্রব্য। অর্থাৎ দৃষ্টিগতভাবে এগুলোকে বিক্রয়বস্তু হওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

দুই মাসআলার মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, মদকে মাল রূপে (অন্যান্য ধর্মে) বিবেচনা করা হয়। তদ্রূপ কোন কোন যিম্মীদের ধর্মমতে শূকর মাল রূপে বিবেচিত। তবে (শরীয়তের দৃষ্টিতে) তা মূল্যমান যোগ্য নয়। কেননা শরীয়ত এগুলোকে মার্যাদা দানের পরিবর্তে ঘৃণা করার ও মর্যাদা না দেওয়ার আদেশ করেছে। অথচ বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে উদ্দেশ্য রূপে এগুলোর মালিকানা গ্রহণ করা এগুলোকে মর্যাদা দান করা হয়।

আর মর্যাদা দান এভাবে হয় যে, এগুলোতে যখন দিরহাম-দীনারের পরিবর্তে খরিদ করবে তখন দিরহাম-দীনার তো মূল উদ্দেশ্য হবে না।

এগুলো হল মাধ্যম যা যিম্মায় ওয়াজিব হয়। যার উদ্দেশ্য হল মদ।

সুতরাং আলোচ্য বিক্রয় চুক্তিতে মূল্যমান সর্বোতভাবে রহিত হয়ে গেলো। পক্ষান্তরে মদের বিনিময়ে বস্ত্র ক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বস্ত্র ক্রয়কারী মূলতঃ মদের বিনিময়ে বস্ত্রের মালিকানা অর্জনের উদ্দেশ্যে করেছে। আর তাতে বস্ত্রকে মর্যাদা দান করা হয়, মদকে নয়। সুতরাং নিছক বস্ত্রের মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে মদের উল্লেখ বিবেচ্য হবে। মদের নিজস্ব সত্তাগত ক্ষেত্রে তার উল্লেখ বিবেচ্য হবে না। একারণেই (মূল্যরূপে) মদের উল্লেখ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর বস্ত্রের বাজার মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে। মদের মূল্য নয়।

তদ্রূপ একই বিধান হবে যদি বস্ত্রের বিনিময়ে মদ বিক্রি করে। কেননা পণ্য বিনিময় হিসাবে এখানে মদের বিনিময়ে বস্ত্র ক্রয়ের দিকটি বিবেচ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বার ও মুকাতাবকে বিক্রি করা ফাসিদ অর্থাৎ বাতিল।

কেননা উম্মে ওয়ালাদের জন্য স্বাধীনতা লাভের অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেছে। নবী (স) বলেছেন, اعتقها ولدها (তার সন্তান তাকে মুক্ত করে দিয়েছে।)

আর মুদাব্বারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভের 'হেতু' বর্তমানেই সাব্যস্ত হয়ে গেছে। কেননা মৃত্যুর পর তো মনিবের মুক্তিদানের যোগ্যতা বাতিল হয়ে যায়।

আর মুকাতাব নিজের উপর এমন নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হয়েছে যা মনিবের উপর অবশ্য কার্যকর। সুতরাং এখন যদি বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তা সবই বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ বিক্রয় বৈধ হবে না।

আর মুকাতাব নিজেই যদি বিক্রয়ের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। আর স্পষ্ট নীতি অনুযায়ী তা জায়িয।

(আর মুদাব্বারের বেলায়) উদ্দেশ্য হলো নিঃশর্ত মুদাব্বার, শর্তযুক্ত মুদাব্বার নয়।

শর্তযুক্ত মুদাব্বার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ভিন্ন মত রয়েছে। দাসমুক্তি বিষয়ক পর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, উম্মে ওয়ালাদ বা মুদাব্বার যদি ক্রেতার হস্তাধীনে মৃত্যুবরণ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণের দায় আসবেনা। ছাহেবায়ন বলেন, তার উপর তাদের বাজার মূল্যের দায় আরোপিত হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে এ মতও বর্ণিত আছে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, এখানে বিক্রয়-এর দিক থেকে তার কবজা গ্রহণ করা হয়েছে, সুতরাং অন্য সকল দ্রব্যের ন্যায় এটাও বাজার মূল্য দ্বারা দায়যুক্ত হবে। এটা এভাবে যে, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। একারণেই বিক্রয় চুক্তিতে তাদের সংগে অন্য কোন গোলামকে যুক্ত করলে তার উপর ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

কিন্তু মুকাতাবের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সে তার নিজের হস্তাধীনে রয়েছে, সুতরাং তার ক্ষেত্রে কবজা সাব্যস্ত হয় না। আর এই 'দায়বহন' কবজার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, বিক্রয়-এর দিকটিকে প্রকৃত বিক্রয়-এর সাথে এমন ক্ষেত্রেই শুধু যুক্ত করা হবে, যে ক্ষেত্র প্রকৃত বিক্রয় গ্রহণের যোগ্যতা রাখে। অথচ উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার প্রকৃত বিক্রয় গ্রহণের যোগ্যতা রাখেনা। সুতরাং তারাও মুকাতাবের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে গেলো।

আর তাদের বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা তাদের নিজেদের সত্তাগত যোগ্যতায় নয়। বরং তাদের সাথে যুক্ত দ্রব্যের উপর বিক্রয়-এর বিধান সাব্যস্ত হওয়ার উদ্দেশ্য।

সুতরাং এটা ক্রেতার মালিকাধীন দ্রব্যের ন্যায় হলো, যা স্বতন্ত্রভাবে তো তার সম্পাদিত চুক্তির বিধানভুক্ত হয় না। তবে তার মালের সাথে বিক্রেতার যে মাল যুক্ত করা হয়েছে, তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য তার উপর অন্তভুক্তির হুকুম সাব্যস্ত করা হয়। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ধরার পূর্বে মাছ বিক্রি করা জায়িয নেই।

কেননা সে তো এমন জিনিস বিক্রি করলো, যার সে মালিক হয়নি। তদ্রূপ কোন ঘেরের ভিতরে থাকা মাছ যদি এমন হয় যে, শিকার করা ছাড়া তা ধরা যায় না তবে সেটা বিক্রি করা জায়িয হবে না।

কেননা (এ অবস্থায়) মাছগুলোকে অর্পণ করা, তার ক্ষমতাধীন নয়। আলোচ্য মাসআলার উদ্দেশ্য এই যে, মাছগুলোকে ধরে ঘেরের মধ্যে ফেলা হয়েছে।

আর যদি ঘের এত ছোট হয় যে, কৌশল গ্রহণ ছাড়া সহজেই তা ধরা যায়, তাহলে বিক্রি করা জায়িয হবে। তবে মাছগুলো যদি নিজে নিজেই ঘের এর মধ্যে এসে জমা হয়ে থাকে আর ঘেরের মুখ বন্ধ না করা হয়ে থাকে তাহলে মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে বিক্রি জায়িয হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, শূন্যে উড়ন্ত পাখি বিক্রি করা জায়িয নেই। কেননা ধরার আগে সেটা তার মালিকানাভুক্ত নয়।

তদ্রূপ বিক্রি জায়িয হবে না যদি (ধরা পাখি) সে হাত থেকে ছেড়ে দেয়। কেননা তা অর্পণ করা তার ক্ষমতাধীন নয়।

গর্ভস্থ বাচ্চা এবং গর্ভস্থ মাদি বাচ্চার সম্ভাব্য বাচ্চাকে বিক্রি করা জায়িয নয়।

কেননা নবী (স) গর্ভস্থ বাচ্চার এবং গর্ভস্থ বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর এজন্য যে, এতে ধোঁকার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওলানে থাকা দুধ বিক্রি করাও জায়িয নয়।

কেননা এদিক থেকে ধোঁকার সম্ভাবনা রয়েছে যে, হতে পারে 'ওলান' এমনি ফুলে রয়েছে।

তাছাড়া দোহনের পদ্ধতি নিয়ে পরস্পর বিবাদ হতে পারে। আবার হতে পারে যে, বিক্রয়ের পর নতুন দুধ বর্ধিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিক্রীত দ্রব্য অবিক্রীত দ্রব্যের সাথে মিশে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ভেড়া-বকরীর পীঠস্থ পশম বিক্রি করা যাবে না।

কেননা তা প্রাণির অনুবর্তী। তাছাড়া পশম গোড়ার দিক থেকে বাড়ে, ফলে বিক্রীত দ্রব্য এবং অবিক্রীত দ্রব্য মিলে যাবে। গাছের ডালপালার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা উপরের দিক থেকে বাড়ে (সুতরাং ক্রেতার মালিকানাতেই বর্ধন ঘটে)।

ক্ষেতের সবজীর বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সেটাকে উপড়ে ফেলা সম্ভব। পক্ষান্তরে পশমের ক্ষেত্রে কর্তন হলো নির্ধারিত, সুতরাং কর্তনের স্থান নির্ধারণ নিয়ে পরস্পর বিবাদ হতে পারে।

আর বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে যে, নবী (স) ভেড়া-বকরীর পীঠের পশম বিক্রি করতে এবং ওলানস্থ দুধ এবং দুধে মিশে থাকা মাখন বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি পৃষ্ঠস্থ পশম প্রসংগে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর বিপক্ষে দলীল। কেননা তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এটা বিক্রি করা জায়িয বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ছাদের কড়িকাঠ এবং (কর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন) বস্ত্র থেকে একগজ বিক্রি করা জায়িয নয়। কর্তনের স্থান উল্লেখ করা হোক কিংবা না করা হোক।

কেননা ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া সেটা অর্পণ করা সম্ভবপর নয়। রূপার পিন্ড থেকে যদি কেউ দশ দিরহাম পরিমাণ বিক্রি করে, তবে তার হুকুম ভিন্ন। কেননা তা খন্ডিত করণে কোন ক্ষতি নেই।

আর যদি (কড়িকাঠ বা গজ) নির্ধারণ করা না হয় তাহলে আমাদের উল্লেখকৃত কারণে তা বিক্রি করা জায়িয নয়। আর অজ্ঞতা থাকার কারণেও।

আর যদি ক্রেতা বিক্রয় চুক্তি নাকচ করার পূর্বে বিক্রেতা গজ পরিমাণ বস্ত্র কেটে ফেলে এবং কড়িকাঠ বের করে ফেলে তাহলে বিক্রয় বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, বিক্রয় ফাসিদকারী 'হেতু' বিলুপ্ত হওয়ার কারণে।

পক্ষান্তরে খেজুরের কিংবা তরমুজের ভিতরের দানা যদি বিক্রি করে তাহলে তা বৈধ হবে না, যদিও তা কেটে ভিতর থেকে বিক্রীত দানা বের করে ফেলে, কেননা (বিক্রয়ের সময়) বিক্রীত দ্রব্যের অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। অথচ কাঠ হলো চাক্ষুষ বিদ্যমান বস্তু।

ইমাম কুদূরী বলেন, শিকারীর এক ক্ষেপ বিক্রি করা বৈধ নয়।

অর্থাৎ একবারের জাল দ্বারা যে পরিমাণ শিকার ধরা পড়বে, তা বিক্রি করা। কেননা এর পরিমাণ অজ্ঞাত। আর তাছাড়া এতে ধোঁকা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'মুযাবানাহ' বিক্রয় বৈধ নয়।

মুযাবানাহ অর্থ খেজুর গাছে বিদ্যমান খেজুর আন্দাজে পরিমাপ করা এবং সেই পরিমাণ কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে তা বিক্রি করা।

কেননা নবী (স) মুযাবানাহ ও মুহাকালাহ বিক্রয় নিষেধ করেছেন। মুযাবানাহ হল যা আমরা উল্লেখ করলাম। আর মুহাফালাহ অর্থ হলো শীষে বিদ্যমান গম আন্দাজে পরিমাপ করা এবং সেই পরিমাণ গমের বিনিময়ে তা বিক্রি করা।

তাছাড়া এই কারণে যে, সে পাত্র-পরিমাপিত জিনিসকে একই শ্রেণীর পাত্র পরিমাপিত জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করেছে। সুতরাং তা অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা বৈধ হবে না; যেমন উভয় গম মাটিতে রক্ষিত অবস্থায় অনুমানে বিক্রী করা জায়িয নয়।

তদ্রূপ কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আংগুর বিক্রি করা বৈধ হবে না একই কারণে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণের কম অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা জায়িয।

কেননা নবী (স) মুযাবানাহ সম্পর্কে নিষেধ করেছেন; কিন্তু عرايا সম্পর্কে অনুমতি প্রদান করেছেন।

আর আরায়ায়-এর বিক্রয় অর্থ পাঁচ ওয়াসাকের নীচে গাছে বিদ্যমান খেঁজুরকে আন্দাজের ভিত্তিতে সেই পরিমাণ খেঁজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা।

আমাদের জবাব এই যে, আভিধানিকভাবে عرية অর্থ দান। আর হাদীসে অনুমোদিত عرايا এর ব্যাখ্যা এই যে, যাকে দান করা হয়েছে, সে গাছের খেঁজুরকে কর্তিত খেঁজুরের বিনিময়ে দাতার কাছে বিক্রি করবে। এটা রূপক অর্থে বিক্রি। কেননা গ্রহীতা তো এখনো দানকৃত খেঁজুরের মালিক হয়নি। সুতরাং কর্তিত খেঁজুর প্রদান করাটা মূলতঃ নতুন দান।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পাথর ছুঁড়ে মারা আবু 'মুলামাসাহ' এবং 'মুনাবাযাহ'-এর মাধ্যমে বিক্রয় বৈধ নয়।

এ ধরনের বিক্রয় ইসলাম পূর্ব যুগে প্রচলিত ছিলো। অর্থাৎ দু'জন লোক একটা পণ্য নিয়ে দরদাম করতো। এর মধ্যে ক্রেতা যদি বিক্রয় দ্রব্য ছুঁড়ে ফেলতো কিংবা

বিক্রেতা যদি ক্রেতার দিকে ছুঁড়ে মারতো কিংবা ক্রেতা যদি বিক্রয় দ্রব্যের উপর একটি পাথর রেখে দিতো তাহলে তার কথিত মূল্যে বিক্রি অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে যেতো। প্রথমোক্ত ছুরতটি হলো بيع الملامسة। দ্বিতীয়টি হলো بيع المنابذة। আর তৃতীয়টি بيع بالقاء الحجر (পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রয়)। আর নবী (স) بيع الملامسة ও بيع المنابذة থেকে নিষেধ করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, এ সকল বিক্রয়ে ঝুঁকিযুক্ততা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দুই কাপড়ের মধ্যে একটি বিক্রি করা জায়িয নয়।

কেননা এখানে বিক্রয় দ্রব্য অজ্ঞাত। আর যদি বিক্রেতা একথা বলে যে, ক্রেতার ইচ্ছাধিকার রয়েছে দুটির যে কোনটি নিতে পারে, তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস মতে তা জায়িয হবে। মাসআলাটি আমরা পূর্বে-তার শাখা-প্রশাখাসহ আলোচনা করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, চারণভূমি বিক্রি করা কিংবা ইজারা দেওয়া জায়িয নয়। এখানে চারণভূমি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চারণভূমির ঘাস (যা সংরক্ষিত নয়)।

বিক্রয় জায়িয না হওয়ার কারণ এই যে, বিক্রির চুক্তিটি এমন জিনিসের ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়েছে, যার সে মালিক নয়। কেননা হাদীস দ্বারা তাতে সকল মানুষের শরীকানা রয়েছে।

ইজারা বৈধ না হওয়ার কারণ এই যে, এখানে এমন একটি জিনিস ব্যবহার দ্বারা নিঃশেষ করার বিষয়ে চুক্তি সম্পন্ন হচ্ছে, যা সকলের জন্য মোবাহ (ব্যবহার করা বৈধ) অথচ যদি তার মালিকানার কোন জিনিস ব্যবহার দ্বারা নিঃশেষ করার বিষয়ে ইজারা চুক্তি হয় তাহলেও তা বৈধ নয়। যেমন দুধ খাওয়ার জন্য গাভী ইজারা জায়িয নয়। সুতরাং এটা জায়িয না হওয়া আরো স্বাভাবিক।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, মৌমাছি বিক্রি করা জায়িয নয়।

এটা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন. যদি উহা সংরক্ষিত অবস্থায় হয় তাহলে বিক্রি করা জায়িয হবে। শাফেয়ী (র)-এরও এই মত। কেননা বস্তুতঃ এবং শরীয়তগতভাবে এটা এমন প্রাণী. যা থেকে উপকার গ্রহণ করা যায়। সুতরাং তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। যদিও তা খাওয়া যায় না। যেমন খচ্চর ও গাধা।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে,এটা কীট-পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং তা বিক্রি করা জায়িয হবে না, যেমন ভিমরুল।

আর উপকার লাভ হয় তা থেকে নির্গত পদার্থ দ্বারা, ঐ প্রাণির সত্তা দ্বারা নয়, সুতরাং ঐ পদার্থ নির্গত হওয়ার পূর্বে তা উপকার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

তবে যদি মৌমাছিসহ মধুপূর্ণ চাক বিক্রি করে তাহলে চাকের অনুবর্তীরূপে তা বৈধ হবে। ইমাম কারখী এরূপ উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে রেশম কীট বিক্রি করা জায়িয নয়।

কেননা তা কীট পতঙ্গযুক্ত। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে যদি কীটের উপর রেশমের আবরণ প্রকাশ পায় তাহলে রেশমের অনুবর্তীরূপে বিক্রি করা জায়িয হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যে কোনভাবেই তা বিক্রি করা বৈধ হবে। কেননা তা উপকারযোগ্য প্রাণী।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে রেশম কীটের ডিম বিক্রি করা জায়িয নয়।

আর ছাহেবায়নের মতে বৈধ হবে; প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে রয়েছেন; যেমন, রেশমকীটের ক্ষেত্রে।

কবুতরের সংখ্যা যদি জানা থাকে আর তা অর্পণ করা সম্ভব হয় তাহলে তা বিক্রি করা জায়িয হবে। কেননা তা অর্পণযোগ্য মাল।

পলাতক গোলামকে বিক্রি করা জায়িয নয়। কেননা নবী (স) তা নিষেধ করেছেন। তাছাড়া এই কারণে যে, বিক্রেতা তা সমর্পণ করতে সক্ষম নয়।

তবে যদি এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে, যে গোলামটি তার কাছে রয়েছে বলে দাবী করে।

কেননা হাদীস দ্বারা যা নিষিদ্ধ হয়েছে তা হলো পূর্ণ পলাতক গোলাম। অর্থাৎ উভয় চুক্তিকারীর ক্ষেত্রে পলাতক রূপে সাব্যস্ত গোলাম। অথচ এই গোলামটি ক্রেতার ক্ষেত্রে পলাতক নয়।

তাছাড়া গোলামটি যখন ক্রেতার নিকট রয়েছে তখন অর্পণের বিষয়ে অক্ষমতা রহিত হয়ে গেছে। আর সেটাই ছিলো প্রতিবন্ধক।

অতঃপর গোলাম যদি ক্রেতার হাতে থেকে থাকে আর সে গোলামকে হাতে নেয়ার সময় দু'জন সাক্ষী রেখে থাকে তাহলে ক্রেতা নিছক বিক্রয় চুক্তির কারণে বিক্রীত দ্রব্যের কবজাকারীরূপে পণ্য হবে না।

কেননা গোলামটি তার কাছে আমানতরূপে রয়েছে। আর আমানতের কবজা বিক্রয়ের কবজার স্থলবর্তী হয়না। আর যদি গোলামটিকে হাতে নেয়ার সময় সাক্ষী না রাখে তাহলে নিছক বিক্রয় চুক্তির ফলে সে কবজাকারীরূপে গণ্য হওয়ার কথা। কেননা তার এই হাতে নেওয়াটা ছিলো অপহরণের কবজা।

আর যদি ক্রেতা বলে যে, গোলাম অমুকের হাতে রয়েছে, তুমি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আর সে বিক্রি করলো, তবে তা বৈধ হবে না। কেননা গোলামটি উভয় চুক্তিকারীর ক্ষেত্রেই পলাতক। তাছাড়া বিক্রেতা তো তাকে অর্পণ করতে সক্ষম নয়।

যদি পলাতক গোলামকে বিক্রি করার পর সে পলাতক অবস্থা থেকে ফিরে আসে তাহলে ঐ বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে না। কেননা গোলামটিতে বিক্রয় পাত্র হওয়ার গুণাগুণ না থাকায় বিক্রয় চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন, শূন্যে উড়ন্ত পাখির বিক্রির ব্যাপারে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি চুক্তিটি রহিত ঘোষণা না করা হয় তবে চুক্তিটি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

কেননা মাল হওয়ার গুণ বিদ্যমান থাকায় চুক্তিটি সংঘটিত হয়েছে। আর এখন বৈধতার প্রতিবন্ধক উঠে গেছে। আর সেটা হলো অর্পণের অপারগতা যেমন বিক্রয়ের পর পলায়নের ক্ষেত্রে। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকেও এরূপ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, পেয়ালায় রক্ষিত কোন স্ত্রীলোকের দুধ বিক্রি করা জায়িয হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বিক্রয় জায়িয হবে। কেননা এটা পাক পানীয়। আমাদের দলীল এই যে, এটা মানব দেহের অংশ। আর মানব দেহ তার সমগ্র অংশসহ সম্মানযোগ্য এবং 'পণ্যায়নের' হীনতা থেকে হেফাজতযোগ্য।

যাহিরে রিওয়ায়েত অনুযায়ী স্বাধীন স্ত্রীলোকের দুধ এবং দাসীর দুধে কোন পার্থক্য নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত একটি মতে দাসীর দুধ বিক্রি করা জায়িয। কেননা দাসীর দেহ সত্তার উপর বিক্রয় চুক্তি আরোপ করা বৈধ। সুতরাং অংশ বিশেষের উপর বিক্রয় চুক্তি বৈধ হবে।

আমাদের দলীল এই যে, দাসত্ব গুণ তার দেহ সত্তায় প্রবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু দুধে দাসত্ব গুণের প্রবিষ্টতা নেই। কেননা দাসত্ব গুণ এমন ক্ষেত্রের সাথে বিশিষ্ট, যেখানে তার বিপরীত শক্তি (তথা স্বাধীনতা গুণ) সাব্যস্ত হতে পারে। আর সেই ক্ষেত্র হলো জীবন্ত সত্তা। অথচ দুধে প্রাণ নেই।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, শূকরের লোম বিক্রি করা জায়িয নয়। কেননা শূকর সামগ্রিকভাবে নাপাক। সুতরাং তার হীনতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তার বিক্রয় বৈধ নয়। তবে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সেলাইয়ের জন্য তাকে ব্যবহার জায়িয রয়েছে। কেননা জুতা সেলাইয়ের কাজ (সাধারণতঃ) তাছাড়া সম্ভব হয় না। আর তা মালিকানাহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। সুতরাং তার ক্রয় বিক্রয়ের প্রয়োজন নেই।

যদি তা অল্প পানিতে পতিত হয় তাহলে, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তা নাপাক হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে নাপাক হবে না। কেননা উপকার লাভের নিঃশর্ত বৈধতা তার পাক হওয়ার প্রমাণ।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, ব্যবহার করার (বা উপকার লাভের) নিঃশর্ত বৈধতা হচ্ছে প্রয়োজনবশতঃ। সুতরাং ব্যবহারের অবস্থা ছাড়া অন্য সময় প্রয়োজন সাব্যস্ত হবে না। আর পানিতে পড়ার অবস্থা ব্যবহারের অবস্থা থেকে ভিন্ন।

মানুষের চুল বিক্রি করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয নয়।

কেননা মানুষ সম্মানযোগ্য, হীনকরণের পাত্র নয়। সুতরাং তার দেহের কোন অংশকে অসম্মান করা বা হীন করা জায়িয হতে পারে না।

আর নবী (স) বলেছেন, لعن الله الواصلة والمستوصلة —'মানব কেশ সংযুক্তকারিণী এবং সংযুক্ত করার আদেশ দানকারিণীকে আল্লাহ অভিশপ্ত করুন।

অবশ্য মেয়েদের বেনী বা খোপা বড় করার লক্ষ্যে পশুর লোম ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, দাবাগত করণের পূর্বে মুরদা পশুর চামড়া বিক্রি করা জায়িয নয়। কেননা তা উপকার লাভযোগ্য নয়।

নবী (স) বলেছেন, لاتنتفعوا من الميتة باهاب —তোমরা মুরদারের ইহাব দ্বারা উপকার হাসিল করো না। আর ইহাব ঐ চামড়াকে বলা হয়, যা পাকা করা হয়নি। যেমন কিতাবুস সালাত পর্বে আলোচিত হয়েছে।

পাকা করার পর তা বিক্রি করা এবং ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই।

কেননা পাকা করার মাধ্যমে তা পাক হয়ে গেছে। সালাত পর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

মৃত পশুর হাড়, পেশী, লোম, শিং, চুল, পশম বিক্রি করা এবং সবকটি থেকে উপকার লাভ করা যায়।

কেননা এগুলো পাক। তাতে প্রাণ বিদ্যমান না থাকায় মৃত্যু প্রবিষ্ট হয় না। ইতিপূর্বে (তাহারাত পর্বে) বিষয়টি প্রমাণিত করে এসেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে হাতিও শূকরের মতই সামগ্রিকভাবে নাপাক।

আর শায়খায়নের মতে হিংস্র প্রাণির পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তার হাড় বিক্রি করা যায় এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি ভবনের নীচের অংশ একজনের এবং উপরের অংশ অন্যজনের হয় আর উভয় অংশ ধসে যায় কিংবা শুধু উপরের অংশ ধসে যায় আর উপরের অংশের মালিক তার অংশের হক বিক্রি করে তাহলে তা জায়িয হবে না।

কেননা উপরত্বের হক 'মাল' রূপে গণ্য নয়। কারণ মাল হলো এমন জিনিস, যেটাকে সংরক্ষণ করা সম্ভব, আর মালই হলো বিক্রয়ের ক্ষেত্র। শিরব (বা জমির সেচ অধিকার) এর বিষয়টি ভিন্ন। বর্ণিত সকল মতেই জমির অনুবর্তীরূপে এই অধিকার বিক্রি করা জায়িয। আর এক বর্ণনা অনুযায়ী পৃথকভাবেও বিক্রি করা জায়িয। বলখের মাশায়েখগণ এ মত গ্রহণ করেছেন।

কেননা এটি হলো পানির অংশ বিশেষ, একারণেই এটা নষ্ট করলে (যেমন অন্যের হিসসার পানি নিজের জমিতে দিলে) তার ক্ষতিপূরণ বহন করতে হয় এবং জমির মূল্যের একটা অংশ তার জন্য ধার্য হয়। শিরব বিষয়ক পর্বে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করবো।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, রাস্তা বিক্রি করা এবং দান করা বৈধ। কিন্তু পানির প্রবাহস্থান বিক্রি বা দান করা বাতিল।

আলোচ্য মাসআলার সম্ভাব্য দু'টি ছুরত রয়েছে। প্রথমত: স্বয়ং চলাচলের পথ এবং পানি প্রবাহের স্থানটই বিক্রি করা; দ্বিতীয়ত: (পথের ভূমির পরিবর্তে) শুধু চলাচলের অধিকার এবং পানি প্রবাহিত করার অধিকার বিক্রি করা। এখানে যদি প্রথম ছুরত উদ্দেশ্য হয় তাহলে দুই মাসআলার মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, পথ হলো সু পরিজ্ঞাত। কেননা তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জানা রয়েছে। পক্ষান্তরে পানির প্রবাহ পথের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ অজ্ঞাত থাকে। কেননা প্রবাহ কতটুকু স্থান অধিকার করবে, তা জানা থাকে না।

আর যদি দ্বিতীয় ছুরতটি উদ্দেশ্য হয় সেক্ষেত্রে চলাচলের অধিকার বিক্রয় সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে। বৈধভাবে মতামতের ক্ষেত্রে চলাচলের অধিকার এবং প্রবাহের অধিকারের মাঝে পার্থক্য এই যে, একটি নির্ধারিত ও জ্ঞাত স্থানের অর্থাৎ পথের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে চলাচলের অধিকারও পরিজ্ঞাত হবে। পক্ষান্তরে প্রবাহ সম্পন্ন হয় ভূমির উপরস্থ শূন্য স্থানে। এটা ভবনের অধিকারের সদৃশ হলো, কিংবা প্রবাহ সম্পন্ন হয় জমির উপরে আর স্থানের পরিমাণের অজ্ঞতার কারণে অধিকারের বিষয়টিও অজ্ঞাত থাকে।

আর দুই বর্ণনার এক বর্ণনা মতে চলাচলের অধিকার এবং উপরত্বের অধিকার-এর মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, উপরত্বের অধিকার এমন একটি বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত থাকে যা স্থায়ী নয়। আর তা হলো ভবনের নীচতল, সুতরাং সংশ্লিষ্ট বস্তুর 'সুবিধা'-এর সদৃশ হলো (আর কোন বস্তুর সুবিধা আলাদা করে বিক্রি করা যায় না) পক্ষান্তরে চলাচলের অধিকার এমন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত যা স্থায়ী, আর তা হলো ভূমি, সুতরাং এটা ভূমির সদৃশ হলো।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি দাসী বিক্রী করল এবং পরে দেখা গেল যে, সে দাস, তাহলে উভয়ের মধ্যে বিক্রয় সংঘটিত হবে না।

পক্ষান্তরে যদি সে ভেড়া বিক্রি করে এবং পরে দেখা গেল যে, তা ভেড়ী, তা হলে সেক্ষেত্রে বিক্রয় সংঘটিত হবে এবং ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

আলোচ্য দুই মাসআলার বিধানগত পার্থক্যের ভিত্তি হল ইমাম মুহাম্মদ (র) অনুসৃত মূলনীতি, আমরা নিকাহ যা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। মূলনীতিটি এই যে, বস্তুর নামের উল্লেখ এবং বস্তুটির প্রতি ইশারা যদি একত্র হয় তাহলে উচ্চারিত নাম এবং ইশারাকৃত বস্তু যদি ভিন্ন শ্রেণীর হয় সেক্ষেত্রে চুক্তিটি উচ্চারিত নামের বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর তা অবিদ্যমান হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি উচ্চারিত নাম এবং ইশারাকৃত বস্তু অভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে চুক্তির সম্পর্ক হবে ইশারাকৃত বস্তুর সাথে এবং বস্তুটি বিদ্যমান থাকার কারণে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে, তবে কাঙ্ক্ষিত গুণের অনুপস্থিতির কারণে ক্রেতা ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। যেমন কেউ

এই শর্তে গোলাম খরিদ করল যে, সে রুটি প্রস্তুত করার কাজে অভিজ্ঞ, কিন্তু দেখা গেলো যে সে একজন লেখক।

আমাদের আলোচ্য মাস'আলায় 'মানব' এর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যগত বড় পার্থক্যের কারণে নর ও নারীকে ভিন্ন শ্রেণী বিবেচনা করা হয়, পক্ষান্তরে পশুদের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যগত নৈকট্যের কারণে দুটিকে অভিন্ন শ্রেণী গণ্য করা হয়। আর শ্রেণীগত ভিন্নতা অভিন্নতার ক্ষেত্রে মূলের পরিবর্তে উদ্দেশ্যের দিকটিই বিবেচ্য। যেমন (একই উৎস অর্থাৎ আংগুর থেকে তৈরি) সিরকা ও সিরাকে দুটি ভিন্ন শ্রেণী গণ্য করা হয়। তদ্রূপ ওয়াযারি ও যানদিনি- ঐ দুই এলাকার তৈরী বস্ত্রকে দু'টি ভিন্ন শ্রেণী গণ্য করা হয়। অথচ উভয়ের উৎস অভিন্ন। (অর্থাৎ তুলা)।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি নগদে কিংবা বাকিতে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কোন দাসী ক্রয় করে এবং তা কবজা করে, অতঃপর মূল্য পরিশোধের পূর্বে বিক্রেতার নিকটই পাঁচশ দিরহামে বিক্রি করে দেয়, তাহলে দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ হবে না।[১]

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বৈধ হবে। কেননা কবজা করার মাধ্যমে দাসীর ক্ষেত্রে ক্রেতার মালিকানা সম্পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করা এবং অন্যের কাছে বিক্রয় করা সমান হবে।

তাছাড়া বিষয়টি বিক্রেতার নিকট প্রথম মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা কিংবা অধিকতর মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা কিংবা পণ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করার মতই হলো।

আমাদের দলীল এই যে, যে স্ত্রীলোক আটশ দিরহামে খরিদ করার পর ছয়শ দিরহামে বিক্রি করে দিলেন তাকে উদ্দেশ্য করে হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেন, তোমার কেনা ও বেচা খুবই মন্দ হয়েছে। যায়দ বিন আরকামকে আমার এ বার্তা পৌঁছে দাও যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের সংগে সে যে হজ্জ ও জিহাদ করেছে আল্লাহ্ তা বাতিল করেছেন, যদি সে তাওবা না করে।

তাছাড়া এই কারণে যে, কবজা না করার কারণে মূল্য এখনো বিক্রেতার 'দায়ভুক্ত' হয়নি। এখন যদি বিক্রীত দ্রব্য তার মালিকানায় চলে আসে আর প্রথম বিক্রয় এবং দ্বিতীয় বিক্রির মূল্যের মাঝে কাটাকাটি সম্পন্ন হয় তাহলে তার অনুকূলে কোন বিনিময় ছাড়া পাঁচশ দিরহাম উদ্বৃত্ত থেকে যায় (যা শরীয়তে নিষিদ্ধ)।

পণ্যের বিনিময়ে বিক্রির মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা উদ্বৃত্তটা শ্রেণী অভিন্নতার ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করে। এরপর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই ঐ দাসীকে এবং তার সাথে অন্য

---

১. প্রথম ক্রয় বিক্রয় বৈধ ছিলো, তা সত্ত্বেও সেটাকে নিন্দনীয় বলার কারণ এই যে, সেটা দ্বিতীয় বিক্রির মাধ্যম হয়েছে।

একটি দাসীকে পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে ঐ বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে তাহলে যে দাসীকে বিক্রেতার কাছ থেকে খরিদ করেনি তার ক্ষেত্রে বিক্রি জায়িয হবে। কিন্তু অন্য দাসীটির বিক্রি বাতিল হবে।

কেননা বিক্রেতার কাছ থেকে না কেনা দাসীটির বিপরীতে নির্ধারিত মূল্যের কিছু অংশ তো ধার্য করতেই হবে। সুতরাং অপর দাসীকে যে মূল্যে বিক্রেতা বিক্রি করেছিলো, তার চেয়ে কম মূল্যে খরিদকারী হবে। আর তা আমাদের মতে অবৈধ। পক্ষান্তরে সংগের দাসীটির ক্ষেত্রে এ অবস্থা পাওয়া যায়নি, আর চুক্তির একাংশের ফাসাদ ও নষ্টতা এই দাসীটির ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হবে না। কেননা বিষয়টি (শরীয়তের প্রত্যক্ষ নাছ-এর পরিবর্তে) ইজতিহাদ নির্ভর হওয়ার কারণে বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রয়কৃত দাসীর মাঝে ফাসাদের বিদ্যমানতা দুর্বল, কিংবা ফাসাদ এসেছে 'রিবা'-এর সদৃশ হিসাবে (এখন যদি দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ফাসাদ বিবেচনা করি তাহলে সেটা হবে 'রিবা'-এর সাদৃশ্যের সদৃশ, আর তা বিবেচ্য নয়।)

কিংবা আলোচ্য ফাসাদটি পরবর্তীতে উদ্ভূত। কেননা মূল্য বন্টিত হওয়ার ফলে কিংবা কাটাকাটি হওয়ার ফলে তা প্রকাশ পাচ্ছে; সুতরাং এই ফ্যাসাদও অন্যত্র প্রসারিত হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি এই শর্তে তেল খরিদ করে যে, বিক্রেতা তাকে পাত্রসহ তেল মেপে দেবে এবং প্রতিটি পাত্রের জন্য পঞ্চাশ 'রতল তার থেকে বাদ যাবে, তাহলে এই বিক্রি ফাসিদ হবে। আর যদি এই শর্তে খরিদ করে যে, পাত্রের ওজন অনুপাতে তার থেকে বাদ যাবে তাহলে জায়িয হবে।

কেননা প্রথম শর্তটি বিক্রয় চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শর্তটি চাহিদা অনুযায়ী।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি চামড়ার পাত্রে ঘী ক্রয় করে অতঃপর দশ 'রতল' ওজনের পাত্র ফেরত দেয় কিন্তু বিক্রেতা বলে যে, ঘীয়ের পাত্র এটা নয়, অন্যটা আর সেটার ওজন ছিলো পাঁচ রতল, তাহলে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা এটাকে যদি কবজাকৃত পাত্র নির্ধারণের মতপার্থক্য রূপে বিবেচনা করা হয় তাহলে কবজাকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে; যামীন হিসেবে হোক কিংবা আমানতদার হিসেবে হোক।

আর যদি ঘীয়ের পরিমাণ সম্পর্কিত মতপার্থক্য হয় তাহলে এটা প্রকৃতপক্ষে মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কিত মতপার্থক্য। সুতরাং সেক্ষেত্রে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে অতিরিক্ত পরিমাণকে অস্বীকার করছে।

মুহাম্মদ (র) বলেন, মুসলিম যদি কোন নাছরানীকে মদ বেচার বা কেনার আদেশ করে (প্রতিনিধি বা ওয়াকীল নিযুক্ত করে) আর সে আদেশ পালন করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বিক্রয় জায়িয হবে।

ছাহেবায়ন বলেন, মুসলমানের পক্ষ থেকে তা (এই প্রতিনিধি নিয়োগ) বৈধ নয়। শূকর সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য (ইহরামের পূর্বে) নিজের শিকারকৃত শিকারকে বিক্রি করার জন্য মুহরিম কর্তৃক ওয়াকীল নিয়োগের বিষয়টিও একই মতপার্থক্যপূর্ণ।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, মোয়াক্কেল নিজে তা সম্পাদন করতে পারে না। সুতরাং সে অন্যকেও এ ক্ষমতা দিতে পারে না।

তাছাড়া ওয়াকীলের অনুকূলে যা কিছু সাব্যস্ত হয়, তা মোয়াক্কেলের দিকেই স্থানান্তরিত হবে। সুতরাং এমন হয়ে গেল যেন সে নিজেই তা সম্পাদন করলো। তাই তা জায়িয হবে না।

ইমাম আবু হানীফা (রা)-এর দলীল এই যে, নিজস্ব যোগ্যতা ও কর্তৃত্ব বলে ওয়াকীল নিজেই হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনকারী, আর নিয়োগদাতার দিকে মালিকানার হস্তান্তর হচ্ছে বিধানগত বিষয়। সুতরাং ইসলামের কারণে চুক্তি নিষিদ্ধ হবে না। যেমন মুসলিম যদি সেগুলোর উত্তরাধিকারী হয়।

যাই হোক তা যদি মদ হয় তাহলে সিরকায় রূপান্তরিত করবে। আর যদি শূকর হয় তাহলে ছেড়ে দেবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি এই শর্তে কোন গোলাম বিক্রি করে যে, ক্রেতা তাকে আযাদ করবে কিংবা মুদাব্বার বানাবে কিংবা মুকাতাব বানাবে অথবা দাসী বিক্রি করলো এই শর্তে যে, তাকে উম্মে ওয়ালাদ বানাবে, তাহলে এ বিক্রি ফাসিদ হবে।

কেননা এটা হলো শর্তসহ বিক্রি, আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্তসহ বিক্রি নিষেধ করেছেন।

এ সম্পর্কে আমাদের মাযহাবের মূলনীতি এই যে, যে সকল শর্ত বিক্রয় চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী হয়, যেমন, ক্রেতার অনুকূলে মালিকানা শর্ত আরোপ করা। এই ধরনের শর্ত বিক্রয় চুক্তিকে ফাসিদ করবে না। কেননা এ শর্তআরোপ ছাড়াই সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে যে সকল শর্ত বিক্রয় চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী না হয়, অথচ তাতে চুক্তির পক্ষদ্বয়ের কোন এক পক্ষের স্বার্থ রয়েছে কিংবা চুক্তিকৃত পণ্যের স্বার্থ রয়েছে, আর ঐ পণ্য স্বার্থ ভোগ করার যোগ্যতা সম্পন্ন। এ ধরনের শর্ত বিক্রয় চুক্তিকে ফাসিদ করে দেবে। যেমন এই শর্ত আরোপ করা যে, ক্রেতা বিক্রয়কৃত গোলামকে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা তাতে বিনিময় বিহীন একটি অতিরিক্ত বিষয় যুক্ত হয়েছে।

সুতরাং তা রিবা'য় পর্যবশিত হবে।

কিংবা কারণ এই যে, এতে বিবাদ সৃষ্টি হবে; ফলে বিক্রয় চুক্তি তার উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তবে শর্তটি যদি প্রচলিত বিষয় হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা, প্রচলন কিয়াসের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

আর যদি শর্তটি বিক্রয় চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী না হয়, এবং তাতে কোন পক্ষের কোন স্বার্থ না থাকে, তাহলে তা বিক্রয় চুক্তিকে ফাসিদ করবে না। এটাই আমাদের মাযহাবের প্রকাশিত মত। যেমন এই শর্ত আরোপ করা যে, বিক্রীত পশুকে ক্রেতা বিক্রি করতে পারবে না।

কেননা পশুর পক্ষ থেকে দাবী অবিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং 'রিবা' কিংবা বিবাদে পর্যবশিত হবে না।

এটা যখন সাব্যস্ত হলো তখন আমরা বলবো যে, 'মতনে' (মূল পাঠে) আলোচিত শর্তগুলো বিক্রয় চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী নয়। কেননা বিক্রয় চুক্তির অনিবার্য দাবী হলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিঃশর্ত অধিকার, বাধ্যতামূলক দায় আরোপ নয়। অথচ আরোপিত শর্ত বাধ্যতামূলক দায় সাব্যস্ত করে। আর তাতে চুক্তিকৃত পণ্যের স্বার্থ রয়েছে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) যদিও আযাদ করার শর্তের ক্ষেত্রে আমাদের বিপক্ষ মত পোষণ করেন এবং এটাকে গোলামের সত্তা বিক্রয়ের উপর কিয়াস করেন; কিন্তু আমরা যে দলীল উল্লেখ করেছি, তা-ই হলো তার বিপক্ষে প্রমাণ।

গোলামের সত্তা বিক্রয়ের ব্যাখ্যা এই যে, শর্ত আরোপ করা ছাড়া এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা, যার সম্পর্কে জানা গেছে যে, গোলামটিকে সে আযাদ করবে।

আযাদ করার শর্তে খরিদ করার পর ক্রেতা যদি গোলামকে আযাদ করে দেয় তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং ক্রেতার উপর বিক্রয় মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর ছাহেবায়ন বলেন, বিক্রয় চুক্তি পূর্বের মত ফাসিদই থেকে যাবে। সুতরাং তার উপর বাজার মূল্য ওয়াজিব হবে।

কেননা বিক্রয় চুক্তিটি ফাসিদ রূপে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা বৈধ অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে না। যেমন অন্যভাবে নষ্ট হয়ে গেলে বৈধ বলে রূপান্তরিত হয় না।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, সত্তাগতভাবে মুক্তি দানের শর্ত বিক্রয় চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। যেমন আমরা আলোচনা করে এসেছি। তবে শর্তের বিধানগত দিক থেকে শর্তটি বিক্রয় চুক্তির উপযোগী। কেননা মুক্তিদান মালিকানাকে সমাপ্তি দান করে, আর কোন বস্তু সমাপ্তি লাভ দ্বারা স্থিতি লাভ করে। এ কারণেই মুক্তি দোষজনিত ক্ষতিপূরণ গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে না।

পক্ষান্তরে অন্যভাবে নষ্ট হওয়া দ্বারা চুক্তির সাথে উপযোগিতা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং ফাসাদ বিক্রয় চুক্তিতে স্থিত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যখন মুক্তিদান পাওয়া গেলো তখন বিক্রয় চুক্তির সহিত মুক্তিদানের শর্তের সামঞ্জস্য সাব্যস্ত হলো, ফলে বৈধতার দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করলো। সুতরাং মুক্তিদানের পূর্বে চুক্তির অবস্থাটি স্থগিত থাকবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তদ্রূপ (বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে) যদি এই শর্তে কোন গোলাম বিক্রি করে যে, বিক্রেতা একমাস তার সেবা গ্রহণ করবে; কিংবা এই

শর্তে কোন বাড়ি বিক্রি করলো যে, বিক্রেতা তাতে বাস করবে। কিংবা এই শর্তে যে, ক্রেতা তাকে দিরহাম করয দেবে কিংবা ক্রেতা তাকে কোন উপহার প্রদান করবে।

কেননা এটা এমন শর্ত যা বিক্রয় চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী নয়। আর তাতে পক্ষদ্বয়ের এক পক্ষের স্বার্থ রয়েছে।

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রয় ও ঋণকে একত্র করতে নিষেধ করেছেন।

তাছাড়া সেবা গ্রহণ ও বসবাসের বিপরীতে যদি মূল্যের কোন অংশ নির্ধারণ করা হয় তাহলে সেটা হবে বিক্রয় চুক্তিতে ইজারা অন্তর্ভুক্ত করা। আর তার বিপরীতে মূল্যের কোন অংশ নির্ধারিত না হলে সেটা হবে বিক্রয় চুক্তিতে কোন আরিয়্যত (ধার) প্রদানের চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা।

অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক চুক্তির মধ্যে দুই চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন নগদ বস্তু বিক্রি করে এই শর্তে যে, মাস শেষের আগে তা অর্পণ করবে না, তাহলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে।

কেননা বিক্রীত নগদ বস্তুর ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারণ করা বাতিল। সুতরাং এটা অবৈধ শর্ত হবে। এধরনের মেয়াদ বাতিল হওয়ার কারণ এই যে, শরীয়ত মেয়াদ অনুমোদন করেছে সহজ করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এটা দায়ন-এর (অনগদ বস্তুর) উপযোগী 'আয়ন'-এর (নগদ বস্তুর) উপযোগী নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি গর্ভস্থ সন্তান বাদ দিয়ে শুধু দাসীকে ক্রয় করে তাহলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যে জিনিসকে আলাদা বিক্রয় চুক্তিতে আনা যায় না, সে জিনিসটিকে বিক্রয় চুক্তি থেকে বাদ রাখাও বৈধ নয়। গর্ভস্থ সন্তানও এ পর্যায়েরই।

এটা একারণে যে, গর্ভস্থ সন্তান সৃষ্টিগতভাবে প্রাণীর সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গের পর্যায়ভুক্ত। আর মূল জিনিসের বিক্রি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং সেগুলোকে বাদ রাখা চুক্তির স্বাভাবিক দাবীর বিপরীত হবে। কাজেই তা শুদ্ধ নয়। তাহলে শর্তটি ফাসিদ হয়ে যাবে। আর শর্তে ফাসিদের কারণে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

আর কিতাবাত চুক্তি, ইজারা চুক্তি এবং রেহেন চুক্তি ও বিক্রয় চুক্তির সমপর্যায় ভুক্ত। কেননা এগুলো ফাসিদ শর্ত আরোপের কারণে বাতিল হয়ে যায়। তবে মূল চুক্তিতে শর্তে ফাসিদের অন্তর্ভুক্তি কিতাবাত চুক্তিকে ফাসিদ করে।[১]

---

১ যেমন মুসলমান তার গোলামের সাথে মদ বা শূকরের বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি করলো। পক্ষান্তরে যদি এই শর্ত আরোপ করে যে, তুমি এই শহরের বাইরে যেতে পারবে না। তবে শর্তটি ফাসিদ হবে এবং শর্তটি বাতিল হবে কিন্তু কিতাবাত চুক্তি বহাল থাকবে।

আর হেবা, ছাদাকা, বিবাহ, খোলা'ও ইচ্ছাকৃত খুনের পরিবর্তে সমঝোতা এগুলোর ক্ষেত্রে গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ দিলে চুক্তি বাতিল হবে না। বরং বাদ দেওয়ার শর্ত বাতিল হবে। কেননা এসকল চুক্তি ফাসিদ শর্ত আরোপ দ্বারা ফাসিদ হয় না।

তদ্রূপ অছিয়তও এই শর্ত আরোপ দ্বারা বাতিল হবে না। তবে ব্যতিক্রমের শর্ত বৈধ হবে। ফলে গর্ভস্থ সন্তান মীরাছ রূপে গণ্য হবে আর দাসীটি অছিয়তরূপে গণ্য হবে (এবং যার নামে অছিয়ত করা হয়েছে সে পাবে।)

কেননা অছিয়ত হলো মীরাছের সমগোত্রীয় আর গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে মীরাছ কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে দাসীর সেবার অধিকারকে চুক্তি থেকে বাদ দেয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাতে মীরাছ কার্যকর হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কাপড় খরিদ করে এই শর্তে যে, বিক্রেতা কাপড় কেটে দেবে এবং জামা বা আবা সেলাই করে দেবে তাহলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হবে।

কেননা এটা এমন শর্ত, যা বিক্রয় চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী নয়। আর তাতে চুক্তির পক্ষ দ্বয়ের একজনের স্বার্থ রয়েছে।

তাছাড়া এতে এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তি প্রবিষ্ট হয়েছে, ইতিপূর্বে যার নিষিদ্ধ হওয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম কদূরী (র) বলেন, কেউ যদি এই শর্তে চামড়া খরিদ করে যে, বিক্রেতা মাপমত জুতা বানিয়ে দেবে কিংবা ফিতা লাগিয়ে দেবে তাহলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরী (র) যা উল্লেখ করেছেন, সেটা হলো কিয়াসের হুকুম। আর তার কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি। পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী প্রকাশিত থাকার কারণে তা বৈধ হবে। সুতরাং এটা কাপড় রং করে দেয়ার শর্ত আরোপের ন্যায় হলো। আর প্রচলনের কারণেই আমরা ফরমায়েশী বিক্রয়কে বৈধ সাব্যস্ত করেছি। যেমন এত টাকার বিনিময়ে একজোড়া জুতা বানিয়ে দাও। অথচ এটা অস্তিত্বহীন একটি জিনিস বিক্রি করার নামান্তর।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নওরোয, মেলা, খৃস্টানদের উপবাস বা ইহূদীদের উপবাস ভংগ ইত্যাদির তারিখে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রি করা ফাসিদ হবে, যদি চুক্তির পক্ষদ্বয়ের ঐসকল অনুষ্ঠানের তারিখ জানা না থাকে।

কারণ হলো মেয়াদের অজ্ঞতা,আর বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে তা বিবাদ সৃষ্টি করে। কেননা বিক্রয়ের স্বভাব ধর্ম হলো উভয়পক্ষের মাঝে কষাকষি হওয়া।

তবে উভয় পক্ষের কাছে তারিখ জানা থাকলে ভিন্ন কথা। কেননা তখন তো উভয় পক্ষের নিকটই মূল্য পরিশোধের মেয়াদ পরিজ্ঞাত হয়ে গেলো।

তদ্রূপ যদি খৃস্টানদের উপবাস শুরু হওয়ার পর উপবাস ভংগের দিন পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারিত করে। কেননা দিনগুণতি হিসাবে তাদের উপবাসের সময়কাল পরিজ্ঞাত হয়েছে। (অর্থাৎ পঞ্চাশ দিন) সুতরাং এখানে অজ্ঞতা নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, হাজীদের আগমনের দিন পর্যন্ত (মূল্য পরিশোধের) মেয়াদ নির্ধারণ করে বিক্রয় চুক্তি করা বৈধ নয়।

তদ্রূপ ফসল কাটা, মাড়ানি, ফল সংগ্রহ করা, কিংবা ভেড়ার লোম কাটার মৌসুম পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করে বিক্রি করা বৈধ নয়।

কেননা এ মৌসুমগুলো 'আগপিছ' হয়। আর যদি এ সকল সময় পর্যন্ত কেউ 'জামিন' হয় তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা যামিনদারির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য। আর এ সকল অজ্ঞতা সামান্য, যার প্রতিকার সম্ভব। সামান্য হওয়ার প্রমাণ এই যে, মেয়াদের অজ্ঞতার বৈধতা প্রসংগে সাহাবা কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে।

তাছাড়া কারণ এই যে, (সময় অজ্ঞাত হলেও) মূল বিষয়টি তো জ্ঞাত।

তোমার কি জানা নয় যে, যামিনদারির ক্ষেত্রে সে মূল ঋণের পরিমাণগত অজ্ঞতাও গ্রহণযোগ্য। যেমন বললো যে, অমুকের জিম্মায় যে পরিমাণ ঋণ রয়েছে সে তার যামিন হবে না। সুতরাং মূল ঋণের কোন একটি গুণের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা আরো স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে।

বিক্রয় চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। সেখানে মূল মূল্যের পরিমাণগত অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং মূল্যের গুণ সংক্রান্ত (অর্থাৎ মেয়াদ সংক্রান্ত) অজ্ঞতাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

পক্ষান্তরে যদি নিঃশর্তভাবে বিক্রয় চুক্তি করে। এরপর মূল্য পরিশোধের বিষয়টি এসকল সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করার শর্ত আরোপ করে তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননা এটি হলো ঋণ পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারণ। আর যামিনদারির ন্যায় এক্ষেত্রেও এই পরিমাণ অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু মূল বিক্রয় চুক্তিতে এই শর্ত আরোপ করা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ শর্ত আরোপ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

যদি প্রথমে এই সকল মেয়াদ নির্ধারণ করে বিক্রয় চুক্তি করে, অতঃপর ফসল কাটা, মাড়াই করা এবং হাজীদের আগমন শুরু হওয়ার আগেই উভয়পক্ষ আরোপিত শর্ত প্রত্যাহার করে নিতে সম্মত হয় তাহলেও বিক্রয় চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে।

যুফার (র) বলেন, বৈধ হবে না। কেননা যা ফাসিদরূপে সংঘটিত হয়েছে তা বৈধ হিসেবে রূপান্তরিত হতে পারে না। আর তা 'মেয়াদী বিবাহের' ক্ষেত্রে মেয়াদ রহিত করণের মত হলো।

আমাদের দলীল এই যে, এখানে ফাসাদ এসেছে বিবাহের সম্ভাবনার কারণে। আর তা 'স্থিত' হওয়ার পূর্বেই বিদূরীত হয়ে গেছে। আর এই অজ্ঞতা হচ্ছে অতিরিক্ত শর্তের মধ্যে; মূল চুক্তির মধ্যে নয়। সুতরাং তা রহিত করা সম্ভব। পক্ষান্তরে যদি দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করে অতঃপর অতিরিক্ত দিরহামটি প্রত্যাহার করে নেয় তাহলেও বিক্রয় বৈধতা লাভ করবেনা। কেননা মূল-চুক্তিতে (বিনিময় দ্রব্য দ্বয়ের একটিতে) ফাসাদ রয়েছে।

মেয়াদী বিবাহর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হচ্ছে 'মুতা' আর মুতা চুক্তি বিবাহ চুক্তি নয়। আর কিতাবে ইমাম কুদূরী উভয়ের সম্মতির যে কথা বলেছেন, তা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। কেননা যার অনুকূলে মেয়াদ আরোপ করা হয়, রহিত করার অধিকার একেকভাবে তার। কেননা এটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব হক।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি একজন স্বাধীন মানুষ এবং একটি গোলামকে একত্র করে, কিংবা একটি জবাইকৃত বকরী এবং একটি মুরদা বকরী একত্র করে বিক্রি করে তাহলে উভয়টির বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।

এটা হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি প্রত্যেকটির জন্য আলাদা মূল্য উল্লেখ করে থাকে তাহলে গোলাম জবাইকৃত বকরীর বিক্রি জায়িয হবে।

আর যদি একটি গোলাম এবং একটি মুদাব্বারকে একত্র করে কিংবা নিজের গোলাম এবং অন্যের গোলামকে একত্র করে বিক্রি করে তাহলে আমাদের তিন ইমামের মতে গোলামের ক্ষেত্রে তার অংশের মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি বৈধ হয়ে যায়।

ইমাম যুফার (র) বলেন, উভয়ের ক্ষেত্রেই বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' না বলে জবাই করা পশু মুরদারের সমতুল্য। আর মুকাতাব গোলাম এবং-উম্মে ওয়ালাদা মুদাব্বারের ন্যায়। ইমাম যুফার (র) এটাকে প্রথম প্রকারের ওপর কিয়াস করেন। কেননা সমগ্রের সাথে সম্পর্কিত করার কারণে 'বিক্রয় পাত্র' হওয়ার যোগ্যতা রহিত হয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলীল এই যে, ফাসাদকারীর পরিমাণে ফাসাদ সাব্যস্ত হবে। যেমন, কেহ বিবাহের ক্ষেত্রে অপরিচিতা নারী এবং নিজের বোনকে একই আকদে বিবাহ করে। সুতরাং গোলামের দিকে ফাসাদ ব্যাপ্ত হবে না। তবে উভয়ের জন্য আলাদা মূল্য উল্লেখ না করলে ভিন্ন কথা, কেননা তখন মূল্য অজ্ঞাত থেকে যায়।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, এবং এটাই উভয় প্রকারের মাঝে পার্থক্য নির্দেশক—স্বাধীন ব্যক্তি মূলত:ই চুক্তিভুক্ত হতে পারে না। কেননা তা মাল নয়। অথচ বিক্রয় চুক্তিটি হচ্ছে অভিন্ন চুক্তি। সুতরাং গোলামের বিক্রয়ের জন্য স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রয়কে কবুল করা শর্ত হলো। আর এটা হলো ফাসিদ শর্ত।

বিবাহের মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা তা ফাসিদ শর্ত দ্বারা ফাসিদ হয় না।

পক্ষান্তরে মুদাব্বার, মুকাতাব ও উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তি স্থগিত থাকে। অথচ মাল হওয়ার গুণ বিদ্যমান থাকার কারণে তারা বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। একারণেই অন্যের গোলামের ক্ষেত্রে মালিকের অনুমতিক্রমে বিক্রি কার্যকর হয়। তদ্রূপ বিশুদ্ধতম মতে মুকাতাবের ক্ষেত্রে তার সম্মতিক্রমে বিক্রি কার্যকর হয়। আর মুদাব্বারের ক্ষেত্রে কাযীর রায় দ্বারা তা কার্যকর হয়।

তদ্রূপ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে বিক্রিও জায়িয। তবে মালিক বিক্রীত গোলামের মালিকানার অধিকার বলে আর ক্রয় নিজ নিজ দেহ সত্তার উপর 'আত্ম অধিকার' বলে বিক্রয়কে নাকচ করে দিয়েছে। এই 'নাকচ' করার কথা 'বিক্রয়' এর বিদ্যমানতা প্রমাণ করে। যেমন দুটি গোলাম খরিদ করলো এবং কবজার পূর্বেই দুটির একটি 'হালাক' হয়ে গেলো।

আর এটা 'বিক্রয় দ্রব্য' নয় এমন বস্তুর বিক্রয় কবুল করাকে শর্ত করা হয়েছে-এমন নয় তদ্রূপ এটা সূচনা থেকে আনুপাতিক মূল্যে বিক্রয় নয়। একারণেই প্রতিটির আলাদা মূল্য উল্লেখ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি।

ফাসিদ বিক্রির হুকুম

ফাসিদ বিক্রির ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিক্রীত দ্রব্য কবজা করে আর চুক্তিতে এমন দুটি বিনিময় দ্রব্য থাকে, যার প্রতিটি 'মাল'রূপে বিবেচিত, তাহলে সে বিক্রীত দ্রব্যটির মালিক হয়ে যাবে এবং দ্রব্যটির বাজার মূল্য তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কবজা করার পরও সে দ্রব্যটির মালিক হবে না। কেননা এটা নিষিদ্ধ বিক্রি, সুতরাং তা দ্বারা মালিকানার নিয়ামত লাভ করা যেতে পারে না। তাছাড়া এজন্য যে, নিষিদ্ধতা শরীয়তের বৈধতা রহিতকারী, উভয়টি বিপরীত বিষয় হওয়ার কারণে। এ কারণেই তো কবজার পূর্বে তা মালিকানা সাব্যস্ত করে না। সুতরাং এটা মুরদারের বিনিময়ে বিক্রি করার মত হলো এবং দিরহামের বিনিময়ে মদ বিক্রি করার মত হলো।

আমাদের দলীল এই যে, বিক্রয়ের 'রোকন' (তথা ইজাব কবুল) যোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকেই সংঘটিত হয়েছে। যোগ্য পাত্রের সাথেই সম্পৃক্ত হয়েছে। সুতরাং বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করা আবশ্যক। (বিক্রয় সম্পাদনের) যোগ্যতা এবং বিক্রয় পাত্র হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই।

বিক্রয়ের রোকন (মূল স্তম্ভ) হলো দ্রব্য দ্বারা দ্রব্য বিনিময় আর এটিই হলো মত পার্থক্যের বিষয়। (যদি উভয় দিকে শরীয়ত স্বীকৃত মাল না হয়, তাহলে সবার মতে বিক্রি বাতিল)।

আমাদের মতে নিষিদ্ধতা শরীয়ত অনুমোদিত হওয়াকে সুসাব্যস্ত করে। কেননা নিষিদ্ধতা নিষিদ্ধ বস্তুর সম্ভাব্যতা দাবী করে। সুতরাং মূল বিক্রয়কর্ম শরীয়তসম্মত। আর এতটুকু দ্বারাই মালিকানার নিয়ামত লাভ হয়।

আর প্রকৃত পক্ষে নিষিদ্ধ হয়েছে বিক্রয়ের সাথে যে গুণগত অবস্থা সংশ্লিষ্ট হয়েছে, সেটা। যেমন (জুমার) আযানের সময় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

আর কবজার পূর্বে মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ এই যে, তা যেন সংশ্লিষ্ট ফাসাদকে স্থিতির দিকে না নিয়ে যায়। কেননা বিক্রীত দ্রব্য ফেরত আনার মাধ্যমে উক্ত ফাসাদ বিদূরীত করা ওয়াজিব। সুতরাং (বিক্রীত দ্রব্য কবজা করার তাগাদা করা থেকে বিরত রাখা উত্তম।)

তাছাড়া একটি মন্দ গুণের সংগে সংশ্লিষ্ট হওয়ার মালিকানার হেতুটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। সুতরাং মালিকানার ফল সাব্যস্ত করার জন্য হেতুটিকে কবজা দ্বারা শক্তিশালী করা শর্ত হবে। হেবা-এর ক্ষেত্রে যেমন।

আর মুরদা তো 'মাল' নয়। সুতরাং বিক্রির মূল স্তম্ভ (মাল-এর বিনিময়) অনুপস্থিত। আর মদ যদি মূল্য না হয়ে মূল্যায়িত (বিক্রীত) দ্রব্য হয় তাহলে তার বিধান আমরা ব্যাখ্যা করে এসেছি (যে, বিক্রয় ক্ষেত্রে বিক্রীত দ্রব্যই হলো মূল উদ্দেশ্য। আর মদকে বিক্রীত দ্রব্য তথা মূল উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার অর্থ তাকে মর্যাদা দান করা)।

তাছাড়া আরেকটা বিষয় এই যে, মদের ক্ষেত্রে তো তার বাজার মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে। আর বাজার মূল্য ধার্যকৃত মূল্যের স্থলবর্তী হতে পারে। বিক্রীত দ্রব্যের স্থলবর্তী হতে পারে না।

ইমাম কুদূরী বিক্রেতার অনুমতিক্রমে কবজা করার শর্ত আরোপ করেছেন। এই যাহিরে রিওয়ায়াত। তবে পরোক্ষ অনুমতিকে যথেষ্ট মনে করা হবে। যেমন চুক্তি মজলিসে কবজা করলো। এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের হুকুম এবং এটাই বিশুদ্ধ মত।

কেননা, বিক্রয়ের অর্থই হলো বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতাকে কবজা করার ক্ষমতা প্রদান। সুতরাং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তার উপস্থিতিতে যখন দ্রব্যটির কবজা করবে আর সে নিষেধ না করে তখন কবজা পূর্ব প্রদত্ত ক্ষমতার ফল রূপেই হবে।

একইভাবে হেবার ক্ষেত্রে চুক্তির মজলিসে কবজা গ্রহণ শুদ্ধ হবে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। বিক্রয় চুক্তিতে এমন দুটি বিনিময় দ্রব্য থাকার শর্ত করা হয়েছে, যার প্রতিটি (শরীয়ত সম্মত) মাল হবে। যাতে বিক্রয়-এর মূল স্তম্ভ তথা মালের পরিবর্তে মালের বিনিময় সাব্যস্ত হয়। এরই ভিত্তিতে মুরদারের বিনিময়ে এবং রক্ত, স্বাধীন ব্যক্তি, বাতাস ইত্যাদির বিনিময়ে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং মূল্য ছাড়া বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) এর বাজার মূল্য সাব্যস্ত হওয়ার বক্তব্যটি হচ্ছে মূল্য নির্ভর বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে, পক্ষান্তরে সাদৃশ্য নির্ভর বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে ক্রেতার উপর সদৃশ্য বস্তু অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

কেন্না (ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) কবজা গ্রহণের কারণ বিক্রীত দ্রব্যটি নিজস্ব সত্তাগত দিক থেকে (অর্থাৎ নিজস্ব 'দ্রব্যতার' দিক থেকে) ক্ষতিপূরণের দায় সম্পন্ন হয়। (বাজার মূল্যের দিক থেকে নয়) সুতরাং তা গছবকৃত দ্রব্যের সদৃশ হলো। (সাদৃশ্য নির্ভর বস্তুর ক্ষেত্রে সদৃশ বস্তু অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার) এই বিধান এজন্য যে, দৃশ্যত: ও গুণগত সাদৃশ্য শুধু গুণগত সাদৃশ্য থেকে অধিক ন্যায়পূর্ণ। ইমাম কুদূরী (র) বলেন, চুক্তির পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে ফাসাদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিক্রয় চুক্তি রহিত করার।

কবজার পূর্বে তো এটা পরিষ্কার। কেননা ফাসিদ বিক্রয় মালিকানা সাব্যস্ত করে না। সুতরাং বিক্রয় চুক্তি রহিত করার অর্থ হবে মালিকানা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। ফাসাদ যদি বিক্রয় চুক্তির মূলে (দ্রব্য দ্বয়ের কোন একটিতে) বিদ্যমান হয় তাহলে কবজার পরও উভয়ের অনুরূপ অধিকার থাকবে। পক্ষান্তরে ফাসাদ যদি অতিরিক্ত শর্ত

আরোপের কারণে সৃষ্ট হয় তাহলে যার অনুকূলে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তার অধিকার থাকবে; যার প্রতিকূলে তার নয়। কারণ হলো চুক্তির শক্তি। তবে পার্থক্য এই যে, যার অনুকূলে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার সম্মতি সাব্যস্ত হয়নি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে ক্রেতা যদি তা বিক্রি করে দেয় তাহলে তার বিক্রয় কার্যকর হবে।

কেননা সে মালিকানা লাভ করেছে। সুতরাং তাতে ব্যবহারের মালিকানাও লাভ করবে। আর দ্বিতীয় বিক্রির মাধ্যমে দ্বিতীয় মানুষের অধিকার সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে প্রথম বিক্রেতার ফেরত চাওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

কেননা প্রথম বিক্রয় রহিত করার আদেশ ছিলো শরীয়তের হকের কারণে। আর বান্দার হক অগ্রবর্তী হবে। যেহেতু সে হাজতমন্দ (অভাবগ্রস্ত)।

তাছাড়া প্রথম বিক্রয়টি মৌলিকভাবে শরীয়ত সম্মত, গুণগতভাবে নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিক্রয়টি মৌলিক ও গুণগত উভয় দিক থেকেই শরীয়ত সম্মত। সুতরাং নিছক গুণগত অবৈধতা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।

তাছাড়া দ্বিতীয় বিক্রয়টি (প্রথম) বিক্রেতার ক্ষমতা প্রদানের কারণে সম্পন্ন হয়েছে।

শোফার অধিকার সংশ্লিষ্ট বাড়ীর ক্ষেত্রে ক্রেতার ব্যবহারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এখানে উভয় হকের প্রতিটি হচ্ছে বান্দার হক, যা শরীয়ত সম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। আর তা শোফার অধিকারীর পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়নি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি মদের বা শূকরের বিনিময়ে কোন গোলাম ক্রয় করে অতঃপর কবজা করে তাকে আযাদ করে বা বিক্রি করে বা দান করত: অর্পণ করে দেয় তাহলে তা জায়িয হবে। আর তার উপর গোলামের বাজার মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

কেননা আমরা বলে এসেছি যে, কবজার মাধ্যমে ক্রেতা তার মালিকানা লাভ করেছে। সুতরাং তার ব্যবহারসমূহ কার্যকর হবে। আর আযাদ করার মাধ্যমে গোলাম 'হালাক' হয়ে গেছে (অর্থাৎ দাসসত্তা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে) সুতরাং তার উপর গোলামের বাজার মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

আর বর্ণিত হয়েছে যে, বিক্রির কারণে এবং হেবার কারণে বিক্রেতার ফেরত চাওয়ার অধিকার রহিত হয়ে গেছে।

কেতাবাত চুক্তি এবং রেহেন চুক্তি বিক্রয় চুক্তির অনুরূপ। কেননা তা অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে যায় এতে মুকাতাবের অপারগতা হেতু এবং রেহেন, ছাড়ানো হলে ফেরত চাওয়ার অধিকার প্রত্যাবর্তন করবে; -বাধা দূরীভূত হওয়ার কারণে।

আর (ফেরত চাওয়ার অধিকার রহিত হওয়ার) এই বিষয়টি থেকে ইজারা চুক্তি ভিন্ন। কেননা ইজারা চুক্তি বিভিন্ন ওজরবশত রহিত হয়। আর ফাসাদ দূরীকরণও ওজর।

তাছাড়া ইজারা চুক্তিটি পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে সংঘটিত হয়ে থাকে।[১] সুতরাং ফেরত প্রদানের অর্থ হবে (চুক্তি বলবত করা থেকে) বিরত থাকা।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ফাসিদ বিক্রয়-এর ক্ষেত্রে বিক্রেতার বিক্রীত বস্তু ফেরত নেওয়ার অধিকার বিক্রেতার নেই, যতক্ষণ না সে মূল্য ফেরত দেয়।

কেননা বিক্রীত দ্রব্যটি মূল্যের মোকাবেলায় রয়েছে। সুতরাং মূল্যের কারণে তা আবদ্ধ থাকবে, যেমন রেহেনের ক্ষেত্রে।

আর যদি বিক্রেতা মারা যায় তাহলে মূল্য উত্তোলন করা পর্যন্ত ক্রেতাই বিক্রীত দ্রব্যের অধিক হকদার হবে। কেননা বিক্রেতার জীবদ্দশায় তাকে তার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশান ও পাওনাদারদের উপর তার অগ্রাধিকার থাকবে। যেমন বন্ধককারীর অগ্রাধিকার থাকে।

আর মূল্যরূপে পরিশোধকৃত দিরহামগুলো যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে স্বয়ং সেগুলোই গ্রহণ করবে, কেননা বিশুদ্ধতম মতে ফাসিদ বিক্রয়-এ মুদ্রা নির্দিষ্ট করার পর নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কেননা তা غصب বা জবর দখলের সম পর্যায়ভুক্ত। আর যদি দিরহামগুলো বহাল না থাকে তাহলে আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে সেগুলোর সমপরিমাণ দিরহাম গ্রহণ করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি ফাসিদ বিক্রয়রূপে কোন বাড়ী বিক্রি করে আর ক্রেতা তাতে ভবন তৈরি করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ক্রেতার উপর ঐ বাড়ীর বাজার মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাঁর নিকট থেকে 'জামে ছাগীর' কিতাবে এটা বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনার উপর তিনি পরে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ছাহেবায়ন বলেন, ভবন ভেংগে বাড়ি ফেরত দিতে হবে।

রোপণকৃত বৃক্ষের ব্যাপারে একই মতপার্থক্য।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, শোফার দাবীদারের হক বিক্রেতার হকের চেয়ে দুর্বল। একারণেই হক্কে শোফার ক্ষেত্রে আদালতের আদেশের প্রয়োজন হয় এবং বিলম্বের কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। আর বিক্রেতার অধিকার এর বিপরীত।

এখন কথা এই যে, দুই 'হক'-এর মধ্যে যেটি দুর্বলতম সেটি ভবন তৈরীর কারণে বাতিল হয় না। সুতরাং সবলটি না হওয়া আরো স্বাভাবিক।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, ভবন ও রোপিত বৃক্ষ এমন জিনিস যেগুলোর স্থায়িত্ব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর তা বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং ফেরত চাওয়ার ক্ষমতা রহিত হবে। যেমন বিক্রয়ের বিষয়টি।

শোফার দাবীদারের অধিকারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদান সাব্যস্ত হয়নি। এ জন্যই ক্রেতার হেবা করার কারণে এবং বিক্রি করার কারণে তা বাতিল হয় না। সুতরাং তার ভবন তৈরী করার কারণেও তা বাতিল হবে না।

---

১. অর্থাৎ ইজারা চুক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে বস্তু থেকে লাভ ও সুবিধা ভোগ। স্বয়ং বস্তুটি চুক্তির ক্ষেত্র নয়। আর লাভ ও সুবিধা সময়ের সাথে সাথে একটু একটু করে অস্তিত্ব লাভ করতে থাকে। সুতরাং চুক্তিটি যখন রদ করা হবে তখন সেটা চুক্তি নাকচ করা বলে গণ্য হবে না। বরং পরবর্তীতে সৃষ্ট সুবিধার ক্ষেত্রে চুক্তির অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এই বর্ণনাটি ইমাম আবু হানীফা (র) হতে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) শোফা পর্বে ইমাম ও তার সাথীদ্বয়ের মাঝে এ বিষয়ে মতপার্থক্য স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। কেননা শোফা এর হক সাব্যস্ত হওয়ার ভিত্তি হলো ভবন তৈরির কারণে বিক্রেতার হক রহিত হওয়ার উপর। অথচ শোফার হক সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি ফাসিদ বিক্রয়রূপে কোন দাসী ক্রয় করে এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে কবজা করে দেয়, তারপর ক্রেতা দাসীকে বিক্রি করে মুনাফা লাভ করে তাহলে মুনাফা সাদাকা করে দেবে। (প্রথম) বিক্রেতা মূল্য থেকে যে লাভ পায় তা তার জন্য হালাল হবে।

পার্থক্যের কারণ এই যে, বিক্রয় চুক্তিতে দাসী নির্ধারিত হয়ে যায়। সুতরাং চুক্তিদ্বয় স্বয়ং দাসীর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ফলে অবৈধতা মুনাফার মধ্যে স্থিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যেহেতু চুক্তিগুলোতে দিরহাম ও দীনার নির্ধারিত করলেও নির্ধারিত হয় না সেহেতু দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটি স্বয়ং (ঐ) দেরহামও দীনারের সাথে সম্পৃক্ত হয়না। সুতরাং অবৈধতা মুনাফার মধ্যে স্থিত হবে না। সুতরাং তা সাদাকা করা ওয়াজিব নয়।

(নির্ধারিত হওয়া এবং নির্ধারিত না হওয়ার সূত্র ধরে এই যে, পার্থক্য) এটা হলো ঐ অবৈধতার ক্ষেত্রে যার হেতু হচ্ছে মালিকানার সৃষ্ট ফাসাদ।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে যে অবৈধতার হেতু হলো মালিকানা না থাকা, সে অবৈধতা উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা যে বস্তু নির্ধারিত করার কারণে নির্ধারিত হয়ে যায়, তার সাথে চুক্তির সম্পর্ক হয় প্রকৃত অবৈধতার ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে যে বস্তু নির্ধারিত করার পরও নির্ধারিত হয় না, তার সাথে চুক্তির সম্পর্ক হয় অবৈধতার সন্দেহের ভিত্তিতে। অর্থাৎ এ হিসাবে যে, তার সাথে বিক্রীত দ্রব্যের সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট থাকে। কিংবা তা দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয়। (অর্থাৎ ঐ দিরহামগুলো দেখানোর মাধ্যমে মূল্যের পরিমাণ শুধু নির্ধারিত হয়। এরপর অন্য দিরহাম দ্বারাও মূল্য পরিশোধ করা যায়।)

আর (মালিকানা হীনতার কারণে যেখানে প্রকৃত মন্দত্ব ছিলো) মালিকানা ফাসিদ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত অবৈধতার মধ্যে সন্দেহ এসে যায়। পক্ষান্তরে অবৈধতার সন্দেহ নেমে আসবে সন্দেহের মধ্যে সন্দেহের উপর। আর (বিষয় এর নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে) অবৈধতার সন্দেহটিই শুধু বিবেচ্য। সন্দেহের মধ্যে সন্দেহের পর্যায়ে যেটি নেমে এসেছে সেটি নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তদ্রূপ যদি কেউ অন্যের বিরুদ্ধে মাল (দিহরাম বা দিনার) পায় বলে দাবী করে আর সে তা পরিশোধ করে দেয়, এরপর উভয়ে এ বিষয়ে একমত হয় যে, আসলে তার কাছে কিছুই পাওনা ছিলো না। অথচ দাবীদার (এরই মাঝে) ঐ দিরহাম (বা দিনার) দ্বারা মুনাফা লাভ করেছে; তাহলে ঐ মুনাফা তার জন্য হালাল হবে।

কেননা এখানে (মুনাফার মধ্যে) অপবিত্রতা এসেছে (দিরহামের) মালিকানার ফাসাদের কারণে। কারণ একজন দাবীদারের দাবীর কারণে ঋণ ওয়াজিব হয়েছে। এরপর পরস্পরের স্বীকৃতির কারণে ঐ ঋণের হকদার সাব্যস্ত হয়েছে। আর যে ঋণের হকদার বের হয়ে আসে তার বদল রূপে পরিশোধকৃত দিরহাম মালিকানাধীন হয়ে থাকে। সুতরাং যে বস্তু নির্ধারিত করলেও (শরীয়তের দৃষ্টিতে) নির্ধারিত হয় না: এই অপবিত্রতা তাতে কার্যকর হবে না।

এমন ক্রয় বিক্রয় যা মাকরূহ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 'নাজাশ' থেকে নিষেধ করেছেন।

নাজাশ অর্থ ক্রয় করার ইচ্ছা ছাড়া শুধু অন্যকে প্ররোচিত করার জন্য মূল্য বাড়িয়ে বলা। নবী (সা) বলেছেন, لا تناجشوا -তোমরা-নাজাশ (ধোঁকাবাজী) করো না।

ইমাম কুদূরী বলেন, আর (নিষেধ করেছেন) অন্যের দামের উপর দাম লাগান থেকে।

নবী (সা) বলেছেন :

لا يستام الرجل على سوم أخيه ولايخطب على خطبة أخيه -

কোন লোক যেন তার ভাইয়ের দাম বলার উপর দাম না করে। আর তার ভাইয়ের বিবাহ প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

আর এ জন্য যে, এতে অন্যের মনে কষ্ট দেওয়া এবং ক্ষতি করার দিক রয়েছে। আর (মাকরূহ হওয়ার) এই বিধান হবে দরাদরির ঐ পর্যায়ে, যখন চুক্তিকারী উভয় পক্ষ একটা নির্ধারিত মূল্যের উপর একমত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যতক্ষণ একজন অপর জনের প্রতি ঝুঁকে না পড়বে ততক্ষণ এটা হবে সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট বিক্রি করা। আর এতে কোন দোষ নেই, যা আমরা পরে উল্লেখ করবো।

আর যে ব্যাখ্যা আমরা উল্লেখ করেছি, বিবাহের ব্যাপারেও নিষিদ্ধতার ক্ষেত্র হল এপর্যায়ে পৌছার পর। **ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর তিনি নিষেধ করেছেন, শহরের বাইরে থেকে আগত পণ্য অগ্রসর হয়ে ক্রয় করা থেকে।**

আর এটা হল তখন যখন শহরবাসীরা এ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে শহরবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হলে তাতে কোন দোষ নেই।

তবে যদি পণ্য নিয়ে আগন্তুকদের নিকট বাজার মূল্যের ব্যাপারে প্রতারণা করে তাহলে মাকরূহ হবে। কেননা এতে ধোঁকা ও ক্ষতির দিক রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর (নিষেধ করেছেন) শহুরেদের (বিশেষভাবে) গ্রামীনদের কাছে বিক্রি করা থেকে।

নবী (সা) বলেছেন, لا يبيع الحاضر للبادى -শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর কাছে বিক্রি না করে। এটা ঐ সময়, যখন শহরবাসী দুর্ভিক্ষ ও পণ্য সংকটে থাকে। অথচ সে উচ্চমূল্যের লোভে সহজ সরল গ্রাম্যদের কাছে বিক্রি করে। কেননা এতে শহরবাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। আর যদি অবস্থা এমন না হয় তাহলে ক্ষতির দিক না থাকায় তাতে কোন দোষ নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর (নিষেধ করলেন) জুমার আযানের সময় ক্রয় বিক্রয় থেকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন - وَذَرُوا الْبَيْعَ —তোমরা বিক্রয় বন্ধ করো। তাছাড়া এতে ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব 'জুমা' ব্যাহত হয়। আর এক্ষেত্রে কোন্ আযান বিবেচ্য, তা আমরা সালাত পূর্বে (জুমা অধ্যায়ে) আলোচনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন,এ সব বিক্রি মাকরূহ সে সকল কারণে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু এতে বিক্রি ফাসিদ হবে না।

কেননা এখানে ফাসাদ এসেছে অতিরিক্ত বহির্ভূত কারণে। বিক্রয় মূল চুক্তির বৈধতার শর্তসমূহে নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সর্বোচ্চ ডাকে বিক্রয়ে কোন দোষ নেই। এর ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত রয়েছে যে, নবী (সা) একটি পেয়ালা ও একটি চট সর্বোচ্চ দরের শর্তে বিক্রি করেছেন। তাছাড়া এটা হলো গরীবদের জন্য সুবিধাজনক বিক্রি এবং এর প্রয়োজন রয়েছে।

মাকরূহ বিক্রয়ের বিশেষ প্রকার

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি এমন নাবালক দুই গোলামের মালিক হয়, যার মধ্যে একজন অন্যজনের মাহরাম হয়; তাহলে তাদের বিচ্ছিন্ন করা হবে না। অদ্রূপ যদি তাদের একজন বড় হয়। এ বিষয়ে মূল দলীল হলো নবী (সা)-এর বাণী :

من فرق بين والدة و والدها فرق الله بينه و بين أحبتة يوم القيمة –

যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার ও তার বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবেন।

আর বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) হযরত আলী (রা)-কে নাবালক দুই সহোদর গোলাম দান করেছিলেন। পরে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, গোলাম দু'টির কি অবস্থা? তিনি বললেন, তাদের একটি বিক্রি করে দিয়েছি। তখন নবী (সা) বললেন, ফিরিয়ে আনো ফিরিয়ে আনো।

তাছাড়া এই জন্য যে, ছোট বালক অন্য ছোট বালকের এবং মানুষের সান্নিধ্য থেকে স্বস্তি লাভ করে। আর বড় তাকে দেখাশুনা করতে পারে। সুতরাং দু'জনের একজনকে বিক্রি করার অর্থ হলো আন্তরিক সংগ নষ্ট করা এবং দেখা-শোনায় বাধা সৃষ্টি করা। তাছাড়া তাতে ছোটদের প্রতি দয়াহীনতা হয়। আর এ বিষয়ে সতর্ক বাণী রয়েছে। আর বিবাহ হারামকারী আত্মীয়তাকে নিষেধাজ্ঞার কারণ গণ্য করা হয়েছে যাতে অনাত্মীয় মাহরাম (যেমন সৎ পিতা) এবং গায়ের মাহরাম আত্মীয় (যেমন চাচাত ভাই) এর অন্তর্ভুক্ত না হয়। আর স্বামী স্ত্রী ও- এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাই তাদেরকে আলাদা (বিক্রি) করা জায়িয হবে। কেননা আলোচ্য হাদীসটি কিয়াসের বিপরীত।

সুতরাং তা হাদীসের ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর (নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার জন্য) উভয়ে তার মালিকানা থাকা আবশ্যক। এর কারণ আমরা পূর্বে বলেছি। সুতরাং ছোট দুই গোলামের একজন যদি তার মালিকানাধীন আর অন্যটি অন্যের মালিকানাধীন হয়। তাহলে দুজনের একজনকে বিক্রি করায় অসুবিধা নেই।

আর যদি কোন হকদারের হকের কারণে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহলে কোন দোষ নেই। যেমন কৃত অপরাধের কারণে দুজনের একজনকে সমর্পণ করা কিংবা ঋণের কারণে একজনকে বিক্রি করা এবং দোষের কারণে একজনকে ফেরত দেওয়া। কেননা এখানে লক্ষ্য হলো অন্যের ক্ষতি রোধ করা। গোলামটির ক্ষতি করা নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি বিচ্ছিন্ন করে দেয় তবে এটি তার জন্য মাকরূহ হবে। কিন্তু বিক্রয় চুক্তি বৈধ হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, জন্ম সূত্রের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ মা বাবা এবং ভাই বোনের ক্ষেত্রে) বিক্রয় চুক্তি বৈধ হবে না। অন্যান্য আত্মীয়তার ক্ষেত্রে বৈধ হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত অন্য এক মতে কোন ক্ষেত্রেই বিক্রয় চুক্তি বৈধ হবে না ঐ হাদীসের কারণে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর ফিরিয়ে আনার আদেশ ফাসিদ বিক্রয় ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে হতে পারে না।

তারফায়নের দলীল এই যে, বিক্রয় চুক্তির মূল বিষয় ইজাব ও কবুল উপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথোপযুক্ত পাত্রে সংঘটিত হয়েছে। আর কারহাত এসেছে পার্শ্ব কারণে। সুতরাং এটা একজনের দামদর করার পর আরেক জনের দামদর করার মকরুহ হওয়ার সদৃশ্য হলো।

আর উভয়ে যদি বয়স্ক হয় তাহলে বিচ্ছিন্ন করাতে কোন দোষ নেই।

কেননা যে বিষয়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

তাছাড়া বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) মারিয়া ও সীরীনকে পৃথক করে ছিলেন। অথচ তারা সহোদরা দাসী ছিলেন।

পরিচ্ছেদ ঃ ইকালাহ

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথম মূল্যের অনুরূপ মূল্যে চুক্তি প্রত্যাহার করা জায়িয রয়েছে।

কেননা নবী (সা) বলেছেন—

من أقال نادماً بيعته أقال الله عثراته يوم القيمة

কেউ যদি অনুতপ্ত ব্যক্তির বিক্রয় (বা ক্রয়) চুক্তি প্রত্যাহার করে,তবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার পদস্খলনগুলো থেকে অবাহতি দান করবেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, চুক্তি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পক্ষ দ্বয়ের অধিকার। সুতরাং নিজেদের প্রয়োজনে তারা তা প্রত্যাহার করার ও অধিকার রাখে।

যদি প্রথমোক্ত মূল্যের চেয়ে অধিক বা কম -এর শর্ত আরোপ করে তাহলে শর্ত বাতিল হবে আর বিক্রেতা প্রথমোক্ত মূল্যের অনুরূপ মূল্যই ফেরত দেবে।

এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের দিক থেকে ইকালা এর অর্থ হবে বিক্রয় রহিতকরণ। পক্ষান্তরে তৃতীয় কোন ব্যক্তির বিচারে তা হবে নতুন বিক্রয় চুক্তি। তবে যদি এটাকে রহিতকরণ ধরা সম্ভব না হয় তাহলে ইকালা বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এটা বিক্রয় তবে (উদ্ধৃত করার কারণে) যদি বিক্রয় সাব্যস্ত করা সম্ভব না হয় তখন সেটাকে বিক্রয় রহিতকরণ সাব্যস্ত করা হবে। আর যদি রহিতকরণও সাব্যস্ত করা সম্ভব না হয় তখন তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এটা হলো বিক্রয় রহিতকরণ; তবে যদি রহিতকরণ সাব্যস্ত করা সম্ভব না হয় তাহলে সেটাকে বিক্রয় ধরা হবে। কিন্তু যদি বিক্রয় সাব্যস্ত করাও সম্ভব না হয়, তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলীল এই যে, ইকালাহ শব্দটি আভিধানিকভাবে 'রহিতকরণ' ও 'দূরীকরণ' অর্থের জন্য নির্ধারিত। এখান থেকেই (দু'আতে)বলা হয় اقلني عثرتي —আমার পদাস্খলন ক্ষমা কর বা দূর কর। সুতরাং শব্দের প্রতি তার 'অর্থ চাহিদা' পূরণ করতে হবে। আর যদি তা অসম্ভব হয় তাহলে তাকে তার সম্ভাব্য অর্থের উপর প্রযুক্ত করতে হবে। আর তার সম্ভাব্য অর্থ হলো বিক্রয়। দেখুন না তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা বিক্রয় রূপে গণ্য হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, (গুণগত দিক থেকে) এখানে হচ্ছে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মালের পরিবর্তে মাল গ্রহণ। আর এটাই হলো বিক্রয় চুক্তির সংজ্ঞা। একারণেই (ক্রেতার দখলে থাকাকালে) বিক্রীত পণ্য নষ্ট হয়ে গেলে ইকালাহ্ বাতিল হয়ে যায় এবং দোষের কারণে পণ্যটি (ক্রেতার কাছে) ফেরত দেওয়া যায় আবার এ চুক্তিতে 'শোফা' অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর এ সবই হচ্ছে বিক্রয় সংশ্লিষ্ট বিধান।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, শব্দটি 'রহিতকরণ' ও 'দূরীকরণ' এর অর্থ বুঝায়, যেমন আমরা বলে এসেছি। আর নীতি হলো শব্দকে তার প্রকৃত চাহিদায় প্রয়োগ করা।

আর ইকালাহ্ শব্দটি সূচনা থেকে বিক্রয় চুক্তি অর্থের সম্ভাবনা রাখে না; যাতে রহিতকরণ অর্থে প্রয়োগ অসম্ভব হওয়ার সময় সে অর্থে প্রয়োগ করা যায়। কেননা বিক্রয় চুক্তি হচ্ছে রহিতকরণের বিপরীত আর কোন শব্দ তার বিপরীত অর্থের সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং (রহিতকরণের অর্থ আরম্ভ হওয়ার সময়) ইকালাহ বাতিল হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে গেলো।

আর তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় রূপে বিবেচ্য হওয়ার জবাব এই যে, তা বিধানগত অনিবার্য বিষয়। কেননা ইকালা দ্বারা বিক্রয়ের অনুরূপ বিধান তথা মালিকানা সাব্যস্ত হয়। এটা শব্দের অর্থের চাহিদা নয়।[১]

কেননা চুক্তির পক্ষদ্বয়ের অন্য কারো উপর কোন অধিকার নেই। এই মূলনীতি যখন সাব্যস্ত হলো তখন আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি (প্রথমোক্ত মূল্যের চেয়ে) বেশী মূল্যের শর্ত আরোপ করে তাহলে প্রথমোক্ত মূল্যের উপরই ইকালা হবে। কেননা অতিরিক্ত মূল্যের উপর পূর্ববর্তী বিক্রয়কে রহিত করা সম্ভব নয়। কারণ যা সাব্যস্তই ছিলো না তাকে দূরীভূত করা অসম্ভব। সুতরাং (অতিরিক্ত মূল্যের) শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। ফাসিদ (বা অগ্রহণযোগ্য) শর্ত আরোপের কারণে ইকালা বাতিল হয় না। বিক্রয় চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিক্রয় চুক্তিতে অতিরিক্ত মূল্য যোগ করা সম্ভব। ফলে 'রিবা' অস্তিত্ব লাভ করে কিন্তু রহিতকরণের (তথা ইকালার) ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

(পূর্বোক্ত মূল্য থেকে) কম মূল্য শর্ত করার ক্ষেত্রে একই বিধান হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। তবে যদি (ক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায়) বিক্রীত দ্রব্যে কোন দোষ দেখা দেয়, তখন (প্রথমোক্ত মূল্যের চেয়ে) কম মূল্যে ইকালাহ করা জায়িয হবে। কেননা তখন হ্রাসকৃত অংশটাকে দোষের কারণে খোয়া যাওয়া অংশের বিপরীতে বিবেচনা করা হবে।

আর সাহবায়নের মতে অতিরিক্ত মূল্যের শর্ত আরোপ করার ক্ষেত্রে ইকালাটি বিক্রয় গণ্য হবে। কেননা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে মূলত: ইকালা হচ্ছে বিক্রয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে (যদিও ইকালা এর মূল হচ্ছে পূর্ববর্তী ক্রিয়াকে রহিতকরণ, কিন্তু অতিরিক্ত মূল্যের শর্ত আরোপ করার ক্ষেত্রে এটাকে পূর্ববর্তী বিক্রয় রহিতকরণ বিবেচন করা সম্ভব নয়। তবে) এটাকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা সম্ভব। সুতরাং যখন সে অতিরিক্ত মূল্যের শর্ত আরোপ করেছে তখন এর মাধ্যমে সে ইকালাহ শব্দ দ্বারা বিক্রয়কেই উদ্দেশ্য করেছে।

তদ্রূপ ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে (প্রথমোক্ত মূল্যের চেয়ে) কম মূল্যের শর্ত আরোপের ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। কেননা তার মতে বিক্রয়ই হচ্ছে ইকালাহ্ এর মূল অর্থ।

---

১. কেননা بيع শব্দটিকে নির্ধারণ করা হয়েছে উদ্দেশ্যেগতভাবে ক্রেতার মলিকানা সাব্যস্ত করার জন্য। আর বিক্রেতার মালিকানা রহিত হওয়া এর অনিবার্য ফল। পক্ষান্তরে اقالة শব্দটিকে নির্ধারণ করা হয়েছে ক্রেতার মালিকানা রহিত করার জন্য আর তার অনিবার্য ফল হচ্ছে বিক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। সুতরাং بيع ও اقالة উভয়টি দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আর শব্দের মূল অর্থ চুক্তির পক্ষদ্বয়ের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা নিজেদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে। আর তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে শব্দের অনিবার্য ফলটি বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা অন্যের উপর তো তাদের অধিকার নেই। অথচ তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটাকে বিক্রয় রহিতকরণ বিবেচনা করার অর্থ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এটা হবে প্রথমোক্ত মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় রহিতকরণ। কেননা এখানে প্রথমোক্ত মূল্যের অংশবিশেষ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্ব করা হয়েছে। অথচ পণ্য মূল্য সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেও যদি ইকালাহ করে তাহলে সেটা বিক্রয় রহিতকরণ বলেই বিবেচিত হয়। সুতরাং এটা তো আরো স্বাভাবিকভাবেই বিক্রয় রহিতকরণ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু অতিরিক্ত মূল্যের শর্ত আরোপ করার বিষয়টি ভিন্ন। আর যদি তাতে দোষ দেখা দেয়, তাহলে তা কম মূল্যে বিক্রয় রহিতকরণ বলে গণ্য হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি।

আর যদি প্রথমোক্ত মূল্যের ভিন্ন শ্রেণীর কোন জিনিসের বিনিময়ে ইকালাহ হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এটা প্রথমোক্ত মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় রহিতকরণ বলে গণ্য হবে। আর অন্য শ্রেণীর জিনিসটির উল্লেখ 'অহেতুক' সাব্যস্ত করা হবে।

আর ছাহেবায়নের মতে এটা বিক্রয় বিবেচিত হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি।

বিক্রীত দাসী বা পশু যদি সন্তান প্রসব করে এরপর উভয় পক্ষ ইকালা করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ইকালা বাতিল। কেননা প্রসবকৃত সন্তানটি বিক্রয় রহিতকরণের প্রতিবন্ধক।

আর ছাহেবায়নের মতে এটা বিক্রয় বলে বিবেচিত হবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার দ্রব্যের ক্ষেত্রে কবজার পূর্বে ইকালা করা হলে সেটাকে বিক্রয় রহিতকরণ বলে গণ্য করা হবে।

অস্থাবর দ্রব্যের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতেও তাই হবে। কেননা (অস্থাবর দ্রব্যের ক্ষেত্রে দখলের পূর্বে) বিক্রয় সাব্যস্ত করা অসম্ভব। আর ভূমির ক্ষেত্রে, তাঁর মতে, বিক্রয় বলে গণ্য হবে। কেননা যেহেতু তার মতে কবজার পূর্বে ভূমি বিক্রি করা বৈধ, সেহেতু তার মতে এটা বিক্রয় বলে গণ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মূল্য হালাক হয়ে যাওয়া ইকালাহর বৈধতাকে বাধাগ্রস্ত করে না। পক্ষান্তরে বিক্রীত দ্রব্য হালাক হয়ে যাওয়া ইকালাকে বাধাগ্রস্ত করে।

কেননা বিক্রয় চুক্তির প্রত্যাহার বিক্রয়ের বিদ্যমানতা দাবী করে। আর তা বিক্রীত দ্রব্য দ্বারা বিদ্যমান থাকে, মূল্য দ্বারা নয়।

আর যদি বিক্রীত দ্রব্যের অংশ বিশেষ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অবশিষ্টের ক্ষেত্রে ইকালাহ্ বৈধ হবে।

কেননা ঐ অংশের ক্ষেত্রে বিক্রয় বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি উভয় পক্ষ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয় করে থাকে তাহলে দুটির যে কোন একটি হালাক হওয়ার পরেও ইকালাহ বৈধ হবে। আর দুটির একটি হালাক হওয়ার পর ইকালাহ্ বাতিল হবে না। কেননা দুটি বস্তুর প্রতিটি বিক্রীত দ্রব্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন। সুতরাং একটি দ্রব্য নষ্ট হওয়ার পরও বিক্রয় বিদ্যমান থাকবে। সঠিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ বায় মুরাবাহা ও তাওলিয়া

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'মুরাবাহা' হল প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে জিনিসটির মালিকানা লাভ করেছে সেটাকে অতিরিক্ত লাভসহ প্রথম মূল্যের উপর হস্তান্তর করা; আর 'তাওলিয়া' হল প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে জিনিসটির মালিকানা লাভ করেছে, সেটাকে অতিরিক্ত লাভ ছাড়া প্রথম মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করা।

আর উভয় প্রকার বিক্রয়ই বৈধ; কেননা এতে বৈধ হওয়ার যাবতীয় শর্ত সমবেত হয়েছে। আর এ ধরনের বিক্রয়ের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। কেননা ব্যবসা বুঝে না এমন নির্বোধ ব্যক্তি বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্মের উপর ভরসা করার প্রয়োজন বোধ করে এবং সে যে মূল্য দ্বারা খরিদ করেছে, সেও তার সদৃশ মূল্যে কিংবা অতিরিক্ত লাভের বিনিময়ে বিক্রি করেছে বলে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারে। সুতরাং এদুটোর বৈধতার হুকুম দেওয়া অনিবার্য। আর (নির্ভরতার) এই প্রয়োজনের কারণেই উক্ত বিক্রয় দুটির ভিত্তি হলো আমানতদারির উপর এবং খিয়ানতও খিয়ানতের সন্দেহ থেকে বিরত থাকার উপর।

আর বিশুদ্ধ রূপে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) যখন হিজরতের এরাদা করলেন, সে সময় আবু বকর (রা) দুটি উট খরিদ করে রাখলেন। তখন নবী (সা) তাঁকে বললেন, দুটির একটিকে আমার কাছে তাওলিয়া রূপে (ক্রয় মূল্যে) বিক্রি করো। তখন আবু বকর (রা) বললেন, সেটা আপনার জন্য কোন বিনিময় ব্যতীত। তখন নবী (সা) বললেন, মূল্য ছাড়া তা আমি গ্রহণ করব না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বায় মুরাবাহ ও তাওলিয়া বিশুদ্ধ হবে না; তবে যদি মূল্য এমন জিনিসের অন্তর্ভুক্তি না হয়, যার সাদৃশ্য রয়েছে।

কেননা যখন বিনিময় দ্রব্যটির সাদৃশ্য থাকবেনা তখন দ্বিতীয় বিক্রয়ের সময় ক্রেতা যদি বিক্রীত দ্রব্যের মালিক হতে চায় তাহলে মূল্য এর বিনিময়ে মালিক হবে। আর তার প্রকৃত মূল্য অজ্ঞাত।

প্রথম ক্রেতা যদি এমন ব্যক্তির কাছে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করে, যে ব্যক্তি ঐ বিনিময় দ্রব্যটির মালিকানা লাভ করেছে। আর সে কিছু দিরহাম লাভের বিনিময়ে কিংবা নির্ধারিত পাত্র পরিমাপিত কোন জিনিস লাভের বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে ঐ বিক্রি বৈধ হবে।

কেননা সে যে দায় গ্রহণ করেছে, তা পুরা করতে সক্ষম।

আর যদি সে তা দশে ক্রীত বস্তু এগারো হিসেবে লাভে বিক্রি করে, তাহলে জায়িয হবে না।[১]

---

১. অর্থাৎ প্রথম বিক্রি চুক্তিতে মূল্য যদি দশ দিরহাম হয়ে থাকে তাহলে এখানে মুনাফা হবে এক দিরহাম, আর যদি বিশ দিরহাম হয়ে থাকে তাহলে মুনাফা দুই দিরহাম, ত্রিশ দিরহাম হলে মুনাফা হবে তিন দিরহাম, আর যদি বিশ দিরহাম হয়ে থাকে তাহলে মুনাফা দুই দিরহাম, ত্রিশ দিরহাম হলে মুনাফা হবে তিন দিরহাম ইত্যাদি। সুতরাং দশের এক উল্লেখ করার দাবী এই যে, মুনাফাটি মূল সদৃশভুক্ত হতে হবে। তা নাহলে 'বায়' জায়িয হবে না।

কেননা যেহেতু বিনিময় দ্রব্যটি সদৃশভুক্ত নয় সেহেতু সে মূল মূল্য এবং তার আংশিক মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রি করেছে।

আর মূল মূল্যের সাথে ধোবীর এবং কারুকাজকারীর এবং রং করাব ও পাড় তৈরি করার মজুরি আর খাদ্য দ্রব্য বহনের মজুরি যোগ করা জায়িয রয়েছে।

কেননা ব্যবসায়ীদের রীতিতে এই মজুরিগুলোকে মূলধনের সাথে যোগ করার প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে কোন জিনিস বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণে কিংবা তার মূল্যে বৃদ্ধি ঘটায়, সেটাকেই মূল ধনের সাথে যোগ করা হয়। এটাই হলো নীতি আর আমরা যেগুলো উল্লেখ করেছি সেগুলো এই গুণ সম্পন্ন। কেননা রং ও তার সমগোত্রীয় জিনিসগুলো বিক্রীত দ্রব্যের সত্তায় বৃদ্ধি ঘটায়। আর বহন করে আনা মূল্য বৃদ্ধি করে। কেননা স্থানের ভিন্নতা দ্বারা মূল্যের ভিন্নতা হয়ে থাকে।

তবে তাকে এভাবে বলতে হবে যে, আমার এত 'পড়তা' পড়েছে। এভাবে বলবে না যে, আমি এত দ্বারা খরিদ করেছি।

যাতে সে মিথ্যাবাদী না হয়ে যায়। আর বকরীকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া পণ্যদ্রব্যকে বহন করে আনার সমতুল্য। কিন্তু রাখালের মজুরি এবং হেফাজত করে রাখার ঘরের ভাড়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এতে সত্তাগতভাবে কিংবা মূল্যগতভাবে বৃদ্ধি ঘটেনা।

গোলামকে কাজ শেখানোর পারিশ্রমিকের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা গোলামের মাঝে বিদ্যমান দক্ষতাগুণের কারণেই তার মূল্য বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

মুরাবাহা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি বিক্রেতার পক্ষ হতে কোন খিয়ানতের ব্যাপারে অবগত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে সমগ্র মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। আর যদি ইচ্ছা করে তাহলে ছেড়ে দেবে।

পক্ষান্তরে যদি তাওলিয়া বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে খিয়ানত পরিমাণ অর্থ মূল্য থেকে বাদ দেবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই তা বাদ দেবে আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই তার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলীল এই যে, চুক্তিতে যে মূল্য উল্লেখ করা হবে, তাই বিবেচ্য। কেননা তা পরিজ্ঞাত (আর মূল্য পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।) পক্ষান্তরে 'তাওলিয়া' এবং মুরাবাহা এর উল্লেখ হয়ে থাকে মাল চালু করার এবং আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এটা হলো বিক্রয় দ্রব্যের একটি কাঙ্ক্ষিত গুণ। যেমন দোষমুক্ত হওয়ার গুণ। সুতরাং ঐ গুণের অনুপস্থিতিতে তাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, এখানে মুরাবাহা ও তাওলিয়া বিষয়টিই মূল। একারণেই তো প্রথম মূল্যটি যদি জানা থাকে তাহলে এধরনের কথায় চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে যে, প্রথম মূল্যের বিনিময়ে তোমার কাছে বিক্রি করলাম কিংবা

প্রথম মূল্যের বিনিময়ে তোমার কাছে মুরাবাহা রূপে বিক্রি করলাম . সুতরাং দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটাকে প্রথম চুক্তির ওপর ভিত্তি করা আবশ্যক। আর তা খিয়ানতকৃত অংশ বাদ দেয়ার মাধ্যমে সম্ভব। তবে তাওলিয়াতে শুধু মূল মূল্য থেকে খিয়ানত পরিমাণ অর্থ বাদ দেবে। আর মুরাবাহাতে মূল মূল্য থেকে ও মুনাফা থেকে বাদ দেবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, তাওলিয়া ক্ষেত্রে যদি উল্লেখিত অংশ বাদ না দেয়া হয় তাহলে গুণগতভাবে সেটা আর তাওলিয়া থাকে না। কেননা তা প্রথমোক্ত মূল্য থেকে বেড়ে যায়। সুতরাং সম্পাদিত কর্ম পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই সেই পরিমাণ বাদ দেওয়া নির্ধারিত হয়ে গেলো। পক্ষান্তরে মুরাবাহার ক্ষেত্রে বাদ না দেওয়া হলেও সেটা মুরাবাহা থাকবে; যদিও মুনাফার পরিমাণে তারতম্য ঘটে। সুতরাং তাতে সম্পাদিত কর্ম পরিবর্তিত হয় না। ফলে এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকার প্রদানের মত দেওয়া সম্ভব। আর যদি পণ্য ফেরত দেওয়ার পূর্বে তা নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা তাতে এমন কোন খুঁত দেখা দেয় যাতে বিক্রয় রহিতকরণ বাধাগ্রস্ত হয়, তবে জাহেরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী উল্লেখকৃত পূর্ণ মূল্যই ক্রেতার ওপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে। কেননা এটা ছিলো নিছক একটি ইচ্ছাধিকার যার বিপরীতে মূল্যের কোন অংশ সাব্যস্ত হয় না, যেমন দেখার ইচ্ছাধিকার এবং শর্তারোপের ইচ্ছাধিকার। দোষজনিত ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি ভিন্ন। (তাতে পূর্ণ মূল্য সাব্যস্ত হয় না, বরং দোষ পরিমাণ মূল্য বাদ যায়) কেননা দোষগত ইচ্ছাধিকার অর্থ হলো যা হাত ছাড়া হয়েছে তা দাবী করা। সুতরাং তা প্রদানে অপারগতার সময় তার বিপরীতে সাব্যস্ত মূল্য রহিত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন বস্ত্র ক্রয় করে অত:পর তা মুনাফার বিনিময়ে বিক্রি করে অত:পর তা ক্রয় করে এরপর যদি সে তা মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে চায় তাহলে দ্বিতীয় ক্রয়ের পূর্বে যদি কিছু মুনাফা ছিলো তা ক্রয়মূল্য থেকে বাদ দিয়ে হিসাব করবে। মুনাফার পরিমাণ যদি পূর্ণ মূল্যকে ধরে ফেলে তাহলে বস্ত্রকে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করতে পারবে না। এটা হলো ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর ছাহেবায়ন বলেন, শেষ মূল্যের উপর মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে।

মাসআলাটির রূপ এই যে, যদি একটি বস্ত্র দশ দিরহামে ক্রয় করে এবং পনের দিরহামে বিক্রয় করে অত:পর আবার দশ দিরহামে ক্রয় করে তাহলে মুরাবাহার ভিত্তিতে তা পাঁচ দিরহাম মূল্য ধরে বিক্রি করবে এবং বলবে যে, এতে আমার পাঁচ দিরহাম পড়েছে। আর যদি দশ দিরহামে ক্রয় করে বিশ দিরহামে বিক্রয় করে। এরপর তা দশ দিরহামে খরিদ করে নেয় তাহলে কোনভাবে সেটাকে সে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করতে পারবে না।

আর ছাহেবায়নের মতে উভয় ক্ষেত্রেই তা সে দশ দিরহাম মূল্যের ওপর মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করতে পারবে ।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটি একটি নতুন চুক্তি, যা বিধানগতভাবে প্রথম চুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং দ্বিতীয় বিক্রয়চুক্তির মূল্যের উপর মুরাবাহা বিক্রয়ের ভিত্তি করা বৈধ হবে। যেমন যদি তৃতীয় ব্যক্তি মধ্যবর্তী হয়।

**ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, (প্রথম চুক্তি দ্বারা অর্জিত মুনাফা দ্বিতীয় চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার সন্দেহ সাব্যস্ত রয়েছে। কেননা দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা প্রথম চুক্তির মুনাফা ছাড়া লাভ করে। অথচ (বিক্রীত দ্রব্যে) দোষ দেখা দেয়ার মাধ্যমে উক্ত মুনাফা হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনার মুখে ছিলো। আর সতর্কতার কারণে মুরাবাহা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুনাফার সন্দেহকে প্রকৃত মুনাফার সমতুল্য ধরা হয়েছে। এ কারণেই সমঝোতার ভিত্তিতে[১] যা অর্জন করা হয়, সেটাতে মুরাবাহা জায়িয হয় না।[১] কেননা এক্ষেত্রে মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং (প্রথম ক্ষেত্রে) বিষয়টা এমন হবে, যেন (দ্বিতীয় চুক্তিতে সে) পাঁচ দিরহাম ও একটি বস্ত্র দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলো। সুতরাং তাকে পাঁচ দিরহাম বাদ দিতে হবে।[২]

আর তৃতীয় ব্যক্তি মধ্যবর্তী হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে তো অন্যের কর্ম (চুক্তি সম্পাদন) দ্বারাই মুনাফা নিশ্চিত হয়ে গেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি দশ দিরহামের কোন বস্ত্র ক্রয় করে আর সে এমন ঋণে দায়গ্রস্ত হয়, যা তার দাস সত্তার মূল্যকে বেষ্টন করে ফেলে। এমতাবস্থায় যদি সে মনিবের কাছে ঐ বস্ত্র পনের দিরহামে বিক্রয় করে তাহলে মনিব দশ দিরহাম মূল্যের উপর মুরাবাহার ভিত্তিতে তা বিক্রি করতে পারবে।

একই বিধান হবে যদি মনিব (দশ দিরহামে) ক্রয় করে গোলামের নিকট পনের দিরহামে বিক্রয় করে।

কেননা (গোলাম ও মনিবের) এই বিক্রয় চুক্তিতে বৈধ না হওয়ার সন্দেহ রয়েছে। কেননা (ঋণের বিদ্যমানতার কারণে চুক্তির বৈধতার) প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও চুক্তিটি জায়িয রাখা হয়েছে। (প্রতিবন্ধক হলো এই বিষয়টি যে, গোলাম তো মনিবের মালিকানাধীন) সুতরাং মুরাবাহার বিধানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চুক্তিটাকে অস্তিত্বহীন গণ্য করা হবে শুধু প্রথম চুক্তিটির বিবেচ্য থাকবে। সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়টা এমন হবে যেন গোলাম মনিবের জন্য তা দশ দিরহামে ক্রয় করেছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এমন হবে যেন সে মনিবের অনুকূলে বিক্রি করছে; সুতরাং প্রথম বিক্রয় মূল্যই বিবেচ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, অর্ধেক লাভের শর্তে মুদারাবা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তির কাছে যদি দশ দিরহাম থাকে আর সে দশ দিরহামে একটি কাপড় খরিদ করে এরপর মূলদাতার নিকট পনের দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রি করে তাহলে মূলধনদাতা সাড়ে বার দিরহামের উপর মুদারাবা ভিত্তিতে বিক্রয় করতে পারবে।

কারণ এই যে, (মুদারাবা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক মূলধনদাতার নিকট) এই বিক্রয়, মুনাফার অবিদ্যমানতার সময় যদিও আমাদের মতে বৈধ বলে বিবেচিত-ইমাম যোফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। অথচ মূলধনদাতা নিজের মালের বিনিময়ে নিজের মাল খরিদ করেছে। কেননা মূলধনদাতার এই ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবহারের অধিকার লাভ

---

১. যেমন যায়দ আমরের কাছে দশ দিরহাম ঋণ পেতো। এখন সে আমরের সাথে সমঝোতা করে দশ দিরহামের পরিবর্তে একটি বস্ত্র গ্রহণ করলো, তো এ কাপড়টি দশ দিরহাম মূল্যের উপর মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে না।

২. পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঐ বস্ত্র এবং দশ দিরহাম দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলো, তাহলে দশ দিরহামের বিনিময়ে দশ দিরহাম হলো, আর কাপড়ের বিপরীতে কিছু থাকলো না। সুতরাং মুরাবাহার ভিত্তিতে তা বিক্রি করতে পারবে না।

করেছে, আর এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। আর চুক্তির সম্পন্নতা অর্জিত ফায়দার অনুবর্তী হয়, তাতে বিক্রয়ের অনুপস্থিতির সন্দেহ রয়েছে। কেননা মুদারা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি প্রথম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক হিসাবে মূলধনদাতার ওয়াকীল সুতরাং অর্ধেক মুনাফার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিক্রয়টাকে অস্তিত্বহীন বিবেচনা করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন দাসী খরিদ করে আর সে কানা হয়ে যায় কিংবা অকুমারী অবস্থায় তার সাথে সহবাস করে তাহলে এই দোষ বর্ণনা না করেই মুরাবাহার ভিত্তিতে তাকে বিক্রি করতে পারে।

কেননা ক্রেতার কাছে এমন কিছু আটক নেই, যার বিপরীতে মূল্যের কোন অংশ সাব্যস্ত হয়। কেননা গুণাবলী হচ্ছে সত্তার অনুবর্তী বিষয়, যার বিপরীতে মূল্যের কোন অংশ সাব্যস্ত হয় না। (আর মূলসত্তা তো বিদ্যমান রয়েছে।) একারণেই দাসীকে সমর্পণের পূর্বে যদি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায় তাতে মূল্যের কোন অংশ রহিত হয় না। তদ্রূপ সংগম সুবিধার বিপরীতেও মূল্যের কোন অংশ সাব্যস্ত হয় না।

এই বিধান হলো ঐ ক্ষেত্রে, যখন সংগম দ্বারা দাসী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। প্রথম ক্ষেত্রে (অর্থাৎ একচক্ষু নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে) আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, বর্ণনা না করে বিক্রি করা যাবে না। যেমন তার নিজের কর্ম দ্বারা যদি কোন বস্তু নষ্ট হয়। ইমাম শাফেয়ী (র)-এরও এই মত।

আর সে নিজে যদি দাসীর চক্ষু ফুঁড়ে দেয়। কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি যদি তার চক্ষু ফুঁড়ে দেয় আর সে তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে বর্ণনা না করে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে না।

কেননা নষ্ট করার মাধ্যমে গুণটি এখানে উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং তার বিপরীতে মূল্যের অংশ বিশেষ সাব্যস্ত হবে। তদ্রূপ যদি কুমারী অবস্থায় তার সাথে সহবাস করে। কেননা সতিত্ব-পর্দা হলো সত্তার অংশ, যার বিপরীতে মূল্যের অংশ বিশেষ সাব্যস্ত হয়। আর সে (স্বেচ্ছাকৃত কর্ম দ্বারা) তা নষ্ট করেছে।

আর যদি সে কোন কাপড় খরিদ করে আর তা ইঁদুরের কর্তন দ্বারা কিংবা আগুনে পোড়া দ্বারা 'দুষ্ট' হয়ে পড়ে তাহলে তা বর্ণনা না করেও মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে। আর যদি তার খোলা ও ভাঁজকরা কারণে তাতে ভাংগাপড়ে যায় তাহলে বর্ণনা করা ছাড়া বিক্রি করতে পারবে না।

(দুটো ক্ষেত্রে পার্থক্যের) কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। **ইমাম মুহাম্মদ (র)বলেন, কেউ যদি এক হাজার দিরহাম বাকিতে কোন গোলাম খরিদ করে অতঃপর তা বর্ণনা না করে একশ দিরহাম মুনাফার শর্তে তা বিক্রি করে আর ক্রেতা পরে বিষয়টি জানতে পারে, তাহলে ইচ্ছা করলে সে তা ফেরত দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে গ্রহণও করতে পারে।**

কেননা বিক্রীত দ্রব্যের সাথে মেয়াদ এর সাদৃশ্য রয়েছে। তাই তো মেয়াদের কারণে মূল্যে বৃদ্ধি ঘটে। আর মুরবাহা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও সন্দেহকেও মূল বিষয়ের সাথে যুক্ত করা হয়। সুতরাং বিষয়টা এমন হলো যেন সে দুটি জিনিস খরিদ করেছে আর উভয়ের মূল্যের বিনিময়ে একটিকে মুরাবাহা রূপে বিক্রি করেছে। আর মুরাবাহা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের খিয়ানত থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক। সুতরাং যখন তা প্রকাশ পেয়ে গেলো তখন তাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। যেমন কোন দোষ প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে।

আর যদি ক্রেতা ঐ বিক্রীত পণ্যকে শেষ করে ফেলে (বিক্রয়ের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন ভাবে) এরপর বিষয়টি জানতে পারে তাহলে এক হাজার ও একশ দিরহামের বিনিময়ে বস্তুটি গ্রহণ করা তার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। কেননা (প্রকৃত পক্ষে) মেয়াদ এর বিপরীতে মূল্যের কোন অংশ সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আর যদি সে তার কাছে তা তাওলিয়ার ভিত্তিতে বিক্রি করে আর বিষয়টি বর্ণনা না করে তাহলে ক্রেতা ইচ্ছা করলে তা ফেরত দিতে পারে।

কেননা (মুরাবাহার ন্যায়) তাওলিয়ার ভিত্তি যেহেতু প্রথম মূল্যের ওপর, সেহেতু তাওলিয়ার ক্ষেত্রে খিয়ানত মুরাবাহার ক্ষেত্রে খিয়ানতের অনুরূপ।

আর যদি ক্রেতা, বিক্রীত দ্রব্য নষ্ট করে দেয়, এরপর খিয়ানত সম্পর্কে অবহিত হয় তাহলে নগদ এক হাজারের বিনিময়ে দ্রব্যটি গ্রহণ করা তার জন্য আবশ্যক হবে।

এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ক্রেতা বস্তুটির বাজার মূল্য ফেরত দেবে এবং (বিক্রেতার নিকট থেকে) পূর্ণ মূল্য ফেরত নেবে।

এই বিধানটি ঐ বিধানের অনুরূপ যখন উৎকৃষ্ট মুদ্রার স্থলে অতিরিক্ত খাদ মিশ্রিত মুদ্রা গ্রহণ করে আর খরচ করার পর বিষয়টি জানতে পারে। ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে তোমার কাছে এ বিষয়ের বর্ণনা আসবে। আর কোন কোন মতে বস্তুটিতে নগদ মূল্য এবং বাকী মূল্য ধার্য করা হবে এবং মধ্যবর্তী অতিরিক্ত মূল্য সে ফেরত নেবে।

আর যদি বিক্রয় চুক্তিতে মেয়াদের শর্ত না থাকে বরং প্রচলিত রীতি হিসাবে কিস্তি করা হয়ে থাকে, তাহলে কোন কোন মতে তা বর্ণনা করা আবশ্যক। কেননা যা প্রচলিত তা শর্তকৃত এর ন্যায়।

আর কোন কোন মতে বর্ণনা করা ছাড়াই বিক্রি করতে পারবে। কেননা (আইনত:) মূল্য নগদ হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কারো কাছে কোন জিনিস যা পড়তায় পড়ে তার বিনিময়ে তাওলিয়া করে আর ক্রেতার জানা না থাকে যে, কত পড়তা পড়েছে তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে, মূল্য অজ্ঞাত হওয়ার কারণে।

এরপর যদি বিক্রয় চুক্তির মজলিসে বিক্রেতা তাকে মূল্যের পরিমাণ জানিয়ে দেয় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে তা গ্রহণ করবে। আর ইচ্ছা করলে তা বর্জন করবে।

কেননা (মজলিস পরিবর্তিত না হওয়ার কারণে) ফাসাদ এখনো স্থিত হয়নি। সুতরাং মজলিসের মধ্যেই যখন অবগতি লাভ হয়ে যাবে তখন সেটাকে চুক্তির শুরুতে অবগতি লাভের সমতুল্য বিবেচনা করা হবে, আর বিষয়টা প্রস্তাব গ্রহণকে মজলিসের শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত করার মত হবে।

আর মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পর ফাসাদ ও নষ্টতা স্থিত হয়ে যায়। তখন তা আর কোন সংশোধন গ্রহণ করবে না। এর সদৃশ বিষয় হলো মূল্য চিহ্ন ভিত্তিতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করা, যদি সে মজলিসেই মূল্যচিহ্নের মর্ম অবহিত হয়, তবে সে ইচ্ছাধিকার লাভ করবে এ জন্য যে, মূল্যের পরিমাণ জানার পূর্বে সম্মতি পূর্ণতা লাভ করেনি। কাজেই সে ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। যেমন পণ্য দেখার ইচ্ছাধিকারের ক্ষেত্রে।

যে ব্যক্তি স্থানান্তরযোগ্য ও অস্থাবর কোন দ্রব্য ক্রয় করে তা কবজা করার পূর্বে তার জন্য তা বিক্রয় করা জায়িয হবে না।

কেননা যা কবজা করা হয়নি, তা বিক্রি করতে নবী (সা) নিষেধ করেছেন। তা ছাড়া (প্রথম বিক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায়) হালাক হওয়ার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় তাতে (দ্বিতীয়) চুক্তিটি বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে

ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে কব্জা করার পূর্বে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা জায়িয রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তা জায়িয নেই।

এটা তিনি বলেন, হাদীসের নিঃশর্ততার দিকে লক্ষ্য করে এবং অস্থাবর দ্রব্যের ওপর কিয়াস করে। এটা স্থাবর সম্পত্তি ইজারা দেয়ার মত হলো।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, বিক্রয় চুক্তির মূল স্তম্ভ (তথা ইজাব ও কবুল) যথাযোগ্য ব্যক্তির পক্ষ হতে যথাযোগ্য পাত্রের ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়েছে আর তাতে (চুক্তি বাতিল হওয়ার) ঝুঁকি নেই। কেননা স্থাবর সম্পত্তি হালাক হওয়া বিরল। অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়টি ভিন্ন (তাতে ঝুঁকি বিরল নয়।)

আর যে ঝুঁকি হাদীসে নিষিদ্ধ হয়েছে, তা হলো চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি। আর চুক্তির বৈধতার দলীল সমূহের উপর আমল করার ভিত্তিতে আলোচ্য হাদীসকে বাতিল হওয়ার ঝুঁকি থাকার কারণের ওপর প্রয়োগ করা হবে।

আর ইজারা সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, কোন কোন মতে এটাও বিরোধপূর্ণ। আর যদি ইজারা বৈধ না হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া হয় তাহলে বক্তব্য এই যে, ইজারার ক্ষেত্রে চুক্তির বিষয় হলো মুনাফা লাভ করা; আর তা নষ্ট হয়ে যাওয়া বিরল নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি পাত্র পরিমাপিত কোন বস্তু পাত্র দ্বারা পরিমাপের শর্তে ক্রয় করে কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপিত কোন বস্তু ওজন দ্বারা পরিমাণ করার শর্তে ক্রয় করে অত:পর পাত্র দ্বারা পরিমাপ করে নেয় কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপ করে নেয় এপর সে ঐ বস্তুকে পাত্র দ্বারা পরিমাপ করার কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপ করার শর্তে বিক্রি করে তাহলে (দ্বিতীয়) ক্রেতার জন্য তা বিক্রি করা কিংবা খাওয়া জায়িয হবে না; যতক্ষণ না সে পুনরায় সেটাকে পাত্র দ্বারা কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপ করে নেয়।

কেননা নবী (সা) খাদ্য দ্রব্য দুইবার পরিমাপ কার্যকর না করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। একবার বিক্রেতার পরিমাপ আরেকবার ক্রেতার পরিমাপ।

তাছাড়া এই কারণে যে, শর্তকৃত পরিমাণের অতিরিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা বিক্রেতার হক আর অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা হারাম। সুতরাং তা পরিহার করা ওয়াজিব।

পক্ষান্তরে অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এক্ষেত্রে (কল্পিত) অতিরিক্ত পরিমাণ ক্রেতার হক। তদ্রূপ গজ দ্বারা পরিমাপ করার শর্তে কাপড় বিক্রি করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ ক্রেতার হয়ে থাকে। কারণ গজের পরিমাপ হলো কাপড়ের গুণগত বিষয়। পক্ষান্তরে ওজন ও পাত্র পরিমাপ হলো বস্তুর সত্তাভুক্ত বিষয়। আর বিক্রয়ের পূর্বে বিক্রেতার পরিমাপ বিবেচ্য নয়; যদিও তা ক্রেতার উপস্থিতিতেই হয়ে থাকে। কেননা সেটাতো বিক্রেতা ও ক্রেতার পরিমাপ নয়। অথচ এটাই হল (হাদীস অনুযায়ী)। তদ্রূপ (দ্বিতীয়) বিক্রয়ের পর ক্রেতার অনুপস্থিতিতে বিক্রেতার পরিমাপ বিবেচ্য নয়।

কেননা পরিমাপ হচ্ছে বিক্রীত দ্রব্য সমর্পণের অন্তর্ভুক্ত কাজ। কারণ পরিমাপ দ্বারাই বিক্রীত দ্রব্য পরিজ্ঞাত হয়। আর ক্রেতার উপস্থিতি ছাড়া সমর্পণ সম্পন্ন হতে পারে না।

আর বিক্রেতা যদি বিক্রয়ের পর ক্রেতার উপস্থিতিতে পরিমাপ করে তাহলে কোন কোন মতে হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ বিবেচনায় তা যথেষ্ট হতে হবে না। কেননা হাদীসে দুটি পরিমাপের কথা বিবেচনায় আনা হয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে,তা যথেষ্ট হবে। কেননা একই মাপ দ্বারা বিক্রীত বস্তুটি পরিজ্ঞাত হয়ে গেছে। আর সমর্পণের বিষয়টিও সাব্যস্ত হয়েছে। আর আলোচ্য হাদীসের প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে দুই চুক্তির সমাবেশ, যা আমরা 'সালাম' অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ আলোচনা করবো।

আর গণনা নির্ভর জিনিস যদি গণনা করার শর্তে বিক্রি করা হয় তাহলে সেটা ছাহেবায়ন থেকে বর্ণিত মতে গজ দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর শ্রেণীভুক্ত হবে। কেননা এটা 'রিবা' ভুক্ত মাল নয়।

আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এটা ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর শ্রেণীভুক্ত হবে। কেননা শর্তকৃত সংখ্যায় অতিরিক্তটা তার জন্য হালাল হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কবজার মূল্যের মাঝে তাসাররুফ করা জায়িয।

কেননা, ব্যবহারের বৈধতা দানকারী অর্থাৎ মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে আর তাতে হালাল হওয়ার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল হওয়ার ঝুঁকি নেই। কেননা তা নির্ধারণের পরও নির্ধারিত হয় না। কিন্তু বিক্রীত দ্রব্যের বিষয়টি ভিন্ন। (কেননা তা নির্ধারণের পর নির্ধারিত হয়ে যায়)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ক্রেতা বিক্রেতার অনুকূলে মূল্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে। তদ্রূপ বিক্রেতা ক্রেতার অনুকূলে বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার মূল্যের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। তবে সমগ্র পরিমাণের সাথেই হকের প্রাপ্যতার সম্পর্ক হবে।

অর্থাৎ আমাদের মতে হ্রাস-বৃদ্ধি দুটোই মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর ইমাম যোফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে (মূল চুক্তির সাথে) সম্পৃক্ততার দিক থেকে তা বৈধ হবে না। অবশ্য নতুন দান হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে।

তাদের দলীল এই যে, অতিরিক্ত অংশটাকে মূল্য রূপে বিশুদ্ধ করা সম্ভব নয়, কেননা তাতে তার মালিকানার জিনিস তার মালিকানার জিনিসের বিনিময়ে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সেটা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত হতে পারে না। হ্রাস করার বিষয়টিও অনুরূপ। কেননা সমগ্র মূল্য সমগ্র বিক্রীত দ্রব্যের বিপরীতে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন মূল্যের কিছু অংশকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। (কেননা তাতে বিক্রীত দ্রব্যের কিছু অংশ মূল্য বিহীন হয়ে পড়বে।) সুতরাং অতিরিক্ত বা হ্রাসকৃত অংশটুকু নতুন দান হবে।

আমাদের দলীল এই যে, তারা দুজন বর্ধিতকরণ বা হ্রাসকরণের মাধ্যমে চুক্তিকে একটি অনুমোদিত গুণ থেকে আরেকটি অনুমোদিত গুণের দিকে পরিবর্তিত করছে, আর অনুমোদিত গুণ হচ্ছে চুক্তিটি লাভজনক হওয়া বা লোকসানপূর্ণ হওয়া বা লাভ লোকসান মুক্ত হওয়া। আর তাদের তো (ইকালাহ্ এর মাধ্যমে) চুক্তিটিকে প্রত্যাহার করারই অধিকার রয়েছে। সুতরাং আরো স্বাভাবিকভাবেই চুক্তির গুণ পরিবর্তনের অধিকার থাকবে। বিষয়টি এমন হলো যেন চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর তারা দুজন ইখ্তিয়ার রহিত করলো কিংবা ইখ্তিয়ারের শর্ত আরোপ করলো।

আর যখন বর্ধিতকরণ বা হ্রাসকরণ বৈধ হলো তখন সেটা মূল চুক্তির সাথেই যুক্ত হবে। কেননা কোন 'কিছুর' গুণ ঐ 'কিছুর' সাথে সম্পৃক্ত হবে, আপন সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

সমগ্র মূল্যকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো মূল চুক্তিকে (বিক্রয় থেকে দানে) পরিবর্তন করা; চুক্তির গুণকে পরিবর্তন করা নয়, সুতরাং সেটা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত হবে না।

আর যুক্ত হওয়ার দিক থেকে বর্ধিত অংশটুকু তার নিজের মালিকানার বিনিময়ে হবে না। (কেননা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে চুক্তির সময় তা বিদ্যমান বলে গণ্য হয়ে যাবে)।

আর মূল চুক্তির সাথে সংযুক্তির বিধান তাওলিয়া ও মুরাবাহার ক্ষেত্রেও প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে সমগ্র মূল্যের তাওলিয়া বা মুরাবাহা করা বৈধ হবে। আর হ্রাস করার ক্ষেত্রে অবশিষ্ট মূল্যের ওপর তাওলিয়া বা মুরাবাহার বিক্রয় সম্পন্ন করবে।

শোফা-এর ক্ষেত্রে তার ফলাফল প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ হ্রাস করার ক্ষেত্রে অবশিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে সে শোফা দাবী করতে পারবে। তবে শোফার অধিকারী ব্যক্তি বর্ধিত মূল্য ছাড়াই শোফা গ্রহণ করতে পারে। কেননা বর্ধিত মূল্যের দ্বারা তার সাব্যস্ত হক বাতিল করা হয়। সুতরাং বিক্রেতা ও ক্রেতা সে অধিকার পাবে না।

আর যাহিরে রিওয়ায়েত অনুযায়ী বিক্রীত দ্রব্য হালাক হওয়ার পর মূল্য বর্ধিতকরণ বৈধ হবে না। কেননা বিক্রীত দ্রব্য এমন অবস্থায় নেই, যার বিনিময় সাব্যস্ত হতে পারে। অথচ কোন জিনিস আগে সাব্যস্ত হয় তারপর তা সম্পৃক্ত হয়। হ্রাসকরণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিক্রীত দ্রব্য এখন এমন অবস্থায় আছে যে, তার বিপরীতে সাব্যস্ত বিনিময় সরিয়ে নেয়া যায়। সুতরাং হ্রাসকরণ মূল চুক্তির সময়ের সাথে সম্পৃক্ত রূপে মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি নগদ মূল্যে কিছু বিক্রি করে অত:পর মূল্যকে নির্ধারিত মেয়াদে মেয়াদী করে তাহলে তা মেয়াদী হয়ে যাবে।

কেননা মূল্য হচ্ছে তার প্রাপ্য হক। সুতরাং যার উপর এই হক সাব্যস্ত হয়েছে, তার প্রতি সহজ করার জন্য তার হক বিলম্বিত করতে পারে। দেখুন না, সে তো প্রতিপক্ষকে মূল্যের দায় থেকে পূর্ণ অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। সুতরাং সাময়িক অব্যাহতিও প্রদান করতে পারবে।

আর যদি সে অজ্ঞাত মেয়াদে মেয়াদী করে আর অজ্ঞতাটা বেশী মাত্রায় হয়, যেমন মৌসুমী বায়ু চলার সময় পর্যন্ত (কিংবা বৃষ্টির মৌসুম পর্যন্ত) তাহলে তা জায়িয হবে না। আর যদি অজ্ঞতাটা সল্প মাত্রায় হয়, যেমন ফসল কাটার বা মাড়াই করার সময় পর্যন্ত, তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা এটা হলো যামানতের সমপর্যায় ভুক্ত। আর ইতিপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি (যে, সল্প মাত্রার অজ্ঞতা তাতে সহনীয়।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে কোন নগদ আর্থিক দায়কে প্রাপক যদি মেয়াদ করে দেয় সেটা আমাদের বর্ণিত কারণে মেয়াদী হয়ে যাবে। ঋণ এর ব্যতিক্রম।

ঋণকে মেয়াদীকরণ বৈধ নয়। কেননা এর সূচনাই হয়েছে আরিয়াত ও দান (عارية ও صلة) এ কারণে عارية শব্দে তা বৈধ হয়। আর যে দান করার অধিকারী নয়, সে ঋণ দানেরও অধিকারী নয়। যেমন অছী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। কিন্তু সমাপ্তি পর্বে তা হয়ে যায় বিনিময় (কেননা হুবহু বস্তুটি ফেরত দেয়া হয় না)। সুতরাং সূচনা পর্বের বিবেচনায় মেয়াদীকরণ তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। যেমন আরিয়াতের ক্ষেত্রে। কেননা দানের ব্যাপারে 'জবর' চলে না। পক্ষান্তরে সমাপ্তি পর্বের বিবেচনায় মেয়াদীকরণ বৈধ নয়। কারণ সেটা হয়ে যায় বাকিতে দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা। আর তা হচ্ছে 'রিবা'। পক্ষান্তরে যদি এমন অছিয়ত করে যে,তার সম্পদ থেকে অমুককে যেন এক বছরের জন্য এক হাজার দিরহাম করয দেয়া হয়। তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে উক্ত লোককে ঋণ দেয়া ওয়ারিছদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং মেয়াদের পূর্বে তাগাদাও করতে পারবে না। কেননা এটা হলো দানের অছিয়ত। গোলামের সেবা এবং বাড়ীতে বসবাস সম্পর্কিত অছিয়তের মত। সুতরাং অছিয়তকারীর প্রাপ্য হক হিসাবে তা বাধ্যতামূলক হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ রিবা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, রিবা হারাম করে দেওয়া হয়েছে সেসব বস্তুর মধ্যে যখন এগুলো পাত্র পরিমাপিত এবং ওজন পরিমাপিত বস্তুর বিনিময়ে কম-বেশী করে বিক্রি করা হয়। তখন তাতে রিবা হারাম হয়।

সুতরাং আমাদের মতে রিবা হারাম হওয়ার কারণ হলো পাত্র পরিমাপ ও সম শ্রেণী হওয়ার কিংবা ওজন পরিমাপ ও সমশ্রেণী হওয়া আবার (দুটোকে এক সাথে) বলা হয় পরিমাপ ও সমশ্রেণীতা। আর এটা অধিকতর সর্বাঙ্গীন (পরিমাপ ও সমশ্রেণীতা রিবার হেতু হওয়ার ক্ষেত্রে) প্রমাণ হলো প্রসিদ্ধ হাদীস, যাতে নবী (সা) বলেছেন,

الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل دابوا

এখানে নবী (সা) ছয়টি দ্রব্য যথা গম, যব, খেজুর, লবণ, সোনা ও রূপাকে এই ধারায় উল্লেখ করেছেন। مثل ও مثلا শব্দটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটির বাক্যরূপ হলো بيع التمر مثل بمثل (খেজুর বিক্রি সমশ্রেণীর বিনিময়ে হবে।) আর দ্বিতীয়টির বাক্যরূপ হলো بيعوا التمر مثلا بمثل (তোমরা খেজুরকে সমশ্রেণীর বিনিময়ে বিক্রি করো।) সকল মুজতাহিদের সর্বসম্মতিক্রমে আলোচ্য হাদীসের হুকুমটি কারণ সম্বলিত।

তবে আমাদের মতে কারণ সেটিই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে কারণ হলো খাদ্যদ্রব্য গুলোতে খাদ্য যোগ্যতা আর মূল্য দ্রব্য দুটিতে কারণ হল মূল্যযোগ্যতা। আর সমশ্রেণীতা হলো রিবা হারাম হওয়ার শর্ত। আর উভয় দ্রব্যের সমতা হলো রিবা মুক্ততার উপায়।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে (সুদী মালের মধ্যে) মূল অবস্থা হলো হারাম হওয়া। কেননা নবী (সা) দুটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যথা, নগদ লেনদেন ও সমতা আর প্রতিটি শর্ত বস্তুগুলোর গুরুত্ব প্রকাশ করে। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষীর শর্তারোপ (সম্ভোগ অংগের বিশেষ-মর্যাদা প্রকাশ করে)। সুতরাং রিবা হারাম হওয়ার বিষয়টিতে এমন কারণ আবিষ্কার করা উচিত, যা গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের উপযোগী হয়। আর খাদ্য দ্রব্যগুলোর ক্ষেত্রে সেই কারণটি হচ্ছে খাদ্য যোগ্যতা। কেননা তা দ্বারাই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা পায়। আর মূল্য দ্রব্য দ্বয়ের ক্ষেত্রে সেই কারণ হচ্ছে মূল্যযোগ্যতা। কেননা মূল্যযোগ্যতা দ্বারাই মাল সম্পদরূপে টিকে আছে। যার ওপর মানবের যাবতীয় কল্যাণ নির্ভর করে।

মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে সমশ্রেণীতার কোন ভূমিকা নেই। সেহেতু সমশ্রেণীতাকে আমরা শর্তরূপে গ্রহণ করেছি।

আর ক্ষেত্র বিশেষে বিধান শর্তের সাথেও আবর্তিত হয়। আমাদের দলীল এই যে, আলোচ্য হাদীসে (ছয়টি দ্রব্যের) বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমতাকে শর্তরূপে সাব্যস্ত করা

হয়েছে। আর সেটাই হলো হাদীসের ভাষ্যের উদ্দেশ্য, যাতে বিক্রয়ের প্রকৃত অর্থ কার্যকর হয়। কেনন বিক্রয় পরস্পর আদান প্রদানের অর্থ বহন করে। আর পরস্পর আদান প্রদান সাব্যস্ত হবে উভয় বস্তুর সমতার মাধ্যমে। কিংবা উদ্দেশ্য হল যাতে মানুষের মাল নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। কিংবা উদ্দেশ্য হল যাতে বিক্রীত দ্রব্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে বিক্রয় চুক্তির ফায়দা ও উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে।[১]

সুতরাং সমতা না থাকা অবস্থায় রিবা হারাম হওয়া অনিবার্য হবে। আর দুটি দ্রব্যের মাঝে সমতা সাব্যস্ত হয় দৃশ্যগত দিক থেকে এবং গুণগত দিক থেকে। আবার পরিমাণ দুটি দ্রব্যের সত্তাকে সমতা দান করে। পক্ষান্তরে সমশ্রেণীতা দুটি বস্তুর মাঝে গুণগত সমতা দান করে। আর এই সমতার ওপরই অতিরিক্ত প্রকাশ পাবে এবং রিবা সাব্যস্ত হবে। কেননা রিবা অর্থই হলো সেই বিনিময় বিহীন অতিরিক্ত দ্রব্য, যা বিনিময়কালে চুক্তিতে শর্তকৃত পক্ষদ্বয়ের একজন প্রাপ্ত হয়।

আর গুণ বিবেচ্য নয়। কেননা লোক প্রচলনে এটাকে তারতম্য রূপে গণ্য করা হয় না। কিংবা কারণ এই যে, এটা বিবেচনায় আনার অর্থ হলো ক্রয়-বিক্রয়ের পথ বন্ধ করে দেওয়া। কিংবা কারণ এই যে,নবী (সা) বলেছেন, جيدها ورديها سواء (তার উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমান)।

আর খাদ্য যোগ্যতা ও মূল্য যোগ্যতা হচ্ছে (দ্রব্যটি থেকে) উপকার গ্রহণের অন্যতম প্রধান দিক। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উদারতা প্রদর্শনই হলো সংগত। কেননা এ বিষয়ে প্রয়োজন সুতীব্র। এক্ষেত্রে সংকোচন সংগত নয়। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র) যা বলেছেন তা বিবেচ্য নয়।

এটা যখন সাব্যস্ত হলো তখন আমাদের বক্তব্য এই যে, পাত্র পরিমাপিত বস্তুকে কিংবা ওজন পরিমাপিত বস্তুকে যখন সমশ্রেণীর বিনিময়ে সমতার সাথে বিক্রয় করা হবে, তখন বৈধতার শর্ত বিদ্যমান থাকার কারণে তাতে বিক্রয় বৈধ হবে। আর বৈধতার শর্ত হলো পরিমাণগত (ও শ্রেণীগত) সমতা। একারণেই তো مثلا بمثل এর পরিবর্তে কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে كيلا بكيل তদ্রূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে وزنا بوزن ।

---

১. যেমন এক কিলো গম এবং এক কিলো যব দৃশ্যত ও সত্তাগতভাবে সমতাপূর্ণ অর্থাৎ পরিমাণ দুটি দ্রব্যের মাঝে দৃশ্যত ও সত্তাগত সমতা প্রদান করেছে। কিন্তু গুণগতভাবে উভয়ের মাঝে সমতা নেই। পক্ষান্তরে এক কিলো গম এবং এক কিলো গম এই দুই দ্রব্যের মাঝে সত্তাগত সমতা যেমন রয়েছে, তেমনি গুণগত সমতা রয়েছে।

২. সার কথা এই যে, আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য হলো রিবাভুক্ত দ্রব্যগুলোর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমতা আবশ্যকতা শর্ত সাব্যস্ত করা। আর সমতা বিধানের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও সমশ্রেণীতাই প্রভাবক ভূমিকা রাখে। কেননা পরিমাণ দ্বারা দৃশ্যত ও সত্তাগত সমতা সাব্যস্ত হয়। আর সমশ্রেণীতা দ্বারা গুণগত ও মূল্যগত সমতা সাব্যস্ত হয়। একারণে এদুটি গুণকে 'রিবা'এর হেতু সাব্যস্ত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে খাদ্য যোগ্যতা ও মূল্য যোগ্যতা দুটি দ্রব্যের মাঝে সমতা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখে না। একারণে একটি গুণকে 'রিবা'এর হেতু বিবেচনা করা গ্রহণ যোগ্য নয়।

আর যদি একটি দ্রব্য অন্যটির চেয়ে অতিরিক্ত হয় তাহলে বিক্রি বৈধ হবে না, রিবা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে।

আর রিবাভুক্ত দ্রব্যগুলো উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্টের বিনিময়ে সমানে সমানে ছাড়া বিক্রি করা জায়িয হবে না। কেননা (উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার) গুণের ক্ষেত্রে তারতম্য ধর্তব্য নয়।

আর দুই অঞ্জলির বিনিময়ে এক অঞ্জলি এবং দুটি আপেলের বিনিময়ে একটি আপেল বিক্রি করা জায়িয রয়েছে।

কেননা সমতা সাব্যস্ত হয় পরিমাপ দ্বারা আর এখানে পরিমাপ পাওয়া যায়নি। সুতরাং অতিরক্তিতাও সাব্যস্ত হয়নি। একারণেই নষ্ট করে ফেলার ক্ষেত্রে বাজার মূল্য দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে যেহেতু রিবার কারণ হচ্ছে খাদ্য যোগ্যতা আর রিবা হারাম হওয়া থেকে নিকৃষ্টতর উপায় হল সমতা। আর তা এখানে বিদ্যমান নেই। সুতরাং এই বিক্রয় হারাম হবে। 'অর্ধ ছা'এর নীচে যা তা অঞ্জলির হুকুমভুক্ত হবে। কেননা শরীয়াতে এর নীচে কোন পরিমাপ নেই।

আর যদি পাত্র পরিমাপিত কিংবা ওজন পরিমাপিত অখাদ্য দ্রব্য সমশ্রেণীর বিনিময়ে কমবেশী করে বিক্রি করে, যেমন চুনা ও লোহা; তাহলে পরিমাপ ও সমশ্রেণীতা বিদ্যমান হওয়ার কারণে আমাদের মতে তা জায়িয হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে তা জায়িয হবে। কেননা খাদ্য যোগ্যতা ও মূল্যযোগ্যতার কারণ বিদ্যমান নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি দুটিগুণ তথা সমশ্রেণীতা এবং তার সাথে যুক্ত গুণ (যেমন পরিমাপ) অবিদ্যমান হয় তাহলে কমবেশী করে বিক্রি করা এবং বাকিতে বিক্রি করা জায়িয হবে।

কেননা রিবা হারামকারী কারণ বিদ্যমান নেই। আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৈধতাই হলো মূল অবস্থা। আর যদি উভয় গুণ বিদ্যমান থাকে তাহলে কমবেশী করে বিক্রয় এবং বাকিতে বিক্রয় হারাম হবে। কেননা হারামকারী কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

আর যদি দুটি গুণের একটি বিদ্যমান থাকে এবং অন্যটি অবিদ্যমান থাকে তাহলে কম-বেশী করে বিক্রি জায়িয হবে। কিন্তু বাকিতে বিক্রি জায়িয হবে না। যেমন দাদনে একটি হারাবী কাপড়ের বিনিময়ে একটি হারাবী কাপড় বিক্রি করলো। কিংবা দাদনে যবের বিনিময়ে গম বিক্রি করলো।

মোট কথা কম-বেশীর রিবা হারাম হবে দুটি গুণের বিদ্যমানতার দ্বারা, আর দাদন বিক্রি হারাম হবে দুটির যে কোন একটি গুণের বিদ্যমানতা দ্বারা। আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সমশ্রেণীতা এককভাবে দাদন বিক্রিকে হারাম করবে না।

কেননা একদিকে বস্তুটি নগদ হওয়া এবং অপরদিকে বস্তুটি নগদ না হওয়া শুধু অতিরিক্ততার সন্দেহ সাব্যস্ত করে (প্রকৃত অতিরিক্ততা সাব্যস্ত করে না।) অথচ এক্ষেত্রে প্রকৃত অতিরিক্ততাও প্রতিবন্ধক নয়। তাই একটি কাপড়কে দুটি কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়িয রয়েছে। সুতরাং অতিরিক্ততার সন্দেহ আরো স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবন্ধক হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, পরিমাপ বা সমশ্রেণীতার দিকে লক্ষ্য করলে এক বিচারে এটা রিবাভুক্ত মাল ও আর 'নগদ' হওয়া সম্পদ অতিরিক্ততা সাব্যস্ত করে। ফলে রিবা এর সন্দেহ সাব্যস্ত হবে। আর প্রকৃত রিবার ন্যায় রিবা এর সন্দেহ বৈধতার প্রতিবন্ধক। তবে কেউ যদি জাফরানের বা এজাতীয় কিছুর বিনিময়ে মুদ্রা দাদন করে তাহলে তা বৈধ হবে। যদিও উভয়টি ওজন পরিমাপিত। কেননা ওজনের প্রকৃতিতে এ দুটি এক প্রকার নয়। কারণ জাফরান পরিমাপ করা হয় গ্রাম ও কেজি হিসেবে, আর মুদ্রা পরিমাপ করা হয় তুলাদণ্ড দ্বারা। তাছাড়া জাফরান হলো মূল্যায়িত দ্রব্য, যা নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুদ্রা হচ্ছে স্বয়ং মূল্য, যা নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত হয় না।

তাছাড়া কেউ যদি ওজন দ্বারা পরিমাপের শর্তে মুদ্রার বিনিময়ে জাফরান বিক্রি করে এবং উভয় নিজনিজ প্রাপ্য দ্রব্য কবজা করে, তাহলে (বিক্রেতার জন্য) ওজন করার পূর্বেই মুদ্রায় হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে। কিন্তু জাফরান ও এজাতীয় দ্রব্যে (ওজনের পূর্বে) হস্তক্ষেপ করা (ক্রেতার জন্য) বৈধ হবে না। সুতরাং দ্রব্যদ্বয়ের পরিমাপের ক্ষেত্রে যখন দৃশ্যতঃ গুণগত ও বিধানগত পার্থক্য বিদ্যমান, তখন ওজন পরিমাপের গুণ উভয় দ্রব্যকে সবদিক থেকে একত্র করবে না। ফলে ওজনগত ঐক্যের সন্দেহ এখানে সন্দেহের সন্দেহে পরিণত হবে। আর সন্দেহের সন্দেহ বিবেচ্য নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে পাত্র পরিমাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ততা হারাম হওয়ার কথা নবী (সা) স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন সেগুলো সর্বকালের জন্যই পাত্র পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। যদিও মানুষ তাতে পাত্র পরিমাপ পরিত্যাগ করে। যেমন—গম, যব, খেজুর ও লবণ, আর যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে ওজন পরিমাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ততা হারাম হওয়ার কথা নবী (সা) স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন, সেসব ওজন পরিমাপিত দ্রব্য বলেই গণ্য হবে। যদিও মানুষ তাতে ওজনের পরিমাপ পরিত্যাগ করে। যেমন—স্বর্ণ ও রৌপ্য।

কেননা শরীয়তের স্পষ্ট বাণী লোক প্রচলনের চেয়ে শক্তিশালী আর অধিকতর শক্তিশালীকে নিম্নস্তরের মোকাবেলায় পরিত্যাগ করা যায় না।

আর যে সকল দ্রব্য সম্পর্কে নবী (সা) সুস্পষ্ট কিছু উল্লেখ করেননি, সেগুলো লোক প্রচলনের ওপর প্রযুক্ত হবে।

কেননা লোক প্রচলন হুকুমের বৈধতা প্রমাণকারী। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নাছের (বা শরীয়তের স্পষ্ট বাণীর) বিপরীতেও তিনি প্রচলন বিবেচনা করেন। কেননা তখনকার প্রচলনের কারণেই 'নছ'-এ উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং প্রচলনই হলো মূল লক্ষণীয় বিষয়। আর প্রচলন পরিবর্তিত হতে পারে। এই ভিত্তিতে কেউ যদি ওজন পরিমাপের দ্বারা গমকে সমশ্রেণীর বিনিময়ে সমান পরিমাণে বিক্রি করে কিংবা স্বর্ণকে পাত্র পরিমাপের ভিত্তিতে সমশ্রেণীর বিনিময়ে সমান পরিমাণে বিক্রি করে তাহলে তারফায়নের মতে তা জায়িয হবে না, যদিও মানুষ তা প্রচলন করে নেয়।

কেননা এক্ষেত্রে যেটা শরীয়ত সম্মত পরিমাপ, তার ভিত্তিতে এখানে অতিরিক্ততার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন অনুমানের মাধ্যমে বিক্রি করার ক্ষেত্রে। তবে গম ইত্যাদির ক্ষেত্রে ওজনের পরিমাপের ভিত্তিতে দাদনে বিক্রি জায়িয হবে। কেননা পরিজ্ঞাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাদন করা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আর যে সকল জিনিসের পরিমাপ 'রতল' এর সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলো ওজন পরিমাপিত বলে গণ্য হবে।

অর্থাৎ যেগুলোকে 'উকিয়্যা' পাত্র দ্বারা পরিমাপণ করা হয়। কেননা ওজনের মাধ্যমেই এর পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং তা দ্বারা যা কিছু বিক্রি করা হবে সেটা ওজন পরিমাপিত বলে গণ্য হবে।

অন্য সকল পরিমাপক পাত্রের বিষয়টি ভিন্ন। যাই হোক, যখন কোন দ্রব্য ওজন পরিমাপিত বলে সাব্যস্ত হবে তখন যদি ঐ দ্রব্যকে ওজনগত পরিমাপ অজ্ঞাত কোন পাত্র দ্বারা পরিমাপ করে অনুরূপ পরিমাণ পাত্রের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তাহলে তা জায়িয হবে না। কেননা তাতে ওজনগতভাবে অতিরিক্ততার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন অনুমানের মাধ্যমে বিক্রির ক্ষেত্রে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, উভয় তরফে মুদ্রা দ্রব্যের ওপর যে বিক্রয় চুক্তি, তা হলো ছারফ চুক্তি। তাতে উভয় বিনিময় দ্রব্য মজলিসেই গ্রহণ করা জরুরী।

কেননা নবী (সা) বলেছেন, الفضة بالفضة هاء وهاء। -রূপার বিনিময়ে রূপা দস্তার বদলে দস্তা বিক্রি হবে।

এই শর্ত আরোপের তত্ত্ব 'ছারফ' অধ্যায়ে বর্ণনা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এছাড়া যে সকল রিবাভুক্ত দ্রব্য রয়েছে তাতে নির্ধারণ করা আবশ্যক; উভয় তরফের কবজা করা আবশ্যক নয়।

খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলীল এই যে, নবী (সা) সুপ্রসিদ্ধ হাদীসটিতে। يدًا بيد (দস্ত বা দস্ত) বলেছেন। তাছাড়া এই কারণ যে,যদি উভয় তরফে মজলিসে কবজা না হয়, তাহলে কবজা আগে-পিছে হবে। অথচ নগদে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং তাতে রিবা এর সন্দেহ সাব্যস্ত হবে।

আমাদের দলীল এই যে, (রোপ্য-স্বর্ণ ছাড়া) এগুলো হচ্ছে এমন বিক্রীত দ্রব্য যা নির্ধারণ করলে নির্ধারিত হয়। সুতরাং তাকে (নির্ধারিত উদ্দেশ্যে) কবজার শর্ত আরোপিত হবে না। যেমন কাপড়ের ক্ষেত্রে। এর কারণ এই যে, আসল উদ্দেশ্য তো হচ্ছে ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জিত হওয়া। আর নির্ধারণের দ্বারাই তা সম্পন্ন হয়।

'বায় ছারফ' (মুদ্রা বিনিময়ের) বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এতে কবজা এ জন্য জরুরী যাতে এ দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়।

আর নবী (সা)-এর বক্তব্য يدًا بيد এর অর্থ হলো নির্ধারিত বস্তুর বিনিময়ে নির্ধারিত বস্তু। যেমন ওবাদা বিন ছামিত বর্ণনা করেছেন।

আর লোক প্রচলনে কবজা করার আগ-পিছ হওয়া সম্পদের তারতম্য রূপে বিবেচ্য নয়। পক্ষান্তরে নগদ ও মেয়াদী এর বিষয়টি ভিন্ন। (সে ক্ষেত্রে সময়ের তারতম্যকে সম্পদত্বের তারতম্য রূপে বিবেচনা করা হয়)।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, দুটি ডিমের বিনিময়ে একটি ডিম,দুটি খেজুরের বিনিময়ে একটি খেজুর এবং দুটি আখরোটের বিনিময়ে একটি আখরোট বিক্রি করা জায়িয রয়েছে। কেননা এগুলি (শরীয়ত সম্মত) পরিমাপের আওতাভুক্ত নয়। ফলে রিবা সাব্যস্ত হবে না। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) আমাদের সাথে মতভিন্নতা পোষণ করেন। কেননা, এতে খাদ্য যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে; যেমন পিছনে আলোচনা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নির্ধারিত দুটি পয়সার বিনিময়ে একটি পয়সা বিক্রি করা জায়িয রয়েছে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, জায়িয নেই। কেননা সকল মানুষের ব্যবহারে তাতে মুদ্রামূল্য সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তাদের দুজনের প্রয়োগের কারণে তা বাতিল হবে না।

আর যখন সেগুলো মুদ্রা রূপে বহাল থাকলো তখন নির্ধারণ করলেও তা নির্ধারিত হবে না। এই বিক্রয় পয়সাগুলো অনির্ধারিত অবস্থায় বিক্রি করার মতই হলো। যেমন দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করা।

শায়খায়নের দলীল এই যে, তাদের ক্ষেত্রে পয়সাগুলোর মুদ্রা তাদের সমঝোতার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা তাদের ওপর অন্যদের অধিকার নেই। সুতরাং তাদের সমঝোতার মাধ্যমে (তাদের ক্ষেত্রে) তা বাতিল হয়ে যাবে। আর যখন মুদ্রামূল্য বাতিল হয়ে যাবে তখন নির্ধারণ করার কারণে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে। তবে তা (পূর্বের মত) ওজন পরিমাপিত হয়ে যাবে না। কেননা গণনার ব্যাপারে তাদের সমঝোতা বিদ্যমান রয়েছে।

কেননা গণনার ক্ষেত্রে সমঝোতা রহিত করায় চুক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এটা দুই আখরোটের বিনিময়ে এক আখরোট বিক্রি করার মত হলো। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা সৃষ্টিগত ভাবেই মূল্য হওয়ার জন্য বিশিষ্ট।

তদ্রূপ পয়সাগুলো অনির্ধারিত হওয়ার বিষয়টিও ভিন্ন। সেটা হচ্ছে দায়নের বিনিময়ে দায়ন বিক্রি করা। আর তা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

আর উভয় দিকে পয়সার যে কোন একটি অনির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (পরিমাপ এর উপস্থিতি ছাড়া) সমশ্রেণীতা এককভাবে বাকি বিক্রিকে হারাম করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর আটার বিনিময়ে কিংবা ছাতুর বিনিময়ে গম বিক্রি করা জায়িয নেই।

কেননা আটা ও ছাতু যেহেতু গমেরই (গুঁড়ো) অংশ, সেহেতু এদিক দিয়ে সমশ্রেণীতা বিদ্যমান রয়েছে। আর ঐ দুটির পরিমাপ হলো পাত্রগত। কিন্তু পাত্র

পরিমাপ এগুলির মাঝে এবং গমের মাঝে সমতা নির্ধারণকারী নয়। কেননা ছাতু ও আটা পাত্রে ভরাট হয়ে থাকে; আর গমের দানা ফাঁক ফাঁক হয়ে থাকে। তাই পাত্র পরিমাপের বিনিময়ে বিক্রি করলেও জায়িয হবে না।

আর পাত্র পরিমাপের ভিত্তিতে সমানভাবে আটার বিনিময়ে আটা বিক্রি করা জায়িয হবে।

কেননা সমতার শর্ত বিদ্যমান হয়েছে। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কমবেশী করে কিংবা সমানভাবে ছাতুর বিনিময়ে আটা বিক্রি করা জায়িয হবে না। কেননা ভাজা গমের বিনিময়ে আটা বিক্রি করা এবং (তাজা) গমের বিনিময়ে ছাতু বিক্রি করা জায়িয নয়। সুতরাং তাদের অংশও বিক্রি করা জায়িয হবে না। কেননা একদিক দিয়ে সমশ্রেণীতা বিদ্যমান রয়েছে।

ছাহেবায়নের মতে তা জায়িয হবে। কেননা উদ্দেশ্যগত ভিন্নতার কারণে ঐ দুটি ভিন্ন শ্রেণী বলে গণ্য হবে। আমাদের দলীল এই যে, বৃহত্তর উদ্দেশ্য তথা খাদ্যরূপে ব্যবহার উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং আংশিক উদ্দেশ্য হাত ছাড়া হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হবে না। অভাজা গমের বিনিময়ে ভাজা গম যেমন এবং পোকায় খাওয়া গমের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট গম যেমন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত হল পশুর বিনিময়ে গোশত বিক্রি করা জায়িয আছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, পশুকে যদি ঐ শ্রেণীর গোশতের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে জায়িয হবে না, তবে যদি কাটা গোশত পরিমাপে অধিক হয় (তখন জায়িয হবে।) যাতে কর্তিত গোশত পশুতে বিদ্যমান গোশতের মোকাবেলায় সমপরিমাণ হয়। আর অবশিষ্ট অংশ পশুর অন্যান্য অংশের মোকাবেলায় হয়। কেননা এমন করা না হলে হয় পশুর অন্যান্য অংশের অতিরিক্ততার দিক থেকে কিংবা গোশত বেশী হওয়ার দিক থেকে রিবা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং এটা তিলের বিনিময়ে তিলের তেল বিক্রি করার মত হলো।

শায়খায়নের দলীল এই যে, সে ওজন পরিমাপিত বস্তু (গোশত) কে এমন জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করেছে, যা ওজন পরিমাপিত নয়। কেননা পশুকে সাধারণতঃ ওজন করে বিক্রি করা হয় না।

আর মাপের মাধ্যমে পশুর ওজন জানা যায় না। কেননা পশু কখনো নিজেকে হালকা আবার কখনো ভারী করে রাখে।

পক্ষান্তরে (তিল ও তেলের) ঐ মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা তিলকে ওজনের পরিমাপ করা তখনই তেলের পরিমাণ জানিয়ে দেবে, যখন তেল ও খৈল আলগা করা হবে এবং খৈল ওজন করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে পাকা তাজা খেজুর সমানভাবে বিক্রি করা জায়িব আছে। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত।

ছাহেবায়ন বলেন, জায়িয নেই। কেননা নবী (সা)-কে যখন এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন শুকানোর পর কি এই তাজা খেজুর কমে যায়? বলা হলো হাঁ। নবী (সা) তখন বললেন, তাহলে 'না'।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, رطب (তাজা খেজুর)-কে তো تمر (খেজুর) বলা হয়। কেননা নবী (সা)-কে যখন খায়বারের রাজস্ব আদায়কারী ব্যক্তি رطب (তাজা খেজুর) হাদিয়া দিলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, أو كل تمر خيبر هكذ (খায়বারের সমস্ত تمر ই-কি এরকম?) নবী (সা) رطب কে تمر বলেছেন। আর আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী 'তামার ' খেজুর সমপরিমাণের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়িয।

তাছাড়া এই কারণে যে, رطب যদি تمر হয় তাহলে (রিবা সম্পর্কিত) হাদীসের প্রথমাংশ অনুসারে বিক্রয় বৈধ হবে। আর যদি না হয় তাহলে হাদীসের শেষাংশ দ্বারা বিক্রি জায়িয হবে। আর তা হলো নবী (সা)-এর বক্তব্য: اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم—যদি দুটি শ্রেণী ভিন্ন হয় তাহলে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো।

আর ছাহেবায়ন যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার সনদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হলেন যায়দ বিন আইয়্যাসা আর হাদীস সংকলকদের মতে তিনি দুর্বল।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কিশমিশের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রির হুকুমও অনুরূপ।

অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত মতভিন্নতা সম্পন্ন। তার কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

আর কেউ কেউ অ-তাজা গমের বিনিময়ে তাজা গম বিক্রির উপর কিয়াস করে বলেন যে, সর্ব সম্পতিক্রমেই তা বিক্রি করা জায়িয হবে না। আর আমাদের মতে পাত্র পরিমাপের ভিত্তিতে رطب (পাকা তাজা খেজুর)-এর বিনিময়ে رطب সমানভাবে বিক্রি করা জায়িয হবে। কেননা এটা تمر এর বিনিময়ে تمر বিক্রির অন্তর্ভুক্ত।

তদ্রূপ তাজা গম কিংবা ভিজা গম অনুরূপের বিনিময়ে কিংবা শুকনোর বিনিময়ে অথবা পানিতে ভেজানো খেজুর বা কিশমিশ সমপরিমাণ ভেজানো খেজুর বা কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়িয রয়েছে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এসকল অবস্থায় বিক্রি জায়িয হবে না। কেননা তিনি স্থিত অবস্থায় সততার বিষয়টি বিবেচনা করেন। আর সেটা হলো পরবর্তী অবস্থা (অর্থাৎ শুষ্কতার অবস্থা)।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর ও এই মত। তারা (রিবা সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ) হাদীসটির নিঃশর্ততার ওপর আমল করেন।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) تمر (শুকনো খেজুর)-এর বিনিময়ে رطب (পাকা তাজা খেজুর) বিক্রির ক্ষেত্রে (বর্তমান সমতার) এই মূলনীতিটি পরিহার করেছেন সেই হাদীসটির কারণে, যা আমরা ছাহেবায়নের দলীল হিসেবে বর্ণনা করেছি।

উল্লেখিত সূরতগুলোর মাঝে এবং رطب এর বিনিময়ে رطب বিক্রির মাঝে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দৃষ্টিতে পার্থক্যের কারণ এই যে, আলোচ্য সূরতগুলোতে বিনিময় দ্রব্যদ্বয়ের যে নামের উপর চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে সে নাম বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও দ্রব্যদ্বয়ের মাঝে (পরবর্তীতে শুকোনোর মাধ্যমে) পার্থক্য প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে تمر এর বিনিময়ে رطب বিক্রির ক্ষেত্রে পার্থক্য প্রকাশ পায় দুটির একটি ঐ নামের উপর বহাল থাকা অবস্থায়, যে নামের উপর চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং স্বয়ং চুক্তিকৃত দ্রব্যের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে বলে ধরা হবে। পক্ষান্তরে رطب এর বিনিময়ে رطب বিক্রির ক্ষেত্রে (পাত্রগত পরিমাপে) অসমতা প্রকাশ পাচ্ছে ঐ নামটি বিলুপ্ত হওয়ার পর (যে নামের উপর চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে)। সুতরাং যে দ্রব্যদ্বয়ের উপর চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, সে দ্রব্যদ্বয়ের মাঝে অসমতা হবে না। তাই সে অসমতা বিবেচ্যও হবে না।

আর যদি লাল হয়ে আসা কাঁচা খেজুর (بسر) কে تمر এর বিনিময়ে কমবেশী করে বিক্রি করে তাহলে জায়িয হবে না। কেননা بسر ও تمر এর অন্তর্ভুক্ত। খেজুরের কুঁড়ির বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ এটাকে খেজুরের বিনিময়ে একটার বিনিময়ে দুটো যেমন ইচ্ছা বিক্রি করা জায়িয আছে। কেননা এটা تمر নয়। কেননা تمر নামটি এই ফলের জন্য খেজুরের রূপধারণ করার পর থেকে প্রযুক্ত হয়, তার পূর্বে নয়। আর كفرى বা কুঁড়ি হচ্ছে গণনানির্ভর পার্থক্যপূর্ণ দ্রব্য। সুতরাং যদি তার বিনিময়ে দাদনে খেজুর বিক্রি করা হয় তাহলে অজ্ঞতার কারণে তা জায়িয হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যায়তুন ফলকে যায়তুন তেলের বিনিমেয় এবং তিলকে তিলের তেলের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়িয নয়। যতক্ষণ না যায়তুনের তেল এবং তিলের তেল যায়তুন ও তিলের মাঝে বিদ্যমান তেল থেকে পরিমাণে বেশী হয়, তখন তেল হবে (ভিতরে বিদ্যমান) সমপরিমাণ তেলের বিনিময়ে আর অতিরিক্তটা হবে খৈলের বিনিময়ে।

কেননা তখন বিক্রয় চুক্তিটি রিবা থেকে মুক্ত হবে। কারণ যায়তুন ও তিলে যে তেল রয়েছে, তা ওজন পরিমাপিত দ্রব্য। অতিরিক্ততার শর্ত এজন্য যে, ভিতরে বিদ্যমান তেল বাইরের তেলের চেয়ে বেশী হবে। কিংবা তার সমান হবে। তখন খৈল ও আংশিক তেল কিংবা শুধু খৈল অতিরিক্ত হয়ে যাবে।

আর যদি যায়তুন ও তিলে বিদ্যমান তেলের পরিমাণ জানা না যায় তাহলে রিবা এর সম্ভাবনার কারণে বিক্রি জায়িয হবে না। আর এক্ষেত্রে রিবার সন্দেহকে প্রকৃত

রিবার পর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হয়। আর আখরোট ও তার তেল, দুধ ও তার ঘি, আঙ্গুর ও তার রস এবং খেজুর ও তার সিরা বিনিময়ের ক্ষেত্রে একই হুকুম হবে। কিন্তু তুলা ও তার সুতার বিনিময়ের ক্ষেত্রে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন। আর কাপড় ও তুলার বিনিময়ে সর্বসম্মতিক্রমে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করা জায়িয হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন,বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর গোশত একটার বিনিময়ে অন্যটা কম-বেশী করে বিক্রি করা জায়িয রয়েছে।

এখানে বিভিন্ন গোশত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উটের, গরুর ও মেষের গোশত।

আর গরু ও মেষ একই শ্রেণীভুক্ত। তদ্রূপ ছাগল ও ভেড়া একই শ্রেণীভুক্ত। আর তদ্রূপ আরবী উট ও'বখতী' উট একই শ্রেণীভুক্ত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর গরু ও বকরীর দুধের হুকুমও অনুরূপ। (কম বেশী করে বিক্রি করা জায়িয)।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, জায়িয নেই। কেননা উদ্দেশ্যগত অভিন্নতার কারণে সমস্ত দুধ একই শ্রেণীভুক্ত। আমাদের দলীল এই যে, দুধের উৎস প্রাণীগুলোর শ্রেণী ভিন্ন। একারণেই যাকাতের ক্ষেত্রে একটির নেছাব অন্যটিকে দিয়ে পূরণ করা হয় না। সুতরাং ঐ প্রাণীগুলোর অংশভুক্ত দুধও ভিন্ন হবে, যতক্ষণ না কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা পরিবর্তিত হয়, (যেমন পনির বানানো হলো)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আঙ্গুরের সিরকার বিনিময়ে খেজুরের সিরকার হুকুমও অনুরূপ (কমবেশী করে বিক্রি করা জায়িয)।

কেননা উভয়ের মূলের মাঝে শ্রেণী ভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং উভয়ের পানির মাঝে শ্রেণী ভিন্নতা থাকবে। একারণেই উভয়ের রস দুধ শ্রেণী বলে গণ্য হয়।

আর উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে ছাগলের পশম এবং ভেড়ার লোম ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত।

দুম্বার নিতম্বের গোশত এবং সাধারণ গোশতের বিনিময়ে উদরের চর্বির বিক্রির হুকুমও অনুরূপ।

কেননা দৃশ্যগত, গুণগত ও উপকারগত বিরাট পার্থক্যের কারণে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গম ও আটার বিনিময়ে রুটি কমবেশী করে বিক্রি করা জায়িয হবে।

কেননা রুটি গণনা শ্রেণীর কিংবা ওজন পরিমাপিত দ্রব্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং সর্বদিক থেকেই পাত্র পরিমাপিত হওয়া থেকে বের হয়ে গেছে। অথচ গম হচ্ছে পাত্র পরিমাপিত। আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, এতে কোন কল্যাণ নেই। তবে ফতোয়া হলো প্রথম মতের উপর। আর এই বৈধতা হবে

তখন, যখন উভয় দ্রব্য নগদ হবে। তদ্রূপ যদি গম বা আটা বাকীতে হয় তাহলেও জায়িয হবে। আর যদি রুটি বাকীতে হয় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়িয হবে এবং এই মতের উপরই ফতোয়া রয়েছে।

তদ্রূপ বিশুদ্ধ মতে রুটির ক্ষেত্রে 'বায় সালাম' জায়িয রয়েছে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে গণনার ভিত্তিতে বা ওজনের ভিত্তিতে রুটি করয নেয় জায়িয় নেই। কেননা বেলার কারণে এবং রুটি প্রস্তুত কারকের কারণে এবং তন্দুরের কারণে এবং আগে বা পিছে হওয়ার কারণে রুটির মধ্যে ব্যবধান হয়ে থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে লোক প্রচলনের কারণে তা বৈধ। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ওজনের ভিত্তিতে জায়িয হবে। গণনার ভিত্তিতে জায়িয নয়। কেননা রুটির এককগুলো পার্থক্যপূর্ণ হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব ও তার গোলামের মাঝে কোন রিবা হয় না।

কেননা গোলাম ও তার কবজার সব কিছু মনিবের মালিকানাধীন। সুতরাং রিবা সাব্যস্ত হবে না। আর এটা হলো তখন, যখন গোলাম ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, আর তার যিম্মায় কোন ঋণ না থাকে। যদি তার ঋণ থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই কম-বেশী করে 'ক্রয় বিক্রয়' বৈধ হবে না।

কেননা এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কবজায় যা থাকে, তা মনিবের মালিকানাধীন নয়। আর ছাহেবায়নের মতে ঐ গোলামের সাথে যেহেতু পাওনাদারদের হক সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে, সেহেতু মনিবের জন্য সে ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে পড়েছে। সুতরাং রিবা সাব্যস্ত হবে। যেমন মনিব ও তার মুকাতাবের মাঝে রিবা সাব্যস্ত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দারুল হরবে মুসলমান ও হারবীর মাঝেও রিবা নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের দলীল হলো আমাদের দারুল ইসলামে আগত নিরাপত্তা গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর কিয়াস (তার সাথে যেমন রিবা হয়, তবে হারবীর সাথেও রিবা হবে)।

আমাদের দলীল হলো নবী (সা)-এর বাণী :

لا ربوا بين المسلم والحربي في دار الحرب

তাছাড়া এ কারণে যে, দারুল হরবে বিদ্যমান অবস্থায় তাদের মাল আমাদের জন্য হালাল। সুতরাং মুসলমান যে কোন উপায়ে তা গ্রহণ করুক হালাল মালই গ্রহণ করেছে, যদি তাতে বিশ্বাস ভঙ্গের দিক না থাকে। তাদের নিরাপত্তা গ্রহণকারী ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে (দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায়) তার মাল নিরাপদ হয়ে গেছে।

পরিচ্ছেদ ঃ অধিকার সম্পর্কীয়

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি এমন একটি ভবন ক্রয় করে, যার উপরে আরেক তালা রয়েছে, তাহলে উপরের তালার মালিক হবে না। অবশ্য যদি ঐ ভবন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অধিকারসহ, কিংবা ঐ ভবন সংশ্লিষ্ট সুযোগ সুবিধাসহ, কিংবা অল্প বিস্তর যা কিছু তাতে রয়েছে কিংবা তা থেকে প্রাপ্ত হয় সেগুলোসহ ক্রয় করলে সেটির মালিক হয়।

আর কেউ যদি একটি ঘর খরিদ করে যার উপরে আরেকটি ঘর রয়েছে, আর খরিদ করে ঐ ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অধিকারসহ, তাহলে উপরের ঘর তার হবে না।

আর কেউ যদি উহার সীমানাসহ কোন বাড়ী ক্রয় করে তাহলে উপরের তালা এবং শৌচাগার ক্রেতার মালিকানায় আসবে।

ইমাম কুদূরী (র) এখানে منزل ، بيت এবং دار একত্রিত করেছেন। دار (বাড়ী) শব্দটি অবশ্য উপরের তালাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কেননা دار বা বাড়ী শব্দটি প্রযুক্তই হয় চতুঃসীমাযুক্ত ভিটির উপর আর উপরের তালা হলো মূলের অনুবর্তী ও তার অংশভুক্ত জিনিস। সুতরাং উপরের তালা তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

আর بيت (ঘর) হচ্ছে এমন স্থান, যেখানে রাত্রি যাপন করা যায়। আর উপরের তালা এর সমকক্ষ। আর কোন জিনিস তার সমকক্ষের অনুবর্তী হতে পারে না। সুতরাং স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া উপরের তালা নীচের তালার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর منزل (বাসস্থান) শব্দটি دار ও بيت এর মাঝামাঝি শব্দ। কেননা তাতে বসবাসের সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকে; অবশ্য কিছু ত্রুটিসহ। কেননা তাতে আবাসস্থল থাকে না।

সুতরাং دار এর সাথে منزل এর সাদৃশ্যের কারণে অনুবর্তী সুযোগ-সুবিধার উল্লেখের ক্ষেত্রে অনুবর্তী রূপে উপরের তালা منزل এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পক্ষান্তরে بيت এর সাথে সাদৃশ্যের কারণে অনুবর্তী সুযোগ সুবিধার উল্লেখ ছাড়া منزل এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কেউ কেউ বলেন, আমাদের প্রচলিত রেওয়াজে উল্লেখকৃত সকল ক্ষেত্রে উপরের তালা অন্তর্ভুক্ত হবে।

কেননা যে কোন বাসস্থানকে ফার্সিতে خانه বলে। আর خانه সাধারণত: উপরের তালা থেকে খালি হয় না। دار শব্দের ক্ষেত্রে উপরের তালা যেমন অন্তর্ভুক্ত হবে, তেমনি শৌচাগার অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা তা دار এর অনুবর্তীসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

তবে আমরা যে সকল শর্তবাচক এবারত উল্লেখ করেছি, সে সকল এবারত উল্লেখ করা ছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে চালা বিশিষ্ট বারান্দা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কেননা সেটা রাস্তার উপরে শূন্যে তৈরী হয়। সুতরাং তা রাস্তার হুকুম ও বিধান গ্রহণ করবে।

আর ছাহেবায়নের মতে চালা বিশিষ্ট বারান্দার প্রবেশ পথ যদি বাড়ীর ভিতরে হয় তাহলে আমাদের উল্লেখকৃত কোন এবারতের উল্লেখ ছাড়াই তা دار এর বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কেননা এটা دار এর অনুবর্তী, সুতরাং শৌচাগারের সদৃশ হলো।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, কেউ যদি কোন বাড়ীর একটি (ঘর) বা منزل (অথবা مسكن বাসস্থান) ক্রয় করে তাহলে রাস্তা ক্রেতার মালিকানায় আসবে না। অবশ্য যদি তার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অধিকারসহ কিংবা সুযোগ সুবিধাসহ কিংবা তার অল্প বিস্তর সব কিছুসহ ক্রয় করে তাহলে অন্তর্ভুক্ত হবে। পানির হিস্সা এবং পানির নালা সম্পর্কেও একই কথা।

কেননা এগুলো বিক্রয়কৃত বস্তুর চতুর্সীমার বহির্ভূত। তবে তার অনুবর্তী বিধায় অনুবর্তী জিনিসসমূহের উল্লেখ থাকলে ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইজারার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ইজারা চুক্তি সংঘটিত হয় উপকার লাভ করার জন্য। আর ঐগুলো ছাড়া উপকার লাভ সম্ভব হবে না। কেননা ভাড়ায় গ্রহণকারী ব্যক্তি সাধারণত: রাস্তা খরিদ করেনা বা আলাদা ভাড়ায় গ্রহণ করে না।

সুতরাং ভাড়ায় গ্রহণ করা ঘরটি থেকে উদ্দিষ্ট ফায়দা হাছিল হওয়ার সম্ভাব্যতার জন্য তা ইজারার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পক্ষান্তরে ক্রয়কৃত দ্রব্য থেকে সেগুলো ছাড়াও ফায়দা হাছিল করা সম্ভব। কেননা ক্রয়কারী সাধারণত: তা আলাদা ক্রয় করে নেয়। তাছাড়া কখনো শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে থাকে। তখন সে রাস্তা বা অন্য সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই বিক্রি করতে পারে। ফলে ফায়দা হাছিল হয়ে যাবে।

পরিচ্ছেদ ঃ অধিকার অর্জন সম্পর্কীয়

কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে আর সে তার কাছে (তার ঔরসে নয়) সন্তান প্রসব করে; অতঃপর কোন লোক সাক্ষী ও প্রমাণ যোগে দাসীর মালিকানা দাবী করে তাহলে সে দাসীকে ও তার সন্তানকে নিয়ে নিবে। আর যদি ক্রেতা কোন ব্যক্তির অনুকূলে দাসীর মালিকানা স্বীকার করে তাহলে দাসীর সন্তান তার অনুবর্তী হবে না।

উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, বাইয়েনাহ বা সাক্ষী হচ্ছে সর্বব্যাপী প্রমাণ। কেননা বাইয়েনাহ শব্দের অর্থই হলো প্রকাশকারী। সুতরাং বাইয়েনাহ দ্বারা মূল থেকেই লোকটির মালিকানা প্রমাণিত হবে। আর সন্তানটি দাসীর সাথে যুক্ত ছিলো। সুতরাং সেটিও তার হবে।

পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণ, মালিকানা সাব্যস্ত করবে শুধু সংবাদ প্রদানের সত্যতার অনিবার্য প্রয়োজনে যার সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে।

আর সন্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মালিকানা সাব্যস্ত করা দ্বারাই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং সন্তানের মালিকানা লোকটির জন্য সাব্যস্ত হবে না।

অতঃপর কারো কারো মতে, আদালতের ফয়সালার ক্ষেত্রে মাতার অনুবর্তীরূপে মাতা সম্পর্কে সন্তান অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর কারো কারো মতে সন্তান সম্পর্কে আলাদা ফায়সালার শর্ত হবে। মাবসূতে বর্ণিত মাসায়েল এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেননা ইমাম মোহাম্মদ (র) বলেছেন, কাজী যদি অতিরিক্ত সন্তান সম্পর্কে না জানে (এবং মূল সম্পর্কে ফায়সালা প্রদান করে) তখন অতিরিক্ত সন্তানটি ফাসয়ালার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তদ্রূপ সন্তান যদি অন্যের কবজায় থাকে তখন সন্তানটি মাতার অনুবর্তীরূপে আদালতের ফায়সালার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ইমাম মোহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি গোলাম ধারণা করে কাউকে খরিদ করে আর পরে দেখা যায় যে, সে স্বাধীন ব্যক্তি; অথচ ঐ গোসাম ক্রেতাকে বলেছিলো যে, তুমি আমাকে ক্রয় করে নাও আমি তার গোলাম, এক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি উপস্থিত থাকে কিংবা 'জ্ঞাত স্থানে' অনুপস্থিত থাকে তাহলে কথিত গোলামের উপর কোন দায় আরোপিত হবে না।

আর যদি বিক্রেতা কোথায় আছে জানা না যায় তাহলে ক্রেতা কথিত গোলামের কাছ থেকে অর্থ ফেরত নেবে। আর সে বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নেবে।

পক্ষান্তরে দাসত্বের ব্যাপারে স্বীকারোক্তিকারী কোন গোলামকে যদি সে বন্ধকরূপে গ্রহণ করে আর পরে দেখে যে, সে স্বাধীন মানুষ, তাহলে সে কোন অবস্থাতেই গোলামের কাছ থেকে অর্থ ফেরত নিতে পারবে না।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ক্রেতা ও বন্ধক গ্রহণকারী কেউ (কথিত গোলাম থেকে) অর্থ ফেরত নিতে পারবে না।

কেননা মূল্য ফেরত নেয়ার অধিকার লাভ হয় বিনিময়ের ভিত্তিতে কিংবা কাফালাত বা দায় গ্রহণের ভিত্তিতে। অথচ এখানে আছে শুধু মিথ্যা সংবাদ প্রদান। (বিনিময় বা দায় গ্রহণ নেই) সুতরাং যেন তৃতীয় একজন ব্যক্তি এরূপ বললো কিংবা যেন 'গোলাম' বললো যে, আমি গোলাম, আমাকে বন্ধক রূপে গ্রহণ করুন, আর এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় মাসআলা।

তারফায়নের দলীল এই যে, ক্রেতা তার আদেশ ও দাসত্বের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করেই ক্রয় শুরু করেছে। কেননা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং বিক্রেতার কাছ থেকে অর্থ ফেরত নেয়া সম্ভব না হওয়ার সময় ক্রয়ের আদেশ দানের কারণে কথিত গোলামকেই মূল্যের জামিন বলে সাব্যস্ত করা হবে, যাতে ক্ষতি ও ধোঁকা রোধকরণ সম্ভব হয়। আর বিক্রেতার অবস্থান স্থল অজ্ঞাত হওয়ার ক্ষেত্র ছাড়া অসাধ্যতা নেই।

আর বিক্রয় হচ্ছে বিনিময় ভিত্তিক চুক্তি। সুতরাং বিক্রয়ের আদেশদাতাকে বিক্রয় দ্রব্যের নিরাপত্তার জামিন বা দায় গ্রহণকারী সাব্যস্ত করা সম্ভব।

আর বিক্রয় দ্রব্যের নিরাপত্তাই হচ্ছে বিক্রয় চুক্তির দাবী।

বন্ধক প্রদান ও গ্রহণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা বিনিময় নয়। বরং তা হলো বন্ধক গ্রহণকারী মূল হক বা প্রাপ্য-উশুল করার নিশ্চয়তার সনদ। এ কারণেই তো 'ছারফ বিক্রয়ের' বিনিময় দ্রব্যের বিপরীতে এবং সালাম বিক্রয়ের মুসলামফীহ বা দাদন দ্রব্যের বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়িয রয়েছে।[১] অথচ এ দুটো ক্ষেত্রে বদল করা হারাম। সুতরাং বন্ধক গ্রহণের আদেশকে বন্ধকী দ্রব্যের নিরাপত্তার জামানত সাব্যস্ত করা যায় না।

তদ্রূপ তৃতীয় ব্যক্তির আদেশ দানের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা তার কথা তো ধর্তব্য নয়। সুতরাং এখানে ধোঁকা প্রদান সাব্যস্ত হয় না।

আমাদের মাসআলাটির নযীর এই যে, মনিব (বাজারে) ঘোষণা করলো যে, আমার এই গোলামের সাথে তোমরা লেনদেন করো। কেননা আমি তাকে অনুমতি প্রদান করেছি। অতঃপর তার আস্ব-অধিকার প্রকাশ পেলো (অর্থাৎ দেখা গেলো যে, সে গোলাম স্বাধীন)

দ্বিতীয়টার উদাহরণ এই যে, যায়দ এক কাফীয গমের জন্য আমরকে দশ দিরহাম দাদন দিলো এবং আমর দাদন দ্রব্যের বিপরীতে যায়দের কাছে কোন জিনিস বন্ধক প্রদান করলো। আর যায়দের কাছ থেকে তা হারাম হয়ে গেলো। তখন বিধান পূর্বের মতই হবে। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীগণ মনিবের কাছ থেকে কথিত দাসের 'বাজার মূল্য' ফেরত নেবে।

তবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত অনুসারে মাসআলাটির কাঠামোতে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে। কেননা তার মতে গোলামের দাসত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য গোলামের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন হলো শর্ত। আর বক্তব্যের স্ববিরোধিতা দাবীকে বিনষ্ট করে দেয়।

আর কারো কারো মতে মাসআলার কাঠামো যদি মৌলিক ও জন্মগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তাতে দাবী শর্ত নয়। কেননা

১. প্রথমটির উদাহরণ এই যে, যায়দ আমরের কাছে সরফ দিরহামের বিনিময়ে দশ দিরহাম বিক্রি করল। এরপর যায়দ আমরের কাছ থেকে কোন কিছু বন্ধক নিল ঐ দশ দিরহামের বিনিময়ে যেটা ছারফের দুই বিনিময় দ্রব্যের একটি। এরপর বন্ধক গ্রহণ করা যায়দের কাছ থেকে বন্ধকী দ্রব্য হালাক হয়ে গেলো। তখন বিধান এই যে, বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য যদি ছারফের বিনিময় দ্রব্যের সমান হয় তাহলে বন্ধক গ্রহণকারী তার হক উশুলকারী হয়ে গেলো। পক্ষান্তরে তার মূল্য যদি বিনিময় দ্রব্য থেকে অধিক হয় তাহলে অতিরিক্তটা তার হাতে আমানত হবে। আর কম হলে অবশিষ্ট পরিমাণ আমর থেকে উশুল করবে।

কোন লোকের জন্মগত স্বাধীন হওয়া তার মাতার লজ্জাস্থান হারাম হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে।[১]

আর কোন কোন মতে জন্মগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও দাবী উত্থাপন শর্ত। তবে এক্ষেত্রে বক্তব্যের স্ববিরোধিতা প্রতিবন্ধক নয়। কেননা গর্ভ সঞ্চারের বিষয়টি গোপনীয় বিষয়।[২]

পক্ষান্তরে মাসআলার কাঠামো যদি হয় আযাদ করার মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীনতা, তাহলে এক্ষেত্রে বক্তব্যের বিরোধিতা (দাবীর সত্যতার জন্য) প্রতিবন্ধক নয়। কেননা মনিব এ বিষয়ে একক ক্ষমতার অধিকারী (তাই বিষয়টি গোলামের অজ্ঞাতে থাকা সম্ভব)। সুতরাং এক্ষেত্রে গোলাম এমন খোলা প্রাপ্ত স্ত্রীর মত হলো যে, খোলা-এর পূর্বে স্বামী তিন তালাক দিয়েছে বলে সাক্ষী পেশ করেছে।[৩] এবং কিতাবাত চুক্তিতে আবদ্ধ গোলামের মত হলো যে, এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করেছে যে, কিতাবাত চুক্তির পূর্বেই মনিব তাকে আযাদ করে দিয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন বাড়ির অংশ দাবী করে অর্থাৎ অনির্ধারিত অংশ। অতঃপর যার দখলে বাড়িটি রয়েছে সে-একশ দিরহামের বিনিময়ে তার সাথে সমঝোতা করে নিল, এরপর পুরো বাড়িটির হকদার বের হয়ে এল, তার এক হাত পরিমাণ ছাড়া তাহলে বিবাদী বাদীর কাছ থেকে সমঝোতার কোন অর্থ ফেরত নিতে পারবে না।

কেননা বাদী বলতে পারে যে, আমার দাবী এই অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রেই ছিলো।

আর যদি সে পুরো বাড়ীটার দাবী করে থাকে এবং দখলে থাকা লোকটি একশ দিরহামের বিনিময়ে তার সাথে সমঝোতা করে থাকে, তারপর ঐ বাড়ীর কোন অংশের হকদার বের হয় তাহলে বিবাদী সেই হিসাবে বাদীর কাছ থেকে সমঝোতার অর্থ ফেরত নিতে পারবে।

কেননা এখানে সঙ্গতি বিধান করা সম্ভব নয়। সুতরাং مبدل বা বিনিময়কৃত বস্তুর নিরাপত্তা রহিত হওয়ার সময় بدل বা বিনিময় দ্রব্যের সেই পরিমাণ ফেরত নেওয়া অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

আর আলোচ্য মাসআলা একথা প্রমাণ করে যে, জ্ঞাত (নির্ধারিত) জিনিসের বিনিময়ে অজ্ঞাত (অনির্ধারিত) জিনিসের ক্ষেত্রে সমঝোতা করা জায়িয রয়েছে। কেননা যা রহিত হবে সে বিষয়ে অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় না।

---

১. অর্থাৎ কোন লোকের জন্মগত স্বাধীন হওয়ার অর্থ এই যে, তার মাতা কারো দাসী নয়। সুতরাং কেউ যদি তাকে দাসী বলে দাবী করে তাহলে তার লজ্জাস্থান ঐ দাবীকারীর জন্য হারাম হবে। আর লজ্জাস্থান হারাম হওয়া আল্লাহ্র হক রূপে গণ্য। আর আল্লাহ্র হক সাব্যস্ত করার জন্য দাবী উত্থাপন শর্ত নয়। বরং দাবী উত্থাপন ছাড়াই সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। যেমন দু'জন লোক দাবী করলো যে, এই দাসীকে তার মনিব আযাদ করে দিয়েছে। অথচ দাসী এ বিষয়ে নীরব। কোন দাবী উত্থাপন করছেনা। এক্ষেত্রে তার দাবী উত্থাপন ছাড়াই তার লজ্জাস্থানের হুরমত সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

মোটকথা, কারো জন্মগত স্বাধীন হওয়া তার মাতার লজ্জাস্থানের হারাম হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর লজ্জাস্থানের হারাম হওয়ার জন্য দাবী উত্থাপন শর্ত নয়। সুতরাং লজ্জাস্থানের হুরমতকে অন্তর্ভুক্তকারী জন্মগত স্বাধীনতার সাব্যস্তও দাবী উত্থাপনের উপর নির্ভরশীল হবে না। দাবী উত্থাপন যখন শর্ত হলো না তখন গোলামের বক্তব্যে বিরোধিতার প্রশ্নও আসে না।

২. কেননা হতে পারে যে, গোলামকে ছোট অবস্থায় দারুল হরব থেকে আনা হয়েছে। আর প্রথমে তার জানা ছিলোনা যে, তার মা কিংবা বাবা স্বাধীন, তাই নিজেকে সে গোলাম বলে স্বীকার করেছে। পরে মা কিংবা বাবার স্বাধীনতার বিষয়টি জ্ঞাত হয়ে নিজেকে স্বাধীন বলে দাবী করেছে।

৩. স্বামী যেহেতু তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে একক ক্ষমতার অধিকারী, সেহেতু হতে পারে যে, তালাক প্রদানের বিষয়টি 'খোলা' করার সময় তার জানা ছিল না, পরে জানা হয়েছে। সুতরাং প্রথমে 'খোলা' করা এর পর তালাকের দাবী করার মাঝে স্ববিরোধিতা নেই।

নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়

কেউ যদি অন্যের মালিকানাধীন জিনিস তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি করে তাহলে মালিকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে বিক্রয়কে অনুমোদন করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে রহিত করতে পারে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ বিক্রয় চুক্তি সংঘটিত হবে না।

কেননা এ চুক্তি শরীয়ত সম্মত কর্তৃত্ব থেকে সম্পাদিত হয়নি। কেননা শরীয়ত সম্মত কর্তৃত্ব লাভ হয় মালিকানা দ্বারা কিংবা মালিকের অনুমতি দ্বারা। আর তা এখানে অনুপস্থিত, আর শরীয়ত সম্মত ক্ষমতা ছাড়া কার্য সংঘটন সম্ভব নয়।

আমাদের দলীল এই যে, এটা মালিকানা প্রদানের পদক্ষেপ, আর তা মালিকানা প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে উপযুক্ত পাত্রে সম্পাদিত হয়েছে। সুতরাং তা সংঘটিত হওয়ার সপক্ষে মত প্রকাশ করা আবশ্যক। কেননা ইচ্ছাধিকার থাকার অবস্থায় মালিকের তাতে কোন ক্ষতি নেই। বরং তাতে তার উপকার রয়েছে। কেননা ক্রেতা সন্ধানের মূল্য নির্ধাণের এবং অন্যান্য ব্যাপারের কষ্ট থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে।

আর চুক্তিকারীর কথা বাতিল হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণে তাতে চুক্তিকারীর উপকার রয়েছে। আর তাতে ক্রেতারও উপকার রয়েছে। সুতরাং এই সকল উপকার সংরক্ষণের জন্য শরীয়তসম্মত ক্ষমতা সাব্যস্ত হবে।

আর কেনইবা নয়? এখানে পরোক্ষ অনুমতি সাব্যস্ত রয়েছে। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি উপকারী পদক্ষেপের ক্ষেত্রে স্বভাবত: অনুমতি দিয়েই থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে দ্রব্যের উপর চুক্তি হয়েছে তা যদি বিদ্যমান থাকে এবং চুক্তি সম্পন্নকারী ব্যক্তিদ্বয় যদি তাদের (উপযুক্ততার) অবস্থায় বহাল থাকে তাহলে মালিকের অনুমতি প্রদানের অধিকার রয়েছে।

কেননা অনুমতি হল চুক্তিকে কার্যকরীকরণ। সুতরাং চুক্তির বিদ্যমানতা আবশ্যক আর চুক্তি সম্পন্নতাকারী ব্যক্তিদ্বয়ের এবং চুক্তিকৃত দ্রব্যের বিদ্যমানতা দ্বারাই তা বহাল থাকবে।

আর মালিক যখন অনুমতি প্রদান করবে তখন বিক্রয় মূল্য তার মালিকানাভুক্ত হবে এবং ঐ লোকটির হাতে আমানতরূপে থাকবে। যেমন ওয়াকীলের ক্ষেত্রে।

কেননা এখানে পরবর্তীতে যুক্ত অনুমোদন পূর্ববর্তী ওয়াকীল নিয়োগের সমপর্যায়ভুক্ত।

নিজের উপর সাব্যস্ত হক রোধ করার উদ্দেশ্যে নিঃসম্পর্কে ব্যক্তির অধিকার রয়েছে (মালিকের) অনুমোদনদানের পূর্বে চুক্তি রহিত করার।

বিবাহের ক্ষেত্রে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির (হস্তক্ষেপে) বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিবাহের ক্ষেত্রে সে শুধু বক্তব্য উচ্চারণকারী। এই শর্ত তখন যখন বিক্রয়মূল্য দায়িত্বভুক্ত মুদ্রা হবে। আর যদি বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত কোন পণ্যদ্রব্য হয় তাহলে অনুমোদন প্রদান বৈধ হবে যদি পণ্য দ্রব্যটিও বহাল থাকে।

অতঃপর এই ক্ষেত্রে অনুমোদনটি হবে (মালিকের মাল থেকে) মূল্য পরিশোধের অনুমোদন, চুক্তি কার্যকর করার অনুমোদন নয়। সুতরাং মূল্যরূপে নির্ধারিত পণ্য দ্রব্যটি

অসম্পর্কিত ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত হবে। আর তার কর্তব্য হবে বিক্রয়-দ্রব্যের অনুরূপ দ্রব্য (ক্রেতাকে) প্রদান করা, যদি তা সদৃশ বস্তু হয়। আর যদি সদৃশ বস্তু না হয় তাহলে ঐ বস্তুটির বাজার মূল্য প্রদান করা আবশ্যক।

কেননা এটা (অর্থাৎ নির্ধারিত পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয়) এক হিসাবে ক্রয়, আর ক্রয় অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না।

আর (অনুমোদন প্রদানের পূর্বে) মালিক যদি মারা যায় তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই ওয়ারিশের অনুমোদনে বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হবে না। কেননা এটা মৃত ব্যক্তির নিজস্ব অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল ছিলো। সুতরাং অন্যের অনুমোদন দ্বারা তা বৈধতা পাবে না।

আর মালিক যদি তার জীবদ্দশায় অনুমোদন দিয়ে থাকে, কিন্তু বিক্রীত দ্রব্যের অবস্থা জানা না যায়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর প্রথম দিকের মত অনুযায়ী বিক্রয় চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) এরও এই মত। কেননা বিক্রীত দ্রব্য বিদ্যমান থাকাটাই হলো মূল অবস্থা।

এরপর ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাঁর মত প্রত্যাহার করে বলেছেন, অনুমোদনের সময় বিক্রীত দ্রব্য বহাল থাকার কথা জানা না যাওয়া পর্যন্ত বিক্রয় চুক্তির অনুমোদন বৈধ হবে না। কেননা অনুমোদনের গ্রহণযোগ্যতার শর্তের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সুতরাং সন্দেহের অবস্থায় অনুমোদন সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন গোলাম গছব করে নেয় এবং বিক্রি করে ফেলে যায় ক্রেতা তাকে আযাদ করে দেয়, অতঃপর গোলামের মনিব বিক্রয় চুক্তি অনুমোদন করে তাহলে আযাদ করা জায়িয হবে।

এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সায়বায়নের মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আযাদ করা বৈধ হবে না। কেননা মালিকানা ছাড়া আযাদ করার অধিকার নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لا عتق فيما لا يملك ابن ادم

আদম সন্তান যে 'দাসের' মালিক নয়, তা আযাদ করার অধিকারী নয়।

আর স্থগিত বিক্রয় চুক্তি মালিকানা সাব্যস্ত করে না। আর যদি পরবর্তীতে (অনুমোদন প্রদানের সময়) তা সাব্যস্ত হয়, তবে সেটা সাব্যস্ত হয় (পূর্ববর্তী অপহরণকারীর বিক্রয়ের সাথে) সম্পৃক্ত অবস্থায়, আর সম্পৃক্তগত মালিকানা এক হিসাবে সাব্যস্ত, অন্য হিসাবে সাব্যস্ত নয়। অথচ আমাদের বর্ণিত হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মালিকানাই হচ্ছে আযাদ করাকে বৈধতা দানকারী। এ কারণেই অপহরণকারী কর্তৃক আযাদ করা, অতঃপর ক্ষতিপূরণ আদায় করা বৈধ নয়। তদ্রূপ বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকা অবস্থায় ক্রেতার আযাদ করে দেওয়া অতঃপর বিক্রেতার ঐ বিক্রয় চুক্তিকে অনুমোদন করা বৈধ নয়।

তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায় অপহরণকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারীর বিক্রয় বৈধ নয়। অথচ বিক্রয় হচ্ছে (আযাদ করার চেয়ে) দ্রুত কার্যকর। এমনকি অপরহণকারী যখন ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয় তখন তার বিক্রয় কার্যকর হয়ে যায়।

তদ্রূপ অপহরণকারী যখন ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয় তখনো অপহরণকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারীর আযাদ করা বৈধ নয়।

শায়খায়নের যুক্তি এই যে, (অপহরণকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারীর) মালিকানা (মালিকের অনুমোদনের উপর) স্থগিতরূপে সাব্যস্ত হয়েছে একটি নিঃশর্ত পদক্ষেপ দ্বারা[১] যা মালিকানার ফায়দা প্রদানের জন্যই শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। আর পিছনে বর্ণিত হয়েছে যে, এতে কোন পক্ষের ক্ষতি নেই। সুতরাং আযাদ করার বিষয়টি মালিকানার সাথে সম্পৃক্তরূপে স্থগিত ও নির্ভরশীল থাকবে। আর মালিকের অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে আযাদকরণও কার্যকর হবে।

বিষয়টি হবে বন্ধকদাতার কাছ থেকে ক্রয়কারীর আযাদ করার মত এবং উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে একটি গোলামের উত্তরাধিকার লাভকারীর আযাদ করার মত যে সম্পদ ঋণ দ্বারা পূর্ণ আবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী যদি আযাদ করার পর ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে আযাদ করা বৈধ ও কার্যকর হয়।

অপহরণকারীর নিজে আযাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা অপহরণ মালিকানার ফায়দা প্রদানের জন্য (শরীয়ত কর্তৃক) নির্ধারিত নয়।

তদ্রূপ বিক্রয় চুক্তিতে বিক্রেতার ইচ্ছাধিকারের শর্ত থাকার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা এটা নিঃশর্ত ও পূর্ণাঙ্গ বিক্রয় চুক্তি নয়। বরং বিক্রয় চুক্তির সাথে শর্তযোগে (মালিকানার) বিধানের ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়াকে সম্পূর্ণতই রোধ করে।

তদ্রূপ অপহরণকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারীর বিক্রয় করার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা অনুমোদনের মাধ্যমে বিক্রেতার নিরংকুশ মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়, আর এই নিরংকুশ মালিকানা যখন অন্যের স্থগিত মালিকানার উপর উদ্ভূত হবে তখন নিরকংকুশ মালিকানা (তার শক্তি বলে) স্থগিত মালিকানাকে বাতিল করে দেবে।[২]

আর অপহরণকারী যখন ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয় তখন তার কাছ থেকে ক্রয়কারীর আযাদ করা কার্যকর হয়। ফকীহ হিলাল (র) এমনই উল্লেখ করেছেন আর এ-ই বিশুদ্ধতম মত।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি গোলামটির হস্তকর্তন করা হয় আর অপহরণকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারী ব্যক্তি তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে অতঃপর

---

১. নিঃশর্ত হস্তক্ষেপ দ্বারা ইচ্ছাধিকারের শর্তযুক্ত বিক্রয়কে ব্যতিক্রম করা হয়েছে।

২. কেননা একই পাত্রে নিরংকুশ মালিকানা এবং স্থগিত মালিকানা একত্র হওয়া সম্ভব নয়। আর বিক্রয় চুক্তি বাতিল হওয়ার পর তার সাথে অনুমোদন যুক্ত হতে পারে না।

(মূল মালিক) বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করে তাহলে ক্ষতিপূরণ ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হবে।

কেননা (অনুমোদনটি মূল হেতু তথা ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে) ক্রয়ের সময় থেকেই ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ক্রেতার মালিকানাতেই হস্তকর্তন হয়েছে। এ হল ইমাম মুহাম্মদ (র) এর বিপক্ষে প্রমাণ।[১]

তবে তার পক্ষ থেকে কৈফিয়ত এই যে, খণ্ডিত মালিকানাই ক্ষতিপূরণের হকদার হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন যদি মুকাতাবের হস্তকর্তন হয় আর মনিব তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে (অতঃপর) কিতাবাতের অর্থ আদায়ে অক্ষমতার (কারণে) তাকে দাসত্বে ফিরে যেতে হয় তাহলে ঐ ক্ষতিপূরণের অর্থ মনিবেরই হয়।

তদ্রূপ যদি খরিদকৃত গোলামের হাত ক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় কর্তন করা হয় আর বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকে অতঃপর বিক্রয় চুক্তি অনুমোদন করা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ ক্রেতার মালিকানায় সাব্যস্ত হয়। আযাদ করার বিষয়টি ভিন্ন, যেমন পিছনে বর্ণিত হয়েছে (যে, পূর্ণাঙ্গ মালিকানাই আযাদ করাকে বৈধতা দান করে।)

আর অর্ধেক মূল্যের অতিরিক্ত যা হবে তা সাদাকা করে দেবে।

কেননা গোলাম তার দায়ভুক্ত হয়নি কিংবা তাতে মালিকানা অবিদ্যমান হওয়ায় সন্দেহ রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, (অপহরণকারী থেকে) ক্রয়কারী যদি তাকে অন্যের কাছে বিক্রি করে অতঃপর মনিব প্রথম বিক্রয় চুক্তিকে অনুমোদন করে তাহলে দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটি বৈধ হবে না।

কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।[২]

তাছাড়া প্রথম বিক্রয় চুক্তিটিতে অনুমোদনের বিবেচনায় দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটিতে বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। আর একারণে শায়খায়নের মতে আযাদ করার বিষয়টি ভিন্ন (অর্থাৎ অপহরণকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারীর আযাদ করা অনুমোদনের পর কার্যকর হবে) কেননা বাতিল হওয়ার ঝুঁকি আযাদ করাকে প্রভাবিত করে না।

গ্রন্থকার বলেন, ক্রেতা যদি তাকে বিক্রি না করে থাকে বরং গোলামটি তার কবজায় থাকা অবস্থায় মারা যায় কিংবা নিহত হয় অতঃপর মনিব বিক্রয়কে অনুমোদন করে তাহলে বৈধতা লাভ করবে না।

কেননা আমরা বলে এসেছি যে, অনুমোদন প্রদানের একটি শর্ত হলো 'চুক্তিকৃত দ্রব্য' বিদ্যমান থাকা, অথচ মৃত্যুর মাধ্যমে তা অবিদ্যমান হয়েছে।

---

১. কেননা স্থগিত মালিকানার ক্ষেত্রে তিনি আযাদ করা বৈধ বলেন না। অথচ স্থগিত মালিকানা দ্বারা যদি ক্রেতার কোন প্রকার মালিকানা অধিকার সাব্যস্ত না হয় তাহলে অনুমোদনের পর সে ক্ষতিপূরণের মালিক হতো না।

২. অর্থাৎ নিরংকুশ মালিকানা যখন স্থগিত মালিকানার উপর উদ্ভূত হয় তখন নিজস্ব শক্তি বলে সে স্থগিত মালিকানাকে বাতিল করে দেয়। বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয়।

তদ্রূপ কতলের ক্ষেত্রেও একই কথা। কেননা কতলের কারণে ক্রেতার অনুকূলে বদল বা বাজার মূল্য সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়, যাতে বদল বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে গোলামটিকে বিদ্যমান বিবেচনা করা যায়।

কেননা কতলের সময় ক্রেতার এমন মালিকানা ছিলো না, যার বিনিময়ে (ক্রেতার অনুকূলে) বদল সাব্যস্ত হবে। সুতরাং গোলামটির অবিদ্যমানতা নিশ্চিত হয়ে যাবে। অবশ্য বিশুদ্ধ বিক্রয় চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত রয়েছে। কাজেই ক্রেতার অনুকূলে বদল বা বাজার মূল্য সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে। সুতরাং স্থলবর্তী বিদ্যমান থাকার সুবাদে বিক্রয় দ্রব্য বিদ্যমান বলে বিবেচিত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি অন্যের গোলাম তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি করে আর ক্রেতা বিক্রেতার কিংবা গোলামের মালিকের এই মর্মে স্বীকারোক্তির উপর 'বাইয়েনা' বা সাক্ষ্য পেশ করে যে, গোলামের মনিব তাকে বিক্রির আদেশ করেনি, এবং এই সূত্রে ক্রেতা বিক্রয় চুক্তি 'রদ' করতে চায় তাহলে তার 'বাইয়েনাহ' ও সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না।

কেননা দাবীর ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা রয়েছে। কারণ ক্রয়ের উদ্দ্যোগ তার পক্ষ থেকে বিক্রয়ের বৈধতার স্বীকারোক্তির সমতুল্য। আর দাবীর বিশুদ্ধতার উপর বাইয়েনাহ বা প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল।

আর বিক্রেতা যদি কাযীর নিকট এই মর্মে স্বীকারোক্তি করে তাহলে বিক্রয় বাতিল হবে।

অবশ্য ক্রেতা যদি বাতিলের আবেদন করে। কেননা দাবীর ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা স্বীকারোক্তির শুদ্ধতাকে রহিত করেনা। সুতরাং ক্রেতার অধিকার রয়েছে স্বীকারোক্তির ব্যাপারে বিক্রেতাকে সহযোগিতা করার। তখন উভয়ের মাঝে ঐক্যমত সাব্যস্ত হবে একারণেই ক্রেতার আবেদনের শর্তারোপ করা হয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন, زيادات গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, ক্রেতা যদি গোলামের মালিকানা দাবীকারীকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, অতঃপর সে বিক্রেতার এই মর্মের স্বীকারোক্তির উপর বাইয়েনাহ বা সাক্ষী উপস্থাপন করে যে, গোলামটি দাবীদারের মালিকানাভুক্ত, তাহলে এই বাইয়েনাহ গ্রহণ করা হবে।

মাশায়েখগণ দুই মাস'আলার মাঝে এভাবে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, (মতনে বর্ণিত) এই মাসআলায় গোলামটি রয়েছে ক্রেতার কবজায়। পক্ষান্তরে (زيادات এ বর্ণিত) সেই মাসআলায় অন্যের কবজায় রয়েছে। অর্থাৎ দাবীদারের হাতে রয়েছে। (সুতরাং ক্রেতার অনুকূলে তা নিরাপদ নয়।) আর মূল্য ফেরত নেয়ার জন্য শর্ত হলো দ্রব্যটি ক্রেতার অনুকূলে নিরাপদ না থাকা।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন লোকের বাড়ী বিক্রি করে আর ক্রেতা (বিক্রেতার আদেশ ছাড়া) সেটাকে নিজের নির্মাণের আওতাভুক্ত করে নেয়, তাহলে বিক্রেতা (ক্ষতিপূরণের) যামীন হবে না।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত, আর এটি আবু ইউসুফ (র) এরও পরবর্তী মত। প্রথমে তিনি বলতেন যে, বিক্রেতা ক্ষতিপূরণের যামীন হবে। আর এ-ই ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মত। এটা হল ভূসম্পত্তি গছবের মাসআলা। আর গছবের অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ আমরা তা আলোচনা করবো। সঠিক বিষয়ে আল্লাহই অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ বায় সালাম প্রসংগ

'সালাম' হচ্ছে কিতাবুল্লাহ দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত একটি বিক্রয় চুক্তি। আর তা হলো ঋণ দান সংক্রান্ত আয়াত। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদেয় হিসেবে 'সালাফ' (অগ্রীম মূল্য প্রদান) হালাল করেছেন এবং সে সম্পর্কে তাঁর কিতাবের দীর্ঘতম আয়াত নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার এই বাণী পাঠ করলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ الْاٰيَةَ

হে ইমানদারগণ, তোমরা যখন নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত পরস্পর ঋণ লেনদেন করো তখন তা লিখে নিও।

আর সুন্নাহ দ্বারাও তা অনুমোদিত হয়েছে আর তা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমন দ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যা মানুষের কাছে নেই, তবে তিনি বায় সালামের অনুমতি প্রদান করেছেন।

আর কিয়াস যদিও এর বৈধতা অস্বীকার করে, কিন্তু আমরা আমাদের বর্ণিত হাদীসের কারণে কিয়াস পরিহার করেছি।

কিয়াসের কারণ এই যে, এটা হচ্ছে অবিদ্যমান দ্রব্য বিক্রি করা। কেননা দাদনকৃত দ্রব্যই বিক্রয় দ্রব্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পাত্র পরিমাপিত ও ওজন পরিমাপিত যাবতীয় বস্তুতে 'বায় সালাম' বৈধ।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من اسلم منكم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم –

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি 'বায় সালাম' করে তাহলে সে যেন নির্ধারিত পাত্র ও নির্ধারিত ওজন ধার্য করে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত 'বায় সালাম' করে।

আর ওজন পরিমাপিত বস্তুসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দিরহাম-দীনার (রৌপ্য ও স্বর্ণ) ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য। কেননা এ দুটি হচ্ছে 'মূল্যদ্রব্য' অথচ 'দাদন-দ্রব্য' পণ্য দ্রব্য হওয়া আবশ্যক। সুতরাং এ দুটিতে 'বায় সালাম' বৈধ হবে না।

অতঃপর কারো কারো মতে এ বিক্রয় চুক্তি বাতিল হবে। আর কারো কারো মতে চুক্তির পক্ষদ্বয়ের উদ্দেশ্যকে যথাসম্ভব কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এটা বাকী মূল্যে বিক্রয় চুক্তিরূপে সংঘটিত হবে। আর চুক্তির ক্ষেত্রে শব্দ নয় মর্মই হলো বিবেচ্য।

তবে প্রথমোক্ত মতই অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা যে ক্ষেত্রে তারা চুক্তি সাব্যস্ত করেছে সে ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধতা সম্পাদন করা আবশ্যক হবে। আর এখানে তা সম্ভব নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তদ্রূপ গজ পরিমাপিত বস্তুসমূহের ক্ষেত্রেও 'বায় সাসাম' জায়িয।

কেননা গজ উল্লেখের মাধ্যমে এবং গুণ ও শিল্প উল্লেখের মাধ্যমে বস্তুটির পরিচয় ধার্য করা সম্ভব। আর অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য তা অপরিহার্য, যাতে 'সালামের' বৈধতার শর্ত বাস্তবায়িত হয়।

তদ্রূপ বেশী তারতম্যপূর্ণ নয় এমন গণনা প্রচলিত বস্তুর মধ্যেও সালাম জায়িয। যেমন আখরোট ও ডিম। কেননা কাছাকাছি পরিমাণ আকারের গণিত বস্তুর পরিমাণ পরিজ্ঞাত এবং তার গুণ নির্ধারণযোগ্য আর তা সমর্পণ সম্ভব। সুতরাং তাতে সালাম জায়িয হবে।

আর এগুলির মধ্যে ছোট-বড় সমান, কারণ লোক প্রচলনে এগুলির পার্থক্য ধর্তব্য নয়।

তরমুজ ও আনারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এর একেকটির মধ্যে বহু পার্থক্য থাকে। আর অর্থমূল্যের ক্ষেত্রে একেকটির পার্থক্য দ্বারাই গণনা নির্ভরবস্তুটির পার্থক্য জানা যায়।

ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, উট পাখির ডিমের ক্ষেত্রে সালাম জায়িয হবে না। কেননা তার একেকটির অর্থমূল্যে পার্থক্য হয়।

অতঃপর এগুলোতে গণনার ভিত্তিতে যেমন সালাম জায়িয হবে, তেমনি পাত্রগত পরিমাপের ভিত্তিতেও জায়িয হবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, পাত্র পরিমাপে জায়িয হবে না। কেননা এগুলো হচ্ছে গণনা নির্ভর বস্তু, পাত্র পরিমাপিত বস্তু নয়।

তাঁরপক্ষ থেকে এমনও বর্ণিত হয়েছে যে, গণনার ভিত্তিতে 'সালাম' জায়িয হবে না। কেনন এগুলোতে পার্থক্য রয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, পরিমাণ কখনো গণনা দ্বারা আবার কখনো পাত্র দ্বারা জানা যায়। তবে লোকের প্রচলন ভিত্তিতে এগুলো গণনানির্ভর হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাঁদের দু'জনের পরিভাষায় তা পাত্র পরিমাপিত হয়ে যাবে।

তদ্রূপ ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রেও গণনার ভিত্তিতে সালাম জায়িয হবে। তবে কেউ কেউ বলেন যে, এটা হলো ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে তা জায়িয হবে না। কেননা এগুলো মূল্য দ্রব্য।

শায়খায়নের দলীল এই যে, তাদের দু'জনের ক্ষেত্রে তাদের পরিভাষার ভিত্তিতে 'অর্থ মূল্যতা' সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তাঁদের দু'জনের পরিভাষায় অর্থমূল্যতা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ওযন পরিমাপিত বস্তুতে ফিরে যাবে না। ইতিপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি।

জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে 'সালাম' জায়িয হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, জায়িয হবে। কেননা শ্রেণী, বয়স, প্রকার ও গুণ বর্ণনা করার পর তা সুপরিজ্ঞাত হয়ে যায়। এরপর পার্থক্য অল্পই থাকে। সুতরাং তা বস্ত্র সদৃশ হলো।

আমাদের দলীল এই যে, যা কিছু উল্লেখ করা হলো সেগুলো উল্লেখ করার পরও অভ্যন্তরীণ গুণাগুণের বিবেচনায় অর্থ মূল্যের ক্ষেত্রে তাতে অনেক পার্থক্য থেকে যায়। সুতরাং তা বিবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে। বস্ত্রের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা মানুষের হাতে তৈরী। সুতরাং দুটি কাপড় যদি একই পদ্ধতিতে বয়ন করা হয় তাহলে তাতে খুব কমই পাথর্ক্য থাকে।

আর বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম জীবজন্তুর মধ্যে 'সালাম' করতে নিষেধ করেছেন, আর তাতে সর্বপ্রকার জীবজন্তু এমন কি চড়ুই পাখিও অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সালাম জায়িয নয়; যেমন মাথা ও পায়।

কেননা তাতে তারতম্য রয়েছে; কারণ তা তারতম্যপূর্ণ গণনানির্ভর বস্তু, যার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, চামড়ার ক্ষেত্রে গণনার ভিত্তিতে এবং লাকড়ীর ক্ষেত্রে আঁটির ভিত্তিতে এবং বাঁসের ক্ষেত্রেও আঁটির ভিত্তিতে সালাম জায়িয নেই।

কেননা এগুলোর মধ্যে তারতম্য রয়েছে। তবে যদি তার পরিমাণ জানা যায়, যেমন দাদন গ্রহীতাকে আঁটি বাঁধার রশির দৈর্ঘ্য বলে দেয়া হলো যে, এক বিঘত বা এক হাত হবে, তখন জায়িয হবে যদি এমনভাবে হয়; যাতে তারতম্যপূর্ণ না হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, চুক্তি সম্পাদনের সময় থেকে মেয়াদ পূর্তির সময় পর্যন্ত যদি দাদনকৃত দ্রব্য (বাজারে) বিদ্যমান না থাকে তাহলে তাতে 'বায় সালাম' জায়িয হবে না। এমন কি যদি চুক্তি সম্পাদনের সময় অবিদ্যমান থাকে, আর মেয়াদ পূর্তির সময় বিদ্যমান থাকে, কিংবা তার বিপরীত হয়, কিংবা দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে অবিদ্যমান থাকে তাহলেও জায়িয হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মেয়াদ পূর্তির সময় যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে সম্পূর্ণ আবশ্যক হওয়ার সময় সমর্পণ সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে জায়িয হবে।

আমাদের দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

لا تسلفوا فى الثمار حتى يبدو صلاحها -

উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ফলফলাদিতে সালাম করো না।

তাছাড়া এই কারণে সংগ্রহ করার মাধ্যমে সমর্পণের সক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং মেয়াদের পূর্ণ সময়ে বিদ্যমানতা অব্যাহত থাকা অপরিহার্য, যাতে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

যদি মেয়াদ পূর্তির পর অবিদ্যমান হয় তাহলে দাদনদাতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে সালাম বাতিল করবে আবার ইচ্ছা করলে দ্রব্যটি বিদ্যমান হওয়ার অপেক্ষা করবে।

কেননা সালাম তো শর্ত মোতাবেক হওয়ার কারণে বৈধ হয়েছে। আর উদ্ভূত অক্ষমতা দূর হওয়ার সম্ভাবনার মুখে রয়েছে। সুতরাং কবজা করার পূর্বে বিক্রীত গোলাম পালিয়ে যাওয়ার মত হলো।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ওজন ও প্রকার পরিজ্ঞাত থাকলে লোনা মাছে, 'বায় সালাম' জায়িয।

কেননা তার পরিমাণ পরিজ্ঞাত ও তার গুণ নির্ধারিত, আর যেহেতু তা (বাজারে) অনুপস্থিত হয় না সেহেতু তা সমর্পণ ক্ষমতাধীন রয়েছে।

তবে গণনার ভিত্তিতে মাছে 'বায় সালাম' জায়িয নয়।

কেননা এগুলোতে তারতম্য রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তাজা মাছে 'বায় সালাম' ভাল নয়। কিন্তু যদি ঐ মাছ ধরার মৌসুমে হয় ওজন নির্ধারিত হয় এবং প্রকার নির্ধারিত হয়। (তা হলে বিধেয়)।

কেননা শীত মৌসুমে তা দুষ্পাপ্য হয়ে যায়। সুতরাং যে দেশে কোন সময়েই দুষ্প্রাপ্য হয় না, সেখানে সব সময় 'বায় সালাম' জায়িয হবে।

তবে আমাদের উল্লেখকৃত কারণে তাতে ওজনের ভিত্তিতে জায়িয হবে, গণনার ভিত্তিতে নয়।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত একটি মতে যে বড় মাছ কেটে বিক্রি করা হয়, তার 'মাংসের' ক্ষেত্রে 'বায় সালাম' জায়িয হবে না। (তিনি তা বলেন) গোশতের সালামের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতের উপর কিয়াস করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সালামে' কোন কল্যাণ নেই।

ছাহেবায়ন বলেন, যদি গোশতের নির্ধারিত স্থান ও নির্ধারিত গুণ বর্ণনা করা হয় তাহলে জায়িয হবে।

কেননা এটা ওজন পরিমাপিত ও গুণ পরিজ্ঞাত বস্তু। একারণেই তো 'সদৃশ' দ্বারা তার 'যিমান' বা দায় শোধ করা হয়। আর ওজনের ভিত্তিতে তা ধারে নেয়া বৈধ হয় এবং তাতে 'রিবা' এর বিধান কার্যকর হয়।

পাখির গোশতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা পাখির গোশতের ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, হাড় কম-বেশী হওয়ার দিক থেকে কিংবা বছরের মৌসূমের পরিবর্তনে মোটা তাজা ও শীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে অজ্ঞতা থেকে যায়।

আর এই অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়। আর 'হাড় ছাড়ানো' গোশতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণে জায়িয হবে না। এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ মত।

আর সদৃশ্য দ্বারা যামিন বানানো (আমাদের মতে) গ্রহণযোগ্য নয়। ধারে নেওয়া সম্পর্কেও **একই কথা**। আর যদি তা বৈধ বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে এর কারণ এই যে, অনুরূপ ও সদৃশ বস্তু বাজার মূল্য থেকে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাছাড়া (ধারে নেয়ার ক্ষেত্রে) দেখে শুনে কবজা করা হয়। সুতরাং কবজাকৃত বস্তুর সদৃশ বস্তু তৎক্ষণাৎ জানা যাবে। কিন্তু শুধু বিবরণ যথেষ্ট হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মেয়াদী ছাড়া 'বায় সালাম' জায়িয নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, হাদীসে নিঃশর্ত রয়েছে এবং সালামের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং (মেয়াদ ছাড়া) তাৎক্ষণিকভাবেও সালাম জায়িয হবে।

আমাদের দলীল এই যে, আমাদের বর্ণিত রিওয়ায়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের বাণী হলো- الى اجل معلوم। (নির্ধারিত মেয়াদে)।

তাছাড়া এই কারণে যে, দরিদ্রদের প্রয়োজন পুরা করার জন্য 'অবকাশ' রূপে তা অনুমোদন করা হয়েছে। সুতরাং মেয়াদ থাকা আবশ্যক, যাতে ঐ মেয়াদে তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। তখন সে সমর্পণ করবে। পক্ষান্তরে যদি তাৎক্ষণিকভাবে সমর্পণ করতে সক্ষম হয় তাহলে তো অবকাশের হেতু পাওয়া গেলো না। সুতরাং সালাম অবৈধতার উপরই বহাল থাকবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নির্ধারিত মেয়াদ ছাড়া 'বায় সালাম' জায়িয হবে না।

কারণ আমাদের বর্ণিত হাদীস।

তাছাড়া এই কারণে যে, মেয়াদের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়, যেমন সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। আর মেয়াদের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এক মাস, কেউ কেউ বলেন, তিন দিন, আবার কারো কারো মতে অর্ধদিনের অধিক। তবে প্রথমোক্ত মত অধিকতর বিশুদ্ধ।

আর নির্দিষ্ট কোন লোকের পাত্র দ্বারা এবং নির্দিষ্ট কোন লোকের গজ দ্বারা 'বায় সালাম' করা জায়িয নয়। অর্থাৎ যদি তার পরিমাণ জানা না থাকে।

কেননা এতে পণ্যের সমর্পণ বিলম্বিত হতে পারে। আর কোন সময় হয়ত উক্ত পাত্র বা গজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে তা বিবাদের উদ্ভব ঘটাতে পারে। বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আর পাত্রটি এমন হতে হবে, যা সংকুচিত বা সম্প্রসারিত হয় না, যেমন পেয়ালা। আর যদি এমন হয় যে, চাপ দিলে তা চাপ গ্রহণ করে, যেমন থলেও ঝুড়ি, তাহলে বিবাদ সৃষ্টির কারণে তার মাধ্যমে সালাম জায়িয হবে না।

তবে লোক প্রচলনের কারণে পানির মশক দ্বারা জায়িয হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী বলেন, নির্ধারিত কোন অঞ্চলের খাদ্যদ্রব্য এবং নির্ধারিত কোন গাছের খেজুরের ক্ষেত্রে 'বায় সালাম' জায়িয নয়।

কেননা তাতে কোন আপদ আসতে পারে। ফলে প্রতিশ্রুত দ্রব্য অর্পণ করতে সক্ষম হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- أرأيت لو اذهب الله تعالى الثمر بم يستحل احدكم مال أخيه -তুমি কি লক্ষ্য করেছ, আল্লাহ্ যদি উক্ত ফল নষ্ট করে দেন তাহলে কিসের বিনিময়ে তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের মালকে হালাল করবে?

আর যদি কোন অঞ্চলের দিকে এই সম্পৃক্ত গুণ বর্ণনার জন্য হয়ে থাকে ফকীহগণের মতে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন, বোখারার খোশমুরান অঞ্চলের গম কিংবা ফারগানার বিসাখ অঞ্চলের গম।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সাতটি শর্ত ছাড়া সালাম জায়িব হবে না। নির্ধারিত শ্রেণী, যেমন গম কিংবা যব, এবং নির্ধারিত প্রকার, যেমন সেচ সিঞ্চিত বা বৃষ্টি সিঞ্চিত গম এবং নির্ধারিত গুণ, যেমন উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট এবং নির্ধারিত পরিমাণ, যেমন, পরিচিত কোন কয়েলের এত কয়েল। কিংবা এত ওজন এবং নির্ধারিত মেয়াদ।

এক্ষেত্রে মূল হচ্ছে আমাদের বর্ণিত হাদীস। এবং তার হিকমত তাই, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর মূলধনের পরিমাণ জানা, যদি মূলধন এমন হয়, যার পরিমাণের সাথে চুক্তি সম্পর্ক যুক্ত, যেমন পাত্র পরিমাপিত বস্তু বা ওজন পরিমাপিত বস্তু, বা গণনীয় বস্তু। আর দাদন দ্রব্যটি যদি পরিবহন ও খরচ সাপেক্ষ হয় তাহলে ঐ স্থান নির্ধারণ, যেখানে দাদন দ্রব্য হস্তান্তর করবে।

ছাহেবায়ন বলেন, মূলধন যদি (ইশারার মাধ্যমে) নির্ধারিত হয় তাহলে তার পরিমাণ উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তদ্রূপ হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বরং চুক্তি সম্পাদনের স্থানে সমর্পণ করবে।

এখানে আলাদা দু'টি মাসআলা হলো। প্রথম মাসআলার ক্ষেত্রে সাহেবায়নের দলীল এই যে, (মূলধন হস্তান্তরের) উদ্দেশ্য তো ইংগিত দ্বারা হাছিল হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এটাও মূল্য ও ভাড়ার মত হলো[১] এবং বস্ত্রের মত হলো।[২]

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, হয়ত মূলধনের কোন অংশ অতিরিক্ত খাদ মিশ্রিত বের হবে আর তা তো মজলিসেই বদল করা হয় না।[৩] সুতরাং যদি

১. যেমন বললো যে, এই দিরহামগুলো দ্বারা খরিদ করলাম, কিন্তু দিরহামের পরিমাণ বললো না।

২. যেমন বললো যে, এই দিরহামগুলো দ্বারা এই জিনিসটি ভাড়া নিলাম, কিন্তু দিরহামের পরিমাণ বললো না।

৩. যুক্তির খোলাসা এই যে, মূলধনের পরিমাণের অজ্ঞতা দাদন দ্রব্যের অজ্ঞতাকে অনিবার্য করে। কেননা দাদন গ্রহীতা মূলধন অল্প অল্প করে খরচ করে থাকে। এর মধ্যে অতিরিক্ত খাদ মিশ্রিত দিরহাম পাওয়া যেতে পারে। সেগুলো তো মজলিসে বদল করা হয় না। সুতরাং এগুলো সে ফেরত দেবে। আর যে পরিমাণ ফেরত দেবে সেই পরিমাণে চুক্তি বাতিল হবে। এখন মূলধনের পরিমাণ যদি জানা না থাকে তাহলে জানা যাবে না যে, কি পরিমাণে সালাম হ্রাস পেলো, আর কী পরিমাণে অবশিষ্ট থাকলো। আর দাদন দ্রব্যের অজ্ঞতা চুক্তিকে ফাসিদ করে। সুতরাং যা দাদন দ্রব্যের অজ্ঞতাকে অনিবার্য করে, সেটাও চুক্তিকে ফাসিদ করবে।

মূলধনের পরিমাণ জানা না থাকে তাহলে জানা যাবে না যে, কি পরিমাণে সালাম অবশিষ্ট থাকলো। কিংবা এমন হতে পারে যে, সে দাদন দ্রব্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলো তখন মূলধন ফেরত দেয়ার প্রয়োজন হবে।

আর এই চুক্তির ক্ষেত্রে ধারণা প্রসূতকে বাস্তবের সমপর্যায়ে বিবেচনা করা হয়। কেননা তা নিষিদ্ধতার কারণ বিদ্যমান সত্ত্বেও অনুমোদিত হয়েছে।

আর যদি মূলধন বস্ত্র হয়, তবে তার হুকুম বিপরীত হবে। কেননা গজের পরিমাণ হচ্ছে বস্ত্রের গুণগত বিষয়। বস্ত্রের পরিমাণের সাথে চুক্তি সম্পর্কযুক্ত হয়না।

মূলধনের পরিমাণ জানা সংক্রান্ত মতপার্থক্যেই অনুসিদ্ধান্ত এই যে, দুই শ্রেণীর দ্রব্যের ক্ষেত্রে সালাম করলো, কিন্তু দুটির প্রতিটির আলাদা মূলধন বর্ণনা করলো না। কিংবা দুই শ্রেণীর মুদ্রা (তথা দিরহাম-দীনার দাদন রূপে) প্রদান করলো। কিন্তু দুটির মধ্য হতে একটির পরিমাণ উল্লেখ করলো না।[১]

দ্বিতীয় মাসআলা সম্পর্কে ছাহেবায়নের দলীল এই যে, চুক্তির স্থানটি (দ্রব্য হস্তারের জন্য) নির্ধারিত হয়ে যায়। কেননা সমর্পণের অবশ্য সাব্যস্তকারী চুক্তি ঐ স্থানেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাছাড়া অন্য কোন স্থান হস্তান্তরের ব্যাপারে চুক্তিস্থলের সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করছে না। সুতরাং এটা শরীয়তের আদেশাবলীর ক্ষেত্রে (আদিষ্ট বিষয়ের) সম্ভাব্যতায় সময়গুলোর প্রথম অংশের সদৃশ হবে।[২] এবং তা করয় ও গসবের মত হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, বর্তমান সময়ে হস্তান্তর তো আবশ্যক নয়। সুতরাং চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হবে না। পক্ষান্তরে কলম ও গসবের বিষয়টি ভিন্ন। আর চুক্তির স্থানটি যখন নির্ধারিত হলো না তখন স্থান সম্পর্কে অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়াবে। কেননা স্থানের ভিন্নতার কারণে বস্তুসমূহের মূল্য বিভিন্ন হয়। সুতরাং স্থান বর্ণনা করা অপরিহার্য। আর এটা গুণ অজ্ঞাত হওয়ার মত হলো।

আর যেহেতু স্থানের ভিন্নতার মূল্য বিভিন্ন হয় যেমন গুণের ভিন্নতার মূল্য বিভিন্ন হয়: সেহেতু এখান থেকেই কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর

---

১. প্রথমটার উদাহরণ এই যে, একশ দিরহাম দাদন প্রদান করলো এক ধামা গম এবং এক ধামা যবের জন্য। কিন্তু গমের বিপরীতে মূলধন কত আর যবের বিপরীতে মূলধন কতো তা বর্ণনা করলোনা। আবু হানীফা (র) এর মতে এটা জায়িয হবে না। কেননা একশ দিরহাম বাজার মূল্য হিসাবে গম ও যবের মাঝে বন্টিত হবে। আর সেটা বোঝার উপায় হলো আন্দায করা। সুতরাং দু'টি দ্রব্যের কোনটারই মূলধন জানা হলো না। আর ছাহেবায়ন বলেন যে, চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত যথেষ্ট, আর তা পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, চুক্তির সম্পর্ক যেখানে পরিমাণের সাথে হয় সেখানে পরিমাণ নির্ধারণ করা অপরিহার্য। আর দুটির একটির পরিমাণ যখন জানা গেলোনা তখন সেই অংশের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। অতঃপর চুক্তির অখণ্ডতার কারণে অপরাংশের ক্ষেত্রেও বাতিল হয়ে যাবে। কিংবা অপরটির পরিমাণ অজ্ঞাত হওয়ার কারণে। আর অজ্ঞাত পরিমাণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে সূচনা থেকেই সালাম জায়িয হয় না। পক্ষান্তরে ছাহেবায়ন বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করাকেই যথেষ্ট মনে করেন।

২. অর্থাৎ নামায যিম্মায় ওয়াজিব হওয়ার হেতু হিসাবে সময়ের সমস্ত অংশ সমান। কিন্তু সময়ের প্রথম অংশটা যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন সেহেতু প্রথম অংশকেই যিম্মায় ওয়াজিব হওয়ার হেতু সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানেও যেহেতু চুক্তির স্থানটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন, সেহেতু....।

মতে হস্তান্তরের স্থান সম্পর্কে মতবিরোধ হলে পরস্পর শপথ গ্রহণকে অনিবার্য করবে। যেমন গুণের বিষয়ে মত বিরোধের ক্ষেত্রে।

আর কারো কারো মতে (ইমাম ত্রয়ের মতপার্থক্য) তাঁর মত এর বিপরীত ১ কেননা সাহেবায়নের মতে স্থান নির্ধারণের বিষয়টি চুক্তির অনিবার্য দাবী।

মূল্য, ভাড়া ও বাটোয়ারার বিষয়টিও একই মতপার্থক্যপূর্ণ। বাটোয়ারার সুরত এই যে, দু'জন ব্যক্তি নিজেদের শরীকানা বাড়ী বাটোয়ারা করলো এবং দু'জনের একজনের হিস্সায় এমন কোন বস্তু যুক্ত করলো, যার পরিবহন ও অন্যান্য খরচ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে, (সবার মতেই) মূল্যের ক্ষেত্রে তা শর্ত নয়। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, মূল্য যদি মেয়াদী হয় তাহলে (আবু হানীফা রহঃ এর মতে) তা শর্ত হবে। শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র) এমত গ্রহণ করেছেন।

আর সাহেবায়নের মতে ভাড়া আদায় করার জন্য বাড়ির স্থান কিংবা পশু সমর্পণের স্থানটি নির্ধারিত থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আর যে সব জিনিসের পরিবহন ও খরচ এবং বহন সমস্যা নেই, সে সব ক্ষেত্রে সর্ব সম্মতিক্রমেই সমর্পণের স্থান উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

কেননা সেগুলোর মূল্য বিভিন্ন হয় না।

আর যে স্থানে 'বায় সালাম' চুক্তি হয়েছে, সেখানেই সমর্পণ করবে।

গ্রন্থকার (র) বলেন, এটা হলো জামে ছাগীর এবং (মাবসূতের) বিক্রয় অধ্যায়ের বর্ণনা পক্ষান্তরে (মাবসূতের) ইজারা অধ্যায়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে হস্তান্তর করবে। এটা বিশুদ্ধতর মত। কেননা সব স্থানই সমান। আর বর্তমানে তো হস্তান্তর আবশ্যক নয়। কেউ কেউ বলেন, আর যদি উভয়ে কোন স্থান নির্ধারণ করে, তাহলে তা নির্ধারিত হবে না। স্থান নির্ধারণ কোন ফায়দা বয়ে আনে না।

আর কেউ কেউ বলেন, স্থানটি নির্ধারিত হয়ে যাবে। কেননা পথের ঝুঁকি নিরসনের ব্যাপারে তা ফায়দা বয়ে আনবে। আর যে সব জিনিসের বহনসমস্যা ও পরিবহন খরচ রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে যদি (দাদন দাতা) কোন শহর নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে শহরে হস্তান্তরই যথেষ্ট হবে। কেননা শহরের অঞ্চল বিস্তৃতি সত্ত্বেও আমাদের উল্লেখকৃত কারণে তা এক স্থানের ন্যায়।

---

১. অর্থাৎ আবু হানীফা (র) এর মতে পারস্পরিক কসম করা অনিবার্য হবে না এবং দাদন গ্রহীতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে সাহেবায়নের মতে কসম করা আবশ্যক হবে। কেননা সাহেবায়নের মতে স্থান নির্ধারণের বিষয়টি যেহেতু চুক্তি অনিবার্য দাবী তাই উহা আবশ্যক হয়ে গেছে। যেহেতু এটা চুক্তির অনিবার্য অংশ। আর চুক্তির অনিবার্য অংশ সম্পর্কে মতপার্থক্য পারস্পরিক শপথ গ্রহণকে অনিবার্য করে। সুতরাং এক্ষেত্রে শপথ গ্রহণকে অনিবার্য করবে। পক্ষান্তরে আবু হানীফা (র) এর মতে স্থান নির্ধারণ চুক্তির অনিবার্য দাবীর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এটা মেয়াদের মত হলো। আর মেয়াদ সম্পর্কে মতপার্থক্য হলে পারস্পরিক কসম অনিবার্য হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রেও হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মজলিসে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে মূলধন হস্তগত না করা পর্যন্ত 'বায় সালাম' বৈধ হবে না।

কেননা মূলধন যদি মুদ্রা (দিরহাম-দীনার) হয় তাহলে এটা হবে অনির্ধারিত জিনিসের বিনিময়ে অনির্ধারিত জিনিসের বিক্রির উপর পৃথক হওয়া। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকির পরিবর্তে বাকির বিক্রি নিষেধ করেছেন।

আর যদি মূলধন নির্ধারিত বস্তু হয় তাহলে কারণ এই যে, 'সালাম' অর্থই হলো বাকির পরিবর্তে নগদ গ্রহণ করা। কেননা (হাদীসে বর্ণিত) সালাফ ও সালাম শব্দদুটি দ্রুততার অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং শব্দের অর্থ প্রতিফলিত হওয়ার জন্য দুই বিনিময় দ্রব্যের একটি (অর্থাৎ মূলধন) নগদ কবজা করা অপরিহার্য।

তাছাড়া একারণেও মূলধন হস্তগত করা জরুরী, যাতে দাদন গ্রহীতা তা কাজে লাগাতে পারে এবং দাদন দ্রব্য সংগ্রহ করে সমর্পণ করতে সক্ষম হয়।

একারণেই আমরা বলেছি যে, দু'জনের কিংবা কোন একজনের জন্য যদি ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপিত হয় তাহলে 'বায় সালাম' বৈধ হবে না। কেননা এটা কবজা পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায়। কেননা ইচ্ছাধিকারের শর্ত চুক্তিটিকে তার ফলাফল তথা মালিকানা সাব্যস্তর ক্ষেত্রে সম্পন্ন হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক তদ্রূপ তাতে দেখার ইচ্ছাধিকারও সাব্যস্ত হয় না। কেননা তা অর্থবহ হবে না। দোষজনিত ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা কব্জার পূর্ণতার পথে তা প্রতিবন্ধক নয়।

আর যদি পৃথক হওয়ার আগেই এবং মূলধন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ইচ্ছাধিকারের শর্ত বাতিল করে তাহলে সালাম বৈধ হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার সদৃশ মাসআলা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।[১]

ফকীহগণ সালামের সব কয়টি শর্ত এভাবে একত্রে উল্লেখ করেছেন—মূলধন সম্পর্কে বর্ণনা ও দ্রুত হস্তান্তর, দাদন এবং দ্রব্য সম্পর্কে বর্ণনা ও তার মেয়াদের হস্তান্তর উল্লেখ এবং হস্তান্তরের স্থান বর্ণনা ও তা সংগ্রহ করার সক্ষমতা।

সুতরাং যদি নির্ধারিত পরিমাণ গমের জন্য দশ দিরহাম মূলধনে দাদন করে এভাবে যে, একশ দিরহাম দাদন গ্রহীতার নিকট পাওনা রইল আর একশ দিরহাম নগদ, তাহলে ঋণের অংশের সালাম বাতিল হবে।

কেননা কবজা পাওয়া যায়নি।

আর নগদ মূলধনের অংশে 'বায় সালাম' বৈধ হবে।

কেননা এই অংশে সালামের বৈধতার সমস্ত শর্ত বিদ্যমান রয়েছে। ফাসিদ হওয়া (পূর্ণ চুক্তিতে) ব্যাপ্ত হবে না। কেননা সালাম চুক্তি বিশুদ্ধরূপে সম্পন্ন হওয়ার পর

১. ফাসিদ বিক্রয় প্রসংগে বলা হয়েছে যে, যদি অজ্ঞাত মেয়াদের উপর বিক্রয় হয় আর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই তা রহিত করা হয় তাহলে বিক্রয় বৈধতা লাভ করবে। কিন্তু যুফার (র) এর মতে একবার যা ফাসিদ রূপে সম্পন্ন হয়েছে, পরবর্তীতে তা শুদ্ধতা লাভ করতে পারে না।

বহিঃকারণে তাতে ফাসাদ যুক্ত হয়েছে। একারণেই যদি মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে মূলধন নগদ দিয়ে দেয় তাহলে চুক্তিটি বৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু (মূলধন দখল না করে) পৃথক হওয়া দ্বারা আমাদের বর্ণিত কারণে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়।

এই সালাম চুক্তির বৈধতা এজন্য যে, (ঋণের উল্লেখ সত্ত্বেও) বিক্রয় চুক্তিতে তা নির্ধারিত হয় না। (বরং তার সমগোত্রীয় অনির্ধারিত ঐ পরিমাণ মুদ্রার সাথে চুক্তির সম্পর্ক হয়।) দেখুন না, তারা দু'জন যদি কোন নির্ধারিত বস্তু ঋণের বিনিময়ে বিক্রি করে আর পরে এ বিষয়ে একমত হয় যে, কোন ঋণ পাওনা নেই, তাহলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয় না। সুতরাং আলোচ্য সালাম চুক্তিটি বৈধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দাদনের মূলধন এবং দাদন দ্রব্য কবজার পূর্বে হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে না।

মূলধনের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, চুক্তির মাধ্যমে কবজার যে (শরীয়তি) হক সাব্যস্ত হয়েছে, তা পূর্ণ হয়না।

আর দাদন দ্রব্যের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, সেটা মূলত: বিক্রয় দ্রব্য আর কবজার পূর্বে বিক্রয় দ্রব্যে হস্তক্ষেপ জায়িয নয়।

দাদন দ্রব্যে কাউকে শরীক করা অথবা তা আসল মূল্যে অন্যের কাছে বিক্রয় বৈধ নয়।[১]

কেননা এটা হলো (কবজার পূর্বে) দাদন দ্রব্যে ভিন্ন মুআমিলা।

যদি উভয়ে সালাম চুক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে দাদনদাতার জন্য দাদন গ্রহীতার নিকট হতে ঐ মূলধনের বিনিময়ে কোন কিছু ক্রয় করা বৈধ হবে না; যতক্ষণ না পূর্ণ মূলধন কবজা করে নেয়।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك

তুমি তোমার 'সালাম-দ্রব্য' কিংবা তোমার মূলধন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করো না।

অর্থাৎ সালাম চুক্তি রহিত করার পর।

তাছাড়া এই কারণে যে, মূলধনটি বিক্রয় দ্রব্যের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে। সুতরাং (বিক্রয় দ্রব্যের মত) মূলধনেও কবজা করার পূর্বে হস্তক্ষেপ করা জায়িয হবে না।

এটা এজন্য যে, তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রত্যাহার হচ্ছে নতুন বিক্রয়। আর (এই নতুন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) সালাম দ্রব্যকে তো বিক্রয় দ্রব্য গণ্য করা সম্ভব নয়। কেননা তাতো রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং মূলধনকেই বিক্রয় দ্রব্য গণ্য করা হবে। কেননা দাদন দ্রব্যের ন্যায় মূলধনও এখানে অনির্ধারিত হয়ে পড়েছে।

---

১. শিরকাতের ছুরত এই যে, দাদনদাতা অন্য একজনকে বললো, আমাকে অর্ধেক মূলধন সরবরাহ করো এবং সালাম দ্রব্যের অর্ধেকের অংশীদার হও।

আর তাওলিয়ার ছুরত এই যে, দাদনদাতা কাউকে বললো, দাদনগ্রহীতাকে আমি যে মূলধন দিয়েছি, তা তুমি আমাকে দিয়ে দাও, 'সালাম দ্রব্য' তোমার হয়ে যাবে।

তবে (বিক্রয় প্রত্যাহারের) মজলিসেই মূলধন হস্তগত করা আবশ্যক নয়। কেননা এটা সার্বোতভাবে নতুনভাবে শুরু করা বিক্রয়ের হুকুমভুক্ত নয়।

এ বিষয়ে ইমাম যুফার (র)-এর ভিন্নমত রয়েছে। আর আমরা যা উল্লেখ করেছি তা হলে তার বিপক্ষে প্রমাণ।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি একটা নির্ধারিত পরিমাণের গমের জন্য সালাম চুক্তি করে আর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় দাদন গ্রহীতা কোন ব্যক্তির নিকট থেকে ঐ পরিমাণ গম খরিদ করতে দাদনদাতাকে দাদন দ্রব্য পরিশোধ হিসাবে তা কবজা করতে বলে, তাহলে তা দাদন দ্রব্যের পরিশোধ বলে গণ্য হবে না।

পক্ষান্তরে যদি আদেশ করে যে, দাদন দাতা প্রথমে তার পক্ষ থেকে কবজা করবে অতঃপর নিজের জন্য কবজা করবে। আর সেই হিসাবে প্রথমে একবার (দাদন গ্রহীতার পক্ষ হতে) পরিমাপ করলো এরপর নিজের জন্য পরিমাপ করলো, তাহলে জায়িয হবে।

কেননা এখানে পরিমাপকে শর্তরূপে ধার্য করে দুটি চুক্তি একত্র করা হয়েছে। সুতরাং দুবার পরিমাপ করা অপরিহার্য।

কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম দুইবার ছা' (বা পরিমাপ) কার্যকর না করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর এটাই হলো হাদীসের প্রয়োগ ক্ষেত্র। যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আর সালাম চুক্তি যদিও অগ্রবর্তী, কিন্তু সালাম দ্রব্যের কবজা তো 'পরবর্তী' হয়েছে। আর এই কবজা নতুন বিক্রয়ের সমতুল্য। কেননা (দখলকৃত) নির্ধারিত বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে সালাম চুক্তির মাধ্যমে (যিম্মায় সাব্যস্ত) অনির্ধারিত বস্তুটি থেকে ভিন্ন। যদিও একটি বিশেষ হুকুমের ক্ষেত্রে (শরীয়ত কর্তৃক) এটাকে হুবহু সালাম দ্রব্য গণ্য করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে সালাম দ্রব্যকে বদল করার নিষিদ্ধতা।[১]

সুতরাং (দাদন গ্রহীতার) ক্রয়ের পর বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

আর যদি (ক্রয়কৃত গম) 'বায় সালাম' না হয়ে করয (পরিশোধের জন্য ক্রয়কৃত গম) হয়ে থাকে আর সে পাওনাদারকে ঐ পরিমাণ গম (শুধু) কবজা করার আদেশ করে তাহলে জায়িয হবে।

কেননা করয অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার প্রদান। এজন্যই তা 'আরিয়াত' শব্দ দ্বারা সংঘটিত হয়। সুতরাং শরীয়তের হুকুম হিসাবে ফেরত দেয়া জিনিসটি সর্বতোভাবেই হুবহু গ্রহণকৃত জিনিস বলে গণ্য হবে।[২] তাই এক্ষেত্রে (পরিমাপের শর্তে) দুটি চুক্তি একত্র হয় না।

---

১. অর্থাৎ দাদন দ্রব্য বদল করা হারাম। এখন যদি দখলকৃত নির্ধারিত বস্তুটিকে চুক্তির সময় সাব্যস্ত অনির্ধারিত বস্তু থেকে ভিন্ন বলে বিবেচনা করি তাহলে দাদন দ্রব্য বদল করা সাব্যস্ত হয়, যা হারাম। ফলে সালাম বিক্রয় রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই শরীয়ত এক্ষেত্রে অভিন্নতার ধারণা অনুমোদন করেছে। পক্ষান্তরে আর সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত ভিন্নতাকে বিবেচনায় রেখেছে।

২. সুতরাং দাদন গ্রহীতার ওয়াকীল রূপে তার পক্ষ হতে একটি পরিমাপ কার্যকর করাই যথেষ্ট।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি নির্ধারিত পরিমাণের গমের জন্য সালাম করে আর দাদনদাতা দাদনগ্রহীতাকে দাতার বস্তায় তা মেপে ভরার আদেশ করে আর সে দাতার অনুপস্থিতিতে ঐ আদেশ পালন করে তাহলে এটা দাদন দ্রব্য পরিশোধ বলে গণ্য হবে না।

কেননা (দাদনদাতার পক্ষ হতে) পরিমাপের আদেশ দান বৈধ হয়নি। কারণ তার অধিকার ও প্রাপ্যতা হচ্ছে (সালাম গ্রহীতার যিম্মায় সাব্যস্ত) অনির্ধারিত বস্তু। নির্ধারিত বস্তু নয়। সুতরাং আদেশটি আদেশদাতার মালিকানার সাথে যুক্ত হয়নি। ফলে বিষয়টি এমন হলো যেন, দাদনগ্রহীতা দাদনদাতার কাছ থেকে বস্তা ধার নিলো এবং তাতে নিজের মালিকানার জিনিস রাখলো। সুতরাং এমন হলো যেন তার কাছে কারো দিরহাম পাওনা ছিলো। আর পাওনাদার দেনাদারের দিকে একটি থলে এগিয়ে দিলো যেন দেনাদার দিরহাম ওজন করে তাতে ভরে দেয়। এতে পাওনাদার দিরহাম কবজাকারী হবে না।

পক্ষান্তরে গম যদি খরিদকৃত হয় আর মাসআলার স্বরূপ হুবহু এই হয়, তাহলে ক্রেতা কবজাকারী বলে গণ্য হবে। কেননা আদেশটি বৈধ হয়েছে। কারণ সে ক্রয় সূত্রে নির্ধারিত বস্তুটির মালিকানা লাভ করেছে। সুতরাং আদেশটি তার মালিকানার সাথে যুক্ত হয়েছে।

দেখুন না, সে যদি বিক্রেতাকে গম পেষার আদেশ দিতো তাহলে সালাম চুক্তির ক্ষেত্রে আটা দাদনগ্রহীতার মালিকানা ভুক্ত হতো। আর সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার হতো। কেননা তাতে আদেশ দানের বৈধতা রয়েছে।

তদ্রূপ যদি বিক্রেতা সে গমগুলো নদীতে ফেলে দেয়ার আদেশ করে তাহলে সালামের ক্ষেত্রে সালামগ্রহীতার মাল হালাক হবে। আর ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার মাল থেকে হালাক হবে। এবং আমাদের উল্লেখিত (আদেশের বৈধতার) কারণে মূল্য ক্রেতার উপরই ধার্য হবে।

এজন্যই বিশুদ্ধ মতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঐ একটি পরিমাপই যথেষ্ট হবে। কেননা ক্রেতার বস্তার রক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে পরিমাণ ও কবজাকরণ উভয় ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতার স্থলবর্তী।

আর ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বিক্রেতার বস্তায় মেপে রাখার আদেশ করে আর সে (তার অনুপস্থিতিতে) তাই করে তাহলে ক্রেতা কবজাকারী বলে গণ্য হবে না। কেননা সে বিক্রেতার বস্তুগুলো ধার নিয়েছে, কিন্তু তা কবজা করেনি। সুতরাং বস্তুগুলো তার কবজায় আসেনি। ফলে বস্তায় যা রাখা হয়েছে, সে গমগুলোও তার কবজাভুক্ত গণ্য হবে না।

আর বিষয়টি এমনই হলো, যেন ক্রেতা বিক্রেতাকে গম মেপে বিক্রেতারই ঘরের এক কোণে রেখে দেয়ার আদেশ দিলো।

কেননা সকল কোণসহ ঘর বিক্রেতার দখলেই রয়েছে। সুতরাং ক্রেতা কবজাকারী হবে না।

আর যদি অনির্ধারিত বস্তু ও নির্ধারিত বস্তু একত্র হয় এবং বস্তা ক্রেতার হয় তাহলে নির্ধারিত বস্তু আগে মাপলে ক্রেতা (উভয় বস্তুর ক্ষেত্রেই) কবজাকারী বলে গণ্য হবে।

নির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রে এ জন্য যে তাতে আদেশ করা বৈধ হয়েছে (সুতরাং আদৃষ্ট ব্যক্তির কর্ম আদেশদাতার কর্ম বলে বিবেচ্য হবে।)

আর অনির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রে এজন্য যে, তা (বস্তায় পূর্ব থেকে বিদ্যমান) তার মালিকানার বস্তুর সাথে তার সম্মতিক্রমে হয়েছে। আর অনুরূপ দ্বারা কবজাকারী বলে গণ্য হয়।

যেমন কেউ গম ধার নিলো এবং কর্জ গ্রহীতা কর্জদাতাকে কর্জগ্রহীতার জমিতে গম বপনের আদেশ দিলো। তদ্রূপ যেমন কেউ স্বর্ণকারের কাছে একটি আংটি দিয়ে আদেশ করলো যেন সে নিজের পক্ষ থেকে তাতে অর্ধ দীনার যোগ করে দেয়।

পক্ষান্তরে যদি অনির্ধারিত বস্তু প্রথমে মাপে তাহলে (দুটো বস্তুর কোনটির ক্ষেত্রেই) সে কবজাকারী হবে না।

অনির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রে এজন্য যে, আদেশ প্রদান বৈধ হয়নি। আর নির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রে এজন্য যে, অর্পণের পূর্বেই বিক্রেতা নিজের মালিকানার সাথে তা মিশ্রিত করে ফেলেছে (এমনভাবে যে, পৃথক করা সম্ভব নয়।) সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বিক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যকে ধ্বংসকারী হলো। ফলে (হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রীত দ্রব্য হালাক হওয়ার কারণে) বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে।

আর এই মিশ্রণ ক্রেতার দিক থেকে সম্মতিসূচক নয়। কেননা হতে পারে যে, তার চাহিদা ছিলো নির্ধারিত বস্তুটি আগে মাপা।

ছাহেবায়নের মতে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে বিক্রয় রহিত করবে এবং ইচ্ছা করলে মিশ্রিত দ্রব্যে তাকে শরীক করে নেবে।

কেননা তাদের মতে মিশ্রণের অর্থ হালাক করা নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি নির্ধারিত পরিমাণ গমের জন্য একটি দাসীর দাদন রূপে দান করে আর দাদন গ্রহীতা দাসীর কবজা গ্রহণ করে। এরপর উভয়ে দাদন চুক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, অতঃপর ক্রেতার কবজা অবস্থায় দাসীটি মারা যায় তাহলে কবজা করার দিন দাসীর যে বাজার মূল্য ছিলো তা দাদন গ্রহীতার উপর ধার্য হবে।

আর যদি দাসীর মৃত্যুর পর উভয়ে দাদন চুক্তি প্রত্যাহার করে তাহলে জায়িয হবে।

কেননা বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাহার চুক্তির বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করবে। আর তা চুক্তি উদ্দিষ্ট দ্রব্যের বিদ্যমানতা দ্বারা হয়। আর সালাম-চুক্তিতে সালাম-দ্রব্যই হচ্ছে

চুক্তি উদ্দিষ্ট দ্রব্য। সুতরাং তা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ইকালাহ্ বৈধ হবে। আর (দ্বিতীয় মাসআলায় দাসীর মৃত্যুর পর) সূচনা হিসাবেই যখন ইকালাহ বৈধ হলো তখন (প্রথম মাসআলায় দাসীর মৃত্যুর পূর্বে সম্পাদিত ইকালাহ দাসীর মৃত্যুর পর) সমাপ্তিরূপে বহাল থাকা আরো স্বাভাবিক হবে। কেননা সূচনার চেয়ে বহাল থাকা অধিকতর সহজ।

আর (ইকালাহ এর মাধ্যমে) দাদন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চুক্তি যখন রহিত হলো তখন দাসীর ক্ষেত্রে অনুবর্তীরূপে চুক্তি রহিত হবে। সুতরাং দাসী ফেরত দেয়া আবশ্যক হবে। অথচ তা ফেরত দিতে সে অক্ষম হয়ে পড়েছে। সুতরাং দাসীর মূল্য ফেরত দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে।

যদি এক হাজার দিরহামে কোন দাসী ক্রয় করে (সালাম নয়, সাধারণ ক্রয়) এরপর উভয়ে বিক্রয় প্রত্যাহারে সম্মত হয়, অতঃপর দাসীটি ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় মারা যায় তাহলে ইকালাহ্ বাতিল হবে। আর যদি দাসীর মৃত্যুর পর তারা ইকালাহ্ করে তাহলেও ইকালাহ্ বাতিল হবে।

কেননা সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দাসীই হলো চুক্তি-উদ্দিষ্ট বিষয়, সুতরাং দাসীর মৃত্যুর পর চুক্তি বহাল থাকবেনা। (তাই চুক্তির উদ্দিষ্ট দ্রব্যের অনুপস্থিতিতে) সূচনারূপে ইকালাহ ছহী হবে না। কাজেই সমাপ্তি রূপেও তা বহাল থাকবে না। কেননা চুক্তির ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকবে না।

এটা পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয়ের বিপরীত। সেখানে সূচনারূপেও ইকালাহ্ ছহী হবে। আবার দুই বিনিময় দ্রব্যের হালাক হওয়ার পর ইকালা বহালও থাকবে। কেননা এখানে বিনিময় দ্রব্যদ্বয়ের উভয়টি বিক্রীত বস্তু (হতে পারে)।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি নির্ধারিত পরিমাণ গমের ব্যাপারে কোন লোককে কিছু দিরহাম দাদনরূপে প্রদান করে অতঃপর সালামগ্রহীতা বলে যে, নিম্নমানের গম প্রদানের শর্ত করেছিলাম আর দাদনদাতা বলে যে, কোন কিছুর শর্ত করোনি তাহলে দাদনগ্রহীতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা দাদন দাতা সালামের বৈধতা অস্বীকার করার কারণে 'হঠকারী' হবে (বিবাদী হবে না)[১] কারণ দাদন দ্রব্য সাধারণত: মূলধনের চেয়ে অধিক হয়ে থাকে।

আর বিপরীত ক্ষেত্রে ফকীহগণ বলেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে দাদন দাতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হওয়া আবশ্যক। কেননা সে সালামের বৈধতা দাবী করেছে। যদিও তার প্রতিপক্ষ অস্বীকারকারী (আর সাক্ষ্য) না থাকা অবস্থায় অস্বীকারকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়।

আর ছাহেবায়নের মতে সালামগ্রহীতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে অস্বীকারকারী; যদিও সে সালামের বৈধতা অস্বীকার করেছে। ইনশাআল্লাহ্ কিছু পরেই আমরা বিষয়টি আলোচনা করবো।

---

১. সালাম বৈধ হওয়ার জন্য গুণ বর্ণনা করা অপরিহার্য। সুতরাং এটা অস্বীকার করার অর্থ সালামের বৈধতা অস্বীকার করা। অথচ সালাম চুক্তি তার জন্য লাভজনক ছিলো। আর লাভের জিনিস অস্বীকার করাকে শরীয়ত বিবাদীর মর্যাদা দেয় না; বরং হঠকারী হিসাবে তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে।

আর সালাম গ্রহীতা যদি বলে যে, কোন মেয়াদ ছিলো না, পক্ষান্তরে দাদনদাতা বলে যে, অবশ্যই মেয়াদ ছিলো, তাহলে দাদনদাতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা মেয়াদ হচ্ছে সালামগ্রহীতার অধিকার। সুতরাং সে তার নিজের হক অস্বীকার করার মাধ্যমে হঠকারী হয়েছে; আর মতবিরোধের ক্ষেত্র হওয়ার কারণে মেয়াদে অনুপস্থিতিতে সালাম ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়।

সুতরাং মূলধন ফেরত দেয়ার লাভের কথা বিবেচ্য হবে না।

গুণ বর্ণনা করার (বিরোধের) বিষয়টি ভিন্ন।

এর বিপরীত ক্ষেত্রে ছাহেবায়নের মতে দাদনদাতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে তার প্রতিকূলে সাব্যস্ত হক অস্বীকার করছে। সুতরাং (প্রতিপক্ষ সাক্ষ্য পেশ করতে না পারা অবস্থায়) তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও সে চুক্তির বৈধতা অস্বীকার করেছে।

যেমন—(মোদাবারার ক্ষেত্রে) মূলধনদাতার বিষয়টি। মোদারিব বা মূলধন গ্রহীতাকে যদি সে বলে তোমার জন্য দশ দিরহাম কম অর্ধেক লভ্যাংশ শর্ত করেছিলাম আর মোদরিব বা মূলধন গ্রহীতা বলে যে, না, বরং পূরো অর্ধেক লভ্যাংশ আমার জন্য শর্ত করেছো। তখন মূলধন দাতাব বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। কেননা সে তার প্রতিকূলে লভ্যাংশের প্রাপ্যতা অস্বীকার করেছে; যদিও (এর ফলে) সে চুক্তির বৈধতা অস্বীকারকারী হচ্ছে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সালাম গ্রহীতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে সালামের বৈধতা দাবী করছে। কারণ তারা একটি একই চুক্তির উপর একমত হয়েছে। সুতরাং দৃশ্যত: তার চুক্তির বৈধতার ব্যাপারেও একমত বলে গণ্য হবে। মোদারাবার মাসআলাটি ভিন্ন।

তাছাড়া (সালাম চুক্তি ও মোদারাবা চুক্তির মাঝে আরেকটি পার্থক্য এই যে মোদারাবা চুক্তি বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে মতপার্থক্য বিবেচ্য হবে না। ফলে শুধু মোদারিব কর্তৃক) লভ্যাংশের প্রাপ্যতার দাবী অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে সালাম চুক্তি হচ্ছে বাধ্যতামূলক।[১]

সুতরাং মূলনীতি দাঁড়ালো এই যে, যার বক্তব্য হঠকারিতামূলক হবে সেক্ষেত্রে সর্ব সম্মতিক্রমে তার প্রতিপক্ষের (তথা বৈধতার দাবীকারীর) বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি যার কথা বিবাদীর কথা রূপে (অর্থাৎ নিজের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে) উচ্চারিত হয় আর একই চুক্তির উপর মতৈক্য হয় সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে

১. খোলাসা এই যে, মোদারাবা চুক্তিটি বাধ্যতামূলক নয়। তাই উভয় পক্ষের যে কোন একজন চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরও এককভাবে তারা রহিত করতে পারে। আর যখন তা বাধ্যতামূলক হলো না তখন চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মতপার্থক্যের কারণে চুক্তিটি রহিত হয়ে যাবে। আর চুক্তি যখন রহিত হয়ে যাবে তখন শুধু রাব্বুল মালের মাল সম্পর্কে মোদারিবের দাবী অবশিষ্ট থাকবে। সেক্ষেত্রে সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকার কারণে অস্বীকারকারীর বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। আর অস্বীকারকারী হচ্ছে রাব্বুল মাল।

চুক্তির বৈধতা দাবীকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর ছাহেবায়নের মতে অস্বীকারকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে যদিও সে চুক্তির বৈধতা অস্বীকারকারী।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও স্থূলত্ব উল্লেখ করা হয় তাহলে কাপড়ের ক্ষেত্রে সালাম জায়িয হবে।

কেননা সে একটি পরিজ্ঞাত ও হস্তান্তর সম্ভব সালাম করেছে, যেমন আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

আর যদি রেশমী কাপড় হয় তাহলে তার ওজনও উল্লেখ করা অপরিহার্য। কেননা রেশমী বস্ত্রের ক্ষেত্রে ওজন উদ্দেশ্যভুক্ত বিষয়।

মূল্যবান পাথর ও মনিমুক্তার ক্ষেত্রে সালাম জায়িয নয়।

কেননা এর এককগুলো বেশী পার্থক্যপূর্ণ। যে সকল ছোট মুক্তা ওজন করে বিক্রি হয় সেগুলোতে সালাম জায়িয হবে। কেননা ঐগুলো ওজন দ্বারা জানা যায়।

কাঁচা ইট ও পোড়া ইটে সালাম জায়িয হবে, যদি নির্ধারিত ছাঁচ উল্লেখ করা হয়।

কেননা এটা হলো গণনীয় ও কাছাকাছি আকারের দ্রব্য। বিশেষত: যদি ছাঁচ উল্লেখ করা হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে সকল দ্রব্যের গুণ নির্ণয় করা এবং তার পরিমাণ জানা সম্ভব, তাতে সালাম জায়িয হবে।

কেননা তা বিবাদ পর্যন্ত গড়াবে না।

আর যেগুলোর গুণ নির্ণয় করা এবং পরিমাণ জানা সম্ভব নয়, তাতে সালাম জায়িয নয়।

কেননা সালাম-দ্রব্য হচ্ছে অনির্ধারিত। আর গুণ নির্ণয় ছাড়া তা এই পরিমাণ অজ্ঞাত থাকে, যা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়।

তশতরি, আতরের শিশি কিংবা মোজা কিংবা এজাতীয় অন্য কিছুতে (যেমন টুপি, বদনা, থলে) সালাম করায় কোন দোষ নেই। যদি (পরিচয় বর্ণনা দ্বারা) তা পরিজ্ঞাত হয়।

কেননা সালামের শর্তসমূহ তাতে বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি পরিজ্ঞাত না হয় তাহলে তাতে বৈধতার কোন অবকাশ নেই। কেননা সেটা হবে অজ্ঞাত দেয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি উপরে বর্ণিত কোন জিনিস প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করার ফরমায়েশ দেয়, তাহলে তা জায়িয হবে।

এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের মত। কেননা সাধারণ প্রচলনের মাধ্যমে ইজমা (বা সর্বসম্মতি) সাব্যস্ত হয়েছে।

কিয়াস মতে তা জায়িয হবে না। কেননা এটা হলো অবিদ্যমান জিনিসের বিক্রয়। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, এটা 'বিক্রয়' সম্পন্ন হবে, বিক্রয়ের ওয়াদা রূপে নয়।

আর অবিদ্যমান জিনিসকেও কখনো কখনো গুণগত ও বিধানগতভাবে বিদ্যমান গণ্য করা হয়।

আর (ফরমায়েশী চুক্তির ক্ষেত্রে) নির্ধারিত দ্রব্যই হচ্ছে চুক্তি উদ্দিষ্ট দ্রব্য। এমন কি যদি সে তার তৈরী নয়, বরং অন্যের তৈরি জিনিস কিংবা চুক্তির আগে তার তৈরিকৃত জিনিস প্রদান করে আর সে তা নিয়ে নেয় তাহলে জায়িয হবে।

আর ফরমায়েশ দাতার পক্ষ থেকে নির্বাচন ছাড়া (ফরমায়েশের ভিত্তিতে) তৈরিকৃত দ্রব্যটি নির্ধারিত হবে না। এমন কি কারিগর যদি ফরমায়েশ দাতার দেখার পূর্বে বিক্রি করে ফেলে তাহলে তা জায়িয হবে। এখানে যেসব বিধান বর্ণনা করা হলো তা-ই বিশুদ্ধ।

ইমাম মুহাম্মদ বলেন, (র) আর তার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করবে, আর ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করবে না।

কেননা সে না দেখা জিনিস খরিদ করেছে; কিন্তু কারিগরের (তথা ফরমায়েশ গ্রহণকারীর) ইচ্ছাধিকার নেই, মাবসূতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা সে না দেখা জিনিস 'বিক্রয়' করেছে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, কারিগরেরও ইচ্ছাধিকার থাকবে। কেননা ক্ষতি ছাড়া 'চুক্তি-উদ্দিষ্ট' বস্তু হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। যেমন চামড়া ইত্যাদি কর্তন করা।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, উভয়ের কারোরই ইচ্ছাধিকার নেই। কারিগরের ইচ্ছাধিকার না থাকার কারণ আমরা উল্লেখ করেছি। আর ফরমায়েশ দাতার ইচ্ছাধিকার না থাকার কারণ এই যে, তার জন্য ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত করাতে কারিগরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার দিক রয়েছে।

কেননা তৈরি বস্তুটি অন্য কেউ এই পরিমাণ মূল্যে ক্রয় করবে না। যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে, যেমন কাপড় ইত্যাদি মানুষের মাঝে এরূপ ফরমায়েশ দেয়ার প্রচলন নেই সেসব ক্ষেত্রে ফরমায়েশী চুক্তি জায়িয হবে না। কেননা বৈধতা দানকারী দিক বিদ্যমান নেই।

আর যে কোন ক্ষেত্রে প্রচলন রয়েছে তাতে ফরমায়েশী চুক্তি জায়িয হবে। যদি গুণ বর্ণনা দ্বারা বস্তুটিকে পরিজ্ঞাত করা সম্ভব হয়, যাতে ফরমায়েশকৃত বস্তুটি অর্পণ করা সম্ভব হয়।

আর 'মেয়াদ ছাড়া' কথাটি উল্লেখ করার কারণ এই যে, যে সকল ক্ষেত্রে প্রচলন রয়েছে, তাতে যদি মেয়াদ ধার্য করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা সালাম চুক্তি হয়ে যাবে। ছাহেবায়ন ভিন্নমত পোষণ করেন।

আর যে সকল ক্ষেত্রে প্রচলন নেই তাতে যদি মেয়াদ নির্ধারণ করে তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে তা 'সালাম' হয়ে যাবে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, استصناع (কার্যাদেশ বা ফরমায়েশ) শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো বস্তু তৈরি করার আদেশ। সুতরাং শব্দটির অর্থ চাহিদা রক্ষা করা হবে। আর মেয়াদের উল্লেখকে তাড়া দেওয়ার অর্থে প্রয়োগ করা হবে।

যে সকল ক্ষেত্রে প্রচলন নেই সে সকল ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা হচ্ছে ফাসেদ ফরমায়েশ। সুতরাং মেয়াদের উল্লেখের সূত্রে এটাকে শুদ্ধ সালামের উপর প্রয়োগ করা হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, এটা একটি অনির্ধারিত দেয়, যা সালাম হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আর সালামের বৈধতা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, যাতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে তাদের মাঝে কাজের ফরমায়েশ প্রদানের প্রচলন বিষয়ে এক প্রকার সন্দেহ রয়েছে। (কেননা ইমাম শাফেয়ী (র) এতে ভিন্ন মত পোষণ করেন।) সুতরাং শব্দটিকে সালামের অর্থে গ্রহণ করাই উত্তম হবে। আল্লাহই অধিক জানেন।

বিক্ষিপ্ত কিছু মাসআলা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কুকুর, চিতা ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী বিক্রি করা জায়িয রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশু সমান।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, দংশনকারী কুকুর বিক্রি করা জায়িয নয়। কেননা তা থেকে উপকার অর্জিত হয় না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কোন প্রকার কুকুর বিক্রি করা জায়িয নয়। কেননা নবী (স) বলেছেন- ان من السحت مهر البغى وثمن الكلب -ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিক এবং কুকুর বিক্রির মূল্য হারামের অন্তর্ভুক্ত।

তাছাড়া কুকুর হচ্ছে সত্তাগতভাবে নাপাক আর নাপাক হওয়া বস্তুটির তুচ্ছতার প্রতি ইঙ্গিত করে। পক্ষান্তরে বিক্রির বৈধতা বস্তুটি মর্যাদার প্রতি ইংগিত করে। সুতরাং বিক্রির বৈধতা নিষিদ্ধ হবে।

আমাদের প্রমাণ হলো বর্ণিত হাদীস যে, নবী (স) কুকুর বিক্রি নিষেধ করেছেন, শিকারের কুকুর এবং পশুপাল পাহারা দেওয়ার কুকুরের বিক্রি নিষিদ্ধ নয়।

তাছাড়া এই কারণে যে, প্রহরার এবং শিকারের উদ্দেশ্যে এই কুকুর দ্বারা উপকার লাভ হয়। সুতরাং এটি (অর্থমূল্য সম্পন্ন) মাল হবে। তাই তা বিক্রি করা জায়িয হবে। কষ্টদায়ক কীট পতঙ্গের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা দ্বারা উপকার লাভ হয় না।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বর্ণিত হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। উদ্দেশ্য ছিলো তাদের কুকুর পালার অভ্যাস নির্মূল করা।

আর আমরা কুকুরের সত্তাগত নাপাকির দাবী স্বীকার করি না এবং যদি স্বীকারও করা হয় তাহলে আমাদের বক্তব্য এই যে, একারণে তা খাওয়া হারাম হবে। বিক্রি করা হারাম হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মদ ও শুকর বিক্রি করা জায়িয হবে না।

কেননা নবী (স) এ সম্পর্কে বলেছেন-

ان الذى حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها

-যে মহান সত্তা তা পান করা হারাম করেছেন তিনি তা বিক্রি করা এবং তার মূল্য ভক্ষণ করাও হারাম করেছেন।

তাছাড়া আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, আমাদের (মুসলমানদের) জন্য তা মাল নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সমস্ত বেচাকেনার ক্ষেত্রে যিম্মীগণ মুসলমানদের ন্যায়।

কেননা নবী (স) বলেছেন-

فاعلمهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين

—তখন তাদের জানিয়ে দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে ঐ সকল সুবিধা যা মুসলমানদের জন্য রয়েছে; এবং তাদের উপর রয়েছে ঐ সকল দায়-দায়িত্ব; যা মুসলমানদের উপর রয়েছে।

তাছাড়া (মুআমালার ক্ষেত্রে) তারাও মুসলিমদের মতই শরীয়তের সম্বোধিত এবং প্রয়োজন গ্রস্ত।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন ঃ তবে বিশেষভাবে মদ ও শূকরের ক্ষেত্রে (তারা অন্তর্ভুক্ত নয়)।

কেননা মদের ক্ষেত্রে তাদের বিক্রয় চুক্তি ফলের রসের ক্ষেত্রে মুসলিমদের বিক্রয় চুক্তির মত। আর শূকরের ক্ষেত্রে তাদের বিক্রয় চুক্তি বকরীর ক্ষেত্রে মুসলিমদের বিক্রয় চুক্তির মত।

কারণ তাদের বিশ্বাস মতে এগুলো হচ্ছে (মূল্য সম্পন্ন) সম্পদ। আর আমাদের আদেশ করা হয়েছে, যেন আমরা তাদের বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দেই। উমর (রা)-এর নিম্নোক্ত আদেশ তা প্রমাণ করে :

وَلُوهُمْ بيعها وخذوا العشر من اثمانهما

তাদেরকে ঐ দুটি বিক্রি করার ক্ষমতা দান কর এবং তার মূল্য থেকে উশর গ্রহণ কর।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি অন্যকে বলে যে, অমুকের কাছে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার গোলাম বিক্রি করো এই শর্তে যে, ঐ এক হাজারের বাইরে মূল্যের পাঁচশ দিরহামের আমি যিম্মাদার। আর সে গোলাম বিক্রি করলো, তাহলে এটা জায়িয হবে। আর বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে এক হাজার উশুল করবে আর দায় গ্রহণকারীর কাছ থেকে পাঁচশ দিরহাম গ্রহণ করবে।

পক্ষান্তরে দায়গ্রহণকারী যদি 'মূল্য থেকে' কথাটা না বলে তাহলে এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রয় জায়িয হবে। আর দায়গ্রহণকারীর উপর কোন দায় আসবে না।

এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, আমাদের মতে মূল্য এবং বিক্রীত দ্রব্যের সাথে অতিরিক্ত সংযোজন বৈধ রয়েছে আর তা মূল চুক্তির সাথেই যুক্ত হবে।

ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল এই যে, এটা হলো বিক্রয় চুক্তিকে একটি বৈধ গুণ থেকে আরেকটি বৈধ গুণে পরিণত করা। অর্থাৎ (মূল্য ও বাজার মূল্য) সমান সমান হওয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কিংবা লাভজনক হওয়া।

আর কখনো এমন হয় যে, ক্রেতা নিজেও অতিরিক্ত সংযোজনের বিনিময়ে কিছু অর্জন করে না। যেমন সে মূল্যের সাথে অতিরিক্ত সংযোজন করলো অথচ পূর্ব নির্ধারিত মূল্যটি বিক্রীত দ্রব্যের সম পরিমাণ ছিলো। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তির উপরও

অতিরিক্ত সংযোজনের শর্ত আরোপ করা যেতে পারে। যেমন, 'খোলা'-এর বিনিময়ে (খোলা চুক্তিকারিণী স্ত্রী লোকটির পরিবর্তে অন্যের আদায় করার শর্ত আরোপ করা যায়।) তবে তার জন্য শর্ত হলো উচ্চারণগত ও দৃশ্যগত দিক থেকে বিনিময় সাব্যস্ত হওয়া (এজন্য মূল্য শব্দটা উচ্চারণ করতে হবে এবং বিক্রীত দ্রব্যকে মূল্য ও সংযোজিত মূল্যের বিনিময় বলে গণ্য করতে হবে)। সুতরাং যখন 'মূল্য থেকে' কথাটা বলবে তখন (তৃতীয় ব্যক্তির উপর) অতিরিক্ততার দায় আরোপের শর্ত বিদ্যমান হবে এবং তা বৈধ হবে। আর যদি তা না বলে তাহলে শর্ত বিদ্যমান না থাকার কারণে বৈধ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি দাসী ক্রয় করে এবং উহা কবজা করার পূর্বেই তাকে বিবাহ দেয় আর স্বামী তার সাথে সহবাস করে তাহলে বিবাহ জায়িয হবে।

কেননা বিবাহ দানের কর্তৃত্বের কারণ আর তা হল 'দাস সত্তার' পূর্ণ মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। (অর্ধেক মালিকানা হলে জায়িয হবে না)। আর তাকে মাহর আদায় করতে হবে।

আর এই বিবাহদান (যার সংগে সহবাস যুক্ত হয়েছে) কবজা বলে গণ্য হবে। কেননা স্বামীর মনিবের পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের কারণেই স্বামীর সহবাস হয়েছে। সুতরাং স্বামীর 'কর্ম' তারই 'কর্ম' হবে।

আর যদি স্বামী তার সাথে সহবাস না করে তাহলে কবজা বলে গণ্য হবে না। আর কিয়াসের বিবাহের মধ্যেই সে কবজাকারী হয়ে যাবে। কেননা বিবাহ দান আইনের চোখে দোষযুক্তকরণ। সুতরাং একে প্রকৃত দোষযুক্তকরণের সাথে কিয়াস করা হবে। সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, প্রকৃত দোষযুক্তকরণের মধ্যে পাত্রের উপর অধিকার অর্জিত হয়। আর তাতে সে কবজাকারী সাব্যস্ত হয়। আর আইনের দৃষ্টিতে দোষযুক্তকরণে তা হয় না। (অর্থাৎ তাতে সত্তাগত কোন পরিবর্তন হয় না। শুধু আগ্রহ হ্রাস পায়) সুতরাং দুটো পৃথক হয়ে গেলো।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন গোলাম খরিদ করে আর (মূল্য পরিশোধের পূর্বেই) ক্রেতা গায়েব হয়ে যায় অথচ গোলাম বিক্রেতার কবজায় থাকে আর বিক্রেতা (কাযীর আদালতে) এই মর্মে 'সাক্ষ্য প্রমাণ' পেশ করলো যে, সে তার কাছে গোলামটি বিক্রি করেছে। এমতাবস্থায় যদি ক্রেতার অনুপস্থিতির স্থান জানা থাকে তাহলে বিক্রেতার প্রাপ্য ঋণ উশুল করার জন্য ঐ গোলাম পুনঃ বিক্রি করা যাবে না।

কেননা বিক্রি না করেও বিক্রেতাকে তার প্রাপ্য হক পর্যন্ত উপনীত করা যায়। অথচ বিক্রি করার ক্ষেত্রে ক্রেতার হক নষ্ট করা হয়।

আর যদি জানা না যায় সে কোথায় রয়েছে তাহলে গোলামকে বিক্রি করে মূল্য উশুল করা হবে।

কেননা বিক্রেতার স্বীকারোক্তিতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং সে (মালিকানাকে) যেভাবে নিজের প্রাপ্য হকের সাথে আবদ্ধ অবস্থায় স্বীকার করেছে সেভাবেই তা সাব্যস্ত হবে। আর যখন প্রাপ্য হক ক্রেতার কাছ থেকে উশুল করা অসম্ভব হলো তখন কাজী ঐ হক উশুল করার ব্যাপারে তা বিক্রির ব্যবস্থা করবেন।

যেমন বন্ধক প্রদানকারী মারা গেলে আর ক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যের কবজা না করে দেউলিয়া অবস্থায় মারা গেলে। ক্রেতা বিক্রীত দ্রব্য কবজা করার পর গায়েব হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন।

কেননা বিক্রীত দ্রব্যের সাথে বিক্রেতার হক আর সংযুক্ত থাকেনি। (বরং ক্রেতার যিম্মায় দায় ও ঋণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে)

মূল্য পরিশোধের পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তা ক্রেতার অনুকূলে সংরক্ষণ করে রাখা হবে। কেননা এটা হলো তার প্রাপ্য হকের বদল।

আর যদি (বিক্রেতার প্রাপ্য হকের চেয়ে) কম হয় তাহলে ক্রেতার কাছ থেকে উদ্ধার করা হবে।

আর যদি ক্রেতা দু'জন হয় এবং তার মধ্যে একজন গায়েব হয়ে যায়, তাহলে উপস্থিত ক্রেতা-পূর্ণমূল্য পরিশোধ করে বিক্রীত দ্রব্যের দখল গ্রহণ করবে। আর অপরজন যখন উপস্থিত হবে তখন সে তার শরীকদারকে মূল্য পরিশোধ না করে তার হিসসা গ্রহণ করতে পারবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, উপস্থিত ক্রেতা যদি পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে তাহলেও সে শুধু নিজেই অবশিষ্ট কবজা করতে পারবে। আর সংগীর পক্ষ থেকে যা সে পরিশোধ করেছে সে ব্যাপারে সে সৌজন্যমূলক দানকারী গণ্য হবে।

কেননা সে অন্যের ঋণ তার নির্দেশ ছাড়া আদায় করেছে। সুতরাং (পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে) সে তার কাছে রুজু করতে পারবে না। আর সে তার শরীকদারের অংশের ব্যাপারে সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। সুতরাং সে ঐ অংশের দখল গ্রহণ করতে পারবে না।

তারফায়নের দলীল এই যে, সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে সে বাধ্য। কেননা বিক্রয় চুক্তিটি যেহেতু অভিন্ন চুক্তি আর মূল্যের সামান্য পরিমাণ বাকি থাকা অবস্থায়ও বিক্রেতার বিক্রয়দ্রব্য আটক রাখার অধিকার রয়েছে; সেহেতু সে সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করা ছাড়া নিজের অংশ দ্বারা উপকৃত হতে পারবেনা। আর বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধকারী রুজু করতে পারবে। যেমন, বন্ধক রাখার জন্য কোন বস্তু ধারে দানকারী। (বন্ধকদাতা দেউলিয়া হয়ে গেলো আর ধারদাতা নিজে পরিশোধ করে বন্ধকী দ্রব্য ছাড়িয়ে আনলো। এমতাবস্থায় বন্ধকদাতার কাছে পরে রুজু করতে পারে।)

আর যখন সে অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে রুজু করার অধিকার পেলো তখন সে তার হক উশুল করা পর্যন্ত অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশটি তার কাছ থেকে আটক রাখতে পারে। যেমন ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়াকীল যদি নিজের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে কোন দাসী খরিদ করে তাহলে স্বর্ণ ও রৌপ্য অর্ধেক অর্ধেক হবে।

কেননা সে 'মিছকাল' পরিমাপকে উভয়ের দিকে সমভাবে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং কোন অগ্রবর্তিতা না থাকার কারণে উভয়ের প্রতিটি থেকে পাঁচশ মিছকাল অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

একইভাবে যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের এক হাজারের বিনিময়ে কোন দাসী ক্রয় করে তাহলে স্বর্ণের ক্ষেত্রে পাঁচশ মিছকাল ওয়াজিব হবে আর রৌপ্যের ক্ষেত্রে পাঁচশ দিরহাম ওয়াজিব হবে, যা প্রতিদশ দিরহাম সাত মিছকাল ওজন সম্পন্ন।

কেননা সে 'হাজার' কে উভয়ের দিকে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং উভয়ের প্রতিটির ক্ষেত্রে প্রচলিত ওজনের দিকেই তা অভিমুখী হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : কারো যদি কারো কাছে উৎকৃষ্ট দশ দিরহাম পাওনা থাকে এবং সে তাকে নিকৃষ্ট দিরহামে পরিশোধ করে দেয়, আর সে না জেনে তা খরচ করে ফেলে কিংবা তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তা পরিশোধ বলে গণ্য হবে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তার আদায়কৃত খাদ মিশ্রিত দিরহামের অনুরূপ দিরহাম ফেরত দেবে এবং নিজের উৎকৃষ্ট দিরহাম ফেরত নেবে।

কেননা মূল দিরহামের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি গুণের ক্ষেত্রেও তার প্রাপ্য হক বিবেচ্য হবে। আর গুণের দায় ও ক্ষতিপূরণ অবশ্য সাব্যস্তকরণের মাধ্যমে গুণের ক্ষেত্রে প্রাপ্য অধিকারের বিষয়টি বিবেচ্য না করা সম্ভব নয়। কেননা সমশ্রেণীর সাথে বিনিময়ের সময় গুণের স্বতন্ত্র কোন মূল্য নেই। সুতরাং আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি সেদিকে উপনীত হওয়াই অনিবার্য।

তারফায়নের দলীল এই যে, খাদ মিশ্রিত দিরহাম তার প্রাপ্য হকের শ্রেণীভুক্ত, এমনকি যদি এমন ক্ষেত্রে খাদমিশ্রিত দিরহাম গ্রহণ করে নেয়, যে ক্ষেত্রে বদল করা জায়িয নেই, সেক্ষেত্রেও ঐ রকম দিরহাম গ্রহণ করা জায়িয হয়। সুতরাং বোঝা গেলো যে, খাদ মিশ্রিত দিরহাম দ্বারাও প্রাপ্য হক উশুল হয়ে যাবে। এখন শুধু উৎকৃষ্টতার হক থেকে যাবে। আর আমাদের বর্ণিত কারণ উৎকৃষ্টতার ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে তা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। অদ্রূপ মূল্যের দায় অবশ্য সাব্যস্ত করার মাধ্যমেও তা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। কেননা এটা হবে তার অনুকূলে হক সাব্যস্ত করার জন্য তার প্রতিকূলে দায় সাব্যস্ত করা। আর শরীয়তে এর কোন নজীর নেই।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : কোন পাখি যদি কারো ভূমিতে ছানা ফুটায় বা ডিম দেয় তাহলে যে তা হস্তগত করবে সেই তার মালিক হবে। একই বিধান হবে যদি হরিণ তার যমিনে বাসস্থান বানিয়ে নেয়।

কেননা এগুলো হচ্ছে মোবাহ (মালিকানাহীন) মাল এবং তাতে তার কবজা অগ্রবর্তী হয়েছে। তাছাড়া কৌশল ছাড়া ধরা গেলেও এগুলো মূলত: শিকার। আর (হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে,) শিকার যে ধরে সে-ই তার মালিক হয়। ডিম সম্পর্কে একই কথা। কেননা ডিম শিকারের মূল। এ কারণেই ডিম ভাঙ্গলে বা ভাজলে মুহরিমের উপর 'দন্ড' সাব্যস্ত হয়।

আর ভূমির মালিক যেহেতু তার ভূমিকে ঐ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেনি সেহেতু এটা শুকানোর জন্য জাল ছড়িয়ে রাখার মত হলো এবং তার ঘরে শিকার ঢুকে পড়ার মত হলো। কিংবা ছিটানো চিনি বা দিরহাম তার কোঁচরে পড়ার মত হলো। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাপড় গুটিয়ে না নিবে ততক্ষণ সেটা তার হবে না (বরং সে হস্তগত করলে তার হবে) কিংবা যদি সে তা হস্তগত করার জন্য কোঁচর প্রস্তুত করে থাকে।

পক্ষান্তরে মৌমাছি যদি তার জমিতে চাক বানায় তাহলে বিষয়টা ভিন্ন হবে। কেননা এটা জমির উৎপন্ন বলে গণ্য হবে। সুতরাং জমির অনুবর্তীরূপে সে তার মালিক হবে; যেমন তাতে উৎপন্ন বৃক্ষ এবং ঢলের কারণে তার জমিতে জমে ওঠা মাটি।

كِتَابُ الصَّرْفِ

অধ্যায় ঃ সারফ

كِتَابُ الصَّرْفِ

অধ্যায় ঃ সারফ (স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিময়)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'সারফ' হল এক বিশেষ 'বায়', যদি তার উভয় বিনিময় দ্রব্যের প্রতিটি মুদ্রা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

সারফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, স্থানান্তর ও ফেরত প্রদান। এই বিক্রয় চুক্তিকে 'সারফ' বলা হয়। একারণে যে, তাতে উভয় বিনিময় দ্রব্যের (তাৎক্ষণিক) হাত বদল হওয়া জরুরী।

কিংবা এ জন্য 'সারফ' বলা হয় যে, এই বিক্রয় চুক্তির দ্বারা শুধু গুণগত অতিরিক্ততাটুকু উদ্দেশ্য।[১] কেননা মুদ্রা শ্রেণীর দ্রব্যসত্তা থেকে উপকার অর্জিত হয় না।

আর খলীল যেমন বলেছেন, সারফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অতিরিক্ততা। ভাষা বিষারদ খলীল এরূপই বলেছেন, এজন্য ইবাদতকে সারফ বলে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য এবং স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ বিক্রি করে তাহলে সম পরিমাণের পরিবর্তে সম পরিমাণ ছাড়া জায়িয হবে না। যদিও তা উৎকৃষ্টতায় ও অলংকরণে পার্থক্যপূর্ণ থাকে।

যেমন নবী (স) বলেছেন-

الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدًا بيد والفضل ربوا

—স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান সমওজনে এবং দস্তবদস্ত হতে হবে আর (একদিকে) অতিরিক্ত হলে তা রিবা (সূদ)।

আর নবী (স) বলেছেন, جيدها ورديها سواء -এগুলোর উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা সমান। আমরা তা বিক্রয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (মজলিস থেকে) পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় বিনিময় দ্রব্যের কবজা জরুরী।

এর দলীল হলো আমাদের এমাত্র বর্ণিত হাদীছ আর ওমর (রা)-এর এ বক্তব্য–

وان استنظرك ان يدخل بيته فلا تنظره

যদি কোন এক পক্ষ তার ঘরে প্রবেশ করার মত সামান্য সময়েরও অবকাশ চায় তবে ততটুকু অবকাশ তাকে দিওনা।

---

১. অর্থাৎ উভয় দিকে স্বর্ণ বা রৌপ্য পরিমাণে সমান, তবে গুণ পার্থক্যের কারণে উভয় পক্ষ নিজ নিজ প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে হাতবদল করতে সম্মত হয়।

তাছাড়া এই কারণে যে, বিনিময় দ্রব্যদ্বয়ের একটি কবজাকরণ তো অপরিহার্য, যাতে (হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ) বিনিময়ে বাকির বিক্রি না হয়। অতঃপর সমতা বিধানের জন্য অপর দ্রব্যটিরও কবজা জরুরী, যাতে রিবা সাব্যস্ত না হয়

তাছাড়া বিনিময় দ্রব্যদ্বয়ের কোনটিই তো (দখল গ্রহণের দিক থেকে) অপরটির চেয়ে অগ্রাধিকার রাখে না ; সুতরাং (যুগপৎ) উভয়টির কবজাকরণ ওয়াজিব হবে চাই উভয় নির্ধারণযোগ্য হোক, যেমন কারুকার্য খচিত কিংবা অনির্ধারণযোগ্য হোক, যেমন টাকশালে তৈরী মুদ্রা কিংবা একটি নির্ধারণযোগ্য আর অন্যটি অনির্ধারণযোগ্য হোক ;

কেননা আমাদের বর্ণিত হাদীসটি নিঃশর্ত।

তাছাড়া (অলংকার বা পাত্র হওয়ার কারণে) নির্ধারণযোগ্য হলেও তাতে অনির্ধারণযোগ্যতার সন্দেহ (বা গুণ) রয়েছে। কেননা সৃষ্টিগতভাবে তা মূল্য দ্রব্য সুতরাং 'রিবা'-এর ক্ষেত্রে সন্দেহকে বিবেচনায় আনার কারণে কবজার শর্ত আরোপিত হবে।

আর (মজলিস থেকে) পৃথক হওয়ার অর্থ দেহগত পৃথকতা ; সুতরাং যদি মজলিস থেকে উঠে একই দিকে দু'জনে হাঁটতে থাকে। কিংবা সেই মজলিসে উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা বেঁহুশ হয়ে যায় তাহলে 'সারফ চুক্তি' বাতিল হবে না ; কেননা হযরত ইবনে উমর (রা) বলেছেন, সে যদি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে তাহলে তুমিও তার সঙ্গে লাফিয়ে পড়ো।

'সালাম' চুক্তির মূলধনের কবজার ক্ষেত্রেও এই অর্থই বিবেচ্য। (অর্থাৎ দেহগত পৃথকতাই বিবেচ্য, মজলিস ত্যাগ করা বিবেচ্য নয়।) তালাকের ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন ; কেননা অনীহা প্রদর্শন দ্বারা ঐ ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যায়। (আর মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ানো অনীহারই প্রমাণ।)

যদি রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করে তাহলে কম-বেশী করা যায়িয হবে, সমশ্রেণীতা না থাকার কারণে। তবে (একই মজলিসে) পরস্পর কবজা করা ওয়াজিব।

কেননা নবী (সা) বলেছেন, الذهب بالورق ربوا إلا هاء وهاء

রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণের বিক্রয় রিবা হবে, কিন্তু যদি হাতে হাতে হয় (রিবা নয়)।

'সারফ' চুক্তির পক্ষদ্বয় যদি উভয় বিনিময় দ্রব্য কিংবা তার একটির কবজার পূর্বে পৃথক হয়ে যায় তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা কবজার শর্ত অবিদ্যমান হয়েছে ; একারণেই 'সারফ' চুক্তিতে ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপ এবং মেয়াদী বিক্রি বৈধ নয় ; কেননা, একটির মধ্যে কবজার হক থাকে না তবে অপরটির মধ্যে চুক্তি বলে কবজার প্রাপ্য হক রহিত হয়ে যায়।

তবে যদি মজলিসেই ইচ্ছাধিকারের শর্ত প্রত্যাহার করা হয় তাহলে চুক্তিটির বৈধতা ফিরে আসবে ; কেননা নষ্টের কারণ 'স্থিত' হওয়ার পূর্বে রহিত হয়ে গেছে।

(আর স্থিতি হয় মজলিসের পরিবর্তন দ্বারা) এ বিষয়ে ইমাম যুফার (র) এর ভিন্নমত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কবজার পূর্বে 'সারফ'-এর মূল্যের ব্যবহার (অর্থাৎ বিক্রি করা, দান করা ইত্যাদি) বৈধ নয়। সুতরাং কেউ যদি দিরহামের বিনিময়ে একটি দীনার বিক্রি করে আর সে দিরহাম দশটির কবজা করার পূর্বেই তা দ্বারা কোন কাপড় ক্রয় করে তাহলে কাপড়ের 'বায়' ফাসিদ হবে।

কেননা দিরহাম দশটির ক্ষেত্রে কবজা করার বিষয়টি আল্লাহ্‌র হক হিসাবে চুক্তি বলে অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ কাপড়ের ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধতা প্রদানের অর্থ হলো আল্লাহ্‌র হক রহিত করা।

অবশ্য কাপড়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তি বৈধ হওয়াই কিয়াসের দাবী ছিলো, যেমন ইমাম যুফার (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কেননা দিরহাম তো নির্ধারণযোগ্য নয়। সুতরাং বিক্রয় চুক্তিটি অনির্ধারিত দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত হবে। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, 'সারফ'-এর ক্ষেত্রে মুদ্রাদ্রব্য বিক্রয়দ্রব্য রূপে গণ্য। কেননা বিক্রয় চুক্তির জন্য। বিক্রয় দ্রব্য অপরিহার্য। অথচ এখানে দু'টি মূল্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু নেই। সুতরাং অগ্রবর্তিতা না থাকার কারণে উভয়ের প্রতিটাকে বিক্রয় দ্রব্যরূপে গণ্য করা হবে। আর দখল গ্রহণের পূর্বে বিক্রীত দ্রব্য বিক্রয় করা জায়িয নয়।

আর বিক্রয় দ্রব্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত হওয়া অনিবার্য নয়। যেমন দাদন দ্রব্যের ক্ষেত্রে।

রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ আন্দায করে বিক্রি করা জায়িয হবে।

কেননা এক্ষেত্রে সমতার শর্ত নেই। তবে আমাদের বর্ণিত কারণ মজলিসে কবজা করার শর্ত থাকবে।

অবশ্য সমশ্রেণীর বিনিময়ে কবজা করার শর্ত থাকবে।

অবশ্য সমশ্রেণীর বিনিময়ে আন্দাযে বিক্রির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাতে 'রিবা'-এর সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি দুই হাযার 'মিছকাল' রৌপ্যের বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করে, যার বাজার মূল্য এক হাযার মিছকাল রৌপ্য, আর তার গলায় একটি রূপার হার থাকে, যার মূল্য এক হাযার মিছকাল রূপা আর সে মূল্যের এক হাযার মিছকাল রূপা নগদ পরিশোধ করে উভয়ে মজলিস থেকে পৃথক হয়, তাহলে যেটা নগদ পরিশোধ করেছে, সেটা রূপার মূল্য হবে।

কেননা সারফের বিনিময় দ্রব্য হওয়ার কারণে রূপার হারের মূল্য মজলিসেই 'কবজা' করা ওয়াজিব।

আর ওয়াজিব পালন করাই বিক্রেতার পক্ষে স্বাভাবিক হবে।

একই বিধান হবে যদি দাসী ও তার গলার হার এক হাযার নগদ ও এক হাযার বাকী- এই দুই হাযার মিছকালের বিনিময়ে ক্রয় করে। অর্থাৎ নগদ এক হাযার মিছকাল হবে হারের মূল্য।

কেননা মেয়াদের শর্ত 'সারফ'-এর ক্ষেত্রে বাতিল। এক দাসীর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জায়েয। আর বৈধ উপায়ে চুক্তি সম্পন্ন করাই চুক্তির পক্ষদ্বয়ের দিক থেকে স্বাভাবিক।

তদ্রূপ যদি (রূপার) কারুকাজপূর্ণ একটি তলোয়ার একশ দিরহামে বিক্রি করে এবং কারুকাজের মূল্য পঞ্চাশ দিরহাম হয় আর মূল্যের পঞ্চাশ দিরহাম নগদ পরিশোধ করে তাহলে বিক্রয় বৈধ হবে। কেননা উল্লেখ না করলেও 'কবজা'কৃত অংশ রূপার কারুকাজের মূল্য বলে গণ্য হবে।

এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। **একই বিধান হবে যদি বলে যে,** পঞ্চাশ দিরহাম উভয়ের মূল্য থেকে গ্রহণ করো।

কেননা (আরবী ভাষায়) দ্বিবচন উল্লেখ করে কখনো কখনো একবচন উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেছেন- يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ -মিঠা পানি নোনা পানি উভয় দরিয়া থেকে মুক্তা ও মারজান বের হয়।

অথচ এখানে উদ্দেশ্য একটি দরিয়া (অর্থাৎ নোনা পানির দরিয়া। কেননা মিঠা পানিতে মুক্তা হয় না।)

সুতরাং বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দ্বিবচনকে একবচনেই প্রযুক্ত করা হবে।

যদি দু'জন পরস্পর লেনদেন না করেই পৃথক হয়ে যায় তাহলে কারুকাজের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা কারুকাজের ক্ষেত্রে চুক্তি হচ্ছে 'বায় সারফ'।

আর যদি ক্ষতিগ্রস্ততা ছাড়া তলোয়ারটাও পৃথক করা সম্ভব না হয় তাহলে তলোয়ারের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হবে। কেননা ক্ষতিগ্রস্ততা ছাড়া তলোয়ারটি অর্পণ করা সম্ভব নয়। একারণেই তলোয়ারটিকে আলাদাভাবে বিক্রি করা জায়িয নয়; যেমন ছাদের কড়িকাঠ।

আর যদি ক্ষতিগ্রস্ততা ছাড়া তলোয়ারটি পৃথক করা সম্ভব হয় তাহলে তলোয়ারের ক্ষেত্রে বিক্রয় বৈধ এবং কারুকাজের ক্ষেত্রে অবৈধ হবে। কেননা (এ অবস্থায়) এককভাবে তলোয়ার বিক্রি করা সম্ভব। সুতরাং এটা দাসী ও তার গলায় হারের মত হবে।

এই বৈধতার বিধান তখন হবে, যখন পৃথক রূপা বিক্রীত দ্রব্য রূপা থেকে বেশী হবে। পক্ষান্তরে যদি তার সম পরিমাণ বা কম হয় কিংবা পরিমাণ অজ্ঞাত হয়, তাহলে 'রিবা'-এর কারণে কিংবা রিবা-এর সম্ভাবনার কারণে বিক্রি জায়িয হবে না। আর

(অজ্ঞাত পরিমাণের ক্ষেত্রে) শুদ্ধতার দিক হলো এক হিসাবে আর ফাসিদ হওয়ার দিক হলো দুই হিসাবে। সুতরাং ফাসিদ হওয়ার দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি (সোনা বা রূপার বিনিময়ে) রূপার পাত্র বিক্রি করে, অতঃপর মূল্যের অংশ বিশেষ 'কবজা' করে উভয়ে পৃথক হয়ে যায় তাহলে যেই পরিমাণের মূল্য 'কবজা' করেনি, সেই পরিমাণের ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হবে আর যেই পরিমাণের মূল্য কবজা করেছে, সেই পরিমাণের ক্ষেত্রে বিক্রয় বৈধ হবে। আর পাত্রটি উভয়ের মাঝে শরীকানা হবে।

কেননা এই চুক্তিটি সম্পূর্ণতই 'বায় সারফ'। সুতরাং যতটুকু অংশে-'সারফ'-এর শর্ত পাওয়া গেছে ততটুকুতে চুক্তি বৈধ হবে আর যে অংশে শর্ত পাওয়া যায়নি সে অংশে চুক্তি বাতিল হবে। আর ফাসিদ হওয়া হল (পরবর্তীতে) আরোপিত। কেননা চুক্তিটি প্রথমে বৈধতা লাভ করেছে, এরপর (কবজার পূর্বে) পৃথক হওয়ার কারণে বাতিল হয়েছে। সুতরাং ফাসিদ হওয়া। সর্বব্যাপী হবে না।

(আলোচ্য মাসআলায়) যদি পাত্রটির অংশ বিশেষের দাবীদার বের হয় তাহলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে অবশিষ্টকে তার অংশের মূল্যের বিনিময়ে নেবে। আর ইচ্ছা করলে ফেরত দেবে।

কেননা অংশীদারিত্ব পাত্রের জন্য দোষ।

কেউ যদি রৌপ্যখণ্ড বিক্রি করে এরপর তার অংশ বিশেষের দাবীদার বের হয় তাহলে ক্রেতা অবশিষ্টাংশকে তার অংশের মূল্যের বিনিময়ে নেবে। এতে তার কোন ইচ্ছাধিকার থাকবে না।

কেননা খণ্ডিতকরণ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি দুই দিরহাম এবং একটি দীনার একটি দিরহাম এবং একটি দীনার একটি দিরহাম এবং দুই দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে বিক্রয় জায়েয হবে এবং ঐ দুটির প্রতিটি শ্রেণীকে তার বিপরীতে গণ্য করা হবে।

ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, জায়িয হবে না।

একই মতপার্থক্য হবে যদি দুই ধামা যব এবং এক ধামা গম এক ধামা যব এবং দুই ধামা গমের বিনিময়ে বিক্রি করে।

ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল এই যে, প্রতিটিকে তার বিপরীত শ্রেণীর বিনিময়ে সাব্যস্ত করার অর্থ হলো লোকটির ব্যবহার পরিবর্তন করা। কেননা সে সমগ্রকে সমগ্রের মোকাবিলায় স্থির করেছে। আর এর দাবী হলো নির্ধারিত রূপে নয়, বরং সর্বব্যাপী রূপে বন্টিত হওয়া। আর চুক্তিকারীর ব্যবহারকে পরিবর্তন করা বৈধ নয়। যদিও তাতে তাদের ব্যবহারকে শুদ্ধ করার ফায়দা রয়েছে। যেমন কেউ

একটি 'বালা' দশদিরহামের বিনিময়ে এবং একটি কাপড় দশ দিরহামের বিনিয়ে ক্রয় করল এবং উভয়টিকে একই বিক্রয় চুক্তিতে 'মুরাবাহা' এর ভিত্তিতে বিক্রি করল, এটা জায়িয হয়না। যদিও এখানে মুনাফাকে কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব। তদ্রূপ যদি একহাযার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করে এরপর মূল্য পরিশোধের পূর্বেই বিক্রেতার কাছে এই গোলামটিকে অন্য একটি গোলামসহ দেড় হাজার দিরহামে বিক্রি করে তাহলে একহাযারে খরিদকৃত গোলামটির ক্ষেত্রে বিক্রয় বৈধ হবে না, যদিও এখানে এক হাজার দিরহামকে খরিদকৃত গোলামের বিপরীতে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে তার এই ব্যবহারকে বৈধতা দান করা সম্ভব।

তদ্রূপ যদি নিজের গোলাম এবং অন্যের গোলামকে একত্র করে আর বলে যে, তোমার কাছে এই দুই গোলামের একটিকে বিক্রি করলাম। তাহলে বৈধ হবে না। যদিও এখানে বক্তব্যকে নিজের গোলামের দিকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তার এ ব্যবহারকে বৈধতাদান করা সম্ভব।

তদ্রূপ যদি একটি দিরহাম ও একটি কাপড়কে একটি দিরহাম ও একটি কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করে এবং 'কবজা' গ্রহণের পূর্বেই দু'জন পৃথক হয়ে যায় তাহলে দুই দিরহামের ক্ষেত্রে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। দিরহামকে কাপড়ের বিপরীতে সাব্যস্ত করা যাবে না।

এসব ক্ষেত্রে কারণ সেটাই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আমাদের দলীল এই যে, নিঃশর্ত বিনিময় এককের বিপরীতে এককের বিনিময়ের সম্ভাবনা রাখে। যেমন সমশ্রেণীর বিপরীতে সমশ্রেণীকে বিনিময়ের ক্ষেত্রে আর চুক্তি কে বৈধতা দানের জন্য এটাই হলো নির্ধারিত পন্থা। সুতরাং তার ব্যবহারকে বৈধতা প্রদানের জন্য বিনিময় নির্ধারণকে এই সম্ভাবনার উপর প্রয়োগ করা হবে। আর তাতে চুক্তি গুণকে পরিবর্তন করা হয় চুক্তির মূল সত্তাকে পরিবর্তন করা হয় না। কেননা চুক্তির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বহাল থাকছে-অর্থাৎ সমগ্রের বিনিময়ে সমগ্রের মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া।

এটা ঐ মাসআলার মত হলো, যেখানে নিজের এবং অন্যের মাঝে শরিকানার গোলামের অর্ধেককে বিক্রি করলো। সেখানে তার ব্যবহারকে বৈধতা প্রদানের জন্য বিক্রয়কে নিজের অংশের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

যে সকল মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ভিন্ন।

'মুরাবাহার' মাসআলাটির ক্ষেত্রে কারণ এই যে, পুরা মুনাফাকে কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মাসআলাটিকে উল্টো করে ফেলার ক্ষেত্রে বিক্রয়টি 'তাওলিয়া' হয়ে যায়। (অর্থাৎ চুক্তির মূলসত্তা পরিবর্তিত হয়ে যায়।)

আর দ্বিতীয় মাসআলাটিতে বৈধতার ছুরতটি নির্ধারিত নয়। কেননা এক হাযার দিরহামের বেশী পরিমাণকে খরিদকৃত গোলামের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব।

আর তৃতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে অনির্ধারিত গোলামের সাথে বিক্রয়কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং তা বিক্রয়পাত্র হতে পারে না। আর নির্ধারিত বস্তু হল অনির্ধারিত বস্তুর বিপরীত। (সুতরাং অনির্ধারিত গোলাম বলে নির্ধারিত গোলাম উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়।)

আর শেষ মাসআলাটিতে চুক্তিটি বিশুদ্ধরূপে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু (কবজা করা ছাড়া পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে) পরবর্তী ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিদ্যমানতার ক্ষেত্রে ফাসাদ এসেছে। আর আমাদের আলোচনা হচ্ছে প্রারম্ভিক অবস্থা ভিত্তিক।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি দশ দিরহাম ও এক দীনারের বিনিময়ে এগার দিরহাম বিক্রি করে তাহলে বিক্রি জায়িয হবে এবং দশ দিরহাম তার সমপরিমাণের বিনিময়ে হবে। আর দীনার হবে এক দিরহামের বিনিময়ে।

কেননা আমাদের বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী দিরহাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমতার শর্ত রয়েছে। সুতরং বাহ্যত: এটাই সাব্যস্ত হবে যে, সে এই বিনিময় দ্বারা সমতারই ইচ্ছা করেছে। তাই এক দীনারের বিনিময়ে এক দিরহাম রয়ে গেলো। আর এ দুটি হলো ভিন্ন দুই শ্রেণী। আর ভিন্ন দুই শ্রেণীর ক্ষেত্রে সমতা বিবেচ্য নয়।

যদি দু'জন রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য কিংবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করে, আর দুটির কোন একটি পরিমাণে কম হয় এবং সেই পরিমাণের সাথে অন্য কোন দ্রব্য থাকে, যার মূল্য (অপর দিকের) অবশিষ্ট রৌপ্যের সমান হয়, তাহলে কারাহাত ছাড়াই উক্ত বিক্রয় বৈধ হবে। আর যদি অবশিষ্ট রৌপ্যের সমান না হয় তাহলে 'কারাহাত' সহ বৈধ হবে। আর যদি ঐ দ্রব্যটি মূল্যহীন হয়, যেমন মাটি, তাহলে বিক্রয় বৈধ হবে না, 'রিবা' সাব্যস্ত হওয়ার কারণে।

কেননা রৌপ্যের অতিরিক্ত অংশটুকুর বিপরীতে কোন বিনিময় দ্রব্য নেই। সুতরাং তা 'বিরা' হবে।

কারো যদি অন্য কারো কাছে দশ দিরহাম পাওনা থাকে, আর দশ দিরহামের দেনাদার তার কাছে দশ দিরহামের বিনিময়ে একটি দীনার বিক্রি করে আর দীনারটি তাকে প্রদান করে আর উভয়ে (সম্মতিক্রমে পাওনা) দশ দিরহামের পরিবর্তে (দীনারের মূল্য) দশ দিরহাম কাটাকাটি করে নেয় তাহলে এই বিক্রি (সূক্ষ্ম কিয়াস হিসাবে) বৈধ হবে।

মাসআলাটির ব্যাখ্যা এই যে, নিঃশর্ত দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে।

বৈধতার কারণ এই যে, এই (নিঃশর্ত) চুক্তি বলে এমন একটি 'মূল্য' অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে, কবজার মাধ্যমে যা নির্ধারিত করা আবশ্যক। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সমশ্রেণীতা না থাকার কারণে শুধু বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে কাটাকাটি সাব্যস্ত হবে না। তারপরো যখন তারা (পারস্পরিক সম্মতিক্রমে) কাটাকাটি করেছে তখন এটা প্রথম সারফ চুক্তিটির রহিতকরণকে এবং চুক্তিকে ঋণের দশ দিরহামের সাথে সম্পৃক্তিকরণকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা এটা যদি না করা হয়[1] তাহলে 'সারফ'

১. অর্থাৎ নিঃশর্ত দশ দিরহামের বিনিময়কৃত সারফকে রহিত করে ঋণের দিরহামের বিনিময়েকৃত সারফ বলে যদি গণ্য না করা হয়।

এর বিনিময় দ্রব্যকে বদল করা অনিবার্য হয়। (যা বৈধ নয়) পক্ষান্তরে (প্রথম চুক্তিটিকে রহিত করে) ঋণের দশ দিরহামের দিকে চুক্তিটিকে সম্পৃক্ত করা হলে খোদ চুক্তির মাধ্যমেই কাটাকাটি সম্পন্ন হয়ে যাবে। এটা আমরা পরে আলোচনা করবো।

আর চুক্তি রহিতকরণ কখনো কখনো অনিবার্যতার ভিত্তিতেও হয়ে থাকে। যেমন দু'জনে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে 'ক্রয় বিক্রয়' এর চুক্তি করলো। এরপর একই বস্তুতে দেড়হাজার এর বিনিময়ে চুক্তি করলো। (তখন অনিবার্যভাবে প্রথম চুক্তিটি রহিত হয়ে যায়।)[১]

আর ইমাম যুফার (র) এতে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তিনি অনিবার্যতা (এর ভিত্তিতে রহিতকরণ সাব্যস্ত করার) স্বীকার করেন না।

এ বিধান হলো তখন যখন ঋণটি চুক্তির পূর্ব থেকেই থাকে। আর যদি চুক্তির পরবর্তীতে সাব্যস্ত হয় তাহলেও দুই বর্ণনার বিশুদ্ধতর বর্ণনা মতে একই বিধান হবে।

কেননা 'কাটাকাটিটি' প্রথম সারফ চুক্তিকে রহিতকরণ এবং চুক্তি পরিবর্তন কালে বিদ্যমান ঋণ-এর সাথে চুক্তিকে সম্পৃক্তকরণকে অন্তর্ভুক্ত করছে। আর বৈধতার জন্য এটাই যথেষ্ট।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, একটি খাঁটি দিরহাম ও দুটি দোষযুক্ত দিরহামকে দু'টি খাঁটি দিরহাম ও একটি দোষ যুক্ত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ নয়।

আর দোষযুক্ত দিরহাম (বা غلة) বলে ঐ দিরহামকে, যা বাইতুল মাল ফেরত দেয় কিন্তু ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করে নেয়।

এখানে বৈধতার কারণ হলো ওজনের ক্ষেত্রে সমতা সাব্যস্ত হওয়া এবং উৎকৃষ্টতার বিবেচনা রহিত হওয়ার কথা পরিজ্ঞাত হওয়া।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দিরহামে যদি রৌপ্যের অংশ প্রধান হয় তাহলে তা রৌপ্য বিবেচিত হবে। তদ্রূপ দীনারে যদি স্বর্ণের অংশ প্রধান হয় তাহলে সেটা স্বর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং এ দুটির ক্ষেত্রে কমবেশী করার হুরমত বিবেচ্য হবে যেমন উৎকৃষ্ট দিরহাম দীনারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হয়।

সুতরাং সেগুলোর বিনিময়ে খাঁটিগুলোকে এবং সেগুলোর কতিপয়কে কতিপয়ের বিনিময়ে ওজনে সমতা ছাড়া বিক্রি করা বৈধ হবে না। তদ্রূপ এই খাদযুক্ত দিরহাম ওজন ছাড়া (গণনার মাধ্যমে) করয হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

কারণ (স্বর্ণ ও রৌপ্য) মুদ্রা সাধারণত: সামান্য খাদ থেকে মুক্ত হয় না। কেননা খাদ ছাড়া সোনারূপা জমাট বাঁধে না। আর এই খাদ কখনো সৃষ্টিগত হয়। যেমন

১. অনিবার্যতার ভিত্তিতে সাব্যস্ত রহিতকরণ এর ক্ষেত্রে ইকালাহ হিসাবে বিক্রেতাকে বিক্রয় দ্রব্য এবং ক্রেতার মূল্য দ্রব্য ফেরত দেয়া জরুরী নয়, যেমনটি সরাসরি রহিতকরণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে দীনার ফেরত প্রদানের প্রশ্ন আসে না।

নিম্নমানের সোনা রূপার ক্ষেত্রে। সুতরাং সামান্য খাঁদকে নিম্নমানের সোনা রূপার সাথে যুক্ত করা হবে। আর (সোনা রূপার ক্ষেত্রে) উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমান।

আর যদি দিরহাম-দীনারে খাদ অধিক হয় তাহলে তা দিরহাম-দীনারের হুকুমভুক্ত হবে না।—আধিক্যের দিক বিবেচনা করে।

সুতরাং কেউ যদি খাদ প্রধান দিরহামের বিনিময়ে খাঁটি রূপা খরিদ করে তাহলে তার বিধান ঐ সকল ছূরতের উপর হবে, যা আমরা তলোয়ারের কারুকাজের ক্ষেত্রে আলোচনা করেছি।

আর যদি খাদ প্রধান দিরহামকে সমশ্রেণীর দিরহামের বিনিময়ে কমবেশী করে বিক্রি করে তাহলে জায়িয হবে।

একটি দ্রব্য শ্রেণীকে তার বিপরীত শ্রেণীর বিপরীতে সাব্যস্ত করার প্রেক্ষিতে। সুতরাং তা দুই জিনিসের রৌপ্য ও পিতল-এর হুকুমভুক্ত হবে। তবে উভয় দিকে রৌপ্য বিদ্যমান থাকার কারণে তা 'বায় সারফ' বলে গণ্য হবে। কাজেই মজলিসে কবজা গ্রহণের শর্ত হবে। আর রৌপ্যের ক্ষেত্রে যখন কবজার শর্ত হবে তখন পিতলের ক্ষেত্রেও কবজার শর্ত হবে। কেননা ক্ষতি ছাড়া পিতলকে রৌপ্য থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আমাদের মাশায়েখ আদালী ও গতেরাফী দিরহামের ক্ষেত্রে কম বেশী করে বিনিময় বৈধ হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন না।

কেনন এ দুটি হলো আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট মূল্যবান মুদ্রা। সুতরাং এক্ষেত্রে কম বেশীর বৈধতা প্রদান করলে 'রিবা'-এব দ্বার খুলে যাবে। খাদ প্রধান দিরহাম দীনার যদি ওজন হিসাবে প্রচলিত হয় তাহলে তাতে বেচা-কেনা করজের লেনদেন ওজনের ভিত্তিতে হবে। আর যদি গণনার হিসাবে প্রচলিত হয় তাহলে গণনার ভিত্তিতেই হবে। আর যদি উভয় রূপে প্রচলিত হয় তাহলে উভয় ভিত্তিতেই লেনদেন হবে।

কেননা খাদ প্রধান দিরহাম-দীনারের ক্ষেত্রে যেহেতু শরীয়তের 'নাস' বা প্রত্যক্ষ বাণী নেই সেহেতু প্রচলনই বিবেচ্য হবে।

আর যে পর্যন্ত তা (মুদ্রা হিসাবে) প্রচলিত থাকবে সে পর্যন্ত তা 'মূল্যদ্রব্য' বলেই গণ্য হবে। অর্থাৎ নির্ধারণ করলেও তা নির্দিষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে যখন তা প্রচলিত থাকবে না তখন তা পণ্যদ্রব্য বলে গণ্য হবে এবং নির্ধারণ করলে নির্ধারিত হয়ে যাবে।

আর যদি এমন হয় যে, কেউ গ্রহণ করে, কেউ গ্রহণ করে না, তাহলে তা 'ভেজাল' মুদ্রার ন্যায় হবে। চুক্তির নির্দিষ্ট মুদ্রার সাথে সম্পৃক্ত হবে না; বরং বিক্রেতা যদি মুদ্রাগুলোর অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে তাহলে ভেজাল মুদ্রার 'শ্রেণী সত্তার' সাথে বিক্রয়ের সম্পর্ক হবে। কেননা তার পক্ষ থেকে সম্মতি সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি অবগত না থাকে তাহলে সম্মতি অবিদ্যমান হওয়ার কারণে উৎকৃষ্ট মুদ্রার 'শ্রেণী সত্তার' সাথে বিক্রয়ের সম্পর্ক হবে।

যদি এ ধরনের দিরহাম দ্বারা কোন পণ্য খরিদ করে আর (ইতিমধ্যে) তা অচল হয়ে যায় এবং লোকেরা এগুলোর মাধ্যমে লেনদেন বর্জন করে থাকে তাহলে ইমাম

আবু হানীফা (র) এর মতে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, বিক্রয় চুক্তির দিন সেগুলোতে যে বাজার মূল্য ছিলো, ক্রেতাকে তাই পরিশোধ করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, লোকেরা ঐ মুদ্রার মাধ্যমে সর্বশেষ যে লেনদেন করেছে সেগুলোর ঐ সময়ের বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, বিক্রয় চুক্তি তো বিশুদ্ধ হয়ে গেছে, তবে অচল হয়ে যাওয়ার কারণে মূল্য পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর (পরবর্তীতে) অর্পণের অসম্ভবতা চুক্তির বিনষ্টতা সাব্যস্ত করে না। যেমন যদি সে ব্যক্তি খেজুরের বিনিময়ে কোন কিছু খরিদ করলো আর তা বাজার ছাড়া হয়ে যায়।

আর বিক্রয় চুক্তি যখন বহাল থাকলো তখন ঐ মুদ্রাগুলোর বাজার মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে বিক্রয়কালের বাজার মূল্য বিবেচ্য হবে। কেননা বিক্রয়ের কারণেই মূল্যের দায় সাব্যস্ত হয়।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে প্রচলন শেষ হওয়ার দিনের বাজার মূল্য বিবেচ্য হবে। কেননা সেটাই হলো (মুদ্রা থেকে) বাজার মূল্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের সময়।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, অচল হওয়া দ্বারা 'মূল্য' বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা এ ধরনের মুদ্রার 'মূল্য গুণ' মানুষের প্রচলনের কারণেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর সেই প্রচলন এখন বহাল নেই। সুতরাং তা মূল্য ছাড়া বিক্রয় চুক্তি হবে। ফলে তা বাতিল হয়ে যাবে। আর বিক্রয় চুক্তি যখন বাতিল হয়ে গেল তখন বিক্রয় দ্রব্য বিদ্যমান থাকলে তা ফেরত প্রদান করা আবশ্যক হবে। আর যদি তা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার বাজার মূল্য ফেরত দিতে হবে। যেমন 'বায় ফাসিদে'র মধ্যে হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা জায়িয।

কেননা পয়সা হচ্ছে পরিজ্ঞাত মাল। আর পয়সা যদি প্রচলিত থাকে তাহলে নির্ধারিত না হলেও তার বিনিময়ে বিক্রয় বৈধ হবে। কেননা প্রচলনের মাধ্যমে তা মূল্যগুণ লাভ করেছে। আর যদি তা অচল হয়ে পড়ে তাহলে যতক্ষণ না তা নির্ধারণ করে নেয়া হবে, ততক্ষণ তার বিনিময়ে বিক্রয় বৈধ হবে না।

কেননা (অচল অবস্থায়) এটা হচ্ছে পণ্য দ্রব্য, সুতরাং তা নির্ধারণ করা অপরিহার্য।

যদি প্রচলিত পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করার পর তা অচল হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে; ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, ছাহেবায়ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর এটা আমাদের উপরোল্লিখিত মতভিন্নতার নজীর।

আর যদি প্রচলিত পয়সা করয রূপে গ্রহণ করে অতঃপর তা অচল হয়ে যায় তাহলে আবু হানীফা (র) এর মতে উক্ত পয়সার অনুরূপ পয়সা পরিশোধ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে।

কেননা এটা عارية বা ধার গ্রহণ, যার অনিবার্য দাবী হলো, গুণগতভাবে অভিন্ন জিনিসটি ফেরত প্রদান করা। আর মূল্যগুণ হলো তাতে বিদ্যমান একটি অতিরিক্ত বিষয়। কেননা 'করয' মূল্যগুণের সাথে বিশিষ্ট নয়।

আর ছাহেবায়নের মতে উক্ত পয়সার বাজার মূল্য পরিশোধ করা অবশ্যকর্তব্য হবে।

কেননা যখন তার মূল্যগুণ বাতিল হয়ে গেলো, তখন যে অবস্থায় গ্রহণ করেছিলো সে অবস্থায় ফেরত প্রদান করা অসম্ভব হয়ে গেলো। সুতরাং তার মূল্য ফেরত প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য হবে। যেমন যদি সদৃশ বস্তু ফরযরূপে গ্রহণ করে আর তা বাজার থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তবে ইতিপূর্বে কথিত বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে করয গ্রহণের দিনের বাজার মূল্য বিবেচনা হবে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (র) এর মতে অচল হওয়ার দিনের বাজার মূল্য বিবেচ্য হবে।

এ বিষয়ে মূল মতপার্থক্য হলো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে কোন সদৃশ বস্তু গসব করে নিলো এরপর তা বাজার থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর বক্তব্য উভয় পক্ষের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর বক্তব্য অধিকতর সহজ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি অর্ধ দিরহাম পয়সার বিনিময়ে কোন কিছু খরিদ করে তাহলে তা বৈধ হবে এবং অর্ধ দিরহামে যে পরিমাণ পয়সা বিক্রয় হয় তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে। অদ্রূপ যদি বলে, এক 'দানিক' পরিমাণ পয়সা, কিংবা এক কীরাত পরিমাণ পয়সার বিনিময়ে তবে তা জায়িয হবে।

আর ইমাম যুফার (র) বলেন, এ সকল ছুরতে বিক্রয় জায়িয হবে না। কেননা সে পয়সার বিনিময়ে খরিদ করেছেন। আর পয়সার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় সংখ্যা দ্বারা 'দানিক' বা অর্ধ দিরহাম দ্বারা নয়। সুতরাং পয়সার সংখ্যাগত পরিমাণ বর্ণনা করা জরুরী।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এক দানিক বা অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে যে পয়সা বিক্রি হয় মানুষের কাছে তার পরিমাণ জানা আছে। আর আমাদের কথাও হচ্ছে সে ক্ষেত্রেই। সুতরাং সংখ্যা বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

আর যদি বলে, এক দিরহাম পরিমাণ পয়সার বিনিময়ে কিংবা দুই দিরহাম পরিমাণ পয়সার বিনিময়ে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এর মতে একই হুকুম। কেননা এক দিরহামের বিনিময়ে যে পয়সা বিক্রি হয় তা পরিজ্ঞাত। আর এটাই উদ্দেশ্য। এক দিরহাম ওজনের পরিমাণ পয়সা উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা রয়েছে যে, দিরহামের ক্ষেত্রে জায়িয হবে না। দিরহামের কমের মধ্যে জায়িয হবে। কেননা দিরহামের কমের মধ্যেই পয়সা দ্বারা লেনদেনের প্রচলন রয়েছে। সুতরাং লোক প্রচলনের ভিত্তিতে তা সবার জানা বিষয় হবে। কিন্তু দিরহামের বিষয়টি এমন নয়।

ফকীহগণ বলেছেন, বিশেষত: আমাদের (মা-ওয়ারউন-নহর) অঞ্চলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর বক্তব্য অধিকতর বিশুদ্ধ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি মুদ্রা ব্যবসায়ীকে একটি দিরহাম দিয়ে বলে, আমাকে এর অর্ধেকের বিনিময়ে পয়সা আর বাকি অর্ধেকের বিনিময়ে এক রত্তি কম অর্ধ দিরহাম (এর সমপরিমাণ ছোট একটি দিরহাম) দাও, তাহলে পয়সার ক্ষেত্রে তো বিক্রয় বৈধ হবে, কিন্তু অবশিষ্টের ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হবে ছাহেবায়নের মতে।

কেননা পয়সার বিনিময়ে অর্ধ দিরহাম বিক্রি করা তো জায়িয। কিন্তু এক রত্তি কম অর্ধেকের বিনিময়ে অর্ধ দিরহাম বিক্রি করা হচ্ছে বলে তা রিবা হবে। সুতরাং তা জায়িয হবে না।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্যের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে সর্ব ক্ষেত্রেই বিক্রয় বাতিল হবে। কেননা (উভয় অংশের) চুক্তিটি অভিন্ন। আর (সর্বসম্মত হওয়ার কারণে এবং চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে) ফাসিদ হওয়ার ব্যাপার শক্তিশালী, সুতরাং তা সর্বব্যাপী হবে। আর (ফাসিদ বিক্রয় অধ্যায়ে) এর নযীর উল্লেখিত হয়েছে।

আর যদি 'দাও' শব্দটি উভয় অংশে পুনরুক্ত করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর সিদ্ধান্ত ছাহেবায়নের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হবে। এটাই বিশুদ্ধ বর্ণনা।

কেননা তখন দুটি স্বতন্ত্র বিক্রয় চুক্তি হবে।

আর যদি বলে আমাকে অর্ধ দিরহাম পয়সা এবং এক রত্তি কম অর্ধ দিরহাম দাও। তাহলে তা জায়িয হবে।

কারণ দিরহামকে অর্ধ দিরহামে বিক্রয়যোগ্য পয়সার এবং এক রত্তি কম অর্ধ দিরহামের বিনিময় সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং এক রত্তি কম অর্ধ দিরহাম অনুরূপের বিনিময়ে হবে। আর অবশিষ্টতা পয়সার বিনিময়ে হবে।

হিদায়া-গ্রন্থকার বলেন, মুখতাছারুল কুদূরীর অধিকাংশ অনুলিপিতে শুধু দ্বিতীয় মাসআলাটির উল্লেখ রয়েছে।

كِتَابُ الْكَفَالَةِ

অধ্যায় ঃ কাফালাহ

كِتَابُ الْكَفَالَةِ

অধ্যায় ঃ কাফালাহ্

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাফালাহ্-এর অভিধানিক অর্থ হলো সংযুক্তকরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا (যাকারিয়্যা তাকে নিজের সংগে যুক্ত করে নিলেন।) কেউ কেউ বলেছেন, শরীয়তের পরিভাষায় কাফালাহ অর্থ হলো দাবীর ক্ষেত্রে (দায়গ্রস্ত ব্যক্তির) দায়ের সাথে (দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির) দায়কে যুক্তকরণ।

আর কারো কারো মতে ঋণের ক্ষেত্রে দায়কে দায়ের সাথে যুক্তকরণ। প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাফালাহ দুই প্রকার ঃ মানুষের দেহসত্তার যামিনদারি এবং অর্থের যামিনদারি।

সুতরাং মানুষের দেহ সত্তার কাফালাহ বৈধ। আর এই প্রকার কাফালাহ্-এর দায় হলো যামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করে দেওয়া।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এটা জায়িয হবে না। কেননা যামিন প্রাপ্ত ব্যক্তির দেহ সত্তার উপর যেহেতু তার কোন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই, সেহেতু সে এমন জিনিসের দায় গ্রহণ করলো, যা অর্পণ করতে সে সক্ষম নয়।

মালের 'কাফালাহ'-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা নিজের অর্থ সম্পদের উপর তো তার কর্তৃত্ব রয়েছে।

আমাদের দলীল হলো নবী (স)-এর বাণী- الزعيم غارم (رواه ابوداود) (কাফীল দায়বদ্ধ হবে।) এ হাদীস (নিঃশর্ত হওয়ার কারণে) উভয় প্রকার কাফালাহ্-এর বৈধ হওয়া প্রমাণ করে।

তাছাড়া সে তাকে বিশেষ পন্থায় অর্পণ করতে সক্ষম। যেমন- দাবীদারকে তার অবস্থান স্থল জানিয়ে দিলো এবং উভয়ের মাঝখানে (পাকড়াও করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান) অন্তরায় দূর করে দিলো। কিংবা কাফীল এ বিষয়ে কাযীর অধীনস্থ লোকদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। আর এ ধরনের দায় গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। তদুপরি কাফালাহ্-এর যে মর্ম তা এক্ষেত্রে সাব্যস্ত করা সম্ভবপর। কেননা এ মর্ম হলো (উপস্থিতির) দাবীর ক্ষেত্রে ('মাকফুল বিহী'-এর দায়ের সাথে নিজের) দায়কে যুক্ত করা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি বলে যে, আমি অমুকের দেহসত্তার কিংবা তার গর্দানের কিংবা তার জানের কিংবা দেহের কিংবা তার মাথায় দায় গ্রহণ করলাম, তদ্রূপ তার শরীরের বা চোহরার দায় গ্রহণ করলাম, তাহলে কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হবে।

কেননা এ সকল শব্দ দ্বারা প্রকৃত অর্থে বা প্রচলিত অর্থে মানবসত্তা বোঝায়, যেমন তালাক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

তদ্রূপ যদি বলে, তার অর্ধেকের কিংবা এক তৃতীয়াংশের বা তার কোন অংশের দায় গ্রহণ করলাম। কেননা দায় গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি মানবসত্তা বিভাজ্য নয়। সুতরাং অংশ বিশেষের উল্লেখ সমগ্রের উল্লেখের ন্যায় সর্বব্যাপী হবে।

আর যদি বলে যে, অমুকের হাতের বা পায়ের জামিন হলাম (বা দায় গ্রহণ করলাম) তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা (লোক প্রচলনে) হাত বা পা দ্বারা সমগ্র দেহসত্তা বোঝানো হয় না। একারণেই হাত বা পায়ের দিকে তালাক এর সম্বোধন শুদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে পূর্বোল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে তালাকের সম্বোধন শুদ্ধ হয়।

তদ্রূপ যদি বলে যে, আমি তার জামিন হলাম। (তাহলে কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হবে।)

কেননা এটা তো হলো কাফালাহ-এর 'অনিবার্য ফল'-এর স্পষ্ট উল্লেখ।

কিংবা যদি বলে সে আমার যিম্মায়।

কেননা এটি দায় গ্রহণের অর্থবোধক শব্দ।

কিংবা যদি বলে, তার বিষয়টি আমার উপর ন্যস্ত।

কেননা এক্ষেত্রে إِلَيَّ (বা আমার কাছে) শব্দটি عَلَى (বা আমার উপর) এর সমার্থক। নবী (স) বলেছেন,

ومن ترك مالاً فلورثته و من ترك كلا اوْ عيالاً فالَى

যে সম্পদ রেখে মারা যায় তা তার ওয়ারিসদের জন্য হবে। আর যে কোন ইয়াতীম ও পোষ্য রেখে মারা যাবে তার দায় আমরা উপর ন্যস্ত।

তদ্রূপ যদি বলে, আমি যিম্মাদারী বা তদারকি গ্রহণ করলাম। কেননা (যিম্মাদারী) 'কাফালাহ'-এরই সমার্থক। এর সমর্থনে আমরা হাদীস বর্ণনা করেছি। তদ্রূপ তদারকি গ্রহণকারী কাফীল-এরই সমার্থক। এজন্য চেককে قبالة (কাবালা) বলে।

আর যদি বলে যে, আমি তার পরিচয়ের জামিনদার তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা একথা দ্বারা সে শুধু উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়ের দায় গ্রহণ করেছে। দাবী পরিশোধের দায় গ্রহণ করেনি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি মানুষের দেহসত্তার দায় গ্রহণের ক্ষেত্রে যামীনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ে অর্পণের শর্ত আরোপ করে থাকে তাহলে তাকে সেই সময়ে দাবী করা মাত্র তাকে উপস্থিত করা তার জন্য আবশ্যক হবে।

যাতে যে দায় গ্রহণ করেছে তা পূর্ণ হয়।

যদি সে (যথা সময়ে) তাকে উপস্থিত করে তাহলে তো ভালো। অন্যথায় শাসক তাকে আটক করবে।

কেননা সে এমন হক পুরা করা থেকে বিরত রয়েছে, যা তার বিপক্ষে অন্যের প্রাপ্য। তবে প্রথম দফাতেই তাকে আটক করবে না। কেননা হতে পারে যে, কেন তাকে ডাকা হয়েছে, তা সে বুঝতে পারেনি।

যার দেহসত্তার দায় গ্রহণ হয়েছে সে যদি গায়েব থাকে তাহলে শাসক কাফিলকে যাওয়া ও আসার সময় পরিমাণ অবকাশ দেবেন। সময় চলে যাওয়ার পরও যদি সে তাকে উপস্থিত না করে, তখন হক পুরা করা থেকে বিরত থাকা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে শাসক তাকে আটক করবেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তদ্রূপ (তাকে অবকাশ প্রদান করা হবে) যদি, আল্লাহ না করুন, সে মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়।

এই সুযোগ প্রদানের কারণ এই যে, সে তো নির্ধারিত সময়ে তাকে উপস্থিত করতে সক্ষম নয়, সুতরাং (ঋণগ্রস্ত) আদেল ব্যক্তির ন্যায় তাকে অবকাশ প্রদান করা হবে।

আর যদি সে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাকে সোপর্দ করে দেয় তাহলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা নির্ধারিত মেয়াদটি হলো তার হক। সুতরাং সে তা রহিত করার অধিকার রাখে। যেমন মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি সে তাকে উপস্থিত করতে এমন স্থানে সোপর্দ করে, যেখানে মাকফূললাহ্ (যার পক্ষে দায় গ্রহণ করা হয়েছে) **তার সাথে মামলা লড়তে পারে; যেমন কোন শহরে, তাহলে কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।**

কেননা সে যে দায় গ্রহণ করেছে তা পূর্ণ করেছে এবং এতটুকু দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। এটা এজন্য যে, সে তো একবার মাত্র সোপর্দ করার দায়ই গ্রহণ করেছে।

আর যদি এই দায় গ্রহণ করে থাকে যে, সে তাকে কাযীর মজলিসে সোপর্দ করবে অতঃপর সে তাকে বাজারে (অর্থাৎ লোক সমাবেশে যেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়) সোপর্দ করে তাহলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে। তবে কোন কোন মতে আমাদের যুগে (কাজী মজলিসে সোপর্দ করার শর্ত আরোপ করা হলে অন্যত্র সোপর্দ করার মাধ্যমে দায়মুক্ত হবে না। কেননা (এখন) সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে আসামীকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করা হাজির করার ব্যাপারে সাহায্য করা নয়।

সুতরাং এই শর্তারোপ অর্থবহ।

যদি তাকে মাঠে ময়দানে (নির্জন স্থানে) সোর্পদ করে তাহলে দায়মুক্ত হবে না।

কেননা মাকফূল লাহু সেখানে তাকে বিচারের সম্মুখীন করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং উদ্দেশ্য অর্জিত হলো না।

তদ্রূপ যদি (এমন) গ্রামে উপস্থিত করে (যেখানে বিচারক নেই।) তাহলে সেখানে ফায়সালা প্রদানের মত কাজী না থাকার কারণে দায়মুক্ত হবে না।

আর যদি যে শহরে কাফালাহ (বা দায়) গ্রহণ করেছিলো, তার পরিবর্তে অন্য কোন শহরে তাকে সোপর্দ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সেখানে বিচারের সম্মুখীন করার ব্যাপারে সক্ষমতার কারণে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

ছাহেবায়নের মতে দায়মুক্ত হবে না। কেননা হতে পারে যে, তার সাক্ষীগণ ঐ শহরেই রয়েছে, যে শহর নির্ধারণ করেছিলো।

যদি জেলখানায় বন্দী অবস্থায় তাকে সোপর্দ করে, আর ঘটনা এই যে, প্রতিপক্ষ (মাকফূললাহ) ছাড়া অন্য কারো মামলায় কাজী তাকে আটক করেছেন, তাহলে সে দায়মুক্ত হবে না।

কেননা জেলখানায় সে তাকে বিচারের সম্মুখীন করতে সক্ষম হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মাকফূল বিহী (জামিন প্রদত্ত বিবাদী ব্যক্তি) যদি মারা যায় তাহলে ব্যক্তিসত্তার দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা সে তাকে উপস্থিত করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। তাছাড়া মৃত্যুর কারণে মূল ব্যক্তির উপর উপস্থিত হওয়ার দায় রহিত হয়ে গেছে, সুতরাং কাফীলের উপর থেকেও উপস্থিত করার দায় রহিত হয়ে যাবে।

একইভাবে কাফালাহ রহিত হয়ে যাবে যদি কাফীল মারা যায়।

কেননা যামীন প্রদত্ত ব্যক্তিকে (মাকফূল-বিনাফাসহী) নিজে সোপর্দ করতে সে সক্ষম থাকেনি আর তার রেখে যাওয়া সম্পদ এই দায়িত্ব পূর্ণ করার যোগ্য নয়।

অর্থের দায়গ্রহণকারী কাফীলের বিষয়টি ভিন্ন।

আর যদি মাকফূল লাহু (যার প্রয়োজনে দায় গ্রহণ করা হয়েছে) মারা যায় তাহলে তার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকার রয়েছে কাফীলের কাছে দাবী করার। আর যদি নিযুক্ত কোন অছী না থাকে তাহলে তার ওয়ারিছদের সে অধিকার থাকবে। কেননা তারা হল মাইয়েতের স্থলবর্তী।

ইমাম মুহাম্মদ বলেন, যে ব্যক্তি অন্য একজনের দেহ সত্তার দায় গ্রহণ করলো কিন্তু একথা বললো না যে, যখন তাকে তোমার কাছে অর্পণ করবো তখন আমি দায়মুক্ত হয়ে যাবো অতঃপর সে তাকে অর্পণ করলো তখন সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা এটাই দল চুক্তির দায়িত্ব। সুতরাং স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়াই দায়মুক্তি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অর্পণকে প্রতিপক্ষের গ্রহণ করার শর্ত নেই। যেমন ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে। মাকফূল বিহী নিজেই যদি তার কফীলের পক্ষ থেকে সোপর্দ করে দেয় তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা বিবাদের ক্ষেত্রে সেই হলো বিবাদী। সুতরাং বিবাদ প্রতিরোধের অধিকার তার রয়েছে। অদ্রূপ দায়মুক্ত হয়ে যাবে যদি কাফীলের ওয়াকীল বা দূত তাকে মাকফূল লাহুর কাছে সোপর্দ করে দেয়। কেননা তারা উভয় কাফিলের স্থলবর্তী।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সে যদি নিজেই কফীল হয় এই শর্তে যে, যদি অমুক সময়ের মধ্যে সে তাকে সোপর্দ না করে তাহলে সে তার কাছে প্রাপ্য অর্থের জামিন হবে। আর প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ হলো এক হাজার দিরহাম। এরপর সে উক্ত সময়ে তাকে সোপর্দ করলো না, তাহলে উক্ত অর্থের জামানত তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

কেননা এখানে অর্থের দায়গ্রহণকে দেহসত্তার অর্পণ না করার শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর এ সম্পৃক্তকরণ বৈধ। সুতরাং যখন শর্ত পাওয়া যাবে তখন কাফীলের উপব অর্থের দায় সাব্যস্ত হবে।

তবে দেহসত্তার দায় থেকেও মুক্ত হবে না।

কেননা কাফালাহ-সূত্রে তার উপর অর্থ দায় অবশ্য সাব্যস্ত হওয়া দেহসত্তার দায় গ্রহণের বিরোধী নয়। কারণ উভয় প্রকার কাফালাহ-এর প্রতিটির উদ্দেশ্যে হচ্ছে বিষয়টিকে দৃঢ়তা দান করা।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, অর্থ দায় গ্রহণের এই কাফালাহ শুদ্ধ হবে না। কেননা এখানে মাল অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার হেতু (তথা কাফালাহ বিলমাল)কে একটি অনিশ্চিত বিষয়ের[১] সাথে ঝুলন্ত করা হয়েছে। সুতরাং এটা বিক্রয় চুক্তির সদৃশ হলো[২]

আর বিক্রয় চুক্তিতে মাল অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার হেতুকে শর্তের সাথে ঝুলন্ত করা বৈধ নয়। সুতরাং এখানে তা বৈধ হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, এটা যেমন বিক্রয় চুক্তির সদৃশ, তেমনি নযর ও মান্নতের সদৃশ; এ হিসাবে যে, এটা হচ্ছে অবশ্য সাব্যস্ত নয় এমন বিষয়কে স্বেচ্ছায় নিজের উপর অবশ্য সাব্যস্ত করা। সুতরাং (বিক্রয় চুক্তির সাথে সাদৃশ্যতার ভিত্তিতে আমরা বলেছি যে, সাধারণ ও অনির্ধারিত শর্তের সাথে এটাকে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে না। যেমন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে উভয়ের সাথে সাদৃশ্যতার প্রেক্ষিতে প্রচলিত শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে। আর (কাফালাহ বিলমালকে) দেহসত্তা উপস্থিত না করার শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রচলন রয়েছে ঃ

এ সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি উভয় সাদৃশ্যতার বিষয়টিকে আমলে আনার জন্য।

কেউ যদি কোন ব্যক্তির দায় গ্রহণ করে আর বলে যে, যদি আগামীকাল তাকে উপস্থিত না করতে পারি তাহলে তার অর্থদায় আমার উপর বর্তাবে; এখন আগামীকালের পরে যদি মাকফূল আনহু (জামিন প্রদত্ত ব্যক্তি) মারা যায় তাহলে সে উক্ত মালের জামিনদার হবে।

কেননা শর্ত অর্থাৎ লোকটিকে উপস্থিত না করা সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে একশ দীনার পাওনার দাবী করে, দীনারের গুণ বর্ণনা করুক বা না করুক, এরপর একজন লোক বিবাদীর দেহসত্তার দায় গ্রহণ করলো এই শর্তে যে, যদি আগামীকাল তাকে উপস্থিত করতে না পারি তাহলে একশ দীনারের দায় আমার উপর বর্তাবে। এরপর আগামীকাল সে তাকে উপস্থিত করলো না, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর একশ দীনারের দায় বর্তাবে।

---

১. অনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে আসামীর দেহসত্তাকে উপস্থিত করা। কেননা তা অস্তিত্ব লাভ করতে পারে আবার নাও করতে পারে।

২. বিক্রয় চুক্তির অর্থমালের বিনিময়ে মাল লেনদেন করা। এখানেও মালের বিনিময়ে মাল সাব্যস্ত হয়। কেননা কাফীল যদি মাককূল বিহীর সম্মতিক্রমে অর্থদায় গ্রহণ করে থাকে তাহলে পরিশোধ করার পর ঐ মালের বিনিময়ে মাককূল বিহীর কাছ থেকে মাল গ্রহণ করবে।

আর মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি বাদী সেই দীনারের গুণ বর্ণনা না করে (যে, সেগুলো উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দীনার) আর একজন লোক উক্ত প্রকার দায় গ্রহণ করলো এরপর বাদী দাবী করলো (যে, দীনারগুলো বিশেষ গুণের) তাহলে তার দাবীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না।

কেননা সে অনির্ধারিত অর্থকে একটি অনিশ্চিত অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করেছে। দেখুন না ঐ অর্থকে সে মাকফূল আনহু-এর কাছে প্রাপ্য অর্থের নামে সম্পৃক্ত করেনি। আর এ অবস্থায় দীনারের গুণ বর্ণনা করলেও কাফালাহ বৈধ হয় না।

তাছাড়া দীনারের গুণ বর্ণনা ব্যতীত দাবী বৈধ হয়নি। সুতরাং বিবাদীর দেহসত্তাকে উপস্থিত করা তার উপর ওয়াজিব নয়। আর যখন তা ওয়াজিব হলো না, তখন দেহসত্তার দায়গ্রহণ (কাফালাহ বিন্‌নাফস) হলোনা। সুতরাং 'অর্থদায়' গ্রহণও ছহী হলো না। কেননা এর ভিত্তি হলো দেহসত্তার দায়গ্রহণ।

যদি দীনারের গুণ বর্ণনা করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

শায়খায়নের যুক্তি এই যে, একশ দীনার মালকে এখানে নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে; সুতরাং এটা ঐ মালের অভিমুখী হবে যা বিবাদীর যিম্মায় রয়েছে।

আর দাবী উত্থাপনের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বিবরণের প্রচলন রয়েছে।[১] সুতরাং পরবর্তী বিবরণের উপরে নির্ভর দাবী গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব যখন সে বিবরণ প্রদান করবে তখন উক্ত বিবরণ মূল দাবীর সাথে যুক্ত হবে। ফলে প্রথম কাফালাহটি (অর্থাৎ দেহসত্তার কাফালাহ) সহী হবে এবং তার উপর নির্ভর করে দ্বিতীটিও (অর্থাৎ কাফালাহ বিল মাল) সহী হবে।

কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে হদ্দ ও কিসাস-এর ক্ষেত্রে দেহসত্তার কাফালাহ বা দায় গ্রহণ করা জায়িয নয়।

এর অর্থ হলো ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বিবাদীকে 'কাফীল বিন নাফস' পেশ করতে বাধ্য করা যাবে না।

ছাহেবায়ন বলেন 'হদ্দুল কাযফ' (অপরাধের হদ্দ)-এর ক্ষেত্রে তাকে বাধ্য করা যাবে। কেননা তাতে বান্দার হক-এর দিক রয়েছে।

কিসাসের ক্ষেত্রে তাঁদের একই মত। কেননা এটি সম্পূর্ণ বান্দার হক।

যে সমস্ত হদ্দ সম্পূর্ণত: আল্লাহর হক সেগুলো সম্পর্কে ভিন্ন কথা।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো নবী (স)-এর হাদীস لا كفالة فى حد

-কোন হদ্দ-এর ক্ষেত্রে কাফালাহ নেই। এতে নবী (স) কোন পার্থক্য করেননি। তাছাড়া সকল হদ্দ-এর ভিত্তি হলো রহিতকরণের উপর। সুতরাং সেক্ষেত্রে (কাফালাহ এর মাধ্যমে) দৃঢ়করণ ওয়াজিব হবে না।

১. এটা হলো ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর কথিত দ্বিতীয় যুক্তির জবাব।

অন্যান্য হকের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেগুলো সন্দেহসমূহের দ্বারা রহিত হয়না। সুতরাং সেগুলোর ক্ষেত্রে (কাফালাহ দ্বারা) দৃঢ়করণ উপযুক্ত হবে। যেমন, শাস্তির ক্ষেত্রে।

অবশ্য বিবাদী যদি স্বেচ্ছায় কাফীল পেশ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা কাফালাহ চুক্তির ফলশ্রুতিকে তার উপর প্রয়োগ করা সম্ভব। কারণ এসকল ক্ষেত্রে বিবাদীর কর্তব্য হলো নিজের দেহাসত্তাকে সোপর্দ করা। সুতরাং কাফীলকেও সে ব্যাপারে দায়বদ্ধ করা যাবে। তাই দায় সংযুক্তি বিদ্যমান হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে বিবাদীকে আটক করা যাবে না; যতক্ষণ না বাদী, যাদের ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা রয়েছে পেশ করে কিংবা একজন সাক্ষী পেশ করে, যার ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কাজী অবগত।

কেননা এখানে আটকের কারণ হচ্ছে অপরাধের অভিযোগ আর অভিযোগ সাব্যস্ত হয় সাক্ষ্য প্রদানের দুটি অংশের যে কোন একটি দ্বারা, হয় (সাক্ষীর) সংখ্যা কিংবা ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা। পক্ষান্তরে অর্থ মামলার ক্ষেত্রে বিবাদীকে আটক করার বিষয়টি ভিন্ন।

কেননা সেক্ষেত্রে আটকই হলো সর্বোচ্চ শাস্তি। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রমাণ ছাড়া তা সাব্যস্ত হতে পারে না।

মাবসূত কিতাবের আদাবুল কাজী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ছাহেবয়নের মতে হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাক্ষ্যে আটক করা যাবে না। কেননা কাফালাহ-এর মাধ্যমে বিবাদীর উপস্থিতি দৃঢ়করণ সম্ভব।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, খেরাজের ক্ষেত্রে বন্ধক ও কাফালাহ্ গ্রহণযোগ্য।

কেননা খেরাজ হল একটি ঋণ, যা দাবীযোগ্য এবং যা উশুল করা সম্ভব।

সুতরাং কাফালাহ ও রেহেনের ক্ষেত্রে কাফালাহ ও রেহেন চুক্তির ফলশ্রুতিকে খেরাজ ঋণের উপর কার্যকর করা সম্ভব।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন লোক থেকে দেহসত্তার কাফীল গ্রহণ করে, এরপর সে চলে গেলে দেনাদার থেকে আরো একজন কাফীল গ্রহণ করে, তাহলে তারা দু'জনই কাফীল হবে।

কেননা কাফলাহ চুক্তির ফলশ্রুতি হলো দাবীর দায় গ্রহণ। আর তা বিভিন্ন হতে পারে। আর (কাফালাহ চুক্তির) উদ্দেশ্যে হলো দৃঢ় করা। আর দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দুটি চুক্তি পরস্পর বিরোধী নয়।

আর অর্থের দায়গ্রহণ বৈধ। মাকফূল বিহীর পরিমাণ জ্ঞাত হোক কিংবা অজ্ঞাত, যদি আলোচ্য ঋণটি বৈধ ঋণ হয়।

যেমন কেউ বললো, আমি তার পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহামের কাফীল হলাম। কিংবা তুমি তার কাছে যা পাও কিংবা এই বিক্রয়চুক্তিতে কিছু ঘটলে আমি তার

জামিন হলাম। কারণ এই যে, কাফালাহ এর ভিত্তি হলো উদারতার উপর। সুতরাং তাতে অজ্ঞতা মেনে নেওয়া যায়।

আর কাফালাহবিছ ছরফ (কারো পক্ষ হতে সম্ভাব্য যে কোন ঝুঁকির দায় গ্রহণ)-এর বৈধতা সম্পর্কে ইজমা রয়েছে। আর প্রমাণরূপে ইজমাই যথেষ্ট।

বিষয়টি আঘাতের দায়গ্রহণের মত হলো। এই কাফালাহ বৈধ। অথচ আঘাত সীমিত থাকার এবং সংক্রামিত (হয়ে প্রাণঘাতী) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঋণটি বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো কিতাবাত চুক্তির বিনিময় যেন না হয়, ইনশআল্লাহ যথাস্থানে এ আলোচনা আসবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মাকফূল লাহু এর ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে মূল ঋণ যার উপর, তাকে তাগাদা করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে তার কাফীলকে তাগাদা করতে পারে।

কেননা কাফালাহ অর্থ তাগাদার ক্ষেত্রে দায়ের সংগে দায়কে যুক্ত করা। আর তা প্রথমজনের দায়মুক্ত নয় বরং দায়বদ্ধতার বিদ্যমানতা দাবী করে। তবে যদি কাফালাহ চুক্তিতে মূল দেনাদারের দায়মুক্ততার শর্ত আরোপ করে, তখন উদ্দেশ্য বিবেচনায় চুক্তিটি হাওয়ালাহ চুক্তিরূপে সম্পন্ন হবে। যেমন মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হবে না-এ শর্তে কৃত হাওয়ালা চুক্তি কাফালাহ চুক্তি বলে গণ্য হয়।

দু'জনের একজনকে তাগাদা করার পর অপরজনকেও তাগাদা করার অধিকার তার রয়েছে। আবার দু'জনকে এক সংগে তাগাদা করারও অধিকার রয়েছে।

কেননা কাফালাহ এর দাবী হলো সংযুক্ততা। পক্ষান্তরে (জবরদখলকৃত বস্তুর) মালিক যদি পারস্পরিক সম্মতি কিংবা কাজীর বিচারের ভিত্তিতে (মালিকের কাছ থেকে জবর দখলকারী কিংবা জবরদখলকারীর কাছ থেকে জবরদখলকারী এই) দুই গসবকারীর কোন একজনকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার জন্য নির্বাচিত করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। (অর্থাৎ অন্যজনের কাছে আর ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে না। কেননা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য মালিকের পক্ষ থেকে দুজনের একজনকে নির্বাচন করা, মালিকের পক্ষ থেকে তাকে মালিকানা প্রদানকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং সে দ্বিতীয়জনকে আর মালিকানা প্রদান করতে পারে না।

পক্ষান্তরে কাফালাহর ভিত্তিতে তাগাদা করা, মালিকানা প্রদানকে অন্তর্ভুক্ত করেনা। সুতরাং দুটি ক্ষেত্রের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাফালাহকে বিভিন্ন শর্তের সাথে যুক্ত করা জায়িয রয়েছে, যেমন বললো, তুমি অমুকের সাথে যা বেচা-কেনা করবে, তার দায়দেনা আমার উপর। কিংবা তার কাছে তোমার যা কিছু প্রাপ্য হবে তার দায়দেনা আমার উপর, কিংবা অমুক তোমার কাছ থেকে যা কিছু গসব করে, তার দায় দেনা আমার উপর। এক্ষেত্রে মূল প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ

بَعِيرٍوَّأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (যে বাদশাহর পানপাত্র এনে দেবে, তার জন্য এক উটের বোঝা পুরস্কার রয়েছে আর আমি তার কাফীল হলাম)।

আর কোন অঘটন ঘটলে তার বৈধতার বিষয়ে ইজমাও রয়েছে।

আর (শর্তারোপের ক্ষেত্রে) মূলনীতি এই যে, কাফালাহকে তার সাথে সংগতিপূর্ণ শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে। যেমন, (বাদীর) হক অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হয়। যেমন বিক্রয় চুক্তির সময় কেউ (ক্রেতাকে বললো, বিক্রয় দ্রব্যের যদি কোন দাবীদার বের হয় তাহলে আমি মূল্যের যিম্মাদার।

কিংবা এমন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা, যার দ্বারা হক উশুল করা সম্ভব হয়। যেমন কাফিল বলল, মকফূল লাহ যায়দ যদি এসে যায় তাহলে আমি তার পক্ষ থেকে কফিল।

কিংবা এমন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা, যা হক উশুল করাকে অসম্ভব করে দেয়। যেমন বললো যে, মাককূল আনহু যদি শহর থেকে গায়েব হয়ে যায় তাহলে আমি জামিন।

আর আলোচ্য মাসআলায় যে সকল শর্ত আলোচিত হয়েছে তা আমাদের কথিত শর্তসমূহের সমশ্রেণীভুক্ত।

তবে সম্পর্কহীন কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে না। যেমন বললো, যদি বায়ু প্রবাহ শুরু হয়, কিংবা বৃষ্টি শুরু হয় তাহলে আমি জামিন হবো। তদ্রূপ এ দুটির কোন একটিকে মেয়াদরূপে উল্লেখ করলেও সহীহ্ হবে না। তবে কাফালাহ সহী হয়ে যাবে আর মাল নগদ আবশ্যক হবে।

কেননা কাফালাহকে যখন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ হলো তখন ফাসিদ শর্ত দ্বারা তা বাতিল হবে না; যেমন, তালাক প্রদান এবং দাসমুক্ত করার ক্ষেত্রে।

যদি বলে যে, তার কাছে তোমার যা প্রাপ্য আছে আমি তার যামিন হলাম। অতঃপর তার কাছে এক হাজার দিরহাম প্রাপ্যতার সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ হলো, তাহলে কাফীল একহাজার দিরহামের জামিন হবে।

কেননা 'সাক্ষ্য প্রমাণ' দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তা চাক্ষুষ সাব্যস্ত হওয়ার সমতুল্য। সুতরাং তার কাছে 'তোমার যা প্রাপ্য' কথাটা সাব্যস্ত হয়ে গেলো, সুতরাং ঐ পরিমাণের জামিন হওয়া সাব্যস্ত হলো।

আর যদি 'সাক্ষ্য প্রমাণ' পেশ না হয় তাহলে পরিমাণের ব্যাপারে কাফীলের শপথসহ স্বীকারোক্তিই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা সে অতিরিক্ত পরিমাণকে অস্বীকার করছে।

আর মাকফূল আনহু যদি তার চেয়ে বেশী পরিমাণ স্বীকার করে তাহলে কাফীলের বিপক্ষে তা সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না।

কেননা এটা হলো অন্যের বিপক্ষে স্বীকার করা। আর অন্যের উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই। তবে তার নিজের ব্যাপারে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে।

কেননা নিজের উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর মাকফূল আনহু-এর আদেশক্রমে এবং বিনা আদেশে কাফীল হওয়া জায়িয রয়েছে।

কেননা আমাদের বর্ণিত হাদীসটি নিঃশর্ত। তাছাড়া এটা হলো তাগাদার দায়গ্রহণ যা তার নিজের সাথে জড়িত বিষয় আর তাতে বাদীর ফায়দা রয়েছে এবং বিবাদীর কোন ক্ষতি নেই। কেননা তার আদেশক্রমে হওয়ার সময় পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত নেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হয় আর তখন তো সে ব্যাপারে সে সম্মতই রয়েছে।

যদি সে তার আদেশক্রমে কাফীল হয় তাহলে সে যা পরিশোধ করে তা সে তার কাছ থেকে ফেরত নেবে।

কেননা সে তো তার আদেশেই তার ঋণ পরিশোধ করেছে।

আর যদি সে তার বিনা আদেশে কাফীল হয় তাহলে যা পরিশোধ করেছে তা ফেরত পাওয়ার দাবী করতে পারে না।

কেননা এই মাল পরিশোধের ব্যাপারে সে হলো স্বেচ্ছা দাতা।

যা পরিশোধ করেছে তা ফেরত নেবে— এর অর্থ হলো যদি কাফীল ঐ জিনিসই পরিশোধ করে থাকে, যার দায় সে গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে যদি সে তার বিপরীত কিছু প্রদান করে থাকে তাহলে সেটাই ফেরত নেবে যেটার দায় গ্রহণ করেছে।

কেননা পরিশোধ করার মাধ্যমে কাফীল ঋণের মালিক হয়েছে, সুতরাং তাকে পাওনাদারের স্থলবর্তী গণ্য করা হবে।

যেমন হেবার মাধ্যমে কিংবা মীরাছের মাধ্যমে কাফীল উক্ত ঋণের মালিক হয়ে গেলো।

কিংবা যেমন হাওয়ালাহ অধ্যায়ে আমরা যে সব সূত্র উল্লেখ করেছি সেগুলোর কোন একটি সূত্রে হাওয়ালার দায়গ্রহণকারী উক্ত ঋণের মালিক হয়ে গেলো।

ঋণ পরিশোধ করার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ সে যা পরিশোধ করবে তাই সে ফেরত পাবে।

কেননা ঋণ আদায়ের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তির উপর কোন দায় ওয়াজিব হয়নি।

যার কারণে পরিশোধের মাধ্যমে সে ঋণের মালিক হয়েছে বলা যায়।

তদ্রূপ কাফীল যদি তাগাদাকারীর সাথে এক হাজারের বিপরীতে পাঁচশর উপর সন্ধি করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা এটা হলো রহিতকরণ, সুতরাং কাফীলকে দায়মুক্ত করে দেয়ার মত হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মাকফূল আনহু-এর পক্ষ হতে মাল আদায় করার আগে তার কাছে মাল দাবী করার অধিকার কাফীলের নেই। কেননা আদায় করার আগে কাফীল মালের মালিক হয় না।

ক্রয় সংক্রান্ত ওয়াকীলের বিষয়টি ভিন্ন। সে মূল্য পরিশোধের পূর্বেই (মুআক্কিলের কাছে) মূল্য চাইতে পারে। কেননা ওয়াকীল ও মুআক্কিলের মাঝে একটি আইনগত বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি 'কাফীল বিল মাল'-এর পিছনে লেগে থাকা হয় তাহলে তারও মাকফূল আনহু-এর পিছনে লেগে থাকার অধিকার রয়েছে, যতক্ষণ না সে তাকে দায়মুক্ত করে।

তদ্রূপ যদি কাফীলকে আটক করা হয় তাহলে তারও অধিকার রয়েছে, মাকফূল আনহুকে আটক করার।

কেননা কাফীল যা কিছু সম্মুখীন হয়েছে তা-মাকফূল আনহু-এর কারণেই। সুতরাং সেও তার সাথে অনুরূপ আচরণ করতে পারে।

বাদী (মাকফূল লাহু) যদি মাকফূল আনহুকে দায়মুক্ত করে দেয় কিংবা তার কাছ থেকে নিজের হক উশুল করে নেয় তাহলে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায়মুক্তি কাফীলের দায়মুক্তিকে ওয়াজিব করে। কেননা বিশুদ্ধ মতে ঋণের দায় মূল ব্যক্তিরই উপর।

আর যদি বাদী কাফীলকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হবে না।

কারণ কাফীল হচ্ছে তার অনুবর্তী।

কেননা কাফীলের উপর শুধু তাগাদায় দায় আরোপিত হয়েছে, ঋণের দায় নয়। আর কাফীল ছাড়া শুধু মূল ব্যক্তির উপর ঋণবহাল থাকা জায়িয।

বাদী যদি মূল ব্যক্তিকে 'অবকাশ'-দান করে তাহলে তা কাফীলকেও 'অবকাশ' দান বলে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে যদি কাফীলকে অবকাশ দান করে তাহলে সেটা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দান বলে গণ্য হবে না।

কেননা অবকাশ দান করার অর্থ হলো সাময়িকভাবে দায়মুক্ত করা। সুতরাং সেটা স্থায়ী দায়মুক্তির সাথে বিবেচ্য হবে।

পক্ষান্তরে তাৎক্ষণিক আদায়যোগ্য মালের যদি এক মাস পর্যন্ত মেয়াদে কাফালাহ গ্রহণ করে তাহলে মূল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মেয়াদ যুক্ত হবে।

কেননা কাফালাহ-এর অস্তিত্ব লাভের সময় ঋণ ছাড়া আর কোন হক মাকফূল লাহু-এর ছিলো না। মেয়াদের শর্তটি মূল ঋণের সাথে যুক্ত হবে।

আর এখানে (উপরোক্ত) মাসআলাটি বল -এর বিপরীত।

কাফীল যদি অর্থ প্রদানকারীর সাথে এক হাজারের বিপরীতে পাঁচশ দিরহামের উপর সন্ধি করে তাহলে কাফীল এবং মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা সে ঋণের এক হাজারের সাথে সন্ধিকে সম্পৃক্ত করেছে। আর উক্ত এক হাজার তো মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপরই অবশ্য সাব্যস্ত ছিলো। সুতরাং সে পাঁচশ দিরহাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা এটা হলো রহিতকরণ। আর মূল ব্যক্তির দায়মুক্তি কাফীলের দায়মুক্তিকে অনিবার্য করে। অতঃপর কাফীলের পাঁচশ দিরহাম পরিশোধের কারণে উভয়ে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

অতঃপর কাফালাহ যদি মূল ব্যক্তির আদেশে হয়ে থাকে তাহলে কাফীল মূল ব্যক্তির কাছ থেকে পাঁচশ দিরহাম ফেরত নেবে।

পক্ষান্তরে যদি এক হাজার দিরহামের বিপরীতে অন্য কোন শ্রেণীর দ্রব্যের উপর সন্ধি করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা এটা হলো আইনগত বিনিময়। সুতরাং সে এক হাজার দিরহামের মালিক হয়ে যাবে এবং মাকফূল আনহু-এর নিকট হতে পূর্ণ এক হাজার ফেরত নেবে।

আর যদি ঋণদাতার সাথে ঐ হক-এর বিপরীতে সন্ধি করে যা কাফালাহ চুক্তির কারণে কাফীলের কাছে তার প্রাপ্য হয়েছিল। তাহলে মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হবে না। কেননা এটা হলো কাফীলকে তাগাদা থেকে দায়মুক্তকরণ।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, মালের দায়গ্রহণকারী কাফীলকে কেউ যদি বলে, তুমি আমার পক্ষ থেকে মালের দায়মুক্ত হয়েছ, তাহলে কাফীল মাকফূল আনহু-এর কাছে ফেরত চাইতে পারে।

অর্থাৎ মাকফূল আনহু-এর আদেশক্রমে যে পরিমাণ মালের জামিন হয়েছে তা।

কেননা যে দায়মুক্তির সূচনা বিবাদী থেকে হয়েছে আর সমাপ্তি কয়েক বাদীর কাছে, তাহলে তা পাওনা পরিশোধ ছাড়া হতে পারে না। তাই এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে পাওনা পরিশোধের স্বীকারোক্তি। সুতরাং সে উক্ত অর্থ ফেরত পাবে।

আর যদি বলে 'দায়মুক্ত করলাম' তাহলে তা কাফীল মাকফূল আনহু-এর কাছে ফেরত চাইতে পারে না।

কেননা দায়মুক্তি অন্যকারো অভিমুখী হয়ে সমাপ্ত হচ্ছে না। আর তা হয় রহিতকরণের মাধ্যমে। সুতরাং তা পাওনা পরিশোধের স্বীকারোক্তি নয়।

আর যদি বলে 'তুমি দায়মুক্ত' তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে এটা দ্বিতীয় বক্তব্যের অনুরূপ হবে। কেননা এ বক্তব্যে তাগাদাকারীর নিকট পরিশোধের মাধ্যমে দায়মুক্ত হওয়ার, আবার দায়মুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং-দুটির নিম্নতরটি সাব্যস্ত হবে। কেননা সন্দেহের অবস্থায় কাফীল ফেরত পেতে পারে না।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এটা প্রথম বক্তব্যের অনুরূপ হবে। কেননা পাওনাদার এমন দায়মুক্তির স্বীকারোক্তি করেছে, যার সূচনা হলো কাফীলের দিক থেকে। আর কাফীলের কর্ম হলো পরিশোধকরণ, দায়মুক্তকরণ নয়।

কারো কারো মতে আমরা যে কটি ছূরত উল্লেখ করেছি, সেগুলোতে বাদী যদি উপস্থিত থাকে তাহলে ব্যাখ্যার ব্যাপারে তার কাছে রুজু করা হবে। কেননা সে-ই হলো বক্তব্য সংক্ষেপণকারী।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাফালাহ-থেকে দায়মুক্তিকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়।

কেননা অন্য সকল 'দায়মুক্তির' মত এখানেও মালিকানা প্রদানের দিক রয়েছে।

তবে এপরও বর্ণিত রয়েছে, যে, শর্তায়ন বৈধ হবে। কেননা বিশুদ্ধ মতে কাফীলের উপর শুধু তাগাদার দায় রয়েছে, ঋণের দায় নয়। সুতরাং তালাকের ন্যায় এটাও নিছক রহিতকরণ। আর নিছক রহিতকরণ হওয়ার কারণেই কাফীলকে দায়মুক্ত করার বিষয়টি রদ্দ করলেও রদ হয় না। পক্ষান্তরে মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দায়মুক্তকরণের বিষয়টি ভিন্ন।

যে সকল হক কাফীলের কাছ থেকে উশুল করা সম্ভব নয়, তার কাফালাহ বা দায়গ্রহণ বৈধ নয়। যেমন যাবতীয় হদ্দ ও কিসাস।

অর্থাৎ স্বয়ং হদ্দ ও কিসাসের দায় গ্রহণ। হদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহসত্তার দায় গ্রহণের বিষয়টি নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়।

কেননা তার উপর হদ্দ ও কিসাস প্রয়োগ করা অসম্ভব। অসম্ভবতার (আইনগত) কারণ এই যে, শাস্তির ব্যাপারে স্থলবর্তিতা চলে না।

আর ক্রেতার পক্ষ থেকে যদি মূল্যের দায়গ্রহণ করে তা বৈধ হবে।

কেননা অন্য সকল ঋণের ন্যায় এটাও। আর যদি বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রয় দ্রব্যের দায়গ্রহণ করে তবে তা বৈধ হবে না।

কেননা বিক্রয়দ্রব্য হচ্ছে একটি নির্ধারিত বস্তু, যা তা থেকে ভিন্ন কিছু দ্বারা অর্থাৎ ধার্য মূল্য দ্বারা দায়বদ্ধ।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতের বিপরীতে আমাদের মতে যদিও দায়বদ্ধ নির্ধারিত বস্তুর কাফালাহ বা দায়গ্রহণ বৈধ রয়েছে। কিন্তু সেটা হলো এমন নির্ধারিত বস্তু, যা হুবহু তার সত্তা দ্বারা দায়বদ্ধ। যেমন ফাসিদ বিক্রয় চুক্তির বিক্রয় দ্রব্য। কিংবা মূলামূলির পর্যায় কবজাকৃত দ্রব্য কিংবা গসবকৃত দ্রব্য। যে সব নির্ধারিত দ্রব্য তা থেকে ভিন্ন কিছু দ্বারা দায়বদ্ধ সেগুলোতে কাফালতে বৈধ নয়। যেমন বিক্রয় দ্রব্য এবং বন্ধকী দ্রব্য। তদ্রূপ আমানতরূপে গণ্য দ্রব্যতেও নয়। যেমন, গচ্ছিত দ্রব্য, ধারে নেয়া দ্রব্য ও ভাড়ায় নেয়া দ্রব্য এবং মোদারাবা ও শিরকাতের ভিত্তিতে গ্রহণকৃত মাল।

যদি কবজা করার পূর্বে ক্রেতার কাছে বিক্রয় দ্রব্য সোপর্দ করার দায় গ্রহণ করে কিংবা ঋণের দখল গ্রহণের পর বন্ধক গ্রহণ করার হাতে বন্ধকী দ্রব্য সোপর্দ করার দায় গ্রহণ করে কিংবা ভাড়ায় গ্রহণকারীর হাতে ভাড়ায় নেয়া বস্তুটি সোপর্দ করার দায় গ্রহণ করে তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা সে এমন একটি কর্মের দায় গ্রহণ করেছে, যা মূল ব্যক্তির উপর ওয়াজিব ছিলো।

কেউ যদি বহনের উদ্দেশ্যে কোন পশু ভাড়া করে আর সেটা যদি নির্ধারিত কোন পশু হয় তাহলে বহনের কাফালা বৈধ হবে না।

কেননা এ দায় পালনে সে অপরাগ।

আর যদি বহন অনির্ধারিত হয় তাহলে কাফালা বৈধ হবে।

কেননা সে নিজের পশুর উপর বহন করতে সক্ষম। আর বহনই হলো এক্ষেত্রে প্রাপ্য।

তদ্রূপ কেউ যদি খেদমতের জন্য কোন গোলাম ভাড়া নেয়। আর কোন লোক তার অনুকূলে ঐ গোলামের খেদমতের দায়গ্রহণ করে তাহলে আমাদের বর্ণিত কারণে তা বাতিল হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাফালাহ বৈধ হবে না, যদি না মজলিসেই মাকফূল লাহু তা গ্রহণ করে।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মোহাম্মদ (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যদি খবরটি তার কাছে পৌছার পর সে তা অনুমোদন করে তাহলে বৈধ হবে।

ইমাম কূদূরীর (র) কোন কোন অনুলিপিতে অনুমোদনের শর্ত আরোপ করা হয়নি।

এই মতপার্থক্য দেহসত্তার অর্থ-সম্পদ উভয় কাফালাহর ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, এ হলো স্বেচ্ছা দায়গ্রহণের একটি পদক্ষেপ। সুতরাং স্বেচ্ছা দায়গ্রহণকারী এ বিষয়ে স্বয়ং অধিকারী হবে। এ হলো ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে প্রাপ্ত এই বর্ণনার কারণ।

আর (অনুমোদনের উপর) স্থগিত থাকার কারণ তা-ই যা আমরা বিবাহের ক্ষেত্রে ফুযুলী (অনাহত ব্যক্তি) সম্পর্কে উল্লেখ করেছি।

তারফায়নের দলীল এই যে, কাফালাহ চুক্তিতে মালিকানা (বা ক্ষমতা) প্রদানের অর্থ রয়েছে, অর্থাৎ (কাফীলের পক্ষ থেকে) তাগাদা করার মালিকানা (বা ক্ষমতা) প্রদান সুতরাং এই চুক্তি উভয়ের দ্বারা সম্পন্ন হবে।

অথচ এখানে চুক্তির অর্ধাংশ বিদ্যমান হয়েছে। সুতরাং মজলিসের পরবর্তী সময়ের উপর তা নির্ভরশীল হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে একটি মাসআলার হুকুম ভিন্ন। আর তা হলো, মৃত্যুশয্যায় অসুস্থ ব্যক্তি তার ওয়ারিছকে বললো যে, আমার যিম্মায় যে ঋণ রয়েছে, তুমি আমার পক্ষ থেকে তার দায় গ্রহণ করো, আর ওয়ারিছ পাওনাদারদের অনুপস্থিতিতে তার দায় গ্রহণ করলো, এটি জায়িয হবে।

কেননা এটা মূলত: ওয়াছিয়াত। (কাফালাহ নয়) একারণেই মাকফূল লাহু-এর নামোল্লেখ ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য হয়।

একারণেই মাশায়েখগণ বলেছেন যে, এই বক্তব্য তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন (মৃত্যুর সময়) তার কাছে মাল থাকে।

অথবা বৈধ-হওয়ার কারণ হিসেবে এও বলা যেতে পারে যে, ঋণ থেকে তার দায়মুক্ত হওয়ার জন্য যেহেতু এই চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার তার প্রয়োজন রয়েছে। আর তাতে পাওনাদারদের উপকার রয়েছে, সেহেতু অসুস্থ ব্যক্তিকেই মাকফূল লাহ-এর স্থলবর্তী বিবেচনা করা হবে।

যেমন, মাকফূল লাহু যদি নিজে উপস্থিত হয়। অসুস্থ ব্যক্তিটির এই বক্তব্য দ্বারাই কাফালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কবুল করার শর্ত আরোপ করা হবে না। কেননা এ অবস্থায় বাহ্যত: এটাই স্বাভাবিক যে, চুক্তি বাস্তবায়নই তার উদ্দেশ্য, দরকষাকষি উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বিষয়টি বিবাহের আদেশ করার মত হলো।

আর অসুস্থ ব্যক্তি যদি কোন অপরিচিত (অর্থাৎ ওয়ারিছ নয় এমন ব্যক্তি) কে একথা বলে সেক্ষেত্রে এর বৈধতা সম্পর্কে মাশায়েখগণের মতভিন্নতা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর লোকটি যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় আর কোন সম্পত্তি রেখে না যায় এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে পাওনাদারদের জন্য কাফীল হলো, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ছাহেবায়ন বলেন, গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা সে (শরীয়তের দৃষ্টিতে এখনো বিদ্যমানও) সাব্যস্ত একটি ঋণের কাফালাহ বা দায় গ্রহণ করেছে। সাব্যস্ত একারণে যে,তা পাওনাদারের হকরূপে ওয়াজিব হয়েছে। আর এর রহিতকারী পাওয়া যায়নি। আর এ জন্যই আখিরাতের বিধান -এর ক্ষেত্রে তা বিদ্যমান থাকে। আর কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় এ ঋণ পরিশোধ করে তাহলে তা সহী হবে। অদ্রূপ যদি তার কোন কাফীল থাকে বা মাল থাকে তাহলেও কাফালাত বিদ্যমান থাকে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, দায়গ্রহণকারী লোকটি বিলুপ্ত ঋণের দায়গ্রহণ করেছে। কেননা ঋণ প্রকৃতপক্ষে একটি কর্ম। একারণেই তা وجوب (আবশ্যকীয়তা) বিশেষণে বিষেশিত হয়। অবশ্য আইনগত দিক থেকে প্রাপ্য অর্থ হলো ঋণ। কারণ পরিণতিতে সেটা মাল পর্যন্ত গড়ায়।

আর লোকটি নিজে কিংবা স্থলবর্তী দ্বারা কর্মটি সম্পাদনে অপারগ হয়ে পড়েছে। সুতরাং ঋণের যে ফলশ্রুতি তথা উত্তরকরণ তা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। সুতরাং অনিবার্যত তা রহিত হয়ে যাবে।

আর অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় পরিশোধ ঋণের বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে না।

আর যদি মৃতের পক্ষ থেকে কোন কাফীল থাকে কিংবা রেখে যাওয়া সম্পত্তি থাকে তাহলে তার স্থলবর্তী কিংবা 'পরিশোধ' বাস্তবায়ন হওয়া বিদ্যমান হলো।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন লোকের পক্ষ থেকে তার নির্দেশে তার যিম্মায় সাব্যস্ত এক হাজার দিরহামের কাফালাহ বা দায় গ্রহণ করে, আর কাফীল পাওনাদারকে টাকা পরিশোধ করার পূর্বে দেনাদার কাফীলকে ঐ এক হাজার প্রদান করে, তাহলে দেনাদার ব্যক্তি তা ফেরত চাইতে পারে না।

কেননা (এক হাজার দিরহাম) কবজাকারী কাফীল ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে, এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রদত্ত অর্থের সাথে তার হক যুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এই সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ফেরত দাবী করা জায়িয হবে না। যেমন কেউ (বছর পূর্তির পূর্বে) আগে ভাগে যাকাত আদায় করলো এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত উশূলকারীর কাছে তা প্রদান করলো।

তাছাড়া সে তো দখল গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত মালের মালিক হয়ে গেছে, যেমন পরবর্তীতে আমরা তা উল্লেখ করব।

পক্ষান্তরে অর্থ প্রদান যদি শুধু বাহক হিসাবে হয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা প্রদত্ত অর্থ তাঁর হাতে নিছক আমানত হবে।

কাফীল যদি ঐ মাল দ্বারা মুনাফা অর্জন করে তাহলে সেটা তারই হবে। সেটা তাকে ছাদকা করে দিতে হবে না।

কেননা যখন সে কবজা করেছে তখন সে উক্ত মালের মালিক হয়ে গেছে।

ঋণ যদি সে পরিশোধ করে দেয় তাহলে তো বিষয়টি পরিষ্কার। তদ্রূপ যদি ঋণগ্রস্ত মাকফূল আনহু নিজেই ঋণ পরিশোধ করে ফেলে এবং তার ফেরত পাওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যায় তবে কাফিলের মালিকানা সাব্যস্ত হবে। কেননা মাকফূল আনহুর কাছে তার ঐ পরিমাণ পাওনা হয়ে গেছে, যে পরিমাণ পাওনাদারের হক তার উপর রয়েছে তবে কাফীলের তাগাদা করার অধিকার পরিশোধ করার সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়েছে। সুতরাং এটাকে মেয়াদী ঋণে পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, আর একারণেই কাফীল যদি (ঋণ পরিশোধ করার পূর্বেই ঋণগ্রস্তকে পাওনা থেকে) দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। তদ্রূপ যদি সে ঐ মালের কবজা করে তাহলে মালিক হয়ে যাবে। অবশ্য তাতে কিছুটা দোষ রয়েছে, যা আমরা পরে বর্ণনা করবো। কিন্তু যে মাল নির্ধারণযোগ্য নয়, মালিকানা অর্জিত হলেও তাতে সেই দোষ বিবেচ্য হবে না। বিক্রয় পর্বে তা আমরা প্রমাণ করে এসেছি।

আর কাফালাহ যদি এক ধামা গম সম্পর্কে হয়, আর কাফীল তা কবজা করে তা বিক্রি করত: মুনাফা অর্জন করে তাহলে আইনের বিচারে মুনাফা তারই হবে।

কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, সে তার মালিক হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, আমি পছন্দ করি যে, মুনাফা সে মূল ঋণগ্রস্তকে ফিরিয়ে দেবে, যে ধামা গম পরিশোধ করেছে; তবে আইনত: তার জন্য তা ওয়াজিব নয়।

'জামে ছাগীরে'র বর্ণনা মতে এটা হলো ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এই মুনাফা তারই। সুতরাং নিজের পক্ষ থেকে ঋণ আদায়কারী মাকফূল আনহুকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে না।

এটাও ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা। তাঁর পক্ষ হতে আরেকটি বর্ণনা এই যে, ঐ মুনাফা সে সাদকা করে দেবে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, আমরা ইতিপূর্বে যে সূত্র বর্ণনা করেছি, সেই সূত্রে প্রাপ্ত মালিকানার মাল দ্বারা সে মুনাফা অর্জন করেছে। সুতরাং সেই মুনাফা তার অনুকূলে নিরাপদ থাকবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, মালিকানা লাভের সমকালেই দোষ তাতে স্থিত হয়েছে। হয় এই কারণে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেই তার ঋণ পরিশোধ করে দেবে এই সূত্র সে প্রদত্ত মাল ফেরত পাওয়ার পথেই রয়েছে। কিংবা কাফীল আদায় করে দিয়েছে এই হিসাবে উক্ত মালের ব্যাপারে কাফীলের হস্তক্ষেপে সে সন্তুষ্ট রয়েছে (অর্থাৎ দুটোরই সম্ভাবনা রয়েছে) কিন্তু যখন সে নিজেই পরিশোধ করে ফেললো তখন বোঝা গেলো যে, সে তাতে সম্মত ছিলো না। আর এই প্রকারের দোষ নির্ধারিত মালের ক্ষেত্রে কার্যকরি হয়। তাই এক বর্ণনা মতে তা থেকে নিষ্কৃতির উপায় হলো সাদকা করে দেয়া। আর অন্য বর্ণনা মতে মাকফূল আনহুকে ফিরিয়ে দেয়া। কেননা তার হক জনিত কারণেই দোষ হয়েছে। এটা বিশুদ্ধতম মত। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়, পছন্দমূলক। কেননা হক তো তার।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি এক হাজার দিরহাম ঋণগ্রস্ত কোন ব্যক্তির আদেশে তার পক্ষ হতে কাফালাহ্ গ্রহণ করে, তারপর মাকফূল আনহু কাফীলকে তার দায়িত্বে এক থান রেশমী বস্ত্রের 'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করার আদেশ করে, আর সে তাই করে; তাহলে এই ক্রয় কাফীলের নিজের জন্য হবে। আর বিক্রেতা যে মুনাফা অর্জন করলো, তা কাফীলের উপর বর্তাবে।

'বায় 'ইনাহ'-এর ছুরত এই যে, কাফীল কোন ব্যবসায়ীর কাছে দশ দিরহাম করয চাইল। কিন্তু তাকে করয দিতে অস্বীকার করলো, তবে অতিরিক্ত লাভের লোভে তার কাছে দশ দিরহাম মূল্যের একটি কাপড় পনের দিরহাম (বাকিতে) বিক্রি করলো, যাতে করয প্রার্থী অন্য একজনের কাছে দশ দিরহামে বিক্রি করে আর পাঁচ দিরহামের ক্ষতিবহন করে।

এ বিক্রয়কে 'বায় ইনাহ' বলে একারণে যে, তাতে ঋণ থেকে বিমুখ হয়ে বস্তু-এর প্রতি অভিমুখী হওয়ার দিক রয়েছে।

এ ধরনের বিক্রয় মাকরূহ। কেননা তাতে রয়েছে, নিন্দনীয় কৃপণতার অনুবর্তী হয়ে ঋণ প্রদানের নেক কাজে অনাগ্রহ প্রকাশ করা।

কারো কারো মতে মাকফূল আনহু-এর এই বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে ক্রেতা (কাফীল) যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে তার দায় গ্রহণ। এটা বলা হচ্ছে তার বক্তব্য 'আমার দায়িত্বে'-এর দিকে লক্ষ্য করে। আর এ 'দায়গ্রহণ' ফাসিদ ও অগ্রহণযোগ্য।

তার এ বক্তব্যের অর্থ ওয়াকীলরূপে নিযুক্তি দান নয়।

আর কারো কারো মতে এটা হচ্ছে ফাসিদরূপে ওয়াকীল নিয়োগ। কেননা রেশমী কাপড় এখানে অনির্ধারিত। অদ্রূপ মূল্যও অজ্ঞাত। কেননা ঋণের পরিমাণ থেকে কতটা অতিরিক্ত হবে তা অজ্ঞাত।

যাই হোক এই ক্রয়টা ক্রেতা তথা কাফীলের নিজের জন্য হবে। এবং অতিরিক্ত মুনাফার দায় তার উপরই বর্তাবে। কেননা সেই হচ্ছে চুক্তি সম্পন্নকারী।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যা তার দায়ভুক্ত রয়েছে কিংবা তার বিপক্ষে যে কোন পরিমাণের ফায়সালা করা হয়, তার দায়গ্রহণ করে, এরপর মাকফূল আনহু গায়েব হয়ে যায় আর দাবীদার কাফীলের বিপক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করে যে, মাকফূল আনহু এর যিম্মায় তার এক হাজার দিরহাম রয়েছে, তাহলে তার 'বাইয়েনাহ' (সাক্ষ্য-প্রমাণ) গ্রহণ করা হবে না।

কেননা যে জিনিসের সে দায় গ্রহণ করেছে তা হলো (দায় গ্রহণের পূর্বে) ফায়সালাকৃত পরিমাণ মাল। 'ফায়সালা' শব্দের ক্ষেত্রে তো এটা পরিষ্কার অদ্রূপ অপর বক্তব্যের ক্ষেত্রেও। কেননা দায়ভুক্ত তো আদালতের ফায়াসালা দ্বারাই হতে পারে।

শব্দ দুটি অতীত বাচক হলেও ভবিষ্যদ্বাচক ক্রিয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয় যেমন اطال الله بقاءك (আল্লাহ তোমার আয়ু দীর্ঘ করুন।) সে হিসাবে ঐ মালের দায় গ্রহণ হতে পারে যা পরবর্তীতে মাকফূল আনহু-এর দায়ভুক্ত হবে। কিন্তু দাবীদারের দাবী যেহেতু এ বিষয়ে নিঃশর্ত সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেউ যদি বাইয়েনাহূ উপস্থিত করে যে, অমুকের কাছে তার এত পাওনা রয়েছে আর এ লোক তার আদেশে তার পক্ষ কাফীল হয়েছে, তাহলে কাফীল (অনুপস্থিত) মাকফূল আনহু-এর বিপক্ষে উক্ত মালের ফায়সালা করা হবে। আর যদি মাকফূল আনহু- এর বিনা আদেশে কাফালাহ হয় তাহলে শুধু কাফীলের বিপক্ষে ফায়সালা করা হবে।

'বইয়েনাহ' গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ এই যে, এখানে মাকফূল বিহী হচ্ছে শর্ত মুক্ত মাল। এটি পূর্ববর্তী মাসআলার বিপরীত।

আদেশের কারণে এবং আদেশ না থাকার কারণে সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হবে এই জন্য যে, তাতে কাফালাহ-এর গুণগত পার্থক্য হয়। কেননা আদেশক্রমে যে কাফালাহ হয় সেটা সূচনা পর্বে হয় স্বেচ্ছাদান, আর সমাপ্তি পর্বে হয় বিনিময়। পক্ষান্তরে বিনা আদেশক্রমে যে কাফালাহ হয় তা সূচনা ও সমাপ্তি উভয় পর্বেই স্বেচ্ছাদান হয়। সুতরাং একশ্রেণীর কাফালাহ-এর দাবী করার কারণে তার অনুকূলে অন্য শ্রেণীর কাফালাহ-এর ফায়সালা করা যেতে পারে না।

আর যখন আদেশক্রমে সাব্যস্ত কাফালাহ সম্পর্কে ফায়সালা করা হলো তখন তার আদেশ প্রদানও সাব্যস্ত হয়ে গেলো। আর 'আদেশ' ঋণের স্বীকারোক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং তার বিপক্ষে ফায়সালা সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে তার আদেশ বিহীন কাফালাহ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কেননা এই কাফালাহ-এর বৈধতা কাফীলের ধারণা মোতাবেক ঋণের বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং ঋণের বিষয়টি মূল ব্যক্তির অভিমুখি হবে না।

মূল ব্যক্তির আদেশে সম্পন্ন কাফালাহ-এর ক্ষেত্রে কাফীল যা পরিশোধ করবে তা আদেশ দাতার কাছ থেকে ফেরত নেবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, (কাফীল মূল ব্যক্তির কাছে তা) ফেরত চাইতে পারে না। কেননা কাফীল যখন অস্বীকার করেছে তখন তার ধারণা মতে (দাবীকারীর পক্ষ হতে) সে যুলুমের শিকার হয়েছে। সুতরাং সে অন্যের উপর যুলুম করতে পারে না।

আমরা বলি যে, তার অস্বীকৃতি শরীয়ত কর্তৃক মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, সুতরাং তার মযলুম হওয়ার ধারণা বাতিল হয়ে গেছে।

মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি একটি বাড়ী বিক্রি করে, আর কোন ব্যক্তি এতে অন্যের হক নেই বলে বিক্রেতার পক্ষ থেকে দায় গ্রহণ করে, তাহলে এটা বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। কেননা কাফালাহ যদি বিক্রয়ের শর্তভুক্ত বিষয় হয় তাহলে তো কাফালাহ গ্রহণ দ্বারা বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে। এরপর দাবী উত্থাপনের অর্থ হলো নিজের দিক থেকে যা সম্পন্নতা লাভ করেছে, সেটা ভাঙ্গার চেষ্টা করা।

আর যদি কাফালাহ বিক্রয় চুক্তির শর্তভুক্ত বিষয় না হয় তাহলে কাফালাহ-এর উদ্দেশ্যে হবে বিক্রয়কে সুদৃঢ় করা এবং ক্রেতাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহী করা। কেননা হয়ত সে কাফালাহ ছাড়া তাতে আগ্রহী হতো না। সুতরাং এটা বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তির পর্যায়ভুক্ত করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আর যদি সাক্ষী হয় এবং সাক্ষী হিসেবে মোহর করে কিন্তু কাফালাহ গ্রহণ না করে তাহলে এটা তার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি হবে না। বরং তার দাবী বহাল থাকবে।

কেননা সাক্ষ্য বিক্রয় চুক্তির শর্তভুক্ত হতে পারে না। তদ্রূপ সেটা মালিকানার স্বীকারোক্তিও নয়। কেননা বিক্রয় কখনো মালিকের পক্ষ থেকে হয় আবার কখনো মালিক ছাড়া অন্যের পক্ষ থেকেও হয়।

সুতরাং সম্ভবত ঘটনাটিকে সংরক্ষিত করার জন্য সে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেছে। যে বিষয়টি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে সেটা ভিন্ন।

মাশায়েখগণ বলেছেন, চুক্তিপত্রে যদি এরূপ লেখা হয় যে, সে মালিকানা সূত্রে বিক্রি করেছে কিংবা পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বিক্রয় সম্পন্ন করেছে। আর সে এ মর্মে সাক্ষী হয়েছে বলে লিখে থাকে তাহলে এটা মালিকানার স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। তবে যদি সে 'চুক্তিকারীদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক' বক্তব্যসহ সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে থাকে। (তাহলে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে না)।

জামানত প্রসঙ্গ

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি (ওয়াকীল রূপে) কারো বস্ত্র বিক্রি করে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য মূল্যের দায়গ্রহণ করে কিংবা মোদারিব যদি রাব্বুল মাল-এর বিক্রয়কৃত পণ্যের মূল্যের দায়গ্রহণ করে তাহলে এই দায়গ্রহণ বাতিল হবে।

কেননা কাফালাহ-এর অর্থ তাগাদা ও দায়গ্রহণ অথচ বিক্রয় সূত্রে তাগাদা তাদের কাছেই হবে। সুতরাং উভয়ের প্রত্যেকে নিজেই নিজের দায়গ্রহণকারী হবে।

তাছাড়া (বিক্রেতা ও মোদারিব) উভয়ের কাছে মাল আমানতরূপে রয়েছে, সুতরাং দায়-গ্রহণের অর্থ শরীয়তের হুকুম পরিবর্তন করা। তাই তাদের দায়গ্রহণ প্রত্যাখ্যাত হবে যেমন আমানত গ্রহণকারী কিংবা ধারে গ্রহণকারীর বিপক্ষে দায়গ্রহণের শর্ত আরোপ করা।

তদ্রূপ (দায়গ্রহণ বৈধ হবে না) যদি দু'জন লোক অভিন্ন চুক্তিতে একটি গোলাম বিক্রি করে আর একজন অপর জনের অনুকূলে তার অংশের মূল্যের দায় গ্রহণ করে।

কেননা যদি শরীকানার অবস্থায় দায় গ্রহণ বৈধ হয় তাহলে সে নিজেই নিজের দায়গ্রহণকারী হবে। মূল্যের প্রতিটি অংশ উভয়ের মাঝে শরীকানা সম্পন্ন। আর যদি বিশেষভাবে অপরজনের হিসসার ব্যাপারে দায়গ্রহণ বৈধ হয় তাহলে তা কবজার পূর্বে দায়নকে ভাগ করা অনিবার্য করবে। আর তা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে গোলামকে যদি ভিন্ন দুই চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় করে। কেননা এখানে শরীকানার প্রশ্ন নেই। দেখুন না, ক্রেতা দু'জনের একজনের অংশের বিক্রয়কে গ্রহণ করতে পারে।

আবার সমগ্র গোলামের বিক্রয়কে গ্রহণ করা সত্ত্বেও শুধু একজনের অংশের মূল্য পরিশোধ করে সেটাকে কবজা করতে পারে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি অন্যের পক্ষ থেকে তার উপর ধার্য খেরাজ, কিংবা আপদকালীন ধার্য কর কিংবা তা বন্টনের দায়গ্রহণ করে তাহলে তা বৈধ।

খেরাজের প্রসংগটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আর তা যাকাত থেকে ভিন্ন। কেননা যাকাত মানে হলো নিছক একটি কর্ম সম্পাদন। একারণেই তো তার অছিয়ত করা ছাড়া তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তা আদায় করা যায় না।

আর আপদকালীন কর দ্বারা ন্যায্য কর উদ্দেশ্য হয় যেমন গণমালিকানার নদী খনন এবং মহল্লাহর চৌকিদারের বেতন এবং বাহিনীর সহিত করার কর এবং বন্দী মুক্তির পণ ইত্যাদি, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে -এর কাফালাহ গ্রহণ বৈধ হবে।

আর যদি তা দ্বারা অন্যায় 'কর' উদ্দেশ্য হয়, যেমন বর্তমান যুগের বিভিন্ন নির্বতনমূলক কর, তাতে মাশায়েখগণের মতপার্থক্য রয়েছে। (কাফালাহ-এর) বৈধতার স্বপক্ষে যাঁরা মতপ্রকাশ করেন তাদের অন্যতম হলেন ইমাম আলী আল বাযদাবী (র)

আর 'কিসমাহ' বা আরোপিত কর সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, এটা এবং দুর্যোগকালীন কর অভিন্ন বিষয়। (তখন أو অব্যয় যোগে عطف হবে।)

কিংবা আরোপিত করের অংশবিশেষ উদ্দেশ্যে হবে। তখন বর্ণনাটা أو অব্যয় যোগে হবে।

আর কারো কারো মতে قسمة অর্থ নিয়মিত ও নির্ধারিত আপৎকালীন কর (সারচার্জ) আর نوائب দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অনিয়মিত ও অনির্ধারিত আপৎকালীন কর। এর বিধান তাই যা আমরা বর্ণনা করেছি।

কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি আমার কাছে এক মাসের মেয়াদে একশ দিরহাম পাবে। পক্ষান্তরে যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে সে নগদ পাওনা বলে দাবী করে তাহলে দাবীদারের দাবীই গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে যে, আমি অমুকের পক্ষ থেকে তোমার অনুকূলে এক মাসের মেয়াদে একশ দিরহামের যামিন হয়েছি। আর যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে সে নগদ বলে দাবী করে তাহলে যামিনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

(দুটি ক্ষেত্রে) পার্থক্যের কারণ এই যে, স্বীকারোক্তিকারী প্রথমে একটা ঋণ স্বীকার করেছে অতঃপর নিজের অনুকূলে একটা সুবিধার পাওনা দাবী করেছে, আর তা হলো একটা মেয়াদ পর্যন্ত তাগাদা বিলম্বিত করা।

পক্ষান্তরে কাফালাহ-এর ক্ষেত্রে কাফীল কোন ঋণ স্বীকার করে কেননা বিশুদ্ধ মতে তার উপর তো কোন ঋণ নেই। সে শুধু এক মাস পর নিছক তাগাদার অধিকার স্বীকার করেছে।

তাছাড়া (আরেকটি পার্থক্য এই যে,) ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ হলো আরোপিত বিষয়। তাই শর্তারোপ ছাড়া তা সাব্যস্ত হয়না। সুতরাং যে শর্ত অস্বীকার করবে তার বক্তব্যই (কসমসহ) গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন খিয়ার শর্তের ক্ষেত্রে।

পক্ষান্তরে কাফালাহ-এর ক্ষেত্রে মেয়াদ কাফালাহ- এরই প্রকার বিশেষ। তাই শর্তারোপ ছাড়া সেটা সাব্যস্ত হয়ে থাকে, যেমন মূল ব্যক্তির উপর যদি মেয়াদী ঋণ সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (র) দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বর্ণিত মতে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির সাথে যুক্ত করেছেন।

আর আমরা উভয়ের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি দাসী ক্রয় করে আর কোন লোক তার অনুকূলে কোন হকদার বের না হওয়ার কাফালাহ্ গ্রহণ করে এরপর দাসীর হকদার আত্মপ্রকাশ করে তাহলে ক্রেতার-অনুকূলে বিক্রেতার প্রতিকূলে মূল্য ফেরত প্রদানের ফায়সালা জারি হওয়ার আগ পর্যন্ত ক্রেতা কাফীলের কাছ থেকে মূল্য গ্রহণ করতে পারবে না।

কেননা জাহির রিওয়ায়েত অনুযায়ী শুধু হকদার সাব্যস্ত হওয়া দ্বারা বিক্রয় রহিত হয় না, যতক্ষণ ক্রেতার অনুকূলে বিক্রেতার উপর মূল্য পরিশোধের ফয়সালা না হয়। সুতরাং মূল ব্যক্তির উপর মূল্য ফেরত প্রদান করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং কাফীলের উপরও ওয়াজিব হবে না।

পক্ষান্তরে (বিক্রীত দাস বা দাসীর) স্বাধীনতার পক্ষে রায় প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিক্রয় ক্ষেত্র না থাকার কারণে শুধু রায় প্রদানের মাধ্যমেই বিক্রয় রহিত হয়ে যায়, তখন ক্রেতা বিক্রেতার কাছে এবং কাফীলের কাছে মূল্য ফেরত দাবী করতে পারে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হকদার সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারা বিক্রয় রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁর মতামতের উপর কিয়াস অনুযায়ী হকদারি সাব্যস্ত হওয়া মাত্র ক্রেতা কাফীলের কাছে মূল্য ফেরত দাবী করতে পারে।

মূল বিন্যাস অনুযায়ী এ মাসআলাটি (ইমাম মুহাম্মদ কর্তৃক সংকলনকৃত) زيادات গ্রন্থের প্রথম দিকে রয়েছে।

কেউ যদি কোন গোলাম খরিদ করে আর কোন ব্যক্তি তার অনুকূলে عهده-এর জামীন হয় তাহলে এই জামানাত বাতিল।

কেননা শব্দটি সন্দেহজনক। কখনো পুরানো দলীল দস্তাবেজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেগুলো তো বিক্রেতার মালিকানাধীন। সুতরাং সেগুলোর দায়গ্রহণ করা বৈধ নয়।

তদ্রূপ শব্দটি চুক্তি অর্থে এবং চুক্তির দায়দায়িত্ব অর্থে এবং ছারাফ (বা মূল্যের ফেরপ্রাপ্তির দায় গ্রহণ) অর্থে এবং ইচ্ছাধিকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর প্রতিটি অর্থেরই যৌক্তিক দিক রয়েছে। সুতরাং (অজ্ঞতার কারণে) শব্দটির উপর আমল করা অসম্ভব হবে। পক্ষান্তরে درك শব্দটির বিষয় ভিন্ন। কেননা শব্দটি প্রচলিত অর্থে হকদার প্রকাশ পাওয়ার কাফালাহ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।

আর যদি خلاص এর কাফালাহ গ্রহণ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তা বৈধ হবে না।

কেননা এর অর্থ হলো যে কোন উপায়ে বিক্রয় দ্রব্যকে মুক্ত করে (ক্রেতার হাতে) অর্পণ করা অথচ সে তা করতে অক্ষম। সাহেবায়নের মতে এটা درك এর পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ (সক্ষম হলে) বিক্রয় দ্রব্যকে অর্পণ করা কিংবা (অক্ষম হলে) তার মূল্য অর্পণ করা। সুতরাং তা বৈধ হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ দুই ব্যক্তির কাফালাহ

যদি কোন ঋণ দুই ব্যক্তির উপর সাব্যস্ত হয় আর তাদের প্রত্যেকে একে অপরের কাফীল হয়, যেমন দু'জনে এক হাজার দিরহামে একটি গোলাম খরিদ করলো এবং উভয়ের প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষে কাফীল হলো তাহলে দু'জনের একজন যা পরিশোধ করবে তা সে অপরজনের কাছে ফেরত চাইতে পারবেনা, যতক্ষণ পরিশোধ পরিমাণ অর্ধেকের বেশী না হয়। তখন অতিরিক্ত অর্থ ফেরত নেবে।

কেননা অর্ধেকের ক্ষেত্রে উভয়ের প্রত্যেকে মূল ব্যক্তি এবং অপর অর্ধেকের ক্ষেত্রে কাফীল। আর মূল ব্যক্তি হিসাবে তার উপর যে অর্ধেক সাব্যস্ত এবং কাফীল হিসাবে যে অর্ধেক সাব্যস্ত-এ দুয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কেননা প্রথমটি হলো ঋণ এবং দ্বিতীয়টি হলো পাওনা। অতঃপর দ্বিতীয় অর্ধেক হলো প্রথম অর্ধেকের অনুবর্তী। সুতরাং পরিশোধকৃত অংশ প্রথম অর্ধেকের খাতে জমা হবে। আর অতিরিক্ত পরিশোধকৃত অংশে তো কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। সুতরাং সেটা কাফালাহ-এর খাতেই জমা হবে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরিশোধকৃত অর্ধেক যদি অপর জনের পক্ষ থেকে গণ্য হয় এবং এই সুবাদে অপর জনের কাছ থেকে তা ফেরত নেয় তাহলে সেই অপরজনের আবার অধিকার থাকবে প্রথমজনের কাছে ফেরত চাওয়ার। কেননা তার নায়েব বা প্রতিনিধির আদায় করা তার নিজের আদায় করার মত। সুতরাং তা চক্রবৎ-এ গড়াবে।

আর যদি দু'জন লোক একজন লোকের পক্ষ থেকে কোন পরিমাণ অর্থের কাফীল হয় এই শর্তে যে, উভয়ের প্রত্যেকে অপরজনের কাফীল, তাহলে দু'জনের কোন একজন যা কিছু আদায় করবে, তা অল্প হোক কিংবা বেশী, তার অর্ধেক অপরজনের কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে।

বিশুদ্ধ মতে মাসআলাটির অর্থ এই যে, মূল ব্যক্তির পক্ষ হতে সমগ্র অর্থের কাফালাহ হবে এবং সহকাফীলের পক্ষ থেকেও সমগ্র অর্থের কাফালাহ হবে এবং 'তাগাদা' একাধিক হবে আর দুটি কাফালাহ একত্র হবে। যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর কাফালাহ এর অনিবার্য ফল হলো তাগাদার দায় গ্রহণ। সুতরাং মূল ব্যক্তি থেকে কাফালাহ যেমন সহী হয় এবং হাওয়ালা গ্রহণকারী (محتال عليه) এর পক্ষ থেকে যেমন হাওয়ালা সহী হয় তেমনি কাফীলের পক্ষ থেকেও কাফালাহ সহী হবে।

এটা যখন জানা গেলো তখন আমাদের বক্তব্য এই যে, দু'জনের একজন যা কিছু পরিশোধ করবে তা উভয়ের পক্ষ হতে পরিব্যাপ্ত রূপে সম্পন্ন হবে। কেননা এখানে পরিশোধকৃত সমগ্রটাই কাফালাহর -এর ভিত্তিতে হয়েছে। সুতরাং একটি অন্যটির উপর অগ্রাধিকার পাবে না।

পক্ষান্তরে পূর্বে বর্ণিত মাসআলাটি ভিন্ন। সুতরাং (পরিব্যাপ্ততার কারণে) সে তার সহকাফীলের কাছ থেকে তার (পক্ষ হতে পরিশোধকৃত) অর্ধেক ফেরত নেবে। আর এটা চক্রবৎ-এ গড়াবেনা। কেননা এই কাফালাহ চুক্তির দাবী হলো উভয় কাফীলের সমতা আর তা দুজনের একজনের পরিশোধকৃত অর্থের অর্ধেক ফেরত গ্রহণ দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং প্রথমজনের কাছে অপরজনের ফেরত চাওয়া দ্বারা এই সমতা ভাঙ্গা যাবে না।

পক্ষান্তরে পূর্বে বর্ণিত মাসআলাটি ভিন্ন। অতঃপর উভয়ে মূল ব্যক্তির কাছে ফেরত চাইবে। কেননা তারা উভয়ে তার পক্ষ হতে আদায় করেছে, একজন স্বয়ং আর অন্যজন তার নায়েবের মাধ্যমে।

আর ইচ্ছা করলে পরিশোধকৃত পুরো অর্থ মাকফূল আনহু এর কাছ থেকে ফেরত নিতে পারে।

কেননা সে তার আদেশে তার পক্ষ হতে সমস্ত মালের দায় গ্রহণ করেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, পাওনাদার যদি দুজনের একজনকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে পুরো অর্থ অপর জনের কাছ থেকে তাগাদা করা হবে।

কেননা কাফীলকে দায়মুক্ত করা মূল ব্যক্তির দায়মুক্তি সাব্যস্ত করে না। সুতরাং পুরো অর্থ মূল ব্যক্তির যিম্মায় বহাল থাকবে। আর অপরজন তার পক্ষ থেকে পুরো অর্থের দায় বহনকারী হবে। যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। একারণেই পাওনাদার তার কাছে পুরো অর্থ দাবী করতে পারবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, শিরকাতুল মুফাবাদাহ চুক্তি সম্পন্নকারী দুই পক্ষ যদি (চুক্তি প্রত্যাহারপূর্বক) পৃথক হয়ে যায় তাহলে পাওনাদারদের ইচ্ছাধিকার রয়েছে, দু'জনের যাকে খুশী তাকে পুরো ঋণের ব্যাপারে তাগাদা করতে পারে।

কেননা (শিরাকাতুল মুফাবাদাহ চুক্তিতে) দু'জনের প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ হতে কাফীল হয়ে থাকে, যেমন শিরাকাহ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

আর ঋণের অর্ধেকের অধিক পরিশোধ না করা পর্যন্ত দু'জনের কেউ অপরজনের কাছ থেকে ফেরত নিতে পারে না।

দুই ব্যক্তির যুগপৎ কাফীল হওয়া প্রসঙ্গে -এর দুটি কারণ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, দুই গোলাম যদি অভিন্ন কিতাবাত চুক্তি সম্পন্ন করে, আর দুজনের প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ হতে কাফীল হয় তাহলে দু'জনের একজন যা কিছু পরিশোধ করবে তার অর্ধেক অপরজনের কাছে ফেরত চাইতে পারে।

এর কারণ এই যে, এধরনের চুক্তি সূক্ষ্ম কিয়াস মতে বৈধ। বৈধতার পন্থা এই যে, (যদি একহাজার দিরহাম ধার্য হয়ে থাকে তাহলে) পুরো এক হাজার ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ের প্রত্যেককে মূলব্যক্তি গণ্য করা হবে। সুতরাং উভয়ের স্বাধীনতা পূর্ণ একহাজার পরিশোধের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে এবং উভয়ের প্রত্যেককে অপরজনের ক্ষেত্রে একহাজার দিরহামের কাফীল গণ্য করা হবে। ইনশাআল্লাহ্ কিতাবাত চুক্তিবদ্ধ গোলাম প্রসঙ্গে বিষয়টি আমরা আলোচনা করবো।

এটা যখন সাব্যস্ত হলো তখন দুজনের একজন যা পরিশোধ করবে তার অর্ধেক সে অপরজনের কাছে ফেরত চাইতে পারবে। কেননা (পরিশোধ অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে) উভয়ে সমান (দায়গ্রহণকারী)। এখন যদি পুরোটা ফেরত নেয় তাহলে সমতা সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ বলেন, দু'জনের কেউ যদি কিছু পরিশোধ না করে আর মনিব দুজনের একজনকে আযাদ করে দেয় তাহলে আযাদ করা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা মুক্তকরণের পদক্ষেপটি মনিবের মালিকানার সাথে যুক্ত হয়েছে।

আর মুক্ত গোলাম অর্ধেক বিনিময় থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা সে তো আর্থিক দায় গ্রহণে শুধু এজন্য সম্মত হয়েছিলো যে, তা মুক্তিলাভের উপায় হবে। অথচ এখন তা উপায় রূপে বহাল নেই। সুতরাং তা রহিত হয়ে যাবে। আর অপরজনের উপর অর্ধেক বিনিময় বহাল থাকবে।

কেননা প্রকৃতপক্ষে পুরো অর্থ উভয়ের দাস সত্তার বিপরীতে সাব্যস্ত। শুধু দায় গ্রহণকে বৈতা প্রদানের কৌশল হিসাবে পুরো অর্থকে স্বতন্ত্রভাবে উভয়ের প্রত্যেকের উপর সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু যখন মুক্তি সাব্যস্ত হয়ে গেছে তখন তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং উভয়ের দাসসত্তার বিপরীতে সাব্যস্ত বলেই গণ্য করা হবে। একারণেই তা অর্ধেক হয়ে যাবে।

আর মানিব যাকে আযাদ করেনি তার অংশ দু'জনের প্রত্যেকের কাছে তাগাদা করার অধিকার মনিবের রয়েছে। আযাদকৃত গোলামের নিকট থেকে কাফালাহ-এর ভিত্তিতে এবং অপরজনের কাছ থেকে মূল চুক্তির ভিত্তিতে।

মনিব যদি আযাদকৃত গোলামের কাছ থেকে গ্রহণ করে তাহলে পরিশোধকৃত অংশ সে তার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ফেরত নেবে।

কেননা সে তার আদেশে তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করেছে।

আর যদি মনিব অপরজনের কাছ থেকেই গ্রহণ করে তাহলে সে আযাদকৃত গোলামের কাছ থেকে কিছুই ফেরত নেবে না। কেননা সে নিজের পক্ষ থেকেই আদায় করেছে। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের কাফীল হওয়া এবং গোলামের পক্ষ থেকে কাফীল হওয়া

কেউ যদি কোন গোলামের পক্ষ হতে এমন মালের দায় গ্রহণ করে যা মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তার উপর ওয়াজিব হবে না আর বর্তমান কিংবা অবর্তমান কোন কিছু উল্লেখ না করে তাহলে এই কাফালাহ্ বর্তমানে গণ্য হবে।

কেননা কথিত মাল গোলামের উপর বর্তমানেই ওয়াজিব রয়েছে হেতু বিদ্যমান থাকার কারণে এবং দায় গ্রহণের যোগ্যতা থাকার কারণে।

তবে অসচ্ছদলতা ও অপারগতার কারণে, বর্তমানে তার কাছে তাগাদা করা হবে না, তার অভাবগ্রস্ততার কারণে। কেননা তার হাতে যা কিছু আছে সবই মনিবের মালিকানাধীন। আর মনিব গোলামের সঙ্গে বর্তমানে ঋণের সম্পৃক্ততায় সম্মত নয়। কিন্তু কাফীল তো সচ্ছল নয়। তাই বিষয়টা কোন অনুপস্থিত কিংবা দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির পক্ষ হতে কাফীল হওয়ার মত হলো।

পক্ষান্তরে মেয়াদী ঋণের বিষয়টি ভিন্ন। সেক্ষেত্রে মেয়াদের পরই কাফীলের কাছে তাগাদা করা যাবে।

কেননা সেখানে একটি বিলম্বিতকারীর বিদ্যমানতার কারণে বিলম্বিত হয়।

যাই হোক, কাফীল যদি গোলামের পক্ষ হতে আদায় করে তাহলে সে মুক্তিলাভের পর গোলামের কাছ থেকে ফেরত চাইতে পারবে। কেননা মূল তাগাদাকারী (মাকফূল লাহু) মুক্তি লাভের পরই তার কাছে তাগাদা করতে পারে। সুতরাং তার স্থলবর্তী হিসাবে কাফীলেরও একই অবস্থা হবে।

কেউ যদি কোন গোলামের বিরুদ্ধে অর্থ দাবী করে আর কোন লোক তার অনুকূলে গোলামের দেহসত্তার যামিন হয় আর গোলাম মারা যায় তাহলে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা মূল ব্যক্তি (মৃত্যুর কারণে) দায়মুক্ত হয়ে গেছে। যেমন দেহসত্তার দায়গ্রহণকৃত ব্যক্তি স্বাধীন হলে (মৃত্যুজনিত কারণে) দায়মুক্ত হয়ে যায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি (বর্তমান দখলদারের বিরুদ্ধে) গোলামের মালিকানা দাবী করে আর কোন ব্যক্তি তার দায়গ্রহণ করে কিন্তু ইতিমধ্যে গোলামটি মারা যায় আর দাবীদার এই মর্মে 'বাইয়্যিনাহ' (বা সাক্ষী-প্রমাণ) পেশ করে যে, গোলামটি তারই ছিলো, তাহলে কাফীল গোলামের বাজার মূল্যের দায় বহন করবে।

কেননা (দখলদার) মনিবের দায়িত্ব ছিলো এরূপ ফেরত প্রদান যে, অক্ষমতায় তার মূল্য তার স্থলবর্তী হবে। আর কাফীলও সেইরূপ ফেরত প্রদানের দায়গ্রহণ করেছে। আর মৃত্যুর পর মূল ব্যক্তির উপর বাজার মূল্যই ওয়াজিব থাকে। সুতরাং কাফীলের উপরও তাই ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত মাসাআলাটি ভিন্ন। (কেননা সেখানে মৃত্যুর কারণে স্বয়ং গোলামের উপর থেকে নিজেকে অর্পণ করার দায় রহিত হয়ে গেছে সুতরাং কাফীলের উপর থেকেও রহিত হয়ে যাবে।)।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, গোলাম যদি মনিবের পক্ষ হতে তার আদেশের কাফীল হয়, অতঃপর সে মুক্তি লাভ করে এবং দায়বদ্ধ মাল পরিশোধ করে কিংবা মনিব যদি গোলামের পক্ষ হতে দায় গ্রহণ করে আর মুক্তিলাভের পর মনিব দায়বদ্ধ মাল পরিশোধ করে, তাহলে দুজনের কেউ অপরজনের কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে না।

ইমাম যোফার (র) বলেন, ফেরত নিতে পারবে।

প্রথমোক্ত ছুরতের অর্থ এই যে, গোলামের উপর আগে থেকে তার দেহসত্তাকে বেষ্টনকারী ঋণ নেই, তাতে গোলামের পক্ষে মনিবের অনুমতিক্রমে তার পক্ষ থেকে মালের কাফীল হওয়া বৈধ রয়েছে।

পক্ষান্তরে গোলামের পক্ষ থেকে মনিবের দায়গ্রহণ যে কোন অবস্থাতেই বৈধ।

ইমাম যোফার (র)-এর দলীল এই যে, ফেরত চাওয়ার অধিকার সাব্যস্তকারী হেতু অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর তা হলো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির আদেশে দায়গ্রহণ আর দাস হওয়ার প্রতিবন্ধকতা মুক্তিলাভের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, এই কাফালাহ্ ফেরত চাওয়ার অধিকার সাব্যস্তকারী রূপে সম্পন্ন হয়নি। কেননা মনিব তার দাসের কাছে কোন ঋণের হকদার হয়না, অদ্রূপ গোলামও তার মনিবের কাছে কোন ঋণের হকদার হয়না। সুরতাং পরবর্তীতে উক্ত কাফালাহ (বা দায় গ্রহণ) কখনো ফেরত চাওয়ার অধিকার সাব্যস্তকারী রূপে পরিবর্তিত হবে না। যেমন কেউ কারো অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ থেকে কফিল হলো আর পরে মাকফূল আনহু তা অনুমোদন করলো।

কিতাবাত চুক্তির অর্থের দায় গ্রহণ বৈধ নয়। চাই স্বাধীন ব্যক্তি দায় গ্রহণ করুক কিংবা দাস।

কেননা এটা এমন ঋণ, যা দাসত্বের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং কাফালাহ্‌র বৈধতার ক্ষেত্রে এ ঋণের অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে না।

তাছাড়া এই কারণে যে, কিতাবাত চুক্তিবদ্ধ গোলাম যদি পরিশোধে অপারগ হয় তাহলে তার দায় রহিত হয়ে যায়। আর এই প্রকৃতিসহ উক্ত ঋণ কাফীলের যিম্মায় সাব্যস্ত করা যায় না।[১] পক্ষান্তরে নিঃশর্ত অবস্থায় সাব্যস্ত করা (কাফালার মূল অর্থ) সংযুক্তি-এর মর্মের বিপরীত। কেননা সংযুক্তির শর্ত হলো অভিন্নতা।[২]

পরিশ্রমের মাধ্যমে দায়বদ্ধ মাল[৩] -এর বিষয়টি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কিতাবাত চুক্তির মালের অনুরূপ। কেননা তার মতে সে মুকাতিবের অনুরূপ।

---

১. কেননা গোলাম যদি চুক্তির অর্থ পরিশোধে অপারগ হয় তাহলে সে দাসত্বের অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু কাফীলের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়।

২. কাফালাহ্-এর অর্থ হলো মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর যে দায় সাব্যস্ত হয়েছে, তার সাথে নিজেকে সংযুক্ত করায়। এজন্যই মূল ব্যক্তির উপর মেয়াদী ঋণ সাব্যস্ত হলে কাফীলের উপরও মেয়াদসহ সাব্যস্ত হয়। সুতরাং কিতাবাতে চুক্তিবদ্ধ গোলামের উপর যে গুণগত প্রকৃতিসহ ঋণটি সাব্যস্ত হয়েছে। সেই গুণ ও প্রকৃতি বাদ দিয়ে কাফীলের উপর নিঃশর্ত ঋণ সাব্যস্ত করলে মাকফূল আনহু-এর দায়ের সাথে কাফীলের দায়কে সংযুক্ত করা সাব্যস্ত হয় না বরং স্বতন্ত্র ঋণ সাব্যস্ত করা হয়।

৩. بدل السعاية অর্থ মনিব যদি তার গোলামের অংশ বিশেষকে আযাদ করে তাহলে পুরা গোলাম আযাদ হয়ে যায়। তবে গোলামের কর্তব্য হলো আযাদ হওয়ার পর অবশিষ্ট মূল্য উপার্জনের মাধ্যমে পরিশোধ করা।

كِتَابُ الْحَوَالَةِ

অধ্যায় ঃ হাওয়ালা

كِتَابُ الْحَوَالَةِ

অধ্যায় ঃ হাওয়ালা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ঋণের ক্ষেত্রে হাওয়ালাহ বৈধ১।

নবী (স) বলেছেন, من احيل على ملئ فليتبع—কাউকে যদি সচ্ছল ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় তাহলে সে যেন সচ্ছল ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়।

তাছাড়া এই কারণে যে, সচ্ছল ব্যক্তি এমন ঋণের দায় বহন করেছে যা সে আদায় করতে সক্ষম। সুতরাং কাফালাহ-এর ন্যায় এটাও বৈধ হবে।

হাওলাহকে শুধু ঋণের সাথে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, এ শব্দটি স্থানান্তর ও হস্তান্তরের অর্থ প্রদান করে। আর স্থানান্তর ঋণের ক্ষেত্রে হতে পারে, বস্তুর ক্ষেত্রে নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, পাওনাদার ও (ঋণের দায় বহনকারী) এই তিনজনের সম্মতিক্রমে হাওয়ালাহ বৈধতা লাভ করে।

পাওনাদারের সম্মতি এজন্য প্রয়োজন যে, ঋণ হচ্ছে তার প্রাপ্য হক এবং হাওয়ালার কারণে সে-ই এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হয়। আর বিভিন্ন ব্যক্তির দায়বহন পার্থক্যপূর্ণ হয়। সুতরাং তার সম্মতি অপরিহার্য।

আর দায়বহনকারীর সম্মতি এজন্য প্রয়োজন যে, ঋণের দায় তার উপর আরোপিত হচ্ছে, আর দায়বহন ছাড়া দায়বদ্ধতা হতে পারে না। আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই হাওয়ালাহ বৈধ হবে। (ইমাম মুহাম্মদ র) زيادات গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

কেননা দায় গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে দায় বহনের অর্থ হচ্ছে নিজের ব্যাপার সম্পর্কে ব্যবহার দ্বারা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। বরং তাতে তার ফায়দা রয়েছে। কেননা যদি তার আদেশে না হয়ে থাকে তাহলে দায়বহনকারী পরবর্তীতে তার কাছে ফেরত চাইতে পারবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, হাওয়ালাহ যখন সম্পন্ন হবে তখন কবুল করার সংগে সংগে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার ঋণ থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

ইমাম যোফার (র) কাফালাহ-এর উপর কিয়াস করে বলেন, সে দায়মুক্ত হবে না।

কেননা কাফালাহ ও হাওয়ালাহ দুটোই হচ্ছে ঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণের চুক্তি।

আমাদের দলীল এই যে, হাওয়ালাহ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্থানান্তর করা। এ থেকেই (চারা স্থানান্তরের) জন্য হাওয়ালা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

---

১. শরীয়তের পরিভাষায় حوالة -এর অর্থ ঋণের দায়কে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায় থেকে অন্য ব্যক্তির যিম্মায় স্থানান্তরিত করা।

যখন এক ব্যক্তির দায় থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গেল তখন তা তার দায়ে আর বহাল থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে কাফালাহ্-এর অর্থ হচ্ছে সংযুক্তকরণ।

আর শরীয়তি বিধানসমূহ আভিধানিক অর্থের সাথে সংগতি রেখেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

আর এখানে নিশ্চিতকরণের দিকটি সাব্যস্ত হচ্ছে অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তিকে কিংবা অধিকতর সদাচরণের সাথে আদায়কারীকে গ্রহণের মাধ্যমে।

আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধ করে তবে পাওনাদারকে তা গ্রহণে বাধ্য করার কারণ এই যে, পাওনা অর্থ 'গচ্চা' যাওয়ার অবস্থায় ঋণগ্রস্তের প্রতি তাগাদা প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সে স্বেচ্ছাদানকারী হলো না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পাওনাদার ঋণগ্রস্তের দিকে রুজু করতে পারবে না, যদি না তার প্রাপ্য হক 'গচ্চা' যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার গচ্চা যাওয়ার ক্ষেত্রেও সে ঋণগ্রস্তের দিকে রুজু করতে পারবে না। কেননা দায়মুক্তি নিঃশর্তরূপে সাব্যস্ত হয়েছে, সুতরাং নতুন 'কারণ' ছাড়া তা ফিরে আসতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, হাওয়ালার বৈধতা পাওনাদারের প্রাপ্য হকের নিরাপদতার শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত। কেননা প্রাপ্য হকের নিরাপদতাই হলো হাওয়ালা চুক্তির উদ্দেশ্য।

কিংবা এই জন্য যে, হাওয়ালা চুক্তি যেহেতু রদযোগ্য সেহেতু উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হওয়ার কারণে হাওয়ালা চুক্তি রদ হয়ে যাবে।

সুতরাং বিক্রয় দ্রব্যের নিরাপদতার গুণের মত হল।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে (হাওয়ালাদারের হক) 'গচ্চা' যাওয়া দুই অবস্থার কোন একটি দ্বারা সাব্যস্ত হবে। এ দায়বহনকারী কসম করে হাওয়ালা অস্বীকার করে আর ঋণগ্রস্ত বা পাওনাদারের কারো কাছে তার বিপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কিংবা দায়বহনকারী ব্যক্তি নিঃস্ব অবস্থায় মারা যায়।

কেননা এই দুই অবস্থার কোন একটি দ্বারা প্রাপ্য হক উসুল করার ব্যাপারে অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর এ হলো প্রকৃতপক্ষে হক নষ্ট হওয়া।

ছাহেবায়ন বলেন, এ দুই অবস্থার সাথে তৃতীয় একটি অবস্থা রয়েছে। তা এই যে, দায়বহনকারীর জীবদ্দশায় আদালতের বিচারক তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করলো।

এই মতপার্থক্যের ভিত্তি এই যে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে কাজীর ঘোষণা দ্বারা দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হয় না। কেননা সম্পদ সকালে আসে সন্ধ্যায় যায়। ছাহেবায়ন এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দায়বহনকারী ব্যক্তি যদি মুহীলের কাছে হাওয়ালাহ্-এর সম পরিমাণ মাল দাবী করে, আর মুহীল বলে যে, আমি তোমার

কাছে আমার প্রাপ্য এক ঋণের বিনিময়ে হাওয়ালাহ করেছি, তাহলে প্রমাণ ছাড়া তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে না। বরং ঋণের সমপরিমাণ অর্থ তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

কেননা (তার স্বীকারোক্তির কারণে) তার কাছে রুজু করার হেতু সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা হলো তার আদেশে তার ঋণ পরিশোধ করা।

তবে মুহীলা দায়বহনকারীর বিপক্ষে একটি ঋণের দাবী করেছে আর সে তা অস্বীকার করছে। এমতাবস্থায় (প্রমাণের অনুপস্থিতিতে) অস্বীকারকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য।

আর দায়বহনের অর্থ দায়বহনকারীর পক্ষ থেকে তার উপর সাব্যস্ত ঋণের স্বীকারোক্তি নয়। কেননা ঋণ ছাড়াও হাওয়ালা বা দায়বহন হতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুহীল যদি হাওয়ালাদারের কাছে হাওয়ালাকৃত মাল দাবী করে আর বলে যে, আমি তো আমার হয়ে গ্রহণ করার জন্য তোমার হাওয়ালা করেছিলাম; আর হাওলাদার বলে যে, না, বরং তুমি তো ঐ করয গ্রহণ করার জন্য আমাকে হাওয়ালা করেছ, যা তোমার কাছে আমার পাওনা ছিলো, এ ক্ষেত্রে মুহীলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য।

কেননা হাওয়ালাদার মুহীলের বিপক্ষে ঋণের দাবী করছে আর সে তা অস্বীকার করছে। আর হাওয়ালাহ শব্দটি ওয়াকালাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং কসমসহ তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন লোকের কাছে এক হাজার দিরহাম আমানত রাখে এবং অন্য একজন (পাওনাদার)-কে ঐ গচ্ছিত এক হাজার গ্রহণের জন্য তার প্রতি হাওয়ালা করে তাহলে এই হাওয়ালা বৈধ হবে। কেননা আমানত গ্রহণকারী হাওয়ালাকৃত মাল পরিশোধ করতে অধিক সক্ষম। এমতাবস্থায় যদি আমানতের মাল হালাক হয়ে যায় তাহলে আমানতগ্রহণকারী দায় মুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা হাওয়ালাহ গচ্ছিত মালের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। কারণ আমানত গ্রহণকারী আমানতের মাল থেকেই শুধু পরিশোধের দায় গ্রহণ করেছিলো।

পক্ষান্তরে হাওয়ালা যদি গসবকৃত মালের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা স্থলবর্তী রেখে নষ্ট হওয়া, নষ্ট না হওয়ার সমতুল্য।

হাওয়ালাহ কখনো কখনো ঋণের সাথেও সম্পৃক্ত হয়। এই সকল সম্পৃক্ত ও শর্তযুক্ত হাওয়ালার বিধান এই যে, মুহীল হাওয়ালার দায় গ্রহণকারীকে ঐগুলোর ব্যাপারে তাগাদা করতে পারবে না। কেননা সেগুলোর সাথে হাওয়ালাদারের হক ও

প্রাপ্যতার সম্পর্ক হয়ে গেছে। যেমন বন্ধকী দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদিও মুহীলের মৃত্যুর পর হাওয়ালাদার অন্যান্য পাওনাদারদের সাথে অংশীদার গণ্য হবে।

তাগাদা করতে না পারার কারণ এই যে, যদি তার তাগাদা করার অধিকার বহাল থাকতো আর দায় গ্রহণকারীর কাছ থেকে তা নিয়ে নিতো তাহলে হাওয়ালা বাতিল হয়ে যেতো। অথচ সেটা হলো হাওয়ালাদারের হক।

নিঃশর্ত ও অসম্পৃক্ত হাওয়ালার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা হাওয়ালাদারের হকের সম্পর্ক ঐ মালের সাথে হয় না; বরং হাওয়ালার দায় বহনকারীর যিম্মার সাথে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং দায়বহনকারীর কাছে যা পাওনা আছে বা গচ্ছিত আছে, তা নিয়ে নেওয়ার কারণে হাওয়ালাহ বাতিল হবে না।

সাফাতেহ বা হুন্ডি মাকরূহ। সাফাতেহ অর্থ এমন ঋণ, যা দ্বারা ঋণদাতা পথের ঝুঁকি রহিত হওয়ার সুবিধা অর্জন করে।

এটাও এক ধরনের সুবিধা, যা ঋণের সাথে লাভ করা হয়েছে, অথচ নবী (স) এমন ঋণ সম্পর্কে নিষেধ করেছেন, যাতে অতিরিক্ত লাভ বয়ে আনে।

كِتَابُ اَدَبِ الْقَاضِىْ
অধ্যায় ঃ বিচারকের শিষ্টাচার

كِتَابُ اَدَبِ الْقَاضِىْ

অধ্যায় ঃ বিচারকের শিষ্টাচার

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাজী বা বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না নিযুক্ত ব্যক্তির মাঝে সাক্ষ্য প্রদানের শর্তসমূহ এবং তার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতাও থাকে।

প্রথমটির কারণ এই যে, বিচারের বিধান সাক্ষ্যের বিধান থেকে উৎসারিত। কেননা সাক্ষ্য প্রদান ও রায় প্রদান-দুটোর প্রতিটি কর্তৃত্বের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং যে সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত হবে সে রায় প্রদানেরও উপযুক্ত হবে এবং সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতার জন্য যে সব শর্ত রয়েছে রায় প্রদানের যোগ্যতার জন্যও সেসব শর্ত রয়েছে।

ফাসিক ব্যক্তি বিচারের দায়িত্ব পালনের যোগ্য; এমনকি যদি ফাসিককে বিচারকের পদে নিযুক্ত করা হয় তাহলে নিয়োগ দান বৈধ হবে। তবে তাকে নিয়োগদান সমীচীন নয়; যেমন সাক্ষ্যের বিধান। কাজেই কাজীর উচিত নয় তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা। কিন্তু যদি তিনি গ্রহণ করে নেন তবে তা জায়িয হবে।

কাজী যদি প্রথমে ন্যায়পরায়ণ থেকে পরবর্তীতে উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন পাপাচার দ্বারা ফাসিক হয়ে যায় তাহলে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে না। অবশ্য পদচ্যুতির যোগ্য হয়ে যাবে। এ হলো যাহিরে মাযহাব। আমাদের হানাফী মাশায়েখগণ এ মত পোষণ করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ফাসিকের বিচারকের দায়িত্ব পালন বৈধ নয়, যেমন ফাসিকের সাক্ষ্য প্রদান তাঁর মতে গ্রহণযোগ্য নয়।

نوادر গ্রন্থের বর্ণনায় আমাদের তিন ইমাম থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ফাসিকের জন্য বিচারকের দায়িত্ব পালন বৈধ নয়।

কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন, যদি প্রথম অবস্থায়ই ফাসিককে বিচারকের দায়িত্ব পালনের ভার অর্পণ করা হয় তবে তা বৈধ; আর ন্যায়পরায়ণ অবস্থায় যদি নিয়োগ প্রদান করা হয়, তবে সে ফাসিক হয়ে গেলে পদচুতি ঘটবে।

কেননা নিয়োগ দানকারী তার ন্যায়পরায়ণতার উপর আস্থাবান ছিল। সুতরাং ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া তাকে নিয়োগ দানে সম্মত ছিলো না।

ফাসিক ব্যক্তি কি মুফতি হওয়ার যোগ্যতা রাখে? কোন কোন মতে, না। কেননা এটা দ্বীনী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বীনী বিষয়ে ফাসিকের খবর গ্রহণযোগ্য নয়।

আর কোন কোন মতে সে মুফতি হওয়ার উপযুক্ত। কেননা ফাসিক ভুলের অভিযোগের ভয়ে সঠিক হুকুম দেওয়ার চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয় শর্তটির ব্যাপারে বক্তব্য এই যে, বিশুদ্ধ মতে ইজতিহাদের যোগ্যতা অগ্রাধিকার লাভের জন্য শর্ত।

পক্ষান্তরে একজন মূর্খ লোককেও বিচারক নিযুক্ত করা আমাদের মতে বৈধ। ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বিচার পরিচালনার বিষয়টি সামর্থ্য দাবী করে। আর ইলম ছাড়া সামর্থ্য থাকে না।

আমাদের দলীল এই যে, অন্যের ফতোয়া অনুসরণ করে বিচার করা তার পক্ষে সম্ভব। আর তাতে বিচারের উদ্দেশ্য তথা হকদারের কাছে হক পৌছে দেওয়া তা দ্বারাই হাছিল হয়ে যাবে।

তবে নিয়োগদানকারীর কর্তব্য হলো বিচার পরিচালনায় যোগ্যতর ও উত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচন করা। কেননা নবী (স) বলেছেন,

من قلد أنسانا عملا و في رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين (رواه الطبراني)

কেউ যদি কোন মানুষকে কোন দায়িত্বে নিযুক্ত করে এমন অবস্থায় যে, তার প্রজাবর্গের মাঝে তার চেয়ে উত্তম লোক বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের জামাতের সাথে খিয়ানত করল।

ইজতিহাদের পর্যায় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে, যা উসূলে ফিকাহ শাস্ত্রে অভিব্যক্ত হয়েছে। তার খোলাসা এই যে, তিনি হাদীস বিশেষজ্ঞ হবেন; তার ফিকাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান রয়েছে, যাতে হাদীসের অর্থ বুঝতে পারেন।

কিংবা তিনি ফিকাহ বিশেষজ্ঞ হবেন, যার হাদীস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান রয়েছে, যাতে নাছযুক্ত বিধানের ক্ষেত্রে কিয়াস নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে পড়েন।

আর কেউ কেউ বলেছেন, সেই সাথে তিনি স্বচ্ছ ও সচেতন বোধসম্পন্ন হবেন, যাতে লোকাচার ও লোক-অভ্যাস সম্পর্কে তার জানাশোনা থাকবে।

কেননা এর উপর কিছু বিধান নির্ভরশীল থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রতি আস্থা রাখে যে, সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবে, তার পক্ষে বিচারকার্যে প্রবেশ করা দোষের নয়।

কেননা সাহাবা কেরাম বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আর অনুসরণের জন্য তাঁরাই যথেষ্ট।

তাছাড়া এই কারণে যে, সৎকাজের আদেশ হিসাবে এটা হলো ফরযে কিফায়া।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে অপারগতার আশংকা করে এবং নিজের ব্যাপারে জুলুম থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে আশ্বস্ত না হয় তার পক্ষে বিচার কার্যে প্রবেশ করা মাকরূহ।

যাতে বিচার কার্যে প্রবেশ অবিচার করার মাধ্যম না হয়ে দাঁড়ায়।

পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ স্বেচ্ছায় বিচারকার্যে প্রবেশ করাকে মাকরূহ বলেছেন। কেননা নবী (স) বলেছেন ঃ

من جعل على القضاء فكانما ذبح بغير سكين (رواه أصحاب السنن الاربعة وحسنه الترمذى)

—যাকে বিচার কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে যেন বিনা ছুরিতে জবাই করা হয়েছে।

তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, ইনসাফ কায়েমের আশায় বিচারকার্যে প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে। আর তার পরিহার করা দায়িত্ব সচেতনতার পরিচায়ক। কেননা হয়ত তার চিন্তা ও বিবেচনায় ভুল হতে পারে। এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তাওফীক না হতে পারে। কিংবা হয়ত অন্য কেউ তাকে সাহায্য করবে না; অথচ তার জন্য সাহায্য অপরিহার্য।

অবশ্য যদি অন্যকারো পরিবর্তে সে-ই শুধু বিচার কার্যের উপযুক্ত হয় তখন আল্লাহ্র বান্দাদের হক রক্ষা করার জন্য এবং জমিনকে ফাসাদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য তার অবশ্য কর্তব্য হবে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কর্তব্য হলো বিচারক হওয়ার কামনা না করা এবং প্রার্থনা না করা।

কেননা নবী (স) বলেছেন ঃ

من طلب القضاء وكل الى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده (رواه الترمذى) ,

—যে ব্যক্তি বিচারের দায়িত্ব তলব করবে তাকে তার নিজের হাওয়ালা করে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যাকে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হবে, তার জন্য একজন ফিরেশতা অবতীর্ণ হবেন, যিনি তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, যে ব্যক্তি বিচারের দায়িত্ব চেয়ে নেয়, সে তো নিজের উপর নির্ভর করে। তাই সে (আল্লাহ্র সহায়তা থেকে) বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে যাকে তাতে বাধ্য করা হয়, সে আপন রবের উপর ভরসা করে, তাই তার প্রতি (নির্ভুল সিদ্ধান্ত) ইলহাম করা হয়।

আর স্বেচ্ছাচারী শাসকের পক্ষ থেকে বিচার দায়িত্ব গ্রহণ বৈধ, যেমন ন্যায় পরায়ণ শাসকের পক্ষ থেকে বৈধ রয়েছে।

কেননা সাহাবা কেরাম হযরত মু'আবিয়া (র)-এর পক্ষ থেকে বিচার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অথচ হযরত আলী (রা) তাঁর চতুর্থ খলীফা হিসেবে হকের উপর ছিলেন।

তদ্রূপ তাবেঈগণ হাজ্জাজের পক্ষ হতে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, অথচ সে ছিলো স্বেচ্ছাচারী।

তবে শাসক যদি তাকে হক বিচার করার সুযোগ না দেয়, তাহলে জায়িয নেই। কেননা দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে হাছিল হবে না। পক্ষান্তরে যদি তাকে ন্যায় বিচার করার সুযোগ প্রদান করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যাকে বিচারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তিনি তার পূর্ববর্তী বিচারকের 'দিওয়ান' সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে পারেন।

'দিওয়ান' অর্থ সেই সরকারী ফাইলসমূহ, যাতে বিচারের যাবতীয় নথিপত্র সংরক্ষিত থাকে। কেননা নথিপত্র তাতে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই হলো যাতে প্রয়োজনের সময় তা প্রমাণ রূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সেগুলো তার হাতেই তুলে দেওয়া হবে, যিনি বিচারের দায়িত্ব প্রশস্ত করেছেন।

যদি কাগজপত্র বায়তুলমাল থেকে প্রদত্ত হয় তাহলে তো বিষয়টি পরিষ্কার। তদ্রূপ বিশুদ্ধ মতে যদি তা বাদী-বিবাদীর পক্ষে প্রদত্ত হয়ে থাকে (তাহলেও একই বিধান) কেননা তারা এগুলো পূর্ববর্তী বিচারকের হাতে রেখেছিল তার কাজের সুবিধার জন্য, আর এখন কাজের দায়িত্ব ন নিযুক্ত বিচারকের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে।

তদ্রূপ বিশুদ্ধ মতে (একই বিধান হবে) যদি সেগুলো কাজীর নিজস্ব অর্থে ক্রয়কৃত হয়ে থাকে। কেননা তিনি সেগুলো দ্বীনি দায়িত্ব হিসাবে সংগ্রহে রেখেছেন, সম্পদ হিসাবে নয়।

নবনিযুক্ত কাজী দু'জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যেন তারা বরখাস্তকৃত কাজীর উপস্থিতিতে এবং তার বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে সেগুলো বুঝে নেয়। তারা দু'জন বরখাস্তকৃত কাজীকে এক এক করে সব কিছু জিজ্ঞাসা করবেন এবং প্রত্যেক প্রকার নথিপত্র আলাদা ফাইলে রাখবেন, যাতে নবনিযুক্ত কাজীর জন্য এলোমেলো না হয়ে যায়। আর এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে অবস্থা ব্যক্ত হওয়ার জন্য, অভিযোগ হিসাবে নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নতুন বিচারক আটক লোকদের অবস্থার খোঁজখবর নেবেন। কেননা তাকে তো (প্রজা সাধারণের অবস্থা) তদারককারী রূপে নিযুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি প্রতিপক্ষের হক স্বীকার করে নেয় তাহলে তাকে অভিযুক্ত গণ্য করবেন।

কেননা স্বীকারোক্তি অভিযোগ গ্রহণ রূপে গণ্য।

আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তার বিপক্ষে বরখাস্তকৃত বিচারকের সিদ্ধান্ত বিনা প্রমাণে গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা পদচ্যুতির মাধ্যমে তিনি সাধারণ প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন। আর কোন এক ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য নয়, বিশেষত: যদি সে সাক্ষ্য তার নিজের কর্ম সম্পর্কিত হয়।

আর যদি তার বিপক্ষে বাইয়েনাহ সাক্ষ্য-প্রমাণসম্পন্ন না হয়, তাহলে নতুন কাজী তাকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে তার নামে ঘোষণা দেবেন এবং তার বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখবেন।

কেননা বাহ্যত: বরখাস্তকৃত বিচারকের সিদ্ধান্তই সঠিক। সুতরাং তাড়াহুড়া করবেন না, যতে অন্যের হক নষ্ট করা পর্যন্ত না গড়ায়।

আর নতুন কাজী গচ্ছিত আমানতের মালামাল এবং ওয়াকফ সম্পত্তির আয় সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন এবং যেমন বাইয়েনাহ উপস্থিত হয় কিংবা যার দায়িত্বে মালামাল রয়েছে সে যেমন স্বীকার করে সে অনুযায়ী তিনি ঐ মালামাল সম্পর্কে কার্য সম্পাদন করবেন।

কেননা এ (বাইয়েনাহ ও স্বীকারোক্তি) সবই প্রমাণরূপে গণ্য।

এক্ষেত্রে বরখাস্তকৃত কাজীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমরা বর্ণনা করেছি।

তবে যার হাতে গচ্ছিত আমানত রয়েছে, সে যদি স্বীকার করে যে, বরখাস্তকৃত কাজী এ সকল আমানত তার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন, তখন সে ব্যাপারে তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে।

কেননা দখলদারের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হলো যে, আমানতের মালের মূল দখল কাজীর ছিলো। সুতরাং উক্ত মালামাল সম্পর্কে বরখাস্তকৃত কাজীর বক্তব্য ঠিক হবে। যেন উক্ত মালামাল বর্তমানেও তার কবজায় রয়েছে।

তবে যদি দখলদার প্রথমে অন্যের অনুকূলে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, অতঃপর কাজী কর্তৃক অর্পণের স্বীকারোক্তি করে, (তখন বরখাস্তকৃত কাজীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না); বরং দখলদারের হস্তস্থিত মালামাল ঐ ব্যক্তিকে অর্পণ করা হবে যার অনুকূলে প্রথমে স্বীকারোক্তি করা হয়েছিলো। কেননা তার হক অগ্রবর্তী হয়েছে।

অতঃপর তার দ্বিতীয় স্বীকারোক্তির কারণে উক্ত দ্রব্যাদির (সদৃশ কিংবা) মূল্য কাজীর অনুকূলে ক্ষতিপূরণ দান করবে এবং কাজীর পক্ষ থেকে যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছিলো তার হাতে তা অর্পণ করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাজী বিচারকের জন্য মসজিদে প্রকাশ্য মজলিসে বসবেন, যাতে বহিরাগতদের কাছে এবং কোন কোন স্থানীয় লোকদের কাছে তার অবস্থান অজ্ঞাত না থাকে।

জামে মসজিদই অধিক উপযুক্ত। কেননা তা অধিক পরিচিত।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বিচারকার্য উপলক্ষ্যে মসজিদে বসা মাকরূহ। কেননা সেই মজলিসে মুশরিক উপস্থিত হতে পারে। আর সে কুরআনের 'নাছ' অনুযায়ী নাপাক।

আর হায়েজগ্রস্ত নারী উপস্থিত হতে পারে। আর মসজিদে প্রবেশ তার জন্য নিষিদ্ধ।

আমাদের প্রমাণ হলো নবী (স) বাণী :

انما بنيت المساجد لذكر الله تعالى و الحكم -

মসজিদ তৈরী করা হয়েছে, আল্লাহর ইবাদতের জন্য এবং বিচারকার্যের জন্য।

তাছাড়া নবী (স) তাঁর ই'তিকাফ স্থলে বিবাদ মীমাংসা করতেন। আর তেমনি খোলাফায়ে রাশেদীন বিবাদ মীমাংসার জন্য মসজিদে বসতেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, বিচার কার্য একটি ইবাদত। সুতরাং সালাতের ন্যায় সেটিও মসজিদে সম্পন্ন করা জায়িয হবে।

আর মুশরিকের না-পাকি হলো তার আকীদায়, যা বাহ্যিক নয়। সুতরাং তাকে মসজিদে প্রবেশ করা থেকে নিষেধ করা হবে না। পক্ষান্তরে হায়জগ্রস্তা স্ত্রীলোকের অবস্থা সম্পর্কে কাজীকে অবহিত করা হবে, তখন কাজী তার কাছে উপস্থিত হবেন, কিংবা মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়াবেন। কিংবা কাউকে পাঠাবেন, যে তার ও তার প্রতিপক্ষের মাঝে ফায়সালা করবে। যেমন কোন পশু সম্পর্কে বিবাদের ক্ষেত্রে করতে হয়।

কাজী যদি তার বাসভবনে মজলিস করেন তাতে দোষ নেই, তবে মানুষকে সেখানে অবাধে প্রবেশের অনুমতি দেবেন।

আর বিচার কার্যে নিযুক্তির পূর্বে যারা তার কাছে বসতো এখনো তারা তার কাছে বসবে। কেননা একাকী বসাতে অপরাধের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর কাজীর নিকট রক্তের আত্মীয় স্বজন ছাড়া এবং বিচার-দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে যাদের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণ করার অভ্যাস ছিলো তাদের ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণ করবেন না।

কেননা প্রথমটি হল ছিলা রেহমী (আত্মীয়তা রক্ষা) আর দ্বিতীয়টি বিচার কার্যের কারণে নয় বরং পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি বিচারের উপলক্ষ্যে অর্থগ্রহণকারী হয়ে যাবেন।'

এমন কি যদি কোন নিকটাত্মীয়ের মামলা থাকে তাহলে তার হাদিয়াও গ্রহণ করবেন না। তদ্রূপ হাদিয়া দাতা যদি অভ্যস্ত পরিমাণ থেকে বেশী দান করে কিংবা তার যদি মামলা থাকে তাহলেও তার কাছ থেকে হাদীয়া গ্রহণ করবেন না। কেননা এটা হলো বিচারপদের জন্য। সুতরাং কাজী তা পরিহার করবেন।

আর সাধারণ দাওয়াত ছাড়া কোন বিশেষ দাওয়াত গ্রহণ করবেন না। কেননা বিশেষ দাওয়াত হলো বিচারক পদের জন্য। সুতরাং তা গ্রহণ করার কারণে অপরাধের সম্মুখীন হতে হবে। সাধারণ দাওয়াতের বিষয়টি ভিন্ন।

দাওয়াত গ্রহণ না করার এই হুকুমে নিকটাত্মীয়ও অন্তর্ভুক্ত হবে। এ হলো শায়খায়নের মত। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, বিশেষ দাওয়াত হলে তার দাওয়াত গ্রহণ করতে পারেন, যেমন হাদিয়ার ক্ষেত্রে।

বিশেষ দাওয়াত অর্থ এমন দাওয়াত যে, মেজবান যদি জানতে পারেন যে, কাজী তাতে উপস্থিত হবেন না, তাহলে তিনি এ দাওয়াতের আয়োজন করতেন না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাজী জানাযায় শরীক হবেন এবং অসুস্থকে দেখতে যাবেন।

কেননা এটা মুসলমানদের হক-এর অন্তর্ভুক্ত। নবী (স) বলেছেন,

للمسلم على المسلم ستة حقوق

মুসলমানের উপর মুসলমানের জন্য ছয়টি হক রয়েছে,

তন্মধ্যে এ দুটিকেও তিনি গণনা করেছেন।

আর কাজী দুই প্রতিপক্ষের একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে দাওয়াত করতে পারবেন না।

কেননা নবী (সা) এ সম্পর্কে নিষেধ করেছেন।

তাছাড়া এতে অপবাদের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর উভয়ে যখন দাওয়াতে উপস্থিত হবে তখন কাজী আসন দান ও অভ্যর্থনা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে উভয়ের মাঝে সমতা রক্ষা করবেন।

কেননা নবী (স) বলেছেন,

اذا ابتلى احدكم بالقضاء فليسو بينهم فى المجلس والا شارة والنظر -

তোমাদের কেউ যদি বিচার দায়িত্বে জড়িত হয় তখন সে যেন বসার ক্ষেত্রে, ইংগিত করার ক্ষেত্রে এবং দৃষ্টিপাত করার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করে।

আর কাজী দু'জনের একজনের সাথে চুপিসারে কথা বলবেন না এবং তার দিকে ইংগিত করবেন না ও তাকে যুক্তি বাতলিয়ে দেবেন না।

কেননা তাতে অপবাদের অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া তাতে অপর জনের মন ভাঙ্গার কারণ রয়েছে। তখন সে তার হক পরিত্যাগ করতে পারে।

কাজী দু'জনের একজনের দিকে লক্ষ্য করে হাসবেন না।

কেননা তাতে সে তার প্রতিপক্ষের প্রতি সাহসী হয়ে পড়বে।

আর বিবাদমান লোকদের সাথে কিংবা তাদের কোন একজনের সাথে কাজী হাসিঠাট্টা করবেন না।

কেননা তাতে বিচারও বিচারকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়ে যায়।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সাক্ষীকে কথা বাতলিয়ে দেয়া মাকরূহ।

এর অর্থ এ ধরনের কথা বলা যে, তুমি কি এই এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছো?

কেননা এটা হলো দুই প্রতিপক্ষের একজনকে সাহায্য করা। সুতরাং স্বয়ং প্রতিপক্ষকে যুক্তি বাতলিয়ে দেওয়ার মত এটাও মাকরূহ হবে।

অপবাদের ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এটাকে ভাল বলেছেন। কেননা মজলিসের ভীতির কারণে সাক্ষী অনেক সময় কথা হারিয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং তাকে কথা যুগিয়ে দেয়ার অর্থ হলো হক রক্ষা করা। যেমন, লোক পাঠিয়ে প্রতিপক্ষকে উপস্থিত করা এবং কোন এক পক্ষের জন্য কাফীল নিয়োগ করার ব্যাপার।

আটক করা প্রসঙ্গ

ইমাম কুদুরী (র) বলেন, কাজীর কাছে যখন 'হক' সত্য বলে প্রমাণিত হয় আর হকদার তার প্রতিপক্ষকে আটক করার দাবী জানায় তখন কাজী তাকে আটক করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। বরং তার যিম্মায় যে মাল রয়েছে, তা তাকে পরিশোধ করার আদেশ করবেন।

কেননা আটককরণ হচ্ছে গাড়িমসি করায় শাস্তি। সুতরাং তার পক্ষ থেকে গড়িমসি প্রকাশ হওয়া আবশ্যক।

তাড়াহুড়া পরিহার করার এ বিধান হলো তখন, যখন তার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে হক প্রমাণিত হয়। কেননা এক্ষেত্রে প্রথমবারেই সে যে গড়িমসিকারী তা, বোঝা যায় না। কারণ হয়ত সে সময় অবকাশের পোষণ করেছে। তাই সে অর্থ সংগে আনেনি।

তবে এর পরে যদি প্রাপ্য পরিশোধে বিরত থাকে তাহলে গড়িমসি প্রকাশ পাওয়ার কারণে তাকে আটক করবেন।

পক্ষান্তরে যদি সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা হক সাব্যস্ত হয় তাহলে সাব্যস্ত হওয়া মাত্র তাকে আটক করবেন। কেননা তার অস্বীকৃতি দ্বারা গড়মসি প্রকাশ পেয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (কাজী পরিশোধের আদেশ প্রদানের পর) যদি সে বিরত থাকে তাহলে এমন সকল ঋণের ক্ষেত্রে তাকে আটক করবেন, যার বিনিময়ে তার দখলে কোন মাল এসেছে, যেমন বিক্রয় দ্রব্যের মূল্য কিংবা যে ঋণ কোন চুক্তির মাধ্যমে সে নিজের জিম্মায় নিয়েছে। যেমন মাহর ও কাফালাহ।

কেননা যখন তার কবজায় মাল আসবে তখন ঐ মাল দ্বারা তার সচ্ছলতা প্রমাণিত হবে। আর স্বেচ্ছায় কোন মালের দায় গ্রহণে অগ্রসর হওয়া তার সচ্ছলতার প্রমাণ। কেননা এটাই তো স্বাভাবিক যে, সে যা পরিশোধ করতে সক্ষম শুধু তারই দায় গ্রহণ করবে।

আর মাহর দ্বারা তলব মাত্র দেয় মাহর উদ্দেশ্য, মেয়াদী মাহর নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, লোকটি যদি বলে যে, আমি দরিদ্র তাহলে, উপরোক্ত অবস্থা এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজী তাকে আটক করবেন না। তবে তার পাওনাদার যদি প্রমাণ করে যে, তার কাছে মাল রয়েছে তাহলে তাকে আটক করবেন।

কেননা সচ্ছলতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যার যিম্মায় ঋণ রয়েছে। পক্ষান্তরে দাবীদারের দায়িত্ব হবে তার সচ্ছলতা প্রমাণ করা।

অবশ্য এমনও বর্ণিত হয়েছে যে, সকল ক্ষেত্রে তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে কি যার যিম্মায় ঋণ রয়েছে, কেননা অচ্ছলতাই হলো মূল অবস্থা।

আবার এমনও বর্ণিত হয়েছে যে, যে ক্ষেত্রে ঋণের বিনিময়ে মাল অর্জিত হয় সে ক্ষেত্র ছাড়া তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য। আর ভরণপোষণের ক্ষেত্রে স্বামীর অসচ্ছলতার

দাবী গ্রহণযোগ্য এবং শরীকানা গোলাম আযাদ করার ক্ষেত্রে আযাদকারীর বক্তব্য গ্রহনযোগ্য।

এ মাসআলা দুটি শেষোক্ত মত দুটিকে সমর্থন করছে।

আর কিতাবে যা বলা হয়েছে সে আলোকে মাসআলা দু'টির ব্যাখ্যা এই যে, এটা পূর্ণাঙ্গ ঋণ নয়। বরং এটা হলো সৌজন্য দান। একারণেই সর্বসম্মতিক্রমে স্বামীর মৃত্যুতে বকেয়া ভরণ পোষণ রহিত হয়ে যায়।

তদ্রূপ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে মুক্তিদানের ক্ষতিপূরণও পূর্ণাঙ্গ ঋণ নয়। যাই হোক যে সকল ক্ষেত্রে দাবীদারের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য যে প্রতিপক্ষের মাল রয়েছে। কিংবা যে ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্তের কতা গ্রহণযোগ্য সে ক্ষেত্রে বাইয়েনা দারা তার সচ্ছলতা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে কাজী তাকে দুই মাস বা তিনমাস আটক রাখবেন। অতঃপর তার (সচ্ছলতা অসচ্ছলতা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

মোটকথা আটক করার কারণ হলো বর্তমানে তার যুলুম প্রকাশ পেয়ে যাওয়া, আর একটা নির্ধারিত সময় আটক রাখার উদ্দেশ্য হলো যদি সে লুকিয়ে রেখে থাকে তাহলে যেন সে তা প্রকাশ করে। সুতরাং সময়টা দীর্ঘায়িত হওয়া জরুরী, যাতে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র) সেটাকে উল্লেখিত সময় দ্বারা সীমায়িত করেছেন। অন্যান্য সময়সীমার কথাও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, একমাস কিংবা চার থেকে ছয় মাস।

তবে বিশুদ্ধ মতে এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রকম হওয়ার কারণে সময়সীমা নির্ধারণের বিষয়টি কাজীর মতামতের উপর অর্পিত হবে।

আর যদি তার কোন মাল প্রকাশ না পায় তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে।

অর্থাৎ সময় সীমা পার হওয়ার পর কোননা সে সচ্ছলতা অর্জন পর্যন্ত অবকাশ লাভের উপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এরপর তাকে আটক করা যুলুম হবে।

আর যদি সময়সীমা পার হওয়ার আগে তার দারিদ্র্যের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হয়ে যা তাহলে এক বর্ণনা মতে তা গ্রহণ করা হবে। আর অন্য বর্ণনা মতে গ্রহণ করা হবে না। গরিষ্ঠ সংখ্যক মাশায়েখগণ দ্বিতীয় মতের সমর্থক।

ইমাম কুদূরী (র) তার কিতাবে বলেছেন, তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তবে তার ও পাওনাদারদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হবে না। এটা হলো পাওনাদারদের তার পিছনে লেগে থাকা সংক্রান্ত আলোচনা। হাজের বা মুয়ামেলার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা পর্বে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

'জামে ছাগীরে' বলা হয়েছে, কোন লোক যদি কাজীর কাছে ঋণের কথা স্বীকার করে তাহলে কাজী তাকে আটক করবেন। অতঃপর তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। যদি সে সচ্ছল সাব্যস্ত হয় তাহলে কাজী তাকে স্থায়ীভাবে আটক করবেন। আর যদি অসচ্ছল হয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেবেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, লোকটি কাজী ছাড়া অন্য কারো কাছে বিংবা কাজীর কাছে আগে একবার স্বীকার করেছিলো, এরপর তার পক্ষ থেকে গড়িমসি প্রকাশ পেয়েছে :

শুরুতেই আটক করা এবং আটকের সময়সীমা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি করবো না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্ত্রীর ভরণপোষণ পরিশোধ না করার কারণে স্বামীকে আটক করা হবে।

কেননা ভরণপোষণ থেকে বিরত থাকার কারণে সে যালিম হয়েছে।

পুত্রের ঋণের কারণে পিতাকে আটক করা যাবে না।

কেননা এটা এক ধরনের শাস্তি। সুতরাং পিতার বিপক্ষে সন্তান তার অধিকারী হবে না। যেমন হদ্দসমূহ ও কিসাসের ক্ষেত্রে।

তবে যদি সন্তানের জন্য খরচ করা থেকে বিরত থাকে (তখন আটক করা হবে না।)

কেননা এতে সন্তানের জীবন রক্ষা হয়। তাছাড়া (দ্বিতীয় কারণ এই যে,) যেহেতু এটা সময় পার হয়ে যাওয়ার কারণে রহিত হয়ে যায় সেহেতু এটার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

আল্লাহই অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ কাজীর পত্র প্রেরণ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, হকসমূহের ক্ষেত্রে এক কাযীর পত্র আরেক কাযীর নামে লেখা গ্রহণযোগ্য; যদি দ্বিতীয় কাযীর কাছে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়। গ্রহণযোগ্যতা প্রয়োজনের জন্য, যা সামনে আমরা বর্ণনা করবো (পত্র প্রেরক কাযীর সামনে) **সাক্ষীগণ যদি প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে সাক্ষ্য অনুযায়ী কাযী রায় প্রদান করবেন** প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে **এবং সেই রায় পত্রে লিপিবদ্ধ করবেন। এটাকে 'সিজিল্ল' (হুকুমনামা) বলে।**

আর যদি প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে কাযী কোন ফায়সালা প্রদান করবেন না।

কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে ফায়সালা বৈধ নয়।

বরং তিনি শুধু সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করবেন।

যাতে পত্র-প্রাপক কাযী ঐ সাক্ষ্য অনুযায়ী ফায়সালা করতে পারেন। এটাকে আল কিতাবুল হুকুমী (বা সাক্ষী-পত্র) বলে। এটা প্রকৃতপক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য স্থানান্তর করা মাত্র। আর এটা এমন সব শর্তের সাথে বিশিষ্ট, যা সামনে আমরা আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

এটা বৈধতা পেয়েছে অনিবার্য প্রয়োজনের কারণে। কেননা বাদীর পক্ষে অনেক সময় তার সাক্ষীদের এবং প্রতিপক্ষকে একত্র করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য প্রদানের সদৃশ হলো।

ইমাম কুদূরীর বক্তব্য **হুকূকের ক্ষেত্রে-এর অন্তর্ভুক্ত হবে ঋণ, বিবাহ, বংশ পরিচয়, গসবকৃত দ্রব্য, অস্বীকারকৃত আমানত দ্রব্য এবং অস্বীকারকৃত মোদারাবাহর মাল। কেননা এগুলো সব ঋণ-এর পর্যায়ভুক্ত বিষয়। আর তা গুণ ও অবস্থা বর্ণনা দ্বারা জানা যায়; ইশারা করে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না।**

ভূ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে কাযীর নামে কাযীর প্রেরিত পত্র গ্রহণযোগ্য। কেননা এক্ষেত্রে পরিচয় দেওয়া হয় চৌহদ্দি বর্ণনা দ্বারা।

অস্থাবর সম্পত্তির বিবাদের ক্ষেত্রে হাতে ইশারা করার প্রয়োজন থাকার কারণে প্রেরিত পত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, দাসের ব্যাপারে প্রেরিত পত্র গ্রহণযোগ্য হবে, দাসীর ক্ষেত্রে নয়। কেননা দাসের ক্ষেত্রে পলায়নের অধিক প্রবণতা রয়েছে, দাসীর ক্ষেত্রে নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, কিছু শর্তের সাথে উভয়ের ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হবে। ঐ সকল শর্ত যথাস্থানে[১] জানা যাবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, অস্থাবর এবং স্থানান্তরযোগ্য সকল বস্তুর ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হবে। পরবর্তী মাশায়েখগণ আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহম করুন ঐ মতই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য ছাড়া কাযীর পত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা (হস্তান্তরের দিক থেকে) একপত্র অন্যপত্রের সদৃশ হয়ে থাকে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ ছাড়া তার যথার্থতা প্রমাণিত হবে না।

এই শর্তারোপ এজন্য যে, পত্রটি হক সাব্যস্তকারী। সুতরাং পূর্ণ প্রমাণ অপরিহার্য।

পক্ষান্তরে দারুল হরবের (শাসকের পক্ষ হতে দারুল ইসলামের শাসকের নামে)। নিরাপত্তা প্রার্থনা করে লিখিত পত্রের বিষয়টি ভিন্ন।

কেননা উক্ত পত্র (ইমাম ও শাসকের উপর) কোন হক সাব্যস্তকারী নয়। বরং শাসক ইচ্ছা করলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

কাযীর পক্ষ থেকে সাক্ষীর যোগ্যতা সত্যায়নকারীর কাছে প্রেরিত এবং সত্যায়নকারীর পক্ষ হতে কাযীর কাছে প্রেরিত দূতের বিষয়টিও ভিন্ন। (সাক্ষী ছাড়াই তার দুতিয়ালী গ্রহণযোগ্য হবে।) কেননা (বিবাদীর উপর) হক সাব্যস্ত হয় সাক্ষীদের দ্বারা, সত্যায়ন দ্বারা নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাযীর উপর ওয়াজিব যে, তিনি তাঁর লিখিত পত্র তাদের সম্মুখে পাঠ করে শোনাবেন, না হয় বিষয়বস্তু তাদের অবহিত করবেন, যাতে তারা পত্রে লিখিত বিষয়বস্তু জানতে পারে।

কেননা অবগতি ছাড়া সক্ষ্য প্রদান সম্ভব নয়।

অতঃপর কাযী তাদের উপস্থিতিতে পত্রকে মোহরাংকিত করবেন এবং তাদের হাতে অর্পণ করবেন।

যাতে পরিবর্তনের সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।

---

১. মাবসূত গ্রন্থের কিতাবুল ইবাক পর্ব।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মত। কেননা পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তাদের উপস্থিতিতে মোহরাঙ্কিত করা শর্ত। তদ্রূপ তাঁদের মতে (বহন করার সময় থেকে অর্পণের সময় পর্যন্ত) পত্রের বিষয়বস্তু স্মৃতিস্থ রাখা শর্ত।

এজন্যই প্রেরক কাজী আমোহরাঙ্কিত অন্য একটি পত্র (অর্থাৎ উক্ত পত্রের অনুলিপি) তাদের হাতে প্রদান করবেন, যাতে মুখস্থ রাখার সহায়ক রূপে তাদের সাথে থাকে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) সর্বশেষ মত রূপে বলেছেন যে, এগুলোর কোনটিই শর্ত নয়।

বরং শর্ত এই যে, কাজী তাদেরকে এই মর্মে সাক্ষী রাখবেন যে, এটা তাঁর লিখিত পত্র এবং তার মোহর।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মোহরাঙ্কিত করাও শর্ত নয়। অর্থাৎ বিচার-দায়িত্বে জড়িত হওয়ার (অভিজ্ঞতার) পর বিষয়টি তিনি সহজ করে দেন; আর 'অবধান' প্রত্যক্ষকরণের সমতুল্য নয়। শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মত গ্রহণ করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, প্রাপক কাযীর কাছে পত্রটি পৌছার পর প্রতিপক্ষের উপস্থিতি ছাড়া তিনি তা গ্রহণ করবেন না।

কেননা এই পত্র সাক্ষ্য প্রদানের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং প্রতিপক্ষের উপস্থিতি অপরিহার্য। পক্ষান্তরে পত্র প্রেরক কাযীর সাক্ষ্য শ্রবণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার শ্রবণ হচ্ছে প্রেরণের জন্য, রায় প্রদানের জন্য নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সাক্ষীগণ যখন প্রাপক কাযীর কাছে পত্র অর্পণ করবে তখন তিনি পত্রের মোহর পরীক্ষা করে দেখবেন। তারা যখন এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, এটা অমুক কাযীর পত্র, তিনি তাঁর বিচার মজলিসে এটা আমাদের হাতে অর্পণ করেছেন। আর আমাদের তা পড়ে শুনিয়েছেন এবং মোহরাঙ্কিত করেছেন, তখন প্রাপক কাযী তা খুলে প্রতিপক্ষকে পড়ে শোনাবেন এবং পত্রের বিষয়বস্তু তার উপর 'অবশ্য কার্যকর' করবেন।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মত।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, এটা তার পত্র এবং তার মোহর; তখন প্রাপক কাজী তা গ্রহণ করবেন, যেমন পেছনে বর্ণিত হয়েছে।

আর কুদুরী কিতাবে পত্রটি খোলার জন্য সাক্ষীদের ন্যায়পরাযণতা সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হওয়ার পর পত্রের মাহর খোলা হবে। ইমাম খাচ্ছাফ (র)ও তেমনি উল্লেখ করেছেন। কেননা হয়ত (সাক্ষীদের ন্যায়পরণতা প্রমাণিত না হওয়ার কারণে) অতিরিক্ত সাক্ষীর

প্রয়োজন দেখা দিতে পারে; আর তারা মোহর অক্ষত থাকার পরই সাক্ষী প্রদানে সক্ষম হবে।

আর প্রাপক কাযী তখনই তা গ্রহণ করবেন যখন প্রেরক কাযী বিচারের দায়িত্বে বহাল থাকবেন। সুতরাং যদি পত্র পৌছার পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন কিংবা বরখাস্ত হন কিংবা বিচারের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত না থাকেন, তাহলে প্রাপক কাযী তা গ্রহণ করবেন না। কেননা তিনি সাধারণ প্রজাবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন। একারণেই তিনি যদি তার কর্ম-এলাকার বাইরে অন্য কাযীকে কিংবা উভয়েরই কর্ম এলাকার বাইরে কোন খবর প্রদান করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

তদ্রূপ একই হুকুম হবে যদি প্রাপক কাযী মৃত্যুবরণ করেন। তবে তিনি যদি এভাবে লিখে থাকেন যে, অমুক শহরের কাযী অমুকের পুত্র অমুক কিংবা মুসলমানদের যে কোন কাযীর হাতে এটা পৌছবে (তাহলে পত্র অকার্যকর হবে না, বরং বিবাদী যে কাযীর কর্তৃত্বাধীনে আছে, যদি তার হাতে পৌছে তিনি তা কার্যকর করবেন)। কেননা সেই অন্য কাযী প্রাপক কাযীর অনুবর্তী ও স্থলবর্তী হয়ে যাবেন, আর সেই সুবাদে তিনি পরিচিত বলে গণ্য হবেন।

পক্ষান্তরে প্রথমেই যদি 'এমন প্রত্যেক কাযীর নামে, যার হাতে এ পত্র পৌছবে' লেখেন তাহলে আমাদের মাশায়েখগণের মতে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা এ অবস্থায় প্রাপক কাযী পরিচিত নয়। আর যদি পত্র প্রাপক কাযীর নিকট পৌছার আগেই বিবাদী মৃত্যুবরণ করে তাহলে পত্রের বিষয়বস্তু তার ওয়ারিছের উপর কার্যকর করা হবে। কেননা সে তার স্থলবর্তী হয়ে যায়।

আর হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে কাযীর নামে কাযীর প্রেরিত পত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা এখানে (সাক্ষীদের) স্থলবর্তিতায় সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং এটা সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্যের মত হলো (যা হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।)

তাছাড়া হদ্দ ও কিসাসের ভিত্তি হলো রহিতকরণের উপর। অথচ পত্র গ্রহণের মাঝে রয়েছে ঐ দু'টিকে কার্যকর করার প্রয়াস।

স্ত্রী লোকের জন্য হদ্দ ও কিসাস ছাড়া সকল ক্ষেত্রে বিচারকের দায়িত্ব পালন বৈধ।

(এ সিদ্ধান্ত হয়েছে) হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের উপর কিয়াস করে. আর পূর্বে এর কারণ আলোচিত হয়েছে।

কাযীর অধিকার নেই (ওজর বশতঃ কিংবা বিনা ওজরে) বিচারকার্যে অন্য কাউকে স্থলবর্তী করা। তবে যদি সে ক্ষমতা তার হাতে অর্পণ করা হয়ে থাকে।

কেননা তাকে বিচার করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, বিচারক নিয়োগের দায়িত্বভার নয়। সুতরাং ওকীল কর্তৃক অন্যকে ওকীল নিয়োগের মত হলো।

পক্ষান্তরে জুম'আর জামাআত কায়েম করার আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্থলবর্তী নিযুক্ত করতে পারে। কেননা জুম'আ নির্ধারিত সময়ের সাথে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তা ফৌত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার মুখে রয়েছে। সুতরাং অবস্থাগত প্রমাণের নিরিখে সে সম্পর্কে আদেশ দানের অর্থ হলো স্থলবর্তী নিযুক্ত করারও অনুমতি প্রদান। বিচারের বিষয়টি এমন নয়।

দ্বিতীয়জন যদি প্রথমজনের উপস্থিতিতে রায় প্রদান করে কিংবা দ্বিতীয়জন (প্রথমজনের অনুপস্থিতিতে) ফায়সালা করে, আর প্রথমজন পরে তা অনুমোদন করে তাহলে তা বৈধ হবে, যেমন ওকীলের ক্ষেত্রে।

এর কারণ এই যে, দ্বিতীয়জনের মতামতের সংগে প্রথমজনের মতামত যুক্ত হয়েছে। আর সেটাই ছিলো শর্ত।

আর যদি তাকে সে ক্ষমতা প্রদান করা হয় তাহলে তিনি স্থলবর্তী নিযুক্ত করার অধিকারী হবেন। ফলে দ্বিতীয়জন মূল বিচারকের নায়েব হবেন। আর প্রথমজন তাকে বরখাস্ত করার অধিকারী হবেন না। তবে যদি বরখাস্ত করার ক্ষমতাও তাকে প্রদান করা হয় তাহলে তা পারেন। এটাই বিশুদ্ধ মত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন শাসকের কোন ফায়সালা যদি কাযীর এজলাসে উত্থাপিত হয় তাহলে তিনি তা কার্যকর করবেন, যদি না তা কোরআন, সুন্নাহ কিংবা ইজমা-এর বিরোধী হয়। কিংবা এমন কোন মতামত হয়, যার পক্ষে কোন শরীয়তি দলীল নেই।

'জামে ছাগীরে' রয়েছে, যে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ফকীহগণ মতভিন্নতা পোষণ করেন, কাযী যদি সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রায় দেন, অতঃপর অন্য এক কাযী এসে তাঁর বিপরীত মত পোষণ করেন তাহলে তিনি পূর্ব রায় বহাল রাখবেন।

এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, কোন ইজতিহাদপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে যখন বিচারকের রায় যুক্ত হয় তখন তা কার্যকর হয়, অন্য বিচারক তা রদ করতে পারেন না ; কেননা (ভুলের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে) দ্বিতীয় জনের ইজতিহাদ প্রথম জনের সমতুল্য। অথচ প্রথম জনের ইজতিহাদ আদালতে ফায়সালাযুক্ত হওয়ার কারণে অগ্রগণ্যতা লাভ করেছে। সুতরাং তার চেয়ে নিম্নতর ইজতিহাদ দ্বারা তা ভঙ্গ করা যাবে না।

আর যদি ইজতিহাদপূর্ণ বিষয়ে কাযী নিজের মাযহাব ভুলে গিয়ে নিজের মতের বিপরীতে ফায়সালা করেন তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তা কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে করলে সে সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে।

কার্যকর হওয়ার কারণ এই যে, নিশ্চিতভাবে তা ভুল নয়।

ছাহেবায়নের মতে উভয় ক্ষেত্রেই তা কার্যকর হবে না। কেননা সে এমন মত অনুযায়ী ফায়সালা করেছে, যা তার দৃষ্টিতে ভুল। এ মতের উপরই ফতোয়া।

আর ইজতিহাদপূর্ণ হওয়ার অর্থ আমরা যা উল্লেখ করেছি সেগুলোর, (অর্থাৎ কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা-এর) বিরোধী না হওয়া।

আর সুন্নাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মশহুর হাদীস আর গরিষ্ঠসংখ্যক লোক যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন সে বিষয়ে দু' একজনের ভিন্নমত পোষণ বিবেচ্য নয়। এটা বিরুদ্ধাচরণ, ভিন্নমত পোষণ নয়।

আর বিবেচ্য হলো প্রথম যুগের (সাহাবা ও তাবেঈনের কল্যাণযুগের) মত পার্থক্য। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যে সকল বিষয়ে কাযী বাহ্যত: হারামের ফায়সালা প্রদান করেছেন, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে প্রকৃতপক্ষেও সেটা তেমন।

তদ্রূপ যদি কোন বিষয় হালাল হওয়ার ফায়সালা করেন।

এ বিধান হলো তখন যখন সুনির্দিষ্ট কোন হেতুর ভিত্তিতে দাবী উত্থাপিত হয়। এটাই হলো চুক্তি এবং চুক্তির প্রত্যাহার ক্ষেত্রে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাযীর ফায়সালা করার মাসআলাহ।

বিবাহ অধ্যায়ে সে আলোচনা বিগত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাযী কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে ফায়সালা করতে পারেন না; যদি না তার স্থলবর্তী কেউ উপস্থিত থাকে (যেমন ওকীল)।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, প্রমাণ অর্থাৎ সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকার কারণে তা জায়িয হবে। কেননা হক প্রকাশ পেয়ে গেছে।

আমাদের দলীল এই যে, সাক্ষ্যকে কাজে লাগানো হয় বিবাদ নিরসনের জন্য। আর অস্বীকৃতি ছাড়া বিবাদ সাব্যস্ত হয় না। অথচ এক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়নি।

তাছাড়া প্রতিপক্ষের দিক থেকে স্বীকারোক্তি ও অস্বীকৃতি দুটোরই সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বিচার ও ফয়সালার প্রকৃতি অস্পষ্ট থেকে যাবে। কেননা দুটোর বিধান ভিন্ন।

আর যদি বিবাদী অস্বীকার করে অতঃপর গায়েব হয়ে যায় তাহলেও একই সিদ্ধান্ত হবে।

কেননা শর্ত হলো বিচার ও ফায়সালার সময় অস্বীকৃতি বিদ্যমান হওয়া।

এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর ভিন্নমত রয়েছে।

আর যে তার স্থলবর্তী হবে সে তার নিযুক্ত নায়েব হতে পারে, যেমন ওকীল। কিংবা শরীয়ত নিযুক্ত নায়েব হতে পারে, যেমন কাযীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত অছী। আবার আইনগত ভাবে তার নায়েব হতে পারে। যেমন অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে দাবী উত্থাপন করা হয়েছে, তা উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপনের হেতু হয়ে যায়।

ফিকাহ্ গ্রন্থগুলোতে-এর একাধিক উদাহরণ রয়েছে। পক্ষান্তরে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে যে দাবী উত্থাপিত হয়েছে, তা যদি উপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে যে দাবী উত্থাপিত হয়েছে তা যদি উপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে দাবী উত্থাপনের শর্ত হয় তাহলে সেটাকে উপস্থিত ব্যক্তিকে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষাবলম্বনকারী বলে বিবেচনা করা হবে না। এর পূর্ণ আলোচনা 'জামে ছাগীর' কিতাবে জানা যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কাযী এতীমদের মাল ঋণরূপে কাউকে দিতে পারেন, তবে তার হক ও পাওনা স্মরণ রাখার জন্য নথিতে লিখে রাখবেন।

কেননা ঋণরূপে প্রদত্ত মাল ক্ষতিপূরণের দায়যুক্ত ও নিরাপদ হওয়ার কারণে ঋণ প্রদানে তাদের স্বার্থ রয়েছে, আর কাযী তা উশুল করতে সক্ষম। আর লিপিবদ্ধ করা হলো বিষয়টি সংরক্ষণের জন্য।

নিযুক্ত অছী যদি এতীমদের মাল করয প্রদান করে তাহলে সে তার যামীন হবে।

কেননা সে তা উশুল করতে সক্ষম নয়।

দুই বর্ণনার মধ্যে বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুযায়ী পিতা অছীর ন্যায়। কেননা সেও উশুল করতে অক্ষম।

পরিচ্ছেদ ঃ সালিস নিয়োগ প্রসঙ্গ

দু'জন লোকে যদি কোন লোককে সালিস বা বিচারক মেনে নেয়, আর তিনি তাদের মাঝে কোন ফায়সালা করেন আর উভয়ে তার ফায়সালা মেনে নেয় তাহলে তা জায়িয হবে।

কেননা নিজেদের উপর তাদের দু'জনের কর্তৃত্ব রয়েছে। সুতরাং তাদের বিচারক নিযুক্ত করা বৈধ হয়েছে। তাই তাদের উপর তার ফায়সালা কার্যকর হবে।

এটা হলো তখন যখন যাকে ফায়সালাকারী নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি ফায়সালা করার যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। কেননা, তাদের দু'জনের মাঝে তিনি কাযী ও বিচারকের সমতুল্য। সুতরাং বিচারক হওয়ার যোগ্যতা শর্ত হবে। কাফির গোলাম, যিম্মী, অপবাদ আরোপের হদ্দপ্রাপ্ত ফাসিক ও বালককে ফায়সালাকারী নিযুক্ত করা জায়িয নয়।

কেননা সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা না থাকার উপর কিয়াস করে বিচারক হওয়ার যোগ্যতাও তাদের নেই।

আর ফাসিককে যখন ফায়সালাকারী নিযুক্ত করা হবে তখন আমাদের নিকট তা বৈধ হওয়ারই কথা। যেমন বিচারকের পদে নিয়োগকৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা না করবেন ততক্ষণ সালিস নিযুক্তকারী দু'জনের প্রত্যেকেরই প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে।

কেননা তাদের দু'জনের দিক থেকে তিনি একজন নিয়োগপ্রাপ্ত। সুতরাং দু'জনের উভয়ের সম্মতি ছাড়া তিনি ফায়সালা করতে পারেন না।

যখন তিনি ফায়সালা করবেন তখন তাদের উপর তা লাযিম হয়ে যাবে।

কেননা তাদের উপর কর্তৃত্ব থাকা অবস্থায় তার ফায়সালা জারি হয়েছে।

যদি তার ফায়সালা কাযীর এজলাসে উত্থাপিত হয় আর তা তার মাযহাবের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়, তাহলে তিনি তা কার্যকর করবেন।

কেননা ঐ ফায়সালা নাকচ করে একইভাবে পুনঃজারি করার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই।

আর যদি তার ফায়সালা তার মাযহাবের বিরোধী হয় তাহলে তিনি তা বাতিল করে দেবেন।

কেননা তার পক্ষ হতে ফায়সালাকারী নিযুক্ত না করার কারণে তার ফায়সালা তার জন্য অবশ্যমান্য হবে না।

হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে কাউকে ফায়সালাকারী নিযুক্ত করা জায়িয নয়।

কেননা নিজেদের রক্ত তথা প্রাণের উপর তাদের কর্তৃত্ব নেই। একারণেই তো তারা নিজেদের হালাল করে দেয়ার অধিকারী হয় না। সুতরাং তাদের সম্মতির কারণে তাদের খুন করা হলাল হবে না।

পরবর্তীকালের মাশায়েখগণ বলেছেন, হদ্দ ও কিসাসকে বিশিষ্ট করা প্রমাণ করে যে, বিবাহ তালাক ও অন্যান্য সকল ইজতিহাদপূর্ণ ক্ষেত্রে সালিস নিযুক্ত করা জায়িয। এটিই বিশুদ্ধ; তবে -এর অনুকূলে ফতোয়া প্রদান করা হবে না। বরং এ বিষয়ে সাধারণ লোকদের স্পর্ধা রোধ করার লক্ষ্যে বলা হবে যে, নিয়োগকৃত কাযীর রায় প্রয়োজন।

যদি ভুলক্রমে রক্তপাতের ব্যাপারে উভয়পক্ষ তাকে সালিস নিযুক্ত করে আর তিনি আকিলাহগণের উপর দিয়ত পরিশোধের ফায়সালা করেন তাহলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে না।

কেননা তাদের পক্ষ হতে যেহেতু সালিস নিয়োগ হয়নি সেহেতু তাদের উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই।

আর যদি হত্যাকারীর উপর তার মাল থেকে দিয়ত পরিশোধের ফায়সালা করেন তাহলে কাযী তা রদ করে আকিলাহগণের উপর দিয়তের ফায়সালা করতে পারেন।

কেননা ঐ সিদ্ধান্ত কাযীর নিজস্ব মতের পরিপন্থী এবং 'নাদ'-এরও পরিপন্থী।

তবে হত্যাকান্ড যদি তার স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়। সেক্ষেত্রে কাযী ঐ ফায়সালা রদ করবেন না। কেননা স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে আকিলাহগণ তার দিয়তের দায়ভার বহন করে না।

সালিস ব্যক্তির জন্য জায়িয রয়েছে সাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং অস্বীকার করার উপর ফায়সালা করা; তদ্রূপ স্বীকারোক্তির উপরও।

কেননা এটা শরীয়ত সম্মত ফায়সালা।

আর তিনি যদি দুই প্রতিপক্ষের একজনের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে কিংবা সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে খবর প্রদান করেন, আর প্রতিপক্ষ দু'জন তাদের সালিস নিযুক্তির উপর তখনো অবিচল থাকে তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা তার কর্তৃত্ব এখনো বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু যদি কোন ফায়সালা সম্পর্কে অবহিত করে। তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে, যেমন বরখাস্তের পর নিয়োগকৃত কাযীর বক্তব্য।

নিজের পিতা-মাতার অনুকূলে এবং স্ত্রী ও সন্তানের অনুকূলে বিচারকের বিচার বাতিল বলে গণ্য হবে। আর শাসকের নিয়োগকৃত কাযী এবং দুই প্রতিপক্ষের নিযুক্ত সালিস এক্ষেত্রে সমান।

ফায়সালা বাতিল হওয়ার কারণ এই যে, সন্দেহ বিদ্যমান থাকার কারণে এদের অনুকূলে তার সাক্ষী গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং একইভাবে এদের অনুকূলে তার ফায়সালা লাভ গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি এদের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন তাহলে কিন্তু ভিন্ন কথা। কেননা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় অপবাদের অবকাশ না থাকার কারণে। সুতরাং বিচারের ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে।

যদি বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষ দু' ব্যক্তিকে সালিস নিযুক্ত করে, তাহলে বিচারের জন্য উভয়ের একত্রিত হওয়া জরুরী। কেননা, এটা এমন বিষয়, যাতে চিন্তা ও মতামত প্রয়োজন। প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত।

বিচার পর্বের বিবিধ মাসআলা

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি ভবনের উপর তালা একজনের আর নীচ তালা অন্যজনের হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে নীচতালার মালিকের অধিকার নেই তাতে খুঁটি ঠোকার কিংবা তাতে ক্ষুদ্র আলো পথের জন্য ছিদ্র করার।

অর্থাৎ উপর তালার মালিকের সম্মতি ছাড়া। ছাহেবায়ন বলেন, এমন কাজ করতে পারে যাতে উপর তালার মালিকের ক্ষতি না হয়।

একই মতপার্থক্য হবে যদি উপরের তালার মালিক তার তালার উপরে আরো তালা বানাতে চায়।

কারো কারো মতে ছাহেবায়ন যা বলেছেন সেটা মূলতঃ ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্যেরই ব্যাখ্যা। সুতরাং এখানে কোন মতপার্থক্য নেই।

আর কেউ কেউ বলেন, ছাহেবায়নের মতে মূল বিষয় হলো বৈধতা। কেননা এটা হলো আপন মালিকানার মাঝে হস্তক্ষেপ। আর মালিকানা নিরংকুশতা দাবী করে। আর নিষিদ্ধতা আসে ক্ষতির উদ্ভূত অবস্থার কারণে। সুতরাং ক্ষতির বিষয়টি যখন অস্পষ্ট থাকে তখন নিষেধ করা জায়িয হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে মূল বিষয় হলো নিষিদ্ধতা। কেননা এটা হলো এমন একটি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ, যার সাথে

অন্যের সম্মানযোগ্য অধিকার সম্পৃক্ত হয়েছে। যেমন, বন্ধক গ্রহণকারীর এবং ভাড়ায় নেওয়া ব্যক্তির অধিকারের মত। তবে উদ্ভূত সম্মতির কারণে হস্তক্ষেপের বৈধতা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যখন বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে গেলো তখন নিষিদ্ধতা বিলুপ্ত হবে না। অবশ্য যে কোন হস্তক্ষেপ উপরের তালার কোন প্রকার ক্ষতি থেকে মুক্ত হয় না। যেমন ভবন দুর্বল হওয়া কিংবা ভেঙ্গে যাওয়া। সুতরাং তাকে তা থেকে নিষেধই করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, একটি সোজা সড়ক থেকে যদি আরেকটি সোজা সড়ক বের হয়, যার শেষ মাথা খোলা নয়, তাহলে প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের অধিকার নেই দ্বিতীয় সড়কের দিকে দরজা খোলার।

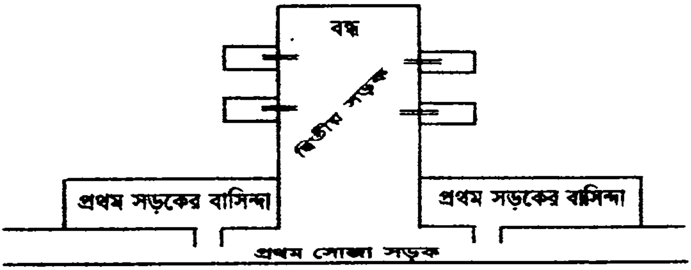

কেননা দরজা খোলার উদ্দেশ্য হলো চলাচল করা; অথচ তাদের সে পথে চলাচলের অধিকার নেই। কেননা ঐ সড়ক বিশেষভাবে ঐ সড়কের বাসিন্দাদের চলাচলের জন্য। এমন কি ঐ সড়কে কোন বাড়ী বিক্রি হলে প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের শোফা অধিকার সাব্যস্ত হয় না।

পক্ষান্তরে সড়কটি উন্মুক্ত হলে ভিন্ন কথা। কেননা উন্মুক্ত পথে চলাচল করা সাধারণের অধিকার।

কারো কারো মতে এই নিষেধাজ্ঞা চলাচলের উপর, দরজা খোলার উপর নয়। কেননা দরজা খোলার অর্থ নিজের দেয়ালের অংশ বিশেষ সরিয়ে দেওয়া।

তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, দরজা খোলার ব্যাপারেই নিষেধাজ্ঞা। কেননা দরজা খোলার পর প্রতিমুহূর্তে চলাচল থেকে তাকে বাঁধা দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া হয়ত সে দরজা লাগানোর সুবাদে এক সময় দ্বিতীয় সড়কে চলাচলের অধিকার দাবী করে বসবে।

আর যদি (দ্বিতীয়) সড়কটি অর্ধবৃত্তাকার হয়, যার উভয় প্রান্ত (প্রথম সড়কের সাথে) মিলিত তাহলে প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের (দ্বিতীয় সড়কের দিকে) দরজা খোলার অধিকার থাকবে।

কেননা যেহেতু সেটা সম্মিলিত প্রাঙ্গণ, সেহেতু তাদের প্রত্যেকেরই সেখানে হাঁটাচলার অধিকার থাকবে। একারণেই সেখানে একটি বাড়ী বিক্রি হলে 'শোফা'-এর ক্ষেত্রে সবাই শরীকাদার হয়।

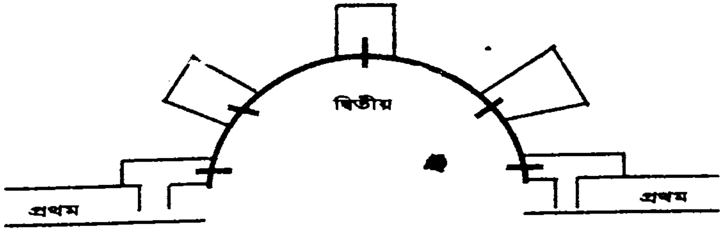

(ক) ক্রস চিহ্ন যুক্ত ঘরের লোক প্রথম সড়কের বাসিন্দা, কিন্তু তারা প্রাঙ্গণের দিকেও দ্বিতীয় দরজা খুলতে পারে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন বাড়ীর অংশ বিশেষের মালিকানা দাবী করে, আর বাড়ী যার দখলে আছে, সে তা অস্বীকার করে, অতঃপর সে দাবীকৃত অংশের ব্যাপারে দাবীদারের সাথে সমঝোতায় আসে তবে এই সমঝোতা বৈধ হবে।

এটা হলো অস্বীকৃতির পর সমঝোতার মাসআলা। ইনশাআল্লাহ্ সমঝোতা অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করবো।

দাবীকৃত অংশ যদিও এখানে অজ্ঞাত, তবু অজ্ঞাত পরিমাণ সম্পর্কে নির্ধারিত পরিমাণের বিনিময়ে সমঝোতা করা আমাদের মতে বৈধ। কেননা এটা হলো রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা। সুতরাং তা বিবাদ পর্যন্ত গড়াবে না। যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন ব্যক্তির দখলে থাকা বাড়ী সম্পর্কে দাবী করে যে, দখল এর সময় তাকে তা হেবা করেছে। যখন তার কাছে প্রমাণ চাওয়া হলো তখন সে বললো যে, হেবার ঘটনা সে অস্বীকার করায় আমি তার কাছ থেকে খরিদ করে নিয়েছি এরপর সে ঐ সময়ের আগে খরিদ করার সাক্ষী পেশ করলো যে সময়ে হেবা করেছে বলে দাবী করছে; তাহলে তার প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না।

কেননা স্ববিরোধিতা প্রকাশ পেয়ে গেছে। কারণ সে হেবার পর খরিদ করেছে বলে দাবী করছে। অথচ তারা হেবার আগে খরিদের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পক্ষান্তরে যদি তারা হেবার পর খরিদ করেছে বলে সাক্ষ্য দেয় তাহলে সংগতি প্রকাশ পাওয়ার কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

আর যদি সে হেবার দাবী করে অতঃপর হেবার আগে খরিদ করেছে বলে প্রমাণ পেশ করে, আর একথা না বলে যে, দখলদার হেবা অস্বীকার করেছে তাই আমি তা খরিদ করেছি, তাহলে প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না। (জামে ছাগীরের) কোন কোন অনুলিপিতে এটা উল্লেখ করা হয়েছে।

কেননা হেবার দাবী করার অর্থ হচ্ছে তার পক্ষ থেকে হেবাকারীর মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া। আবার (হেবার কথিত সময়ের আগে) খরিদ করার দাবী উত্থাপনের অর্থ হচ্ছে মালিকানার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা, সুতরাং এ দাবী স্ব-বিরোধী পণ্য করা হবে।

পক্ষান্তরে যদি হেবার (কথিত সময়ের) পরে খরিদ করেছে বলে দাবী করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো হেবা করার সময় হেবাকারীর মালিকানার স্বীকৃতি দান।

কেউ যদি অন্য একজনকে সম্বোধন করে বলে যে, এই দাসীটি তুমি আমার কাছ থেকে খরিদ করেছো আর অপর লোকটি তা অস্বীকার করে, এখন বিক্রেতা যদি বিবাদ পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে দাসীর সংগে সহবাস করা তার জন্য বৈধ হবে।

কেননা ক্রেতা যখন বিক্রয় চুক্তি অস্বীকার করলো তখন এটা তার পক্ষ থেকে বিক্রয় চুক্তি রহিত করার সমতুল্য হলো। কারণ অস্বীকৃতি দ্বারাও রহিতকরণ সাব্যস্ত হয়। যেমন উভয়ে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে। অতঃপর বিক্রেতা যখন বিবাদ পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিলো তখন চুক্তি রহিতকরণ পূর্ণতা লাভ করলো।

শুধু মনের সিদ্ধান্ত দ্বারা যদিও রহিতকরণ সাব্যস্ত হয় না, কিন্তু এখানে সিদ্ধান্তের সাথে কর্ম যুক্ত হয়েছে আর তা হলো দাসীকে নিজের কাছে রাখা, আর বিবাদস্থল থেকে সরিয়ে আনা এবং এ জাতীয় অন্য কিছু।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য উশুল করা যখন দুঃসাধ্য হয়ে গেলো তখন বিক্রেতার সম্মতিও লুপ্ত হয়ে গেলো। সুতরাং বিক্রেতা বিক্রয় চুক্তি রহিতকরণের একক অধিকারী হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি স্বীকার করে যে, সে অমুকের কাছ থেকে (কোন সূত্রে) দশটি দিরহাম গ্রহণ করেছে অতঃপর সে দাবী করে যে, দিরহামগুলো খাদযুক্ত, তাহলে তাকে বিশ্বাস করা হবে।

কোন কোন অনুলিপিতে 'কবজা'-এর স্থলে 'গ্রহণ করা' উল্লেখ রয়েছে এবং এটিও কবজার অর্থে প্রযুক্ত।

এর কারণ এই যে, খাদযুক্ত মুদ্রাও দিরহামের শ্রেণীযুক্ত, তবে তা দোষযুক্ত, শ্রেণী অভিন্নতার কারণেই 'বায় সারফ' ও 'বায় সালাম' চুক্তির ক্ষেত্রে তা নিতে রাজি হলে তা জায়িয হবে। (অথচ এই দুই চুক্তিতে বিনিময় দ্রব্যের পরিবর্তন বৈধ নয়।)

আর কবজা করার বিষয়টি উৎকৃষ্ট মুদ্রার সাথে বিশিষ্ট নয়। সুতরাং তার দাবী সত্য বলে মেনে নেয়া হবে। কেননা সে তার প্রাপ্য হক গ্রহণ করার কথা অস্বীকার করেছে।

পক্ষান্তরে যদি সে এই মর্মে স্বীকার করে যে, উৎকৃষ্ট দিরহাম কিংবা তার প্রাপ্য হক, কিংবা প্রাপ্য মূল্য গ্রহণ করেছে, কিংবা সে উশুল করেছে (শব্দটি ব্যবহার করে) তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা সে এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে কিংবা প্রকারান্তরে উৎকৃষ্ট দিরহাম গ্রহণের কথা স্বীকার করেছে, সুতরাং নিকৃষ্ট হওয়ার দাবী বিশ্বাস করা হবে না।

নাবাহ্‌রাজা (অতি নিকৃষ্ট) মুদ্রা খাদযুক্ত দিরহামের সমগোত্রীয়। আর 'সেতুকা' (অর্থাৎ যার মধ্যে তামা কাসার অংশ অধিক) মুদ্রা গ্রহণ করেছে বলে দাবী করলে বিশ্বাস করা হবে না। কেননা এটা দিরহামের সমগোত্রীয় নয়। এমন কি যদি আমাদের কথিত 'বায় সারফ' ও 'বায় সালাম' চুক্তিতে দিরহামের পরিবর্তে এটা নিতে রাজি হয় তাহলেও জায়িয হবে না।

زيف (বা খাদযুক্ত) হলো এমন দিরহাম, যা বায়তুল মাল খাদযুক্ত গণ্য করে (এ জন্য তা গ্রহণ করে না, কিন্তু ব্যবসায়ীরা লেনদেনের সময় নিয়ে নেয়।)

আর نبهرجة হলো এমন দিরহাম, যা ব্যবসায়ীরাও ফেরত দিয়ে দেয়।

আর ستوقه হলো এমন মুদ্রা, যাতে ভেজালের পরিমাণ (রৌপ্যের তুলনায়) বেশী।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি অন্যজনকে বলে যে, আমার কাছে তোমার এক হাজার দিরহাম পাওনা রয়েছে, আর অপর লোকটি বলে যে, তোমার কাছে আমার কোন পাওনা নেই; অতঃপর সে ঐ স্থানে বসেই বলে যে, তোমার কাছে আমার এক হাজার পাওনা রয়েছে, তাহলে স্বীকারোক্তিকারীর প্রতিকূলে কোন কিছু অবশ্য সাব্যস্ত হবে না।

কেননা প্রথম এক হাজার (সম্পর্কে) ছিলো তার স্বীকারোক্তি, আর সেটা যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছিলো তার নাকচ করার কারণে নাকচ হয়ে গেছে। এরপর দ্বিতীয় বক্তব্যটি হচ্ছে নতুন দাবী। সুতরাং (এই দাবী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য) সমান কিংবা প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তি অপরিহার্য।

পক্ষান্তরে যদি সে অন্যকে বলে যে, তুমি (আমার কাছ থেকে এই দাসীটি) খরিদ করেছো, আর অপর ব্যক্তি তা অস্বীকার করে; তাহলে পরবর্তীতে স্বীকারোক্তিকারীর তার সত্যায়ন করার অধিকার থাকবে।

কেননা দুই চুক্তিকারীর একজন চুক্তি নাকচ করার একক অধিকার রাখেনা, যেমন চুক্তি সম্পন্ন করার অধিকার রাখেনা। এর কারণ এই যে, চুক্তি নাকচ করা উভয়ের সম্মিলিত অধিকার। সুতরাং চুক্তিটি বহাল থাকবে এবং তার সত্যায়নও কার্যকর হবে।

পক্ষান্তরে যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করার একক অধিকার রাখে। সুতরাং ক্ষেত্র দুটি পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে মাল দাবী করে, আর বিবাদী বলে যে, আমার কাছে কখনই তোমার কিছু পাওনা ছিলো না। অতঃপর

বাদী এক হাজার দিরহাম পাওনার পক্ষে বাইয়েনাহ (বা সাক্ষী প্রমাণ) পেশ করলো আর বিবাদী তা পরিশোধ করার স্বপক্ষে বাইয়েনাহ পেশ করলো, সে ক্ষেত্রে তার বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে।

তদ্রূপ যদি অব্যাহত দানের পক্ষে বাইয়েনাহ পেশ করে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, তার বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা পরিশোধ, পাওনার অবশ্য সাব্যস্ত (বা وجوب) প্রমাণ করে, অথচ সে তা অবশ্য সাব্যস্ত অস্বীকার করেছে। সুতরাং (পরিশোধ করার দাবীর ক্ষেত্রে) তার দাবী স্ববিরোধী হল।

আমাদের দলীল এই যে, (দুটি বক্তব্যের মাঝে) সংগতি বিধান সম্ভব। কেননা বিবাদ নিরসনের জন্য অনেক সময় অ-পাওনাও পরিশোধ করা হয় এবং তা থেকে দায়মুক্ত করা হয়। এজন্যই তো 'অন্যান্য দাবী পরিশোধ করেছে'-বলা হয়।

তাছাড়া অনেক সময় (অস্বীকৃতি সত্ত্বেও) কোন জিনিসের উপর সন্ধি করা হয়, ফলে তা অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়, অতঃপর তা পরিশোধ করা হয়। তদ্রূপ যদি বলে যে, আমার কাছে কখনো তোমার কোন পাওনা নেই। কেননা সংগতি বিধান অধিকতর স্পষ্ট।

আর যদি বলে, আমার কাছে তোমার কোন পাওনা ছিলো না এবং আমি তোমাকে চিনি না, তাহলে পরিশোধের স্বপক্ষে বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে না।

তদ্রূপ অব্যাহতি দানের স্বপক্ষেও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সংগতি বিধান সম্ভব নয়। কারণ পরিচয় ছাড়া দু'জন লোকের মাঝে দেয়া-নেয়া পরিশোধকরণ ও পরিশোধ গ্রহণ, লেন-দেন ও সমঝোতা হতে পারে না।

ইমাম কুদূরী (র) অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, এক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হবে। কেননা এমন হয় যে, অন্তরালে থাকতে অভ্যস্ত অভিজাত পুরুষ বা পর্দানশীন স্ত্রীলোক তার দোর গোড়ায় শোরগোল বিরক্ত হয় আর না চিনেই তার কোন নায়েবকে দাবীদারকে খুশী করে বিদায় করার আদেশ দিয়ে দেয়, এরপর হয়ত তার পরিচয় জানতে পারে। দুই বক্তব্যের মাঝে সংগতি বিধান সম্ভব।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে দাবী করে যে, বিবাদী তার কাছে তার দাসী বিক্রি করেছে আর বিবাদী বলে যে, আমি কখনো তোমার কাছে তাকে বিক্রি করিনি, আর বাদী ক্রয়ের অনুকূলে বাইয়েনাহ পেশ করে অতঃপর দাসীর হাতে অতিরিক্ত আঙ্গুল দেখতে পেলো তখন বিবাদী বাইয়েনাহ পেশ করলো যে, সে তার কাছে সমস্ত দোষ থেকে দায়মুক্তির কথা বলেছে; তাহলে বিক্রেতার বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা পূর্বে সংগতি বিধানের যে **ছূরত উল্লেখ করেছি,** তার ভিত্তিতে বাইয়েনাই গ্রহণযোগ্য হবে।

যাহিরে রিওয়ায়েতের কারণ এই যে, সকল দায় থেকে দেয় মুক্তির শর্ত করার অর্থ হলো দোষমুক্ত তার রূপ পরিবর্তন। আর এটা বিক্রয় চুক্তির অস্তিত্ব দাবী করে।

অথচ সে চুক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। সুতরাং তার বক্তব্য স্ববিরোধী হলো। পক্ষান্তরে ঋণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা বাতিল হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধ করা হয়, যেমন আগে বলা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কোন পাওনা সংক্রান্ত চিরকুট বা চেকের নীচে যদি লেখা থাকে যে, এই চেক যে ব্যক্তি পেশ করবে, সে তাতে বর্ণিত 'হক'-এর অধিকারী হবে ইনশাআল্লাহ। কিংবা যদি ক্রয় পত্রের নীচে লেখা থাকে যে, (যে ব্যক্তি এই ক্রয়পত্র নিয়ে হাজির হবে) অমুকের দায়িত্ব হবে এটাকে 'অবমুক্ত' করা এবং ক্রেতার হাতে অর্পণ করা ইনশাআল্লাহ্, তাহলে সম্পূর্ণ চিরকুট বাতিল বলে গণ্য হবে। এটা হলো ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। ছাহেবায়নের মতে 'ইনশাআল্লাহ্' অংশটি 'অমুকের দায়িত্ব হবে অবমুক্ত করা' এবং 'যে ব্যক্তি এই চেক পেশ করবে' এর সাথে যুক্ত হবে।[১]

ছাহেবায়নের মতামত হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। ইমাম মুহাম্মদ (র) এটা-(মাবসুতের) ইকরার অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

কেননা ইনশাআল্লাহ বক্তব্যটি তার সংশ্লিষ্ট অংশের অভিমুখী হয়। কারণ চিরকুট বা চেক লেখা হয় দৃঢ়করণের জন্য।[২]

তাছাড়া বক্তব্যের মূলদাবী প্রতিটি কথা স্বতন্ত্র হওয়া[৩]।

আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, (আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে) عطف-এর দাবী মতে পুরো বক্তব্য অভিন্ন হবে। সুতরাং ইনশাআল্লাহ্ বাক্যটি পুরো বক্তব্যের সাথে যুক্ত হবে। যেমন عطف কৃত বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। উদাহরণ-কেউ বললো, আমার গোলাম আযাদ এবং আমার স্ত্রী তালাক এবং আমার হজ্জ করা ফরয ইনশাআল্লাহ্।[৪]

আর যদি মাঝখানে সাদা জায়গা ছেড়ে দেয় তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' কে পূর্ববর্তী কোন বক্তব্যের সাথেই যুক্ত ধরা হবে না এবং এটা কথা বলার সময় নীরবতার মাধ্যমে ব্যবধান সৃষ্টির মত হবে।

---

১. অর্থাৎ শুধু এই অংশটুকু বাতিল হবে। পক্ষান্তরে স্বীকারকৃত অর্থ এবং ক্রয় বহাল থাকবে।

২. অথচ পুরো বক্তব্যের সাথে ইনশাআল্লাহ্ যুক্ত হলে পুরো বক্তব্যই বাতিল হয়ে যায়, যা চিরকুট লেখার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, ইনশাআল্লাহ অংশটি শুধু সংলগ্ন অংশের সাথে যুক্ত হবে।

৩. সুতরাং ইনশাআল্লাহ্ শুধু পূর্ববর্তী কথার সংগে যুক্ত হবে। অন্যান্য বাক্য স্বতন্ত্র হওয়ার কারণে এর আওতাভুক্ত হবে না।

৪. এখানে ইনশাআল্লাহ প্রতিটি বাক্যের সাথে যুক্ত হয়। ফলে গোলাম আযাদ হয় না, স্ত্রী তালাক হয় না এবং হজ্জও ফরয হয় না।

মীরাছ সংক্রান্ত ফায়সালা প্রসংগে

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কোন নাসরানী যদি মৃত্যুবরণ করে, আর তার স্ত্রী মুসলমান অবস্থায় উপস্থিত হয়ে বলে যে, আমি তার মৃত্যুর পর ইসলাম গ্রহণ করেছি, পক্ষান্তরে ওয়ারিছগণ বলে যে, তুমি তার মৃত্যুর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছো; তাহলে ওয়ারিছদের দাবীই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর ইমাম যুফার (র) বলেন যে, স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা ইসলাম গ্রহণ হচ্ছে একটি নতুন বিষয়। সুতরাং এটাকে নিকটতম সময়ের দিকে সম্পৃক্ত করা হবে।

আমাদের দলীল এই যে, মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ বর্তমান সময়ের সাব্যস্ত হয়েছে, সুতরাং বর্তমান অবস্থাকে বিচার্য গণ্য করে বিগত সময়েও তা সাব্যস্ত হবে। যেমন পানি উত্তোলনের চরকার পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে। আর এটা হলো প্রকাশিত বর্তমান অবস্থা, যাকে আমরা দাবী রোধ করার জন্য গণ্য করি আর তিনি দাবী প্রমাণ করার জন্য গণ্য করেন (অথচ প্রকাশিত অবস্থা রোধ করার যোগ্যতা রাখে, দাবী সাব্যস্ত করার যোগ্যতা রাখে না।)

মুসলমান যদি মারা যায় নাছরানী স্ত্রী রয়েছে আর সে তার মৃত্যুর পর মুসলমান অবস্থায় এসে হাজির হয় আর দাবী করে যে, আমি তার মৃত্যুর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর ওয়ারিছরা বলে যে, তুমি তার মৃত্যুর পরে ইসলাম গ্রহণ করেছো তাহলে এক্ষেত্রেও তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

বর্তমান অবস্থাকে বিচার্য গণ্য করা হবে না। কেননা প্রকাশিত বর্তমান অবস্থা হক সাব্যস্ত করার প্রমাণ হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা। অথচ এমন একটি প্রমাণেরই পর প্রয়োজন।

পক্ষান্তরে ওয়ারিছগণ হচ্ছে উভয় মাছয়ালার ক্ষেত্রে রোধকারী।

তাছাড়া প্রকাশিত নতুন অবস্থাও তাদের সমর্থক। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, এক ব্যক্তির হাতে তার চার হাজার দিরহাম গচ্ছিত রয়েছে, আর আমানত গ্রহণকারী ব্যক্তি বলে যে, এ হলো মৃত ব্যক্তির পুত্র, সে ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিছ নেই; তাহলে সে ঐ পুত্রের কাছেই মাল সোপর্দ করবে।

কেননা সে স্বীকার করেছে যে, তার হাতে যে মাল রয়েছে, তা মাইয়েতের স্থলবর্তী রূপে ওয়ারিছের হক।

সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন সে স্বীকার করলো যে, এটা জীবিত অবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে 'মুরিছ'-এর হক।

পক্ষান্তরে যদি সে কোন ব্যক্তির অনুকূলে স্বীকার করে যে, ঐ ব্যক্তি আমানত প্রদানকারীর পক্ষ থেকে কবজা করার ওকীল, কিংবা সে গচ্ছিত দ্রব্য আমানত প্রদানকারীর নিকট থেকে ক্রয় করেছে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ তাকে গচ্ছিত দ্রব্য ঐ ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করতে আদেশ করা হবে না।

কেননা যেহেতু আমানত প্রদানকারী জীবিত রয়েছে, সেহেতু সে আমানত প্রদানকারীর হক বিদ্যমান থাকার স্বীকারোক্তি করেছে। সুতরাং এই স্বীকারোক্তির অর্থ হবে অন্যের মালের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি।

কিন্তু মৃত্যুর পরে স্বীকারোক্তির বিষয়টি এমন নয়।

পক্ষান্তরে ঋণগ্রহণকারী যদি অন্যকে ঋণ উশুল করার উকীল বানানোর কথা স্বীকার করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা ঋণ যেহেতু তার সদৃশ দ্বারা পরিশোধ করা হয় সেহেতু এই স্বীকারোক্তির অর্থ হবে নিজের প্রতিকূলে স্বীকারোক্তি করা। সুতরাং তাকে তার কাছে পরিশোধ করায় আদেশ করা হবে।

আর যদি আমানত গ্রহণকারী ব্যক্তি বলে যে, এই লোকটিও তার পুত্র। আর প্রথম লোকটি দাবী করে যে, আমি ছাড়া তার কোন পুত্র নেই, তাহলে প্রথমজনের অনুকূলে মালের ফায়সালা করা হবে।

কেননা প্রথম জনের অনুকূলে আমানত গ্রহণকারীর স্বীকারোক্তি যখন বৈধ হলো তখন ঐ মালের উপর তার কর্তৃত্ব রহিত হয়ে গেলো। সুতরাং পরবর্তী স্বীকারোক্তির অর্থ হবে প্রথম জনের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদান। সুতরাং দ্বিতীয় জনের অনুকূলে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন প্রথমজন সুপরিচিত পুত্র হলে।

তাছাড়া প্রথমজনের অনুকূলে স্বীকার করার সময় তাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী বিদ্যমান ছিলো না। সুতরাং তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় জনের অনুকূলে স্বীকার করার সময় মিথ্যা প্রতিপন্নকারী বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তার এ স্বীকারোক্তি বৈধ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কাযী যখন মাইয়েতের মাল পাওনার দাবীদারদের মাঝে এবং ওয়ারিছদের মাঝে মীরাছ বন্টন করবেন তখন তিনি পাওনাদারদের কাছ থেকে কোন কাফীল দাবী করতে পারবে না, আর ওয়ারিছের কাছ থেকেও না।

কোন কোন কাযী (অর্থাৎ ইবনে আবী লায়লা) সতর্কতামূলকভাবে কাফীল দাবী করেছেন। এটা যুলুম।

এ হলো ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত, আর ছাহেবায়নের মতে কাযী কাফীল দাবী করতে পারেন।

আর আলোচ্য সিদ্ধান্ত হবে ঐ ছূরতে, যখন ঋণ ও উত্তরাধিকার সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর সাক্ষীরা একথা না বলে যে, তাকে ছাড়া আর কোন ওয়ারিছের কথা আমাদের জানা নেই।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, কাযী হলেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষাকারী। আর বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এই মীরাছের বিষয়ে অনুপস্থিত ওয়ারিছ কিংবা অনুপস্থিত পাওনাদার রয়েছে। কেননা কখনো কখনো আকস্মিক মৃত্যু ঘটে যায়। সুতরাং কাফীল গ্রহণের মাধ্যমে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। যেমন কাযী পলাতক গোলাম এবং হারানো বস্তু তার মালিককে প্রদান করেন কিংবা অনুপস্থিত ব্যক্তির স্ত্রীকে তার মাল থেকে 'খরচ' প্রদান করেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, উপস্থিত পাওনাদার এবং ওয়ারিছদের হক নিশ্চিত রূপে বা বাহ্যিকভাবে সাব্যস্ত হয়েছে।

সুতরাং নিছক ধারণাকৃত 'হক'-এর কারণে সাব্যস্ত হককে জামিনদার পেশ করার সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা যাবে না।

যেমন কোন ব্যক্তি দখলদারের কাছ থেকে খরিদ করার প্রমাণ পেশ করলো কিংবা গোলামের বিপক্ষে ঋণের প্রমাণ পেশ করলো। আর গোলামকে ঐ ঋণের বিপরীতে বিক্রি করা হলো। সেক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট থেকে কিংবা পাওনাদারের নিকট থেকে যামিনদার গ্রহণ করা হয় না।

আর এ জন্য যে, এখানে যার পক্ষে কাফীল গ্রহণ করা হবে সে অজ্ঞাত, সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যেন, পাওনাদারদের কোন একজনের অনুকূলে জামিনদার গ্রহণ করা হয়।

স্ত্রীর খরচের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা উক্ত গচ্ছিত মালের উপর স্বামীর হক সাব্যস্ত রয়েছে। আর স্বামী পরিজ্ঞাত।

আর পলাতক গোলাম এ কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। বিশুদ্ধতম বর্ণনা এই যে, এক্ষেত্রেও মতপার্থক্য রয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেছেন, কাযী যদি বস্তুটির চিহ্ন বর্ণনার কারণে বা গোলামের স্বীকারোক্তির কারণে প্রদান করে থাকেন তাহলে সবার মতেই তিনি কাফীল গ্রহণ করবেন। কেননা শুধু চিহ্ন দ্বারা বা গোলামের স্বীকারোক্তি দ্বারা হক সাব্যস্ত হয় না। এজন্যই তো কাযীর বিরত থাকার অধিকার রয়েছে।

আর কাফীল গ্রহণের সিদ্ধান্তটিকে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, এর অর্থ হলো সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। আর এ বক্তব্য তাঁর এই মাযহাবই প্রমাণ করে যে, মুজতাহিদ কখনো ভুল করেন, কখনো সঠিক মত প্রকাশ করেন।

কেউ কেউ যেমন ধারণা করে যে, মুজতাহিদ ভুল করেন না এবং আবু হানীফা (র)-এরও সেই মত, তা ঠিক নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, বাড়ী যদি কোন লোকের দখলে থাকে আর অন্য একজন এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, তার বাপ মারা গেছেন এবং এই বাড়ীটি তার মাঝে এবং তার অমুক অনুপস্থিত ভাইয়ের মাঝে মীরাছ হিসেবে রেখে গেছেন তাহলে তার অনুকূলে অর্ধেক বাড়ীর ফায়সালা করা হবে। আর অপর অর্ধেক ঐ লোকের হাতে রেখে দেয়া হবে, যার দখলে বর্তমানে রয়েছে। অধিকতর নিশ্চয়তা

লাভের জন্য তার কাছে কাফীল দাবী করা হবে না। এটা হলো, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত।

ছাহেবায়ন বলেন, যার দখলে রয়েছে, সে যদি (উপস্থিত পুত্রের দাবী) অস্বীকার করে তাহলে বাকী অর্ধেক তার কাছ থেকে নিয়ে একজন বিশ্বস্ত লোকের হাতে রাখা হবে। আর যদি সে অস্বীকার না করে তাহলে তার হাতেই রেখে দেওয়া হবে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, অস্বীকারকারী ব্যক্তি হলো খিয়ানতকারী। সুতরাং তার হাতে মাল রাখা যায় না। পক্ষান্তরে যে স্বীকার করে তার বিষয়টি ভিন্ন! কেননা সে আমানতদার বলে গণ্য।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, কাযীর ফায়সালা উদ্দেশ্য ও মুখ্যত: মাইয়েতের অনুকূলে সাব্যস্ত হয়।

আর (অস্বীকার করা সত্ত্বেও) মাইয়েতের পক্ষ থেকে দখলদারের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তার দখল ভঙ্গ করা হবে না। যেমন স্বীকার করার ক্ষেত্রে ভঙ্গ করা হয় না।

আর কাযীর ফায়সালার কারণে তার অস্বীকৃতি বিদূরিত হয়েছে, আর ভবিষ্যতে পুনরায় অস্বীকৃতি না ঘটাই স্বাভাবিক। কেননা ঘটনাটি তার ও কাযীর জানা হয়ে গেছে।

আর দাবী যদি অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে হয় তাহলে কারো কারো মতে সর্বসম্মতিক্রমে অপর অর্ধেক দখলদারের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে।

কেননা অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। আর তার হাত থেকে সরিয়ে আনাই অধিকতর নিরাপদ।

স্থাবর সম্পত্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা নিজস্ব সত্তাগতভাবেই সংরক্ষিত।

আর একারণেই মাইয়েতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত অছী অনুপস্থিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার রাখে। অথচ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার রাখে না, তদ্রূপ মা, ভাই ও চাচা 'অপ্রাপ্ত বয়স্ক'-এর অছী নিযুক্ত হলেও একই হুকুম।

আর কারো কারো মতে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেও এই মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতামত অধিকতর স্পষ্ট। কেননা তার সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

কাফীল দাবী না করার কারণ এই যে, তাতে বিবাদ সৃষ্টি হবে। অথচ কাযী নিযুক্ত হয়েছেন বিবাদ মিটানোর জন্য, বিবাদ সৃষ্টির জন্য নয়।

আর অনুপস্থিত ভাই যখন হাজির হবে তখন তার পুনঃসাক্ষ্য পেশ করার প্রয়োজন হবে না। বরং পূর্ববর্তী ফায়সালার ভিত্তিতেই বাকী অর্ধেক তাকে অর্পণ করা হবে। কেননা মাইয়েতের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে যে সকল হক সাব্যস্ত হয় সে সকল হকের ক্ষেত্রে একজন ওয়ারিছ অন্যান্যদের পক্ষ থেকেও মামলার পক্ষ রূপে গণ্য হয়। চাই তা নির্ধারিত কোন বস্তুদ্রব্য হোক কিংবা অনির্ধারিত মুদ্রাদ্রব্য হোক।

কেননা যার পক্ষে বা বিপক্ষে ফায়সালা করা হচ্ছে; সে মূলত: মাইয়েত। আর ওয়ারিছদের যে কোন একজন ঐ বিষয়ে মাইয়েতের স্থলবর্তী হতে পারে।

পক্ষান্তরে নিজের জন্য উশুল করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এক্ষেত্রে সে নিজের জন্য কাজ করছে; সুতরাং সে অন্যের স্থলবর্তী হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা। একারণেই উপস্থিত ব্যক্তি নিজের হিসসাই শুধু উশুল করতে পারে।

বিষয়টি এমন হলো যে, মাইয়েতের অনুকূলে ঋণের সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপিত হলো।

তবে একজন ওয়ারিসের বিপক্ষে সমগ্র মালের প্রাপ্যতা সাব্যস্ত হবে, যদি সমগ্র মাল তার কবজায় থাকে। 'জামে ছাগীর' কিতাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা কবজা ছাড়া কেউ মামলার প্রতিপক্ষ হতে পারে না। সুতরাং তার হাতে যে পরিমাণ মাল আছে সেই পরিমাণের উপরই আদালতের ফায়সালা সীমাবদ্ধ থাকবে।

কেউ যদি বলে আমার মাল মিসকীনদের মধ্যে সাদাকা, তাহলে তা ঐ সকল মালের উপর কার্যকর হবে, যাতে যাকাত ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যদি সে তার মালের এক তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অছিয়ত করে, তাহলে তা সব কিছুর এক তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

'মাল' শব্দটির ব্যাপকতার কারণে সমস্ত মাল ছাদকা করার আবশ্যকতাই হলো কিয়াসের দাবী; যেমন ইমাম যুফার (র) তাই বলেন, যেমন অছিয়তের ক্ষেত্রে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, বান্দার পক্ষ থেকে ওয়াজিব করাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওয়াজিব করার উপর কিয়াস করা হবে। সুতরাং বান্দার পক্ষ হতে ওয়াজিব করণের বিষয়টি ঐ মালের অভিমুখী হবে, যে মালের ক্ষেত্রে শরীয়ত সাদাকা (যাকাত) ওয়াজিব করেছে।

পক্ষান্তরে অছিয়ত হলো মীরাছের সমগোত্রীয়। কেননা মীরাছের মত অছিয়ত স্থলবর্তীতা সাব্যস্ত করে। সুতরাং তা এক মাল বাদ দিয়ে অন্য মালের উপর বিশিষ্ট হবে না।

তাছাড়া উদ্বৃত্ত মালের ক্ষেত্রে সাদাকার বাধ্যবাধ্যকতা গ্রহণ করাই হলো বাহ্যিক অবস্থার দাবী। আর সেটা হলো যাকাতের মাল। পক্ষান্তরে অছিয়ত সম্পন্ন হয় মাল থেকে অনুখাপেক্ষিতার অবস্থায়। সুতরাং তা সমস্ত মালের দিকে অভিমুখী হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে উপরোক্ত 'দান বাক্যে' উশরী ভূমিও অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা উশরী ভূমি সাদাকা (উশর) ওয়াজিব হওয়ার কারণ। যেহেতু ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে উপরের ক্ষেত্রে সাদাকার দিকটি প্রবল।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে উক্ত 'দানবাক্যে' উশরী ভূমি অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা উশরী ভূমি হলো আর্থিক দায় আরোপের কারণ। যেহেতু তাঁর মতে উশরের ক্ষেত্রে আর্থিক দানের দিকটি প্রবল।

তবে খিরাজি ভূমি সর্ব সম্মতিক্রমেই অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা খিরাজ নিছক আর্থিক দায় সম্পন্ন বিধান।

আর যদি বলে "আমি যা কিছুর মালিক তা মিসকীনদের জন্য সাদাকা," তাহলে কেউ কেউ বলেন, সমস্ত মালকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা 'যা কিছুর মালিক' কথাটা 'মাল' শব্দের চেয়ে ব্যাপক।

আর (যাকাতের মালের সাথে) বিশিষ্টকারী হচ্ছে শরীয়তের পক্ষ থেকে ওয়াজিবকরণ এবং শরীয়তের ওয়াজিবকরণ 'মাল' শব্দের সাথে বিশিষ্ট আর 'মালিকানা' শব্দের ক্ষেত্রে বিশিষ্টকারী কিছু নেই, সুতরাং তা ব্যাপকতার উপরই বহাল থাকবে।

আর বিশুদ্ধমতে দুটোই সমান। কেননা উভয় শব্দ দ্বারাই প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত বস্তুকে লাযিম করা হয়েছে। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর যে মাল ওয়াজিবকরণের অন্তর্ভুক্ত হয় তাছাড়া আর কিছু তার কাছে না থাকে তাহলে ঐ মাল থেকে তার খোরাক পরিমাণ রেখে দেবে। এরপর যখন কোন কিছু উপার্জন করতে পারবে তখন রেখে দেওয়া পরিমাণে সাদাকা করে দেবে। কেননা তার নিজের এ প্রয়োজন সাদাকা থেকে অগ্রবর্তী।

তবে ধরে রাখার কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। কেননা এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রকম।

কোন কোন মতে পেশাদার একদিনের খোরাক ধরে রাখবে।

পক্ষান্তরে নির্ধারিত আমদানি ওয়ালা ব্যক্তি একমাসের খোরাক পরিমাণ ধরে রাখবে। আর ক্ষেত খামার ওয়ালা ব্যক্তি এক বছরের খোরাক পরিমাণ ধরে রাখবে। অর্থাৎ তাদের হাতে মাল আসার সময়ের পার্থক্য হিসাবে এটা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই হিসাবে একজন ব্যবসায়ী তার কাছে মাল ফিরে আসার সময় পরিমাণ খোরাক ধরে রাখবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কাউকে যদি অছী নিযুক্ত করা হয়, আর সে অছী নিযুক্তি সম্পর্কে কিছু না জানে এমনকি (না জেনে) উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে কিছু বিক্রি করে ফেলে তাহলে অছী রূপে গণ্য হবে এবং বিক্রি বৈধ হবে। কিন্তু অবগত হওয়ার পূর্বে 'উকীল'-এর বিক্রি করা বৈধ নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রথম ছূরতেও জায়িয হবে না। কেননা অছী নিযুক্ত করার অর্থ হলো মৃত্যুর পর স্থলবর্তী করা, সুতরাং এটাকে মৃত্যুর পূর্বে স্থলবর্তী করা তথা উকীল বানানোর উপর কিয়াস করা হবে। আর যাহিরে রিওয়ায়েতের বর্ণনায় উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, অছী নিযুক্ত করার অর্থ 'স্থলবর্তী' করা। কেননা এটা স্থলবর্তিতা বাতিল হওয়ার সময়ের দিকে সম্পর্কিত।

সুতরাং এটা অবগতির উপর নির্ভর করবে না। যেমন, ওয়ারিছের ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

আর উকীল নিয়োগ করার অর্থ হলো স্থলবর্তী করা। কেননা যার স্থলবর্তী হয়েছে তার কর্তৃত্ব বহাল থাকে। সুতরাং স্থলবর্তিতা অবগতির উপর নির্ভর করবে।

এর কারণ এই যে, উকীলের নিযুক্তি যদি তার অবগতির উপর নির্ভর করে তাহলে কল্যাণ বিনষ্ট হয় না। কেননা মোওয়াক্কেল নিজে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে প্রথমটির ক্ষেত্রে (অর্থাৎ অছী নিযুক্তির ক্ষেত্রে যদি তার অবগতির উপর নির্ভর করা হয় তাহলে) কল্যাণ বিনষ্ট ছাড়া হবে। কেননা অছী নিয়োগকারী (মৃত্যুর কারণে) অক্ষম হয়ে পড়েছে।

আর কোন লোক তাকে উকীল নিযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করলে উকীল হিসাবে তার কর্মকান্ড বৈধ হবে।

কেননা এটা হক সাব্যস্ত করা, কোন বিষয় লাযিম করা নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওয়াকালাত নিষেধ করা গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ ন, দু'জন সাক্ষী কিংবা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তার কাছে সাক্ষ্য প্রদান করে।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর ছাহেবায়ন বলেন যে, এটা এবং প্রথমটা অভিন্ন। কেননা উভয়টি মুয়ামালা-এর অন্তর্ভুক্ত। আর মুয়ামালা-এর ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির খবরই যথেষ্ট।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, এটা হলো দায়িত্ব আরোপকারী খবর। সুতরাং এক হিসাবে এটা হলো সাক্ষ্য। তাই সাক্ষ্যের দুটি দিকের একটি বিদ্যমান থাকা শর্ত হবে। আর তাহলো সাক্ষীর সংখ্যা কিংবা খবর দানকারীর আদেল হওয়া।

পক্ষান্তরে প্রথমটি (অর্থাৎ উকীল নিযুক্তির খবর প্রদানের বিষয়টি) ভিন্ন। তদ্রূপ মুওয়াক্কিলের প্রেরিত দূতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা 'প্রেরণের' প্রয়োজনের কারণে তার বক্তব্য হুবহু প্রেরকের বক্তব্য বলে গণ্য হবে।

একই মতপার্থক্য হবে মনিবকে তার গোলামের কোন 'অপরাধ' সম্পর্কে খবর প্রদানের ক্ষেত্রে এবং শোফার অধিকারীকে কিংবা কুমারীকে কিংবা দারুল ইসলামে হিজরত করেনি এমন মুসলমানকে খবর প্রদানের ক্ষেত্রে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কাযী কিংবা তাঁর পক্ষ হতে নিযুক্ত 'আমীন' (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) যদি পাওনাদারদের দেনা আদায়ের জন্য গোলাম বিক্রি করে এবং মূল্য উশুল করে নেয়, পরে তা নষ্ট হয়ে যায়, এরপর গোলামের হকদার আত্মপ্রকাশ করে তাহলে কাযী বা আমীন জামীন হবে না।

কেননা কাযীর নিযুক্ত আমীন কাযীর স্থলবর্তী আর কাযী হলেন, ইমামের (প্রধান শাসকের) স্থলবর্তী। আর এদের কারো উপরই ক্ষতিপূরণের দায়ভার আরোপিত হবে না, যাতে মানুষ এই দায়িত্ব গ্রহণে পিছপা না হয় এবং জনসাধারণের হক নষ্ট না হয়ে যায়।

আর ক্রেতা পাওনাদারদের কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেবে। কেননা তাদের জন্যই বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে ছিলো। সুতরাং চুক্তিকারীর কাছে রুজু করা অসম্ভব হওয়ার অবস্থায় তাদের কাছেই রুজু করবে।

যেমন, চুক্তিকারী যদি 'অনুমতি বঞ্চিত ব্যক্তি হয়।

একারণেই তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে গোলাম বিক্রি করা হয়।

পক্ষান্তরে কাজী যদি অছীকে পাওনাদারদের জন্য গোলাম বিক্রি করার আদেশ করেন এরপর গোলামের হকদার বের হয় কিংবা কবজার পূর্বে গোলাম মারা যায় আর মূল্য নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতা অছীর কাছ থেকেই মূল্য ফেরত নেবে।

কেননা সে মাইয়েতের স্থলবর্তী রূপে চুক্তিকারী। যদিও সে অছী হয়েছে মাইয়েতের পক্ষ হতে কাজীর নিযুক্ত করার কারণে। সুতরাং দেনাদার মৃতব্যক্তি নিজে বিক্রি করার মত হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, আর অছী পাওনাদারদের কাছ থেকে রুজু করবে।

কেননা সে তো তাদের পক্ষে কাজ করেছে।

আর যদি মাইয়েতের এ ছাড়া আরো মাল পাওয়া যায় তাহলে পাওনাদার ঐ মাল থেকে তার পাওনা ঋণ উশুল করবে।

মাশায়েখগণ বলেছেন, এটা বলা যেতে পারে যে, পাওনার ক্রেতাকে কিংবা অছীকে যে একশ' দিরহাম ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে সেটাও সে মাইয়েতের মাল থেকে উশুল করতে পারবে।

কেননা মাইয়েতের বিষয়েই এই ক্ষতিপূরণ তার উপর আরোপিত হয়েছে।

আর যদি ওয়ারিছের জন্য গোলাম বিক্রি করা হয় তাহলে সে পাওনাদারের পর্যায়ভুক্ত হবে।

কেননা উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে যদি ঋণ না থাকে তাহলে চুক্তিকারী তার পক্ষ হতে কার্য সম্পাদনকারী বলে গণ্য হবে।

কাযী যদি বলেন যে, আমি এই ব্যক্তির উপর রজমের ফায়সালা করেছি! সুতরাং তুমি তাকে রজম করো; কিংবা তার হস্তকর্তনের ফায়সালা করেছি, সুতরাং তুমি তার হস্তকর্তন করো; কিংবা দোররা মারার ফায়সালা করেছি, সুতরাং তুমি তাকে দোররা মারো, তাহলে আদিষ্ট ব্যক্তির তা করার অধিকার আছে।

তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে, যে তিনি এই মত থেকে রুজু করেছেন এবং বলেছেন যে, প্রমাণ চাক্ষুষ না করে তুমি কাযীর কথা গ্রহণ করতে পারো না।

কেননা কাযীর কথা ভুল ও ত্রুটি-পূর্ণ হতে পারে। অথচ পরে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

এই বর্ণনা মতে কাযীর লিখিত পত্রও গ্রহণযোগ্য হবে না। আমাদের যুগে অধিকাংশ কাযীর ন্যায়পরায়ণতা স্খলনের কারণে মাশায়েখগণ এই বর্ণনাটিকে পছন্দ করছেন। তবে অনিবার্য প্রয়োজনে কাযীর লিখিত পত্রের বিষয়টি ভিন্ন হবে।

যাহিরে রিওয়াতের কারণ এই যে, কাযী এমন একটি বিষয়ের খবর প্রদান করেছেন যা তিনি নিজে করার অধিকার রাখেন। সুতরাং তা গ্রহণ করা যাবে, যেহেতু এতে অপবাদের অবকাশ নেই।

তাছাড়া কর্তৃপক্ষের আনুগত্য ওয়াজিব। আর তাঁর কথা সত্য বলে মেনে নেয়ার মধ্যেও আনুগত্য রয়েছে।

আর ইমাম আবু মানসূর (র) বলেছেন, যদি কাযী ন্যায়পরায়ণ হন, আলেম হন, তাহলে তাঁর কথা গ্রহণ করা যাবে; ভুল ও খিয়ানতের অপবাদ অবিদ্যমান থাকার কারণে।

আর যদি কাযী ন্যায়পরায়ণ হন কিন্তু জ্ঞান সম্পন্ন না হন তাহলে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি তিনি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন। তাহলে তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়া ওয়াজিব। আর যদি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না পারেন তাহলে তাঁর কথা গ্রহণ করা হবে না। আর যদি জ্ঞান সম্পন্ন না হন এবং ফাসিক হন কিংবা আলিম হন, ফাসিক হন তাহলে ফয়সালা প্রদানের কারণ চাক্ষুষ অবলোকন ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। কেননা ভুল করার কিংবা খিয়ানত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি কাজীকে বরখাস্ত করা হয় আর তিনি কোন ব্যক্তিকে বলেন, আমি তোমার কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম নিয়ে অমুককে প্রদান করেছি, যার অনুকূলে এবং তোমার প্রতিকূলে ঐ পরিমাণ দিরহামের ফায়সালা করেছিলাম। আর লোকটি যদি বলে যে,ঐ দিরহাম আপনি অন্যায়ভাবে নিয়েছেন, তাহলে কাযীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অদ্রূপ একই হুকুম হবে। যদি তিনি বলেন যে, একটি 'হক' এর বিপরীতে আমি তোমার হস্তকর্তনের ফায়সালা দিয়েছিলাম।

এই বিধান তখন হবে যখন যার হস্তকর্তন করা হয়েছে, এবং যার কাছ থেকে মাল নেয়া হয়েছে তারা স্বীকার করে যে, তিনি কাযী থাকা অবস্থায় তা করেছেন।

এর কারণ এই যে, তারা দু'জন এ বিষয়ে যখন একমত হলো যে, তিনি বিচারকের পদে থাকা অবস্থায় তা করেছেন তখন বাহ্যিক অবস্থায় কাজীর অনুকূলে সাক্ষ্যদানকারী হলো। কেননা দৃশ্যত: কাজী অন্যায় ফায়সালা প্রদান করতে পারেন না।

আর এ বিষয়ে কসম করা কাযীর উপর ওয়াজিব নয়।

কেননা পারস্পরিক স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর কর্মটি তার বিচারকালে সম্পন্ন হওয়া প্রমাণিত হয়েছে, আর কযজীর উপর কসম আরোপিত হয় না।

তদ্রূপ হস্তকর্তনকারী কিংবা অর্থ গ্রহণকারী যদি, কাযী যা স্বীকার করেছেন তা স্বীকার করে, তাহলে তারাও জামীন হবে না।

কেননা কাযী তা বিচারকের পদে থাকা অবস্থায় করেছেন। আর হকদারকে কাযীর হক প্রদান করা বৈধ হয়েছে, যেমন যার কাছ থেকে মাল নেয়া হয়েছে যদি তার সম্মুখে ফয়সালা করা হয়।

আর যার হস্তকর্তন করা হয়েছে কিংবা যার কাছ থেকে মাল নেওয়া হয়েছে, তারা যদি দাবী করে যে, তিনি এটা করেছেন বিচারকের দায়িত্ব লাভের পূর্বে কিংবা বরখাস্ত হওয়ার পর, তাহলেও কাযীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

এই বিশুদ্ধ মত। কেননা তিনি তার কাজকে এমন একটি অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবী করেছেন, যা সুপরিজ্ঞাত এবং যামীন হওয়ার দায় আরোপের পরিপন্থী।

সুতরাং ঐ ব্যক্তির মত হলো যে বললো, আমি বিকৃত মস্তিক অবস্থায় তালাক দিয়েছি কিংবা আযাদ করেছি, আর তার মস্তিষ্ক বিকৃতি সুপরিজ্ঞাত ছিলো।

আর যদি এই ছূরতে হস্তকর্তনকারী কিংবা অর্থ গ্রহণকারী, কাজী যা স্বীকার করেছেন তা স্বীকার করে, তাহলে তারা জামীন হবে।

কেননা তারা দুজন ক্ষতিপূরণের দায় সাব্যস্ত হওয়ার কারণ স্বীকার করেছে, আর কাযীর বক্তব্য শুধু তার নিজের উপর থেকে ক্ষতিপূরণের দায় রোধ করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দায় সাব্যস্তের কারণ রহিত করার বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রথমোক্ত বিষয়টি ভিন্ন। কেননা পাস্পরিক স্বীকৃতির মাধ্যমে তার কর্মটি তার বিচারকালে সম্পন্ন হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

আর যদি অর্থ গ্রহণকারীর হাতে ঐ অর্থ বিদ্যমান থাকে আর কাযী যা স্বীকার করেছে সে কথা সেও স্বীকার করে আর যার কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হয়েছে সে কাযীর এই দাবী সত্য বলে স্বীকার করে যে, তিনি তার বিচারকালেই এটা করেছেন কিংবা দাবী করে যে, তিনি তার বিচারকালের বাইরে এটা করেছেন তাহলে উভয় অবস্থায় অর্থগ্রহণকারীর কাছ থেকে অর্থ ফেরত নেয়া হবে।

কেননা সে (নিজের মালিকানা দাবী করার পাশাপাশি) এটা স্বীকার করে নিয়েছে যে, যার কাছ থেকে মাল নেয়া হয়েছে, তার কবজা বিদ্যমান ছিলো। সুতরাং শরীয়ত সম্মত প্রমাণ ছাড়া তার মালিকানার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এক্ষেত্রে বরখাস্তকৃত কাযীর কথা প্রমাণ নয়।

كِتَابُ الشَّهَادَةِ

অধ্যায় ঃ সাক্ষ্য

كِتَابُ الشَّهَادَةِ

অধ্যায় ঃ সাক্ষ্য

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সাক্ষ্য প্রদান হলো ফরয, যা সাক্ষীদের উপর অবশ্য কর্তব্য। আর বাদী যখন তাদের কাছে সাক্ষ্য প্রদানের দাবী জানায় তখন তাদের সাক্ষ্য গোপন করার অধিকার নেই।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

"সাক্ষীদের যখন ডাকা হয় তখন তারা অস্বীকার করে না।"

আল্লাহ আরো বলেছেন—

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে তা গোপন করবে তবে তার অন্তর গুনাহগার।"

বাদীর পক্ষ থেকে দাবী ও তলবের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা সাক্ষ্য হলো তার প্রাপ্য হক। সুতরাং অন্য সমস্ত 'হক' -এর ন্যায় এটাও তার দাবী করার উপর নির্ভর করে।

আর 'হদ্দ' সংক্রান্ত সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সাক্ষীর গোপন করার এবং প্রকাশ করার মাঝে ইচ্ছাধিকার রয়েছে।

কেননা সে দুটি নেক কাজের মাঝে রয়েছে অর্থাৎ হদ্দ কায়েম করা এবং (মুসলমান ভাইকে) বে-আবরু করা থেকে বিরত থাকা।

তবে গোপন করাই উত্তম।

কেননা যে সাহাবী তাঁর সামনে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন, তাকে তিনি বলেছিলেন,

لو سترته بثوبك لكان خيرا لك

"যদি তুমি তোমার কাপড় দ্বারা তাকে ঢেকে রাখতে তাহলে তা তোমার জন্য মঙ্গল হতো।"

নবী (সা) আরো বলেছেন—

من ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والاخرة

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহ্ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার দোষ গোপন করবেন।"

নবী (সা) এবং তাঁর সাহাবী কেরাম (রা) থেকে 'হদ্দ' রোধ হওয়ার বাক্য উচ্চারণের ব্যাপারে যে শিক্ষা রয়েছে তাতে গোপন করায় উত্তমতার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

তবে চুরির ক্ষেত্রে মাল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া ওয়াজিব। আর এভাবে বলবে যে, সে মাল নিয়েছে।

যাতে যার মাল চুরি হয়েছে তার হক রক্ষা পায় তবে গোপনীয়তার রক্ষার জন্য 'চুরি করেছে' বলবে না।

তাছাড়া এই কারণে যে, 'চুরি করেছে'-এই সাক্ষ্য দ্বারা যদি চুরি সাব্যস্ত হয়ে যায় তখন হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে। আর ক্ষতিপূরণ হস্ত কর্তনের সাথে একত্র হয় না। ফলে যার মাল চুরি হয়েছে তার হক উদ্ধার করার উদ্দেশ্য হাছিল হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সাক্ষ্যের কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে। একটি হলো যিনা সম্পর্কে সাক্ষ্য। তাতে চারজন পুরুষ বিবেচ্য হবে।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَالّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ –

"তোমাদের স্ত্রীলোকদের থেকে যারা অশ্লীল কর্ম করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের (পুরুষদের মধ্যে) থেকে চারজন সাক্ষ্য উপস্থিত করবে।"

তাছাড়া আল্লাহ্ আরো বলেছেন—

(وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ) ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

যারা 'মুহছান' (সতী মু'মিনা) নারীদের কে অপবাদ দান করে অত:পর চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারবে না .....।

যিনার ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

কেননা ইমাম যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সা) থেকে শুরু করে তাঁর পরে দুই খলীফার যামানা পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত ছিলো যে, হদ্দ ও কিসাসের ব্যাপারে স্ত্রী লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

তাছাড়া স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য পুরুষদের সাক্ষ্যের স্থলবতী হওয়ার কারণে[১] তাতে **'বদলি সাক্ষ্য'** হওয়ায় সন্দেহ রয়েছে।

সুতরাং যে সকল ব্যাপার সন্দেহের কারণে রহিত হয়, সে সকল ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আরেকটি শ্রেণী হলো অন্যান্য হদ্দ ও কিসাসের সাক্ষ্য। তাতে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ

"তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করো।"

---

১. কেননা অন্য সাক্ষ্য প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন— যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ এবং দু'জন স্ত্রীলোক।

আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে এ সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এছাড়া অন্য যে সকল হক রয়েছে তাতে দু'জন পুরুষের কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, উক্ত হক অর্থ সংক্রান্ত হোক কিংবা অর্থ ছাড়া অন্য কোন হক হোক। যেমন বিবাহ তালাক, ওয়াকালাহ (উকীলের দায়িত্ব) অছিয়ত, ইত্যাদি।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, শুধু মালের ক্ষেত্রে এবং মালের অনুবর্তী ক্ষেত্রগুলোতে[১] স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য হলো মূল অবস্থা তাদের বুদ্ধি স্বল্পতা, স্মৃতিতে সংরক্ষণের ত্রুটি এবং কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতার কারণ। কেননা তারা আমীর ও শাসক হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা।

(অগ্রহণযোগ্যতাই আসল) একারণেই তো যাবতীয় 'হদ্দ' -এর ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। এবং এককভাবে (দু'জন দু'জন করে) তাদের চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না তবে অনিবার্য প্রয়োজনে[২] অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। (আর্থিক বিষয়াদির তুলনায়) বিবাহ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত কম ঘটে। সুতরাং যা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত বেশী ঘটে তার সাথে এটাকে যুক্ত করা যাবে না।

আমাদের দলীল এই যে, স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতাই হলো মূল অবস্থা। কেননা সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা যে জিনিসের উপর ভিত্তি লাভ করে তা বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো অবলোকন (ও শ্রবণ) এবং স্মৃতিতে সংরক্ষণ ও উপাস্থাপন। কেননা প্রথমটি দ্বারা সাক্ষী অবগতি লাভ করে। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা অবগতি অব্যাহত থাকে আর তৃতীয়টি দ্বারা কাযীর অবগতি লাভ হয়। আর এজন্যই হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়।

আর বিস্মৃতির আধিক্যের কারণে স্মৃতিতে সংরক্ষণের যে দুর্বলতা তার ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে আরেকজন স্ত্রী লোককে তার সংগে যুক্ত করার মাধ্যমে। সুতরাং এরপরে সন্দেহ ছাড়া আর কিছু বাকি থাকে না, আর এই কারণে ঐ সকল বিষয়ে তাদের গ্রহণ করা হয় না, যা সন্দেহ ছাড়া আর কিছু বাকি থাকে না আর এই কারণে ঐ সকল বিষয়ে তাদের সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হয় না। যা সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যায়। আর (উপরে বর্ণিত) এসকল হক সন্দেহ সত্ত্বেও সাব্যস্ত হয়। আর চারজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিধান কিয়াসের বিপরীতের সাব্যস্ত হয়েছে। যাতে তাদের বাইরে বের হওয়ার অধিক্য না দেখা দেয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, প্রসবের ক্ষেত্রে, কুমারিত্বের ক্ষেত্রে এবং মেয়েদের যে সকল স্থানের দোষ পুরুষেরা জানতে পারে না, সে সকল দোষের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

---

১. ধারে কিছু দেয়া, ভাড়া দেয়া, কাফীল হওয়া, ইত্যাদি।

২. অর্থাৎ যেহেতু অর্থ সংক্রান্ত ঘটনা সংখ্যায় সুপ্রচুর সেহেতু আল্লাহর বান্দাদের হক ও প্রাপ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণের অনিবার্যতা রয়েছে।

কেননা নবী (সা) বলেছেন—

شهادة النساء جائزة فيما لايتسطيع الرجال النظر اليه

"যে সব স্থান পুরুষেরা দেখতে পারে না সেসব স্থানের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

(আলোচ্য হাদীসে النساء শব্দটি ال যুক্ত বহুবচনে) আর ال যুক্ত বহুবচন দ্বারা শ্রেণী উদ্দেশ্যে হয়। সুতরাং তা ন্যূনপক্ষে একজন স্ত্রীলোককে অন্তর্ভুক্ত করবে।

চারজন স্ত্রীলোকের শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে এ হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বিপক্ষে প্রমাণ।[১]

তাছাড়া এই কারণ যে, তাকানোর দোষ হালকা হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়ার শর্ত রহিত হয়েছে। কেননা সমশ্রেণীর দিকে সমশ্রেণীর দৃষ্টিদান হালকা। সুতরাং একইভাবে সংখ্যার শর্তের বিবেচ্য রহিত হবে। অবশ্য দুজন বা তিনজন হওয়ার মধ্যে অধিক সতর্কতা রয়েছে।

কেননা তাতে দায় আরোপের গুণগত দিক রয়েছে।[২]

আর প্রসবের ক্ষেত্রে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের বিধান আমরা তালাক প্রসংগে আলোচনা করেছি।[৩]

আর কুমারিত্বের ক্ষেত্রে বিধান এই যে, যদি স্ত্রীলোকেরা সাক্ষ্য দান করে যে,স্ত্রী কুমারী রয়েছে[৪] তাহলে পুরুষত্বহীন স্বামীর ক্ষেত্রে একবছরের অবকাশ প্রদান করা হবে। অত:পর বিচ্ছিন্ন করা হবে।

কেননা এই সাক্ষ্য একটি সমর্থক অবস্থা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। কেননা কুমারিত্ব হলো মূল অবস্থা (আর সাক্ষ্য মূল অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়েছে।)

তদ্রূপ কুমারিত্বের শর্তে খরিদকৃত বাঁদী ফেরৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীলোকেরা বলে যে, সে অকুমারী তাহলে বিক্রেতাকে কসম করানো হবে। যাতে তার কসমের অস্বীকৃতি তাদের সাক্ষ্যের সাথে যুক্ত হয়। স্ত্রীলোকদের কথায় অকুমারিত্বের দোষ সাব্যস্ত হবে। তখন বিক্রেতাকে কসম করানো হবে।

আর প্রসবের সময় বাচ্চার কান্না সম্পর্কে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য মীরাছের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে গ্রহণযোগ্য হবে না।

---

১. তার যুক্তি এই যে, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে দুজন নারী যেহেতু একজন পুরুষের স্থলবর্তী সেহেতু দুজন পুরুষের স্থলবর্তী রূপে চারজন স্ত্রী সাক্ষীর প্রয়োজন হবে।

২. একারণেই সাক্ষী স্ত্রীলোকটির স্বাধীন ও মুসলিম হওয়া শর্ত। এবং সাক্ষ্য শব্দ ব্যবহার করা শর্ত এবং কাযীর মজলিসে হওয়া শর্ত।

৩.তালাক পর্বের বংশ পরিচয় সাব্যস্ত অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী যদি বিবাহের ছয় মাস বা তার বেশী সময়ের ব্যবধানে সন্তান প্রসব করে, আর স্বামী ঐ সন্তানের প্রসব অস্বীকার করে, তাহলে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা প্রসব প্রমাণিত হবে।

৪. অর্থাৎ পুরুষত্বহীন স্বামী সহবাস করেছে বলে দাবী করে আর স্ত্রী বলে যে, সহবাস করেনি, এক্ষেত্রে একজন স্ত্রীলোক যদি বলে যে, সহবাস হয়নি কুমারিত্ব অক্ষুন্ন রয়েছে। সেটা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা এটা এমন বিষয় যা পুরুষেরা অবহিত হতে পারে। তবে জানাযা পড়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এটা হলো ধর্মীয় বিষয়; আর ছাহেবায়নের মতে মীরাছের ক্ষেত্রেও স্ত্রীলোকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা একটা হলো প্রসবকালীন আওয়াজ। আর সাধারণত পুরুষেরা সে সময় উপস্থিত থাকে না। সুতরাং এটা মূল প্রসব বিষয়ে তাদের সাক্ষ্যের সমতূল্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এ সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা এবং সাক্ষী শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য। সাক্ষী যা সাক্ষ্য শব্দে উচ্চারণ না করে বলে যে, 'আমি জানি, কিংবা 'আমি বিশ্বাস করি'তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

ন্যায়পরায়ণতার শর্ত এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ। –"সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট হও।"

আর ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীই হলো সন্তোষজনক সাক্ষী। তাছাড়া আল্লাহ আরো বলেছেন, وَاشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ –"তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও।"

তাছাড়া এই কারণে যে, ন্যায়পরায়ণতার গুণই সত্যবাদিতার দিকটি নিশ্চিত করে। কেননা যে ব্যক্তি মিথ্যাচার ছাড়া অন্যান্য গোনাহ করে। সে মিথ্যাচারের গোনাহও করতে পারে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ফাসিক যদি সমাজে অভিজাত ও সজ্জন রূপে পরিচিত হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

কেননা অভিজাত্যের কারণে তাকে 'খরিদ' করা যাবে না; আর সজ্জনতার কারণে সে মিথ্যা পরিহার করবে।

প্রথমোক্ত মতই অধিকতর বিশুদ্ধ তবে কাযী যদি ফাসিকের সাক্ষী অনুযায়ী বিচার করে তাহলে আমাদের মতে তা বৈধ হবে। মাসআলাটি সুপরিচিত।

আর 'সাক্ষ্য' শব্দের শর্ত এজন্য যে কুরআনের বাণীসমূহ 'সাক্ষ্য' শব্দের শর্তারোপের কথা উচ্চারণ করেছে।

কেননা তাতে এই শব্দযোগে আদেশ রয়েছে। তাছাড়া তাতে অতিরিক্ত দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। কেননা এটা হলো কসমের শব্দ সুতরাং এই শব্দের কারণে মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা অধিকতর প্রবল হবে।

আর ইমাম কুদূরী (র)-এর বক্তব্য 'এ সকল ক্ষেত্রে' দ্বারা পূর্বে বর্ণিত (সাক্ষীর) সব কটি (শ্রেণী) উদ্দেশ্যে। সুতরাং প্রসব ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা ও 'সাক্ষ্য' শব্দ উচ্চারণের শর্ত আরোপিত হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা তাতে দায় আরোপের গুণগত দিক বিদ্যমান থাকার কারণে এটা সাক্ষ্য বলেই গণ্য। একারণেই এটা কাযীর মজলিসের খাছ, (অর্থাৎ সেখানেই এটা পেশ করতে হয়।) এবং এক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়াও ইসলামের শর্ত রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, শাসক (অর্থাৎ বিচারক) মুসলমানের বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতা যথেষ্ট মনে করবেন, প্রতিপক্ষ অভিযুক্ত না করা পর্যন্ত সাক্ষীদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করবেন না।

কেননা নবী (সা) বলেছেন—

المسلمون عدول بعضكم على بعض الا محدوداً فى قذف

"মুসলমানগণ একে অপরের জন্য ন্যায়পরায়ণ বলে গণ্য। অপবাদ আরোপের হদ্দপ্রাপ্ত ছাড়া।"

হযরত উমর (রা) থেকেও এধরনের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে।

তাছাড়া দীনের হারামকৃত জিনিস থেকে বিরত থাকাই হলো (মুসলমানের ক্ষেত্রে) স্বাভাবিক। আর বাহ্যিক অবস্থাতেই যথেষ্ট মনে করা হবে। কেননা নিশ্চিত অবস্থা পর্যন্ত উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

তবে হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সম্পর্কে তদন্ত করা হবে।

কেননা হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে তা রহিত করার পূর্ণ চেষ্টা করা হয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে পূর্ণ খোঁজ খবর নেয়ার শর্ত আরোপিত হবে। তাছাড়া এক্ষেত্রে সন্দেহ হদ্দকে রহিত করে।

প্রতিপক্ষ যদি তাদেরকে অভিযুক্ত করে তাহলে কাযী তাদের সম্পর্কে প্রকাশ্যে ও গোপনে তদন্ত করবেন।

কেননা এখানে দুই বাহ্যিক অবস্থার মোকাবেলা হচ্ছে, সুতরাং অগ্রাধিকার প্রদানে উদ্দেশ্যে তদন্ত করবেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যাবতীয় 'হক' এর ক্ষেত্রে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের সম্পর্কে তদন্ত করা হবে।

কেননা বিচারের ভিত্তি হলো (শরীয়ত সম্মত)প্রমাণের উপর, আর তা হলো ন্যায়পরায়ণদের সাক্ষ্য। সুতরাং কাযী ন্যায়পরায়নতা জানার চেষ্টা করবেন। আর এতে বিচারকের বিচার বাতিল হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়।

কেউ কেউ বলেন, এই মতপার্থক্য হচ্ছে যুগ ও কালের পার্থক্য। আর বর্তমান যুগে ছাহেবায়নের মতামত অনুযায়ী ফতোয়া হবে।

আর গোপনে সাফাই-বিবরণ হাসিল করার সুরত এই যে, ন্যায়পরায়ণতা নির্ধারণকারীর নিকট গোপন পত্র পাঠাবেন। তাতে সাক্ষীদের বংশ পরিচয় (নাম গোত্র ইত্যাদি), দৈহিক বিবরণ এবং মহল্লার মসজিদের কথা উল্লেখিত হবে। আর 'মন্তব্যকারী' মন্তব্যসহ তা ফেরত পাঠাবেন। আর এসবই হবে গোপনে যাতে ফাঁস না হয়ে যায়। তা না হলে হয় তাকে অর্থ দ্বারা প্রভাবিত করা হবে কিংবা তার ক্ষতিসাধন করা হবে।

আর প্রকাশ্য তদন্তের ক্ষেত্রে (কাযীর মজলিসে) ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে মন্তব্যকারী ও সাক্ষীদের মাঝে সমাবেশ ঘটানো জরুরী, যাতে অন্য কাউকে ন্যাপরায়ণ সাব্যস্ত করার সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

সাহাবা কেরামের যুগে শুধু প্রকাশ্য তদন্তই ছিলো। আর আমাদের যুগে ফিতনা পরিহারের লক্ষ্যে গোপনে তদন্তকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন যে, প্রকাশ্যে সাফাই মন্তব্য চাওয়া কঠিন পরীক্ষা ও ফিতনার বিষয়।

আর কেউ কেউ বলেছেন মন্তব্যকারীকে অবশ্যই একথা বলতে হবে যে, সাক্ষী স্বাধীন ন্যায়পরায়ণ এবং সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। কেননা গোলামও ন্যায়পরায়ণ হতে পারে। আর কারো কারো মতে, 'সে ন্যায়পরায়ণ' কথাটি বলাই যথেষ্ট কেননা দারুল ইসলাম হওয়ার কারণে স্বাধীনতা সাব্যস্ত রয়েছে। এটাই বিশুদ্ধতম মত।

আর যারা সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ জরুরী মনে করেন, তাদের মতে প্রতিপক্ষের অর্থাৎ বিবাদীর 'সে ন্যায়পরায়ণ' এ মন্তব্য গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, বিবাদীর 'তাযকিয়াহ্' (ন্যায়পরায়ণতার সত্যায়ণ) গ্রহণযোগ্য হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার তাযকিয়াহ্র সংগে অন্য একজনের তাযকিয়াহ্ যুক্ত করতে হবে। কেননা তাঁর মতে তাযকিয়াহকারীর সংখ্যা (দুজন হওয়া) শর্ত।

যাহির রেওয়ায়েত দলীল এই যে, বাদী ও তার সাক্ষীদের ধারণা মতে বিবাদী তো তার দাবী অস্বীকার করার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী, অস্বীকৃতিতে অটল থাকার ক্ষেত্রে অন্যায়কারী। সুতরাং সে ন্যায়পরায়ণতা সত্যায়নের যোগ্য নয়।

আর আলোচ্য মাসআলার কাঠামো এই যে, বিবাদী বলছে, সাক্ষীরা ন্যায়পরায়ণ। তবে তারা ভুল করছে কিংবা ভুলে গেছে, (সুতরাং এটা প্রতিপক্ষের দাবীর স্বীকৃতি নয়)। পক্ষান্তরে যদি বলে যে, তারা সত্য বলেছে কিংবা তারা ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী তাহলে তো সে প্রতিপক্ষের হক মেনেই নিলো, (ফলে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় হবে, সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নয়।)

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কাযীর প্রেরিত ব্যক্তি যদি একজন হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে দুজন হওয়া অধিকতর উত্তম।

এটা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, দু'জন ছাড়া জায়েয হবে না।

এখানে 'প্রেরিত ব্যক্তি' দ্বারা ন্যায়পরায়ণতার সত্যায়ণকারী উদ্দেশ্য। তবে সত্যায়ণকারীর কাছে প্রেরিত কাযীর দূত সম্পর্কে এবং সাক্ষীর 'মুখপাত্র' সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র)-এর দলীল এই যে, সাক্ষীর সত্যায়ণ সাক্ষ্যদানের সমার্থক। কেননা বিচারের কর্তৃত্ব নির্ভর করে সাক্ষীদের ন্যায়পণায়ণতা সাব্যস্ত হওয়ার উপর; আর তা সাব্যস্ত হয় সত্যায়ণ দ্বারা। সুতরাং সত্যায়ণকারীর ক্ষেত্রেও সংখ্যা শর্ত হবে। যেমন

সত্যায়ণকারীর ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার শর্ত রয়েছে। তদ্রূপ হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে যেমন সত্যায়ণকারীর পুরুষ হওয়া শর্ত।

শায়খায়নের দলীল এই যে, সত্যায়ণ সাক্ষ্যদানের সমার্থক নয়। একারণেই সত্যায়নের ক্ষেত্রে 'সাক্ষ্যদান' শব্দের উচ্চারণ এবং কাযীর মজলিসে উপস্থিতি শর্ত নয়।

আর সাক্ষীর ক্ষেত্রে সংখ্যার শর্ত কিয়াসের বিপরীত শরীয়তের বিধান। সুতরাং সেটা এই স্থল থেকে অন্যত্র সম্প্রাসারিত হবে না।

আর গোপন সত্যায়নের ক্ষেত্রে সত্যায়নকারীর সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা থাকা শর্ত নয়।

তাই গোলাম সত্যায়নকারী রূপে গ্রহণযোগ্য হবে।

পক্ষান্তরে প্রকাশ্যে সত্যায়নের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা শর্ত হতে হবে। তদ্রূপ সংখ্যাও শর্ত হবে।

আর ইমাম খাচ্ছাফ (র) বলেছেন এর উপর ইজমা রয়েছে। কেননা প্রকাশ্য সত্যায়ন কাযীর মজলিসের সাথে খাছ।

মাশায়েখগণ বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যিনার সাক্ষীদের সত্যায়নের ক্ষেত্রে চারজন হওয়া শর্ত।

অনুচ্ছেদ

সাক্ষী যে 'সাক্ষ্য' বহন করে তা দু'প্রকার প্রথমত যে 'সাক্ষ্য' বিষয়ের' বিধান সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়াই কার্যকর হয়ে যায়। যেমন বিক্রয় স্বীকারোক্তি, গছব, হত্যা এবং বিচারকের রায়। এসকল ক্ষেত্রে সাক্ষী যদি বিষয়টি দেখে ও শোনে তাহলে সে নিজে থেকে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে, যদিও তার কাছ থেকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য চাওয়া হয়নি।

কেননা সে এমন বিষয় অবগত হয়েছে যা নিজস্ব সত্তাগত ভাবেই বিধান কার্যকারী। আর এটাই হলো সাক্ষ্যদানের বৈধতার প্রদানের মূল বিষয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

"কিন্তু যারা সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে এমন অবস্থায় যে, তারা (মূলে সাক্ষ্যদান করছে অন্তরে) তা জানে।"

আর নবী (সা) বলেছেন, اذا علمت مثل الشمس فاشهد والا فدع

"যদি সূর্যের মত স্পষ্টভাবে জানো, তাহলে সাক্ষ্যদান করো অন্যথায় পরিহার করো।"

আর সে এভাবে বলবে, 'আমি সাক্ষ্যদান করছি', এভাবে বলবেনা যে, 'আমাকে সাক্ষী বানিয়েছে' কেননা এটা মিথ্যা হবে।

আর যদি পর্দার আড়াল থেকে কথা শুনে থাকে (যেমন একজন বললো বিক্রি করলাম আর অন্যজন বললো ক্রয় করলাম) তাহলে তার জন্য সাক্ষ্যদান করা জায়িয হবে না। আর যদি সে কাযীর সম্মুখে একথা ব্যক্ত করে, তাহলে কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না।

কেননা কণ্ঠস্বর কণ্ঠস্বরের সদৃশ হয়। সুতরাং এই শ্রবণ দ্বারা নিশ্চিত অবগতি লাভ হয় না।

তবে যদি কেউ ঘরে প্রবেশ করে আর সাক্ষী নিশ্চিত জানে যে, ঘরে ঐ লোক ছাড়া আর কেউ নেই; এরপর সাক্ষী দরজায় বসলো, আর ঘরেরও অন্য কোণে প্রবেশ পথ নেই। এ অবস্থায় সে প্রবেশকারীর স্বীকারোক্তি শুনলো, কিন্তু তাকে দেখলোনা, তাহলে সে সাক্ষ্য দান করতে পারে।

কেননা এ অবস্থায় নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়।

আরেক প্রকার 'সাক্ষ্যবিষয়' এমন, যার হুকুম সরাসরি সাব্যস্ত হয় না। যেমন (সাক্ষীদের) সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য প্রদান। সুতরাং যদি (কাযীর মজলিসের বাইরে) সাক্ষীকে কোন বিষয়ে সাক্ষ্যদান করতে সে না শোনে তাহলে তার জন্য বৈধ হবে না। তার সাক্ষ্য দানের উপর সাক্ষ্যদান করা, যদি না সাক্ষী (বা বাদী) তাকে এই সাক্ষ্যদানের বিষয়ে সাক্ষী বানায়।

কেননা 'সাক্ষ্য' নিজস্ব সত্তাগতভাবে বিধান কার্যকরী নয়। বরং কাযীর মজলিসে উপস্থাপনের মাধ্যমে তা কার্যকরী হয়। সুতরাং কাযীর মজলিসে সাক্ষ্য দানের ব্যপারে) তাকে স্থলবর্তী করা এবং সাক্ষ্য বহন করা অপরিহার্য। আর তার এখানে পাওয়া যায়নি।

তদ্রূপ যদি সে সাক্ষীকে তার সাক্ষ্যের ব্যাপারে অন্য কাউকে সাক্ষী বানাতে শোনে, তাহলে শ্রবণকারীর জন্য সাক্ষ্যদান করা জায়িয হবে না।

কেননা সাক্ষী তাকে সাক্ষ্যের বাহক বানায় নি বরং অন্যকে বাহক বানিয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তদ্রূপ সাক্ষী যদি সাক্ষ্য পত্রে তার স্বাক্ষর (হস্তাক্ষর) দেখে তাহলে সেই ভিত্তিতে সাক্ষ্যদান করা জায়েয হবে না। তবে সাক্ষ্যদানের ঘটনা স্মরণ হলে জায়িয হবে।

কেননা হস্তাক্ষর হস্তাক্ষরের সদৃশ হয়। সুতরাং তা দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না।

কেউ কেউ বলেছেন এটা হলো, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। ছাহেবায়নের মতে, তার জন্য সাক্ষ্যদান জায়িয হবে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। মতপার্থক্য হলো ঐ ক্ষেত্রে যখন কাযী সাক্ষীর সাক্ষ্যকে কিংবা তার রায়কে তার নিজের নথিতে লিপিবদ্ধ দেখে।

কেননা তার নথিতে যা লিপিবদ্ধ থাকবে সেটা তো তাঁর দ্বারা মোহর মারা থাকবে (অর্থাৎ তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে) বাড়ানো কমানো থেকে তা নিরাপদ থাকবে। সুতরাং তা দ্বারা কাযীর নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হবে।

সাক্ষ্যপত্রে লিখিত সাক্ষ্য তেমন নয়। কেননা তা অন্যের হাতে থাকে।

একইমত পার্থক্যর হবে সাক্ষীর যদি ঐ মজলিস স্মরণ হয় যেখানে সে সাক্ষ্য প্রদান করছিল কিংবা যাদের প্রতি তার আস্থা রয়েছে এমন লোকেরা যদি তাকে খবর দেয় যে, আমরা এবং তুমি (এই এই) ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সাক্ষীর জন্য এমন কোন বিষয় সাক্ষ্যদান করা জায়িয হবে না, যা সে নিজে দেখেনি। তবে বংশ, মৃত্যু, বিবাহ, স্ত্রী সহবাস ও কাযীর দায়িত্ব লাভ সম্পর্কে তাঁর জন্য সাক্ষ্য দেওয়া জায়িয রয়েছে। এই সব বিষয় সম্পর্কে এমন কেউ তাকে খবর প্রদান করে যার প্রতি তার আস্থা রয়েছে।

এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস। সাধারণ কিয়াস হলো এরকম শোনা কথার সাক্ষ্যদান বৈধ না হওয়া। কেননা شهادة (সাক্ষ্য) শব্দটি مشاهدة থেকে নির্গত। আর مشاهدة হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অথচ এখানে তা হয়নি। সুতরাং এটা 'বিক্রয়'এর মত হলো (যাতে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্যদান বৈধ নয়।)

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, এই সব বিষয়ের অনুষঙ্গসমূহের অবলোকন বিশেষ লোকদের সাথে বিশিষ্ট অথচ এগুলোর সাথে এমন সব বিধান সম্পৃক্ত হয় যা যুগ যুগ বিগত হওয়ার পরেও বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যদি এসকল ক্ষেত্রে শ্রুতির ভিত্তিতে সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে বিশেষ ক্ষতি এবং সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ অকার্যকর হওয়ার দিকে পৌছবে।

বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন, কেননা যে কেউ তা শুনতে পারে।

আর সাক্ষীর জন্য সাক্ষ্যদান বৈধ হচ্ছে খ্যাতির কারণে। আর প্রকৃত খ্যাতি সাব্যস্ত হয় ক্রমাগত বহুলোকের বর্ণনা দ্বারা কিংবা (গুণগত খ্যাতি হয়) এমন লোকের খবর প্রদান দ্বারা যার প্রতি তার আস্থা রয়েছে। যেমন কুদূরী কিতাবে বলা হয়েছে।

আর শর্তহলো দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক তাকে খবর প্রদান করে যাতে তাঁর এক প্রকার অবগতি লাভ হয়।

আর কেউ কেউ বলেছেন, মৃত্যুর ক্ষেত্রে একজন (ন্যায়পরায়ণ) পুরুষ বা নারীর খবরই যথেষ্ট হবে। কেননা, মৃত্যু অবস্থা খুব কমই একাধিক ব্যক্তি অবলোকন করে। কারণ মানুষ এটাকে ভয় করে এবং অপছন্দ করে। সুতরাং এক্ষেত্রে সংখ্যার শর্ত আরোপ করার মধ্যে এক ধরনের অসুবিধা রয়েছে।

বংশ পরিচয় ও বিবাহের বিষয়টি তেমন নয়।

আর মুক্ত ও নিঃশর্তভাবে সাক্ষ্যপ্রদান করাই কর্তব্য[1]। কোন ব্যাখ্যা প্রদান করবে না। যদি কাযীর সামনে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে, সে শোনার ভিত্তিতে সাক্ষ্যদান করছে, তাহলে কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। যেমন কোন বস্তুর উপর কারো কবজা অবলোকন করা (তার মালিকানার পক্ষে) সাক্ষ্যদানের বৈধতা সাব্যস্ত করে। কিন্তু যখন সে (এই) ব্যাখ্যাসহ সাক্ষ্যদান করে, (যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,বস্তুটিকে আমি তার কবজায় দেখেছি।) তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। এটাও তেমনি।

---

১. অর্থাৎ সোজা এভাবে বলবে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে অমুকের পুত্র, কেননা ব্যাখ্যা প্রদান দুর্বলতার পরিচায়ক।

তদ্রূপ যদি কোন মানুষকে সে দেখে যে, তিনি বিচারের মজলিসে সমাসীন রয়েছেন আর বাদী বিবাদীরা তার কাছে হাজির হচ্ছে, তাহলে সে তার কাযী হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করতে পারে। (যদিও ইমাম তাকে কাযী নিযুক্ত করতে সে দেখেনি।)

তদ্রূপ যদি কোন পুরুষ ও স্ত্রীলোককে একই বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীর মত মেলামেশাভাবে বাস করতে দেখে (তাহলে স্ত্রীলোকটি ঐ লোকের স্ত্রী বলে সাক্ষ্য দিতে পারে।) যেমন কোন একটি বস্তু কারো হাতে দেখে সাক্ষ্য দিতে পারে যে, বস্তুটি তাঁর।

কেউ যদি সাক্ষ্য দান করে যে, সে অমুকের দাফনে উপস্থিত ছিলো, কিংবা অমুকের জানাযা পড়েছে তাহলে এটা অবলোকনের সমার্থক। সুতরাং যদি সে কাযীর কাছে এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করে (ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সাক্ষ্য দেয়) তাহলে কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন।

আর কুদূরী কিতাবে ব্যতিক্রমী বিধানকে এ পাঁচটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করায় 'ওয়ালা' সম্পর্ক ও 'ওয়াকফ'এর ক্ষেত্রে শ্রবণ ভিত্তিক সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা নাকচ করে।

তবে শেষ দিকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'ওয়ালা সম্পর্কের ক্ষেত্রে জায়িয হবে। কেননা ওয়ালা হচ্ছে বংশ পরিচয়ের পর্যায়ভুক্ত। কারণ নবী (সা) বলেছেন -

الولاء لحمة كلحمة النسب

—'ওয়ালা' বংশ সম্পর্কের মতই একটি সম্পর্ক।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওয়াকফের ক্ষেত্রেও তা জায়িয হবে। কেননা ওয়াকফ বহু যুগ পর্যন্ত বহাল থাকে।

তবে (আবু ইউসুফ (র)-এর মত সম্পর্কে) আমাদের বক্তব্য এই যে, 'ওয়ালা' সম্পর্ক নির্ভর করে (গোলামের উপর থেকে মনিবের) মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার উপর। আর (যেহেতু তা শ্রুতব্য কথা দ্বারা সম্পন্ন হয় সেহেতু) তাতে (সাক্ষ্য প্রদানের জন্য) প্রত্যক্ষ অবলোকন অপরিহার্য। সুতরাং যার ভিত্তি এর উপর সেক্ষেত্রেও অবলোকন অপরিহার্য।

আর 'ওয়াকফ' সম্পর্কে বিশুদ্ধমত এই যে, মূল ওয়াকফ সম্পর্কে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ হবে। কিন্তু তার শর্তাবলী সম্পর্কে নয়।

কেননা মূল ওয়াকফের বিষয়টি প্রচারিত হয়। (শর্তাবলী প্রচার পায় না।)

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, দাস-দাসী ছাড়া অন্য কিছু যদি কারো কবজায় দেখো, তাহলে তুমি সাক্ষ্য প্রদান করতে পারো যে, এটা তার।

কেননা যে সকল বিষয় দ্বারা মালিকানার প্রমাণ পেশ করা হয়, তন্মধ্যে কবজাই হলো চূড়ান্ত। কারণ কবজাই হলো মালিকানার সকল হেতুর ক্ষেত্রে প্রামাণ্যতার ভিত্তিমূল। সুতরাং কবজার অবলোকনকেই যথেষ্ট মনে করা হবে।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সেই সাথে তিনি এ সত্য আরোপ করেন যে, দখল অবলোকনকারীর মনে এই বিশ্বাস জন্মিতে হবে যে, এটা তারই মালিকানাধীন।

মাশায়েখগণ বলেছেন, যে এমনও হতে পারে যে, মনের বিশ্বাসের এ শর্তমূলত, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর নিঃশর্ত বর্ণনার ব্যাখ্যা। তখন শর্তটি হয়ে যাবে সর্বসম্মত।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন,ব্যবহারের সাথে কবজা থাকা মালিকানার প্রমাণ। আমাদের কোন কোন মাশায়েখ এ মতই গ্রহণ করেছেন। কেননা কবজা আমানত থেকে নিয়ে মালিকানা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্যবহার বিভিন্ন ভিত্তিতে হতে পারে: স্থলবর্তিতা ও প্রত্যক্ষ মালিকানা।

যাই হোক,মাসআলাটি চার প্রকার। যদি মালিক ও তার মালিকানাধীন বস্তু উভয়কে অবলোকন করে (অর্থাৎ উভয়ের পরিচয় লাভ করে এবং মন বলে যে, এটা তার মালিকানার বস্তু) তাহলে তাঁর জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা জায়েয হবে।

অদ্রূপ সূক্ষ্ম কিয়াসের মতে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ হবে, যদি মালিকানাধীন বস্তুটিকে তার চৌহদ্দিসহ (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত সহ) দেখে কিন্তু মালিককে না দেখে (অর্থাৎ তার চেহারা ও বংশ পরিচয় না জানে)। কেননা (মালিকানা) বংশ পরিচয় শ্রুতির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং শ্রুতির মাধ্যমেই তার পরিচয় লাভ হয়ে যাবে। (সুতরাং জানা ব্যক্তি সম্পর্কেই সাক্ষ্য প্রদান হবে।) আর যদি মালিক বা মালিকানাধীন বস্তু কোনটিকেই অবলোকন না করে (শুধু শোনে যে, অমুকের পুত্র অমুকের অমুক গ্রামে একটি জমি আছে) কিংবা মালিককে অবলোকন করলো (অর্থাৎ তার চাক্ষুষ পরিচয় পেলো। কিন্তু মালিকানাধীন বস্তু অবলোকন করলোনা, তাহলে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ হবে না।

আর দাস ও দাসী সম্পর্কে কথা এই যে, যদি তাদের দাসত্বের বিষয়টি সুপরিচিত হয়, তাহলে একই হুকুম হবে। কেননা গোলাম তো নিজের মালিকানাধীন হতে পারে না। আর যদি তারা দাস বা দাসী বলে পরিচিত না হয়। কিন্তু তারা এত ছোট যে, নিজের সম্পর্কে বলতে পারে না। তাহলেও একই হুকুম। কেননা তাদের 'আত্ম অধিকার' নেই।

আর যদি বড় হয় তাহলে সেটাই হবে আলোচ্য ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র। কেননা তাদের নিজেদের উপর নিজেদের 'আত্ম অধিকার' রয়েছে (তারা যদি স্বাধীন বলে দাবী করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হয়।) সুতরাং তাদের এই 'আত্ম অধিকার' অন্যের অধিকারকে রোধ করবে। তাই মালিকানার প্রমাণ অবিদ্যমান হলো।

ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, বয়স্কদের ব্যাপারেও কবজা অবলোকন কারীর জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ হবে। এ সিদ্ধান্ত হয়েছে, বস্ত্রাদির (ও অন্যান্য দ্রব্যের) উপর কিয়াস করে।

আর এর পার্থক্য আমরা যা বর্ণনা করেছি। আল্লাহই অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ যার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম যুফার (র) বলেন, যে সকল ক্ষেত্রে শ্রবণের উপর নির্ভর করে সে সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে। কেননা সেখানে প্রয়োজন শ্রবণের। আর তাতে কোন ত্রুটি নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকেও এই মর্মে বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সাক্ষ্য ধারণের সময় যদি দৃষ্টিসম্পন্ন হয় তাহলে তার সাক্ষ্য দান বৈধ হবে। কেননা অবলোকনের মাধ্যমে (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। আর সাক্ষ্য দানের সম্পর্ক হলো বচনের সাথে। আর তার জিহবা (বাকশক্তি) তো ত্রুটি পূর্ণ নয়। আর যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে, তার পরিচয় প্রদান সম্পন্ন হবে না সব (বংশ সূত্র) বর্ণনা দ্বারা। যেমন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে।

আমাদের দলীল এই যে, সাক্ষ্যদান -এর ক্ষেত্রে বাদী ও বিবাদীর মাঝে ইশারার মাধ্যমে পার্থক্য করার প্রয়োজন রয়েছে।

অথচ অন্ধ শুধু কণ্ঠস্বর দ্বারা পার্থক্য নির্ধারণ করতে সক্ষম। আর তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, যা পরিহার করা সম্ভব সাক্ষী শ্রেণীর অন্য সদস্যদের দ্বারা (দৃষ্টিসম্পন্ন সাক্ষী গ্রহণ দ্বারা)।

আর বংশ সূত্র গ্রহণযোগ্য হয় অনুপস্থিত ব্যক্তির পরিচায়নের জন্য, উপস্থিত ব্যক্তির নয়। সুতরাং এটা হদ্দ ও কিসাসের ন্যায় হলো (যেখানে সন্দেহের কারণে অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়)।

সাক্ষ্য প্রদানের পর যদি অন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে রায় প্রদান কার্যক্রম রহিত হয়ে যাবে।

কেননা রায় প্রদানের সময় সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা বহাল থাকা শর্ত, কারণ রায় প্রদানের সময় সাক্ষ্যটি প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হয়। অথচ সাক্ষ্যের যোগ্যতা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং অন্ধত্বের বিষয়টি বোবা হয়ে যাওয়া, পাগল হয়ে যাওয়া এবং ফাসিক হওয়ার মত হলো। (রায় প্রদানের পূর্বে এসকল উপসর্গ দেখা দিলে রায় কার্যক্রম রহিত হয়ে যায়।)

পক্ষান্তরে যদি সাক্ষীরা মারা যায় বা গায়েব হয়ে যায়,তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা মৃত্যুর মাধ্যমে তো সাক্ষ্যদান শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়ে গেছে। আর অনুপস্থিত হওয়া দ্বারা যোগ্যতা রহিত হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গোলামের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে না।

কেননা সাক্ষ্যদান হলো অভিভাবকত্ব প্রয়োগের অন্তর্ভুক্ত। অথচ তাঁর নিজের উপর তাঁর অভিভাবকত্ব নেই। সুতরাং অন্যের উপর তাঁর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত না হওয়া আরো স্বাভাবিক।

ব্যভিচারের অপবাদকারী যার উপর হদ্দ কায়েম হয়েছে, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, যদিও সে তওবা করে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

"কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না।"

তাছাড়া এই কারণে যে, সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান হলো হদ্দ এর পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান অপবাদ আরোপ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং প্রত্যাখ্যান তাওবার পরেও বহাল থাকবে যেমন মূল হদ্দ বহাল থাকে।

অপবাদ আরোপ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে হদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (ঐ সকল ক্ষেত্রে) সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান হয় তার ফাসিক হওয়ার কারণে, আর তা তওবা দ্বারা রহিত হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তওবা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : إلا الذين تابوا (যারা তওবা করে তারা ব্যতীত এতে)। তাওবাকারীকে ব্যতিক্রম করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, ব্যতিক্রমায়ন টি তার নিকটবর্তী অংশের দিকে অভিমুখী হবে। আর তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فأولئك هم الفاسقون (তারাই হলো ফাসিক)। কিংবা এটা হলো لكن এর অর্থ দানকারী বিযুক্ত ব্যতিক্রমায়ন।

কাফির যদি অপবাদ আরোপের কারণে হদ্দ প্রাপ্ত হয়। অত:পর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা (কাফিরের বিপক্ষে) কাফিরের সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রয়েছে সুতরাং তা প্রত্যাখ্যান করা হদ্দ-এর পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত হবে। অত:পর ইসলামের কারণে তার স্বতন্ত্রসাক্ষ্যদান যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

পক্ষান্তরে গোলাম যদি (অপবাদ আরোপের কারণে) হদ্দ প্রাপ্ত হয়, অত:পর আযাদ হয় তাহলে তার বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা গোলামের মূলতই সাক্ষ্যদান যোগ্যতা নেই। সুতরাং তার হদ্দ এর পূর্ণতা হবে আযাদ হওয়ার পর সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রদ করার মাধ্যমে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এবং পিতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় তার সন্তানের পক্ষে এবং সন্তানের পক্ষে তদ্রূপ সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়, তার পিতামাতার পক্ষে এবং তার দাদা-নানার পক্ষে।

এক্ষেত্রে প্রমাণ হলো নবী (সা)-এর বাণী—

لايقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لا مرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الاجير لمن استأجره

"পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য ও সন্তানের পক্ষে পিতার সাক্ষ্য, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সাক্ষ্য ও স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সাক্ষ্য, মনিবের পক্ষে গোলামের সাক্ষ্য ও গোলামের পক্ষে মনিবের সাক্ষ্য এবং মালিকের পক্ষে চাকরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।"

তাছাড়া এই কারণে যে, সন্তান ও পিতা-মাতার মাঝে ভোগ সুবিধা সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ কারণেই তাদের যাকাত প্রদান করা জায়িয নয়। সুতরাং এই সাক্ষ্যদান এক হিসাবে নিজের পক্ষেই সাক্ষ্যদান হবে, কিংবা তাতে (পক্ষপাতিত্বের) তোহমতের সম্ভাবনা রয়েছে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাশায়েখদের বক্তব্য মতে أجير দ্বারা ঐ বিশেষ শাগরেদ উদ্দেশ্য, যে তার ওস্তাদের ক্ষতিকে নিজের ক্ষতি এবং তার লাভকে নিজের লাভ বলে গণ্য করে। আর এটাই হলো নবী (সা)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্যে—

لا شهادة للقانع باهل البيت لهم

"কোন পরিবারের সাথে থাকা খাওয়ায় সংযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।"

আর কারো কারো মতে أجير দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো বার্ষিক, মাসিক বা দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত শ্রমিক। কেননা সাক্ষ্যদানের সময় শ্রমিক তার শ্রম দ্বারা মজুরির প্রাপ্যতা সাব্যস্ত করে। সুতরাং সাক্ষ্যদানের জন্য মজুরির বিনিময়ে নিযুক্ত ব্যক্তির মত হলো।

তদ্রূপ স্বামী-স্ত্রীর **পরস্পরের পক্ষে পরস্পরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।**

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সম্পদের মালিকানা তাদের মাঝে পৃথক এবং কবজার অধিকারও সংরক্ষিত। একারণেই তাদের মাঝে কিসাস এবং ঋণের কারণে আটক করণ কার্যকর হয়।

আর একজনের পক্ষে অন্যজনের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সাক্ষীর যে লাভ রয়েছে তা বিবেচ্য হবে না। কেননা সেটা সাক্ষ্যের অনুষঙ্গ ও পার্শ্ব বিষয়রূপে সাব্যস্ত হয়। (মুখ্য বিষয়রূপে নয়) যেমন পাওনাদার তার দেউলিয়া দেনাদারের পক্ষে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে।

আমাদের প্রমাণ হলো ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীস।

তাছাড়া এই কারণে যে, সাধারণত সুবিধা ভোগের বিষয়টি সংযুক্ত থাকে। আর তাই বিবেচ্য। সুতরাং এক হিসাবে সে নিজের পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী হবে, কিংবা সে তোহমতগ্রস্ত হবে। পাওনাদারের সাক্ষ্যের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা যে বিষয়ে সে সাক্ষ্যদান করছে তার উপর পাওনাদারের কর্তৃত্ব নেই।

আর গোলামের পক্ষে মনিবের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

কেননা সার্বিকভাবেই এটা নিজের পক্ষে সাক্ষ্যদান যখন গোলামের উপর কোন ঋণ না থাকে। কিংবা গোলামের উপর ঋণ থাকার সুরতে আংশিকভাবে এটা নিজের পক্ষে সাক্ষ্যদান হবে।

কেননা গোলামের অবস্থাটা স্থগিত ও পর্যবেক্ষণাধীন।

তদ্রূপ আমাদের বর্ণিত কারণে মোকাতাব গোলামের পক্ষে মনিবের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আর শরীকদারের পক্ষে শরীকের সাক্ষ্য শরীকানা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রহণ করা হবে না।

কেননা সাক্ষ্যদানের ফলে যে সুবিধা অর্জিত হবে তাতে যেহেতু উভয়ে শরীকদার সেহেতু এক হিসাবে এটা হলো নিজের অনুকূলে সাক্ষ্যদান।

পক্ষান্তরে যদি এমন বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে যেটা তাদের শরীকানাভুক্ত নয় তাহলে তোহমতের সুযোগ না থাকার কারণে গ্রহণযোগ্য হবে।

কোন ব্যক্তির তাঁর ভাইয়ের পক্ষে এবং তাঁর চাচার পক্ষে সাক্ষ্যদান গ্রহণ করা হবে।

কেননা সম্পদের মলিকানা ও সুবিধা ভোগ যেহেতু পৃথক এবং পরস্পরের ভোগের ক্ষেত্রে উদারতা নেই। সেহেতু তোহমতের অবকাশ নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'মুখান্নাছ' (মেয়েরূপ ধারণকারী পুরুষের) সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

'মুখান্নাছ' দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো যে ঘৃণ্য কাজে (অর্থাৎ সমকামিতায়) ব্যবহৃত হয়। কেননা সে তো পাপাচারী। পক্ষান্তরে যার কথায় (নারী সূলভ) কমনীয়তা রয়েছে এবং অঙ্গভঙ্গিতে লাস্য রয়েছে, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

তদ্রূপ পেশাদার বিলাপকারীণী এবং গায়িকার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

কেননা তারা হারাম কাজে লিপ্ত রয়েছে। কারণ নবী (সা) দুটি নির্বোধ আওয়াজ তথা বিলাপিনী ও গায়িকার আওয়াজকে নিষেধ করেছেন।

তদ্রূপ ক্রীড়াস্থলে মাদকাসক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

কেননা সে তার দ্বীনের হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত রয়েছে।

তদ্রূপ তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়, যে পাখি নিয়ে ক্রীড়া মগ্ন হয়।

কেননা এটা অন্তরে গাফলতি সৃষ্টি করে (সুতরাং সাক্ষ্যপ্রদানে কম বেশী করার ক্ষেত্রে সচেতনতা থাকবে না।)

তাছাড়া পাখি উড়ানোর জন্য ছাদে আরোহণের কারণে নারীদের গুপ্ত অবস্থা তার নজরে আসবে (যা হারাম কাজ)।

কোন অনুলিপিতে طيور (পাখি) এর পরিবর্তে রয়েছে طنبور (অর্থাৎ তাম্বুরা নিয়ে যে মগ্ন হয়) তখন উদ্দেশ্যে হবে গায়ক।

তদ্রূপ তার সাক্ষ্যগ্রহণ যোগ্য নয়। যে মানুষের বিনোদনের জন্যে গান গেয়ে বেড়ায়।

কেননা সে মানুষকে কবীরা গুনাহের কাজে একত্রিত করে।

তদ্রূপ তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, যে এমন সকল কবীরা গোনাহের কোন একটিতে লিপ্ত থাকে যার সাথে 'হদ্দ'এর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ এতে সে ফাসিক হয়ে যায়।

তদ্রূপ যে, উলঙ্গ অবস্থায় হাম্মামখানায় প্রবেশ করে।

কেননা মানুষের সামনে লজ্জাস্থান খোলা হারাম।

কিংবা সুদখায় কিংবা দাবা বা সতরঞ্জ দ্বারা জুয়া খেলে।

কেননা এসবই হলো কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দাবা ও সতরঞ্জ খেলায় মত্ত থাকার কারণে যার সালাত ফওত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে নিছক সতরঞ্জ খেলা সাক্ষ্য যোগ্যতার রহিতকারী পাপাচার নয়। কেননা এ বিষয়ে ইজতিহাদী মতভেদের অবকাশ রয়েছে।

মবসুত কিতাবে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, সুদ খাওয়ার ক্ষেত্রে কুখ্যাতি থাকতে হবে। কেননা মানুষ ফাসিক বিক্রয় চুক্তি করা থেকে খুব কমই বেচে থাকতে পারে। আর তা সবই রিবা বা সুদ-এর পর্যায়ভুক্ত।

তদ্রূপ যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট ও লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হয়। যেমন পথে পেশাব করা, পথে খাওয়া।

কেননা সে 'মুরুওয়ত' বা শিষ্টাচারিতার পরিত্যাগ করেছে। এধরনের কাজে যখন লজ্জা বোধ করে না তখন মিথ্যা বলা থেকেও লজ্জাবোধ করবে না। সুতরাং সে তোহমতের পাত্র হবে।

তদ্রূপ যারা প্রকাশ্যে 'সালাফে সালেহীন'কে গালি দেয়, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা তার ফাসিক প্রকাশ পেয়ে গেছে। পক্ষান্তরে 'সালাফে' সালেহীন প্রতি বিরূপ মনোভাব যে গোপন রাখে তার বিষয়টি ভিন্ন।

বিদ'আত পন্থীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, তবে খাত্তাবীদের নয় (অর্থাৎ যার আকীদা কুফরী পর্যায়ে চলে যায়)।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এটা হলো পাপাচারের নিকৃষ্টতম স্তর।

আমাদের দলীল এই যে, এ হলো আকীদাগত দিক থেকে পাপাচার। আর তার প্রতি ধার্মিকতাই তাকে এই বিদআতে (তথা আকীদাগত পাপাচারে) লিপ্ত করেছে, সুতরাং সে মিথ্যা থেকে বিরত থাকবে। আর সে ঐ (হানাফী) ব্যক্তির মত হলো যে মুছাল্লদ (জ্বাল দিয়ে তিনভাগের একভাগ শুকানো) নাবীয পান করে কিংবা ঐ (শাফেয়ী) ব্যক্তির মত হলো যে, হালাল মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ্ না বলে জবাইকৃত পশুর গোশত খায়।

পক্ষান্তরে কর্মগত পাপাচারের বিষয়টি ভিন্ন।

খাত্তাবী হলো রাফেযীদের একটি চরমপন্থী ফেরকা যারা কসম করে সাক্ষ্যদানকারী যে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য অবশ্য গ্রহণযোগ্য মনে করে। আর কোন কোন মতে যারা নিজের সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্যদান অবশ্যকরণীয় মনে করে।

কেননা তাদের পাপাচার প্রকাশিত হওয়ার কারণে। তাদের সাক্ষ্যদান মিথ্যার তোহমতের অবকাশ রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যিম্মীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, তাদের পরস্পরের প্রতি, যদিও তাদের ধর্ম বিভিন্ন হয়।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা যিম্মী তো ফাসিক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- وَالْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (কাফিররা তারাতো ফাসিক।) সুতরাং তাদের প্রদত্ত খবর সম্পর্কে 'বিরত'থাকা আব্যশক হবে। এ কারণেই মুসলমানদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং সে মোরতাদের মত হলো।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা) নাসারাদের পরস্পরের সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, তাদের নিজেদের উপর এবং নিজেদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। সুতরাং তাদের সমশ্রেণীর উপর কর্তৃত্ব থাকবে।

আর আকীদাগত পাপাচার সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রোধকারী নয়। কেননা সেটাকে সে তার ধর্মের নিষিদ্ধ বিষয় বলে বিশ্বাস করতে সেটা সে পরিহার করবে। আর মিথ্যাচার সব ধর্মেই নিষিদ্ধ।

মোরতাদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার কোন কর্তৃত্ব নেই। অদ্রূপ মুসলমানের বিপক্ষে যিম্মীর সাক্ষ্য দানের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা মুসলমানের ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব নেই।

তাছাড়া তার উপর মুসলমানের আধি..ত্যের কারণে মুসলমানের প্রতি সে বিদ্বেষ পোষণ করে তাই সে মুসলমানের বিপক্ষে মিথ্যা বলতে পারে।

পক্ষান্তরে কুফুরির ধর্মসমূহ ভিন্ন হলেও যেহেতু পরস্পরের উপর আধিপত্য বিস্তারগত বিদ্বেষ নেই, সেহেতু বিদ্বেষ তাকে মিথ্যাচারে উদ্বুদ্ধ করবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যিম্মীর বিপক্ষে হারবীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহই অধিক অবগত। হারবী দ্বারা তিনি সম্ভবত নিরাপত্তা লাভকারী বুঝিয়েছেন। কেননা, নিরাপত্তা লাভকারী যিম্মীর উপর তার কর্তৃত্ব নেই। কারণ যিম্মী হলো আমাদের দারুল ইসলামের বাসিন্দা। সুতরাং মর্যাদাগত দিক থেকে সে তার চেয়ে উচ্চ।

হারবীর বিপক্ষে যিম্মীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য; যেমন হারবী ও যিম্মীর বিপক্ষে মুসলামানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

নিরাপত্তা গ্রহণ করে আগতদের পরস্পরের বিপক্ষে পরস্পরের সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তারা একই দেশের বাসিন্দা হয়। পক্ষান্তরে যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশের বাসিন্দা হয়, যেমন রোম ও তুর্ক, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা 'দেশ' এর ভিন্নতা কর্তৃত্বকে রহিত করে। একারণেই তার পরস্পর উত্তরাধিকার সম্পর্কে রহিত করে।

যিম্মীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে আমাদের দারুল ইসলামের বাসিন্দা। নিরাপত্তা গ্রহণ করে আবাত ব্যক্তি তা নয়।

কারো যদি বদ কাজের চেয়ে নেক কাজ বেশী হয়, আর সে কবীরা গোনাহসমূহ পরিহার করে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। যদিও সে মাঝে মধ্যে কোন গোনাহ্ করে ফেলে।

শরীয়তে গ্রহণযোগ্য ন্যায়পরায়ণতার পরিচয়ের ক্ষেত্রে এটাই হলো বিশুদ্ধ মত। কেননা সকল প্রকার কবীরা গোনাহ পরিহার করা অপরিহার্য। এরপর ছাগীরা গোনাহের আধিক্য হবে বিবেচ্য, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি।

পক্ষান্তরে কোন গোনাহ করে ফেলা সাক্ষ্যযোগ্যতার ক্ষেত্রে শর্তকৃত ন্যায়পরায়ণকে ক্ষুণ্ন করে না। সুতরাং সে কারণে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য রদ করা হবে না। কেননা সমস্ত গোনাহ্ পরিহারের শর্ত বিবেচনা করার অর্থ সাক্ষ্যদানের দরজা বন্ধ করে দেওয়া। অথচ এ দরজা খোলা হয়েছে মানুষের হকসমূহের রক্ষার জন্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, খাতনাহীন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

কেননা এতে ন্যায়পরায়ণতা ক্ষুণ্ন হয় না। তবে যদি দীনের প্রতি অজ্ঞতার কারণে সে তা তরক করে। (তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।) কেননা এ আচরণের কারণে সে ন্যায়পরায়ণ থাকবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অন্ডকোষ কর্তিত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা ওমর (রা) অন্ডকোষ কর্তিত আলকাম -এর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া এই কারণ যে, তার একটি অঙ্গ অন্যায়ভাবে কর্তন করা হয়েছে। সুতরাং তা হস্ত কর্তনের মত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, জারজ সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা পিতা মাতার পাপাচার সন্তানের পাপাচারকে অনিবার্য করে না। যেমন, সন্তানের মুসলিম হওয়া অবস্থায় পিতা-মাতার কাফির থাকা।

ইমাম মালিক (র) বলেন, যিনার বিষয়ে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে জারজ সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে তো চাইবে যে অন্যরাও তার মতো হয়ে যাক। সুতরাং সে তোহমত গ্রস্ত হয়ে পড়বে।

আমাদের দলীল এই যে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এই পন্থা গ্রহণ করতে এবং তা পছন্দ করতে পারে না। আর কথা হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'খুনছা'-এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

কেননা সে হয় পুরুষ কিংবা নারী। আর উভয় শ্রেণীর সাক্ষ্যই 'নাছ' (শরীয়তের বাক্য) দ্বারা গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সরকারী কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ।

অধিকাংশ মাশায়েখের মতে 'আমলা' দ্বারা বাদশাহ্‌র আমলা উদ্দেশ্যে।

কেননা আমলা হওয়া নিজস্বভাবে পাপাচার নয়। তবে যদি তারা জুলুমের সহায়তাকারী হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

কোন কোন মতে (জুলুমের সহায়কারী হওয়ার পরেও) আমলা যদি সমাজে অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত বলে পরিচিত হয়, যে অনুমানে কথা বলে না, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। যেমন ফাসিক সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সে তার আভিজাত্যের কারণে সম্মান রক্ষার জন্য মিথ্যা বলতে উদ্যোগী হবে না। আর তার সমাজিক সমীহের কারণে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য অর্থের বিনিময়ে তাকে খরিদ করা সম্ভব হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, দু'জন লোক যদি সাক্ষ্যদান করে যে, তাদের আব্বা অমুক ব্যক্তিকে অছী নিযুক্ত করেছে, আর অছী তা দাবী করে তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে অছী যদি তা অস্বীকার করে তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

কিয়াস মতে অবশ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে দাবী করে।

একই বিধান হবে যদি যে দুজনের জন্য অছী নিযুক্ত করা হয়েছে তারা এই মর্মে সাক্ষ্যদান করে। কিংবা এমন দুই ব্যক্তি যদি এই মর্মে সাক্ষ্যদান করে যাদের অনুকূলে মৃত ব্যক্তির উপর পাওনা রয়েছে। কিংবা মৃতের অনুকূলে তাদের উপর পাওনা রয়েছে কিংবা দু'জন অছী যদি সাক্ষ্যদান করে যে, তাদের সংগে এই লোকটিকেও সে অছী নিযুক্ত করেছে।

কিয়াসের কারণ এই যে, এটা হলো সাক্ষীর অনুকূলে সাক্ষ্যদান। কেননা সাক্ষ্যের লাভ তার কাছে-ই ফিরে আসবে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, অছী যদি অছীর-দায়িত্ব' দাবী করে আর মৃত্যুর বিষয়টি যদি সুপরিচিত হয় তাহলে তাকে অছীর দায়িত্বে নিযুক্ত করার কর্তৃত্ব কাযীর রয়েছে। সুতরাং কাযী নিযুক্তি দানের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য এই সাক্ষ্যকে যথেষ্ট মনে করছেন। বিষয়টি এমন নয় যে, এই সাক্ষ্য দ্বারা কোন কিছু কার্যকর করা হচ্ছে' সুতরাং এটা লটারী করার মত হলো,

পক্ষান্তরে দুই অছী যদি স্বীকার করে যে, তাদের সঙ্গে তৃতীয় একজন রয়েছে; তাহলে কাযী তাদের সঙ্গে তৃতীয়জনকে নিযুক্তি দানের অধিকার রাখেন। কেননা তারা তাদের স্বীকৃতির কারণে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে অক্ষম।

পক্ষান্তরে অছী যদি ওছিয়াত (অছীর দায়িত্ব) অস্বীকার করে কিংবা মৃত্যুর বিষয়টি যদি সুপরিচিত না হয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা কাযীর অছী নিযুক্ত করার অধিকার নেই। সুতরাং সাক্ষীই হবে অবশ্য সাব্যস্তকারী।

মৃতের কাছে পাওনা রয়েছে, এমন দুই পাওনাদারের ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিষয়টি পরিচিত না হলেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে ; কেননা তারা নিজেদের বিপক্ষে (ঋণের টাকা অন্য লোকের গ্রহণের অধিকার) স্বীকার করেছে; সুতরাং তাদের স্বীকারোক্তির কারণে তাদের নিজের ক্ষেত্রে মৃত্যু সাব্যস্ত হবে।

আর যদি লোক দু'জন সাক্ষ্যদান করে যে, তাদের 'অনুপস্থিত' পিতা কুফায় তার পাওনা ঋণ উশুল করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে ওকীল নিযুক্ত করেছে, তাহলে ওকীল ওয়াকালাত দাবী করুক বা অস্বীকার করুক, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

কেননা কাযী অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওকীল নিয়োগের অধিকারী নন। সুতরাং এখন যদি ওকীলের নিযুক্তি সাব্যস্ত হয় তাহলে তাদের সাক্ষ্যবলেই সাব্যস্ত হবে। অথচ তোহমতের অবকাশের কারণে তা অবশ্য সাব্যস্তকারী নয়।

(বিবাদীর সাক্ষীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত) **নিছক অভিযোগমূলক সাক্ষ্য কাযী শ্রবণ করবেন না এবং ঐ অভিযোগের অনুকূলে রায় প্রদান করবেন না।**

কেননা পাপাচার (ও পাপাভ্যাস) বিচারের আওতাভুক্ত হয় না। কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তি তাওবার মাধ্যমে তা নিরসন করতে পারে। সুতরাং অভিযোগ আরোপ সাব্যস্ত হয় না। তাছাড়া নিছক অভিযোগ আরোপে দোষের গোপনীয়তা ছিন্ন করা হয়। অথচ দোষ গোপন করা ওয়াজিব এবং তা প্রকাশ করা হারাম, শুধু অন্যের হক রক্ষা করার জন্য তা প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। আর হক রক্ষার বিষয়টি আসে ঐ ক্ষেত্রে, যা বিচারের আওতাভুক্ত হয়।

তবে যদি তারা এই বিষয়ে (অর্থাৎ বাদীর সাক্ষীদের পাপাচারী হওয়ার বিষয়ে) বাদীর স্বীকারোক্তির সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে কাযী তা গ্রহণ করবেন।

কেননা স্বীকারোক্তি বিচারের আওতাধীন বিষয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, বিবাদী যদি সাক্ষ্য পেশ করে যে, বাদী সাক্ষীদেরকে অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত করেছে তাহলে সে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

কেননা এটা নিছক অভিযোগের উপর সাক্ষ্য। আর অর্থের বিনিময়ে নিযুক্তি যদিও অতিরিক্ত একটি বিষয়, কিন্তু তা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সে প্রতিপক্ষ নয়। কেননা এ বিষয়ে বিবাদী বাদীর সাথে নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যদি বিবাদী এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, বাদী সাক্ষীদেরকে দশ দিরহামের বিনিময়ে নিযুক্ত করেছে, যেন তারা সাক্ষ্য প্রদান করে। আর বাদী তাদেরকে সেই মাল থেকে দশ দিরহাম প্রদান করেছে, যা তার হাতে ছিলো; তাহলে এই সাক্ষী গ্রহণ করা হবে; কেননা বিবাদী যা দাবী করছে সেক্ষেত্রে বাদী তার প্রতিপক্ষ। অতঃপর এর উপর ভিত্তি করে অভিযোগ সাব্যস্ত হবে।

তদ্রূপ যদি বিবাদী এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, আমি এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এই সাক্ষীদের সাথে সমঝোতা করেছিলাম, যেন তারা আমার বিরুদ্ধে এই

মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয় এবং তাদের অর্থ প্রদান করেছি; অথচ তারা সাক্ষ্য প্রদান করেছে, এরপর বিবাদী সেই অর্থ ফেরত দাবী করে তাহলে সাক্ষী গ্রহণ করা হবে।

(যেহেতু নিছক অভিযোগ ভিত্তিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়) এজন্যই আমরা বলি যে, বিবাদী যদি এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, বাদীর সাক্ষী গোলাম কিংবা অপবাদ আরোপের কারণে হদ্দপ্রাপ্ত কিংবা মদ পান করেছে কিংবা অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা সে রাব্বীর শরীকদার তাহলে এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি সাক্ষ্য দান করে এবং স্থান ত্যাগ করার আগেই বলে যে, আমি আমার সাক্ষ্যের অংশবিশেষে ভুল করেছি; এক্ষেত্রে যদি সে ন্যায়পরায়ণ হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

আর 'ভুল করেছি'-এর অর্থ হলো বিস্মৃতির কারণে এমন কিছু বাদ দিয়েছি, যা উল্লেখ করা আমার কর্তব্য ছিলো কিংবা এমন কিছু অতিরিক্ত বলেছি, যা বাতিল ও অমূলক ছিলো।

এটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ এই যে, বিচারকের মজলিসের ভীতির কারণে সাক্ষী এ ধরনের অবস্থার শিকার হতে পারে। সুতরাং ওজর পরিষ্কার। তাই যথা সময়ে (অর্থাৎ স্থান ত্যাগের পূর্বে) যদি সে তা সংশোধন করে আর ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে তা গ্রহণ করা হবে।

পক্ষান্তরে সাক্ষী যদি বিচার মজলিস থেকে চলে যায়, এরপর ফিরে এসে বলে যে, 'আমি ভুল করেছি', তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এটা ঘোলাটে করার দ্বারা কিংবা প্রলুব্ধ করার দ্বারা বাদীর পক্ষ থেকে বিষয়বস্তু বৃদ্ধির (তদ্রূপ বিবাদীর পক্ষ হতে বিষয়বস্তু হ্রাসের) সন্দেহ সৃষ্টি করে। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

তাছাড়া মজলিস যদি অভিন্ন হয় তাহলে সংযুক্ত অংশ মূল সাক্ষ্যের সাথে যুক্ত বলে বিবেচ্য হয় এবং অভিন্ন বক্তব্যের সমতুল্য হয়। কিন্তু মজলিস ভিন্ন হলে সেরূপ হয় না।

একই বিধান হবে যদি সীমানার অংশবিশেষে বা বংশ পরিচয়ের অংশবিশেষে ভুল বর্ণনা হয়ে যায়।

আর গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার এই বিধান হলো সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে যদি সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার ক্ষেত্র না হয় তাহলে বক্তব্য পুনরুক্ত করায় কোন দোষ নেই। যেমন সাক্ষ্য শব্দটা কিংবা এই জাতীয় কিছু বাদ দিলো (এরপর দোহরাল) যদি ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে মজলিস থেকে চলে যাওয়াতেও কোন অসুবিধা নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মজলিসের বাইরেও (অর্থাৎ মজলিস ত্যাগ করার পরও) সাক্ষীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে যদি সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ হয়। কিন্তু যাহিরে রেওয়ায়েত তাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সাক্ষ্য যদি (কাযীর মজলিসে উত্থাপিত) দাবীর আনুকূল হয় তাহলে গ্রহণ করা হবে না।

কেননা বান্দার হকসমূহের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো দাবী অগ্রবর্তী হওয়া। আর তা ঐ ক্ষেত্রে বিদ্যমান হয়েছে যে সাক্ষ্য দাবীর অনুকুল হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দাবী থেকে ভিন্ন হয়, সেক্ষেত্রে দাবী অবিদ্যমান গণ্য হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে শব্দ ও মর্মের ক্ষেত্রে উভয় সাক্ষীর অভিন্নতা বিবেচ্য হবে। সুতরাং একজন যদি এক হাযার সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে আর অপরজন দুই হাযার সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করে তাহলে তাঁর মতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। সাহেবায়নের মতে বাদী যদি দুই হাযার দাবী করে থাকে তাহলে এক হাযার সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

এক'শ ও দু'শ এবং এক তালাক, দুই তালাক ও তিন তালাকের একই মতপার্থক্য হবে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, উভয় সাক্ষী এক হাযার সম্পর্কে কিংবা এক তালাক সম্পর্কে একমত হয়েছে। পক্ষান্তরে তাদের একজন 'অতিরিক্ত'-এর ক্ষেত্রে আলাদা হয়েছে। সুতরাং যে ক্ষেত্রে একমত হয়েছে সেক্ষেত্রে তা সাব্যস্ত হবে, আর যেক্ষেত্রে একজন আলাদা হয়েছে, তা সাব্যস্ত হবে না।

সুতরাং এটা এক হাযার এবং এক হাযার ও পাঁচশ এর মত হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, উভয় সাক্ষী শব্দগতভাবে আলাদা হয়েছে। আর তা মর্মগত ভিন্নতা প্রমাণ করে। কেননা শব্দ থেকে মর্ম আহরিত হয়। শব্দের ভিন্নতা অর্থের ভিন্নতা প্রমাণ করে। এ কারণে যে, الف (বা এক হাযার) দ্বারা الفان (বা দুই হাযার) বোঝানো হয় না। কেননা দু'টি আলাদা শব্দ। তাই প্রতিটি শব্দের পক্ষে একজন সাক্ষী পাওয়া গেলো। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন মালের সাক্ষ্যের ন্যায় হল।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দু'জনের একজন যদি এক হাযারের সাক্ষ্য দেয় আর অপরজন এক হাযার ও পাঁচ'শ (الف وخمس مائة) এর সাক্ষ্য দেয়, আর বাদী এক হাযার ও পাঁচ'শ এর দাবী করে তাহলে এক হাযারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

কেননা এক হাযারের ক্ষেত্রে উভয় সাক্ষী শব্দগত ও অর্থগত উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়েছে। কারণ الف ও خمس مائة দু'টি আলাদা শব্দ, যার একটিকে অন্যটির উপর عطف করা হয়েছে, আর عطف প্রথমটিকে সুসাব্যস্ত করে। এর উদাহরণ হলো এক

তালাক এবং এক তালাক ও অর্ধ তালাক। তদ্রূপ একশ' এবং একশ ও পঞ্চাশ। পক্ষান্তরে عشرة ও خمسة عشر -এর বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা خمسة ও عشر এর মাঝে حرف العطف ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং এটা الف ও الفان এর নযীর হবে।

আর যদি বাদী (কমের দাবী করে) বলে যে, তার কাছে আমার শুধু এক হাযার পাওনা ছিলো, তাহলে যে সাক্ষী এক হাযার ও পাঁচশ-এর সাক্ষ্য দিয়েছে, তার সাক্ষ্য বাতিল হবে।

কেননা সাক্ষ্যের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বাদী সাক্ষীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

একই বিধান হবে যদি এক হাযার দাবী করার পর অবশিষ্ট সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করে। কেননা এখানেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার বিষয়টি সুস্পষ্ট। সুতরাং দাবী ও সাক্ষ্যের মাঝে সংগতি বিধান অপরিহার্য। সেই হিসাবে বাদী যদি বলে যে, আমার মূল পাওনা ছিলো এক হাযার ও পাঁচশ (যেমন সাক্ষী বলছে) তবে পাঁচশ আমি উশুল করেছি কিংবা মাফ করে দিয়েছি। তাহলে সংগতি বিদ্যমান থাকায় সাক্ষ্যটি গ্রহণ করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তারা দু'জন যদি এক হাযারের সাক্ষ্য দেয়, আর দু'জনের একজন বলে যে, বিবাদী পাঁচশ পরিশোধ করেছে, তাহলে এক হাযার সম্পর্কে উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

কেননা উভয়ে এ বিষয়ে একমত।

কিন্তু পাঁচশ পরিশোধের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

কেননা এটা হলো এক ব্যক্তির সাক্ষ্য।

তবে তার সংগে অন্য একজন যদি এই সাক্ষ্য দান করে তাহলে গ্রহণ করা হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, পাঁচশ এর অনুকূলে রায় প্রদান করা হবে। কেননা পাঁচশ পরিশোধের সাক্ষীর সাক্ষ্যের মূল বক্তব্য এই যে, ঋণের পরিমাণ পাঁচশ এর বেশী নয়। তার জবাব সেটাই, যা আমরা বলেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সাক্ষী যদি পাঁচশ পরিশোধের ব্যাপারে অবগত থাকে তাহলে বাদী পাঁচশ উশুল করার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করার পূর্বে এক হাযারের সাক্ষ্য না দেয়াই কর্তব্য।

যাতে সে যুলুমের ব্যাপারে সাহায্যকারী না হয়ে যায়। 'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, ব্যক্তি যদি এক লোকের বিপক্ষে এক হাযার দিরহাম ঋণের সাক্ষ্যদান করে; এরপর দু'জনের একজন এই সাক্ষ্য দান করে যে, সে ঐ এক হাযার দিরহাম পরিশোধ করেছে, তাহলে ঋণের ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে বিষয়ে উভয়ে একমত হয়েছে। পক্ষান্তরে পরিশোধের ব্যাপারে তাদের একজন একা হয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে বলেছি।

ইমাম তাহাবী (র) আমাদের মাশায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ঋণের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম যুফার (র) এরও একই মত। কেননা পরিশোধের পক্ষে সাক্ষ্যদানকারীকে বাদী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

আমাদের দলীল এই যে, এটা হলো প্রথম সাক্ষ্যবস্তু থেকে ভিন্ন বিষয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর 'প্রথম সাক্ষ্যবস্তু' হলো ঋণ। আর এ ধরনের অবস্থা সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতাকে রহিত করে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দু'জন সাক্ষী যদি এই মর্মে সাক্ষ্য দান করে যে, এই ব্যক্তি যায়দকে কোরবানীর দিন মক্কায় কতল করেছে; আর অন্য দু'জন সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তি কোরবানীর দিন যায়দকে কুফায় কতল করেছে; আর উভয় সাক্ষীর দল কাযীর সামনে উপস্থিত হয় (এবং এই সাক্ষ্য দেয়) তাহলে উভয় সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা নিশ্চিতরূপেই একটি সাক্ষ্য মিথ্যা। আর একটি সাক্ষী অন্যটি থেকে অগ্রাধিকারযোগ্য নয়।

অবশ্য একটি সাক্ষ্য যদি আগে প্রদত্ত হয় এবং সে অনুযায়ী রায় প্রদান করা হয়, অতঃপর অন্য সাক্ষীদ্বয় উপস্থিত হয় তাহলে পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

কেননা প্রথম সাক্ষ্যটির সাথে আদালতের রায় যুক্ত হওয়ার কারণে তা অগ্রণ্যতা লাভ করেছে। সুতরাং দ্বিতীয়টি দ্বারা তা রহিত হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, দুজন যদি এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে একটি গাভী চুরি করেছে কিন্তু গরুর রং সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ভিন্ন হয়, তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। কিন্তু একজন যদি বলে গাভী আর অন্যজন বলে বলদ তাহলে কর্তন করা হবে না। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত।

সাহেবায়ন বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই হস্ত কর্তন করা হবে না। আর কেউ কেউ বলেন, এ মতভেদ হল এমন দুই বর্ণের পার্থক্য, যেগুলি কাছাকাছি; যেমন কালো ও লাল, সাদা ও কালোর পার্থক্য হলে মতভেদ নেই। আর কেউ কেউ বলেন, সমস্ত বর্ণ সম্পর্কেই একই মতপার্থক্য হবে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, কালো গাভীর চুরি সাদা গাভীর চুরি থেকে ভিন্ন। সুতরাং প্রতিটি কর্মের ক্ষেত্রেই সাক্ষ্যের নেছাব (বা নির্ধারিত মাত্রা) পূর্ণ হয়নি। সুতরাং (গাভী) গসবের সাক্ষ্য প্রদানের (এবং সম্পর্কে ভিন্ন বক্তব্য প্রদানের) মতো হলো; বরং তার চাইতে এটাই অধিক গুরুতর। কেননা 'হদ্দ'-এর (প্রামাণ্যতার) বিষয়টি অধিক গুরুতর। আর বিষয়টি (গুণগত দিক থেকে) হয়ে গেল লিঙ্গ পার্থক্যের মত। ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, এখানে (উভয় সাক্ষ্যের মাঝে) সঙ্গতি বিধান সম্ভব। কেননা সাক্ষ্যটি রাতের বেলায় দূর থেকে ধারণ করা হয়েছে। আর (কালো ও লালের ক্ষেত্রে) দুটি রং কাছাকাছি হয়ে থাকে। কিংবা সাদা ও কালো একই জন্তুর

মধ্যে একত্র হতে পারে। যেমন, এক পার্শ্বে হয় কালো, এবং এ লোক তা অবলোকন করলো, আর অন্য পার্শ্বে হয় সাদা রং, যা অপর ব্যক্তি অবলোকন করে।

ছিনতাইয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য ধারণ সাধারণত দিনের বেলা হয়ে থাকে। নিকটবর্তী সন্ধান থেকে।

আর 'নরত্ব' ও 'নারীত্ব' এক প্রাণীতে একত্র হতে পারে না। তদ্রূপ এ বিষয়টির অবগতি নিকট থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তখন বিষয়টি অস্পষ্ট হয় না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন ব্যক্তির অনুকূলে সাক্ষ্য দান করে যে, সে অমুকের কাছ থেকে এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করেছে; আর অন্য কেউ সাক্ষ্য দান করে যে, সে 'এক হাযার ও পাঁচ শত' এর বিনিময়ে খরিদ করেছে তাহলে এ সাক্ষ্য বাতিল।

কেননা (অর্পণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বিক্রির দাবী উপস্থাপনের) উদ্দেশ্য হচ্ছে (মালিকানার) হেতু তথা বিক্রয় চুক্তি প্রমাণিত করা। আর তা ভিন্ন হয়ে যায়, মূল্য ভিন্ন হওয়ার কারণে। সুতরাং সাক্ষ্য বিষয় ভিন্ন হয়ে গেল এবং কোনটির ক্ষেত্রেই সাক্ষ্যসংখ্যা পূর্ণ হলো ন। তাছাড়া বাদী এখানে দুই সাক্ষীর একজনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

তদ্রূপ বাদী বিক্রেতা হলেও সাক্ষ্য বাতিল হবে। আর বাদীর স্বল্প মূল্যের বা অধিক মূল্যের দাবী করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কারণ আমরা বর্ণনা করেছি যে, (এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকানার হেতু তথা বিক্রয় চুক্তি প্রমাণিত করা)।

আর কিতাবাত চুক্তির হুকুমও অনুরূপ। কেননা উদ্দেশ্য হচ্ছে কিতাবাত চুক্তি প্রমাণিত করা (অর্থের পমিরাণ প্রমাণিত করা নয়।) বাদী গোলাম হলে তো তা স্পষ্ট। তদ্রূপ বাদী মনিব হলেও একই কথা। কেননা কিতাবাতের বিনিময়ে পরিশোধের পূর্বে তো মুক্তি সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং মনিবেরও উদ্দেশ্য হলো মুক্তির হেতু তথা চুক্তি প্রমাণিত করা। খোলা এবং মালের বিনিময়ে আযাদ করা এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার বিপরীতে সমঝোতা করার বিষয়টিও একই হবে, যদি বাদী স্ত্রী, বা গোলাম বা হত্যাকারী হয়। কেননা এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে (খোলা ও অন্যান্য) চুক্তি প্রমাণিত করা, আর তালাক, মুক্তি ও ক্ষমা সাব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। পক্ষান্তরে দাবী যদি অপর দিক থেকে হয় তাহলে আমরা (ঐক্যমত ও মতপার্থক্যের) যে কয়টি ছূরত উল্লেখ করেছি, সেসব ক্ষেত্রে এটা হবে ঋণের দাবীর সমতুল্য।

কেননা ক্ষমা, মুক্তি ও তালাক (তা হক-এর অধিকারী ব্যক্তির (তথা নিহতের অভিভাবক, মনিব ও স্বামীর) স্বীকারোক্তি দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এখন থাকবে শুধু (বিনিময়রূপে সাব্যস্ত অর্থ তথা) ঋণের দাবী।

বন্ধকের ক্ষেত্রে বন্ধক গ্রহণকারী যদি বাদী হয় (আর সাক্ষীদের মাঝে পরিমাণ সম্পর্কে মতভিন্নতা হয়) তাহলে সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না। কেননা বন্ধকী দ্রব্যে বন্ধক

গ্রহণকারীর কোন হিসসা (বা মালিকানা) নেই, সুতরাং এই সাক্ষ্যে দাবী শূন্য হলো, (অর্থাৎ কোন দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপিত হয়নি)

আর যদি বন্ধক প্রদানকারী বাদী হয় তাহলে এটা ঋণের দাবীর সমতুল্য হবে।

ভাড়ার ক্ষেত্রে যদি (লাভ ভোগের পূর্বে) মেয়াদের শুরুতেই দাবী উত্থাপিত হয় তাহলে তা বিক্রয়ের সমতুল্য (একই কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।) আর যদি (লাভ ভোগের অর্থাৎ) মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরে এবং বাদী অন্যপক্ষ হয় তবে তা ঋণের দাবীর সমতুল্য হবে। (এবং স্বল্পতার পরিমাণের অনুকূলে রায় প্রদান করা হবে।)

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, (মোহরের পরিমাণের ক্ষেত্রে যদি সাক্ষীদ্বয়ের মাঝে মতভিন্নতা হয়) তাহলে আর বিবাহের ব্যাপারে তা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী এক হাযারের বিনিময়ে সাব্যস্ত হবে। সাহেবায়ন বলেন, (বিক্রয়ের মত) বিবাহের ক্ষেত্রে এ সাক্ষ্য বাতিল হবে (এবং সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হবে।)

الامالى (সংকলন) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতের অনুগামী।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, এটা হলো চুক্তির মধ্যেই মতভিন্নতা।

কারণ এখানে উভয় পক্ষেরই উদ্দেশ্য হলো হেতু (বিবাহ চুক্তি) প্রমাণিত করা। সুতরাং তা বিক্রয় চুক্তির সদৃশ হলো।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, বিবাহের ক্ষেত্রে মাল হচ্ছে অনুবর্তী (আর অনুবর্তী সম্পর্কে মতভিন্নতা মূল সম্পর্কে মতভিন্নতা সাব্যস্ত করে না। সুতরাং মূল বিবাহ সাব্যস্ত হবে)।

আর মূল লক্ষ্য হলো হালাল হওয়া এবং উভয়ের সংযুক্তি সাব্যস্ত হওয়া আর সম্ভোগ মালিকানা লাভ হওয়া আর এ মূল বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

কেননা এক হাযার মোহরের বিবাহ এক হাযার ও পাঁচশ মোহরের বিবাহ থেকে ভিন্ন, আর চুক্তির ক্ষেত্রে মতভিন্নতা সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে।

সুতরাং তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এরপর যখন অনুবর্তী (তথা মাল) সম্পর্কে মতভিন্নতা হল তখন সল্পতর পরিমাণের উপর ফয়সলা হবে। কেননা এতে উভয় সাক্ষী একমত।

আর বিশুদ্ধ মতে স্বল্পতর ও অধিকতর মালের দাবীর ব্যাপারে হুকুম একই হবে।

এরপর কোন কোন মতে ইমাম আবু হানীফা (র) ও সাহেবায়নের মাঝে উক্ত মত পার্থক্য হলো ঐ ক্ষেত্রে, যখন স্ত্রী হবে বাদী। পক্ষান্তরে স্বামী বাদী হলে এ বিষয়ে ইজমা' রয়েছে যে, সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা স্ত্রীর উদ্দেশ্য মালও হতে পারে। কিন্তু স্বামীর উদ্দেশ্য বিবাহের আকদ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আর কোন কোন মতে উভয় ক্ষেত্রেই মতপার্থক্য রয়েছে। এটাই বিশুদ্ধতর। এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি।

মীরাছ সম্পর্কে সাক্ষ্য

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন বাড়ী সম্পর্কে সাক্ষ্য পেশ করে যে, এটা তার আব্বার ছিলো, তিনি সেটি এখন যার হাতে আছে, তার কাছে 'আরিয়াত' (সাময়িক ব্যবহারের জন্য) কিংবা আমানত রেখেছিলেন, তাহলে বাদী (ঐ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে) ঐ বাড়ী গ্রহণ করতে পারবে। তাকে এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না যে, তার পিতা মারা গেছেন এবং এটা তার জন্য মীরাছ হিসেবে রেখে গেছেন।

মীরাছের সাক্ষ্য সম্পর্কে মূলনীতি এই যে, 'মুরিছ'-এর মালিকানা যখন সাব্যস্ত হয়ে যাবে তখন ওয়ারিছ-এর অনুকূলে ঐ মালিকানার ফায়সালা জারি করা হবে না, যতক্ষণ না সাক্ষীরা এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, 'মুরিছ' মারা গেছে এবং সেটা তার অন্য মীরাছ রেখে মারা গেছে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, (স্থলবর্তী হিসাবে) ওয়ারিছ-এর মালিকানা মূলত: মুরিছ-এরই মালিকানা।

সুতরাং মুরিছের অনুকূলে মালিকানার সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হলো ওয়ারিছের অনুকূলে মালিকানার সাক্ষ্য প্রদান করা।

তারফায়ন বলেন, মীরাছ দ্রব্যের ক্ষেত্রে ওয়ারিছ-এর মালিকানা নতুন। তাই মীরাছি সূত্রে প্রাপ্ত দাসীর ক্ষেত্রে ওয়ারিছের কর্তব্য হলো গর্ভ পরিষ্কার পর্যন্ত অপেক্ষা করা; তদ্রূপ দরিদ্র মুরিছের কাছে ছাদাকার যে মাল ছিলো, সেটা ধনী ওয়ারিছের জন্য হালাল হয়। সুতরাং মালিকানার স্থানান্তর সাব্যস্ত করা জরুরী। তবে অনিবার্য কারণে স্থানান্তর সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মৃত্যুর সময় মূরিছ-এর মালিকানা বিদ্যমান থাকার অনুকূলে প্রদত্ত সাক্ষ্যকেই যথেষ্ট মনে করা হবে। তদ্রূপ (মৃত্যুর সময়) মূরিছ-এর 'কবজা' বিদ্যমান থাকার স্বপক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্যকেই যথেষ্ট মনে করা হবে, যা ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তীতে উল্লেখ করবো। আর কিভাবে উল্লেখিত মাসআলায় কব্জা বিদ্যমান থাকার অনুকূলে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। কেননা 'আরিয়াত' গ্রহণকারীর, আমানত গ্রহণকারীর এবং ভাড়া গ্রহণকারীর দখল মূরিছের দখলের স্থলবর্তী। সুতরাং তা মালিকানা স্থানান্তরের (সাক্ষ্যের) প্রয়োজনীয়তা বিলুপ্ত করেছে।

আর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, বাড়ীটি অমুকের হাতে ছিলো এবং হাতে থাকা অবস্থায় সে মারা গেছে তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা মৃত্যুর সময় দায়বদ্ধতার সূত্রে উক্ত কব্জা মালিকানার কব্জায় রূপান্তরিত হয়। (আর মৃত্যুর সময় বর্ণনা না করে) অজ্ঞাত রাখার কারণে আমানতের দ্রব্য দায়বদ্ধ

দ্রব্য হয়ে যায়। সুতরাং এটা মৃত্যুর সময় তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকার সপক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্যের মত হলো।

আর যদি সাক্ষীরা কোন জীবিত ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, বাড়ীটি দাবীদারের হাতে কয়েক মাস যাবৎ ছিলো, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা মালিকানার ন্যায় কব্জাও উদ্দেশ্যভুক্ত। আর যদি তারা তার মালিকানায় ছিল বলে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এ সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে। আর এটা ঐ দূরত্বের মত হবে, যখন তারা দাবীদারের হাত থেকে নিয়ে নেয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে।

যাহিরে রেওয়ায়েতে-যা তারফায়েনের মত-এর কারণ এই যে, এখানে একটি অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য সম্পন্ন হয়েছে। কেননা (দাবীদারের) কব্জা বর্তমানে বিলুপ্ত। ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ কব্জা ইত্যাদি। সুতরাং অজ্ঞাত বিষয়কে ফিরিয়ে দেয়ার ফায়সালা দেয়া অসম্ভব।

মালিকানার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা সুপরিজ্ঞাত এবং (হেতু বিভিন্ন হলেও) তার স্বরূপ অভিন্ন। তদ্রূপ দাবীদার থেকে কব্জা নিয়ে নেয়ার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সাক্ষ্যযোগে তা সুপরিজ্ঞাত হয়েছে এবং তার বিধানও সুপরিজ্ঞাত। আর তা হলো ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হওয়া।

তাছাড়া কব্জাকারীর কব্জা তো প্রত্যক্ষ। পক্ষান্তরে দাবীদারের কব্জা সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত, আর প্রদত্ত খবর তো চাক্ষুষ অবলোকনের সমতুল্য নয়।

আর বিবাদী যদি বিষয়টি স্বীকার করে যে, এই বাড়ী বাদীর দখলে ছিলো, তাহলে বাদীর হাতে তা ফেরত দেওয়া হবে।

কেননা স্বীকারকৃত বিষয়ের অজ্ঞতা স্বীকারোক্তির বৈধতাকে নাকচ করে না।

আর যদি দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্যদান করে যে, বিবাদী স্বীকার করেছে যে, বাড়ীটি বাদীর হাতে ছিলো তাহলে বাড়ী বাদীর হাতে ফেরত দেওয়া হবে।

কেননা এখানে 'সাক্ষ্য বিষয়' হলো বিবাদীর স্বীকারোক্তি, আর তা সুপরিজ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান এমন প্রত্যেক হক সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য, যা সন্দেহের কারণে রহিত হয় না।

এ বৈধতা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী। কেননা এর অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ বিভিন্ন অসুবিধা বশতঃ মূল সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানে অক্ষম হতে পারে। এমতাবস্থায় যদি সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য প্রদান বৈধ না হয় তাহলে তা মানুষের হকসমূহ নষ্ট হওয়া পর্যন্ত গড়াতে পারে। এই প্রয়োজনীয়তার কারণেই সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য

প্রদানকে আমরা বৈধতা দান করেছি, তার পরম্পরা যত অধিকই হোক। তবে বদলী সাক্ষ্য হওয়ার দিক থেকে কিংবা ভুলের অতিরিক্ত সম্ভাবনার দিকে থেকে তাতে সন্দেহ রয়েছে। আর (মূল সাক্ষী অধিক সংখ্যায় হলে) সমশ্রেণীর সাক্ষীদের মাধ্যমে বদলী সাক্ষী পরিহার করা সম্ভব। সুতরাং যেগুলো সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়, সেগুলোর ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন হদ্দ্ ও কিসাস।

দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, চারজন ছাড়া বৈধ হবে না, যাতে প্রত্যেক মূল সাক্ষীর বিপরীতে দু'জন হয়। কেননা (স্থলবর্তিতার ক্ষেত্রে) প্রত্যেক দুই সাক্ষী একজন মূল সাক্ষীর স্থলবর্তী। সুতরাং (এক পুরুষের স্থলবর্তী) দুই স্ত্রীলোকের ন্যায় হলো।

আমাদের দলীল হলো, হযরত আলী (রা) এর বাণী—

لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين

একজন লোকের সাক্ষ্যের উপর দু'জনের সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না। (رجلين-এর নিঃশর্ততা দু'জন লোকের যথেষ্টতা প্রমাণ করে।)

তাছাড়া এই কারণে যে, মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্যদান (বাদীর প্রাপ্য) অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং স্থলবর্তী সাক্ষীদ্বয় যেন প্রথমে একটি হক সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলো, অতঃপর অন্য একটি হক সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলো। সুতরাং তা গ্রহণ করা হবে। তবে একজনের সাক্ষ্যের উপর একজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ আমাদের বর্ণিত (আলী (রা)-এর) হাদীস। আর তা ইমাম মালিক (র) এর বিপক্ষে প্রমাণ। যিনি এ ক'জনের সাক্ষ্য যথেষ্ট বলেন। তাছাড়া এই কারণে যে,এটা হকসমূহের মধ্যে একটা হক। সুতরাং সাক্ষ্যের নির্ধারিত সংখ্যা অপরিহার্য।

আর সাক্ষ্যের উপর সাক্ষী বানানোর রূপ এই যে, মূল সাক্ষী স্থলবর্তী সাক্ষীকে বলবে যে, তুমি এই মর্মে আমার প্রদত্ত সাক্ষ্যের উপর সাক্ষী থাকো যে, অমুকের পুত্র অমুক আমার কাছে এই বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে এবং আমাকে তার নিজের উপর সাক্ষী রেখেছে।

কেননা স্থলবর্তী সাক্ষী মূল সাক্ষীর স্থলাভিষিক্তের ন্যায়। সুতরাং (মূল সাক্ষীর পক্ষ হতে) তাকে সাক্ষ্য বহন করানো এবং (বহন করার জন্য) ওকীল বানানো অপরিহার্য, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আর স্থলবর্তী সাক্ষীর নিকট মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য দান অপরিহার্য; যেমন কাযীর মজলিসে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে; যাতে স্থলবর্তী সাক্ষী উক্ত সাক্ষ্যকে কাযীর মজলিসে স্থানান্তরিত করতে পারে।

আর যদি মূল সাক্ষী একথা না বলে যে, সে আমাকে নিজের উপর সাক্ষী রেখেছে, তাহলেও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা যে অন্যের স্বীকারোক্তি শ্রবণ করেছে, তার জন্য সে

সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করা বৈধ— যদিও স্বীকারোক্তিকারী এ কথা না বলে যে, তুমি সাক্ষী থাকো।

আর স্থলবর্তী সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানের সময় বলবে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুক তার এই সাক্ষ্যের উপর আমাকে সাক্ষী বানিয়েছে যে, অমুক তার সামনে এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। কিংবা (এভাবে বলবে যে,) অমুক আমাকে বলেছে যে, তুমি এ বিষয়ে আমার প্রদত্ত সাক্ষ্যের উপর সাক্ষী থাকো।

কেননা স্থলবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান ও মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য উল্লেখ করা এবং তার পক্ষ হতে সাক্ষ্য বহন করানোর বিষয়টি উল্লেখ করা অপরিহার্য।

কেননা স্থলবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রদান ও মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য উল্লেখ করা এবং তার পক্ষ হতে সাক্ষ্য বহন করানোর বিষয়টি উল্লেখ করা অপরিহার্য।

স্থলবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানের অধিকতর দীর্ঘ ও অধিকতর সংক্ষিপ্ত ইবারত রয়েছে; তবে সব বিষয়ে মধ্যস্থতাই উত্তম।

আর কেউ যদি বলে যে, অমুক (স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তি) আমাকে তার নিজের (স্বীকারোক্তির) উপর সাক্ষ্য রেখেছে; তাহলে শ্রবণকারী ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারবে না; যতক্ষণ না সে একথা বলে যে, আমার সাক্ষ্যের উপর তুমি সাক্ষী থেকো।

কেননা (মূল সাক্ষীর পক্ষ থেকে) সাক্ষ্য বহন করানো অপরিহার্য, ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মত হিসাবে এটা পরিষ্কার। কেননা তার মতে এক্ষেত্রে প্রদত্ত রায় হলো স্থলবর্তী ও মূল সাক্ষীগণের সকলের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত রায়। একারণেই সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে সকলে শরীক হবে।

অদ্রূপ সাহেবায়নের মতেও তা জরুরী। কেননা মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য (কাযীর মজলিসে) স্থানান্তর করা অপরিহার্য যে, যাতে তা প্রমাণরূপে গণ্য হয়, তখন প্রমাণরূপে গণ্য বিষয় বহন করা সাব্যস্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মূল সাক্ষীদের মৃত্যুবরণ করা ছাড়া কিংবা তাদের তিন দিনের বা ততোধিক দূরত্বে অনুপস্থিত ছাড়া কিংবা কাযীর মজলিসে হাযির হতে অক্ষম হওয়ার মত অসুস্থ ছাড়া স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা তাদের সাক্ষ্যের বৈধতা হলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে। আর মূল সাক্ষীদের অক্ষমতার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন দেখা দেবে। আর উল্লেখিত বিষয়ের দ্বারা অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। সফরকে আমরা বিবেচনা করেছি এ কারণে যে, মূলতঃ অক্ষমকারী হলো পথের দূরত্ব। আর সফরের মেয়াদকাল (শরীয়তের পক্ষ হতে) গুণগতভাবে দূরবর্তী বলে গণ্য। একারণেই তার উপর সফরের বিভিন্ন আহকামকে আবর্তিত করা হয়েছে। সুতরাং এই বিধানটিরও একই হুকুম হবে।

অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি সাক্ষী এমন স্থানে থাকে, যেখানে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ভোরে রওয়ানা দিয়ে নিজের পরিবারের মাঝে রাত্রি যাপন করতে পারবে না, তাহলে মানুষের হকসমূহ রক্ষা করার জন্য স্থলবর্তীকে সাক্ষী বানানো বৈধ হবে।

মাশায়েখগণ বলেছেন, প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর উত্তম। আর দ্বিতীয়টি অধিকতর সহজ এবং ফকীহ আবুললায়ছ এমতই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্থলবর্তী সাক্ষীগণ যদি মূল সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতার সত্যায়ন করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা তারা ন্যায় পরায়ণতার সত্যায়ন করার যোগ্য।

তদ্রূপ যদি দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্যদান করে আর একজন অপরজনের ন্যায়পরায়ণতার সত্যায়ন করে তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে।

উপরোল্লিখিত কারণে বেশীর চেয়ে বেশী ব্যাপার এই যে, তাতে তার লাভ রয়েছে। এই হিসাবে যে, তার সাক্ষ্য অনুযায়ী বিচার হচ্ছে। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে এ ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না। যেমন তার নিজের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে তাকে অভিযুক্ত করা যায় না।

কিভাবে অভিযুক্ত করা যাবে, অথচ তার বক্তব্য তার নিজের ক্ষেত্রে এমনিতেই গ্রহণযোগ্য, যদিও অপরজনের সাক্ষ্য নাকচ হয়ে যায় (আর অন্য একজন ন্যায়বান সাক্ষী তার সাথে যোগ দেয়) সুতরাং তোহমত বা অভিযোগের অবকাশ নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি স্থলবর্তী সাক্ষীগণ মূল সাক্ষীদের ন্যায়পরতা সত্যায়নের বিষয়ে নীরব থাকে, তবুও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর কাযী নিজে মূল সাক্ষীদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেবেন।

এটা আবু ইউসুফ (র) এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাই যদি তারা মূল সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতার সম্পর্কে না জানে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য স্থানান্তর করবে না। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, তাদের কর্তব্য ছিলো সাক্ষ্য স্থানান্তর করা, ন্যায়পরতার সত্যায়ন নয়। কেননা বিষয়টি তাদের অজ্ঞাত থাকতে পারে। যখন তারা সাক্ষ্য স্থানান্তর করবে তখন কাযী তাদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে (অন্যাদের কাছে) খোঁজ খবর নেবেন, যেমন তারা নিজেরা উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্যদান করে নিতেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মূল সাক্ষীরা যদি সাক্ষ্য অস্বীকার করে তাহলে স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা দুই খবরের মাঝে বিরোধ হওয়ায় সাক্ষ্য বহন করানো সাব্যস্ত হবে না। অথচ (স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য) সেটাই হলো শর্ত।

কোন দুই ব্যক্তি যদি এই সাক্ষ্য দেয় যে, অন্য দু'জন ব্যক্তি অমুকের মেয়ে অমুক, যার গোত্র এই-বিপক্ষে তার এক হাজার দিরহামের সাক্ষ্য প্রদান করেছে, আর স্থলবর্তী সাক্ষীদ্বয় বলে যে, মূল সাক্ষীদ্বয় ঐ মেয়েকে চেনে বলে আমাদেরকে অবহিত করেছে, অতঃপর বাদী একজন স্ত্রীলোককে হাজির করে আর স্থলবর্তী সাক্ষীদ্বয় বলে যে, আমরা জানি না যে, এ মেয়েই সে মেয়ে কিনা; তখন বাদীকে বলা হবে যে, তুমি দু'জন সাক্ষী হাজির করো, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, এ মেয়েই অমুক মেয়ে।

কেননা পিতৃপরিচয় ও গোত্র পরিচয় দ্বারা পরিচয়কৃত স্ত্রীলোকের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে বাদী উপস্থিত স্ত্রী লোকটির বিরুদ্ধে হক দাবী করছে। অথচ হতে পারে যে, উপস্থিত স্ত্রী লোকটি সেই স্ত্রীলোক নয়। সুতরাং উপস্থিত স্ত্রীলোকটিকে ঐ পিতৃপরিচয় দ্বারা পরিচায়িত করা অপরিহার্য।

এর উদাহরণ এই যে, যখন একটি চৌহাদ্দিসপন্ন জমি বিক্রির সাক্ষ্য সাক্ষীরা ধারণ করে এবং জমিটির চৌহাদ্দি বর্ণনা করা হয় (আর ক্রেতা ঐ চৌহাদ্দিসম্পন্ন জমি তার দখলে থাকার কথা অস্বীকার করে) এবং সাক্ষীরা ক্রেতার বিপক্ষে সাক্ষী দান করে তখন অন্য দু'জন সাক্ষীর অনিবার্য হবে যারা এই সাক্ষ্য দান করে যে, উক্ত চৌহাদ্দি সম্পন্ন জমিটি ক্রেতার কব্জায় রয়েছে। তদ্রূপ একই বিধান হবে যদি বিবাদী সাক্ষ্যে বর্ণিত সীমানাকে তার কব্জাভুক্ত জমির সীমানা বলে অস্বীকার করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এক কাযীর নামে অন্য কাযীর (এই মর্মে লিখিত) পত্র সম্পর্কে একই হুকুম।

কেননা এই পত্র সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের সমতুল্য। তবে পূর্ণ ধার্মিকতার কারণে এবং পূর্ণ কর্তৃত্বের কারণে কাযী সাক্ষ্য স্থানান্তর করার একক ক্ষমতা রাখেন।

এ দুটি ক্ষেত্রে যদি সাক্ষীগণ তামীমী গোত্রের মেয়ে বলে উল্লেখ করে, তাহলে জায়িয হবে না, যতক্ষণ না তার বিশেষ শাখা গোত্রের নাম উল্লেখ করবে। শাখা গোত্র অর্থ বিশেষ বংশ।

এটা জায়েয না হওয়ার কারণ এই যে, এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পরিচায়ন অপরিহার্য। আর বৃহৎ ও সাধারণ গোত্র উল্লেখ দ্বারা পরিচয় অর্জিত হয় না। আর বনুতামীমের সাথে সম্পৃক্ততা হিসাবে সে সাধারণ পরিচয়ের স্ত্রীলোক হয়ে যাবে। (বিশেষ পরিচয়ের স্ত্রীলোক হবে না) কেননা বনুতামীম হলো অসংখ্য লোক সমষ্টির গোত্র। পক্ষান্তরে গোত্রের উল্লেখ দ্বারা পরিচয় অর্জিত হয়। কারণ শাখাটি বিশেষ গোত্র।

কেউ কেউ বলেছেন, ফারগানা হলো সাধারণ পরিচয়, পক্ষান্তরে আওয জোন্দিয়া হলো বিশিষ্ট পরিচয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন : সামারকান্দ ও বোখরা হলো সাধারণ পরিচয় আর কেউ কেউ বলেন, ছোট গলি হলো বিশিষ্ট পরিচয়। পক্ষান্তরে বড় মহল্লা এবং শহর হলো সাধারণ পরিচয়।

আর যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর নিকট যদিও দাদার নামল্লোখ দ্বারা পরিচয় পূর্ণ হয় আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ভিন্নমত পোষণ করেন (এবং বলেন যে, শুধু পিতার নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট।) তবে শাখাগোত্র হচ্ছে সম্প্রদায়ের আদি পিতামহ। সুতরাং তিনি নিকটতম পিতামহের স্থলবর্তী হবেন।

অনুচ্ছেদ

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, "আমি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীকে বাজারে ঘুরিয়ে রাষ্ট্র করার নির্দেশ দিব, সাজা প্রদানের নির্দেশ দিব না।" আর সাহেবায়ন বলেন, আমরা প্রহার দ্বারা কষ্ট দিব এবং আটক করব।

ইমাম শাফেয়ী (র) এরও এই মত। সাহেবায়নের দলীল হলো, হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীকে তিনি চল্লিশ দোররা মেরেছেন এবং তার মুখে কালি মেখেছেন। তাছাড়া এই কারণে যে, এটি একটি মহা অপরাধ, যার ক্ষতি অন্য মানুষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। আর তাতে শরীয়ত নির্ধারিত কোন শাস্তি বা হদ্দ নেই। সুতরাং শাসকের বিবেচনায় নির্ধারিত শাস্তি (বা تعزير) দেওয়া হয়।

আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, (সাহাবা আমলের) কাযী শোরায়হ মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীকে রাষ্ট্র করতেন, প্রহার করতেন না।

তাছাড়া এই কারণে যে, রাষ্ট্র করা দ্বারা সতর্কীকরণ অর্জিত হয়। সুতরাং তা-ই যথেষ্ট বিবেচনা করা হবে। আর প্রহার যদিও সতর্কীকরণের চূড়ান্ত পর্যায়; কিন্তু তা সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। সুতরাং এই দিকে লক্ষ্য রেখে লঘুকরণ অনিবার্য। আর দোররার সংখ্যা চল্লিশে পৌছানো এবং মুখে কালি মাখা প্রমাণ করে যে, ওমর (রা) সম্পর্কিত ঘটনাটি বিশেষ শাসনের অর্থে প্রযোজ্য।

আর تشهير বা রাষ্ট্র করার ব্যাখ্যা কাযী শোরায়হ থেকে বর্ণিত হয়েছে। কেননা তিনি লোকটি বাজারের হলে তাকে আছরেব পর যখন সবচেয়ে বেশী লোক সমাগম হয় সেই সময় বাজারে পাঠিয়ে দিতেন, আর বাজারের লোক নাহলে তাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আর প্রেরিত লোকেরা ঘোষণা করতো যে, কাযী শোরায়হ তোমাদেরকে সালাম বলেছেন আর বলেছেন যে, এই লোকটিকে আমরা মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী রূপে পেয়েছি; সুতরাং তোমরা নিজেরাও তার সম্পর্কে সতর্ক থাকো; এবং লোকদেরকেও তার সম্পর্কে সতর্ক রাখ।

শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র) বলেন, সাহেবায়নের মতেও রাষ্ট্র করা হবে। আর সাহেবায়নের মতে সাজারও পরিমাণ এবং আটকের মেয়াদ কাযীর বিবেচনার উপর নির্ভর করবে। আর সাজার ধরণ সেটাই হবে, যা আমরা হদ্দ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

আর জামে ছাগীরে বলা হয়েছে যে, দু'জন সাক্ষী স্বীকার করলো যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, তাদেরকে প্রহার করা হবে না। কিন্তু সাহেবায়নের মতে প্রহার করা হবে।

জামে ছাগীরের এই বক্তব্যের অর্থ এই যে, আমরা (রাষ্ট্র করা বা আটক করার) যে বিধান উল্লেখ করেছি সে বিধানের ক্ষেত্রে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীরূপে সেই বিবেচিত হবে যে এ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে বাইয়েনাহ বা সাক্ষ্য দ্বারা তা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। কেননা সেটা হবে সাক্ষ্যকে নাকচ করা। আর 'বাইয়েনা' উপস্থাপিত হয় বিধান সাব্যস্ত করার জন্য (নাকচ করার জন্য নয়)। আল্লাহই অধিক অবগত।

كِتَابُ الرُّجُوْعِ عَنِ الشَّهَادَاتِ

অধ্যায় ঃ সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসঙ্গ

كِتَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَاتِ

অধ্যায় ঃ সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসঙ্গ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সাক্ষীগণ যদি সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদানের পূর্বে তা প্রত্যাহার করে, তাহলে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা রায় প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষ্য সাব্যস্ত হয়। আর কাযী (সাক্ষীর) স্ববিরোধী বক্তব্য অনুযায়ী রায় প্রদান করতে পারেন না। আর সাক্ষীদ্বয়ের উপর কোন ক্ষতিপূরণের দায় আরোপিত হবে না।

কেননা তারা বাদী কিংবা বিবাদীর কোন হক নষ্ট করেনি।

আর যদি কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করে ফেলেন, এরপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তাহলে কাযীর রায় বাতিল হবে।

কেননা তাদের বক্তব্যের শেষ অংশ প্রথম অংশের বিপরীত রয়েছে; সুতরাং স্ববিরোধী হওয়ার কারণে রায় বাতিল।

তাছাড়া সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে শেষ অংশটি প্রথম অংশের সমতুল্য। আর প্রথম অংশটি আদালতের রায়যুক্ত হওয়া দ্বারা অগ্রগণ্যতা অর্জন করেছে।

আর তারা তাদের সাক্ষ্য দ্বারা যে হক নষ্ট করেছে তার ক্ষতিপূরণ তাদের উপর আরোপিত হবে।

কেননা ক্ষতিপূরণের হেতু সম্পর্কে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে।

আর বিরোধিতা স্বীকারোক্তির বৈধতা রহিত করেনা। পরবর্তীতে বিষয়টি আমরা প্রতিষ্ঠিত করবো।

আর কাযীর উপস্থিতি ছাড়া প্রত্যাহার বৈধ নয়।

কেননা প্রত্যাহার অর্থ সাক্ষ্য রহিত করণ। সুতরাং সাক্ষ্য যেমন কাযীর মজলিসের সাথে বিশিষ্ট, তেমনি এটাও তার সাথে বিশিষ্ট হবে, যে কোন কাযীর মজলিস হোক।

তাছাড়া প্রত্যাহার অর্থ হলো (মিথ্যা কথনের অপরাধ থেকে) তাওবা করা। আর তাওবা অপরাধ অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং গোপন তাওবা হবে গোপন অপরাধের ক্ষেত্রে আর প্রকাশ্য তাওবা হবে প্রকাশ্য অপরাধের ক্ষেত্রে।

আর কাযীর মজলিসের বাইরে প্রত্যাহার **যখন** বৈধ হলো না **তখন** যার **বিরুদ্ধে** সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে, সে যদি সাক্ষীরা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে বলে দাবী করে আর তাদের হলফ করাতে চায়, সেক্ষেত্রে তাদেরকে হলফ করানো হবে না। তদ্রূপ তাদের বিরুদ্ধে তার উপস্থাপিত সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা সে একটি 'বাতিল প্রত্যাহারের' কথা দাবী করেছে।

পক্ষান্তরে যদি সে এই মর্মে বাইয়েনা বা সাক্ষ্য উপস্থাপন করে যে, অমুক কাযীর মজলিসে সে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে আর কাযী তার উপর ক্ষতিপূরণের দায় আরোপ করেছে তাহলে তার বাইয়েনাহ গ্রহণ করা হবে।

কেননা (বাইয়েনাহ গ্রহণ করার) হেতুটি বিশুদ্ধ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দুজন সাক্ষী যদি (কারো বিপক্ষে) কোন মালের সাক্ষ্য প্রদান করে আর কাযী সেই মাল সম্পর্কে (বিবাদীর বিপক্ষে) রায় প্রদান করেন, এরপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তারা যার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে তার অনুকূলে ঐ মালের ক্ষতিপূরণ বহন করবে।

কেননা 'অন্যায় স্বরূপ কারণ সৃষ্টি করণ' ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়ার হেতু। কূপ খননকারী যেমন। আর তারা অন্যায় রূপে মাল নষ্ট করার কারণ সৃষ্টি করেছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সাক্ষীদ্বয় যামীন হবে না। কেননা তাঁর মতে সরাসরি সম্পৃক্ততা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কারণ সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচ্য নয়।

আমাদের দলীল এই যে, সরাসরি সম্পৃক্ততা কারীর (কাযীর) উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি রায় প্রদানের ব্যাপারে (সাক্ষীদ্বয়ের পক্ষ হতে) বাধ্যকৃত ব্যক্তির ন্যায়। আর তার উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করার অর্থ হলো মানুষকে বিচার-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত রাখা। তদ্রূপ বাদীর কাছ থেকে তা উশুল করা সম্ভব নয়। কেননা আদালতের রায় কার্যকর হয়েছে। সুতরাং কারণ সৃষ্টি করণের বিষয়টিই বিবেচ্য হবে। অবশ্য তারা ক্ষতিপূরণ দান করবে যদি বাদী মাল কবজা করে থাকে। সেই মাল নির্ধারিত বস্তু হোক কিংবা অনির্ধারিত হোক।

কেননা বাদীর হস্তগত করা দ্বারা বিবাদীর মাল নষ্ট করা সম্পন্ন হয়। তাছাড়া নির্ধারিত বস্তু উশুল করা আর অনির্ধারিত বস্তুর দায় আরোপ করার মাঝে সাদৃশ্য নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সাক্ষীদ্বয়ের একজন যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে সে অর্ধেক মালের যামিন হবে।

এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, প্রত্যাহারের ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয় হলো যারা বাকি রয়েছে, তাদের বাকি থাকা; যারা প্রত্যাহার করেছে তাদের প্রত্যাহার বিবেচ্য নয়। আর এ ক্ষেত্রে যে তার সাক্ষীর উপর বহাল রয়েছে, তার বহাল থাকার কারণে প্রাপ্য হক এর অর্ধেক বহাল রয়েছে।

আর যদি মাল সম্পর্কে তিনজন সাক্ষ্য প্রদান করে অত:পর একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না। কেননা যারা তাদের সাক্ষ্যের উপর বহাল রয়েছে, তাদের বহাল থাকার কারণে পূর্ণ হক বহাল রয়েছে। এর কারণ এই যে, 'প্রমাণ' বহাল থাকার কারণে সাক্ষ্য বস্তুর প্রাপ্যতা বহাল রয়েছে।

আর বাদীর নষ্টকৃত জিনিসটির যখন হকদার বের হয় তখন (নষ্টকারীর উপর বাদীর অনুকূলে যে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয়েছিলো, সেই) ক্ষতিপূরণ রহিত হয়ে যায়। সুতরাং (সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার উপর) হতে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত না হওয়া আরো স্বাভাবিক হবে।

তবে পরবর্তীতে যদি অন্য একজন প্রত্যাহার করে তাহলে উভয় প্রত্যাহারকারী অর্ধেক হক -এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। কেননা তাদের একজনের বহাল থাকা অর্ধেক হককে বহাল রাখে।

আর যদি একজন ও দুজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য প্রদান করে তারপর একজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে হকের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

কেননা যারা বহাল রয়েছে, তাদের বহাল থাকার কারণে হকের তিন চতুর্থাংশ বহাল রয়েছে।

আর যদি উভয় স্ত্রীলোক প্রত্যাহার করে তাহলে অর্ধেক হকের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। কেননা পুরুষটির সাক্ষ্যের কারণে অর্ধেক হক বহাল রয়েছে।

আর যদি একজন পুরুষ এবং দশজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য প্রদান করে; অত:পর আটজন স্ত্রীলোক প্রত্যাহার করে, তাহলে তাদের উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না।

কেননা এই পরিমাণ সাক্ষী বিদ্যমান রয়েছে, যাদের সাক্ষ্য দ্বারা পুরো হক বহাল থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এর পর যদি আরো একজন প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের উপর হকের এক চতুর্থাংশ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কেননা হকের অর্ধেক বিদ্যমান রয়েছে পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা। আর চতুর্থাংশ বিদ্যমান রয়েছে অবশিষ্ট এক মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা। সুতরাং তিন চতুর্থাংশ বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি এক পুরুষ সাক্ষী এবং দশ মহিলা সাক্ষী সবাই প্রত্যাহার করে তাহলে পুরুষের উপর হক এর এক ষষ্ঠাংশের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে; আর স্ত্রীলোকদের উপর হক -এর পাঁচ ষষ্ঠাংশ সাব্যস্ত হবে। আর সাহেবায়ন বলেন, পুরুষের উপর অর্ধেক আর স্ত্রীলোকদের উপর অর্ধেক সাব্যস্ত হবে। কেননা তারা সংখ্যায় যত অধিক হোক, একজন পুরুষেরই স্থলবর্তী হয়। এজন্যই একজন পুরুষের সংযুক্তি ছাড়া তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, প্রত্যেক দুই স্ত্রীলোক একজন পুরুষের স্থলবর্তী হয়েছে। (কেননা) স্ত্রীলোকদের বুদ্ধির ত্রুটি সম্পর্কে নবী (সা) বলেছেন,

عدلت شهادة اثنين منهن بشهادة رجل واحد

তাদের মধ্য দু'জনের সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমতুল্য করা হয়েছে।

সুতরাং বিষয়টি এমনই হলো, যেন ছয়জন পুরুষ সাক্ষ্য দান করলো অত:পর তারা প্রত্যাহার করলো।

আর যদি পুরুষের পরিবর্তে শুধু দশজন স্ত্রীলোক প্রত্যাহার করে তাহলে উভয় মতেই তাদের উপর অর্ধেক হক (এর ক্ষতিপূরণ) সাব্যস্ত হবে। এর কারণ আমরা বলে এসেছি (যে, যারা বহাল থাকে, তাদের বহাল থাকাই হলো বিবেচ্য)।

আর যদি দুজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক কোন মাল সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করে, অত:পর তারা (সকলে) প্রত্যাহার করে তাহলে পুরুষদ্বয়ের উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে, স্ত্রীলোকের উপর নয়। কেননা একজন স্ত্রীলোক সাক্ষী নয়, বরং সাক্ষীর অংশ বিশেষ। সুতরাং ঐ অংশ বিশেষের দিকে হুকুমকে সম্পৃক্ত করা হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দু'জন সাক্ষী যদি কোন স্ত্রীলোকের বিপক্ষে মোহরে মিছলের বিনিময়ে বিবাহের সাক্ষ্য প্রদান করে অত:পর তারা প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না।

তদ্রূপ একই বিধান হবে যদি মোহরে মিছলের কম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে। কেননা (তালাকের মাধ্যমে) নষ্ট করার ক্ষেত্রে সম্ভোগ অংগের লাভ মূল্য সম্পন্ন বিষয় নয়। কারণ মৌল ফিকাহ শাস্ত্রে একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ক্ষতিপূরণ আরোপ (উভয়ের মাঝে) সদৃশ্যতা দাবী করে। (অথচ মাল ও সম্ভোগ অংগের লাভ এদুয়ের মাঝে সদৃশতা নেই।) অবশ্য সম্ভোগ অংগের মালিকানা অর্জনের সময় এটাকে ক্ষতিপূরণযোগ্য ও মূল্য সম্পন্ন করা হয়। কেননা সম্ভোগ অংগের মর্যাদা প্রকাশের জন্য মালিকানা লাভের অনিবার্য প্রয়োজনে সেটা মূল্যসম্পন্ন বলে সাব্যস্ত হয়।

তদ্রূপ (ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না) যদি সাক্ষীদ্বয় কোন পুরুষের বিপক্ষে কোন নারীকে মোহরে মিছলের বিনিময়ে বিবাহ করার সাক্ষ্য প্রদান করে।

কেননা এটা হলো (সম্ভোগ অংগের লাভের) বিনিময় -এর বিপরীতে (স্বামীর) মাল নষ্টকরণ। কারণ (স্বামীর) মালিকানায় প্রবেশের সময় সম্ভোগ অংগ মূল্য সম্পন্ন বলে বিবেচিত হয়। আর বিনিময়ের বিপরীতে নষ্ট করা, নষ্ট না করার ন্যায়। এর কারণ এই যে, ক্ষতিপূরণের ভিত্তি হলো সদৃশ্যতার উপর। আর বিনিময়ের বিপরীতে নষ্ট করা এবং বিনিময় শূন্যতার বিপরীতে নষ্ট করার মাঝে কোন সদৃশ্যতা নেই।

পক্ষান্তরে যদি মোহরে মিছলের চেয়ে বেশী সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে, অত:পর প্রত্যাহার করে তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

কেননা অতিরিক্ত পরিমাণটুকু তারা বিনিময় ছাড়া নষ্ট করেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি তারা সম মূল্যের বিনিময়ে কিংবা তার চেয়ে বেশী মূল্যের বিনিময়ে কোন বস্তুর বিক্রয় সম্পর্কে (বিক্রেতার বিপক্ষে) সাক্ষ্য প্রদান করে, অত:পর প্রত্যাহার করে, তাহলে তারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না।

কেননা বিনিময়ের দিকে লক্ষ্য করলে গুণগতভাবে এটা নষ্টকরণ নয়।

আর যদি সম মূল্যের কমের বিনিময়ে বিক্রয়ের সাক্ষ্য দেয় তাহলে কমটুকুর ক্ষতিপূরণ দেবে।

কেননা এই অংশটুকু তারা বিনিময় ছাড়া নষ্ট করেছে। আর বিক্রয় চূড়ান্ত হোক কিংবা তাতে বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকুক, এদুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

কেননা (মালিকানা বিলুপ্তকারী) করণ হচ্ছে পূর্ববর্তী বিক্রয়। সুতরাং ইচ্ছাধিকার রহিত হওয়ার সময় মালিকানা বিলুপ্তির বিধান ঐ কারণের সংগেই সম্পৃক্ত হবে। নষ্ট হওয়ার বিষয়টি সাক্ষীদ্বয়ের দিকেই সম্পৃক্ত হবে।

আর যদি তারা কোন পুরুষ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তার স্ত্রীকে সহবাসের (বা একান্ত মিলনের) পূর্বে তালাক দিয়েছে, অত:পর তারা প্রত্যাহার করে, তাহলে তারা অর্ধেক মোহরের যামিন হবে।

কেননা তারা দু'জন এমন একটি আর্থিক দায়কে নিশ্চিত করেছে, যা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা মুখে ছিলো। তুমি কি দেখো না যে, তার স্ত্রী যদি স্বামীর পুত্রকে 'প্রশ্রয়' দিতো কিংবা ধর্মত্যাগ করতো তাহলে মোহর সম্পূর্ণত:ই রহিত হয়ে যেতো।

তাছাড়া একান্ত মিলনের পূর্বে সংঘটিত বিচ্ছেদ গুণগতভাবে আকদ (বা বিবাহ চুক্তি) রহিত হওয়ার সমতুল্য। সুতরাং তা সমস্ত মোহর রহিত হওয়াকে অবশ্য সাব্যস্ত করবে। যেমন বিবাহ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। অত:পর 'মুতআ' বা উপঢৌকন হিসাবে অর্ধেক মোহর নতুনভাবে অবশ্য সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তাদের সাক্ষ্যের কারণেই তা ওয়াজিব হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তার গোলামকে আযাদ করেছে, অত:পর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে গোলামের বাজার মূল্যের যামিন হবে।

কেননা তারা কোন বিনিময় ছাড়াই মনিবের জন্য গোলামটির 'মূল্যমান' নষ্ট করেছে। তবে 'ওয়ালা' আদায়কারীর অনুকূলে সাব্যস্ত হবে। কেননা এই ক্ষতিপূরণ দানের কারণে 'মুক্তিদান' তাদের দিকে রূপান্তরিত হবে না। সুতরাং 'ওয়ালা' সম্পর্কও তাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না।

আর যদি তারা কিছাছ সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে; অত:পর কতলের পরে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে দিয়তের দায় বহন করবে। তবে তাদের থেকে কিছাছ নেওয়া হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তাদের থেকে কিছাছ নেওয়া হবে। কেননা কারণ সৃষ্টির দিক থেকে তাদের পক্ষ থেকে 'হত্যাকরণ' পাওয়া গেছে। সুতরাং হত্যাকান্ডের ব্যাপারে বাধ্যকৃত ব্যক্তির ন্যায় হলো। বরং (কতলের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের কারণত্ব) আরো অধিক। কেননা অভিভাবককে তো (কিছাছ উশুল করার ব্যাপারে) সাহায্য করা হয়। পক্ষান্তরে কতলের ব্যাপারে বাধ্যকৃত ব্যক্তিকে নিষেধ করা হয়।

আমাদের দলীল এই যে, সাক্ষীদের থেকে প্রত্যক্ষভাবে 'কতল' পাওয়া যায়নি, তদ্রূপ কারণ সৃষ্টিগত দিক থেকেও তা পাওয়া যায়নি। কেননা سبب বা কারণ হলো (ঐ গুণগত অবস্থা) যা সাধারণত: কতল পর্যন্ত উপনীত করে। অথচ এখানে সে পর্যন্ত উপনীত করে না। কেননা মাফ করে দেওয়া হলো শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসতাহাব।

পক্ষান্তরে বাধ্যকৃত ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দৃশ্যত: সে নিজের জীবনকেই অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

তাছাড়া (সাক্ষীগণ যদি কতলের কারণ হয়ও তবু অভিভাবকদের) স্বেচ্ছাকৃত কর্ম অন্য দিকে সম্পৃক্ততাকে রহিত করে। তাছাড়া সন্দেহের পর্যায় থেকে কম তো নয়ই। আর সন্দেহ কিছাছকে রহিত করে। মাল বা দিয়তের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সন্দেহ সত্ত্বেও তা সাব্যস্ত হয়। অবশিষ্ট আলোচনা (ফকীহ আবুল লাইছকৃত) مختلف কিতাবে জানা যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্থলবর্তী সাক্ষীগণ যদি প্রত্যাহার করে তাহলে তারা 'সাক্ষ্য বস্তুর' ক্ষতিপূরণ দান করবে।

কেননা কাজির মজলিসে সাক্ষ্যদান তাদের পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়েছে। সতুরাং সাক্ষ্যবস্তু নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তাদের সাথেই সম্পৃক্ত হবে।

আর যদি মূল সাক্ষীগণ প্রত্যাহার করে এবং বলে যে, আমরা স্থলবর্তী সাক্ষী (রূপে কথিত ব্যক্তি) দেরকে আমাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী বানাইনি, তাহলে তাদের উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না। কেননা তারা 'কারণ' অস্বীকার করেছে। আর কারণ হলো তাদের পক্ষ হতে নিজেদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে সাক্ষী বানানো। তবে বিচারের রায় বাতিল হবে না। কেননা তা হলো সত্য-মিথ্যার সম্ভাবনা সম্পন্ন একটি খবর। সুতরাং (রায় ঘোষণার পর) সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাহার সমতুল্য হলো। রায় ঘোষণার পূর্বে হলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। (কেননা মূল সাক্ষীদের পক্ষ হতে সাক্ষ্য বহন করানো অপরিহার্য; অথচ তারা তা অস্বীকার করছে।)

আর যদি তারা বলে যে, আমরা তাদেরকে সাক্ষী বানিয়েছি, তবে আমরা ভুল করেছি, তাহলে তারা ক্ষতিপূরণ দান করবে।

এটা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না। কেননা রায় জারি হয়েছে স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা। কারণ কাযী তো ফায়সালা করবেন যে প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছেন, সে আলোকে। আর সেটা হলো স্থলবর্তীদের সাক্ষ্য।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলীল এই যে, স্থলবর্তী সাক্ষীরা তো মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে কাযীর মজলিসে নকল করেছে। সুতরাং এমন হলো যেন তারা নিজেরা উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্যদান করলো, (অত:পর দ্বিতীয়বার উপস্থিত হয়ে প্রত্যাহার করলো)।

আর যদি মূল সাক্ষী ও স্থলবর্তী সাক্ষী সবাই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে শায়খায়নের মতে শুধু স্থলবর্তী সাক্ষীদের উপরই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। অন্য কারো উপর নয়। কেননা তাদের সাক্ষ্য দ্বারা বিচার সম্পন্ন হয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে যার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে, তার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে মূল সাক্ষীদের দায়বদ্ধ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে স্থলবর্তীদের দায়বদ্ধ করতে পারে। কেননা শায়খায়ন যে দিক উল্লেখ করেছেন সেই দিক হিসাবে স্থলবর্তীদের সাক্ষ্য দ্বারা বিচার সম্পন্ন হয়েছে। আবার মুহম্মদ (র) যে দিক উল্লেখ করেছেন, সে হিসাবে মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং তার এই দুই দলের মাঝে যাকে ইচ্ছা যামীন বানানের এখতিয়ার থাকবে।

আর যেহেতু উল্লেখিত দিক দুটি পরস্পর বিপরীত, সেহেতু ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে একত্র করা হবে না।

আর (বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর) যদি স্থলবর্তী সাক্ষীরা বলে যে, মূল সাক্ষীরা এ বিষয়ে মিথ্যা বলেছে কিংবা ভুল বলেছে, তাহলে তাদের কথার প্রতি কর্ণপাত করা হবে না। কেননা যে বিচার কার্যকর হয়ে গেছে তা তো তাদের কথায় নাকচ হবে না। তবে তাদের উপর ক্ষতিপূরণও সাব্যস্ত হবে না। কেননা তারা তো তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেনি। বরং অন্যদের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সত্যায়নকারীরা যদি সত্যায়ন প্রত্যাহার করে তাহলে তারা ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, তারা ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে না।

কেননা তারা সাক্ষীদের সম্পর্কে ভাল প্রশংসা করেছিলো। সুতরাং তারা যিনার অভিযুক্ত ব্যক্তির محصن (বা বিবাহিত ও রজমযোগ্য) হওয়ার সাক্ষ্যদানকারীদের মত হলো।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, সত্যায়নই সাক্ষ্যকে 'কার্যকর' করে। কেননা কাযী তো সত্যায়ন ছাড়া সাক্ষ্য অনুযায়ী ফায়সালা করেন না। সুতরাং সেটা 'হেতুর হেতু' -এর মত হলো।

محصن হওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারীদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো ব্যভিচারের বিধানের জন্য একটি শর্ত মাত্র।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দুজন সাক্ষী যদি শর্ত আরোপের সাক্ষ্য প্রদান করে, আর অন্য দু'জন সাক্ষী শর্ত পূর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং পরে সবাই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তাহলে ক্ষতিপূরণ শুধু শর্ত আরোপের সাক্ষ্যের উপর সাব্যস্ত হবে।

কেননা শর্ত আরোপই হলো (বিধান আরোপিত হওয়ার) কারণ। আর নষ্টতার কারণ (বা سبب)-এর অস্তিত্ব সাব্যস্তকারীদের দিকেই সম্পৃক্ত হবে। নিছক শর্ত এর অস্তিত্ব সাব্যস্তকারীদের দিকে নয়। দেখুন না, কাযী তো শর্ত আরোপের সাক্ষ্যর ভিত্তিতেই রায় জারি করেন, শর্ত এর অস্তিত্বের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নয়।

আর যদি শুধু শর্ত এর অস্তিত্বের প্রত্যাহার করে তাহলে এর বিষয়ে মাশায়েখদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে।

আর মাসআলাটির স্বরূপ গোলাম আযাদ ও সহবাস পূর্ব তালাক সংক্রান্ত শর্ত আরোপ।

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

অধ্যায় ঃ ওয়াকালাহ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে কোন চুক্তি মানুষ নিজে সম্পন্ন করতে পারে সেটা সম্পন্ন করার জন্য অন্যকে সে ওকীল নিযুক্ত করতে পারে।

কেননা বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষ কখনো কখনো নিজে কার্য সম্পাদন করতে অপারগ হয়ে যায়। তখন সে ঐ বিষয়ে অন্যকে ওকীল বানানোর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। তাই প্রয়োজন পূরণের জন্য তার অবকাশ থাকবে।

আর বিশুদ্ধ রূপে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী (সা) হাকীম বিন হিযামকে খরিদ করার ওকীল নিযুক্ত করেছিলেন। আর উমর বিন উম্মে সালামাকে (তার মা উম্মে সালামাকে) বিবাহের জন্য ওকীল নিযুক্ত করেছিলেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যাবতীয় হক এর ক্ষেত্রে স্বপক্ষ সমর্থনের ওকীল নিযুক্ত করা জায়িয রয়েছে।

কারণ সেই প্রয়োজন, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কেননা প্রত্যেকে স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের সব ব্যাপার বুঝতে পারে না। আর বিশুদ্ধ রূপে প্রমাণিত রয়েছে যে, আলী (রা) আকীল (বিন আবু তালিব)-কে স্বপক্ষে প্রমাণের ওকীল নিযুক্ত করেছিলেন। আর আকীল বয়োবৃদ্ধ হওয়ার পর আবদুল্লাহ্ বিন জাফরকে ওকীল নিযুক্ত করে ছিলেন।

তদ্রূপ হদ্দসমূহ ও কিছাছ ছাড়া অন্যান্য হক আদায়ের জন্য ও উশুল করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করা জায়িয রয়েছে। ঐ দুটি উশুল করার ক্ষেত্রে ওকীল নিযুক্ত করা বৈধ নয়, যদি মওয়াক্কিল (হক উশুলের) মজলিসে অনুপস্থিত থাকে।

কেননা এ দুটি সামান্য সন্দেহের সম্ভাবনা দ্বারা রহিত হয়ে যায়। আর মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে ক্ষমার সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে। বরং শরীয়তের উৎসাহ দানের প্রেক্ষিতে এ-ই স্পষ্ট।

সাক্ষীদের অনুপস্থিতির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সাক্ষ্য প্রত্যাহার না করাই স্বাভাবিক।

তদ্রূপ মুওয়াক্কিলের উপস্থিতির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এই সন্দেহ রহিত হয়ে যায়। আর প্রত্যেকে হক উশুল করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং যদি এ বিষয়ে ওকীল নিয়োগ নিষেধ করা হয়, তাহলে হক উশুল করার রাস্তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।

আর এই যা কিছু উল্লেখ করলাম, তা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, সাক্ষী পেশ করার মাধ্যমে হদ্দ ও কিছাছ প্রমাণ করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করাও বৈধ নয় (যেমন উশুল করার ক্ষেত্রে বৈধ নয়)।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অনুকূলে। আর কারো কারো মতে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অনুকূল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এই মতপার্থক্য হলো মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, উপস্থিতির ক্ষেত্রে নয়। কেননা মুওয়াক্কিলের উপস্থিতির ক্ষেত্রে ওকীলের বক্তব্য মুওয়াক্কিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং এমন হলো যেন সে নিজেই বক্তব্য প্রদান করছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, ওকীল নিযুক্ত করার অর্থ হলো নায়েব ও স্থলবর্তী নিযুক্ত করা। অথচ হদ্দ ও কিছাছের ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতার সন্দেহও পরিহার করা কর্তব্য। যেমন (এবিষয়ে) সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে। তদ্রূপ (যেমন) হদ্দ ও কিছাছ উশুল করার ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে,দাবী উত্থাপন হলো (হদ্দ ও কিছাছ সাব্যস্ত করার জন্য) নিছক শর্ত। কেননা অপরাধের প্রকাশ সাক্ষ্যের দিকে সম্পৃক্ত হয়। (সাব্যস্ত করার আইনী প্রয়াসের দিকে নয়)। সুতরাং অন্য সব হক -এর ন্যায় এক্ষেত্রেও ওকীল নিয়োগ চলবে।

যার বিরুদ্ধে হদ্দ বা কিছাছের দাবী উত্থাপিত হয়েছে, তার পক্ষ থেকে জবাব দিহি করার ওকীল নিযুক্ত করার বিষয়টি একই রকম মতপার্থক্যপূর্ণ।

আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল অধিকতর স্পষ্ট। কেননা (অন্যের দাবী) রোধ করার ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ বাধা সৃষ্টি করে না।

তবে মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে ওকীলের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এক্ষেত্রে এ সম্পর্কে আদেশ প্রদান না করার সন্দেহ রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া (মামলার কিংবা সাফাইয়ের ওকীল নিয়োগ বৈধ নয়। তবে যদি মুওয়াক্কিল অসুস্থ হয় কিংবা তিনদিন বা ততোধিক দূরত্বে অনুপস্থিত থাকে।

সাহেবায়ন বলেন, প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়াও ওকীলের নিযুক্তি বৈধ হবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-এরও এই মত।

নিযুক্তির বৈধতা সম্পর্কে মতভিন্নতা নয়, বরং মতভিন্নতা হলো (প্রতিপক্ষের উপর) বাধ্যতামূলক হওয়া সম্পর্কে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, এটা হলো সম্পূর্ণতঃ তার নিজস্ব হক এর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ। সুতরাং অন্যের সম্মতির উপর তা নির্ভর করবে না। যেমন ঋণ উশুল করার ব্যাপারে ওকীল নিযুক্তকরণ।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, জওয়াব তলব করা হচ্ছে প্রতিপক্ষের কাছে বাদীর প্রাপ্য অধিকার। একারণেই বাদী কাযীর মজলিসে প্রতিপক্ষের উপস্থিতি দাবী করতে পারে। আর দাবী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বেশকম হয়ে থাকে। সুতরাং ওকীল নিযুক্তির বিষয়টিকে (প্রতিপক্ষের জন্য) বাধ্যতামূলক বলে রায় দিলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং সেটা তার সম্মতির উপর নির্ভর করবে। যেমন শরীকী গোলামের সাথে যদি দুই মনিবের একজন কিতাবাত চুক্তি করে তাহলে অপর জন ইচ্ছাধিকার লাভ করে।

অসুস্থ ও মুসাফিরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে জওয়াব তলব করা তাদের কাছে (বাদীর) প্রাপ্য অধিকার নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে যেমন মুসাফিরের পক্ষ হতে ওকীলের নিযুক্তি (প্রতিপক্ষের জন্য) বাধ্যতামূলক, তেমনি প্রয়োজন সাব্যস্ত হওয়ার কারণে সফরের এরাদা করলেও বাধ্যতামূলক হবে।

আর স্ত্রীলোক যদি এমন পর্দানশীন হয় যে, বাইরে বের হওয়া এবং কাযীর মজলিসে যাওয়ার অভ্যাস তার নেই, সে ক্ষেত্রে আবু বকর রাযী (র) বলেন, তার পক্ষ থেকে ওকীল নিযুক্তি বাধ্যতামূলক।

কেননা সে উপস্থিত হলেও লজ্জার কারণে নিজের হক সম্পর্কে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং তার ওকীল নিযুক্ত করা (প্রতিপক্ষের জন্য) জরুরী হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ফকীহগণ এ বক্তব্য পসন্দ করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওকীল নিয়োগ করার জন্য শর্ত এই যে, মুওয়াক্কিলকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যে কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা রাখে এবং সে কর্মের বিধান তার উপর কার্যকর হয়।

কেননা ওকীল মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হয়ে থাকে। সুতরাং মুওয়াক্কিল নিজে (ঐ পদক্ষেপ গ্রহণের) মালিক হতে হবে, যাতে সে অন্যকে মালিক বানাতে পারে।

আর এ-ও শর্ত যে, ওকীল এমন ব্যক্তি হতে হবে, যে চুক্তি কী তা বোঝে এবং এর ইচ্ছা করতে সক্ষম।

কেননা বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ওকীল মুওয়াক্কিলের স্থলবর্তী হয়ে থাকে। সুতরাং তার বক্তব্য দানের যোগ্য হওয়া শর্ত হবে। তাই যদি এমন নাবালক হয়, যে চুক্তির বোধ রাখে না, কিংবা পাগল হয় তাহলে তার ওকীল নিযুক্তি বাতিল হবে।

আর যদি আকেল বালেগ স্বাধীন ব্যক্তি কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম তাদের মত কাউকে ওকীল নিযুক্ত করবে তবে তা বৈধ।

কেননা এখানে মুওয়াক্কিল পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী আর ওকীলও বক্তব্য দানের যোগ্য।

অদ্রূপ যদি সে এমন নাবালককে যে ক্রয়-বিক্রয় বোঝে, যে নিষেজ্ঞাপ্রাপ্ত কিংবা নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত গোলামকে ওকীল নিযুক্ত করে তাহলে তা জায়িয হবে; তবে চুক্তির হক (ও বিধান) তাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না, বরং তাদের মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

কেননা এধরনের নাবালক তো বক্তব্যদানের যোগ্য। এ কারণেই তো তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তার পদক্ষেপ কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে গোলাম হলো নিজের উপর হস্তক্ষেপ করার যোগ্য ও অধিকারী। শুধু মনিবের ক্ষেত্রে সে এর অধিকারী নয়।

(তাই তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হয়েও স্থগিত থাকে।) আর তাকে ওকীল বানানো মনিবের হকে হস্তক্ষেপ নয়।

তবে এ দুজনের পক্ষ থেকে দায়গ্রহণ বৈধ নয়। নাবালকের ক্ষেত্রে এ জন্য যে,তার যোগ্যতা ক্রুটিপূর্ণ। আর গোলামের ক্ষেত্রে তার মনিবের হক বিদ্যমান থাকার কারণে। সুতরাং তা মুওয়াক্কিলের উপরই অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ক্রেতা যদি বিক্রেতার অবস্থা সম্পর্কে না জানে আর পরে জানতে পায় যে, সে নাবালক কিংবা (মাঝে মধ্যে দেখা দেয় এমন) পাগল কিংবা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত, তাহলে তার উক্ত চুক্তি বাতিল করার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

কেননা সে এই ধারণা বশত: চুক্তিতে প্রবেশ করেছে যে, তার প্রাপ্য হকসমূহের সম্পর্ক হবে চুক্তিকারীর সাথে। সুতরাং যখন তার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পেলো তখন সে ইচ্ছাধিকার লাভ করবে, যেমন (বিক্রীত দ্রব্যের) দোষ সম্পর্কে অবহতি হলে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওকীল যে সকল চুক্তি সম্পাদন করেন, তা দুই প্রকার। এমন সব চুক্তি, যা ওকীল নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে; যেমন বিক্রয় চুক্তি এবং ইজারা ও ভাড়া চুক্তি, এগুলোর যাবতীয় হক ওকীলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, মুওয়াক্কিলের সঙ্গে নয়।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মুওয়াক্কিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে।

কেননা যাবতীয় হক চুক্তিলব্ধ বিধানের অনুগামী। আর চুক্তিলব্ধ বিধান তথা মালিকানা মুওয়াক্কিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং অনুগামী গুলোও মুওয়াক্কিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। এভাবে সে প্রেরিত দূত এবং বিবাহের ওকীলের মত হবে।

আমাদের দলীল এই যে, প্রকৃত পক্ষে ওকীলই হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনকারী। কেননা চুক্তি নির্ধারিত বক্তব্য দ্বারা অস্তিত লাভ করে। আর তার বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা (ওকীল হওয়ার সূত্রে নয়, বরং) মানব হওয়ার সূত্রে বৈধ। তদ্রূপ বিধানের দিক থেকেও (ওকীলই হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনকারী)। কেননা তার চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি সে মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে শুধু বার্তাবাহক হতো তাহলে চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত না করে পারতো না। প্রেরিত দূতের ক্ষেত্রে যেমন।

ওকীল যখন এই অবস্থানের অধিকারী হলো তখন যাবতীয় হক (ও প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য)-এর ক্ষেত্রে সেই হবে মূল ব্যক্তি। সুতরাং চুক্তির হকসমূহ তার সঙ্গেই সম্পৃক্ত হবে।

এজন্যই কিতাবে ইমাম কুদূরী (র) বলেছেন, ওকীলই বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ করবে এবং মূল্য গ্রহণ করবে এবং যদি সে খরিদ করে তাহলে তার কাছে মূল্য দাবী করা হবে। আর সে-ই বিক্রীত দ্রব্য কবজা করবে। আর (বিক্রীত হলে) দোষ সম্পর্কে তাকেই বিবাদী করা হবে; পক্ষান্তরে (ক্রেতা হলে) সে-ই দোষ সম্পর্কে বাদী হবে।

কেননা এসবই হলো চুক্তিলব্ধ হকসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর মুওয়াক্কিলের জন্য যে মালিকানা সাব্যস্ত হয়, সেটা পূর্ববর্তী ওকীল নিযুক্তির ভিত্তিতে ওকীলের বদল হিসাবে। যেমন গোলাম হেবা কবুল করে শিকার করে এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আর মনিব সেগুলোর মালিক হয়। এটাই বিশুদ্ধ মত।

গ্রন্থকার বলেন, দোষ সংক্রান্ত মাসআলায় বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ্ আমরা পরবর্তিতে আলোচনা করবো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে সমস্ত চুক্তি ওকীল তার মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করে থাকে, যেমন বিবাহ, খোলা, স্বেচ্ছাকৃত হত্যা থেকে সমঝোতা; এসকল ক্ষেত্রে চুক্তির হকসমূহ মুওয়াক্কিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, ওকীলের সঙ্গে নয়। সুতরাং স্বামীর ওকীলের কাছে মোহরের তাগাদা করা যাবে না। তদ্রূপ স্ত্রীর ওকীলের দায়িত্ব নয় স্ত্রীকে স্বামীর হাতে অর্পণ করা।

কেননা এসকল চুক্তির ক্ষেত্রে ওকীল হলো শুধু বার্তাবাহক। তুমি কি জান না যে, একারণেই ওকীল চুক্তিগুলোকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত না করে পারে না। তাই (বিবাহের ক্ষেত্রে) যদি চুক্তিকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে তাহলে বিবাহ তার জন্য সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সে (বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে) প্রেরিত দূতের মত হলো।

এর কারণ এই যে, এসকল চুক্তির ক্ষেত্রে বিধান তার কারণ থেকে পৃথক হয় না। কেননা এ চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে سبب বা কারণটি হচ্ছে রহিতকরণ জাতীয়। সুতরাং এখানে হুকুম বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং এটা কল্পনা করা সম্ভব নয় যে, سبب (বা কারণ) মৌলিকভাবে একজন থেকে প্রকাশ পাবে আর বিধান সাব্যস্ত হবে অন্যের অনুকূলে।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সমগোত্রীয় হলো অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদান করা এবং কিতাবাত করা এবং অস্বীকার সত্ত্বেও সমঝোতা করা। পক্ষান্তরে যে সমঝোতা বিক্রয় এর সদৃশ (অর্থাৎ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সমঝোতা) সেটা প্রথম প্রকারের সমগোত্রীয়।

আর হেবা করার, ছাদাকা করার, আরিয়াত দেওয়ার, মাল গচ্ছিত রাখার এবং করয দান করার ব্যাপারে নিযুক্ত ওকীলও নিছক দূত রূপে গণ্য হবে। কেননা এসকল চুক্তির ক্ষেত্রে কবজা দ্বারা চুক্তির বিধান সাব্যস্ত হয়। আর কবজা তো যুক্ত হয় অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর সাথে। (সুতরাং চুক্তির বিধানও অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর সাথে যুক্ত হবে)। ফলে ওকীলকে চুক্তির মূল পক্ষ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

একই হুকুম (ওকীল প্রেরিত দূত বলে গণ্য হবে) যদি (দান, ঋণ, ভাড়া ইত্যাদির) প্রার্থীর পক্ষ থেকে ওকীল হয়।

তদ্রূপ এ হুকুম শরীকানার চুক্তি এবং মোদারাবার চুক্তির ওকীলের জন্যও।

তবে ঋণ গ্রহণ করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করা বাতিল। তাই তাতে মুওয়াক্কিলের মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। পক্ষান্তরে ঋণ গ্রহণের জন্য দূত প্রেরণের বিষয়টি ভিন্ন। (অর্থাৎ তাতে ঋণ প্রার্থী মুওয়াক্কিলের মালিকানা সাব্যস্ত হবে)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুওয়াক্কিল যদি ক্রেতার কাছে মূল্য তাগাদা করে তাহলে তার অধিকার রয়েছে মূল্য তাকে প্রদান না করার।

কারণ সে চুক্তি ও তার হকসমূহ সম্পর্কে অপরিচিত (বা অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) কেননা যাবতীয় হক চুক্তিকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।

তবে সে যদি মুওয়াক্কিলকে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে তা বৈধ হবে। আর **ওকীলের দ্বিতীয় বার তার কাছে মূল্য তাগাদা করা বৈধ নয়।**

কেননা উশুলকৃত মূল্য হুবহু মুওয়াক্কিলের হক, আর তা তার কাছে পৌছে গেছে। আর মুওয়াক্কিল থেকে নিয়ে ওকীলকে প্রদানের কোন ফলাফল নেই।

একারণেই তো ক্রেতার যদি মুওয়াক্কিলের কাছে কোন ঋণ পাওনা থাকে তাহলে কাটাকাটি হয়ে যায়। আর যদি ওকীল ও মুওয়াক্কিল উভয়ের কাছে ক্রেতার ঋণ পাওনা থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রেও শুধু মুওয়াক্কিলের ঋণের বিপরীতে কাটাকাটি হবে, ওকীলের ঋণের বিপরীতে নয়।

আর যদি শুধু ওকীলের কাছে ঋণ পাওনা থাকে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে 'কাটাকাটি' সম্পন্ন হবে। কেননা তাদের মতে ওকীল ক্রেতাকে মূল্য থেকে দায়মুক্ত করে দিতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রে ওকীল মুওয়াক্কিলের জন্য মূল্যের ব্যাপারে যামিন হবে।

বিক্রয় ও ক্রয় সম্পর্কে ওকীল নিযুক্ত করা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে কোন জিনিস ক্রয় করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করে তাহলে ঐ জিনিসের শ্রেণী ও প্রকার উল্লেখ করা কিংবা জিনিসের শ্রেণী এবং তার মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করা অপরিহার্য

যাতে যে কাজের ওকীল নিযুক্ত করা হয়েছে সেই কাজটি সুপরিজ্ঞাত হয়ে যায় এবং তা পালন করা সম্ভব হয়।

তবে যদি তাকে সাধারণ ওকীল নিয়োগ করে, অর্থাৎ বলে যে, তুমি আমার জন্য যা ভালো মনে করো তা খরিদ করো, (তাহলে শ্রেণী বা প্রকার উল্লেখের প্রয়োজন নেই।)

কেননা সে বিষয়টিকে তার মতামতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং যা-ই সে খরিদ করবে তাতে আদেশ পালনকারী হবে।

এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, সুক্ষ্ম কিয়াসমতে ওয়াকালাত এর ক্ষেত্রে সাধারণ ও সামান্য অজ্ঞতাকে মেনে নেয়া হয়। যেমন (শ্রেণী জানা থাকার পর) গুণাগুণের অজ্ঞতা।

কেননা ওকীল নিযুক্তির অর্থ যেহেতু সাহায্য গ্রহণ, সেহেতু প্রসারতার উপরই ভিত্তি হবে। অথচ (সাধারণ অজ্ঞতা না থাকার) এই শর্ত বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা রয়েছে. সে অসুবিধা দূরীভূত করেছে।

অত:পর কথিত শব্দটি যদি কয়েক শ্রেণীর জিনিসকে কিংবা কয়েক শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে মূল্য বর্ণনা করা সত্ত্বেও নিযুক্ত করা বৈধ হবে না। কেননা ঐ মূল্য দ্বারা তো প্রতিটি শ্রেণীর জিনিসই পাওয়া যাবে। সুতরাং মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞতার কারণে আদেশ দাতার উদ্দেশ্য বোঝা যাবে না।

আর যদি শব্দটি এক শ্রেণী বাচক হয় যা কয়েকটি প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে মূল্যের পরিমাণ কিংবা প্রকার উল্লেখ করা ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণে প্রকার পরিজ্ঞাত হয়ে যায়। আর প্রকার উল্লেখে অজ্ঞতার মাত্রা হ্রাস পায়। ফলে এই সামান্য অজ্ঞতা আদেশ পালনকে বাধা দেয় না।

এর উদারণ এই যে, যদি তাকে দাস বা দাসী ক্রয় করায় ওকীল নিযুক্ত করে, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এটা কয়েক প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। পক্ষান্তরে যদি প্রকার উল্লেখ করে দেয়, যেমন তুর্কী, হাবশী, হিন্দী, সিন্ধী কিংবা আরবে প্রতিপালিত অনারব (বা শংকর) তাহলে জায়িয হবে।

তদ্রূপ মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করলে আমাদের বর্ণিত কারণে বৈধ হবে।

আর যদি প্রকার বা মূল্য উল্লেখ না করে কিন্তু উৎকৃষ্টতা, নিকৃষ্টতা বা মধ্যমতার গুণ উল্লেখ না করে তাহলেও জায়িয হবে। কেননা এটা এমন অজ্ঞতা, যা (মুওয়াক্কিলের অবস্থা বিবেচনা করে) পূর্ণ করা যায়।

কিতাবে جنس (বা শ্রেণীর) বিপরীতে যে صفة শব্দ বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্যে হলো 'প্রকার'।

আর 'জামি ছাগীর' কিতাবে বলা হয়েছে; কেউ যদি কাউকে বলে যে, আমার জন্য বস্ত্র বা পশু বা বাড়ী ক্রয় করো, তাহলে মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞতার কারণে ওয়াকালাহ বাতিল হবে। কেননা ভাষায় প্রকৃত অর্থে دابة (পশু) বলে ভূমিতে বিচরণশীল যে কোন প্রাণীকে; আর লোক প্রচলনে শব্দটি ব্যবহৃত হয় ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের উপর। সুতরাং শব্দটি কয়েকটি শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করলো। আর বস্ত্র (ثوب) শব্দটিও একই রকম। কেননা তা উৎকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট পরিধেয় অন্তর্ভুক্ত করে। একারণেই মোহর হিসাবে শুধু বস্ত্র উল্লেখ করা বৈধ নয়।

তদ্রূপ دار বা বাড়ী শব্দটি গুণগতভাবে কয়েক শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা, প্রতিবেশীর বিভিন্নতা, সুযোগ-সুবিধার বিভিন্নতা, মহল্লার বিভিন্নতা এবং শহরের বিভিন্নতার কারণে তা বেশ পার্থক্যপূর্ণ হয়। সুতরাং আদেশ পালন করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে।

'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি বাড়ীর মূল্য উল্লেখ করে এবং বাড়ী ও বস্ত্রের শ্রেণী উল্লেখ করে তাহলে জায়িয হবে।

এখানে শ্রেণী দ্বারা প্রকার উদ্দেশ্য। তদ্রূপ যদি পশুর প্রকার উল্লেখ করে, যেমন বললো, গাধা বা অন্য কিছু, তাহলেও জায়িয হবে।

(ইমাম মুহাম্মদ (র) জামি ছাগীর কিতাবে) বলেন, কেউ যদি কাউকে (কম বা বেশী) কিছু দিরহাম দিয়ে বলে, এ দ্বারা আমার জন্য খাদ্য-সামগ্রী ক্রয় করো, তাহলে গম বা আটা উদ্দেশ্য হবে।

এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের কথা। পক্ষান্তরে প্রকৃত অর্থের বিবেচনায় কিয়াসের দাবী হবে, যে কোন খাদ্য দ্রব্য। খাওয়ার ব্যাপারে ইয়ামীন বা কসম করার ক্ষেত্রে যেমন। কেননা খাওয়া যায় এমন যে কোন কিছুকেই খাদ্য সামগ্রী বলে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, (কিয়াসের তুলনায়) লোক প্রচলনই অগ্রগণ্য। আর খাদ্য সামগ্রী শব্দটিকে ক্রয় বা বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত রূপে উল্লেখ করলে আমরা যা বলেছি। সেটাই উদ্দেশ্য হয়। পক্ষান্তরে খাওয়ার কসমের ক্ষেত্রে আলাদা কোন লোক প্রচলন নেই। সুতরাং তখন শব্দটি তার আদি অর্থেই বহাল থাকবে।

কেউ কেউ বলেছেন, দিরহামের পরিমাণ বেশী হলে গম উদ্দেশ্য হবে, আর অল্প হলে তৈরী রুটি উদ্দেশ্য হবে, আর মধ্যম পরিমাণ হলে আটা উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওকীল যদি বস্তুটি খরিদ করে এবং কবজা করে অতঃপর কোন দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে বিক্রয় দ্রব্য তার হাতে থাকা পর্যন্ত দোষের কারণে তা ফেরত দেয়ার অধিকার রয়েছে।

কেননা এটা হলো চুক্তি সংশ্লিষ্ট অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর (চুক্তি সংশ্লিষ্ট) সমস্ত অধিকার তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

আর যদি মুওয়াক্কিলের কাছে অর্পণ করে দেয় তাহলে তার অনুমতি ছাড়া ফেরত দিতে পারবে না। কেননা (অর্পণের মাধ্যমে) ওয়াকালাহ্ -এর বিধান শেষ হয়ে গেছে।

তাছাড়া তাতে মুওয়াক্কিলের প্রকৃত কবজা বাতিল করা হয়। সুতরাং তার অনুমতি ছাড়া ওকীল তা করতে পারবে না।

একারণেই খরিদকৃত জমিতে কেউ যদি শোফা ইত্যাদি কোন দাবী উত্থাপন করে তাহলে মুওয়াক্কিলের হাতে অর্পণ করার পূর্বে ওকীল মামলায় প্রতিপক্ষ বলে গণ্য হয়। কিন্তু অর্পণের পরে নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'বায় সারফ' ও 'বায় সালাম' চুক্তির ব্যাপারে ওকীল নিযুক্ত করা বৈধ।

কেননা এটা এমন চুক্তি, যা মুওয়াক্কিল নিজে সম্পাদন করতে পারে। সুতরাং প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঐ বিষয়ে ওকীল নিযুক্ত করারও অধিকারী হবে। যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরীর উদ্দেশ্য হলো (দাদন দাতার পক্ষ হতে) 'বায় সালাম' চুক্তি সম্পাদনের জন্য ওকীল নিযুক্ত করা, দাদন গ্রহীতার পক্ষ থেকে বায় সালাম চুক্তি গ্রহণের জন্য ওকীল নিযুক্ত করা নয়। কারণ তা জায়িয নয়। কেননা এক্ষেত্রে ওকীল তার যিম্মায় অনির্ধারিত রূপে সাব্যস্ত খাদ্য বিক্রি করছে এই শর্তে যে, মূল্যটা হবে অন্যের আর তা জায়িয নয়।

(সারফ ও সালামের ক্ষেত্রে) ওকীল যদি (সারফের বিনিময় এবং দাদনের মূলধন) কবজা করার পূর্বেই প্রতিপক্ষ থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা কবজা করা ছাড়া পৃথক হওয়া পাওয়া গেছে।

মুওয়াক্কিলের পৃথক হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য নয়।

কেননা সে তো চুক্তি সম্পাদনকারী নয়। আর চুক্তির কারণে চুক্তিকারীর প্রাপ্য হয়েছে। আর সে হলো ওকীল; সুতরাং তার কবজা করা বৈধ হবে, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে তার সঙ্গে হকসমূহ সম্পৃক্ত হয় না। যেমন নাবালক ও নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দাস (যদি ওকীল হয়।) পক্ষান্তরে 'বায় সারফ' ও 'বায় সালামের' বিষয়ে প্রেরিত দূতদ্বয়-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের 'বার্তাবহন' হলো চুক্তির ক্ষেত্রে, কবজার ক্ষেত্রে নয়। আর তার বক্তব্য প্রেরকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং দূতের কব্জা গ্রহণ হবে যে চুক্তিকারী নয় তার কবজা গ্রহণ। সুতরাং তা বৈধ হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওকীল যদি তার নিজের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করে এবং বিক্রীত দ্রব্য কবজা করে তাহলে মুওয়াক্কিলের কাছে তার মূল্য ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে। (এটা তার পক্ষ থেকে দান গণ্য করা হবে না।)

কেননা ওকীল ও মুআক্কিলের মাঝে বিধিগতভাবে একটি বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে। একারণেই তো মূল্যের ব্যাপারে দলীল এই যে, ওযাকিলের কবজা মুআক্কিলের কবজা হওয়া এমন এক বিষয় যা পরিহার করা সম্ভব নয়। সুতরাং আটকাধিকার রহিত হওয়ার বিষয়ে সে সম্মত বলে বোঝা যায় না। বরং প্রকৃত কথা এই যে, ওকীলের কবজা গ্রহণ ঝুলন্ত থাকবে। সুতরাং যদি সে আটক না রাখে তাহলে তা মুআক্কিলের জন্য কবজা বলে সাব্যস্ত হবে। আর আটক করার ক্ষেত্রে নিজের জন্য কবজা গ্রহণ সাব্যস্ত হবে।

যদি আটক রাখার পর ওকীলের কাছে তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে বস্তুটি বন্ধকী দ্রব্যের ক্ষতি পূরণের মত দায়বদ্ধ হবে। আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে বিক্রয়ের ক্ষতিপূরণের মত দায়বদ্ধ হবে।

আর এই হলো ইমাম আবু হানীফা (র) এরও মত। আর ইমাম যুফার (র) এর মতে গসবের মত সে দায়বদ্ধ হবে। কেননা তাঁর মতে এটা হলো নাহক ভাবে আটকে রাখা।

তারফায়নের দলীল এই যে, মুআক্কিলের কাছে ওকীল হল বিক্রেতার মত। সুতরাং তার আটককরণ ছিলো মূল্য উশুল করার জন্য। সুতরাং বিক্রয় দ্রব্য হালাক হলে মূল্য রহিত হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, এটা হলো (নিজের পক্ষ হতে আদায়কৃত) মূল্য উশূল করার উদ্দেশ্যে আটক করার কারণে দায়বদ্ধ; অথচ আগে তা দায়বদ্ধ ছিলো না। আর এটাই হুবহু বন্ধকী দ্রব্যের গুণ। বিক্রয় দ্রব্যের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (বিক্রেতার নিকট) তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বিক্রয় রহিত হয়ে যায়। অথচ এখানে (বিক্রেতা ও উকীলের মাঝে বিদ্যমান) মূল চুক্তি রহিত হয় না।

আমাদের বক্তব্য এই যে, মুআক্কিল ও ওকীলের ক্ষেত্রে তা রহিত হয়ে যায়। যেমন মুআক্কিল 'আয়েব' এর কারণে ফেরত দিলো আর ওকীল তাতে সম্মত হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি তাকে এক দিরহামের বিনিময়ে দশ রতল গোশত খরিদ করতে ওকীল নিযুক্ত করে আর সে এক দিরহাম দ্বারা বিশ রতল এমন গোশত খরিদ করলো, যার দশ রতল এক দিরহামেই বিক্রি করা যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) -এর মতে মুআক্কেলের জন্য বৈধ দিরহামে তা থেকে দশ রতল গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। আর সাহেবায়ন বলেন, এক দিরহামের বিনিময়ে বিশ রতল নেয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

ইমাম কুদূরী (র) রচিত 'মুখতাসার'-এর কোন কোন অনুলিপিতে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) মতপার্থক্য উল্লেখ করেন নি।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, সে প্রদত্ত দিরহামের গোশত বাবদ ব্যয় করার আদেশ করেছে, আর তার ধারণা ছিলো তার মূল্যমান দশ রতল গোশতের সমান। এমতাবস্থায় ওকীল যদি এক দিরহাম দ্বারা বিশ রতল খরিদ করে থাকে তাহলে সে তাকে অধিক কল্যাণ দান করেছে। আর বিষয়টা এমন হলো যেন সে তাকে এক হাযার দিরহামে তার গোলাম বিক্রি করে দেয়ার জন্য ওকীল নিযুক্ত করলো, আর সে দুই হাযারে তা বিক্রি করলো।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, সে তো তাকে দশ রতল (অর্থাৎ নির্ধারিত একটা পরিমাণ) খরিদ করার আদেশ করেছে, অতিরিক্ত অংশটুকু খরিদ করার আদেশ করেনি। সুতরাং অতিরিক্ত অংশের ক্রয় তার নিজের জন্য হবে। আর দশ রতল ক্রয় মুআক্কিলের পক্ষে কার্যকর হবে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ যে উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, সেটা ভিন্ন। কেননা অতিরিক্ত অংশ সেখানে মুআক্কিলের মালিকানার বিমিময়; সুতরাং তা তারই হবে।

পক্ষান্তরে যদি এমন গোশ্‌ত খরিদ করে, যার বিশ রতল এক দিরহামে বিক্রি হয়, তাহলে সবার মতেই সে নিজের জন্য খরিদকারী বলে গণ্য হবে। কেননা মুআক্কিলের আদেশ মোটাতাজা পশুর গোশতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অথচ এটা দুবলা পাতলা পশুর গোশত। সুতরাং আদেশদাতার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুআক্কিল যদি কাউকে নির্ধারিত কোন বস্তু ক্রয় করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করে, তাহলে সেটা নিজের জন্য খরিদ করার অধিকার উকিলের নেই।

কেননা এটা মুআক্কিলকে ধোঁকাদানে পর্যবশিত হবে। কেননা সে তো তার উপর ভরসা করেছিলো।

তাছাড়া এতে নিজেকে ওকীলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অথচ কারো কারো মতে মুআক্কিলের উপস্থিত ছাড়া সে তা করার অধিকার রাখে না।

আর যদি মূল্য উল্লেখকৃত হয়ে থাকে, কিন্তু সে অন্য শ্রেণীর মূল্য দ্বারা (যেমন দিরহামের কথা ছিলো, কিন্তু সে দীনার দ্বারা) খরিদ করলো কিংবা মূল্য উল্লেখকৃত ছিলো না, আর সে মুদ্রা ছাড়া অন্য জিনিসের বিনিময়ে খরিদ করল, কিংবা ওকীল অন্য একজনকে উক্ত বস্তু খরিদ করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করলো আর দ্বিতীয় জন প্রথম জনের অনুপস্থিতিতে খরিদ করলো তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে প্রথম ওকীলের জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হবে। কেননা সে আদেশদাতার আদেশ লংঘন করেছে। সুতরাং ক্রয় তার নিজের উপর কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়জন যদি প্রথম ওকীলের উপস্থিতিতে খরিদ করে তাহলে প্রথম মুআক্কিলের অনুকূলে ক্রয় কার্যকর হবে। কেননা এই ক্রয় প্রথম ওকীলের মতামত সংযুক্ত ছিলো। সুতরাং সে আদেশ লংঘনকারী হয়নি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি অনির্ধারিত কোন গোলাম খরিদ করার জন্য তাকে ওকীল নিযুক্ত করে আর সে কোন একটা গোলাম খরিদ করে, তাহলে সেটা ওকীলের হবে; তবে যদি বলে যে, মুআক্কিলের জন্য খরিদ করার নিয়ত করেছিলাম, কিংবা যদি মুআক্কিলের মাল দ্বারা খরিদ করে (তাহলে মুআক্কিলের জন্য হবে।)

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এই মাসআলাটির কয়েক সূরত রয়েছে। ওকীল যদি আদেশদাতা মুআক্কিলের দিরহামের সাথে চুক্তিকে সম্পৃক্ত করে, তাহলে তা মুআক্কিলেরই হবে। আমার মতে ইমাম কুদূরীর বক্তব্য 'কিংবা মুআক্কিলের মাল দ্বারা খরিদ করে'-এর এটাই হলো উদ্দেশ্য, ঐ মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা পরিশোধের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ ও মতভিন্নতা রয়েছে। অথচ মুআক্কিলের মালের সাথে চুক্তিকে সম্পৃক্ত করার সূরতটি সর্বসম্মত, আর কিতাবে তা অনির্ধারিত রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি নিজের দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে ক্রয় তার নিজের জন্য হবে। এ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে ওকীলের অবস্থাকে ঐ সূরতের উপর প্রযুক্ত করার জন্য যা শরীয়তের দৃষ্টিতে তার জন্য হালাল।

কিংবা সাধারণত: সে যা করে তার উপর প্রযুক্ত করার জন্য। কেননা অন্যের দিরহামের সাথে চুক্তিকে সম্পৃক্ত করে নিজের জন্য ক্রয় করা শরীয়ত ও লোক প্রচলন উভয় বিচারেই ঘৃণ্য।

আর যদি সাধারণ দিরহামের দিকে সম্পৃক্ত করে তাহলে মুআক্কিলের জন্য নিয়ত করলে মুআক্কিলের হবে আর নিজের জন্য নিয়ত করলে নিজের হবে।কেননা এই (অনির্ধারিত বিষয়ে) ওকীল নিযুক্তির ক্ষেত্রে সে নিজের জন্য কাজ করতে পারে এবং মুওয়াক্কিলের জন্যও কাজ করতে পারে।

আর যদি নিয়তের ব্যাপারে পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে মূল্য পরিশোধকে বিচারক নিযুক্ত করা হবে। কেননা মূল্য পরিশোধ স্পষ্টভাবে আমাদের উল্লেখকৃত বক্তব্য প্রমাণ করে।

আর যদি উভয়ে একমত পোষণ করে যে, (ক্রয় করার সময়) তার মনে নিয়ত উপস্থিত ছিলো না, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন যে, সেটা চুক্তি সম্পাদনকারীর জন্য হবে। কেননা মূল অবস্থা এই যে, প্রত্যেকে নিজের জন্য কাজ করে থাকে, তবে যদি অন্যের জন্য নির্ধারণ করা সাব্যস্ত হয় (তাহলে ভিন্ন কথা) কিন্তু এখানে তা প্রমাণিত হয়নি।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এক্ষেত্রে পরিশোধকে বিচারক সাব্যস্ত করা হবে। কেননা যে চুক্তিটাকে সে নিয়ত মুক্ত রেখেছে সেটা দু'দিকেরই সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং তার হুকুম স্থগিত থাকবে। দুই মালের যেটা থেকে পরিশোধ করবে, ধরা হবে যে, সেই সম্ভাব্যটাকে সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য করেছে।

তাছাড়া (নিয়ত না থাকার ব্যাপারে) উভয়ের একমত হওয়া সত্ত্বেও মুআক্কিলের জন্য নিয়ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। (কেননা হতে পারে যে, নিয়ত করেছিলো, পরে ভুলে গেছে।) আর আমরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি, তাতে তার অবস্থাকে সততার উপর প্রযুক্ত করা হয়। যেমন পরস্পরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে হয়েছে।

খাদ্য দ্রব্যের 'বায় সালাম' চুক্তি সম্পাদনের জন্য ওকীল নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে এই সকল সূরত বিবেচ্য হবে।

'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কাউকে এক হাযার দিরহামে একটি গোলাম খরিদ করতে বলে, আর ওকীল বলে যে, আমি করেছি আর সে আমার কাছে মারা গেছে; কিন্তু মুআক্কিল বলে যে, তুমি তাকে নিজের জন্য খরিদ করেছো, তাহলে মুআক্কিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর মুআক্কিল যদি ওকীলকে এক হাযার দিরহাম প্রদান করে থাকে তাহলে ওকীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা প্রথম সূরতে ওকীল এমন একটি চুক্তি সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেছে, যা সে নতুনভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। আর তা হলো (চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে) মুআক্কিলের কাছ থেকে মূল্য উশুল করা; অন্য দিকে মুআক্কিল তা অস্বীকার করছে, আর অস্বীকার করার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সূরতে সে হলো আমানত রক্ষাকারী, এবং আমানতের দায় থেকে সে মুক্ত হতে চায়, তাই তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যখন দু'জনে মতপার্থক্য করছে তখন যদি গোলামটি জীবিত থাকে আর মূল্য যদি (মুআক্কিলের পক্ষ হতে ওকীলকে) দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ওকীলের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে সে হলো আমানত রক্ষাকারী। (এবং আমানতের দায় থেকে মুক্ত হতে চায়।) আর যদি মূল্য প্রদত্ত না হয়ে থাকে তাহলেও ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা এ অবস্থায় সে ক্রয়চুক্তি নতুনভাবে সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং খবর প্রদানের ব্যাপারে তাকে তোহমতগ্রস্ত করা যাবে না।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুআক্কিলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে এই তোহমতের পাত্র হয়ে আছে যে, সে নিজের জন্য খরিদ করেছিলো, এখন চুক্তিটিকে লোকসানজনক মনে করে মুআক্কিলেকে গছাতে চাচ্ছে।

(মুআক্কিলের পক্ষ হতে) মূল্য প্রদত্ত হলে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ বিষয়ে সে আমানত রক্ষাকারী। সুতরাং আমানতের দায় থেকে মুক্ত হওয়ার দাবীর গ্রহণযোগ্যতার অনুগামী হিসাবে মুআক্কেলের জন্য খরিদ করার দাবীও গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে তো তার হাতে মূল্য বিদ্যমান নেই।

আর যদি নির্দিষ্ট কোন গোলাম খরিদ করার আদেশ করে থাকে অতঃপর মতপার্থক্য হয় আর গোলামও জীবিত আছে, তাহলে মূল্য প্রদত্ত হোক কিংবা অপ্রদত্ত উভয় ক্ষেত্রে ওকীলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কেননা সে এমন চুক্তির খবর প্রদান করেছে; যা নতুনভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ্য তার রয়েছে; আর তাতে তোহমতের অবকাশ নেই। কেননা নির্দিষ্ট কোন বস্তু খরিদ করার জন্য নিযুক্ত ওকীল মুআক্কিলের অনুপস্থিতিতে ঐ পরিমাণ মূল্যে ঐ বস্তুটি নিজের জন্য খরিদ করতে পারে না, যেমন আগে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে অনির্দিষ্ট গোলামের বিষয়টি ভিন্ন, যেমন ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি।

কেউ যদি কাউকে বলে যে, এই গোলামটি অমুকের জন্য আমার কাছে বিক্রি কর, তখন সে তার কাছে বিক্রী করল। অতঃপর সে অমুক যে তাকে আদেশ করেছে, তা অস্বীকার করলো। পরে অমুক এসে বললো যে, আমি তাকে তা খরীদ করার আদেশ করেছিলাম, তাহলে গোলামটি অমুকই নিয়ে নিবে।

কেননা তার পূর্ববর্তী কথাটি ছিলো তার পক্ষ থেকে অমুকের ওকীল হওয়ার স্বীকারোক্তি। সুতরাং পরবর্তী অস্বীকার তার কোন কাজে আসবে না।

আর অমুক যদি বলে যে, আমি তাকে আদেশ করিনি, তাহলে গোলামকে নেয়ার অধিকার তার হবে না।

কেননা তার রদ করে দেয়ার কারণে তার পূর্ববর্তী স্বীকারোক্তি রদ হয়ে গেছে।

তবে যদি অমুকের জন্য ক্রয়কারী উক্ত গোলামটিকে অমুকের হাতে অর্পণ করে দেয়, তখন এই অর্পণ হবে তার পক্ষ হতে বিক্রয়; আর অমুকের উপর মূল্যের দায় আসবে।

কেননা কার্যত: আদান প্রদানের মাধ্যমে সে ক্রেতা হয়ে যাবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্যের জন্য তার আদেশ ছাড়াই ক্রয় করলো আর ক্রয় ক্রেতার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গেলো। অতঃপর যার জন্য খরিদ করা হয়েছে, তার হাতে সে তা অর্পণ করে দিলো (তখন এটা কার্যত: আদান প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয় বলে সাব্যস্ত হয়ে গেল।)

মাসআলাটি একথা প্রমাণ করছে যে, بيع التعاطى (বা আদান-প্রদান ভিত্তিক বিক্রয় সাব্যস্ত) হওয়ার জন্য বিক্রয় সূত্রের অর্পণই যথেষ্ট; যদিও মূল্য পরিশোধ পাওয়া না যায়। আর পরস্পর সম্মতি সম্পন্ন হওয়ার কারণে মূল্যবান ও সাধারণ সব দ্রব্যের ক্ষেত্রেই بيع التعاطى সাব্যস্ত হবে। আর বিক্রয় প্রসঙ্গে এটাই হলো বিবেচ্য।

'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কাউকে নির্দিষ্ট দু'টি গোলাম খরিদ করতে আদেশ দেয়, কিন্তু তাকে কোন মূল্যের কথা না বলে, আর সে দুই গোলামের একটিকে ঐ লোকের জন্য খরিদ করে তাহলে এই ক্রয় গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা এখানে ওকীল নিযুক্তিটি ছিলো শর্তমুক্ত। সুতরাং সেটা তার নিঃশর্ততার উপরই বহাল থাকবে। আর বিক্রয় চুক্তিতে দু'টোকে একত্র করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

তবে যেটুকু ক্ষতি মানুষ সাধারণত: গ্রহণ করে না, ঐ পরিমাণ মূল্যে ক্রয় করলে জায়িয হবে না।

কেননা এটা হলো ক্রয়ের জন্য ওকীল নিযুক্তকরণ। এ সবই হলো সর্বসম্মত মত।

আর যদি তাকে উভয় গোলামকে এক হাযার দ্বারা খরিদ করতে বলে আর উভয়ের বাজার মূল্য সমান হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে যদি দু'টির একটিকে পাঁচশ দিরহাম বা তার চেয়ে কম মূল্যে খরিদ করে তাহলে জায়িয হবে। আর যদি তার চেয়ে বেশী মূল্যে খরিদ করে তাহলে আদেশদাতার জন্য তা বাধ্যতামূলক হবে না।

কেননা সে তো এক হাযারকে উভয়ের বিপরীতে উল্লেখ করেছে। আর উভয়ের বাজার মূল্য সমান। সুতরাং (স্পষ্ট বক্তব্যের অনুপস্থিতিতে) পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে এক হাযারকে দুই ভাগ করা হবে। তাই সে যেন উভয় গোলামের প্রতিটিকে পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করার আদেশ দানকারী হলো।

অতঃপর পাঁচ'শ দিরহামে খরিদ করার অর্থ হলো আদেশ পালন, আর তার চেয়ে কমে খরিদ করার অর্থ হলো এমন বিরুদ্ধাচরণ, যাতে কল্যাণ রয়েছে। আর বেশীতে খরিদ করার অর্থ এমন বিরুদ্ধাচরণ, যাতে অনিষ্ট রয়েছে।

সেই বেশীর পরিমাণ অল্প হোক কিংবা অধিক। সুতরাং তা জায়েয হবে না।

তবে যদি উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ার আগে সে অবশিষ্ট দিরহাম দ্বারা অবশিষ্ট বস্তুটি খরিদ করে ফেলে (তাহলে সে তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।)

এ সিদ্ধান্ত হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। কেননা প্রথমটির ক্রয় তো বিদ্যমান রয়েছে। আর তার স্পষ্ট উচ্চারণকৃত উদ্দেশ্যটিও অর্জিত হয়েছে। আর তা হলো এক হাযার দ্বারা গোলাম দুটিকে লাভ করা। আর এক হাযারের সমান বিভক্তি তো পরোক্ষ প্রমাণে শুধু সাব্যস্ত হয়েছিলো। অথচ স্পষ্ট বক্তব্যের স্থান তার উপরে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, দু'টির একটিকে যদি অর্ধসহস্রের চেয়ে এমন বেশী মূল্যে ক্রয় করে, যাতে যে পরিমাণ ক্ষতি মানুষ সাধারণতঃ গ্রহণ করে নেয়, আর এক হাযার থেকে এ পরিমাণ বাকি থাকে, যা দ্বারা অবশিষ্ট গোলামটি ক্রয় করা যায়, তাহলে তা জায়িয হবে।

কেননা ওকীল নিযুক্তির বিষয়টি (পাঁচশ দিরহামের শর্ত থেকে) মুক্ত। কিন্তু তা সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ। আর সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো সেই পরিমাণ ক্ষতি, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তবে এক হাযার

থেকে এই পরিমাণ অবশিষ্ট থাকতে হবে, যা দ্বারা অবশিষ্ট গোলামটি খরিদ করা যায়; যাতে মুআক্কিলের উদ্দেশ্য সাধন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়।

'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কারো যদি অন্য কারো কাছে এক হাযার দিরহাম পাওনা থাকে, আর পাওনাদার তাকে ঐ এক হাযার দ্বারা এই (নির্ধারিত) গোলামটি খরিদ করতে বলে, আর সে তা খরিদ করে, তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননা বিক্রয় দ্রব্য নির্ধারণ করার অর্থ হলো বিক্রেতা নির্ধারণ করে দেয়া, আর বিক্রেতা নির্ধারণ করে দিলে তা জায়িয হয়। যেমন আমরা আলোচনা করবো, ইন্‌শাআল্লাহ্।

আর যদি সে তাকে ঐ এক হাযার দ্বারা অনির্ধারিত গোলাম খরিদ করতে বলে, আর সে তা খরিদ করে এবং মুআক্কিল তার কব্জার পূর্বেই তার হাতে মারা যায়, তাহলে ক্রেতার মাল হিসাবেই নষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যদি মুআক্কিল তা কব্জা করে নেয়, তাহলে (ওকীলের হাতে মারা গেলেও) তা তারই গোলাম মারা গেছে বলে গণ্য হবে।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, ওকীল যদি তা কব্জা করে থাকে তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই তা মুআক্কিলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

একই বিশদ বিবরণ সাব্যস্ত হবে, যদি পাওনাদার তাকে তার কাছে পাওনা মাল দ্বারা 'বায় সালাম' বা সারফ চুক্তি করতে বলে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, (বিক্রয় ও অন্যান্য) বিনিময় চুক্তির ক্ষেত্রে দিরহাম দীনার নির্ধারিত হয় না। চাই তা ঋণরূপে দেনাদারের যিম্মায় সাব্যস্ত হোক কিংবা ঋণরূপে (যিম্মায় সাব্যস্ত না হয়ে) বস্তুরূপে বিদ্যমান হোক। দেখুন না যদি দু'জনে ঋণরূপে সাব্যস্ত দিরহাম (বা দীনার) এর বিনিময়ে স্থূলভাবে বিদ্যমান দিরহাম (বা দীনার) ক্রয়-বিক্রয় করে, তারপর উভয়ে একমত হয় যে, ঋণ বিদ্যমান নেই, তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না, (বরং কথিত ঋণের সম পরিমাণ ওয়াজিব হবে।) সুতরাং শর্তমুক্ত রেখে শুধু এক হাযার বলা আর পাওনা এক হাযারের শর্ত দ্বারা শর্তায়িত করা সমান হবে আর এভাবে ওকীল রূপে নিযুক্ত করা বৈধ হবে এবং আদেশদাতার জন্য চুক্তিটি বাধ্যতামূলক হবে। কেননা ওকীলের কব্জা মুআক্কিলের কব্জার সমান।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, ওয়াকালাহ-এর ক্ষেত্রে দিরহাম দীনার (ওকীলের হাতে অর্পণ করার পর) নির্ধারিত হয়ে যায়। দেখুন না, মুআক্কিল যদি ওয়াকালাহকে স্থূলভাবে বিদ্যমান মুদ্রার সাথে কিংবা ঋণরূপে (ওকীলের যিম্মায়) বিদ্যমান মুদ্রার সাথে বিশিষ্ট করে; অতঃপর (মুআক্কিল কিংবা ওকীল) ঐ বস্তুগতভাবে বিদ্যমান মুদ্রা হালাক ও নষ্ট করে ফেলে কিংবা মুআক্কিল (ওকীলের যিম্মায় সাব্যস্ত) ঋণ রহিত করে দেয় সেক্ষেত্রে ওয়াকালাহ বাতিল হয়ে যায়।

তো দিরহাম দীনারের নির্ধারিত হওয়া যখন সাব্যস্ত হলো তখন উল্লেখিত এই ওকীল বানানোর অর্থ হলো (পাওনাদার মুআক্কিলের পক্ষ হতে) এমন ব্যক্তিকে (ওকীলের নিকট প্রাপ্য) ঋণের মালিক বানানো, যার উপর ঋণ সাব্যস্ত নয় (অর্থাৎ বিক্রেতাকে মালিক বানানো।) অথচ তাকে (অর্থাৎ বিক্রেতাকে) ঐ ঋণ কব্জা করার জন্য ওকীল বানানো হয়নি। আর (অর্পণ করতে অপরাগ হওয়ার কারণে) এ ধরনের মালিক বানানো জায়িয নয়। যেমন যদি ক্রেতা ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রাপ্য ঋণের বিনিময়ে ক্রয় করে (তাহলে তা বৈধ হয় না) কিংবা এই ওকীল বানানোর অর্থ হলো কব্জার পূর্বে এমন মাল প্রদানের আদেশ করা, যা দখল গ্রহণ করা ছাড়া সে মালিক হয় না আর তা বৈধ নয়। যেমন যদি বলে যে, তোমার কাছে আমার যা পাওনা, তা থাকে তোমার যা ইচ্ছা তাকে দান করো।

পক্ষান্তরে মুআক্কিল যদি বিক্রেতা নির্ধারণ করে দেয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা তখন বিক্রেতা (অনিবার্যভাবে) পাওনাদার মুআক্কিলের পক্ষ থেকে কব্জা করার ওকীল হয়ে যাবে; অতঃপর সে তার মালিকানা লাভ করবে।

তদ্রূপ যদি পাওনাদার দেনাদারকে ঋণের টাকা গরীব মিসকীনদের কেনাকাটা করার আদেশ করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা এক্ষেত্রে মালকে সে আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করেছে। আর তা সুপরিজ্ঞাত।

মোটকথা ওকীল নিযুক্ত করা যখন বৈধ হলো না তখন এই ক্রয় ওকীলের উপর কার্যকর হবে। সুতরাং তার মাল হিসাবেই গোলামটি হালাক হবে। তবে মুআক্কিল যদি ওকীলের কাছ থেকে গোলামকে কব্জা করে নেয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা সেক্ষেত্রে আদান প্রদানের ভিত্তিতে (মুআক্কিল ও ওকীলের মাঝে) বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কাউকে এক হাযার দিরহাম দিয়ে একটি দাসী খরিদ করতে আদেশ করে আর সে তা খরিদ করে; কিন্তু আদেশদাতা বলে যে, তুমি তা পাঁচশ দিয়ে খরিদ করেছো আর ওকীল বলে যে, এক হাযার দিয়ে খরিদ করেছি; এ ক্ষেত্রে (কসমসহ) ওকীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, দাসীটি যদি এক হাযার দিরহাম মূল্যের সমান হয়। কেননা এ বিষয়ে সে আমানতদার (অর্থাৎ তার আমানতের উপর বিশ্বাস করা ছাড়া বিকল্প নেই) আর সে আমানতের দায় থেকে মুক্ত হওয়ার দাবী করছে। পক্ষান্তরে আদেশদাতা তার বিপক্ষে পাঁচশ দিরহামের দায় দাবী করছে; আর ওকীল তা অস্বীকার করছে। তবে দাসী যদি পাঁচশ দিরহামের সমমূল্যের হয় তাহলে আদেশদাতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে পাঁচশ দিরহাম মূল্যের দাসী খরিদ করে আদেশ লংঘন করেছে; কারণ আদেশ এক হাযার দিরহামের সমমূল্যের দাসীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলো। সুতরাং সে (পাঁচশ দিরহামের) দায়বহন করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি আদেশদাতা তাকে এক হাযার প্রদান না করে থাকে, তাহলে আদেশদাতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

যদি তার বাজার মূল্য পাঁচশ-এর সমান হয়ে থাকে তাহলে তার আদেশের বিরোধিতার কারণে ওকীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি এক হাযার দিরহামের সমমূল্যের হয়ে থাকে তাহলে আদেশ দাতার বক্তব্য গ্রহণের অর্থ হলো, উভয়কে কসম করতে হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে মুআক্কিল ওকীল বিক্রেতা ও ক্রেতার পর্যায়ে নেমে আসবে। (কেননা উভয়ের মাঝে গুণগত বিনিময় সাব্যস্ত হয়েছে।) আর মূল্য সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। আর তার অনিবার্য ফল হলো পরস্পর কসম করা। এবং কসমের পর তাদের মাঝে সংঘটিত চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং দাসীটি ওকীলের।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি তাকে এই (নির্ধারিত) গোলামটি তার জন্য খরিদ করতে বলে, আর কোন মূল্য বেঁধে না দেয়, আর সে গোলামটি খরিদ করে। এরপর আদেশদাতা বলে যে, পাঁচশ দিরহামে খরিদ করেছো, আর ওকীল এক হাযার দিরহামের কথা বলে আর বিক্রেতা ওকীলকে সত্যায়িত করে, তাহলে কসমসহ ওকীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

কারো কারো মতে এখানে পরস্পর কসমের বিধান নেই। কেননা বিক্রেতা উপস্থিত থাকার কারণে তার সত্যায়নের দ্বারা মতপার্থক্য নাকচ হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে প্রথম মাসআলায় বিক্রেতা অনুপস্থিত ছিলো, তাই মতপার্থক্য বিবেচ্য হয়েছে।

আর কোন কোন মতে আমাদের উল্লেখকৃত কারণে পরস্পরকে কসম করতে হবে। আর (বস্তুতঃ ওকীলের কসমের কথা বলে) তারপর কসমের মূল অংশটা উল্লেখ করা হয়ে গেছে। আর তা হলো বিক্রেতার কসম।

আর (ওকীলের কাছ থেকে) বিক্রেতা মূল্য উশুল করে নেয়ার পর তাদের দু'জনের বিষয়ে নিঃসম্পর্কিত ও অপরিচিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে মূল্য উশুল করার পূর্বে মুআক্কিলের বিষয়ে অপরিচিত ছিলো। কেননা তাদের দু'জনের মাঝে তো বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়নি। সুতরাং মুআক্কিলের বিপক্ষে তার সত্যায়ন গ্রহণ করা হবে না। ফলে মত পার্থক্য বহাল থাকবে। এটা হলো ইমাম আবু মনসূরের (র) মত। আর (যুক্তির বিচারে) এটাই অধিকতর প্রকাশিত। সঠিক বিষয়ে আল্লাহ্ অধিক অবগত।

গোলাম কর্তৃক আপন সত্তা ক্রয় করার জন্য ওকীল নিযুক্তকরণ

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, গোলাম যদি কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমার মনিবের কাছ থেকে আমার অনুকূলে আমার সত্তাকে এক হাযারের বিনিময়ে ক্রয় করো। অতঃপর সে তাকে এক হাযার প্রদান করলো। এখন লোকটি যদি মনিবকে বলে থাকে যে, আমি গোলামটিকে তার নিজের জন্য ক্রয় করলাম। আর মনিব একথার উপর তাকে বিক্রি করে তাহলে গোলাম আযাদ বলে গণ্য হবে এবং ওয়ালা সম্পর্ক মনিবের অনুকূলে সাব্যস্ত হবে।

কেননা মনিবের পক্ষ থেকে (গোলামের অনুকূলে) গোলামের দাসসত্তাকে বিক্রি করার অর্থ হলো আযাদ করা। আর গোলামের নিজের দাসসত্তা ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ বিনিময়ের ভিত্তিতে মুক্তিদানকে গ্রহণ করা আর আদিষ্ট ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে বার্তাবহনকারী দূত মাত্র। কেননা চুক্তির হক ও দায়সমূহ তার উপর আরোপিত হয় না। সুতরাং এমনই হলো যেন গোলাম নিজে ক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করেছে। আর এটা যখন মুক্তিদান বলে সাব্যস্ত হলো তখন তার ফলশ্রুতিরূপে 'ওয়ালা সম্পর্ক' সাব্যস্ত করবে।

আর যদি লোকটি মনিবের কাছে বিষয়টি বর্ণনা না করে, তাহলে সে ক্রেতার গোলাম হবে।

কেননা প্রকৃত অর্থে ক্রয় শব্দটি বিনিময়ের জন্য তৈরি হয়েছে; আর উদ্দিষ্ট অর্থ বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে শব্দটাকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব। সুতরাং বিনিময়ের প্রকৃত অর্থকে রক্ষা করা হবে।

পক্ষান্তরে গোলামের নিজে আপন সত্তা ক্রয় করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে রূপক অর্থটি নির্ধারিত। সুতরাং এই ক্রয় যখন বিনিময় অর্থে গৃহীত হবে তখন ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে।

আর (ওকীলের কাছে গোলামের প্রদত্ত) এক হাযার দিরহাম মনিবের প্রাপ্য হবে। কেননা সেটা তার গোলামের উপার্জিত অর্থ। আর ক্রেতার উপর অনুরূপ এক হাযার দিরহাম গোলামের মূল্য রূপে অবশ্য সাব্যস্ত হবে। কেননা উক্ত পরিশোধ যখন গ্রহণযোগ্য হয়নি তখন ক্রেতার যিম্মায় মূল্যের দায় বহাল থাকবে।

পক্ষান্তরে গোলাম ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে উক্ত গোলামকে খরিদ করার জন্য নিযুক্ত ওজনের বিষয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ সেখানকার জন্য খরিদ করা হচ্ছে তা বর্ণনা করার শর্ত নেই। কেননা (ওকীলের জন্য এবং মুআক্কিলের জন্য সাব্যস্ত) উভয় চুক্তি একই সূরতে (অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের সূরতে) সম্পন্ন হচ্ছে এবং উভয় ক্ষেত্রে মূল্যের তাগাদা চুক্তিকারীর অভিমুখী হবে।

পক্ষান্তরে এখানে (অর্থাৎ গোলামের পক্ষ হতে ওকীল নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে) একটি 'ক্রয়' ~~হচ্ছে মুক্তিদানের সমার্থক, যা ওয়ালা সম্পর্ক~~ সাব্যস্ত করে। সেক্ষেত্রে মূল্যের তাগাদা ওকীলের উপর আরোপিত হয় না।

আর এক্ষেত্রে হতে পারে যে, মনিব মুক্তিদানে সম্মত নয়। বরং সে নিছক বিনিময়ের প্রতি আগ্রহী হবে। সুতরাং বিষয়টি বর্ণনা করা অপরিহার্য।

আর কেউ যদি কোন গোলামকে বলে যে, তুমি আমার অনুকূলে তোমার দেহসত্তাকে তোমার মনিবের নিকট থেকে ক্রয় কারো আর সে তার মনিবকে বলে যে, আপনি আমার দেহসত্তাকে অমুকের অনুকূলে এত দিরহামের বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করুন; আর সে তাই করে। সেক্ষেত্রে গোলামটি আদেশদাতার মালিকানায় যাবে।

কেননা গোলাম আপন দেহসত্তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে অন্যের পক্ষ থেকে ওকীল হতে পারে। কারণ তার অর্থমূল্য যেহেতু মনিবের মালিকানাধীন, সেহেতু সে তার অর্থমূল্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তি হবে। এবং একটি সম্পদ হিসাবে তার উপর বিক্রয় চুক্তি সাব্যস্ত হবে। তবে (সে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার সুবাদে)। তার অর্থ মূল্য তার নিজের কব্জায় রয়েছে। ফলে বিক্রেতা মনিব বিক্রয়ের পর মূল্য উশুল করার জন্য তাকে আটক রাখতে পারবে না।

এমতাবস্থায় বিক্রয় চুক্তিকে যখন সে আদেশদাতার দিকে সমন্বিত করবে তখন তার ক্রয় কর্মটি আদেশ পালন রূপে গ্রহণযোগ্য হবে। ফলে চুক্তিটি আদেশদাতার অনুকূলে সম্পন্ন হবে।

পক্ষান্তরে যদি সে চুক্তিটি নিজের জন্য করে তাহলে সে আযাদ হবে।

কেননা গোলাম যেহেতু কোন কিছুর মালিক নয়, যাতে সে উক্ত বস্তু দ্বারা ক্রয় সম্পন্ন করতে পারে; সেহেতু এটা হবে মানিবের পক্ষ হতে মুক্তিদান, বিনিময় নয়, আর মনিব তাতে সম্মত রয়েছে।

আর গোলাম যদিও নির্দিষ্ট বস্তু খরিদ করায় ওকীল ছিলো, কিন্তু সে ওয়াকালাতপ্রাপ্ত কর্ম থেকে ভিন্ন অন্য একটি কর্ম সম্পন্ন করেছে। আর এধরনের ক্ষেত্রে উক্ত কর্ম ওকীলের উপর কার্যকর হয়।

পক্ষান্তরে যদি সে (শর্তহীনভাবে) বলে যে, আমার দেহসত্তাকে আমার কাছে বিক্রি করুন, 'অমুকের অনুকূলে' কথাটা যদি না বলে তাহলেও সে আযাদ হবে।

কেননা শর্তহীন এই বক্তব্য দু'টি দিকের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং সন্দেহবশত: তা ওয়াকালাতের আদেশ পালন বলে গণ্য হবে না। ফলে সম্পন্নকৃত কর্মটি তার নিজের অনুকূলে সম্পন্ন হবে।

ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত ওকীল

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বিক্রয় বা ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওকীলের পক্ষে বৈধ নয় যে, সে তার পিতার এবং দাদার সংগে কিংবা এমন কারো সংগে চুক্তি সম্পাদন করবে, যাদের অনুকূলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আর সাহেবায়ন বলেন, বাজার মূল্যের সমপরিমাণ তাদের কাছে বিক্রি করা বৈধ হবে; তবে নিজের গোলামের কাছে কিংবা নিজের মোকতাব গোলামের কাছে বিক্রি করা বৈধ হবে না।

কেননা ওকীল নিযুক্তি (প্রশ্নে) নিঃশর্ত হয়েছে: আর এতে তোহমতের কোন অবকাশ নেই। কেননা তাদের মালিকানা শর্ত স্বতন্ত্র এবং উপকার লাভের বিষয়টিও পৃথক।

গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা গোলামের কব্জায় রক্ষিত সম্পদ যেহেতু মনিবের সেহেতু এটা হবে মনিবের নিজের কাছে বিক্রয় করা। তদ্রূপ মোকতাব গোলামের উপার্জনে মনিবের হক রয়েছে এবং কিতাবাতের বিনিময় পরিশোধে অক্ষমতার সময় তা প্রকৃত 'হক'-এ রূপান্তরিত হয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, তোহমতের সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষেত্রেগুলোকে ওয়াকালাহ থেকে বাদ রাখা হয়েছে। আর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার প্রমাণের ভিত্তিতে এগুলো তোহমতের ক্ষেত্র।

তাছাড়া সাধারণত: উপকার লাভ তাদের মাঝে মিলিত হয়ে থাকে। তাই এক প্রেক্ষিতে এটা নিজের কাছে বিক্রয় হবে। ইজারা চুক্তি এবং সারাফ (ও 'বায় সালাম') চুক্তি সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রয়ের ওকীল অল্পমূল্যে এবং অধিক মূল্যে এবং দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে। সাহেবায়ন বলেন, এমন কম মূল্যে বিক্রি করতে পারে না, যে পরিমাণ কম সাধারণত: মানুষ গ্রহণ করে না। আর দিরহাম-দীনার ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারবে না।

কেননা ওয়াকালাহ এর নিঃশর্ত আদেশ লোক প্রচলিত অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত হয়ে থাকে। কারণ এই সমস্ত পদক্ষেপ হচ্ছে প্রয়োজনসমূহ পূরণ করার জন্য। সুতরাং তা প্রয়োজনের ক্ষেত্রসমূহের সাথে শর্তায়িত হবে।

আর লোক প্রচলিত রূপ হলো সমমূল্যে বিক্রয় করা এবং মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা। একারণেই কয়লা, বরফ ও কোরবানীর পশু ক্রয়ের জন্য ওকীল নিযুক্তকরণ প্রয়োজনকালের সাথে বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

তাছাড়া অতিরিক্ত 'কমমূল্যে' বিক্রয় এক হিসাবে বিক্রয় এবং আরেক হিসাবে দান। তদ্রূপ দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় এক হিসাবে বিক্রয় এবং আরেক হিসাবে ক্রয়। সুতরাং নিঃশর্ত 'বিক্রয়' শব্দটি এটাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। একারণেই পিতা এবং অছী তা করতে পারে না।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, বিক্রয়ের ওকীল নিযুক্তকরণ নিঃশর্ত হয়েছে। সুতরাং তোহমতের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র সেটা নিজস্ব নিঃশর্ততার উপরই বহাল থাকবে।

আর মুদ্রাদ্রব্যের অধিক প্রয়োজনের সময় এবং বস্তু বিশেষের প্রতি অনাগ্রহের কারণে অতিরিক্ত কম মূল্যের কিংবা দ্রব্য বিশেষের বিনিময়ে বিক্রয় করার লোক প্রচলন রয়েছে।

আর উল্লেখিত মাসআলাগুলো ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত অনুযায়ী নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আর এ বিক্রয় সর্বতোভাবে বিক্রয় বলেই গণ্য। এজন্যই কেউ যদি বিক্রয় করবে না বলে কসম করে তাহলে এই বিক্রয় দ্বারা কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

তবে সর্বোতভাবে বিক্রয় হওয়া সত্ত্বেও বাপ বা অছী (অতিরিক্ত ঠকমূল্যে) বিক্রয় করতে পারে না একারণে যে, তাদের অভিভাবকত্ব হলো তার কল্যাণ ভিত্তিক। আর এতে কল্যাণ নেই। আর পণ্য বিনিময় যেমন সর্বদিক থেকে ক্রয়, তেমনি সর্বদিক থেকে বিক্রয়ও। কেননা উভয়ের প্রতিটি সংজ্ঞা তাতে প্রযুক্ত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওকীল সমমূল্যে এবং এই পরিমাণ অধিক মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে; যে ধরনের পরিমাণে মানুষ সাধারণত: স্বল্প ক্ষতি গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যে পরিমাণ কম মূল্যের ক্ষতি মানুষ গ্রহণ করেনা, সেই মূল্যে বিক্রি করা জায়িয নেই।

কেননা 'অতিঅল্প মূল্যে' ক্রয় করাতে তোহমত বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এমন হতে পারে যে, সে নিজের জন্য ক্রয় করেছিলো, পরে যখন তার মনমত হয়নি তখন সে সেটাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, যেমন আগে বর্ণিত হয়েছে।

তবে যদি সে নির্দিষ্ট কোন বস্তু ক্রয় করায় ওকীল হয়, তাহলে ফকীহগণ বলেছেন আদেশদাতার উপর তা কার্যকর হবে। কেননা এটা সে নিজের জন্য খরিদ করতে পারে না।

তদ্রূপ বিবাহ সম্পাদনের ওকীল যদি মুওয়াক্কিলের কাছে কোন নারীকে তার মোহরে মেছেলের চেয়ে বেশী পরিমাণ মোহরে বিবাহ প্রদান করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা জায়িয রয়েছে।

কেননা বিবাহ চুক্তিতে মুআক্কিলের দিকে সম্পর্কিত করা অপরিহার্য। সুতরাং সেখানে এই তোহমত সাব্যস্ত হতে পারে না।

কিন্তু ক্রয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ওকীলের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা চুক্তিকারী চুক্তিটিকে সম্বন্ধহীন ও মুক্ত রেখে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে পরিমাণ মূল্যের ক্ষতি মানুষ গ্রহণ করে না তার হলো ঐ পরিমাণ ঐ পরিমাণ যা মূল্য বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নে আসেনা ; আর পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে কারো কারো মতে সাধারণ ক্ষতির পরিমাণ হলো দশ দিরহামের স্থলে কাপড় দশ দিরহাম এবং পশুর ক্ষেত্রে দশ দিরহামের স্থলে এগার এগার দিরহাম আর ভূ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে দশ দিরহামের স্থলে বার দিরহাম।

কেননা প্রথমটিতে লেদেন প্রচুর হয়। আর শেষটিতে অল্প লেনদেন হয়, পক্ষান্তরে মাঝেরটিতে মধ্যম ধরনের হয়। আর ক্ষতির-এর আধিক্য হয় লেনদেনের অল্পতার কারণে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি তাকে তার গোলাম বিক্রি করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করে আর সে গোলামের অর্ধেক বিক্রি করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তা বৈধ হবে।

কেননা শব্দটি 'খন্ডন ও অখণ্ডন'-এর শর্ত থেকে মুক্ত। দেখুন না, সে যদি সমগ্র গোলামকে অর্ধেকের মূল্যে বিক্রি করে তাহলে তাঁর মতে তা জায়িয হয়। সুতরাং যদি অর্ধেকের মূল্য দ্বারা অর্ধেক খরিদ করে তাহলে তা আরো স্বাভাবিকভাবেই বৈধ হবে।

ছাহেবায়ন বলেন, তা জায়িয হবে না। কেননা অর্ধেক গোলাম বিক্রি করা লোক প্রচলিত নয়, তাছাড়া তাতে অংশীদারিত্বের ক্ষতি রয়েছে।

তবে উভয়ে বিবাদ করার পূর্বেই যদি বাকি অর্ধেক বিক্রি করে ফেলে তাহলে বৈধ হয়ে যাবে।

কেননা অর্ধেক বিক্রি করা কখনো কখনো আদেশদাতার আদেশ পালনের মাধ্যম হতে পারে। যেমন পুরোটা ক্রয় করার মত ক্রেতা পেলোনা, তখন ভাগ করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং যখন প্রথম বিক্রয় বাতিল হওয়ার আগে অবশিষ্ট অংশ বিক্রি করলো তখন প্রকাশ পেয়ে গেলো যে, এটা (আদেশ পালনের) মাধ্যম হয়েছে। আর যদি বিক্রি না করে তাহলে প্রকাশ পাবে যে, তা আদেশ পালনের মাধ্যম হয়নি। ছাহেবায়নের মতে এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস।

আর যদি তাকে একটি গোলাম খরিদ করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করে আর সে গোলামের অর্ধেক খরিদ করে তাহলে ক্রয় মওকুফ থাকবে। যদি সে অবশিষ্ট অংশ খরিদ করে তাহলে মুআক্কিলের জন্য তা বাধ্যতামূলক হবে।

কেননা অর্ধেক অংশ খরিদ করা কখনো কখনো আদেশ পালনের মাধ্যম হতে পারে। যেমন গোলামটি একদল লোকের মীরাছী মাল ছিলো। ফলে ভাগে ভাগে খরিদ করার প্রয়োজন হলো। সুতরাং আদেশ দাতা বিক্রয় প্রত্যাখানের পূর্বে যদি অবশিষ্ট অংশ সে খরিদ করে ফেলে, তাহলে প্রকাশ পাবে যে, অর্ধেক অংশের খরিদ আগে দাতার আদেশ পালনের মাধ্যম হয়েছে। সুতরাং আদেশদাতার উপর এই বিক্রয় কার্যকর হবে।

এটা হলো আমাদের তিন ইমামের সর্ব সম্মত মত। বিক্রয় ও ক্রয়ের পার্থক্যের কারণ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দৃষ্টিতে এই যে, ক্রয়ের ক্ষেত্রে তোহমত বিদ্যমান থাকে; যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া আরেকটি পার্থক্য এই যে, বিক্রয়ের আদেশ তার মালিকানার সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং তার আদেশ বৈধতা লাভ করে। তাই

সেক্ষেত্রে বিক্রয়ের নিঃশর্ততা বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে ক্রয়ের আদেশ অন্যের মালিকানার সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং তা বৈধ হতে পারে না। (কিন্তু প্রয়োজনের অনিবার্যতার কারণে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। আর লোক প্রচলিত রূপ তথা পুরোটা ক্রয় দ্বারাই প্রয়োজন পুরো হয়) সুতরাং শর্তাবদ্ধতা ও নিঃশর্ততা তাতে বিবেচ্য হবে না।

'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে তার গোলামটিকে বিক্রি করে দেয়ার আদেশ (ও দায়িত্ব) প্রদান করে, আর গোলাম বিক্রি করে, অত:পর সে মূল্য উশুল করুক বা না করুক, ক্রেতা আদালতে রায়ের মাধ্যমে এমন কোন দোষের কারণে গোলামটি ফেরত দেয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি হয় না। আর আদালতের রায়ের ভিত্তি হলো, (বাদী কর্তৃক উপস্থাপিত) সাক্ষী কিংবা (বিবাদীর) কসম করতে অস্বীকৃতি, কিংবা তার স্বীকারোক্তি। এমতাবস্থায় সে গোলামটি আদেশদাতার কাছে ফেরত দিবে।

কেননা বিচারক বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় দোষ বিদ্যমান থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন। সুতরাং তার বিচার এই সকল প্রমাণের কোনটির উপরই নির্ভরশীল হবে না। তবে 'জামে ছাগীর' কিতাবে এই সকল প্রমাণের কোন একটি শর্ত আরোপের ব্যাখ্যা এই যে, কাযী এটা জানেন যে, এধরনের দোষ উদাহরণ স্বরূপ এক মাসের সময়সীমা উদ্ভূত হতে পারে না। তবে বিক্রয়ের তারিখ তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। ফলে তারিখের বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানার জন্য তার এই সকল প্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে।

(আরেকটি ব্যাখ্যা এই যে,) কিংবা (ক্রেতা যে দোষের কারণে ফেরত দিতে চায় তা এমন দোষ, যা স্ত্রীলোকেরা ছাড়া কিংবা চিকিৎসকেরা ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না)। আর স্ত্রীলোকের বক্তব্য এবং চিকিৎসকের মতামত বিক্রেতার বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপনের জন্য তা প্রমাণস্বরূপ বিবেচিত হবে, বিক্রেতার কাছে ফেরত প্রদানের জন্য প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে না। সুতরাং ফেরত প্রদানের জন্য এই সকল প্রমাণের মুখাপেক্ষী হবে। এজন্যই তো দোষটি যদি প্রকাশিত থাকে, আর কাযী বিক্রয় প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তাহলে কাযী এই সকল প্রমাণের কোনটিরই মুখাপেক্ষী হবেন না।

আর ফেরত প্রদানের এ ফায়সালা হচ্ছে মুআক্কিলের উপর। সুতরাং উকীল মুআক্কিলের বিপক্ষে দাবী উত্থাপনের এবং ফেরত প্রদানের নতুন রায় লাভের মুখাপেক্ষী হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, অদ্রূপ যদি ক্রেতা-উকীলের কাছে এমন কোন দোষের কারণে ফেরত প্রদান করে যা হঠাৎ উদ্ভূত হতে পারে, বাইয়েনাহ -এর দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার কারণে কিংবা উকীলের কসম অস্বীকার করার কারণে।

কেননা বাইয়েনাহ হলো পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ। আর উকীল কসম অস্বীকার করতে বাধ্য। কেননা বিক্রীত গোলামের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকার কারণে দোষ সম্পর্কে তার অবগতি নেই। সুতরাং এ গোলাম আদেশদাতার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি দোষজনিত ফেরতদানের ফায়সালা ওকীলের স্বীকারোক্তির কারণে হয়, তাহলে এই ফেরত দান শুধু আদিষ্ট ওকীলের উপর সাব্যস্ত হবে।

কেননা স্বীকারোক্তি হলো ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণ। আর যেহেতু নীরবতা অবলম্বন কিংবা কসম অস্বীকার করা তার পক্ষ্যে সম্ভব ছিলো, সেহেতু স্বীকারোক্তি করতে সে বাধ্য ছিলো না।

তবে মুআক্কিলের বিপক্ষে সে এই মর্মে দাবী উত্থাপন করতে পারবে যে, (দোষটি মুআক্কিলের কাছে থাকা অবস্থায় বিদ্যমান ছিলো) তখন তার উপস্থাপিত বাইয়েনাহ দ্বারা কিংবা মুআক্কিলের কসম অস্বীকার করা দ্বারা মুআক্কিলের বিপক্ষে ফেরত প্রদান সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ফেরত প্রদান যদি উকীলের স্বীকারোক্তি দ্বারা, কিংবা আদালতের ফায়সালা ছাড়া হয়, আর দোষটি এমন হয়, যা যে কোন সময় উদ্ভূত হতে পারে, তাহলে উকীল তার বিক্রেতার (অর্থাৎ মুআক্কিলের) বিপক্ষে দাবী উত্থাপন করতে পারবেনা।

কেননা আদালতী ফায়সালা ছাড়া শুধু স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ফেরত প্রদান তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন বিক্রয় বলে গণ্য হবে। আর মূল বিক্রেতা (তথা মুআক্কিল) এখানে তৃতীয় ব্যক্তি। পক্ষান্তরে (স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে) আদালতী ফায়সালার মাধ্যমে ফেরত প্রদানের অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী বিক্রয় বাতিল করা। কেননা কাযীর (উকীল মুআক্কিল সবার উপর) পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। তবে স্বীকারোক্তিগত প্রমাণটি হলো ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং এটা পূর্ববর্তী বিক্রয়ের রহিতকরণ হিসাবে উকীলের অধিকার থাকবে মুআক্কিলের বিপক্ষে দাবী উত্থাপনের। পক্ষান্তরে প্রমাণটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে এই ফেরত প্রদান উকীলের পক্ষ হতে উত্থাপিত প্রমাণ ছাড়া, কিংবা উকিলের সাথে অস্বীকার ছাড়া মুআক্কিলের উপর সাব্যস্ত হবে না।

আর দোষ যদি এমন হয়, যা যে কোন সময় উদ্ভূত হয় না এবং ফেরত প্রদান যদি উকীলের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আদালতী ফায়সালার মাধ্যমে হয়, তাহলে এক রিওয়াত মতে ওকীলের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন ছাড়াই মুআক্কিলের উপর তা অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা এক্ষেত্রে ফেরত প্রদান নির্ধারিত।

তবে (মাবসূত কিতাবের) সাধারণ বর্ণনা মতে মুআক্কিলের বিপক্ষে দাবী উত্থাপনের অধিকার উকীলের থাকবে না। কারণ আমরা উল্লেখ করেছি (যে, তৃতীয় জনের ক্ষেত্রে এটা হলো নতুন বিক্রয়)।

আর (বিক্রয়ের কারণে ক্রেতার প্রথম) হক বা অধিকার হলো বিক্রীত দ্রব্যের দোষমুক্ততার গুণ। অত:পর তার অধিকার ফেরত প্রদানের দিকে স্থানান্তরিত হয়। অত:পর (ফেরত প্রদান থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে) তার হক ক্ষতিপূরণের দিকে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং ফেরত প্রদানের বিষয়টি অবধারিত হলো না। 'কিফায়াতুল মুনতাহী' কিতাবে বিষয়টি আরো বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কাউকে বলে যে, আমি তোমাকে নগদ মূল্যে আমার গোলাম বিক্রি করার আদেশ দিয়ে দিলাম আর তুমি বাকি মূল্যে বিক্রি করেছো। পক্ষন্তরে আদিষ্ট ওকীল বলে যে, তুমি আমাকে শুধু বিক্রি করতে বলেছো, নগদ-বাকির কথা কিছুই বলনি, তাহলে আদেশদাতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা আদেশ তো তার পক্ষ থেকে এসেছে, সুতরাং তার আদেশ সম্পর্কে সেই ভালো জানবে। আর বক্তব্যের নিঃর্শততার কোন প্রমাণ নেই।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, এ বিষয়ে যদি মুযারিব ও মূলধনদাতা মতবিরোধ করে তাহলে মুযারিবের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা মোযারাবা চুক্তির ক্ষেত্রে নিঃর্শততাই হলো আসল অবস্থা। দেখুন না, শুধু মোযারাবা শব্দ ব্যবহার দ্বারা সম্পন্ন চুক্তির ক্ষেত্রে মুযারিব সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপের অধিকারী হয়ে থাকে। সুতরাং নিঃশর্ততার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

পক্ষান্তরে মূলধনদাতা যদি নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রে মোযারাবা চুক্তির কথা দাবী করে আর মুযারিব অন্য কোন ক্ষেত্রে মোযারাবার কথা বলে, তখন মূলধনদাতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা পরস্পরের সত্যায়ন দ্বারা নিঃশর্ততার বিষয়টি তো রহিত হয়ে গেলো। সুতরাং বিষয়টি নিছক ওয়াকালাহ (যা ওকীল নিয়োগের) পর্যায়ে পর্যবসিত হলো। আর ওয়াকালাহ এর ক্ষেত্রে বিক্রয়ের নিঃশর্ত আদেশ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে নগদ বিক্রি এবং যে কোন মেয়াদের বিক্রি সবটাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। পক্ষান্তরে ছাহেবায়নের মতে লোক প্রচলিত মেয়াদকেই শুধু অন্তর্ভুক্ত করবে। উভয় পক্ষের দলীল পূর্বে (বিক্রয়ের উকীল নিয়োগ প্রসঙ্গে) বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন লোককে তার গোলাম বিক্রি করার দায়িত্ব প্রদান করে, আর সে ঐ গোলাম বিক্রি করে এবং মূল্যের পরিবর্তে বন্ধক গ্রহণ করে; কিন্তু বন্ধক দ্রব্য তার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা সে মূল্যের বিপরীতে কাফীল (ও যিম্মাদার) গ্রহণ করেছিল কিন্তু মূল্য তার হাতছাড়া হয়ে গেলো; এমতাবস্থায় তার উপর (আদিষ্ট ওকীলের উপর) ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না।

কেননা (ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত) যাবতীয় 'হক'-এর ক্ষেত্রে উকীলই হলো মূল ব্যক্তি। আর মূল্য কবজা করা উপরোক্ত 'হক' -এরই অন্তর্ভুক্ত। 'কাফালাহ্' (বা যিম্মাদার) গ্রহণ করা অর্থ হলো মূল্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিতকরণ এবং বন্ধক গ্রহণের অর্থ হলো মূল্য উশুলের দিকটিকে নিশ্চিত করা। সুতরাং ওকীল এই দুটির অধিকারী হবে।

ঋণ উশুল করার উকীলের বিষয়টি ভিন্ন। (সে ঋণের বিপরীতে কাফীল বা বন্ধক গ্রহণ করতে পারবে না।) কেননা সে তো পাওনাদারের স্থলবর্তীরূপে কাজ করে। আর সে তাকে শুধু ঋণ উশুলের ব্যাপারে স্থলবর্তী করেছে; কাফীল গ্রহণ কিংবা বন্ধক গ্রহণের জন্য নয়। পক্ষান্তরে বিক্রয়ের উকীল মূল ব্যক্তি হিসাবে মূল্য গ্রহণ করে। একারণেই মুআক্কিল তাকে মূল্য গ্রহণ থেকে বাধা দিতে পারে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি দুইজনকে ওকীল নিয়োগ করে, তাহলে যে বিষয়ে তাদের দুজনকে উকীল নিয়োগ করা হয়েছে, সে বিষয়ে একজনকে বাদ দিয়ে অন্য জনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

এটা হলো এমন হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে, যাতে মতামত প্রদানের প্রয়োজন পড়ে। যেমন, বিক্রয়, খোলা ইত্যাদি।

কেননা মুআক্কিল তাদের উভয়ের মতামতের প্রতি সম্মত রয়েছে: একজনের মতামতের প্রতি নয়।

আর (বিনিময় সুনির্ধারিত হওয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান, কেননা) বিনিময় সুনির্ধারিত হলেও এই নির্ধারণ মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং আদর্শ ক্রেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও মতামত প্রয়োগকে বাধা গ্রস্ত করে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে যদি উভয়কে আদালতে দাবী উত্থাপন (বা দাবী রোধ) করার ব্যাপারে ওকীল নিয়োগে করে (সে ক্ষেত্রে যে কোন জন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।)

কেননা আদালতের একত্র হওয়া কঠিন এজন্য যে, এতে কাযীর মজলিসে শোরগোল সৃষ্টি হবে। আর মতামতের প্রয়োজন পড়ে বিচারকের মজলিস বসার পূর্বে, যাতে মামলা সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কিংবা স্ত্রীকে বিনিময় ছাড়া তালাক প্রদানের কিংবা গোলামকে বিনিময় ছাড়া আযাদ করার কিংবা তার কাছে বিদ্যমান আমানত ফেরত দেওয়ার কিংবা তার কাছে পাওনা ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে (উভয়কে একত্রিত হওয়া শর্ত নয়)

কেননা এসকল ক্ষেত্রে মতামত প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না। বরং এই 'ওয়াকালাহ' হচ্ছে নিছক (মুআক্কিলের পক্ষ থেকে) বক্তব্য উচ্চারণ। আর দুজনের কথা এবং একজনের কথা এক সমান।

পক্ষান্তরে যদি উভয়কে বলে যে, তোমরা ইচ্ছা করলে আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারো, কিংবা আমার স্ত্রীর বিষয়টি তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম, (সে ক্ষেত্রে উভয়য়ের সম্মিলিত মতামত অপরিহার্য।) কেননা বিষয়টিকে উভয়ের মতামতের উপর সোপর্দ করা হয়েছে। তাছাড়া দেখুনন‍া, (মুআক্কিলের) এই বক্তব্যের দ্বারা এমন মালিকানা প্রকাশ করা হয়, যা সে মজলিসে সীমাবদ্ধ থাকে।

তাছাড়া মুআক্কিল তালাককে উভয়ের 'কর্মের' সংগে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং বিষয়টি উভয়ের গৃহে প্রবেশের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করার সাথে তুলনীয় হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে বিষয়ে তাকে ওকীল নিয়োগ করা হয়েছে, সে বিষয়ে অন্যকে ওকীল নিয়োগ করার অধিকার তার নেই।

কেননা মুআক্কিল তার হাতে এ ব্যাপারটি অর্পণ করেছে। এ ব্যাপারে অন্যকে উকীল নিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করেনি, আর এটি (উকীলের উকীল নিয়োগের এই অবৈধতা) এ কারণে যে, মুআক্কিল তার মতামতে সম্মত হয়েছে। আর মতামতের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে যদি মুআক্কিল এ বিষয়ে তাকে অনুমতি প্রদান করে।

কেননা তখন সম্মতি বিদ্যমান রয়েছে।

কিংবা যদি তাকে বলে যে, তুমি তোমার মত অনুযায়ী কাজ কর।

কেননা তার মতামতের উপর অর্পণকে নিঃশর্ত করা হয়েছে; এই ছূরতে যখন ওকীলের উকীল নিয়োগ বৈধ হলো তখন দ্বিতীয় জন মূল মুআক্কিলের পক্ষ থেকেই উকীল হবে। সুতরাং প্রথম ওকীল দ্বিতীয় উকীলকে বরখাস্ত করার অধিকারী হবে না। এবং প্রথম জনের মৃত্যুতে দ্বিতীয়জন অপসারিত হবে না। আবার মূল মুআক্কিলের মৃত্যুর কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ওকীল অপসারিত হবে। কাযীর আচরণ বিধি প্রসঙ্গে এর সদৃশ মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুআক্কিলের অনুমতি ছাড়া সে যদি কাউকে ওকীল নিয়োগ করে আর দ্বিতীয় ওকীল প্রথম ওকীলের উপস্থিতিতে কোন চুক্তি সম্পন্ন করে, তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননা উদ্দেশ্য হলো প্রথম জনের মতামত বিদ্যমান থাকা। আর তা বিদ্যমান আছে।

আর উক্ত চুক্তির হক বা দায়দায়িত্ব কার উপর অর্পিত হবে, (প্রথম উকীলের উপর না দ্বিতীয় উকীলের উপর) সে সম্পর্কে মাশায়েখগণ আলোচনা করেছেন।

আর যদি তার অনুপস্থিতিতে চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে জায়িয হবে না। কেননা তার মতামত অনুপস্থিত রয়েছে।

তবে যদি তার কাছে খবর পৌছে আর সে অনুমোদন করে (তাহলে জায়িয হবে।)

একই বিধান হবে যদি ওকীল ছাড়া অন্য কেউ চুক্তি সম্পাদন করে আর ওকীল খবর পেয়ে তা অনুমোদন করে।

কেননা তার মতামত বিদ্যমান হয়েছে।

আর যদি প্রথম জন দ্বিতীয় জনের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দেয় আর দ্বিতীয় জন প্রথম জনের অনুপস্থিতিতে চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে জায়িয হবে।

কেননা বাহ্যত: মূল্য নির্ধারণের জন্যই চুক্তিতে তার মতামতের প্রয়োজন পড়ে, আর তা তো হয়েছেই।

পক্ষান্তরে যদি মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে দুজন উকীল নিয়োগ করে তাহলে দুজনের কেউ ঐ নির্ধারিত মূল্য এককভাবে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা মূল্য নির্ধারণের পরও যখন বিষয়টি তাদের দুজনের হাতে অর্পণ করেছে তখন পরিষ্কার বোঝা গেছে যে, তার উদ্দেশ্য হলো বর্ধিত মূল্যের ক্ষেত্রে ও ক্রেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের মতামত একত্র হওয়া। যেমন আমরা বলে এসেছি।

পক্ষান্তরে মুআক্কিল যদি মূল্য নির্ধারণ না করে চুক্তির দায়িত্ব প্রথম ওকীলের উপর অর্পণ করে, তখন বোঝা যায় যে, মুআক্কিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে চুক্তির প্রধান বিষয় তথা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার মতামতের উপর নির্ভর করা।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মুকাতাব কিংবা গোলাম যিম্মী যদি তার অপ্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন ও মুসলিম কন্যাকে বিবাহ্ দেয় কিংবা তার অনুকূলে ক্রয়-বিক্রয় করে তাহলে তা জায়িয হবে না।

ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উক্ত কন্যার মালের মধ্যে হস্তক্ষেপ। কেননা দাসত্ব ও কুফরি কর্তৃত্বকে রহিত করে দেয়। দেখুননা, গোলাম তো নিজেকে বিবাহ প্রদানের (অর্থাৎ নিজে বিবাহ করার) অধিকারী নয়। সুতরাং সে কীভাবে অন্যকে বিবাহ দিতে পারে।

তদ্রূপ কাফিরের তো মুসলমানের উপর কোন কর্তৃত্ব নেই। তাই মুসলমানের বিপক্ষে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না।

তাছাড়া এই কর্তৃত্ব হলো কল্যাণমূলক। সুতরাং তা এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা জরুরী, যার সক্ষমতা রয়েছে এবং স্নেহ রয়েছে, যাতে কল্যাণের গুণটি সাব্যস্ত হতে পারে। অথচ দাসত্ব সক্ষমতাকে রহিত করে আর কুফরী মুসলমানের প্রতি স্নেহকে রহিত করে। সুতরাং এই কর্তৃত্ব তাদের হাতে অর্পণ করা যাবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মুরতাদ হওয়ার কারণে কতলকৃত মুরতাদ এবং হারবীর হুকুমও অনুরূপ।

কেননা (মুসলমানের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে) হারবী যিম্মী থেকে আরো দূরবর্তী। সুতরাং কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার ব্যাপারে সে অধিক যোগ্য।

পক্ষান্তরে নিজের মালের ক্ষেত্রে মুরতাদের হস্তক্ষেপ ছাহেবায়নের মতে যদিও কার্যকর, কিন্তু তার সন্তানের ব্যাপারে এবং সন্তানের মালের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে তার হস্তক্ষেপ স্থগিত থাকবে। (যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কার্যকর হবে। অন্যথায় রহিত হবে।)

কেননা এটা হলো কল্যাণমূলক কর্তৃত্ব। আর কল্যাণ বিদ্যমান হবে ধর্মের অভিন্নতা দ্বারা। আর তা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। যখন রিদ্দাতের কারণে কতল হয়ে যায়, তখন কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার দিকটি স্থির হয়ে যাবে। ফলে তার হস্তক্ষেপ বাতিল হয়ে যাবে।

আর যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ধরে নেয়া হবে, যেন সে অব্যাহতভাবেই মুসলমান ছিল। সুতরাং তার হস্তক্ষেপ বৈধ হবে।

পরিচ্ছেদ দাবী উত্থাপন এবং কজা করার জন্য ওকীল নিয়োগ করা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দাবী উত্থাপনের ওকীল কব্‌জা করারও ওকীল; —আমাদের মতে।

ইমাম যুফার (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, মুআক্কিল তো দাবী উত্থাপনের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। আর কব্‌জা করাতো উত্থাপন থেকে ভিন্ন বিষয়। আর সে ব্যাপারে মুআক্কিল সম্মত হয়নি।

আমাদের দলীল এই যে, কেউ যদি কোন কিছুর মালিকানা লাভ করে, তবে সে তাকে পূর্ণতা দানেরও মালিক হবে। আর দাবী উত্থাপনের পূর্ণতাও সমাপ্ত হয় কবজার মাধ্যমে। তবে বর্তমান যুগে উকীলদের মাঝে খেয়ানত ছড়িয়ে পড়ার কারণে ইমাম যুফার (র)-এর মত অনুযায়ী ফতোয়া হবে। তাছাড়া কখনো কখনো এমন ব্যক্তিকেও দাবী উত্থাপনের (মামলা পরিচালনার) ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। মালের ব্যাপারে বিশ্বাস করা হয় না। এর উদাহরণ হলো ঋণের তাগাদা করার জন্য নিযুক্ত উকীল মবসূতের সিদ্ধান্ত মতে এই ঋণের টাকা উশুল ও কব্‌জা করার অধিকার রাখে। কেননা আরবী শব্দ تقاضى আভিধানিকভাবে قبض -এর সমার্থক (অর্থাৎ তাগাদা ও উশুল সমার্থক)।

তবে লোক প্রচলনে تقاضى -এর আভিধানিক অর্থ থেকে রহিত করে। সুতরাং (যামানার ফাসাদের কারণে) ফতোয়া এই যে, ঋণের তাগাদার জন্য নিযুক্ত ওকীল কবজা করার অধিকারী হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, দুজন যদি দাবী উত্থাপনের (ও মামলা পরিচালনার) ওকীল নিযুক্ত হয়, তাহলে দুজন এক সঙ্গে ছাড়া কব্‌জা করার অধিকারী হবে না। (মুদ্রা হোক বা নির্ধারিত দ্রব্য হোক)।

কেননা মুআক্কিল উভয়ের সম্মিলিত আমানতদারির প্রতি সম্মত হয়েছে। একজনের একক আমানতদারির প্রতি সম্মত হয়নি। আর কব্‌জা করার ক্ষেত্রে দুজনের একত্র হওয়া সম্ভব। মামলা উত্থাপনের বিষয়টি ভিন্ন; যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঋণ কবজা করার জন্য নিযুক্ত ওকীল দাবী উত্থাপনেরও ওকীল বলে গণ্য হবে।

সুতরাং যদি এই ওকীলের বিপক্ষে এই মর্মে বাইয়েনাহ পেশ করা হয় যে, মুআক্কিল ঋণ উশুল করে নিয়েছে বা দেনাদারকে মুক্ত করে দিয়েছে তাহলে তা গ্রহণ করা হবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে।

ছাহেবায়নের মতে সে মামলার পক্ষ হবে না। (সুতরাং তা বিপক্ষে প্রতিপক্ষের বাইয়েনাহ গ্রহণ করা হবে না) এটা ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে হাসান বিন যিয়াদের বর্ণনা। কেননা কবজা করা (বা উশুল করা) দাবী উত্থাপন করা থেকে ভিন্ন একটি বিষয়। তাছাড়া মালের ব্যাপারে যাকে বিশুদ্ধ করা হয় এমন প্রত্যেক দাবী উখপান ও মামলা পরিচালনার পারদর্শী হয় না। সুতরাং কব্জা করার ব্যাপারে সম্মতি মামলা উত্থাপনের ব্যাপারে সম্মতি প্রমাণ করে না।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, মুআক্কিল তাকে মালিক হওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছে। কেননা ঋণ (হুবহু আদায় করা হয় না, বরং) তার সদৃশ দ্বারা আদায় করা হয়। কারণ মূল ঋণ হুবহু আদায় করা কল্পনা করা যায় না; বরং এক হিসাবে সেটাকেই মূল পাওনা উশুল করা ধরা হয়েছে। সুতরাং সে শোফা -এর ভিত্তিতে বাড়ীর দখল গ্রহণের জন্য নিযুক্ত ওকীলের সদৃশ হলো ও হেবা রুজু করার ওকীলের এবং ক্রয়ের ওকীলের সদৃশ হলো।

এজমালী সম্পত্তির হিস্‌সা গ্রহণের জন্য নিযুক্ত ওকীলের সদৃশ হলো এবং দোষের কারণে বিক্রীত দ্রব্য ফেরৎ প্রদানের জন্য নিযুক্ত ওকীলের সৃদশ হলো।

ঋণ কব্জা করার ওকীলের মাসআলাটি (ক্রয়ের ওকীলের তুলনায়) শোফার অধিকার গ্রহণের ওকীলের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। এমনকি ঋণ উশুল করার ওকীল করার পূর্বেই দেনাদারের প্রতিপক্ষ রূপে গণ্য হয়। যেমন, শোফা গ্রহণের ক্ষেত্রে শোফা গ্রহণের পূর্বেই ওকীল ক্রেতার প্রতিপক্ষ রূপে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে ক্রয়ের ওকীল ক্রয় সম্পাদনের পূর্বে প্রতিপক্ষ বলে গণ্য হয় না।

আর এটা একারণে যে, পরস্পর বিনিময় কিছু হক ও দায়দায়িত্ব (তথা গ্রহণ ও অর্পণ) দাবী করে। আর বিনিময় সম্পাদনের আদিষ্ট ব্যক্তি বিনিময়ের যাবতীয় হক ও দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তি রূপে বিবেচিত হয়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে সে প্রতিপক্ষ হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, নির্ধারিত বস্ত্র কব্জা করার ওকীল দাবী উত্থাপনের ওকীল হবে না।

কেননা এক্ষেত্রে ওকীল নিছক আমানত গ্রহণকারী হবে। আর (যেহেতু মুআক্কিলের হুবহু প্রাপ্য বস্তুকে কব্জা করা হয়েছে; সদৃশ বস্তুকে নয়, সেহেতু) কবজা এখানে পারস্পরিক বিনিময় নয়। সুতরাং সে বার্তাবাহকের সদৃশ হলো।

কাজেই কেউ যদি কাউকে তার একটি গোলামকে কবজা করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করে, আর গোলামটি যার হাতে আছে, সে যদি এই মর্মে বাইয়েনাহ পেশ করে যে, মুআক্কিল তার কাছে তা বিক্রি করেছে, তাহলে অনুপস্থিত মুআক্কিল উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত থাকবে।

এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী পক্ষান্তরে কিয়াসের দাবী হলো ওকীলের হাতে গোলাম প্রদান করা।

কেননা এখানে 'অপ্রতিপক্ষের' সামনে বাইয়েনাহ্ পেশ করা হয়েছে। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, নির্ধারিত দ্রব্য কজা করার ওকীল তার কজার অধিকার রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ। কেননা কজা করার ক্ষেত্রে সে মুআক্কিলের

স্থলবর্তী। সুতরাং বিক্রয় (তথা মুআক্কিলের মালিকানা রহিত হওয়া) সাব্যস্ত না হলেও ওকীলের কব্জার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং অনুপস্থিত মুআক্কিল যখন উপস্থিত হবে তখন বিক্রয়ের সপক্ষে বাইয়েনাহ পুন:উথাপন করা হবে।

সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, গোলামের দখলদার এই মর্মে বাইয়েনাহ পেশ করলো যে, মুআক্কিল এই ওকীলকে তার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেছে, কব্জার অধিকার রহিত করার ক্ষেত্রে এই বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং এখানেও তাই হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, আযাদ করা, তালাক দেওয়া এবং এ জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে।

এর অর্থ এই যে, স্ত্রী যদি তালাকের উপর এবং দাস বা দাসী যদি মুক্তির সপক্ষে বাইয়েনাহ পেশ করে ঐ লোকের সামনে, যাকে স্ত্রী বা দাস দাসীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওকীল নিযুক্ত করেছে, তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস মতে তার কব্জার অধিকার রহিত করার ক্ষেত্রে এই বাইয়েনাহ গ্রহণ করা হবে, যতক্ষণনা অনুপস্থিত মুআক্কিল উপস্থিত হয়। মুক্তি বা তালাক সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মামলা পরিচালনার ওকীল যদি তার মুআক্কিলের বিপক্ষে কাযীর কাছে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তাহলে তার বিপক্ষে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে, কাযীর আদালতের বাইরে গ্রহণযোগ্য হবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মত; সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী। তবে একারণে সে 'ওয়াকালাহ্'-এর দায়িত্ব থেকে বের হয়ে যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে কাযীর মজলিসের বাইরেও তার বিপক্ষে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে।

আর ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর প্রথম দিকের মত এবং এটাই কিয়াসের দাবী। কেননা সে মুআক্কিলের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আদিষ্ট। অথচ স্বীকারোক্তি হলো তার বিপরীত। কারণ এটা হলো সমঝোতা। আর কোন বিষয়ের আদেশ তার বিপরীতকে অন্তর্ভুক্ত করে না। একারণেই সে সমঝোতা করার ও দায়মুক্ত করার অধিকারী নয়। আর স্বীকারোক্তি ক্ষমতা রহিত করে মামলা পরিচালনার ওকীল নিযুক্ত করা বৈধ। তদ্রূপ যদি নিঃশর্তভাবে জওয়াব প্রদানের জন্য ওকীল নিযুক্ত করে তাহলে এমন জওয়াব দ্বারা শর্তায়িত হবে যা মুআক্কিলের আত্মপক্ষ সমর্থন বলে গণ্য। কেননা এরকমই লোক প্রচলন রয়েছে। একারণেই তো মামলা পরিচালনার জন্য পারদর্শীর চাইতে পারদশী ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, উপরোক্ত মামলা পরিচালনায় ওকীল নিয়োগ অকাট্য ভাবে বৈধ হয়েছে। আর এই বৈধতা সম্ভব হবে ঐ উত্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা দ্বারা; মুআক্কিল নিশ্চিত রূপে যে উত্তর প্রদানের অধিকারী। আর সেটা হলো নিঃশর্ত উত্তর, নির্দিষ্টভাবে দুটির কোন একটি নয়। আর রূপক অর্থ গ্রহণের যোগ্য এই খানে বিদ্যমান রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ তা আমরা বর্ণনা করবো।

সুতরাং توكيل بالخصومة (বা মামলা পরিচালনার জন্য ওকীল নিয়োগ) কে নিঃশর্ত উত্তর দানের অধিকার প্রদানের অর্থে গ্রহণ করা হবে, যাতে ওকীল নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বৈধতা লাভ করে।

আর যদি স্বীকারোক্তির অধিকার সে না দেয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) -এর মতে তা বৈধ নয়। কেননা মুআক্কিল নিজে -এর অধিকারী নয়।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, স্বীকারোক্তির অধিকার বাদ দেয়ার বৈধতা রয়েছে। কেননা স্বীকারোক্তির অধিকার রহিত করা সুস্পষ্ট ঘোষণা একথাকে অধিকতর জোরদার ভাবে প্রমাণ করে যে, মুআক্কিল নির্ধারিতভাবে অস্বীকার করার অধিকারী।

পক্ষান্তরে যদি ওকীল নিয়োগের বিষয়টি নিঃশর্ত হয়, তখন অধিকতর উত্তম অবস্থার উপর বিষয়টি প্রযুক্ত করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে প্রাপ্ত অন্য এক বর্ণনা মতে, তিনি বাদী ও বিবাদীর মাঝে পার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ মামলা পরিচালনার জন্য ওকীল নিয়োগ যদি বিবাদীর পক্ষ থেকে হয় তাহলে স্বীকারোক্তির ব্যতিক্রমকে তিনি বৈধ মনে করেন না। কেননা সে স্বীকারোক্তির উপর বাধ্য হতে পারে। পক্ষান্তরে বাদীর উভয় বিষয়ের এখতিয়ার থাকে।

উল্লেখিত বিষয়ের সাব্যস্ত হওয়ার পর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর বক্তব্য এই যে, ওকীল হলো মুআক্কিলের স্থলবর্তী। আর মুআক্কিলের স্বীকারোক্তিও বিশিষ্ট হবে না।

আর তারফায়ন বলেন, মামলা পরিচালনার জন্য ওকীল নিয়োগ করা এমন উত্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা প্রকৃত অর্থে কিংবা রূপক অর্থে خصومة বলে গণ্য হয়। আর কাযীর মজলিসে স্বীকারোক্তি রূপক অর্থে خصومة হবে।

আর রূপকত্বের সূত্র এই যে, স্বীকরোক্তিটি خصومة বা বিবাদের বিপরীতে এসেছে। কিংবা সূত্র এই যে, خصومة (বা বিবাদ) হলো স্বীকারোক্তির কারণ। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, হকদার যখন হক তলব করবে তখন প্রাপ্য হকটাই সে পেশ করবে। আর প্রাপ্য হক হলো কাযীর মজলিসে উত্তর প্রদান।

তবে যদি এই মর্মে বাইয়েনাহ পেশ করা হয় যে, সে আদালতের বাইরে স্বীকারোক্তি করেছে, তাহলে সে ওয়াকালাহ্ এর দায়িত্ব থেকে বের হয়ে যাবে। সুতরাং তার হাতে মাল প্রদানের আদেশ জারি করা হবে না। কেননা সে স্ববিরোধী বক্তব্য দানকারী হয়ে যাবে। ফলে সে ঐ পিতা বা অছীর মত হয়ে গেলো, যে কাযীর মজলিসে স্বীকারোক্তি করেছে। এই স্বীকারোক্তি ছহীহ্ হবে না এবং তার হাতে মালও সোপর্দ করা হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কারো পক্ষ হতে মালের কাফীল হয় আর মালের মালিক (তথা পাওনাদার) দেনাদার থেকে মাল কব্জা করার জন্য তাকে ওকীল নিযুক্ত করে তাহলে কখনই সে এই বিষয়ে ওকীল হবে না।

কেননা ওকীল হলো ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের পক্ষে কাজ করে। অথচ যদি তার ওকীল হওয়াকে আমরা বৈধ বলি তাহলে নিজের দায়মুক্তির জন্যই কর্মসম্পাদনকারী হবে। ফলে ওয়াকালাহ-এর মূল রোকন অবিদ্যমান হবে।

তাছাড়া ওকীলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হওয়া ওয়াকালাহ-এর অনিবার্য অঙ্গ। কেননা এই বিষয়ে তাকে আমানতদার গণ্য করা হয়েছে। অথচ যদি তার ওয়াকালাহকে আমরা বৈধ বলি তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণাকারী হচ্ছে। সুতরাং ওয়াকালাহ-এর অনিবার্য অঙ্গ বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ওয়াকালাহ বিলুপ্ত হবে।

এটা সেই মাসআলার সদৃশ যেখানে ঋণগ্রস্ত অনুমতি প্রাপ্ত গোলামকে মনিব আযাদ করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে মনিব পাওনাদারদের অনুকূলে গোলামের মূল্যের যামিন হবে; এবং গোলামের কাছে পুরো ঋণের তাগাদা করবে। এখন পাওনাদার যদি গোলামের কাছ থেকে মাল কব্জা করার জন্য তাকে ওকীল নিযুক্ত করে তাহলে আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে তা বাতিল হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি দাবী করে যে, সে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে তার ওকীল, আর দেনাদার তাকে সত্যায়ন করে তাহলে তার হাতে ঋণ অর্পণের আদেশ জারী করা হবে।

কেননা এটা হলো দেনাদারের নিজের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি। কারণ, সে যা পরিশোধ করবে সেটা তার নিজস্ব মাল।

এরপর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তাকে সত্যায়ন করে (তাহলে তো ভালো)। অন্যথায় দেনাদার দ্বিতীয় বার তাকে ঋণ পরিশোধ করবে।

পাওনাদার ওয়াকালাহ্ অস্বীকার করার কারণে ঋণ উশুল করা সাব্যস্ত হয়নি। আর এক্ষেত্রে কসমসহ তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং (সেই ঋণ) পরিশোধে অসিদ্ধ হয়েছে।

আর দেনাদার কথিত ওকীলের কাছে পরিশোধকৃত ঋণের ব্যাপারে রুজু করবে, যদি মাল তার হাতে বহাল থাকে।

কেননা দেনাদারের মাল প্রদানের উদ্দেশ্য ছিলো দায়মুক্ত হওয়া। অথচ সেটা অর্জিত হয়নি। সুতরাং তার অধিকার আছে ওকীলের 'কবজা' ভঙ্গ করার।

আর যদি মাল ওকীলের হাতে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে ওকীলের কাছে রুজু করতে পারবে না।

কেননা দেনাদার তার সত্যায়ন দ্বারা স্বীকার করে নিয়েছে যে, ওকীল তার কব্জার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ ছিলো। আর এর গ্রহণের ব্যাপারে সে পাওনাদারের পক্ষ থেকে মজলুম হয়েছে। আর মজলুম তো অন্যের উপর জুলম করতে পারে না।

গ্রন্থকার বলেন, তবে যদি পরিশোধের সময় দেনাদার ওকীলকে যামিন সাব্যস্ত করে থাকে।

কেননা দ্বিতীয়বার গৃহীত অর্থ উভয়ের ধারণা মতেই পাওয়নাদারের বিপক্ষে ক্ষতিপূরণের দায়যুক্ত। আর এটা কাফালাহ্ যা (পাওনাদারের দ্বিতীয়বার) কব্জা করা অবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এটা বৈধ হবে না। যেমন অমুকের বিপক্ষে তার অনুকূলে যা কিছু অবশ্য সাব্যস্ত, তার কাফীল হওয়া বৈধ হয়।

আর যদি দেনাদার ওকীল হওয়ার ব্যাপারে তাকে সত্যায়ন না করে এবং তার দাবীর ভিত্তিতে তার কাছে ঋণ পরিশোধ করে, এক্ষেত্রে পাওনাদার যদি দেনাদারের কাছ থেকে ঋণ পুন: উশুল করে তাহলে দেনাদার ওকীলের কাছে রুজু করবে। কেননা

'ওয়াকালাহ'-এর বিষয়ে সে তাকে সত্যায়ন করেনি। বরং পাওনাদারের অনুমোদনের ধারণা করে পরিশোধ করেছে। এই ধারণা যখন বিলুপ্ত হলো তখন সে তার কাছে রুজু করবে। তদ্রূপ 'ওয়াকালাহ'-এর বিষয়ে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও যদি ঋণ পরিশোধ করে তাহলেও রুজু করবে। আমাদের বর্ণিত কারণে এটা আরো সুস্পষ্ট।

আর বর্ণিত সকল ছূরতেই অনুপস্থিত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত দেনাদার প্রদত্ত অর্থ ফেরত নিতে পারবেনা। কেননা আদায়কৃত অর্থ অনুপস্থিত ব্যক্তির হক হয়ে গেছে। পরস্পরের সত্যায়নের ক্ষেত্রে তো স্পষ্টতই। আর অসত্যায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাগত ভাবে। যেমন কোন 'ফুযূলী' ব্যক্তিকে এই আশা প্রদান করলো যে, পাওয়ানাদার তা অনুমোদন করবে, এক্ষেত্রে অনুমোদনের সম্ভাবনার কারণে তা ফেরত নিতে পারে না।

তাছাড়া কেউ যদি কোন উদ্দেশ্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তখন ঐ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার আগে সেটাকে সে বাতিল করতে পারে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি দাবী করে যে, আমি (অমুকের) আমানতের মাল কবজা করার ওকীল, আর যার কাছে আমানত গচ্ছিত রয়েছে, সে তাকে সত্যায়ন করলো, তবু তাকে তার হাতে মাল সোপর্দ করার আদেশ করা হবে না।

কেননা এটা হলো অন্যের মালের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি। ঋণের বিষয়টি ভিন্ন।

কেউ যদি দাবী করে যে, তার পিতা মারা গেছে এবং (অমুকের কাছে) আমানতি মাল তার জন্য মীরাছ হিসেবে রেখে গেছে। সে ছাড়া তার কোন ওয়ারিছ নেই, আর যার কাছে আমানত গচ্ছিত রয়েছে, সে তাকে সত্যায়ন করলো, সে ক্ষেত্রে তাকে তার হাতে মাল সোপর্দ করার আদেশ করা হবে। কেননা আমানতকারীর মৃত্যুর পর সেটা তার মাল থাকে না। আর তারা উভয়ে একমত হয়েছে যে, এটা ওয়ারিছের মাল।

আর যদি দাবী করে যে, সে আমানতকারীর কাছ থেকে আমানতের মাল খরিদ করেছে, আর আমানত গ্রহীতা তাকে সত্যায়ন করে, তাহলে তাকে তার হাতে সোপর্দ করার আদেশ করা হবে না। কেননা যতক্ষণ আমানতকারী জীবিত ছিল ততক্ষণ এই সত্যায়নের অর্থ হবে অন্যের মালের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করা। কেননা আমানতকারীর মালিকানার যোগ্যতা বহাল রয়েছে। সুতরাং তার বিপক্ষে বিক্রয়ের দাবীর ক্ষেত্রে তাদের দুজনকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কাউকে তার মাল কজা করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করে আর দেনাদার দাবী করে যে, পাওনাদার তার মাল উশুল করে নিয়েছে, তাহলে তাকে ওকীলের কাছে দেনা পরিশোধ করতে হবে।

কেননা পারস্পরিক সত্যায়ন দ্বারা ওয়াকালাহ্ সাব্যস্ত, অথচ শুধু তার দাবীর কারণে ঋণ উশুল করা সাব্যস্ত হবে না।

সুতরাং ওকীলের কজা করার হক বিলম্বিত করা হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, দেনাদার মালের মূল মালিকের অনুসরণ করবে এবং তাকে হলফ করাবে।

এ আদেশ হলো দেনাদারের স্বার্থ রক্ষার জন্য। ওকীলকে হলফ করাবেনা। কেননা সে তো হলো মুআক্কিলের স্থলবর্তী।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কাউকে দোষের ভিত্তিতে দাসী ফেরত দেয়ার জন্য ওকীল নিয়োগ করে আর বিক্রেতা ক্রেতার সম্মতি ছিলো বলে দাবী করে তাহলে ক্রেতা কসম না করা পর্যন্ত ওকীল বিক্রেতার কাছে দাসী ফেরত দিতে পারবে না।

ঋণের মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা পাওনাদার (ঋণ উশুল করেনি মর্মে) কসম করতে অস্বীকার করার কারণে যখন ভুল প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন ওকীল যা কব্জা করেছিলো সেটা ফেরত নেয়ার মাধ্যমে ঋণের ক্ষেত্রে বিষয়টি সুরাহা করা সম্ভব; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কেননা, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব এই যে, চুক্তি রহিতকরণের আদালতী ফায়সালা তার বৈধতার পূর্বে বহাল থাকবে। যদিও তা ভুল প্রমাণিত হয়। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে চুক্তি রহিতকরণের রায় কার্যকর হওয়ার পর ক্রেতাকে কসম করানো হবে না। কেননা তা অর্থবহ নয়।

মাশায়েখগণ বলেন, বর্ণিত এই মূলনীতির ভিত্তিতে ছাহেবায়নের মতে উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা। অর্থাৎ ক্রেতার কসম করা পর্যন্ত দাসী ফেরত দেওয়ার আদেশ বিলম্বিত করা হবে না।

কেননা যেহেতু তাদের মতে আদালতের রায় ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর বাতিল করা যায়, সেহেতু পরেও বিষয়টির সুরাহা করা সম্ভব।

কারো কারো মতে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর নিকট বিশুদ্ধতম মত এই যে, উভয় ক্ষেত্রে ফেরত প্রদান বিলম্বিত করা হবে। কেননা তিনি দেনাদারও বিক্রেতার স্বার্থের দিকটি বিবেচনা করেন। এমন কি ক্রেতা যদি উপস্থিত থাকে তাহলে তিনি ক্রেতাকে কসম করাতে বলেন, যদিও বিক্রেতা কসম করানোর দাবী না জানান। সুতরাং এই স্বার্থগত দিক বিবেচনা করে ক্রেতা অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে তার কসমের জন্য অপেক্ষা করা হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে দশ দিরহাম প্রদান করে যেন সে প্রদানকারীর পরিবারের জন্য তা খরচ করে; অত:পর সে নিজের তহবিল থেকে তাদের জন্য দশ দিরহাম খরচ করলো, তাহলে দশ দিরহামে দশ দিরহামে কাটাকাটি হয়ে যাবে।

কেননা দশ দিরহাম খরচ করার ওকীল মূলত: ক্রয় করার ওকীল। আর ক্রয়ের ওকীলের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সেটাই, যা আমরা আলোচনা করে এসেছি এবং প্রমাণিত করে এসেছি। সুতরাং এখানেও তাই হবে।

কারো করো মতে এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস। পক্ষান্তরে কিয়াসের দাবী এই যে, কাটাকাটি করতে পারবে না। বরং সে (ঐ দশ দিরহাম) স্বেচ্ছাদানকারী হবে।

আর কারো করো মতে কিয়াস ও সূক্ষ্ম কিয়াসের বিরোধ হচ্ছে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে। কেননা এটা তো ক্রয় নয়। পক্ষান্তরে পরিজনের জন্য খরচ করার দায়িত্ব ক্রয়ের দায়িত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং কিয়াস ও সূক্ষ্ম কিয়াসে বিরোধ এখানে প্রবেশ করবে না। সঠিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জানেন।

পরিচ্ছেদ ঃ ওকীলের অপসারণ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওকীলকে ওয়াকালাহ্ থেকে অপসারণের অধিকার মুআক্কিলের রয়েছে।

কেননা ওয়াকালাহ্ হলো মুআক্কিলের হক। সুতরাং এটা বাতিল করার অধিকার তার রয়েছে। তবে যদি এই ওয়াকালাহ -এর সঙ্গে অন্যের হক সম্পৃক্ত হয়ে যায় (তাহলে অপসারণের অধিকার থাকবে না) যেমন বাদীর পক্ষ থেকে দাবীর প্রেক্ষিতে বিবাদীর পক্ষ থেকে মামলা পরিচালনার ওকীল নিযুক্ত হলো, কেননা এক্ষেত্রে অন্যের (তথা বাদীর) হক নষ্ট করা হয়। আর এটা রেহেন চুক্তির অন্তর্গত ওয়াকালাহ্ -এর মত হল।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি ওকীলের কাছে অপসারণের খবর না পৌঁছে তাহলে তার ওয়াকালাহ বহাল থাকবে এবং অবগতি লাভ করা পর্যন্ত তার কার্য বৈধ হবে।

কেননা অপসারণ করায় তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়, এই হিসাবে তার কর্তৃত্ব বাতিল করা হয় কিংবা এই হিসাবে যে, চুক্তির দায়দায়িত্ব তার দিকে প্রত্যাবর্তিত । সুতরাং (ক্রয়ের ওকীল হলে) সে মুআক্কিলের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করবে কিংবা (বিক্রয়ের ওকীল হলে) বিক্রীত দ্রব্য সে ক্রেতার হাতে অর্পণ করবে, এরপর মূল্যের বা বিক্রীত দ্রব্যের দায় বহন করতে হবে, যাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আর প্রথমোক্ত (কর্তৃত্ব বাতিল হওয়ার) কারণে বিবাহ ইত্যাদি ওকীলের ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

আর অপসারণের খবরদাতার ক্ষেত্রে সংখ্যা ও ন্যায়পরায়ণতার শর্ত আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করবো না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুআক্কিলের মৃত্যুর কারণে, তার পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে এবং মোরতাদ অবস্থায় দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে ওয়াকালাহ বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা ওকীল নিয়োগ হচ্ছে এমন একটি পদক্ষেপ, যা বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং তার স্থায়িত্বের জন্য তার সূচনার বিধান কার্যকর হবে। সুতরাং আদেশ বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। অথচ এই সকল উপসর্গের কারণে আদেশের অব্যাহততা বাতিল হয়ে যায়।

মস্তিষ্ক বিকৃতি স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার শর্ত এজন্য যে, সামান্য মাত্রায় মস্তিষ্ক বিকৃতি সংজ্ঞাহীনতার অন্তর্ভুক্ত। আর স্থায়িত্বের পরিমাণ ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে একমাস। তিনি ঐ মস্তিষ্ক বিকৃতির উপর কিয়াস করেছেন, যা দ্বারা রামাযানের সিয়াম রহিত হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে একদিন এক রাতের অধিক সময়ের কথাও বর্ণিত হয়েছে। কেননা এই সময়ের মস্তিষ্ক বিকৃতি দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত রহিত হয়ে যায়। সুতরাং সে মৃত ব্যক্তির মত হয়ে গেল।

ইমাম মুহম্মদ (র) এক বছরের কথা বলেছেন। কেননা একবছর সময়ে সমস্ত ইবাদত রহিত হয়ে যায়। সুতরাং সর্তকতার ভিত্তিতে একবছরের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে।

মাশায়েখগণ বলেছেন, দারুল হরবে চলে যাবার ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিধান ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব। কেননা তাঁর মতে মোরতাদের যাবতীয় কর্মকান্ড স্থগিত থাকে। সুতরাং তার ওয়াকালাহও স্থগিত থাকবে। যদি সে পুন: ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তা কার্যকর হবে। আর যদি তাকে কতল করা হয় কিংবা সে দারুল হরবে চলে যায় তাহলে তার ওয়াকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ছাহেবায়নের মতে মোরতাদের যাবতীয় ক্রিয়াকার্য কার্যকর। সুতরাং মৃত্যু ছাড়া কিংবা ধর্ম ত্যাগের কারণে কতল ছাড়া কিংবা তার দারুল হরবে পলায়নের সরকারী ঘোষণা ছাড়া তার ওকীল নিয়োগ বাতিল হবে না। সিয়ার গ্রন্থে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে

আর মুআক্কিল যদি নারী হয় আর সে মোরতাদ হয় তাহলে সর্বসম্মতক্রমে ওকীলের ওয়াকালাহ বহাল থাকবে; যতক্ষণ না সে মারা যায় কিংবা দারুল হরবে পলায়ন করে।

কেননা (জিহাদ পর্বে) আলোচিত হয়েছে যে, তার ধর্মত্যাগে তার সম্পাদিত চুক্তি প্রভাবিত হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুকাতাব গোলাম যদি কাউকে ওকীল নিযুক্ত করে এরপর কিতাবাতের অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ওকীল নিয়োগের পর নিষেজ্ঞা প্রাপ্ত হলো, কিংবা দুই শরীক ওকীল অবগত হোক বা না হোক তার ওয়াকালাহ বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা আমরা উল্লেখ করেছি যে, ওয়াকালাহ -এর স্থায়িত্ব নিয়োগাদেশের বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে। আর অক্ষমতার কারণে বা নিষেধাজ্ঞার কারণে বা আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে আদেশদানের যোগ্যতা বাতিল হয়ে গেছে। আর অবগতি বা অনবগতির মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এটা হলো শরীয়ত আরোপিত অপসারণ। সুতরাং তা অবগতির উপর নির্ভর করবে না। যেমন বিক্রয়ের ওকীলের ক্ষেত্রে মুআক্কিল নিজেই যদি তা বিক্রয় করে ফেলে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওকীল যদি মারা যায়, কিংবা স্থায়ী মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হয় তাহলে তার ওয়াকালাহ্ বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা মস্তিষ্ক বিকৃতির পর এবং মৃত্যুর পর তার আদিষ্ট হওয়া সিদ্ধ হয় না।

আর যদি ওকীল মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে পলায়ন করে তবে পুন: ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার কর্মসম্পাদন জায়িয হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার ওয়াকালাহ্ পুন: বহাল হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র)-এর দলীল এই যে, ওকীল নিয়োগের অর্থ হলো কর্মসম্পাদনের বাধা দূরীকরণ। কেননা তার উদ্দেশ্য হলো বাধা দূরীকরণ।

পক্ষান্তরে ওকীল এমন কিছু গুণবলে কর্মসম্পাদন করে, যা তার সত্তায় বিদ্যমান। এখন উদ্ভুত উপসর্গের কারণে কর্মসম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। আর তা হলো পলায়নের ফলে দুই আবাসভূমির ভিন্নতা। এই অক্ষমতা যখন দূর হয়ে য়াবে আর মুআক্কিলের পক্ষ থেকে বৈধতা প্রদান বহাল থাকবে তখন সে ওকীল রূপে যথাপূর্ব বহাল থাকবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, ওকীল নিয়োগ করার অর্থ হলো কর্মসম্পাদন কার্যকর করার কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করা। কেননা কর্মসম্পাদনের মূল কর্তৃত্ব অর্জিত হয় তার নিজস্ব যোগ্যতা বলে। আর কার্যকর করার কর্তৃত্ব অর্জিত হয় মালিকানা বলে। অথচ দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে সে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আর কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং তা পুন: বহাল হবে না। যেমন উম্মে ওয়ালাদ ও মোদাব্বারের ক্ষেত্রে তার মালিকানা পুন: বহাল হয় না।

আর মুআক্কিল মোরতাদ অবস্থায় দারুল হরবে চলে যাওয়ার পর যদি মুসলমান হয়ে ফিরে আসে তবে যাহির রিওয়াতের বর্ণনা মতে ওকীলের ওয়াকালাহ্ পুন:বহাল হয় না।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে প্রাপ্ত এক বর্ণনা মতে ওয়াকালাহ্ পুন: বহাল হবে। যেমন ওকীলের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন।

যাহিরে রিওয়াতের বর্ণনা মতে (ওকীল ও মুআক্কিলের মাঝে) তাঁর পার্থক্য করণে যুক্তি এই যে, মুআক্কিলের ক্ষেত্রে ওকীল নিয়োগের ভিত্তি হলো তার মালিকানা, আর তা বিলুপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে ওকীলের ক্ষেত্রে ভিত্তি হলো ঐ গুণ, যা তার সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান। আর তা দারুল হরবে চলে যাওয়ার পরও বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কাউকে কোন বিষয়ে ওকীল নিয়োগ করে এরপর ঐ বিষয়ে সে নিজেই কর্ম সম্পাদন করে তাহলে ওয়াকালাহ্ বাতিল হয়ে যাবে।

এই বক্তব্য বেশ কয়েকটি ছুরতকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন নিজে গোলামকে আযাদ করার জন্য কিংবা গোলামের সঙ্গে কিতাবাত চুক্তি করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করল পরে মুআক্কিল নিজেই তাকে আযাদ করল কিংবা তার সঙ্গে কিতাবাত চুক্তি করলো কিংবা তার সাথে (নির্দিষ্ট) কোন বস্তু খরিদ করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করলো এবং পরে সে নিজেই তা করে ফেললো, কিংবা তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের জন্য উকীল নিযুক্ত

করলো তারপর সে নিজেই তা করে ফেললো। কিংবা তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের জন্য ওকীল নিযুক্ত করলো, তারপর সে নিজেই তিন তালাক দিলো, কিংবা এক তালাক দিলো আর ইদ্দত পার হয়ে গেলো। কিংব স্ত্রীর সাথে খোলা করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করলো, তারপর সে নিজেই তার সাথে খোলা করলো (এসকল ক্ষেত্রে ওয়াকালাহ বাতিল হয়ে যায়)। কেননা যখন সে নিজেই কর্মসম্পাদন করে ফেললো তখন ওকীলের পক্ষে পুন:কর্মসম্পাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ওয়াকালাহ বাতিল হয়ে যায়। এমনকি যদি ঐ স্ত্রীলোকটিকে নিজেই বিবাহ করে, অতঃপর তাকে বায়েন তালাক প্রদান করে তখন ওকীল তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্প্রদান করতে পারে না। কেননা বিবাহের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি ওকীল নিজেই স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করে এবং বায়েন তালাক প্রদান করে তাহলে সে তাকে মুআক্কিলের সঙ্গে বিবাহ সম্প্রদান করতে পারে। কেননা মুআক্কিলের বিবাহের প্রয়োজন রয়ে গেছে।

তদ্রূপ (ওয়াকালাহ বাতিল হয়ে যাবে) যদি সে তার গোলামকে বিক্রি করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করে, অত:পর নিজেই তাকে বিক্রি করে।

তবে বিক্রির পর যদি দোষের কারণে আদালতের মাধ্যমে গোলামটি তার কাছে ফেরত দেয়া হয় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে দ্বিতীয়বার বিক্রি করার অধিকার ওকীলের নেই।

কেননা তার নিজের বিক্রি করার অর্থ ছিলো ওকীলকে কর্মসম্পাদন থেকে বাধা দেওয়া। সুতরাং এটা তাকে অপসারণের মত হলো।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, ওকীল তাকে দ্বিতীয়বার বিক্রি করতে পারে। কেননা উকীল নিয়োগের অর্থ যেহেতু কর্মসম্পাদনে বাধা প্রত্যাহার (আর তা বহাল রয়েছে) সেহেতু ওয়াকালাহ্ বহাল রয়েছে। আর বিক্রয়ের অক্ষমতা দূরীভূত হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে যদি গোলামকে হেবা করার জন্য ওকীল নিযুক্ত করে, অত:পর নিজেই দ্বিতীয়বার হেবা করার অধিকার থাকে না।

কেননা মুআক্কিল ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত। সুতরাং তা হেবা করার প্রয়োজন না থাকা প্রমাণ করে।

পক্ষান্তরে আদালতের মাধমে দোষজনিত কারণে ফেরত আসা তার ইচ্ছা ছাড়া সম্পন্ন হয়। সুতরাং তা ছাড়া প্রয়োজন না থাকা প্রমাণ হয় না। সুতরা যখন তার কাছে তার গোলামের পূর্বমালিকানা ফেরত আসে, তখন ওকীলের বিক্রয় করার ক্ষমতাও ফিরে আসবে। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

كتاب الدعوى

অধ্যায় ঃ দাবী উত্থাপন প্রসংগে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বাদী ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে, যাকে নালিশ প্রত্যাহার করার পর তা অব্যাহত রাখতে বাধ্য করা হয় না। আর বিবাদী বলে ঐ ব্যক্তিকে যাকে প্রতিপক্ষের জবাব দিতে বাধ্য করা যায়। বাদী ও বিবাদীর মধ্যে পার্থক্য বোঝা মামলা ও বিবাদের যাবতীয় বিধানের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। আর এ সম্পর্কে মাশায়েখগণের বক্তব্য বিভিন্ন। একটি বক্তব্য তো কুদূরী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এটা সর্ব ব্যাপক ও বিশুদ্ধ সংজ্ঞা।

কেউ কেউ বলেছেন, বাদী হলো ঐ ব্যক্তি, যে প্রমাণ ছাড়া হকদার হয় না। যেমন অন্যের দখলস্থ বস্তুর মালিকানা দাবীকারী। আর বিবাদী হলো ঐ ব্যক্তি, যে প্রমাণ ছাড়া শুধু নিজের বক্তব্য বলে হকদার হয়। যেমন দখলদার ব্যক্তি।

আবার কেউ কেউ বলেন, বাদী হলো ঐ ব্যক্তি, যে স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত বক্তব্য প্রদান করে। আর বিবাদী হলো ঐ ব্যক্তি, যে স্বাভাবিক অবস্থাকে বক্তব্য রূপে পেশ করে।

আর মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যে প্রতিপক্ষের বক্তব্য অস্বীকার করে, সেই হলো বিবাদী। এটা অবশ্য সঠিক। কিন্তু কে যে অস্বীকারকারী, তা বোঝাই হলো সমস্যা।

আমাদের মাশায়েখদের মাঝে যারা বিচক্ষণ, তাদের মতে গুণগত দিক দ্বারাই অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। কেননা গুণগত দিকই বিবেচ্য, বাহ্যিক অবস্থা বিবেচ্য নয়। কারণ আমানত গ্রহীতা যদি বলে যে, আমি আমানত ফেরত প্রদান করেছি, তখন কসমসহ তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও বাহ্যত: সে আমানত ফেরত দেওয়ার দাবী করছে। কেননা গুণগত ও উদ্দেশ্যেগতভাবে যিমান (বা দায়) ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না শ্রেণীগতভাবে এবং পরিমাণগতভাবে নির্ধারিত কোন বস্তু উল্লেখ করে।

কেননা দাবীর ফলাফল হলো প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে (প্রতিপক্ষের উপর) দায় আরোপ করা। আর অজ্ঞাত বিষয়ে দায় আরোপ সাব্যস্ত হয় না।

যদি দাবীকৃত বস্তুটি বিবাদীর হাতে স্থানান্তরযোগ্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা উপস্থিত করতে বাধ্য করা হবে।

যেন বাদী দাবীর সময় সেদিকেই ইংগিত করতে সক্ষম হয়। সাক্ষ্য প্রদান ও কসম করানোর ক্ষেত্রে একই হুকুম।

কেননা দাবীর বিশুদ্ধতার জন্য যতদূর সম্ভব পরিচিত করা শর্ত। আর স্থানান্তর যোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে সেটা হবে ইশারার মাধ্যমে। কেননা স্থানান্তর করা সম্ভব। আর ইশারা হলো পরিচিতি প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর।

আর বিশুদ্ধ দাবীর সঙ্গে কয়েকটি বিষয় সম্পৃক্ত হয়। যেমন বিবাদীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হওয়া। সকল যুগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিচারকের এটাই হলো সিদ্ধান্ত।

আর বিবাদী যখন উপস্থিত হবে তখন (হাঁ বা না বলে) উত্তর দেয়া বাধ্যতামূলক হওয়া, যাতে তার উপস্থিতি অর্থবহ হয়।

আর দাবীকৃত বস্তুটি উপস্থিত করা। এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি।

আর (বাদী বাইয়েনাহ পেশ করতে অক্ষম হলে এবং) বিবাদী অস্বীকার করলে কসম ওয়াজিব হওয়া। ইনশাআল্লাহ্ অতি সত্তর তা আমরা বর্ণনা করবো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দাবীকৃত বস্তুটি যদি উপস্থিত করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার বাজার মূল্য উল্লেখ করতে হবে।

যাতে দাবীকৃত বস্তু পরিচিত হয়ে যায়। কেননা (অস্থাবর) বস্তুর গুণ বর্ণনা দ্বারা পরিচিত হয় না। (কেননা বহু বস্তু একটি গুণে শরীক হতে পারে।) পক্ষান্তরে মূল্যের মাধ্যমে বস্তু পরিচিত হতে পারে। আর কখনো বস্তুটি অবলোকন করা দুসাধ্য হয়।

ফকীহ আবুল লায়স বলেছেন, মূল্য বর্ণনার সাথে সাথে (প্রাণী ক্ষেত্রে) তা পুরুষ না স্ত্রী তা উল্লেখ করতে হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি স্থাবর সম্পত্তি দাবী করে তাহলে তার চৌহদ্দি বর্ণনা করতে হবে আর একথা বলতে হবে যে, তা বিবাদীর দখলে আছে এবং সে তার কাছ থেকে তা ফেরত দাবী করছে।

কেননা (কাযীর মজলিসে) স্থানান্তর অসম্ভব হওয়ার কারণে ইশারার মাধ্যমে তার পরিচায়ন সম্ভব নয়। সুতরাং চৌহদ্দি বর্ননার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে। কেননা চৌহদ্দি বর্ণনা দ্বারা স্থাবর সম্পত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হবে। কেননা চৌহদ্দি বর্ণনা দ্বারা স্থাবর সম্পত্তির পরিচায়ন করা হয়।

আর চতুর্সীমা বর্ণনা করতে হবে এবং চার দিকের ভূমির মালিকদের নাম ও বংশ পরিচয় উল্লেখ করতে হবে। শহর ও অঞ্চল উল্লেখ করার পর চৌহদ্দি উল্লেখ করা জরুরী এজন্য যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এর দ্বারা পরিচায়নের পূর্ণতা সম্পন্ন হয়। যেমন আগে আলোচিত হয়েছে। এটাই বিশুদ্ধ মত।

আর লোক যদি প্রসিদ্ধ হয় তাহলে তার নামোল্লেখই যথেষ্ট হবে।

আর যদি তিন দিকের সীমানা উল্লেখ করে তাহলে আমাদের মতে তা যথেষ্ট হবে। কেননা অধিকাংশের উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু ইমাম যুফার (র) ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আর চতুর্থ সীমানা উল্লেখ করতে গিয়ে যদি ভুল করে তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তা দ্বারা দাবীকৃত বিষয় ভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তার উল্লেখ পরিহার করা দ্বারা ভিন্নতা আসে না।

আর দাবীর ক্ষেত্রে যেমন চৌহদ্দি বর্ণনা করার শর্ত, তেমনি সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তা শর্ত।

কিতাবে যে বলা হয়েছে— "এ কথা উল্লেখ করতে হবে যে, দাবীকৃত বস্তুটি বিবাদীর দখলে আছে"- এটা অপরিহার্য। কেননা দাবীকৃত বস্তু যদি বিবাদীর দখলে থাকে তবেই সে প্রতিপক্ষ রূপে বিবেচিত হবে।

পক্ষান্তরে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাদীর একথা উল্লেখ করা এবং বিবাদীর একথা সত্যায়ন করা যথেষ্ট নয় যে, সেটা তার দখলে আছে। বরং স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাইয়েনা ছাড়া কিংবা কাযীর অবগতি ছাড়া দখল সাব্যস্ত হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। এটা যোগসাজশের অপবাদ দূর করার জন্য জরুরী। কেননা হতে পারে যে, সম্পত্তি বাদী ও বিবাদী ছাড়া কারো হাতে আছে। অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়টা ভিন্ন। কেননা সে ক্ষেত্রে দখল দেখা যাচ্ছে। আর কিতাবের এই শব্দ– সে তা দাবী করছে। কেননা প্রাপ্য দাবী করা তার হক। সুতরাং দাবী উত্থাপন করা অপরিহার্য। তাছাড়া এমনও সম্ভাবনা আছে যে, দাবীকৃত জিনিসটি বিবাদীর হাতে বন্ধক অবস্থায় আছে কিংবা বিবাদীর হাতে মূল্যের বিপরীতে আটক আছে। যখন সে প্রাপ্য বলে দাবী করবে তখন এই সম্ভাবনা বিদূরীত হবে। আর এই সম্ভাবনার কারণেই মাশায়েখগণ বলেছেন যে, অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাদীকে বলতে হবে যে, তা বিবাদীর দখলে অন্যায়ভাবে রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি দাবীকৃত জিনিসটি বিবাদীর যিম্মায় সাব্যস্ত কোন হক (বা ঋণ) হয় তাহলে বাদীকে একথা বলতে হবে যে, সে বিবাদীর কাছ থেকে এই হক পাওয়ার দাবী করছে।

কারণ আমরা আগে বলেছি। এটা এজন্য যে, প্রাপ্য যার কাছে রয়েছে, সেই বিবাদী আদালতে উপস্থিত রয়েছে। এখন দাবী করা ছাড়া আর কোন করণীয় অবশিষ্ট নেই। ভিন্ন শ্রেণী ও পরিমাণের দ্বারা পরিচয় প্রদান জরুরী। কেননা এর দ্বারাই ঋণের পরিচয় লাভ হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এভাবে দাবী উত্থাপন যখন বিশুদ্ধ হয়ে গেলো তখন কাযী বিবাদীকে দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন;

যাতে কাযীর সামনে ফায়সালার ধরণ স্পষ্ট হয়ে যায়।

আর বিবাদী যদি স্বীকার করে নেয় তাহলে কাযী বিবাদীর বিপক্ষে ঐ দাবী সম্পর্কে রায় প্রদান করবেন।

কেননা স্বীকারোক্তি নিজেই দায় সাব্যস্তকারী। সুতরাং কাযী তাকে তার স্বীকারোক্তির দায় থেকে বের হয়ে আসার আদেশ করবেন।

আর যদি সে অস্বীকার করে তাহলে বাদীর কাছে বাইয়েনাহ তলব করবেন।

কেননা নবী (সা) (বাদীকে) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ألك بينة -তোমার কি বাইয়েনাহ আছে? বাদী বললো, না নেই। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, لك يمين -তাহলে তোমার অধিকার রয়েছে তার কাছে কসম তলক করার।

এঘটনায় নবী (স) প্রথমে বাইয়েনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং বাইয়েনাহ না থাকা অবস্থায় কসম আরোপ করেছেন। সুতরাং (বাদীকে বাইয়েনাহ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা জরুরী, যাতে কাযী বিবাদীকে কসম করাতে পারেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বাদী যদি বাইয়েনাহ পেশ করে তাহলে কাযী সে অনুযায়ী ফায়সালা করবেন।

কেননা দাবী সম্পর্কে তোহমতের সম্ভাবনা দূর হয়ে গেছে।

আর যদি সে বাইয়েনাহ্ পেশ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং প্রতিপক্ষ থেকে কসম করে তাহলে কাযী তাকে দাবী সম্পর্কে কসম করবেন।

কারণ আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস।

তবে বাদীর পক্ষ থেকে বিবাদীর কসম তলব করা জরুরী। কেননা এই কসম হলো তার নিজস্ব হক। দেখুন না, হাদীস শরীফে কিভাবে ل অব্যয় দ্বারা এটাকে বাদীর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুতরাং তার পক্ষ থেকে কসমের তলব জরুরী।

পরিচ্ছেদ ঃ কসম প্রসঙ্গ

বাদী যদি বলে যে, আমার বাইয়েনাহ উপস্থিত আছে, তারপর সে (প্রতিপক্ষের কাছ থেকে) কসম দাবী করে তাহলে তাকে কসম করানো হবে না; ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে। এর অর্থ হলো শহরে উপস্থিত আছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, কসম করানো হবে। কেনন কসম হলো প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বাদীর হক। সুতরাং বাদী যখন (বিবাদীর কাছে) তা দাবী করবে তখন কাযী তার দাবী গ্রহণ করবেন।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, বাইয়েনাহ উস্থাপনে বাদীর অক্ষমতার উপর তার হক সাব্যস্ত হয়। কারণ, আমাদের বর্ণিত হাদীস। সুতরাং সেই অক্ষমতা ছাড়া কসম-এর উপর বাদীর হক সাব্যস্ত হবে না। যেমন, কাযীর মজলিসে বাইয়েনাহ উপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে।

ইমাম খাস্সাফের বর্ণনা মতে ইমাম মুহম্মদ (র) ইমাম আবু হানীফার (র) সঙ্গে রয়েছেন।

আর ইমাম তাহাবী (র)-এর বর্ণনা মতে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সঙ্গে রয়েছেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বাদীর উপর কসম পাল্টা আরোপ করা হবে না।

কেনেনা নবী (সা) বলেছেন البينة على المدعى واليمين على من انكر (বাইয়েনাহ বাদীর উপর আর কসম অস্বীকার কারীর উপর)।

এ হাদীসে বিষয় দুটিকে ভাগ করা হয়েছে। আর বন্টন শরীকানার বিপরীত। (সুতরাং বাদী বাইয়েনাহ ও কসম দুটোতে শরীক হতে পারে না।)

তাছাড়া অস্বীকারকারীদের জন্য কসম-এর জিন্‌স বা জাতি সত্তাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর জাতি সত্তার বাইরে তার কিছুই বিদ্যমান হতে পারে না।

এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ভিন্নমত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (কারণ বর্ণনা ব্যতীত) শুধু মালিকানা দাবীর ক্ষেত্রে দখলদারের বাইয়েনাহ গ্রহণ করা হবে না। বরং সে ক্ষেত্রে দখলবঞ্চিত ব্যক্তির বাইয়েনাহ অগ্রাধিকারযোগ্য।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এক্ষেত্রে দখলদারের বাইয়েনাহ অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে। কেননা তার বাইয়েনাহ দখল দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং তার হক অধিক প্রকাশিত হবে।

এটা পশুর প্রসবের দাবীর ন্যায় ও বিবাহের দাবীর ন্যায়। আর আযাদ করাসহ মালিকানার দাবী কিংবা উম্মে ওয়ালাদ বানানো কিংবা মোদাব্বার বানানোসহ মালিকানার দাবীর ন্যায় হলো।

আমাদের দলীল এই যে, অদখলদার ব্যক্তির বাইয়েনাহ (মালিকানাকে) অধিকতর সাব্যস্তকারী কিংবা অধিকতর প্রকাশকারী। কেননা দখল যে পরিমাণ মালিকানা সাব্যস্ত করে দখলদারের বাইয়েনাহ সে মালিকানা সাব্যস্ত করে না। কারণ দখল তো সূত্র বিহীন মালিকানার প্রমাণ।

পশুর প্রসবের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দখল প্রসব প্রমাণ করে না। তদ্রূপ দখল আযাদ করা ওম্মে ওয়ালাদ বানানো এবং মোদাব্বার বানানো প্রমাণ করে না, তদ্রূপ এই তিনটির ফলশ্রুতিতে যে 'ওয়ালা' সাব্যস্ত হয় তাও প্রমাণ করে না। (বরং বাইয়েনা দ্বারাই তা সাব্যস্ত হয়, সুতরাং উভয় প্রমাণ সমমর্যাদার হলো।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বিবাদী যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে অস্বীকৃতির কারণে কাযী তার বিপক্ষে রায় প্রদান করবেন এবং বাদী তার বিপক্ষে যে দাবী করেছে সে দাবী তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত করবেন।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, অস্বীকৃতির ভিত্তিতে রায় প্রদান করবেন না, বরং বাদীর উপর কসম ফেরত আরোপ করবেন। যখন সে কসম করবে তখন তার কসমের ভিত্তিতে (তার অনুকূলে) ফায়সালা করবেন।

কেননা অস্বীকারের মধ্যে-এর সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে মিথ্যা কসম পরিহার করতে চায় এবং সত্য কসম থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে চায় আর অবস্থা অস্পষ্টও হতে

পারে। সুতরাং বিভিন্নমুখী সম্ভাবনাসহ অস্বীকৃতি প্রমাণ রূপে দাঁড়াতে পারে না। পক্ষান্তরে বাদীর কসম তার দাবীর সত্যতার সুস্পষ্টতার প্রমাণ। সুতরাং তার কসমের শরণাপন্ন হতে হবে।

আমাদের দলীল এই যে, বিবাদীর অস্বীকৃতির মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে (বাদীর) দাবী পূরণ করতে চায় অথবা সে দাবী স্বীকার করে নিচ্ছে। কেননা তা না হলে সে তার কর্তব্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কিংবা তার উপর আরোপিত ক্ষতিরোধ করার জন্য অবশ্যই কসমে উদ্যোগী হতো। সুতরাং এই দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

আর যে হাদীস আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি, তার প্রেক্ষিতে বাদীর উপর কসমের দায় ফেরত আরোপের কোন অবকাশ নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাযীর জন্য সমীচীন হবে বিবাদীকে তিনবার এই মর্মে সর্তক করা যে, আমি তোমাকে কসম করার প্রস্তাব দিচ্ছি। যদি তুমি কসম কর তাহলে তো ভালো। অন্যথায় বাদী যা দাবী করে সে সম্পর্কে তোমার বিপক্ষে ফায়সালা করবো।

এই সর্তকবাণীর উদ্দেশ্য হলো ফলাফল তাকে জানিয়ে দেওয়া। কেননা (ইজতিহাদগত মতভিন্নতার) কারণে বিষয়টি অপস্পষ্টতা সম্পন্ন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাযী যখন তিনবার প্রস্তাবটি তার সামনে পুনরুক্ত করবেন, তখন অস্বীকৃতির ভিত্তিতে তার বিপক্ষে রায় জারি করবেন।

আর এই পুনরুক্তির কথা ইমাম খাচ্ছাফ (র) উল্লেখ করেছেন অধিক সর্তকতা এবং চূড়ান্তভাবে অজুহাত প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য।

পক্ষান্তরে মূল মাযহাব এই যে, একবার প্রস্তাব পেশ করার পর অস্বীকার করার প্রেক্ষিতে যদি রায় দেওয়া হয় তাহলে তা জায়িয হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এটিই বিশুদ্ধ।

তবে (ইমাম খাস্‌সাফ বর্ণিত) প্রথম বাক্যটি অধিকতর উত্তম।

আর অস্বীকৃতি কখনো হাকিকী হতে পারে। যেমন বললো, আমি কসম করবো না। আবার হুকমী হতে পারে। যেমন নীরবতা অবলম্বন করলো। যদি জানা যায় যে, বধিরতা বা বাকহীনতার কোন প্রতিবন্ধিতা তার নেই, সেক্ষেত্রে নীরবতার বিধান মৌখিক অস্বীকৃতির বিধানের অনুরূপ। এটাই বিশুদ্ধ মত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দাবী যদি বিবাহ সংক্রান্ত হয় তাহলে অস্বীকারকারীকে কসম করানো হবে না— ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে।

তাঁর মতে বিবাহের দাবী অস্বীকার, তালাক প্রত্যাহার ঈলা প্রত্যাহার, কিংবা দাসত্বের দাবী অস্বীকার, (মনিবের পক্ষ হতে) দাসীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার দাবী অস্বীকার, নসব ও বংশ পরিচয়ের দাবী অস্বীকার, ওয়ালা এর দাবী অস্বীকার, হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার দাবী অস্বীকার, (স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রী কর্তৃক) এবং লিআন ওয়াজিব হওয়ার দাবী অস্বীকার করার কারণে কসম করানো যায় না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এই সকল ক্ষেত্রে কসম করানো হবে, হদ্দ ও লিআন ছাড়া।

'দাসীর মাতৃত্ব' (দাবী ও অস্বীকার করার সূরত এই যে, দাসী বললো, আমি মনিবের উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানের মা) আর এইটি হলো তার ঔরসজাত আমার সন্তান। (কিংবা সন্তান মারা গেছে) আর মনিব তা অস্বীকার করল। পক্ষান্তরে মনিব দাবী করলে তার স্বীকারোক্তি দ্বারাই দাসীর মাতৃত্ব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। দাসীর অস্বীকৃতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, কসম করতে অস্বীকার করার অর্থ হলো দাবী মেনে নেওয়া। কেননা এটা প্রমাণ করে যে, (বাদীর দাবী) অস্বীকার করার ব্যাপারে সে মিথ্যাবাদী, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। সুতরাং এটা স্বীকারোক্তি হবে কিংবা প্রত্যক্ষ স্বীকারোক্তির বিকল্প হবে। আর এ সকল ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কসমের অস্বীকৃতি হচ্ছে এমন স্বীকারোক্তি, যা সন্দেহপূর্ণ। আর হদ্দ সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়; এবং লি'আন হদ্দ-এর হুকুমের অর্থবোধক।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, কসম অস্বীকার করার অর্থ হলো পরিত্যাগ করা। কেননা (মামলা প্রত্যাহারের) উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার কারণে পরিত্যাগের পর কসম করা ওয়াজিব থাকে না। আর (একজন মুসলমান হিসাবে) দাবী অস্বীকার করার ক্ষেত্রে যাতে সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয় সে জন্য তাকে স্বেচ্ছায় মামলা পরিত্যাগকারী সাব্যস্ত করাই উত্তম। আর এ সকল ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা পরিত্যাগ কার্যকরী নয়।[১] আর কসম করতে বলার ফায়দা হচ্ছে অস্বীকৃতির ভিত্তিতে রায় জারি করা, সুতরাং কসম করতে বলা হবে না। তবে যেহেতু এটা হলো মামলায় ঝামেলা এড়ানোর জন্য স্বেচ্ছা পরিত্যাগ সেহেতু মোকাতাব ও (ব্যবসায়ের) অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম তা করতে পারে। যেমন সামান্য আপ্যায়ন করাতে পারে।

আর ঋণের ক্ষেত্রে বৈধতা হচ্ছে বাদীর এই ধারণার ভিত্তিতে যে, সে তার হক উশুল করছে। সুতরাং এখানে (ঋণের ক্ষেত্রে) স্বেচ্ছাদান বা স্বেচ্ছা পরিত্যাগের অর্থ হচ্ছে (বিবাদীর পক্ষ হতে) প্রতিরোধ প্রত্যাহার। (যা মালের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। কেননা) মালের বিষয়টি স্বচ্ছ।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, চুরির অপরাধে অভিযুক্তকে কসম করতে বলা হবে। যদি সে অস্বীকার করে তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণের দায় আরোপ করা হবে, কিন্তু তার হস্তকর্তন করা হবে না।

কেননা তার এই অপরাধ কর্মের সঙ্গে দু'টি বিষয় সম্পৃক্ত হয়। মালের ক্ষতিপূরণ এবং হস্তকর্তন। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে অস্বীকৃতিকে আমলে আনা হবে। কিন্তু তা দ্বারা হস্তকর্তন সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং তার বিপক্ষে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য প্রদানের মত হলো।

---

১. কেননা স্ত্রীলোক যদি বলে যে, তোমার এবং আমার মাঝে বিবাহ হয়নি, তবে আমি স্বেচ্ছায় আমার অবস্থান পরিত্যাগ করে নিজেকে স্বেচ্ছা দান করছি, তাহলে এই স্বেচ্ছা দান গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, স্ত্রী যদি সহবাসপূর্ব তালাকের দাবী করে তাহলে স্বামীকে কসম করতে বলা হবে। যদি সে অস্বীকার করে তাহলে সবার মতেই তার উপর অর্ধেক মোহরের দায় আরোপ করা হবে।

কেননা ইমামদের মতে, তালাকের ক্ষেত্রে কসম তলব করা যায়। বিশেষত: যখন উদ্দেশ্য হয় আর্থিক দায় সাব্যস্ত করা।

তদ্রূপ বিবাহের ক্ষেত্রেও স্বামীকে কসম করতে বলা হবে, যদি স্ত্রী মোহর দাবী করে। কেননা এটা হলো মালের দাবী, অতঃপর স্বামী কসম অস্বীকার করার ভিত্তিতে মাল সাব্যস্ত হবে। তবে বিবাহ সাব্যস্ত হবে না। তদ্রূপ নসব ও বংশ পরিচয়ের ক্ষেত্রেও (বিবাদীকে কসম করতে বলা হবে)। যদি বাদীর উদ্দেশ্য হয় কোন হক দাবী করা, যেমন মীরাছ, কিংবা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর প্রতিপালনের অধিকার, কিংবা ভরণপোষণের হক, কিংবা হেবা ফেরত নেওয়ার অবৈধতা। কেননা এসকল ক্ষেত্রে বংশ পরিচয় দাবী করার মূল উদ্দেশ্য এই সকল হক আদায় করা।

আর সাহেবায়নের মতে, শুধু নসব ও বংশ পরিচয় দাবী করার ক্ষেত্রে তখনই বিবাদীকে কসম করতে বলা হবে, যখন শুধু তার দাবী বা স্বীকৃতি দ্বারাই বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে যায়। যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে কাউকে পিতা বলে বা পুত্র বলে দাবী করা, আর স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে কাউকে পিতা বলে দাবী করা (কাউকে পুত্র বলে, দাবী করা নয়) কেননা স্ত্রী লোকের কাউকে পুত্র বলে দাবী করার অর্থ অন্যের উপর বংশ পরিচয় চাপিয়ে দেয়া।

আর মনিব ও স্বামীর স্বীকারোক্তি নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।[১]

ইমাম কুদুরী বলেন, কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে কিসাসের দাবী তোলে আর সে অস্বীকার করে, তাহলে সকলের মতেই তার উপর কসম আরোপ করা হবে। তবে জান ব্যতীত (অন্য প্রত্যঙ্গের) কিসাসের ক্ষেত্রে যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে তার উপর কিসাস লাযিম হবে। আর যদি জানের কিসাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে তাহলে কসম করা কিংবা স্বীকার করা পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে।

এটা হলো ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। সাহেবায়ন বলেন, (জানের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের) উভয় ক্ষেত্রেই দিয়াত লাযিম হবে। কেননা তাঁদের মতে কসম অস্বীকার করা সন্দেযুক্ত স্বীকৃতি। সুতরাং তা দ্বারা কিসাস সাব্যস্ত হবে না। বরং তা দ্বারা মাল বা দিয়াত ওয়াজিব হবে। যদি বিবাদীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কারণে কিসাস বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন বিবাদী ঘটনাটি ভুলক্রমে হয়েছে বলে স্বীকার করলো, আর ওয়ালী (বা বাদী) ইচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে বলে দাবী করল।

---

১. যেমন স্ত্রীলোক দাবী করলো যে, অমুক আমার মনিব বা স্বামী, কিংবা কোন পুরুষ দাবী করলো যে, অমুক লোক আমার মনিব। কিংবা অমুক নারী আমার স্ত্রী। অথচ বাইয়েনাহ পেশ করতে পারলোনা, তখন বিবাদী পুরুষ হোক বা নারী, যদি কসম করতে অস্বীকার করে তবে এটাকে স্বীকারোক্তি ধরা হবে এবং দাবী সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে মালের অনুরূপ আচরণ করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রেও স্বেচ্ছায় অঙ্গদান কার্যকর হবে। জানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা যদি কেউ বলে যে, আমার হাত কেটে ফেলো, আর সে কেটে ফেলল তাহলে কর্তনকারীর উপর যিমান ওয়াজিব হবে না। এটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় দান কার্যকর হওয়ার প্রতিফলন। তবে যেহেতু এতে কোন ফায়দা নেই সেহেতু এই কর্তন জায়িয হবে না। পক্ষান্তরে কসম অস্বীকার করার মাধ্যমেই এই স্বেচ্ছায় অঙ্গদান অর্থবহ। কেননা তা দ্বারা আমলার লড়াই নিরসন হয়। সুতরাং এটা পচনশীল ক্ষতের কারণে হাত কেটে ফেলা এবং ব্যাথার কারণে দাঁত উপড়ে ফেলার মত হলো।

যাই হোক, জানের ক্ষেত্রে যেহেতু স্বেচ্ছায় দান কার্যকর নয়, সেহেতু (কসম অস্বীকার করার কারণে) জানের ক্ষেত্রে যখন কিসাস অসিদ্ধ হলো, অথচ কসম হলো তার কাছে বাদীর প্রাপ্য হক; সেহেতু ঐ হকের কারণে তাকে আটক করা হবে। যেমন 'কাসামাহ' এর ক্ষেত্রে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বাদী যদি বলে যে, শহরে আমার বাইয়েনা উপস্থিত আছে, তাহলে তার প্রতিপক্ষকে বলা হবে যে, তুমি তিন দিনের জন্য তোমার ব্যক্তিসত্তার কাফীল (বা যামিন) পেশ কর।

যাতে বিবাদী গায়েব হয়ে যেতে না পারে, তখন তো বাদীর হক নষ্ট হয়ে যাবে। আর ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, আমাদের মতে ব্যক্তি সত্তার কাফালাহ (বা জামানত) জায়িয আছে।

আর আমাদের মতে, নিছক দাবীর ভিত্তিতে কাফীল গ্রহণ সূক্ষ্ম কিয়াসের বিধান।

কেননা এতে বাদীর স্বার্থ রক্ষা হয়। অথচ বিবাদীর বেশী কোন ক্ষতি নেই। আর এটা এজন্য যে, শুধু দাবীর ভিত্তিতেই আদালতে হাজির হওয়া বিবাদীর জন্য জরুরী। এমন কি বিবাদীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে শাসকের সাহায্য নেয়া যায়। আর বিবাদী ও তার কাজের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং উপস্থিত করার ব্যাপারে কাফীল গ্রহণ করা জায়িয হবে।

কেননা এতে বাদীর স্বার্থ রক্ষা হয়। অথচ বিবাদীর বেশী কোন ক্ষতি নেই। আর এটা এজন্য যে, শুধু দাবীর ভিত্তিতেই আদালতে হাজির হওয়া বিবাদীর জন্য জরুরী। এমন কি বিবাদীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে শাসকের সাহায্য নেয়া যায়। আর বিবাদী ও তার কাজের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং উপস্থিত করার ব্যাপারে কাফীল গ্রহণ করা জায়িয হবে।

আর তিন দিনের সময় নির্ধারণ ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে। এটাই বিশুদ্ধ মত। আর যাহিরে রিওয়ায়াতের মতে বিবাদী আঘাত ও সাধারণ হওয়া এবং বিখ্যাত ও মান্যগণ্য হওয়ার মাঝে, তদ্রূপ মালের পরিমাণ অল্প ও বেশী হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

তবে কাফীল গ্রহণের জন্য বাদীর এ ঘোষণা দেয়া জরুরী যে, আমার বাইয়েনা (বা সাক্ষী) শহরে উপস্থিত রয়েছে। সুতরাং বাদী যদি বলে যে, আমার কোন বাইয়েনাহ বা সাক্ষী নেই কিংবা বলে যে, আমার সাক্ষীগণ অনুপস্থিত, তাহলে কোন ফলাফল না থাকার কারণে কাফীল গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি সে কাফীল পেশ করে তাহলে তো ভালো। অন্যথায় বাদীকে তার পিছনে লেগে থাকার আদেশ দেওয়া হবে, যাতে তার হক নষ্ট না হয়। তবে বিবাদী যদি পরদেশী বা মুসাফির হয় তাহলে শুধু কাযীর মজলিস চলা পর্যন্ত তার পিছনে লেগে থাকার আদেশ দেওয়া হবে।

তদ্রূপ মজলিসের শেষ পর্যন্ত কাফীল গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ ব্যতিক্রমায়নের বিষয়টি উভয় বিধানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেননা এই পরিমাণের বেশী সময় পিছনে লেগে থাকা বা কাফীল গ্রহণ করা তার ক্ষতির কারণ হবে এবং তার সফরকে বাধাগ্রস্ত করবে। পক্ষান্তরে এই পরিমাণের ক্ষেত্রে দৃশ্যত: কোন ক্ষতি নেই এর মাঝে বাইয়েনাহ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে কাযী আর অপেক্ষা না করে কসমের ভিত্তিতে ফায়সালা করে মজলিস শেষ করে দেবেন।

আর পিছনে লেগে থাকার সূরত কী হবে, সে সম্পর্কে আমরা كتاب الحجر (বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ অধ্যায়ে) আলোচনা করবো ইন্‌শাআল্লাহ্।

কসম করা এবং কসম করানোর পদ্ধতি প্রসঙ্গে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কসম আল্লাহ্‌র নামে হবে, গায়রুল্লাহ্‌র নামে নয়।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر - তোমাদের কেউ যদি কসম করতে চায় তবে সে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম করে; নাহলে কসম পরিত্যাগ করবে।

নবী (সা) আরো বলেছেন,

من حلف بغير الله فقد أشرك (الترمذى و احمد والحاكم)

যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্‌র নামে কসম করল সে শিরক করল।

আর কখনো আল্লাহ্‌র গুণাবলী উল্লেখ করে কসমকে জোরদার করা যায়।

আর গুণাবলী উল্লেখ হলো কসমকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্য। তা যেমন বিবাদীকে বলা হলো যে, বলো, ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সব জানেন, যিনি দয়ালু ও দয়াবান, যিনি প্রকাশ্য বিষয় যেমন জানেন তেমনি গোপন বিষয় জানেন, এই অমুক ব্যক্তির তোমার উপর বা তোমার কাছে ঐ মালের কোন অংশই পাওনা নেই, যে মাল সে দাবী করছে; আর তার পরিমাণ এত এত।

আর কসমকে দৃঢ় করার ক্ষেত্রে কাযী এই বাক্যের মধ্যে কম-বেশীও করতে পারেন। তবে কাযীকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন কসম তার উপর পুনরাবৃত্ত না হয়। কেননা তার যিম্মায় প্রাপ্য হলো একটি কসম।

আর কাযীর ইচ্ছাধিকার রয়েছে। তিনি চাইলে কসমকে কঠিন করতে পারেন, চাইলে কঠিন নাও করতে পারেন। বরং শুধু বলতে পারেন যে, বলো, 'আল্লাহ্‌র কসম' আর কেউ কেউ বলেন, নেক সুপরিচিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কসম কঠিন করবে না, এবং অন্যদের উপর কঠিন করবেন। আর কেউ কেউ বলেন, বেশী মূল্যবান সম্পদের ক্ষেত্রে কসম কঠিন করবেন, তুচ্ছ মালের ক্ষেত্রে নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বিবি তালাক বা গোলাম আযাদের নামে কসম নেওয়া হবে না।

এর দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ। কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের বর্তমান যামানায় বাদী পক্ষ যদি পীড়াপীড়ি করে তাহলে কাযীর জন্য এই ধরনের কসম করানোর বৈধতা রয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র নামে কসম করার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে

বেপরোয়াভাব বেড়ে গেছে। আর স্ত্রী তালাকের কসম দেওয়ার কারণে মানুষ বেশী বিরত থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইহুদীকে এভাবে কসম করানো হবে যে, ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি মুসা (আ)-এর উপর তাওরাত নাযিল করেছেন, খ্রীস্টানকে এভাবে কসম করানো হবে যে, ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ইসা (আ)-এর উপর ইঞ্জিল নাযিল করেছেন।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইবনে ছোরিয়া আল-আ'ওয়ার থেকে এভাবে কসম নিয়েছিলেন যে, তোমাকে ঐ আল্লাহ্‌র নামে কসম দিচ্ছি, যিনি মূসা (আ) এর উপর তাওরাত নাযিল করেছেন যে, তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি কি এরূপ?

তাছাড়া এজন্য যে, যেহেতু মুসা (আ) এর ইহুদী 'নবুয়ত বিশ্বাস করে আর নাছরানী যেহেতু যেহেতু ঈসা (আ)-এর নবুয়ত বিশ্বাস করে সেহেতু উভয়ের প্রত্যেককে তার নবীর উপর নাযিলকৃত কিতাবের উল্লেখ দ্বারা কঠিন কসমের সম্মুখীন করা হবে।

আর অগ্নিপূজককে এভাবে কসম করানো হবে; ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আগুনকে সৃষ্টি করেছেন।

মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) এমনই উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, খালেস আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কাউকে কসম করানো হবে না।

আর ইমাম খাচ্ছাফ (র) বলেন, ইহুদী ও নাছারা ছাড়া অন্যদের শুধু আল্লাহ্‌র নামে কসম করানো হবে। আমাদের কোন কোন মাশায়েখ এটাকেই গ্রহণ করেছেন। কেননা আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে আগুনের উল্লেখে আগুনের প্রতি তা'যীম প্রদর্শন হয়। অথচ আগুনের প্রতি তা'যীম প্রদর্শন উচিৎ নয়। আর কিতাবদ্বয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত সমস্ত কিতাব সম্মানযোগ্য।

আর মূর্তিপূজককে শুধু আল্লাহ্‌র নামে কসম করানো হবে। কেননা সকল কাফির আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্বাস করে। আল্লাহ্ বলেন-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

—যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ্।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তাদের উপাসনালয়ে কসম করানো হবে না।

কেননা কাযী তো যেখানে উপস্থিত হতে পারবেন না, বরং তার তো সেখানে উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বিশেষ কোন সময় বা স্থান দ্বারা মুসলমানের কসমকে দৃঢ় করা ওয়াজিব নয়।

কেননা কসমের উদ্দেশ্য হলো যার নামে কসম করা হচ্ছে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আর তা তো এ ছাড়াই হাছিল হয়েছে। তাছাড়া স্থান ও কাল নির্ধারণ করাতে কাযীর অসুবিধা রয়েছে। কেননা তিনি সেখানে উপস্থিত হতে বাধ্য হবেন। অথচ এ যিম্মাদারী তার উপর নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি দাবী করে যে, সে এই লোকের কাছ থেকে তার গোলাম এক হাজার দিয়ে ক্রয় করেছে। আর সে তা অস্বীকার করে। তখন কাযী বিবাদীকে এই মর্মে কসম করাবেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, এই গোলামের ব্যাপারে তোমাদের মাঝে কোন বিক্রয় চুক্তি বিদ্যমান নেই। এভাবে কসম করাবে না যে, আল্লাহ্‌র কসম আমি বিক্রি করি নি।

কেননা অনেক সময় বস্তু বিক্রি করা হয় তারপর বিক্রি প্রত্যাহারও করা হয়।

আর গসবের দাবীর ক্ষেত্রে এভাবে কসম করানো হবে, আল্লাহ্‌র কসম, সে ঐ বস্তুটি তোমার কাছে ফেরত পাওয়ার হকদার নয়। এভাবে কসম করাবে না যে, আল্লাহ্‌র কসম আমি গসব করিনি। কেননা কখনো কখনো গসবের পর হেবার মাধ্যমে বা বিক্রির মাধ্যমে রহিত করা হয়।

বিবাহের দাবী অস্বীকারের ক্ষেত্রে এভাবে কসম করানো হবে যে, আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের মাঝে বর্তমানে বিবাহ সম্পর্ক বিদ্যমান নেই।

কেননা বিবাহের পর 'খোলা' সম্পন্ন হতে পারে।

আর তালাকের দাবীর ক্ষেত্রে এভাবে কসম করাবে যে, তুমি যেভাবে উল্লেখ করেছো, সেভাবে সে বর্তমানে তোমার থেকে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত নয়। এভাবে কসম করাবে না যে, আল্লাহ্‌র কসম তাকে সে তালাক দেয় নি।

কেননা বায়েন তালাকের পর কখনো বিবাহ নবায়িত হয়ে থাকে। মোট কথা এই সকল সুরতে 'কারণ' দ্বারা সম্পন্ন কার্যের উপর কসম নেয়া হবে। কেননা 'কারণ'-এর উপর কসম নেয়া হলে বিবাদী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এটা হলো ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ) এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে এসকল ক্ষেত্রে কারণ এর উপর কসম নেওয়া হবে। তবে বিবাদী যদি আমাদের উল্লেখিত বিষয় (অর্থাৎ কারণ-এর উপর কসম করতে) আপত্তি করে তখন 'কারণ' দ্বারা সম্পন্ন 'কার্য'-এর উপর কসম করানো হবে।

আর কেউ কেউ বলেন যে, বিবাদীর অস্বীকৃতির স্বরূপ দেখা হবে। যদি সে 'কারণ' অস্বীকার করে (বলে যে, আমি বিক্রি করিনি বা জবর দখল করিনি, ইত্যাদি) তাহলে

'কারণ'-এর উপর কসম করানো হবে। আর যদি কারণ দ্বারা যে হুকুম বর্তায় তা অস্বীকার করে, তাহলে 'কার্য'-এর উপর কসম করানো হবে।

মোট কথা তারফায়নের মতে কারণ দ্বারা সম্পন্ন কার্যই হলো মূল, যদি তা কোন রহিতকারীর দ্বারা রহিত হয়। তবে যদি তাতে বাদীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন সবার মতেই কারণ-এর উল্লেখ দ্বারা কসম করানো হবে। যেমন তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে ইদ্দতকালের খোরপোষ দাবী করে অথচ স্বামী ঐ মাযহাবের অনুসারী, যারা এটাকে স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার মনে করে না। কিংবা সে প্রতিবেশীতার ভিত্তিতে শোফা দাবী করলো অথচ ক্রেতা প্রতিবেশীর শোফা অধিকার বৈধ মনে করে না।

কেননা এক্ষেত্রে যদি সে কারণ দ্বারা সম্পন্ন 'কার্য'-এর উপর কসম করে, তাহলে তার মাযহাবী বিশ্বাস মতে সে সত্যবাদী হবে, তখন বাদীর ক্ষেত্রে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

আর যদি কারণটি এমন হয়, যা কোন 'রহিতকারী' দ্বারা রহিত হয় না, তখন সর্বসম্মতভাবেই 'কারণ'-এর উপর কসম করানো হবে। যেমন মুসলিম গোলাম যদি মনিবের বিরুদ্ধে আযাদ করার দাবী করে। বাঁদী ও কাফির গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (আযাদ করার পর) মোরতাদ হওয়ার কারণে এবং দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে দাসীর ক্ষেত্রে দাসত্বের পুনঃঅস্তিত্ব হতে পারে। আর দাসের ক্ষেত্রে যিম্মা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করার কারণে এবং দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে দাসত্ব পুনঃ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। কিন্তু মুসলিম দাসের ক্ষেত্রে তা পুনঃ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি মীরাছ সূত্রে কোন গোলামের মালিক হয়, আর অন্য কেউ তার মালিকানা দাবী করে, তাহলে তার অবগতির উপর তাকে কসম করানো হবে।

কেননা 'মূরিছ' (যে সম্পত্তি ছেড়ে গেছে) কী করে গেছে তা তার জানা নাও থাকতে পারে। সুতরাং (বাদীর হকদার না হওয়ার) নিশ্চয়তার উপর তাকে কসম করানো যাবে না।

আর যদি গোলামটি তাকে হেবা করা হয়ে থাকে বা সে খরিদ করে থাকে তাহলে নিশ্চয়তার উপর তাকে কসম দেওয়া হবে।

কেননা (নিশ্চয়তার উপর) কসম করার 'অনুমোদক' পাওয়া গেছে। কারণ ক্রয় ও দান দু'টোই সত্তাগতভাবেই মালিকানা সাব্যস্তের কারণ।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে কোন মাল দাবী করে আর বিবাদী কসম করার পরিবর্তে 'মাশুল' প্রদান করে কিংবা কসমের পরিবর্তে (উদাহরণ স্বরূপ) দশ দিরহামের উপর সমঝোতায় উপনীত হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

কসমের পরিবর্তে মাশুল প্রদান হযরত উছমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে। আর বাদী বিবাদীকে ঐ বিষয়ের উপর কখনো কসম করাতে পারবে না। কেননা সে তো তার হক রহিত করে নিয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ উভয় পক্ষ থেকে কসম নেওয়া প্রসঙ্গে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যদি বিক্রয় চুক্তি সম্পর্কে মতভিন্নতা করে, যেমন, ক্রেতা একটা মূল্য দাবী করল আর বিক্রেতা তার থেকে বেশী মূল্য দাবী করল। কিংবা বিক্রেতা একটা পরিমাণ বিক্রয় দ্রব্য স্বীকার করল আর ক্রেতা তার থেকে বেশী পরিমাণ দাবী করলো, আর দু'জনের একজন বাইয়েনাহ্ পেশ করল (আর অন্য জন তা পেশ করতে ব্যর্থ হলো) তখন ঐ বাইয়েনাহ্‌র ভিত্তিতে তার অনুকূলে রায় দেওয়া হবে।

কেননা অপর পক্ষে রয়েছে নিছক দাবী, আর বাইয়েনাহ হল দাবীর চাইতে শক্তিশালী।

আর যদি উভয়ের প্রত্যেকে বাইয়্যেনাহ পেশ করে, তাহলে অধিক পরিমাণ প্রমাণকারী বাইয়েনাহ অগ্রাধিকারযোগ্য হবে।

কেননা কোন বিষয় সাব্যস্ত করার জন্যই বাইয়েনাহ উপস্থাপিত হয়। আর অতিরিক্তের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

আর যদি মূল্য ও বিক্রয় দ্রব্য উভয়ের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হয় তাহলে মূল্যের ক্ষেত্রে বিক্রেতার বাইয়েনাহ এবং বিক্রয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার বাইয়েনাহ অগ্রাধিকারযোগ্য হবে।

এটা বলা হলো অধিক প্রমাণিত হওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে।

আ যদি উভয়ের কারোই বাইয়েনাহ্ না থাকে তাহলে ক্রেতাকে বলা হবে যে, বিক্রেতার বাইয়েনাহ এবং বিক্রয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার বাইয়েনাহ অগ্রাধিকারযোগ্য হবে।

এটা বলা হলো অধিক প্রমাণিত হওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে।

আর যদি উভয়ের কারোই বাইয়েনাহ না থাকে তাহলে ক্রেতাকে বলা হবে যে, বিক্রেতার দাবীকৃত মূল্যে যদি রাজি থাকো তাহলে তা ভালো, অন্যথায় আমরা বিক্রয় চুক্তি রহিত বলে রায় দেবো।

আর বিক্রেতাকে বলা হবে, ক্রেতার দাবী পরিমাণ বিক্রয় দ্রব্য অর্পণ করো তো ভালো, অন্যথায় আমরা বিক্রয় চুক্তি রহিত বলে রায় দেবো।

কেননা উদ্দেশ্য হলো বিরোধ নিরসন করা আর এটা বিরোধ নিবারণের একটি ছূরত। কারণ হয়ত উভয়েই বিক্রয় রহিত হওয়া পছন্দ করবে না। সুতরাং রহিতকরণের কথা জানতে পেরে পরস্পর সম্মত হয়ে যেতে পারে।

যদি তারা পরস্পর সম্মত না হয়, তাহলে বিচারক উভয়কে অপরের দাবীর ব্যাপারে কসম করাবেন।

ক্রেতার বিক্রয় দ্রব্য কবজা করার পূর্বে এই পারস্পরিক কসম কিয়াস সম্মত হবে।

কেননা বিক্রেতা অধিক মূল্য দাবী করছে, আর ক্রেতা তা অস্বীকার করছে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যে পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করছে তাতে বিক্রয় দ্রব্য অর্পণের আবশ্যকীয়তা দাবী করছে। আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করছে। এ দিক থেকে তারা প্রত্যেকে অস্বীকারকারী হচ্ছে। সুতরাং তাকে কসম করতে হবে।

পক্ষান্তরে বিক্রয় দ্রব্য কবজা করার পর এটা হবে কিয়াসের বিপরীত। কেননা বিক্রয়দ্রব্য যেহেতু তার হাতে নিরাপদ রয়েছে, সেহেতু ক্রেতা কোন কিছুর দাবীদার হচ্ছে না। সুতরাং অধিক মূল্যের ক্ষেত্রে বিক্রেতার দাবীই শুধু থেকে যাচ্ছে আর ক্রেতা তা অস্বীকার করছে। সুতরাং তার কসমই যথেষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু এ বিধান আমরা জেনেছি 'নাছ' (শরীয়তি বাণী) দ্বার আর তা হলো নবী (সা)-এর বাণী-

اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بينهما تحالفا وترادا

ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি মতভিন্নতা করে, আর পণ্য বিদ্যমান থাকে তাহলে উভয়ে কসম করবে এবং পণ্য ও মূল্য পরস্পর ফেরত প্রদান করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর কাযী প্রথমে ক্রেতার কসম নিবেন।

এটা হলো ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্য-এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর শেষের দিকের বক্তব্য এবং ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা। আর এটাই বিশুদ্ধ মত।

কেননা অস্বীকৃতির দিক থেকে ক্রেতা অধিকতর জোরালো। কারণ আগে তার কাছে মূল্যের তাগাদা আসবে। (সুতরাং তার অস্বীকৃতি আগে হবে।) কিংবা এ কারণে যে, কসম অস্বীকার করার ফল তথা (বিক্রেতার দাবীকৃত) মূল্য আরোপ করা দ্রুত হবে। পক্ষান্তরে বিচারক যদি বিক্রেতার কসম দিয়ে শুরু করেন (আর সে কসম করতে অস্বীকার করে) তাহলে সে মূল্য উশুল করা পর্যন্ত বিক্রয় দ্রব্য অর্পণ করার দাবী বিলম্বিত হবে।

প্রথম দিকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বিক্রেতার কসম দিয়ে শুরু করার কথা বলতেন। কেননা নবী (সা) বলেছেন,

اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع

ক্রেতা-বিক্রেতা যদি মতভিন্নতা করে, তাহলে বিক্রেতা যা বলবে তাই গ্রহণযোগ্য হবে।

এখানে নবী (সা) তাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, আর তার সর্বনিম্ন ফায়দা হলো অগ্রবর্তিতা।

আর যদি পণ্যের বিনিময়ে পণ্য কিংবা মুদ্রা-দ্রব্যের বিনিময়ে মুদ্রা-দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহলে বিচারক উভয়ের যে কারো কসম প্রথমে নিতে পারেন,

উভয়টি সমান হওয়ার কারণে।

আর কসমের ছূরত এই হবে যে, বিক্রেতা এই মর্মে কসম করবে যে, আল্লাহর কসম, সে এক হাজারে বিক্রি করেনি। আর ক্রেতা কসম করবে যে, আল্লাহ্র কসম সে দুই হাজারে ক্রয় করেনি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'যিয়াদাত' গ্রন্থে বলেছেন যে, কসমের বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য নেতিবাচক বক্তব্যের সাথে ইতিবাচক বক্তব্যকে যুক্ত করে এভাবে বলবে যে, সে এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রী করেনি, বরং দু'হাযারের বিনিময়ে বিক্রি করেছে। আর ক্রেতা এভাবে কসম করবে যে, আল্লাহ্র কসম, সে দু'হাযারের বিনিময়ে ক্রয় করেনি, বরং এক হাযারের বিনিময়ে ক্রয় করেছে।

তবে বিশুদ্ধতর মত হলো নেতিবাচক বক্তব্যের উপরই সীমাবদ্ধ রাখা। কেননা শরীয়তে নেতিবাচক বক্তব্যের উপরই কসমের ভিত্তি রাখা হয়েছে। 'কাসামাহ' সংক্রান্ত হাদীস তা প্রমাণ করে।

ঃ আল্লাহ্র কসম তোমরা হত্যা করনি এবং এই নিহতের কোন হত্যাকারী সম্পর্কে তোমরা জানো না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি তারা উভয়ে কসম করে তাহলে বিচারক উভয়ের মাঝে বিক্রয় চুক্তি রহিত করে দেবেন।

এটা প্রমাণ করে যে, শুধু পারস্পরিক কসমের কারণে বিক্রয় রহিত হবে না।

কেননা উভয়ের প্রত্যেকে যে দাবী করছে তা পারস্পরিক কসম দ্বারা সাব্যস্ত হয় নি। সুতরাং তা অজ্ঞাত (মূল্য দ্বারা সম্পন্ন) বিক্রয়রূপে বিদ্যমান থাকবে। কাজেই বিরোধ নিরসনের জন্য কাযী বিক্রয় রহিত করবেন। কিংবা এভাবে বলা যায় যে, (পরস্পর বিরোধের কারণে) বিনিময় তথা মূল্য যখন সাব্যস্ত হলো না তখন সেটা বিনিময়হীন বিক্রয় হলো এবং তা ফাসিদ বিক্রয় আর ফাসিদ বিক্রয় রহিত করা অপরিহার্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি দু'জনের একজন কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে অপর পক্ষের দাবী তার উপর সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

কেননা অস্বীকারকারীকে স্বেচ্ছা দানকারী গণ্য করা হবে। সুতরাং তার দাবী প্রতিপক্ষের দাবীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বহাল থাকলো না। সুতরাং তার দাবীর সাব্যস্তির পক্ষে মত দেয়া জরুরী হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি তারা উভয়ে মেয়াদ সম্পর্কে কিংবা ইচ্ছাধিকার সম্পর্কে কিংবা আংশিক মূল্য উশুল করা সম্পর্কে মতানৈক্য করে তাহলে তাদের মাঝে কসম বিনিময় হবে না।

কেননা এটা হলো চুক্তিকৃত বস্তু এবং চুক্তির বিনিময় মূল্য ছাড়া অন্য বিষয়ে মতবিরোধ। সুতরাং এটা সাব্যস্ত মূল্যের পরিমাণ হ্রাস করা এবং অন্য মূল্য থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে মতানৈক্যের সদৃশ হলো।

এটা এ কারণে যে, মতবিরোধের উল্লেখিত বিষয়গুলো অবিদ্যমান হলেও যা দ্বারা চুক্তি অস্তিত্ববান থাকে তা বিঘ্নিত হয় না।

পক্ষান্তরে মূল্যের গুণ (তথা উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা) কিংবা তার শ্রেণী (তথা দিরহাম না দীনার) সম্পর্কে মতানৈক্যের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ কসম বিনিময় সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তা মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কিত মতানৈক্যের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা তা স্বয়ং মূল্যসত্তা সম্পর্কে মতানৈক্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।

কারণ মূল্য হলো অনির্ধারিত দেয় যা পরিচিত হয় গুণের দ্বারা। মেয়াদ এরূপ নয়। কেননা তা গুণ নয়। দেখুন না, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও মূল্য বিদ্যমান থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে ইচ্ছাধিকার এবং মেয়াদ অস্বীকার করবে, কসম সহ তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা এ দু'টি বিষয় এমন শর্ত দ্বারা সাব্যস্ত হয় যা মূল চুক্তির উপর আরোপিত, আর আরোপিত বিষয়গুলোকে যে অস্বীকার করে তার কথাই কসমসহ গ্রহণযোগ্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বিক্রয় দ্রব্য হালাক হয়ে যাওয়ার পর যদি তারা মতানৈক্য করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে তাদের দু'জনের কাছ থেকে কসম নেওয়া হবে না এবং ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, উভয়ে কসম করবে, এবং হালাক হওয়া বিক্রয় দ্রব্যের বাজার মূল্যের উপর বিক্রিয় চুক্তি রহিত করা হবে।

এটাই ইমাম শাফেয়ী (র) এর মত। একই মতপার্থক্য হবে যদি বিক্রীত দ্রব্য তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়, কিংবা এমন হয় যে, দোষের কারণে তা ফেরত দেয়া সম্ভব নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীল এই যে, চুক্তির পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে অপর পক্ষের দাবীকৃত চুক্তি থেকে ভিন্ন চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার দাবী করছে। আর অপর পক্ষ তা অস্বীকার করছে। আর এই কসম বিনিময় দ্বারা দ্রব্য ও মূল্য ফেরত দেয়া নেয়া যদিও সম্ভব নয়; কিন্তু বিক্রেতার অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে (ক্রেতার উপর) অধিক মূল্য আরোপিত হওয়াকে রোধ করার ফায়দা দেবে। সুতরাং উভয়ে কসম করবে। যেমন- বিক্রয় দ্রব্য হালাক হওয়ার পর 'মূল্য'-এর শ্রেণী সংক্রান্ত মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, কবজা করার পর পরস্পর কসম বিনিময় কিয়াসের পরিপন্থী। কেননা ক্রেতা যা পাওনা বলে দাবী করছে, তা সম্পূর্ণ কাছেই রয়েছে। কসম বিনিময় সংক্রান্ত শরীয়তের বাণী উচ্চারিত হয়েছে বিক্রীত দ্রব্য বিদ্যমান থাকার অবস্থায়। আর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কসম বিনিময় চুক্তি রহিতকরণ পর্যন্ত গড়ায়। পক্ষান্তরে বিক্রীত দ্রব্য হালাক হওয়ার পর তা হয় না। কেননা হালাক হওয়ার সময় চুক্তি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং এটা বিক্রীত দ্রব্য বিদ্যমান থাকার সমার্থক হলো না।

তাছাড়া (বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার অনুকূলে নিরাপদ হওয়ার) উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার 'কারণ'-এর মতামতের পার্থক্যের বিষয়টির প্রতি ভ্রূক্ষেপে করা হয় না। -মুকসেদ হাসিল হয়ে যাওয়ার পর।

আর ঐ ফায়দা হাছিল হওয়ার বিষয়টি শুধু বিবেচ্য হবে, যেটাকে বিক্রয় চুক্তি অবশ্য সাব্যস্ত করে। অথচ অতিরিক্ত মূল্যের আরোপ রোধ করা বিক্রয় চুক্তির অবশ্য সাব্যস্ত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর এই মতপার্থক্য হবে তখন, যখন মূল্য অনির্ধারিত দেয় হয়। পক্ষান্তরে যদি নির্ধারিত বস্তু হয় তাহলে উভয়ে কসম করবে। কেননা দুই পক্ষের এক পক্ষের কাছে বিক্রীত দ্রব্য বিদ্যমান রয়েছে; সুতরাং চুক্তি রহিতকরণের ফায়দা অর্জিত হবে। অত:পর নষ্ট হওয়া দ্রব্যের যদি সদৃশ থাকে তাহলে তার সদৃশ দ্রব্য ফেরত দেবে। আর যদি তার সদৃশ বস্তু না থাকে তাহলে মূল্য ফেরত দেবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি বিক্রীত দুই গোলামের একটি হালাক হয়ে যায় এরপর মূল্য সম্পর্কে উভয়ে মতপার্থক্য করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উভয়ে কসম করবে না; তবে যদি বিক্রেতা হালাক গোলামের মূল্যাংশ ত্যাগ করতে রাজি হয়।

'জামে ছাগীরে' রয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কসমসহ ক্রেতার মত গ্রহণযোগ্য হবে, তবে বিক্রেতা যদি এবিষয়ে সম্মত হয় যে, জীবিত গোলামটা নিয়ে নেবে আর হালাক গোলামের মূল্য বাবদ সে কিছু পাবে না।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, জীবিত গোলামটির জন্য (উভয় গোলামের মূল্যের ব্যাপারে) উভয়ে কসম করবে। অত:পর জীবিত গোলামটির ক্ষেত্রে চুক্তি রহিত করা হবে। আর হালাক গোলামের মূল্য সম্পর্কে ক্রেতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন যে, দুই গোলামের জন্যই উভয়ে কসম করবে, তবে জীবিতটিকে ফেরত দেবে আর মৃতটির মূল্য ফেরত দেবে। কেননা তাঁর মতে তো সমগ্র বিক্রীত দ্রব্য হালাক হওয়া কসম বিনিময়কে বাধাগ্রস্ত করে না। সুতরাং আংশিক দ্রব্য হালাক হওয়া আরো স্বাভাবিক ভাবেই বাধাগ্রস্ত করবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, কসম বিনিময়ের বিঘ্নতা দেখা দিয়েছে হালাক হওয়ার কারণে। সুতরাং সেটা হালাক হওয়ার পরিমাণের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, (কবজা করার পর) বিক্রীত দ্রব্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কসম বিনিময়ের বিষয়টি (শরীয়তের বাণী দ্বারা) কিয়াসের বিপরীতে সাব্যস্ত হয়েছে। আর مبيع বা سلعة শব্দটি বিক্রীত দ্রব্যের সমগ্র অংশের উপর প্রযুক্ত। সুতরাং কিছু অংশ হালাক হয়ে গেলে سلعة (বা বিক্রীত দ্রব্য সর্বাংশে) বিদ্যমান থাকল না।

তাছাড়া বিদ্যমান অংশটির উপর কসম বিনিময় তখনই সম্ভব হবে যখন মূল্য থেকে তার অংশটিকে বিবেচনা করা হবে। সুতরাং বাজার মূল্যের ভিত্তিতে মূল্যকে ভাগ করা অপরিহার্য হবে। আর তা জানা যাবে আন্দাযের ও অনুমানের ভিত্তিতে। সুতরাং অজ্ঞতার অবস্থায় কসম বিনিময় অনিবার্য হবে। আর তা বৈধ নয়।

তবে যদি বিক্রেতা হালাক গোলামের অংশ মূল্য থেকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়। কেননা তখন সমগ্র মূল্য বিদ্যমান গোলামের বিপরীতে সাব্যস্ত হবে। আর হালাক গোলামটি চুক্তি থেকে বের হয়ে যাবে (যেন চুক্তিতে ছিলই না।) সুতরাং উভয়ে কসম বিনিময় করবে।

আর এটা হলো কোন কোন মাশায়েখের ব্যাখ্যা। তাদের মতে (কুদূরী ও মাবসূতে উল্লেখিত) এ ব্যতিক্রম কসম বিনিময়ের সঙ্গে যুক্ত হবে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি।

আর মাশায়েখগণ বলেছেন যে, 'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) যে বলেছেন, জীবিত গোলামটি নিবে আর হালাক গোলামের কোন অংশ মূল থেকেই নেবে না।

পক্ষান্তরে কোন কোন মাশায়েখের মতে হালাক গোলামের মূল্য থেকে অতটুকু অংশ নেবে যতটুকু ক্রেতা স্বীকার করে। শুধু অতিরিক্ত পরিমাণটা নেবে না।

এই মাশায়েখদের মতে (কুদূরীতে উল্লেখিত) ব্যতিক্রমায় ক্রেতার কসমের সঙ্গে যুক্ত হবে, উভয়ের কসম বিনিময়ের সঙ্গে নয়।

কেননা বিক্রেতা যখন ক্রেতার বক্তব্য অনুযায়ী গ্রহণ করলো তখন বোঝা গেল যে, সে ক্রেতাকে সত্য বলে স্বীকার করেছে। সুতরাং ক্রেতাকে কসম করানো হবে না।

আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মত অনুযায়ী কসম বিনিময়ের ব্যাখ্যা সেটাই, যা আমরা বিদ্যমান গোলাম প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছি।

যখন উভয়ে কোন মূল্যের উপর একমত না হয়ে কসম করবে, আর তাদের একজন কিংবা উভয়ে চুক্তি রহিত করার দাবী জানাবে, তখন উভয়ের মাঝে চুক্তি রহিত করে দেয়া হবে। আর কাযী ক্রেতাকে বিদ্যমান গোলাম এবং হালাক গোলামের বাজার মূল্য ফেরত দেয়ার আদেশ দিবেন।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী কসম বিনিময়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মাশায়েখেগণ মতপার্থক্য করেছেন। বিশুদ্ধ মত এই যে, ক্রেতা এই মর্মে কসম করবে যে, আল্লাহ্র কসম আমি ঐ মূল্যে গোলাম দুটি ক্রয় করিনি, যে মূল্য বিক্রেতা দাবী করছে।

যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে বিক্রেতার দাবী তার উপর লাযিম হয়ে যাবে।

আর যদি সে কসম করে তাহলে বিক্রেতা এই মর্মে কসম করবে যে, আল্লাহ্র কসম আমি ঐ মূল্যে বিক্রয় করিনি, যে মূল্য ক্রেতা দাবী করছে।

যদি বিক্রেতা কসম করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে ক্রেতার দাবী তার উপর লাযিম হয়ে যাবে। আর যদি বিক্রেতা কসম করে তাহলে বিদ্যমান গোলামের ক্ষেত্রে তারা বিক্রয় চুক্তিকে রহিত করে ফেলবে এবং মূল্য থেকে তার অংশ বাদ যাবে। (এবং বাজার মূল্য ফেরত দেবে।) আর ক্রেতার উপর লাযিম হবে।

আর ভাগ করার ক্ষেত্রে কবজা করার দিনের উভয়ের বাজার মূল্য বিবেচ্য হবে।

আর যদি কবজা করার দিন হালাক গোলামের বাজার মূল্য কি ছিলো সে সম্পর্কে উভয়ে মতপার্থক্য করে তাহলে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে উভয়ের যে কেউ

বাইয়েনাহ পেশ করলে তার বাইয়েনাহ্ গ্রহণ করা হবে। আর যদি উভয়ে বাইয়েনাহ পেশ করে তাহলে বিক্রেতার বাইয়েনাহ অগ্রাধিকাযোগ্য হবে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর যে মতামত উল্লেখ করা হলো, তা মাবসুতের বিক্রয় অধ্যায়ে উল্লেখকৃত মাসআলার কিয়াসের দাবী। সেই মাসআলা এই যে, ক্রেতা দুটি গোলাম খরিদ করলো এবং উভয়টিকে কবজা করলো। পরে দোষের কারণে একটিকে ফেরত দিলো আর অন্যটি তার কবজা থেকে হালাক হলো। তখন তার হাতে হালাক হওয়া গোলামের মূল্য তার উপর লাযিম হবে। আর যেটা ফেরত দিয়েছে সেটার মূল্য তার যিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে। আর কবজা করার দিন উভয়ের যে বাজার মূল্য ছিলো তার ভিত্তিতেই মূল্য ভাগ হবে। আর যদি হালাক হওয়া গোলামের বাজার মূল্য সম্পর্কে উভয়ে মতপার্থক্য করে, তাহলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা উভয়ের বক্তব্য মতেই মূল্য তো সাব্যস্ত হয়েছে। এরপর ক্রেতা হালাক হওয়াকে গোলামের বাজার মূল্য কম বলার মাধ্যমে মূল্য অধিক পরিমাণ রহিত হওয়ার দাবী করছে। আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করছে। আর অস্বীকারকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য। তবে যদি উভয়ে বাইয়েনাহ পেশ করে সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার বাইয়েনাহ অগ্রাধিকারযোগ্য হবে। কেননা প্রকাশ্যই তার বাইয়েনাহ অধিক পরিমাণ সাব্যস্ত করছে। কারণ তা হালাক হওয়া গোলামের অধিক বাজার মূল্য সাব্যস্ত করছে।

আর এটাই (বিক্রেতার বাইয়েনাহ এবং তার কসম গ্রহণযোগ্য হওয়া) অধিকতর ফিকাহ সম্মত (যুক্তি সম্মত)। তা এই কারণে যে, ইয়ামীন ও কসমের ক্ষেত্রে আসল অবস্থা বিবেচ্য হয়। কেননা কসম চুক্তির পক্ষদ্বয়ের একজনের অভিমুখী হয়। আর আসল অবস্থা তারাই জানে। সুতরাং আসল অবস্থার উপরই বিষয়টির ভিত্তি হবে। আর প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতা হচ্ছে (অতিরিক্ত পরিমাণ রহিত হওয়ার) অস্বীকারকারী। একারণেই (কসমসহ) তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য।

আর বাইয়েনাহর ক্ষেত্রে প্রকাশ্য অবস্থাই হলো বিবেচ্য। কেননা সাক্ষীদ্বয় প্রকৃত অবস্থা জানে না। সুতরাং সাক্ষীদ্বয়ের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য অবস্থাই বিবেচ্য হবে। আর বিক্রেতা প্রকাশ্য অবস্থার দাবীদার। সুতরাং তারই বাইয়েনাহ গ্রহণ করা হবে। আর প্রকাশিত অবস্থা সমর্থিত অধিক পরিমাণ দাবী করার দ্বারা তার বাইয়েনাহ্ অগ্রাধিকার লাভ করবে। যেমন বর্ণিত হয়েছে (যে, বিক্রেতার বাইয়েনাহ অধিক পরিমাণ সাব্যস্ত করছে)।

আর (মাবসূতের বিক্রয় অধ্যায়ে আলোচিত) এই মাসআলা তোমার কাছে স্পষ্ট করে দেবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর যে মতামত আমরা উল্লেখ করেছি তার মর্ম।

ইমাম মুহম্মদ (র) (জামে ছাগীরের বিক্রয় অধ্যায়ে) বলেন, কেউ যদি দাসী ক্রয় করে অত:পর তা কবজা করে অত:পর উভয়ে বিক্রয় প্রত্যাহার করে, অত:পর মূল্যের ব্যাপারে উভয়ে মতপার্থক্য করে তাহলে উভয়ে কসম বিনিময় করবে এবং [illegible] বা বিক্রয় প্রত্যাহার রহিত হয়ে প্রথম বিক্রয় পুন:সাব্যস্ত হবে।

আর إقالة বা বিক্রয় প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে কসম বিনিময়ের বিষয়টিকে আমরা نص (বা শরীয়তি বাণী) দ্বারা সাব্যস্ত করিনি। কেননা শরীয়তি বাণীটি বর্ণিত হয়েছে সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে; আর চুক্তির পক্ষদ্বয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যাহার হচ্ছে বিক্রয় রহিতকরণ।

এখানে আমরা কসম বিনিময় সাব্যস্ত করেছি কিয়াসের ভিত্তিতে। কেননা মাসআলাটির স্বরূপ ধরা হয়েছে إقالة -এর পর বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রীত দ্রব্যের কবজার পূর্বে। আর কবজার পূর্বে কসম বিনিময় কিয়াস সমর্থিত। যেমন (পূর্ব অধ্যায়ের শুরুতে) কথিত হয়েছে। এজন্যই (কবজা পূর্ববর্তী) ইজারার ক্ষেত্রে মতপার্থক্যকে আমরা কবজা গ্রহণের পূর্ব অবস্থার বিক্রয়ের উপর কিয়াস করে থাকি এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার ওয়ারিছদের মতপার্থক্যকে চুক্তি করা ক্রেতা-বিক্রেতার উপর কিয়াস করে থাকি এবং ক্রেতা ছাড়া অন্য কেউ যদি বিক্রেতার কবজায় বিদ্যমান বিক্রীত দ্রব্য হালাক করে ফেলে সেক্ষেত্রে (ক্ষতিপূরণ রূপে প্রদত্ত) বাজার মূল্যকে আমরা নির্ধারিত বিক্রয় দ্রব্যের উপর কিয়াস করে থাকি।

আর যদি বিক্রয় প্রত্যাহারের পর বিক্রেতা বিক্রীত দ্রব্য কবজা করে থাকে, সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে কসম বিনিময় সাব্যস্ত হবে না। ইমাম মুহম্মদ (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেননা তিনি কবজা পরবর্তী অবস্থায়ও শরীয়তি বাণীকে কিয়াস সম্মত মনে করেন।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি এক'কুর' গমের জন্য দশ দিরহাম দাদন প্রদান করে এরপর উভয়ে (দাদন চুক্তি) প্রত্যাহার করে নেয়; অত:পর মূল্য সম্পর্কে উভয়ে মতপার্থক্য করে, তাহলে দাদন গ্রহীতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। সালাম (বা দাদন) চুক্তি পুন:সাব্যস্ত হবে না।

কেননা 'বায় সালাম'-এর ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রত্যাহার চুক্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা রাখে না। কেননা 'বায় সালামের' ক্ষেতে বিক্রয় প্রত্যাহার -এর অর্থ হলো দাদনকে দাদন গ্রহীতার দায় থেকে রহিত করে দেওয়া। (আর দাদন বস্তু অর্নিধারিত বা দান ও ঋণ রূপে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর দায়মুক্ত ঋণ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করতে পারে না) সুতরাং 'বায় সালাম' পুন:প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। বিক্রয় প্রত্যাহার -এর বিষয়টি ভিন্ন।

দেখুন না দাদন পুঁজি (মুদ্রা না হয়ে) যদি কোন দ্রব্য হয় আর দাদন গ্রহীতা (কবজা করার পর) দোষের কারণে তা ফেরত দেয়; কিন্তু দাদনদাতার হাতে অর্পণ করার পূর্বে দাদন গ্রহীতার কাছে থাকা অবস্থায় তা হালাক হয়ে যায়, তাহলে সালাম চুক্তি পুন: প্রত্যাবর্তিত হয় না। অথচ নির্ধারিত বস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে বিক্রয় প্রত্যাবর্তিত হবে। এটা সালাম ও সাধারণ বিক্রয়ের মাঝে পার্থক্য প্রমাণ করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্বামী-স্ত্রী যদি মোহরের বিষয়ে মতপার্থক্য করে। স্বামী দাবী করলো যে, সে এক হাযার মোহরানায় বিবাহ করেছে আর স্ত্রী বললো যে, তুমি আমাকে দুই হাযার মোহরানায় বিবাহ করেছো তাহলে দুজনের যে কেউ বাইয়েনাহ পেশ করবে তার বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা সে তার দাবীকে প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট করেছে।

আর যদি উভয়ে বাইয়েনাহ পেশ করে তাহলে স্ত্রীর বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা তার বাইয়েনাহ অতিরিক্ত পরিমাণ সাব্যস্ত করছে। স্ত্রীর বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার অর্থ এই যে, তার মোহরে মেছেল যদি তার দাবীকৃত পরিমাণ থেকে কম হয়।

আর যদি উভয়ের কোন বাইয়েনাহ না থাকে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উভয়ে কসম বিনিময় করবে। কিন্তু বিবাহ রহিত হবে না।

কেননা কসম বিনিময়ের বিক্রয় হবে মোহর উল্লেখের অবিদ্যমানতা। আর মোহরের অনুল্লেখ বিবাহের বৈধতাকে বিঘ্নিত করে না। কারণ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর হলো অনুগামী। বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মূল্যের অনুল্লেখ বিক্রয় চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। যেমন বিক্রয় পর্বে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং বিক্রয় চুক্তি রহিত হয়ে যাবে।

তবে মোহরে মেছেলকে বিচারক (বা নির্ধারক) সাব্যস্ত করা হবে। যদি তা স্বামীর স্বীকৃত পরিমাণের সদৃশ বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে স্বামীর বক্তব্যের অনুকূলে ফায়সালা করা হবে। কেননা প্রকাশিত অবস্থা তার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করছে।

আর যদি স্ত্রী যে পরিমাণ দাবী করছে তার সদৃশ হয় কিংবা তার চেয়ে বেশী হয় তাহলে স্ত্রীর বক্তব্যের অনুকূলে ফায়সালা করা হবে। আর যদি মোহরে মেছেল স্বামীর স্বীকারকৃত পরিমাণের চেয়ে বেশী এবং স্ত্রীর দাবীকৃত পরিমাণের চেয়ে কম হয় তাহলে স্ত্রীর জন্য মোহরে মেছেলের ফায়সালা করা হবে।

কেননা যখন উভয়ে কসম বিনিময় করবে তখন মোহরে মেছেলের অতিরিক্ত পরিমাণ সাব্যস্ত হবে না। আর তার থেকে কম পরিমাণও সাব্যস্ত হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী (র) আগে কসম বিনিময়ের কথা, তারপর মোহরে মেছেলকে বিচারক নির্ধারণের কথা উল্লেখ করেছেন। এটা ইমাম কারখী (র) -এর মত।

কেননা মোহরের উল্লেখ থাকা অবস্থায় মোহরে মেছেল বিবেচনায় আসে না। আর মোহরের উল্লেখের বিবেচনা রহিত হয় কসম বিনিময়ের কারণে। এজন্য সকল ক্ষেত্রেই কসম বিনিময় অগ্রবর্তী করা হয়।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মোহাম্মদ (র)-এর মতে স্বামীর কসম দ্বারা শুরু করা হবে, যাতে কসম অস্বীকারের ফায়দা দ্রুত সাব্যস্ত হয়। যেমন ক্রেতার ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু বকর রাযী (র)-এর ব্যাখ্যা -এর বিপরীত। বিবাহ পর্বে আমরা তা বিস্তারিত উল্লেখ করেছি এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতভিন্নতাও উল্লেখ করেছি। সুতরাং এখানে তার পুন: আলোচনা করবো না।

আর স্বামী যদি এই গোলামকে মোহর নির্ধারণ করে বিবাহ করার দাবী করে আর স্ত্রী 'এই দাসীকে' মোহর নির্ধারণ করে বিবাহের দাবী করে তাহলে সেটা পূর্ববর্তী মাসআলার অনুরূপ হবে। তবে দাসীর বাজার মূল্য যদি মোহরে মেছেলের সদৃশ হয়

তাহলে সে মূল্য দাসী পাবে না, বরং তার বাজার মূল্য পাবে। কেননা পরস্পর সম্মতি ছাড়া দাসীর মালিকানা লাভ সম্ভব নয়। আর তা পাওয়া যায়নি। সুতরাং বাজার মূল্যই সাব্যস্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইজারার ক্ষেত্রে যদি ইজারাকৃত বস্তুটির কবজা লাভের পূর্বে উভয়ে মতপার্থক্য করে তাহলে উভয়ে কসম বিনিময় করবে এবং ফেরত নিবে।

মাসআলাটির অর্থ এই যে, উভয়ে ভাড়ার পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছে। কিংবা ভাড়াকৃত বস্তুটির ভোগের পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছে।

কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, বিক্রীত দ্রব্যের দখল গ্রহণের পূর্ববর্তী বিক্রয়-এর ক্ষেত্রে কসম বিনিময় করা কিয়াস সমর্থিত। আর উপকার লাভ করার পূর্ববর্তী ইজারা বিক্রীত দ্রব্যের দখল গ্রহণের পূর্ববর্তী বিক্রয়ের সদৃশ। আর আমাদের আলোচনাও হচ্ছে উপকার লাভের পূর্ববর্তী ইজারা।

আর যদি ভাড়া সম্পর্কে মতপার্থক্য হয় তাহলে ভাড়া গ্রহণকারীর কসম দ্বারা শুরু করা হবে।

কেননা সে (অতিরিক্ত) ভাড়া সাব্যস্তকে অস্বীকার করছে।

আর যদি উপকার লাভের পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য হয় তাহলে ভাড়া প্রদানকারীর কসম দ্বারা শুরু করবে।

উভয়ের মধ্যে যে কসম করতে অস্বীকার করবে, তার প্রতিপক্ষের দাবী তার উপর লাযিম হয়ে যাবে।

আর দু'জনের যে কেউ বাইয়েনাহ পেশ করবে, তা গ্রহণ করা হবে। আর যদি উভয়ে বাইয়েনাহ পেশ করে তাহলে ভাড়া প্রদান কারীর বাইয়েনাহ অগ্রাধিকার পাবে, যদি ভাড়া সম্পর্কে মতপার্থক্য হয়।

আর যদি উপকার লাভের পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য হয় তাহলে ভাড়া গ্রহণকারীর বাইয়েনাহ অগ্রাধিকার পাবে।

আর যদি উভয় বিষয়ে মতপার্থক্য হয় তাহলে নিজ নিজ দাবীকৃত অতিরিক্ত পরিমাণের ক্ষেত্রে উভয়ের বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে।

যেমন ভাড়া প্রদানকারী দশ দিরহামের বিনিময়ে এক মাসের দাবী করছে, আর ভাড়া গ্রহণকারী পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে দুই মাসের দাবী করছে; তাহলে দশ দিরহামের বিনিময়ে দুই মাসের ফায়সালা করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, উপকার অর্জন করার পর যদি (ভাড়া সম্পর্কে) মত পার্থক্য করে তাহলে কসম বিনিময় করবে না। বরং ভাড়া গ্রহণকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তো এটা সুস্পষ্ট। কেননা চুক্তিকৃত বস্তুর হালাক হওয়া তাদের মতে কসম বিনিময়কে বাধাগ্রস্ত করে।

তদ্রূপ ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মূলনীতি মতেও এটা সুস্পষ্ট। কারণ তাঁর মতে বিক্রীত দ্রব্যের ক্ষেত্রে হালাক হওয়া কসম বিনিময়কে বাধাগ্রস্ত করে না। কেননা বিক্রীত দ্রব্যের একটি বাজার মূল্য রয়েছে, যা তার স্থলবর্তী হবে। সুতরাং বাজার মূল্যকে কেন্দ্র করেই কসম বিনিময় করবে।

আর এখানে যদি কসম বিনিময় সাব্যস্ত হয় এসব ইজারা চুক্তি রহিত করা হয় তাহলে কোন বাজার মূল্য বিদ্যমান থাকে না। কেননা উপকার লাভ নিজস্ব সত্তার মূল্যমান সম্পন্ন নয়; বরং চুক্তির ভিত্তিতে তা মূল্য সম্পন্ন হয়। আর রহিত হওয়া দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, চুক্তি বিদ্যমান নেই।

আর যখন উভয় পক্ষের কসম নিষিদ্ধ হলো তখন কসমসহ ভাড়া গ্রহণকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সেই হলো হক দেনাদার।

আর যদি চুক্তিকৃত উপকার লাভের কিছু অংশ উশুল করার পর মতপার্থক্য করে তাহলে কসম বিনিময় করবে এবং অবশিষ্ট অংশে চুক্তি রহিত হবে। আর যতটুকু উপকার লাভ হয়েছে, সে ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা ইজারার ক্ষেত্রে চুক্তি মুহূর্তে মুহূর্তে সম্পন্ন হতে থাকে। সুতরাং উপকার লাভের প্রতিটি অংশে ধরে নেয়া হবে যেন ঐ অংশের উপর চুক্তি নতুন করে সম্পন্ন হচ্ছে।

বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে চুক্তি একবারেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং (অবিদ্যমানতার কারণে) এক অংশে যদি চুক্তি রহিতকরণ সম্ভব না হয় তাহলে সর্বাংশেই তা অসম্ভব হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব ও মোকাতাব যদি কিতাবাতের মালের পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উভয়ে কসম বিনিময় করবে না এবং সাহেবায়নের মতে কসম বিনিময় করবে আর কিত... চুক্তি রহিত হয়ে যাবে।

এটাই ইমাম শাফেয়ী (র)-এরও মত। কেননা এটা হল বিনিময় চুক্তি বিশেষ, যা রহিতকরণ গ্রহণ করে। সুতরাং বিক্রয়ের মূল্য সম্পর্কে মতাপার্থক্যের সদৃশ হলো। আর উভয়ের মাঝে যোগ সূত্র এই যে,জমির অতিরিক্ত পরিমাণ দাবী করছে যা গোলাম অস্বীকার করছে। পক্ষান্তরে গোলাম দাবী করছে যে, তার দাবীকৃত পরিমাণ পরিশোধের পর মনিবের প্রতিকূলে সে মুক্তির হকদার হয়েছে, আর মনিব তা অস্বীকার করছে। সুতরাং উভয়ে কসমের বিনিময় করবে। যেমন (বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) মূল্য সম্পর্কে মতপার্থক্য হলে (কসমের বিনিময় করা হয়)।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, তাৎক্ষণিকভাবে কিতাবত চুক্তির অর্থ হচ্ছে কবজা করা ও কর্ম সম্পাদনের হকের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিনিময় (মুক্তিদানের বিনিময় নয়।) আর (যেহেতু কিতাবত চুক্তির বিষয়ে উভয়ে একমত, সেহেতু) ঐটুকু বিষয় মুকাতাবের নিরাপদ রয়েছে। পক্ষান্তরে অর্থ পরিশোধের পূর্বে তা মুক্তির বিনিময় হবে না। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় শুধু কিতাবত চুক্তির অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়ে গেলো, অন্য কোন বিষয়ে মতপার্থক্য নেই। সতুরাং উভয়ের মধ্যে কসম বিনিময় হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্বামী যদি ঘরের সামান-পত্রের মালিকানা নিয়ে মতপার্থক্য করে তাহলে যেগুলো পুরুষের ব্যবহার উপযোগী, সেই হলো পরাধের হবে, যেমন পাগড়ী। আর যা স্ত্রীর ব্যবহার উপযোগী তা স্ত্রীর হবে। যেমন শির: বন্ধনী।

কেননা প্রকাশিত অবস্থা তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আর যা উভয়ের ব্যবহার উপযোগী, যেমন বাসনপত্র, সেগুলো পুরুষের।

কেননা স্ত্রী এবং তার হাতে যা কিছু আছে, সেগুলো স্বামীর কর্তৃত্বাধীন। আর দাবীর ক্ষেত্রে দখলদারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। তবে যেগুলো স্ত্রীর সাথে বিশিষ্ট, সেগুলোর বিষয় ভিন্ন। কেননা স্বামীর কর্তৃত্বগত দখলারি প্রকাশিত অবস্থার মোকাবেলা করছে এমন একটি প্রকাশিত অবস্থা, যা তার চেয়ে শক্তিশালী।

আর বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মতপার্থক্য এবং বিচ্ছেদ সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী অবস্থার মতপার্থক্যের মাঝে কোন তারতম্য নেই।

আর যদি স্বামী-স্ত্রীর একজন মারা যায়, আর তার ওয়ারিছরা অপর জনের সাথে মতপার্থক্য করে, তাহলে যা কিছু পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের ব্যবহার উপযোগী, তা সবই উভয়ের মধ্যে জীবিত জনের হবে।

কেননা দখল জীবিত জনের, মৃতজনের নয়। আর এই যা কিছু আমরা উল্লেখ করলাম (সামগ্রিকভাবে) তা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, (যা উভয়ের ব্যবহার উপযোগী তার মধ্যে) ঐগুলো স্ত্রীকে প্রদান করা হবে, যে ধরনের জিনিস জেহেয (বা যৌতুক) রূপে দেয়া হয়। অবশিষ্টগুলো কসমসহ স্বামীকে প্রদান করা হবে। কেননা প্রকাশিত অবস্থা এই যে, স্ত্রী জেহেয নিয়ে আসে। আর এটা (স্বামীর দখলদারিগত প্রকাশিত অবস্থা থেকে) অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং তা দ্বারা স্বামীর দখল দারিগত প্রকাশিত অবস্থা বাতিল হয়ে যাবে। অত:পর অবশিষ্টগুলোর ক্ষেত্রে স্বামীর (দখলদারিগত) প্রকাশিত অবস্থার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সুতরাং তা বিবেচ্য হবে।

আর তালাক ও মৃত্যু সমান। কেননা ওয়ারিছ তাদের মুরিছ-এর স্থলবর্তী হয়ে থাকে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যা পুরুষের ব্যবহার উপযোগী, তা পুরুষের হবে। আর যা স্ত্রীলোকের ব্যবহার উপযোগী তা স্ত্রীর হবে। আর যা উভয়ের ব্যবহার উপযোগী তা পুরুষের কিংবা (মৃত অবস্থার) তার ওয়ারিছদের হবে। কারণ সেটাই যা আমরা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল হিসেবে বর্ণনা করেছি।

আর (ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতেও) তালাক ও মৃত্যুর বিধান অভিন্ন। কেননা ওয়ারিছ মুরিছ-এর স্থলবর্তী হয়ে থাকে।

আর যদি তাদের দুজনের একজন দাস (বা দাসী) হয় তাহলে জীবিত অবস্থায় সামান পত্র যে স্বাধীন (স্বামী বা স্ত্রী) তার হবে।

কেননা স্বাধীন ব্যক্তির কবজা অধিকতর শক্তিশালী, আর মৃত্যুর পর সামানপত্র যে জীবিত তার হবে।

কেননা মৃত ব্যক্তির কোন দখলদারি নেই। সুতরাং জীবিত ব্যক্তির দখলদারি প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে মুক্ত।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, ব্যবসার কাজে অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম এবং মুকাতাব স্বাধীন ব্যক্তির সমপর্যায়ভুক্ত। কেননা মামলা বিবাদের ক্ষেত্রে উভয়ের গ্রহণযোগ্য দখলদারি রয়েছে।

যারা মামলায় প্রতিপক্ষ হতে পারে না

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বিবাদী যদি বলে যে, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি এই জিনিসটি আমার কাছে আমানত রূপে কিংবা বন্ধক রূপে রেখেছে; কিংবা আমি তার কাছ থেকে গসব করেছি এবং -এর পক্ষে সে বাইয়েনাহ্ পেশ করেছে, তাহলে তার ও বাদীর মাঝে প্রতিপক্ষতা সাব্যস্ত হবে না।

তদ্রূপ যদি বলে যে, সে আমাকে এটা ভাড়ায় দিয়েছে এবং -এর স্বপক্ষে বাইয়েনাহ পেশ করে।

কেননা সে বাইয়েনাহ্ দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, তার কবজা প্রতিপক্ষতার কবজা নয়।

আর কাযী ইবনে শুবরুমাহ বলেন, এতে প্রতিপক্ষতা রহিত হবে না। কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির অনুকূলে মালিকানা সাব্যস্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ তার পক্ষ থেকে কোন দাবীদার এবং দাবী খণ্ডনকারী অবিদ্যমান।

আর এর ভিত্তিতেই আমরা বলি, বাইয়েনাহর দাবী দুটি। অনুপস্থিত ব্যক্তির অনুকূলে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া আর যেহেতু এ বিষয়ে কোন দাবীদার নেই, সেহেতু (এই বাইয়েনাহ দ্বারা) অনুপস্থিত ব্যক্তির মালিকানা সাব্যস্ত হবে না।

আর দ্বিতীয় দাবী হলো বাদীর বিবাদ ও প্রতিপক্ষতা খণ্ডন করা এবং এ বিষয়ে বাদী প্রতিপক্ষরূপে বিদ্যমান। সুতরাং এই (বাইয়েনাহ্) দ্বারা খণ্ডিত হবে।

বাদী এক্ষেত্রে স্ত্রীকে (স্বামীর কাছে) নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বামীর নিযুক্ত ওকীলের মত হলো, যখন স্ত্রী তালাকের অনুকূলে বাইয়েনাহ পেশ করে দেয়। যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

অবশ্য বাইয়েনাহ্ পেশ করা ছাড়া প্রতিপক্ষতা রহিত হবে না, যেমন ইবনে আবী লায়লা বলেছেন। কেননা সে তার বাহ্যিক দখলদারির কারণে প্রতিপক্ষ হয়ে পড়েছে। সুতরাং ধরে নেয়া হবে যে, সে তার স্বীকারোক্তি দ্বারা তার উপর সাব্যস্ত একটি 'হক' কে রোধ করতে চায়। সুতরাং প্রমাণ ছাড়া তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। যেমন যদি তার যিম্মা থেকে অন্যের যিম্মায় ঋণ স্থানান্তরের দাবী করে।

শেষের দিকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন, দখলদার ব্যক্তি যদি সৎ হয় তাহলে বিধান সেটাই, যা আমরা বলেছি। আর যদি কৌশলবাজ হিসাবে পরিচিত হয় তাহলে তার থেকে প্রতিপক্ষতা রহিত হবে না।

কেননা কৌশলবাজ লোকেরা (গোপনে) কোন মুসাফিরের কাছে নিজের মাল প্রদান করে, যে ঐ মাল তার কাছে আমানত রূপে রেখে যাবে এবং এর উপর সাক্ষীও রাখে। এভাবে অন্যের হক বাতিল করার জন্য কৌশল অবলম্বন করে। সুতরাং কাযী যখন তাকে কৌশলবাজ রূপে অভিযুক্ত করবেন তখন তার কথা গ্রহণ করবেন না।

আর যদি সাক্ষীরা বলে যে, এমন এক ব্যক্তি তার কাছে আমানত রেখেছে, যাকে আমরা চিনিনা, তাহলে বিবাদী থেকে প্রতিপক্ষতা রহিত হবে না।

কেননা হতে পারে যে, এই বাদীই সেই ব্যক্তি, যে আমানত রেখেছে।

তাছাড়া এই কারণে যে, দখলদার বাদীকে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির হাওয়ালা করেনি যাতে বাদী তার পিছু নিতে পারে। এমতাবস্থায় যদি (বিবাদী থেকে) প্রতিপক্ষতা রহিত হয়ে যায় তাহলে বাদী তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আর যদি সাক্ষীরা বলে যে, তাকে আমরা চেহারায় চিনি, নামে বা বংশ পরিচয়ে চিনিনা; তাহলে দ্বিতীয়োক্ত কারণে ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে একই সিদ্ধান্ত হবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে প্রতিপক্ষতা রহিত হয়ে যাবে। কেননা বিবাদী তার বাইয়েনাহ দ্বারা এটা প্রমাণ করেছে যে, বস্তুটি তার কাছে বাদী ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে এসেছে। কারণ সাক্ষীরা যে আমানত রেখেছে তাকে চেহারায় চিনেছে। প্রথম সূরতটি এর বিপরীত।

সুতরাং বিবাদীর দখলদারী প্রতিপক্ষতার দখল হল না আর এটা সাব্যস্ত করাই ছিলো (বিবাদীর) উদ্দেশ্য।

আর বাদী নিজেই নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কেননা সে তার প্রতিপক্ষকে ভুলে বসে আছে। কিংবা সাক্ষীরা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, বিবাদী নয়। এই মাসআলাটি মাবসূতের দাবী উত্থাপন পর্বে বর্ণিত পঞ্চমুখী মাসআলা রূপে পরিচিত। আর সে পাঁচটি মতামত আমরা বর্ণনা করেছি।

আর যদি বলে যে, আমি তা ক্রয় করেছি ঐ ব্যক্তি থেকে, যে এমন, তাহলে সে প্রতিপক্ষ গণ্য হবে।

কেননা সে যখন দাবী করলো যে, তার কবজা হচ্ছে মালিকানা কবজা, তখন সে প্রতিপক্ষ হওয়ার কথা স্বীকার করে নিলো।

আর যদি বাদী বলে যে, এটা তুমি আমার কাছ থেকে গসব করেছো কিংবা আমার কাছ থেকে চুরি করেছো তাহলে প্রতিপক্ষতা রহিত হবে না; যদিও কবজাকারী তা আমানতি মাল হওয়ার পক্ষে বাইয়েনাহ পেশ করে।

কেননা কবজাকারী ব্যক্তি প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হয়েছে তার বিরুদ্ধে একটি কর্মের দাবী উত্থাপনের কারণে, তার কবজার কারণে নয়। পক্ষান্তরে সাধারণ মালিকানার দাবী উত্থাপনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে বিবাদী তার কবজার কারণে প্রতিপক্ষ হয়। এ কারণেই তো যে ব্যক্তি কবজাকারী নয়, তার বিরুদ্ধে সাধারণ মালিকানার দাবী উত্থাপন সিদ্ধ নয়। কিন্তু (কবজাকারীর বিরুদ্ধে) কোন কর্মের অভিযোগ আনয়নের মাধ্যমে দাবী উত্থাপন সিদ্ধ হয়।

আর যদি বাদী বলে যে, এটা আমার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে, আর কবজাকারী বলে যে, অমুক আমার কাছে তা আমানত রেখেছে এবং বাইয়েনাহ্ পেশ করে তাহলে প্রতিপক্ষতা রহিত হবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। আর তা সূক্ষ্ম কিয়াস।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, প্রতিপক্ষতা রহিত হবে। কেননা, সে বিবাদীর বিরুদ্ধে কর্মের অভিযোগ আনয়নের মাধ্যমে দাবী উত্থাপন করে। সুতরাং এমন হল যদি বলে যে,আমার কাছ থেকে গসব করা হয়েছে এবং গসবকারীর নাম উচ্চারণ না করে।

শায়খায়নের দলীল এই যে, চৌর্যকর্ম অনিবার্যভাবে একটি কর্তা দাবী করে। আর প্রকাশিত অবস্থা এই যে, কর্তা সেই হবে, যার দখলে জিনিসটি রয়েছে। তবে বাদী বিবাদীর উপর অনুগ্রহ করে 'হদ্দ' রহিত করার জন্য এবং দোষ গোপন করা ছাড়াই হাছিল করার জন্য তাকে চিহ্নিত করেনি। সুতরাং এটাও তুমি চুরি করেছো বলার মত হলো। পক্ষান্তরে গসবের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাতে হদ্দ নেই। আর সাধারণত: এটা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা হয় না।

আর বাদী যদি বলে যে, আমি অমুকের কাছ থেকে এটা খরিদ করেছি, আর দখলদার বলে যে, সেই অমুক এটা আমার কাছে আমানত রেখেছে, তাহলে বাইয়েনাহ পেশ করা ছাড়াই প্রতিপক্ষতা রহিত হয়ে যাবে।

কেননা উভয়ে এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, এই বস্তুটিতে মূল মালিকানা বিবাদী ছাড়া অন্যের। সুতরাং দখলদারের কাছে বস্তুটি সেই লোকটির কাছ থেকেই আসবে। সুরতাং তার কবজা প্রতিপক্ষতার কবজা নয়। তবে যদি বাদী এই বাইয়েনাহ পেশ করে যে, সেই অমুক তাকে এটার কবজা করার ওকীল বানিয়েছে, কেননা এ ক্ষেত্রে সে বাইয়েনাহ্ দ্বারা সেটাকে কবজায় রাখার অধিকতর হকদার বলে প্রমাণ করেছে।

পরিচ্ছেদ : দু'জন যদি একই জিনিসের দাবীদার হয়

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দু'জন লোক যদি অন্য একজন লোকের কবজায় বিদ্যমান কোন বস্তু দাবী করে আর উভয়ের প্রত্যেকে মনে করে যে, এটা তার মালিকানার বস্তু এবং উভয়ে বাইয়েনাহ পেশ করে তাহলে ঐ বস্তুটি সম্পর্কে উভয়ের অনুকূলে ফায়সালা করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর একটি মত এই যে, উভয় বাইয়েনাহ্ বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অন্য মতে উভয়ের মাঝে লটারি করা হবে।

কেননা দু'টি বাইয়েনাহ্-এর একটি নিশ্চিত রূপেই মিথ্যা। কারণ একই অবস্থায় একটি বস্তুর সমগ্রে দুই মালিকানার একত্র হওয়া অসম্ভব। আর সত্য বাইয়েনাহ ও মিথ্যা বাইয়েনাহ্ এর পার্থক্য করা কঠিন। সুতরাং উভয়টি বাতিল হবে, কিংবা লটারির আশ্রয় গ্রহণ করা হবে। কেননা নবী (সা) এ ক্ষেত্রে লটারি করেছেন এবং বলেছেন, اللهم انت الحكم بينهما (হে আল্লাহ! আপনিই এদের দুজনের মাঝে বিচারক)।

আমাদের প্রমাণ হলো হযরত তামীম বিন তোরফা (রা)-এর হাদীস যে, দুজ'জন লোক একটি উটনী সম্পর্কে নবী (সা)-এর কাছে বিবাদ নিয়ে এলো এবং উভয়ের প্রত্যেকে বাইয়েনাহ্ পেশ করলো; তখন তিনি ঐ উটনীকে উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে ফায়সালা করলেন।

আর লটারী সংক্রান্ত হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিলো। পরে তা রহিত হয়ে গেছে।

তাছাড়া এই কারণে যে, উভয়ের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সাক্ষ্যের বৈধতাদানকারীর অস্তিত্ব সম্ভবনাপূর্ণ এভাবে যে, দুই সাক্ষী দলের একদল মালিকানার কারণের উপর নির্ভর করেছে। আর অন্যদল হস্তগত কবজার উপর নির্ভর করেছে। সুতরাং উভয় সাক্ষ্যের উপর আমল করা আবশ্যক হবে।

আর আধাআধি করে ভাগ করার মাধ্যমে উভয় সাক্ষ্যের উপর আমল করা সম্ভব। কারণ বস্তুটি আধাআধিকরণ গ্রহণ করে। আর আধাআধি করণের কারণ হলো হকদারীর কারণের ক্ষেত্রে উভয়ের সমতা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি উভয়ের প্রত্যেকে একজন স্ত্রীলোকের বিবাহের দাবীদার হয় এবং উভয়ে বাইয়েনাহ পেশ করলো, তাহলে দুই বাইয়েনাহ্ এর কোনটির অনুকূলে ফায়সালা করা হবে না।

কারণে উভয় বাইয়েনাহ্র উপর আমল করা সম্ভব নয়। কারণ,ক্ষেত্রটি শরীকানা গ্রহণ করে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অবশ্য দু'জনের একজনের অনুকূলে স্ত্রীলোকটির সত্যায়নের দিকে রুজু করা হবে।

কেননা বিবাহ এমন একটি বিধান, যে বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সত্যায়নের মাধ্যমে ফায়সালা করা হয়।

এ ফায়সালা তখন হবে যখন উভয় বাইয়েনাহ কোন তারিখ নির্ধারণ না করে। পক্ষান্তরে যদি তারিখ নির্ধারণ করে তাহলে প্রথম তারিখের অধিকারী ব্যক্তি অগ্রাধিকার লাভ করবে।

আর যদি বাইয়েনাহ্ উপস্থাপিত হওয়ার পূর্বে দু'জনের একজনের অনুকূলে স্ত্রী স্বীকৃতি প্রদান করে তাহলে সে তার স্ত্রী হবে।

কেননা (বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে) তাদের সত্যায়ন সাব্যস্ত হয়েছে। আর অপর জন যদি বাইয়েনাহ্ পেশ করে তাহলে বাইয়েনাহ্র অনুকূলে ফায়সালা করা হবে। কেননা (প্রমাণ হিসাবে) বাইয়েনাহ্ স্বীকারোক্তির চেয়ে শক্তিশালী।

আর যদি দুজনের একজন আলাদা দাবী উত্থাপন করে আর স্ত্রী লোকটি তা অস্বীকার করে আর দাবীদার বাইয়েনাহ্ পেশ করে এবং কাযী ঐ বাইয়েনাহ অনুযায়ী ফায়সালা করে ফেলে, অত:পর অন্যজন দাবী উত্থাপন করে এবং একই

রকম বাইয়েনাহ্ পেশ করে তাহলে দ্বিতীয় বাইয়েনাহ্ অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে না।

কেননা প্রথম ফায়সালাটি বৈধ হয়েছে। সুতরা তার সদৃশ দলীলের কারণে তা ভঙ্গ করা হবে না। বরং দ্বিতীয় দলীলটি প্রথমটির চেয়ে নিম্নস্তরের।

তবে যদি দ্বিতীয় জনের সাক্ষীরা (প্রথম জনের সাক্ষীদের বর্ণিত তারিখের) পূর্ববর্তী কোন তারিখ নির্ণয় করে সাক্ষ্য প্রদান করে (তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে)।

কেননা প্রথম ফায়সালার ক্ষেত্রে নিশ্চিত রূপে ভুল প্রকাশ পেয়ে গেছে।

তদ্রূপ স্ত্রীলোকটি যদি স্বামীর অধীনে থাকে এবং তার বিবাহ প্রকাশিত থাকে,তাহলে বহিরাগত ব্যক্তির বাইয়েনাহ্ তারিখগত পূর্ববর্তীতা ছাড়া গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি দু'জনের প্রত্যেকে দাবী করে যে, এই গোলামটি সে গোলাম যার দখলে আছে তার কাছ থেকে খরিদ করেছে এবং উভয়ে (তারিখ ছাড়া) বাইয়েনাহ্ পেশ করে তাহলে উভয়ের প্রত্যেকে ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। ইচ্ছা করলে সে অর্ধেক মূল্য দ্বারা অর্ধেক গোলাম গ্রহণ করবে আর ইচ্ছা করলে সে তা ত্যাগ করবে।

কেননা মালিকানার কারণের ক্ষেত্রে উভয়ের সমতার কারণে কাযী উভয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ফায়সালা করবেন। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, দুই ফুযূলী (অনিয়োজিত) ব্যক্তির প্রত্যেকে একেক জনের কাছে বিক্রি করল আর মালিক উভয় বিক্রিকে অনুমোদন করলো। উভয়ের প্রত্যেককে ইচ্ছাধিকার প্রদান করার কারণ এই যে,উভয়ের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই চুক্তির শর্ত (তথা সম্মতি) পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কেননা সমগ্রের মালিকানা লাভের প্রতিই তার আগ্রহ ছিল। সুতরাং ইচ্ছা করলে তা সে ফেরত দিয়ে সমগ্র মূল্য ফেরত নিতে পারে।

আর যদি কাযী উভয়ের মাঝে ঐ গোলাম ভাগ করার ফায়সালা করে আর তাদের একজন বলে যে, আমি অর্ধেক গ্রহণ করবো না, তাহলে অপর জনের পুরোটা নেওয়ার অধিকার থাকবে না।

কেননা তার জন্য অর্ধেকের ফায়সালা হয়ে গেছে। সুতরাং বাকি অর্ধেকের ক্ষেত্রে বিক্রয় রহিত হয়ে যাবে।

এটা এ কারণে যে, গোলামের ব্যাপারে সে প্রতিপক্ষ ছিলো, কেননা অপর পক্ষের বাইয়েনাহ না থাকলে তার বাইয়েনাহ্ দ্বারা সমগ্র গোলামের উপর তার হকদারি প্রকাশিত হতো।

পক্ষান্তরে কাযীর ইচ্ছাধিকার প্রদানের পূর্বে যদি তা বলে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ তার সমগ্র গোলাম গ্রহণের অধিকার থাকবে। কেননা সে তো সমগ্রটাই দাবী করছে। আর মালিকানার 'কারণ' (তথা ক্রয়) রহিত হয়নি। তার অর্ধেকে নেমে

আসার কারণ ছিলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর তা এখানে পাওয়া যায় নি। এর সদৃশ মাসআলা হলো আদালতের ফায়সালার নিজস্ব হক ছেড়ে দেয়া। আর প্রথমটির সদৃশ মাসআলা হলো আদালতের ফায়সালার পরে শোফার অধিকার অর্পণ করা।

আর যদি উভয়ের প্রত্যেকে একটি তারিখ উল্লেখ করে তাহলে তা প্রথম তারিখওয়ালার জন্য হবে।

কেননা সে এমন সময়ে ক্রয় প্রমাণিত করেছে, যখন তাতে অন্য কেউ প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল না। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুক্ত সময়ে প্রমাণিত করা দ্বারা অপর জনের দাবী রহিত হয়ে যাবে।

আর যদি একজন তারিখ নির্ধারণ করে আর অন্যজন না করে তাহলে তা তারিখওয়ালার জন্য হবে।

কেননা ঐ তারিখে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর অপরজনের ক্রয় ঐ তারিখের আগে হতে পারে পরেও হতে পারে। সুতরাং সন্দেহ দ্বারা তার অনুকূলে ফায়সালা করা যাবে না।

আর যদি দুজনের কেউ তারিখ উল্লেখ না করে কিন্তু দুজনের মধ্য থেকে একজনের কবজা বিদ্যমান থাকে তাহলে সে অধিকতর অগ্রাধিকারী হবে।

এর অর্থ এই যে, গোলামটি তার অধিকারে রয়েছে। কেননা তার দখল গ্রহণে সক্ষমতা পর্যবেক্ষিতভাবে প্রমাণ করে যে, সে আগে ক্রয় করেছে।

তাছাড়া উভয় দাবীদার দাবী প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সমান হয়েছে। সুতরাং সন্দেহ দ্বারা সাব্যস্ত কবজা ভঙ্গ করা যাবে না। অদ্রূপ একই হুকুম হবে যদি অপর জন (অর্থাৎ অদখলদার) কোন তারিখ উল্লেখ করে। কারণ তাই, যা আমরা বর্ণনা করেছি। তবে যদি অদখলদার এই মর্মে বাইয়েনাহ্ পেশ করে যে, তার ক্রয় দখলদারের ক্রয় থেকে পূর্ববর্তী ছিল। কেননা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরোক্ষ প্রমাণ থেকে উপরে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন,যদি দুজনের একজন ক্রয় দাবী করে; আর অন্যজন হেবা ও কবজা দাবী করে। অর্থাৎ একই ব্যক্তির পক্ষ থেকে, আর উভয়ে বাইয়েনাহ্ পেশ করে কিন্তু তাদের কাছে নির্দিষ্ট কোন তারিখ নেই তাহলে ক্রয়ের দাবীদার অধিক হকদার হবে।

কেননা (মালিকানার হেতু হিসাবে) ক্রয় হেবা থেকে অধিকতর শক্তিশালী। কারণ ক্রয়ে উভয় দিক থেকে বিনিময় রয়েছে। তাছাড়া ক্রয় নিজে নিজেই মালিকানা সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে হেবার ক্ষেত্রে মালিকানা কবজা করার উপর মওকুফ থাকবে।

আমাদের বর্ণিত একই কারণে ক্রয় এবং কবজাসহ সাদাকার একই হুকুম হবে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

কবজাসহ হেবা এবং কবজাসহ সাদাকা সমান। তাই উভয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ফায়সালা করা হবে।

কেননা দানের দিক থেকে (এবং কবজার মুখাপেক্ষী হওয়ার দিক থেকে) দুটোই সমান।

অনিবার্যতার দিক থেকে অগ্রাধিকার প্রদানের উপায় নেই। কেননা অনিবার্যতা পরবর্তী সময়ের উপর নির্ভর করে। অথচ অগ্রাধিকার প্রদান হয় বর্তমানে বিদ্যমান কোন গুণগত কারণ দ্বারা। আধাআধি ভাগ করার বিধান ঐ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য যেখানে বিভাজন সম্ভব নয়। তদ্রূপ কারো কারো মতে যেখানে বিভাজন সম্ভব, সেখানেও একই হুকুম হবে।

কেনন মালিকানার বিস্তার হচ্ছে আরোপিত। (সুতরাং এই সর্বাব্যাপিতা হেবাকে বাতিল করবে না)। আর কারো কারো মতে এটা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা এর অর্থ হবে অনির্ধারিত বিস্তৃত শরীকানার বস্তুতে হেবা কার্যকর করা। (আর তা বৈধ নয়)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি দুজনের একজন দাবী করে যে, গোলামটিকে সে কবজাকারীর হাত থেকে খরীদ করেছে আর এক স্ত্রীলোক দাবী করে যে, কবজাকারী তাকে এই গোলামটিকে মাহর ধরে বিবাহ করেছে তাহলে উভয়ের দাবী সমান হবে।

কারণ ক্রয় ও বিবাহ উভয়টি যেহেতু বিনিময় জাতীয় যা স্বামীর পক্ষেই মালিকানা সাব্যস্ত করে, সেহেতু 'কারণ' হিসাবে উভয়টির শক্তি সমান। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, (হেতু হিসাবে) ক্রয় অগ্রাধিকারযোগ্য। আর স্ত্রী তার স্বামীর কাছে গোলামের মূল্য পাবে। এ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, ক্রয়কে অগ্রবর্তী ধরে নিয়ে উভয় বাইয়েনাহর উপর আমল করা সম্ভব। কেননা অন্যের মালিকানাধীন নির্ধারিত বস্তুর উপর বিবাহ করা বৈধ রয়েছে। সেক্ষেত্রে বস্তুটি অর্পণ করা অসম্ভব হলে তার মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

আর যদি দু'জনের একজন দখলসহ বন্ধক বলে দাবী করে, আর অপর জন দখলসহ হেবা দাবী করে, আর উভয়ে বাইয়েনাহ পেশ করে, তাহলে বন্ধকের দাবী অগ্রাধিকারযোগ্য।

এটা সূক্ষ্ম কিয়াস। সাধারণ কিয়াস মতে হেবা অগ্রাধিকারযোগ্য হবে। কেননা হেবা মালিকানা সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে বন্ধক মালিকানা সাব্যস্ত করে না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে,বন্ধক সূত্রে যা কবজা করা হয়, সেটা ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ হয়। আর হেবা সূত্রে যা কবজা করা হয় তা ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ হয় না। আর দায়বদ্ধ সম্পন্ন চুক্তি অধিক শক্তিশালী। বিনিময় মূলক হেবার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা পরিণতির দিক থেকে তা বিক্রয়। আর বিক্রয় হেবা থেকে অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা তা দায়বদ্ধ সম্পন্ন চুক্তি, যা (বর্তমানে) দৃশ্যত: এবং (পরবর্তীতে) গুণগত মালিকানা সাব্যস্ত করে; পক্ষান্তরে বন্ধক মালিকানা সাব্যস্ত করে না। অবশ্য বন্ধকী দ্রব্য হালাক হওয়ার সময় শুধু গুণগত মালিকানা সৃষ্টি করে। কিন্তু দৃশ্যত: নয়।

সুতরাং একইভাবে বিনিময়মূল্য হেবা (বন্ধক থেকে শক্তিশালী হবে।)

আর যদি দুই অদখলদার (তৃতীয় একজন দখলদারের বিরুদ্ধে) তারিখ উল্লেখসহ মালিকানা দাবী করে তাহলে অগ্রবর্তী তারিখ ওয়ালা অধিক হকদার হবে।

কেননা সে প্রমাণ করেছে যে, সে দুই মালিকের প্রথম জন। সুতরাং তার দিক থেকেই মালিকানা লাভ করা যাবে; অথচ অপর জন তার কাছ থেকে মালিকানা লাভ করেনি।

ইমাম কুদূরী বলেন, আর যদি দু'জন এক ব্যক্তির কাছ থেকে খরিদ করার দাবী করে, অর্থাৎ কবজাকারী ছাড়া ভিন্ন এক ব্যক্তি থেকে, এবং উভয়ে দুটি ভিন্ন তারিখের উপর বাইয়েনাহ পেশ করে তাহলে প্রথম তারিখওয়ালা অগ্রাধিকার যোগ্য হবে।

কেননা আমরা বর্ণনা করেছি যে, সে এমন সময়ে মালিকানা দাবী করেছে; যে সময়ে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

আর যদি উভয়ের প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ব্যক্তি থেকে খরিদ করার দাবী করে আর উভয়ে একই তারিখ উল্লেখ করে তাহলে উভয়ে সমান অধিকারী হবে।

কেননা উভয়ে তাদের বিক্রেতার অনুকূলে মালিকানা সাব্যস্ত করছে। সুতরাং এমন হবে যেন বিক্রেতাদ্বয় উপস্থিত হয়েছে। (এবং ঐ দাবী করেছে) অত:পর উভয়কে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর যদি দুই বাইয়েনাহ্‌র একটি কোন তারিখ উল্লেখ করে থাকে আর অন্যটি কোন তারিখ উল্লেখ না করে তাহলে উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে ফায়সালা করা হবে।

কেননা দু'জনের মধ্য থেকে একজনের তারিখ নির্ধারণ তার মালিকানা অগ্রাধিকার প্রমাণ করে না। কারণ হতে পারে যে, অপরজন তার থেকে অগ্রবর্তী। পক্ষান্তরে বিক্রেতা একজন হলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা উভয় দাবীদার এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, মালিকানা শুধু এই বিক্রেতার কাছ থেকেই লাভ করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় তাদের একজন যখন বাইয়েনাহ দ্বারা একটি তারিখ প্রমাণ করবে তখন তার অনুকূলেই ফায়সালা করা হবে, যতক্ষণ না প্রমাণিত হবে যে, অপর জনের ক্রয় তার থেকে অগ্রবর্তী হয়েছে।

আর যদি দুজনের একজন কোন লোকের কাছ থেকে ক্রয়ের দাবী করে আর অপরজন অন্য কারো কাছ থেকে কবজাসহ হেবা দাবী করে আর তৃতীয় একজন তার বাবার কাছ থেকে মীরাছ রূপে মালিকানা দাবী করে আর চতুর্থ একজন অন্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে কবজাসহ সাদাকার দাবী করে, তাহলে তাদের মাঝে চতুর্থাংশ করে ফায়সালা করা হবে। কেননা তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ (দাতা ও) বিক্রেতার কাছ থেকে মালিকানা অর্জন করবে। সুতরাং যেন এমন হলো যে, তারা প্রত্যেকে উপস্থিত হয়েছে আর দাবীদারগণ বাইয়েনাহ যোগে সাধারণ মালিকানা দাবী করছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অকবজাকারী ব্যক্তি যদি তারিখযুক্ত মালিকানা দাবী করে আর কবজাকারী ব্যক্তি অগ্রবর্তী তারিখযুক্ত মালিকানা দাবী করে তাহলে কবজাকারী অগ্রাধিকারযোগ্য হবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। আর এটা ইমাম মুহম্মদ (র) থেকেও প্রাপ্ত একটি বর্ণনা।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) হতে প্রাপ্ত আরেকটি বর্ণনা মতে কবজাকারীর বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম মুহম্মদ (র)এই শেষ বর্ণনাটির দিকে রুজু করেছেন।

কেননা উভয় বাইয়েনাহ্ সাধারণ মালিকানার জন্য পেশ করা হয়েছে এবং উভয়েই মালিকানা লাভের সূত্র ও উৎস উল্লেখ করেনি। সুতরাং অগ্রবর্তিতা ও পরবর্তিতার বিষয়টি সমান।

শায়খায়নের দলীল এই যে, (কবজাকারীর) তারিখ যুক্ত বাইয়েনাহ (অপর পক্ষের বাইয়েনাহ্কে) রোধ করার গুণগত দিককে নিজের মাঝে ধারণ করছে। কেননা একটি সময় যখন একজনের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় তখন পরবর্তী সময়ে তার দিক থেকে লাভ করা ছাড়া অন্য কারো জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হতে পারে না। আর (প্রতিপক্ষতা) রোধ করার ব্যাপারে কবজাকারীর বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য।

একই মতপার্থক্য হবে যদি একটি বাড়ী তাদের দুজনেরই কবজায় থাকে (এবং উভয়ে তারিখসহ মালিকানা দাবী করে)। আর কারণ সেটাই, যা ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

আর যদি অদখলদার ও দখলদার সাধারণ মালিকানা দাবী করে। আর দুই বাইয়েনাহর একটিতে সময় উল্লেখিত হয় আর অন্যটিতে সময় উল্লেখিত না হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে অদলখদার ব্যক্তি অগ্রাধিকারযোগ্য।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, আর এটি ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত একটি মত; সময় উল্লেখকারী দাবীদার অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা মালিকানায় সে অগ্রবর্তী। আর এটা এমনই হলো যেমন ক্রয়ের দাবীদার ক্ষেত্রে একজন সময় উল্লেখ সহ বাইয়েনাহ পেশ করলো। তখন সময় উল্লেখকারী দাবীদার অগ্রাধিকারযোগ্য হয়।

তারফায়নের দলীল এই যে, দখলদারের বাইয়েনাহ তো গ্রহণযোগ্য হবে (অদখলদারের বাইয়েনাহকে) রোধ করার গুণগত দিক এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে। অথচ এখানে রোধ করার বিষয় নেই। কারণ তার দিক থেকে মালিকানা লাভের বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। **একই মতপার্থক্য হবে যদি এই সূরতে বাড়ীটি উভয়ের দখলে থাকে। আর যদি বাড়ীটি তৃতীয় কারো দখলে থাকে এবং মাসআলাটির সূরত হুবহু এই হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে অদখলদার উভয়ে সমান হকদার হবে।**

আর ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, যে তারিখ উল্লেখ করবে সে অগ্রাধিকারযোগ্য হবে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যে তারিখমুক্ত সাধারণ মালিকানা দাবী করবে সে অগ্রাধিকারযোগ্য হবে। কেননা সে অগ্রাধিকারযোগ্য মালিকানা দাবী করছে। দলীল এই যে, সাধারণ মালিকানার দাবীদার উক্ত বস্তুর অতিরিক্ত ফায়দা গুলোরও হকদার হয় এবং মালিকানার অন্যদাবীদার প্রমাণিত হলে বিক্রেতাগণ পর্যায়ক্রমে একে অন্যের কাছে রুজু করার অধিকার হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, তারিখের উল্লেখ ঐ সময়ের নিশ্চিত মালিকানা সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে তারিখ মুক্তদাবী ঐ সময়ের পূর্বে না হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আর নিশ্চয়তার কারণে অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হবে। যেমন উভয়ে যদি ক্রয়দাবী করে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, তারিখটির সঙ্গে অনগ্রবর্তিতার সম্ভাবনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সুতরাং তারিখটির বিবেচ্যতা রহিত হয়ে যাবে। তাই এটা ঐ অবস্থার মত হলো, যখন উভয়ে সাধারণ মালিকানার পক্ষে বাইয়েনাহ পেশ করলো। ক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা নব উদ্ভূত ঘটনা। সুতরাং এটাকে নিকটতম সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। ফলে তারিখ উল্লেখকারীর দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অ-দখলদার এবং দখলদার উভয়ের প্রত্যেকে যদি দাবী করে যে, এই পশুটি তার কাছে প্রসব করেছে, তাহলে দখলদার অগ্রাধিকার লাভ করবে।

কেননা দখলদারের বাইয়েনাহ এমন বক্তব্যের উপর উপস্থিত হয়েছে, দখল যার সত্যতা প্রমাণ করে। সুতরাং উভয় বাইয়েনাহ তো সমান হলো; কিন্তু দখলের কারণে দখলদারের বাইয়েনাহ অগ্রাধিকার লাভ করবে। তাই তার অনুকূলে ফায়সালা করা হবে। এটাই হলো বিশুদ্ধ মত। এর বিপরীতে ঈসা বিন আবান (র) বলেন, উভয় বাইয়েনাহ বাতিল হবে এবং বিতর্কিত বস্তুটি তার হাতে ছেড়ে দেয়া হবে; তবে আদালতের বিচারের ভিত্তিতে নয়। আর যদি (দখলদার ও অদখলদার) উভয়ের প্রত্যেকে আলাদা আলাদা লোকের কাছ থেকে মালিকানা লাভ করেছে বলে দাবী করে এবং সেই লোকের কাছে থাকা অবস্থায় বাচ্চা হয়েছে বলে বাইয়েনাহ পেশ করে তাহলে নিজের কাছে থাকা অবস্থায় বাচ্চা হওয়ার পক্ষে বাইয়েনাহ পেশ করার মত হবে।

আর যদি উভয়ের একজন মালিকানার পক্ষে বাইয়েনাহ পেশ করে, আর অন্যজন (তার কাছে থাকা অবস্থায়) বাচ্চা হওয়ার পক্ষে বাইয়েনাহ পেশ করে, তাহলে বাচ্চা হওয়ার দাবীদার অগ্রাধিকার লাভ করবে, সে দুজনের যে-ই হোক।

কেননা তার বাইয়েনাহ পূর্ববর্তী মালিকানার পক্ষে পেশ হয়েছে। সুতরাং অপর পক্ষের জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হবে না, তবে যদি সে তার কাছ থেকেই মালিকানা লাভ করে থাকে।

একইভাবে যদি দুই অদখলদার পরস্পর দাবীদার থাকে, সে ক্ষেত্রে বাচ্চা হওয়ার পক্ষে পেশকৃত বাইয়েনাহ অগ্রাধিকার লাভ করবে। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর যদি দখলদারের অনুকূলে 'প্রসবিত' বাচ্চার ফায়সালা করা হয়, তারপর তৃতীয় একজন তার কাছে বাচ্চা হওয়ার দাবী করে তাহলে (এই বাইয়েনাহর ভিত্তিতে) তার অনুকূলে নতুন ফায়সালা দেয়া হবে, যদি না দখলদার পুন: বাইয়েনাহ্ পেশ করে।

কেননা অদখলদার তৃতীয় ব্যক্তিটি পূর্ববর্তী রায়ের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হয়নি।

তদ্রূপ দখলদারের বিরুদ্ধে সাধারণ মালিকানার রায় জারি হওয়ার পর যদি দলখদার তার কাছে বাচ্চা হওয়ার বাইয়েনাহ পেশ করে, তাহলে তার বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে। এবং পূর্ববর্তী রায় নাচক হয়ে যাবে।

কেননা বাচ্চা হওয়ার পক্ষে পেশকৃত বাইয়েনাহটি নাছ এর পর্যায়ভুক্ত। আর প্রথমটি ইজতিহাদের পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তদ্রূপ একই হুকুম হবে ঐ বস্ত্র বয়নের ক্ষেত্রে, যা একবারের অধিক বয়ন করা হয় না। যেমন তুলার সূতা কেটে বস্ত্র বয়ন। তদ্রূপ একই হুকুম হবে মালিকানায় সৃষ্ট এমন প্রতিটি 'হেতু' এর ক্ষেত্রে, যা একাধিকবার সম্পন্ন হতে পারে না।

কেননা এগুলো বাচ্চা প্রসবের সমার্থক। যেমন দুধ দোহনের দাবী, পনির তৈরির দাবী, গালিচা তৈরির দাবী, ছাগলের পশম কর্তনের এবং দুম্বার পশম কর্তনের দাবী।

আর যদি 'হেতুটি' পুনর্বার ঘটার যোগ্য হয়, তাহলে অদখলদারের অনুকূলে রায় প্রদান করা হবে। যেমন সাধারণ মালিকানা দাবী করার ক্ষেত্রে। আর তার উদাহরণ হলো, কাঁচা রেশমের বয়নকৃত বস্ত্র এবং ঘর গাছের রোপিত চারা, গমের ফসল ও অন্যান্য শস্যের।

আর যদি হেতুটি পুন:ঘটন যোগ্য কি-না তা বোঝা মুশকিল হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের শরণাপন্ন হবে। কেননা এ বিষয়ে তারা অধিক জ্ঞাত। যদি তাদের কাছেও বিষয়টি জটিল মনে হয় তাহলে অ-দখলদারের অনুকূলে ফায়সালা করা হবে।

কেননা অদখলদারের বাইয়েনাহ অনুযায়ী ফায়সালা করাই হলো মূল অবস্থা। এই অবস্থা থেকে সরে আসা হয়েছে বাচ্চা প্রসব সংক্রান্ত হাদীসের কারণে। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা যখন জানা যাবে না তখন মূল অবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অ-দখলদার যদি সাধারণ মালিকানার বাইয়েনাহ পেশ করে আর দখলদার অ-দখলদারের কাছ থেকে খরিদ করার অনুকূলে বাইয়েনাহ্ পেশ করে তাহলে দখলদার অগ্রাধিকারযোগ্য হবে।

কেননা প্রথম জন যদিও প্রাথমিক মালিকানা প্রমাণ করছে, কিন্তু দ্বিতীয়জন তারই কাছ থেকে মালিকানা লাভের দাবী করছে। আর এ দুইয়ের মাঝে বিরোধ নেই। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, দখলদার প্রথমে অদখলদারের মালিকানা স্বীকার করলো, তারপর তার কাছ থেকে ক্রয়ের দাবী করলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, উভয়ের প্রত্যেকে যদি অপরজনের কাছ থেকে ক্রয়ের দাবী করে, আর উভয়ের কারোই তারিখ জানা না থাকে তাহলে উভয় পক্ষের বাইয়েনাহ বাতিল হয়ে যাবে। এবং ভবনটি (অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ বস্তুটি) দখলদারের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এট ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত।

ইমাম মুহম্মদ (র)-এ মতে উভয় বাইয়েনাহ অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে। এবং বাড়িটি অদলদারের হবে। কেননা উভয় বাইয়েনাহ কার্যকর করা সম্ভব এভাবে যে, ধরে নেয়া হবে যে, দখলদার প্রথমে অদখলদারের কাছ থেকে তা ক্রয় করেছে এবং দখল গ্রহণ করেছে। অত:পর অদখলদারের কাছে বিক্রি করেছে, কিন্তু তাকে দখল বুঝিয়ে দেয়নি। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, দখল ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতা প্রমাণ করে। কিন্তু বিষয়টি উল্টো হবে না। কেননা তার মতে এমন কি অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেও দখল গ্রহণের পূর্বে বিক্রি করা জায়িয হবে না।

শায়খায়নের দলীল এই যে, ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করার অর্থ তার পক্ষ হতে বিক্রেতার অনুকূলে মালিকানার স্বীকৃতি প্রদান করা। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যেন উভয় বাইয়েনাহ দ্বারা দুইটি স্বীকারোক্তি সাব্যস্ত হলো। আর সে ক্ষেত্রে সর্বাসম্মতিক্রমে উভয় স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এখানেও বাতিল হয়ে যাবে।

তাছাড়া 'হেতু' দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো বিধান সাব্যস্ত করা। আর এখানে ক্রয় 'হেতু' বিধান হলো মালিকানা। অথচ এখানে দখলদারের অনুকূলে এমন মালিকানার ফায়সালাই শুধু দেয়া সম্ভব, যার বিপক্ষে অ-দখলদারের হকদারী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং বিধান ছাড়া শুধু 'হেতু'-এর অনুকূলে ফায়সালা প্রদান করা হবে। আর তা ফলদায়ক হবে না।

'অত:পর উভয় বাইয়েনাাহ যদি মূল্য পরিশোধের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করে, তখন শায়খায়নের মতে, এক হাজার হাজারের বিপরীতে বদল হয়ে যাবে। যখন উভয় দিক থেকে দায়মুক্ত গ্রহণ দ্বারা সমতাপূর্ণ হয়েছে।

আর যদি তারা মূল্য পরিশোধের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান না করে তাহলে, ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে বদলা বদলি সাব্যস্ত হবে। কেননা তাঁর মতে উভয় দিক থেকে মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আর উভয় দল যদি বিক্রয় ও দখল গ্রহণের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে উভয় বাইয়েনাহ নাচক হয়ে যাবে।

কেননা মুহম্মদ (র)-এর মতে এখানে দুই বাইয়েনাহর মাঝে সমন্বয় বিধান সম্ভব নয়; কারণ, উভয় বিক্রয় বৈধতা লাভের যোগ্য।

আর স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে উভয় বাইয়েনাহ যদি তারিখ উল্লেখ করে কিন্তু দখল গ্রহণের কথা উল্লেখ না করে আর অদখলদারের তারিখ অগ্রবর্তি হয় তাহলে শায়খায়নের মতে দখলদারের অনুকূলে ফায়সালা করা হবে এবং ধরে নেয়া হবে যে, অদখলদার প্রথমে খরিদ করেছে এরপর দখল গ্রহণের পূর্বেই দখলখদারের কাছে বিক্রি করেছে। আর শায়খায়নের মতে স্থাবর সম্পত্তি দখল গ্রহণের পূর্বে বিক্রি করা যায়।

আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে অদখলদারের অনুকূলে ফায়সালা করা হবে। কেননা দখল গ্রহণের পূর্বে তার বিক্রয় সিদ্ধ হয়নি। সুতরাং সেটা তার মালিকানাতেই রয়ে গেছে।

আর যদি উভয় বাইয়েনাহ স্থাবর সম্পত্তিতে দখল গ্রহণ সাব্যস্ত করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে দখলদারের অনুকূলে ফায়সালা করা হবে। কেননা উভয় মতে বিক্রয়টি সিদ্ধ হয়েছে।

আর যদি দখলদারের উল্লেখকৃত সময়টি অগ্রবর্তী হয় তাহলে দখল গ্রহণের সাক্ষ্য প্রদান করা হোক বা না হোক, উভয় অবস্থায় অ-দখলদারের অনুকূলে ফায়ছালা করা হবে এবং ধরে নেয়া হবে যে, দখলদার তার কাছ থেকে খরিদ করেছে এবং দখল গ্রহণ করেছে অত:পর (দখলদারের কাছে) বিক্রি করেছে কিন্তু দখল প্রদান করেনি। কিংবা দখল প্রদান করেছে, তবে পরবর্তীতে অন্য হেতু দ্বারা দখলদারের দখলে চলে এসেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দুই দাবীদারের একজন যদি দুই সাক্ষী পেশ করে আর অপর জন চার সাক্ষী পেশ করে তাহলে উভয় বাইয়েনাহ সমান বলেই গণ্য হবে।

কেননা প্রত্যেক দুই সাক্ষীর সাক্ষ্য একটি পূর্ণ প্রমাণ, যেমন পৃথকভাবে দুই সাক্ষীর ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয় না বরং তার শক্তি দ্বারা হয়। যেমন উসূলুল ফেকাহ শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি কোন এক লোকের দখলে কোন বাড়ী থাকে আর অন্য দু'জন লোক তার মালিকানা দাবী করে; একজন দাবী করে সমগ্র বাড়ী আর অন্যজন দাবী তার অর্ধেক, আর উভয় দাবীদার বাইয়েনাহ পেশ করে; তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সমগ্রের দাবীদার পাবে তিন চতুর্থাংশ, অর্ধেকের দাবীদার পাবে এক চতুর্থাংশ।

এ সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'বিরোধপূর্ণ' বিবেচনা করে। কেননা, অর্ধেকের দাবীদার অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে অপর পক্ষের সাথে বিরোধ করছে না। সুতরাং সেটা তার জন্য বিরোধহীন অবস্থায় নিরাপদ হয়ে গেলো। পক্ষান্তরে অন্য অর্ধেকের ব্যাপারে উভয়ের বিরোধ সমশক্তি সম্পন্ন হলো। সুতরাং এটাকে উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে ভাগ করা হবে।

আর সাহেবায়ন বলেন, বাড়ী তাদের মাঝে তিন ভাগে ভাগ হবে।

অর্থাৎ সাহেবায়ন عول (আপাত রাশি বর্ধন) ও مضاربة (বা সর্বায়ন)-এর সূত্র বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ সমগ্রের দাবীদার সমগ্রের দুই হিসসা পাবে। আর অর্ধেকের দাবীদার সমগ্রের এক হিসসা পাবে। সুতরাং সমগ্র সম্পত্তিকে তিন ভাগ করা হবে। এই মাসআলাটির কতিপয় সদৃশ ও বিসদৃশ উদাহরণ রয়েছে, যা এই সংক্ষিপ্ত (বিদায়া) গ্রন্থে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। যিয়াদাত গ্রন্থে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি বাড়ীটি তাদের দুজনের দখলে থাকে তাহলে সমগ্রের দাবীদারের অনুকূলে আদালতের রায়ের ভিত্তিতে 'অর্ধেক' বাড়ী নিরাপদ থাকবে। বাকি অর্ধেকও তার অনুকূলে নিরাপদ থাকবে, তবে সেটা আদালতের রায়ের ভিত্তিতে নয়।

কেননা যে অর্ধেক অপর পক্ষের হাতে আছে, সে অর্ধেকের ব্যাপারে সে হলো অ-দখলদার। সুতরাং তার বাইয়েনাহ অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে। আর যে অর্ধেক তার দখলে ছিলো অপর পক্ষ সেটা দাবী করেনি। কেননা তার দাবী তো শুধু অর্ধেক সম্পর্কে আর তা তার দখলে রয়েছে। সুতরাং সমগ্রের দাবীদারের জন্য অর্ধেক হয়ে গেল। কেননা অর্ধেকের দাবীদারের হাতে যে অর্ধেক রয়েছে, সেটা আদালতের রায় ছাড়াই তার হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি উভয়ে কোন পশু সম্পর্কে বিবাদ করে এবং উভয়ে এই মর্মে বাইয়েনাহ পেশ করে যে, পশুটি তার কাছে প্রসব করেছে এবং উভয়ে একটি তারিখ উল্লেখ করে আর পশুর বয়স দুই তারিখের কোন একটির অনুকূল হয় তাহলে সে-ই অগ্রাধিকারী হবে।

কেননা অবস্থা তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং সে অগ্রাধিকার লাভ করবে।

আর যদি বয়সের বিষয়টি জটিল হয় তাহলে পশুটি উভয়ের মাঝে শরীকানা হবে।

কেননা তারিখের বিষয়টি নাকচ হয়ে গেছে। সুতরাং ধরে নেওয়া হবে যেন তারা তারিখ উল্লেখ করেনি।

আর যদি পশুর বয়স উভয় তারিখের সাথেই অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে উভয় বাইয়েনাহ বাতিল হয়ে যাবে। যেমন হাকিম শহীদ (র) উল্লেখ করেছেন। কেননা উভয় পক্ষের মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেয়ে গেছে। সুতরাং পশুটি যার হাতে ছিলো তার হাতেই রেখে দেয়া হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন একজনের হাতে যদি একটি গোলাম থাকে আর দু'জন লোক তার বিরুদ্ধে বাইয়েনাহ পেশ করে, একজন গসবের বাইয়েনাহ,অন্যজন আমানত রাখার বাইয়েনাহ, তাহলে গোলামটি উভয়ের শরীকানায় হবে। কেননা উভয়ে সমান।

কবজার মাধ্যমে বিবাদ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দুজন লোক যদি একটি সওয়ারি সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হয়, আর তাদের মধ্যে একজন তাতে সওয়ার থাকে আর অন্য জন লাগাম ধরে রাখে তাহলে আরোহী অগ্রাধিকার লাভ করবে।

কেননা আরোহণের কাজটি যেহেতু মালিকানার সাথে বিশিষ্ট, সেহেতু তার কর্তৃত্ব অধিক প্রকাশিত।

তদ্রূপ একজন যদি সওয়ারির গদীতে সওয়ার থাকে আর অন্যজন গদীর বাইরে পশ্চাতে আরোহণকারী হয়, তাহলে গদীতে আরোহী অগ্রাধিকার লাভ করবে।

পক্ষান্তরে উভয়ে যদি গদীতে আরোহণকারী হয় তাহলে কর্তৃত্বের সমতার কারণে পশুটি উভয়ের মাঝে শরীকানা হবে।

তদ্রূপ যদি উভয়ে একটি উট নিয়ে বিবাদ করে আর তাদের একজনের বোঝা তার উপর চাপানো থাকে এবং অন্যজনের একটি পানপাত্র ঝুলন্ত থাকে তাহলে বোঝা ওয়ালা অগ্রাধিকারী হবে।

কেননা সেই হচ্ছে উটটিতে কর্তৃত্ববান।

তদ্রূপ যদি একটি জামা নিয়ে দু'জন বিবাদ করে। আর অবস্থা এই যে, **একজন জামা পরিধান করে আছে, আর অন্যজন আস্তিন ধরে আছে, তাহলে পরিধানকারী অগ্রাধিকারী হবে।**

কেননা উভয়ের মধ্যে পরিধানকারীর কর্তৃত্ব অধিক স্পষ্ট।

আর যদি একটি বিছানা সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হয়। আর অবস্থা এই যে, একজন তাতে বসে আছে এবং অন্যজন তা ধরে আছে, তাহলে এটা উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে।

এর অর্থ হলো এটা আদালতের ফায়সালার ভিত্তিতে নয়। কেননা বসে থাকা দ্বারা দখল সাব্যস্ত হয় না। তাই উভয়ে সমান হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, একটি কাপড় যদি একজন লোকের হাতে থাকে, আর তার একটি প্রান্ত অন্য একজন লোকের হাতে থাকে তাহলে তা উভয়ের মাঝে আধাআধি হবে।

কেননা দখলের অতিরিক্ত পরিমাণ প্রমাণের শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং এই অতিরিক্ত হকদারির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রমাণ করবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কোন বাচ্চা যদি কারো কবজায় থাকে আর সে কথা বলতে পারে, সে যদি বলে যে, আমি স্বাধীন, তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা সে নিজের দখলে আছে।

আর যদি বলে যে, আমি অমুকের গোলাম, তাহলে যার হাতে আছে তারই গোলাম বলে সাব্যস্ত হবে।

কেননা দাসত্বের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সে একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, তার উপর তার নিজের কোন কবজা নেই।

আর যদি সে কথা বলতে না পারে তাহলে যার হাতে আছে তারই গোলাম সাব্যস্ত হবে।

কারণ যেহেতু সে কথা বলতে পারে না, সেহেতু তার নিজের উপর নিজের কোন দখল নেই। বরং সামানপত্র -এর সমতুল্য হবে। পক্ষান্তরে কথা বলতে পারার বিষয়টি ভিন্ন।

আর যদি সে বড় হওয়ার পর স্বাধীনতা দাবী করে তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ছোট অবস্থায় তার দাসত্ব সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, দেয়াল যদি একজন লোকের হয়, যে দেয়ালের উপর কতিপয় 'বীম' স্থাপিত হয়েছে; কিংবা দেয়াল যদি তার ভবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় আর তার উপর অন্য কারো 'তক্তা' বিছানো থাকে, তাহলে তা 'বীম' ওয়ালার এবং সংযুক্তি সম্পন্ন ভবন ওয়ালার হবে। বিছানো তক্তা বিবেচ্য নয়।

কেননা 'বীম' ওয়ালা হলো সে দেয়াল ব্যবহাকারী, আর অন্যজন হলো সম্পর্কিত ব্যক্তি। সুতরাং বিষয়টি ঐ সওয়ারি পশুর মত হলো, যার মালিকানা নিয়ে দু'জন বিরোধ করছে আর তাদের একজনের বোঝা পশুর উপর রয়েছে আর অন্যজনের একটি পানপাত্র তার সাথে ঝুলানো রয়েছে।

আর সংযুক্তি অর্থ এর দেওয়ালের ভিতরে প্রবিষ্টতা অর্থাৎ তার দেয়ালের ইট এই বিরোধপূর্ণ দেয়ালের ভিতরে প্রবিষ্ট আছে। আর অপরপক্ষের ইট শুধু তার দেয়ালেই গাঁথা আছে। এটাকে পরিভাষায় اتصال تربيع। (বা বর্গ সংযুক্তিও) বলে। আর এই সংযুক্তি সংযুক্তির অধিকারী ব্যক্তির অনুকূলে একটি প্রকাশিত ও সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা তক্তা তার ভবনের (বা দেয়ালের) কিছু অংশ এই বিরোধপূর্ণ দেয়ালের উপর রয়েছে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্য 'বিছানা কিছুই নয়' প্রমাণ করে যে, তক্তার কোন বিবেচ্যতাই নেই। দেওয়ালের উপরে বিছানো চাটাই সম্পর্কেও একই কথা।

কেননা দেয়াল মূলত:ই তক্তা বা চাটাই বিছানোর জন্য তৈরি করা হয় না। আর যদি কোন দেওয়াল সম্পর্কে দুজনের মাঝে বিরোধ হয়, আর তার উপর একজনের তক্তা বিছানো থাকে; কিন্তু সেটার উপর অপর জনের কিছুই না থাকে, তাহলে সেটার মালিকানা উভয়ের মাঝে হবে।

আর যদি ঐ দেয়ালের উপর উভয়ের প্রত্যেকের তিনটা করে 'বীম' থাকে তাহলে দেওয়ালের মালিকানা উভয়ের মাঝে হবে।

কেননা তারা উভয়ে সমান। আর তিনের পরে বীমের আধিক্য বিবেচ্য নয়।

আর যদি এক জনের বীম তিনজনের কম হয় তাহলে দেয়াল তিন বীম ওয়ালার হবে। আর অপর জন তার বীম স্থাপনের স্থানাধিকার লাভ করবে—এক বর্ণনা মতে।

আরেক বর্ণনা মতে উভয়ের প্রত্যেকে ঐ অংশটুকু পাবে, যা তার কাঠের নীচে আছে।

অত:পর কেউ কেউ বলেন, এক কাঠ থেকে আরেক কাঠ পর্যন্ত উভয়ের মাঝে শরিকানা হবে। আর কেউ কেউ বলেন, তাদের কাঠের পরিমাণ অনুপাতে মালিকানা হবে।

কিন্তু কিয়াসের দাবী হলো উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টিত হওয়া। কেননা নিছক প্রমাণের আধিক্য বিবেচ্য নয়।

দ্বিতীয় বর্ণনার দলীল এই যে, প্রত্যেক পক্ষ থেকে তার কাঠ পরিমাণ অংশ তার ব্যবহারে এসেছে।

আর প্রথম মতের দলীল এই যে, দেয়াল তৈরি হয় তার উপর অনেকগুলো বীম রাখার জন্য, একটি দুটি রাখার জন্য নয়। সুতরাং প্রকাশিত অবস্থা অধিক বীমওয়ালার অনুকূলে প্রমাণ। তবে এক বা দুই বীম ওয়ালার কড়িকাঠ স্থাপনের স্থানাধিকার থাকবে। কেননা প্রকাশিত অবস্থা তার দখল- অধিকার লাভের প্রমাণ নয়।

আর যদি দু'জনের মধ্য হতে একজনের সেটার উপর বীম থাকে আর অন্যজনের সংযুক্তি থাকে তাহলে প্রথমজন অগ্রাধিকার লাভ করবে।

অন্য বর্ণনা মতে দ্বিতীয় জন অগ্রাধিকারী হবে।

প্রথম বর্ণনার কারণ এই যে, বীম ওয়ালার পক্ষ থেকে বস্তুটির উপর ব্যবহার সাব্যস্ত হয়েছে। আর সংযুক্তি লাভ করা ব্যক্তির পক্ষ থেকে কবজা সাব্যস্ত হয়েছে। আর ব্যবহার অধিকতর শক্তিশালী। কেননা দখলেরও উদ্দেশ্য ব্যবহার।

দ্বিতীয় বর্ণনার কারণ এই যে, সংযুক্তির কারণে দুটি দেয়াল অভিন্ন স্থাপনের মত হয়ে যায়। আর একটি স্থাপনের আংশিকের ফায়সালা তার অনুকূলে করার অনিবার্য ফল হলে অনুকূলে সমগ্রের ফায়সালা করা।

তবে (দ্বিতীয় বর্ণনা মতে) অপর জনের তার বীমসমূহ স্থাপনের অধিকার থাকবে। কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এটা হলো ইমাম তাহাবীর বর্ণনা। আর ফকীহ জুরজানী এই মতকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, একটি বাড়ীর দশটি কক্ষ যদি একজন লোকের দখলে থাকে আর অন্যজনের কবজায় একটি কক্ষ থাকে তাহলে আঙ্গিনা (উঠান) উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে হবে।

কেননা অঙ্গন ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তা দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, দু'জন লোক যদি একটি জমি দাবী করে। অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকে দাবী করে যে, জমিটি তার দখলে রয়েছে, তাহলে জমিটি তাদের একজনের দখলে রয়েছে বলে ফায়সালা দেয়া হবে না; যতক্ষণ না তারা বাইয়েনাহ পেশ করে যে, জমিটি তাদের উভয়ের কবজায় রয়েছে।

কেননা জমি যেহেতু কাযীর আদালতে হাজির করা সম্ভব নয় সেহেতু জমিতে কবজা অবলোকনযোগ্য নয়। আর যটা কাযীর জানার বাইরে থাকে সেটা বাইয়েনাহ দ্বারা প্রমাণ করতে হয়।

আর যদি দুজনের একজন বাইয়েনাহ পেশ করে তাহলে প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার কারণে জমি তার দখলে দেয়া হবে।

কেননা কবজা একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ হক।

আর যদি উভয়ে বাইয়েনাহ পেশ করে তাহলে জমিটি উভয়ের অধিকারে প্রদান করা হবে।

কেননা আমরা বর্ণনা করেছি যে, প্রমাণ উস্থাপিত হয়েছে।

সুতরাং দলীল ও প্রমাণ ছাড়া দুজনের কোন একজনকে অধিকার প্রদান করা হবে না।

আর তাদের একজন যদি জমিনে ইট তৈয়ার করে কিংবা দেয়াল তোলে কিংবা তাতে খনন করে তাহলে ঐ ভূমি তার কবজায় রয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে।

কেননা তার পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব ও ব্যবহার রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ বংশ প্রসঙ্গে দাবী

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন দাসী বিক্রি করে আর সে সন্তান প্রসব করে এবং বিক্রেতা তার পিতৃত্ব দাবী করে, এমতাবস্থায় যদি বিক্রির দিন থেকে ছয় মাসের কম সময়ে প্রসব হয়ে থাকে তাহলে সে বিক্রেতার পুত্র হবে। এবং তার মাতা বিক্রেতার উম্মে ওয়ালাদ (সন্তান-মাতা) সাব্যস্ত হবে।

আর কিয়াস মতে তার ঔরস দাবী বাতিল। আর এটা ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বক্তব্য। কেননা বিক্রয় করার অর্থ হচ্ছে তার পক্ষ হতে এই মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করা যে, গর্ভস্থ বাচ্চাটি গোলাম। সুতরাং ঔরস দাবী করার ক্ষেত্রে সে স্ববিরোধী হবে। আর দাবীর উপস্থিতি ছাড়া নসব বা বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হয় না।

আর সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, তার মালিকানায় গর্ভ সঞ্চার হওয়া গর্ভটি তার ঔরস থেকে হওয়ার প্রকাশিত প্রমাণ। কারণ যিনা না হওয়াই হলো প্রকাশিত অবস্থা।

আর বংশ পরিচয়ের ভিত্তিই হলো গোপন অবস্থার উপর। সুতরাং সে ক্ষেত্রে স্ববিরোধ উপেক্ষা করা হবে। আর বিক্রেতার ঔরস দাবী যখন সিদ্ধ হলো তখন

সেটাকে গর্ভ সঞ্চারের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। ফলে প্রকাশ পেয়ে গেলো যে, সে তার উম্মেওয়ালাদকে বিক্রি করেছে। সুতরাং বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা জায়িয নেই। আর (পরিশোধকৃত) মূল্য ফেরত দেবে। কেননা তা সে না-হক কবজা করেছে।

আর বিক্রেতার দাবীর সঙ্গে বা পরে ক্রেতাও যদি বাচ্চার পিতৃত্ব দাবী করে তাহলে বিক্রেতার দাবী অগ্রাধিকারযোগ্য হবে। কেননা তার দাবী অগ্রবর্তী।

কারণ তার দাবীর সম্পৃক্তি হচ্ছে গর্ভ সঞ্চারের সময়ের সাথে আর এটা হচ্ছে উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার দাবী।

আর যদি বিক্রয়ের সময় থেকে দুই বছরের বেশী সময় পরে সন্তান প্রসব করে তাহলে বিক্রেতার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা সুনিশ্চিতভাবেই গর্ভ সঞ্চার তার মালিকানায় সম্পন্ন হয়নি। আর সেটাই হলো বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ।

তবে যদি ক্রেতা তাকে সত্যায়ন করে তাহলে বিক্রেতার পক্ষ থেকে নসব সাব্যস্ত হবে।

এবং বিবাহের মাধ্যমে গর্ভ সঞ্চার হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা হবে। আর বিক্রয় বাতিল হবে না। কেননা আমরা নিশ্চি হয়েছি যে, তার মালিকানায় গর্ভ সঞ্চার হয়নি। সুতরাং সন্তানের ক্ষেত্রে প্রকৃত স্বাধীনতা এবং তার মায়ের ক্ষেত্রে ভাবিষতে স্বাধীনতার অধিকার সাব্যস্ত হয়নি। এটাকে বলে মুক্তিদানের দাবী— دعوة تحرير

আর যে মালিক নয়, সে মুক্তিদানের অধিকারী নয়।

আর যদি বিক্রয়ের সময় থেকে ছয় মাসের বেশী সময়ে এবং দুই বছরের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে তাহলে ক্রেতার সত্যায়ন ছাড়া বাচ্চার পিতৃত্ব বিষয়ে বিক্রেতার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা গর্ভ সঞ্চার তার মালিকানায় না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং প্রমাণ বিদ্যমান না হওয়ায় ক্রেতার পক্ষ হতে সত্যায়ন অপরিহার্য। ক্রেতা যদি সত্যায়ন করে তাহলে নসব সাব্যস্ত হবে এবং বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। আর সন্তান স্বাধীন হবে ও তার মা বিক্রেতার উম্মে ওয়ালাদ (সন্তান-মাতা) হবে, যেমন প্রথম মাসআলায় হয়েছিল।

কারণ ক্রেতা বিক্রেতার পরস্পর সত্যায়ন রয়েছে এবং বিক্রেতার মালিকানায় গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা আছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বাচ্চাটি যদি মারা যায় এবং বিক্রেতা তার পিতৃত্ব দাবী করে, আর অবস্থা এই যে, দাসী তার সন্তানটিকে ছয় মাসের কম সময়ে প্রসব করেছে, তাহলে 'মাতার' ক্ষেত্রে উম্মে ওয়ালাদ হওয়া সাব্যস্ত হবে না।

কেননা এ ক্ষেত্রে মাতা সন্তানের অনুবর্তিনী। আর প্রয়োজন না থাকায় মৃত্যুর পর সন্তানের নসব সাব্যস্ত হয় না।

সুতরাং নসবের অনুবর্তী রূপে মাতার উম্মে ওয়ালাদ হওয়াও সাব্যস্ত হবে না।

আর যদি 'মা' এর মৃত্যু হয় এবং বিক্রেতা বাচ্চার পিতৃত্ব দাবী করে, আর অবস্থা এই যে, দাসী তার সন্তানকে ছয় মাসের কম সময়ে প্রসব করেছে, তাহলে সন্তানের ক্ষেত্রে নসব সাব্যস্ত হবে এবং বিক্রেতা তাকে নিয়ে নিবে।

কেননা নসবের সন্তান হলো মুল (এবং মা হলো অনুবর্তী)। সুতরাং 'অনুবর্তী' এর অবিদ্যমানতা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

সন্তান মূল হওয়ার কারণ এই যে, এ ক্ষেত্রে মাকে সন্তানের দিকে সম্পৃক্ত করে ام الولد (বা সন্তানের মা) বলা হয়। এবং সন্তানের সূত্রেই মা স্বাধীনতা লাভ করে থাকে। এর দলীল হল নবী (সা)-এর বাণী : اعتقها ولدها। (তার সন্তান তাকে আজাদ করে দিয়েছে)। আর 'মা'-এর জন্য স্বাধীনতার অধিকার সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে সন্তানের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয়। আর নিম্নতর অবস্থা (স্বভাবত:ই) উচ্চতর অবস্থার অনুবর্তী হয়ে থাকে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতা (পরিশোধকৃত) সমগ্র মূল্য ফেরত প্রদান করবে। পক্ষান্তরে সাহেবায়ন বলেন, সন্তানের অংশ ফেরত দেবে, 'মা'-এর অংশ ফেরত দেবে না।

কেননা এটা প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, সে তার উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করেছে। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রয় চুক্তি এবং গসবের ক্ষেত্রে উম্মে ওয়ালাদের সম্পদগুণ অর্থমূল্য সম্পন্ন নয়। সুতরাং ক্রেতা তার (ক্ষতিপূরণের) দায় বহন করবে না।

আর সাহেবায়নের মতে উম্মে ওয়ালাদের সম্পদগুণ অর্থ মূল্য সম্পন্ন। সুতরাং ক্রেতা তার ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, 'জামে ছাগীর' কিতাবে রয়েছে যে, দাসী যদি কোন পুরুষের মালিকানায় থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হয় আর সে তাকে বিক্রি করে ফেলে অত:পর ক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় সে সন্তান প্রসব করে আর বিক্রেতা সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে আর অবস্থা এই যে, ক্রেতা দাসী মাতাকে মুক্ত করে দিয়েছে, তাহলে বাচ্চাটি বিক্রেতার সন্তান হবে এবং বিক্রেতা সে তাকে বাচ্চার মূল্যাংশ ফেরত দেবে।

আর যদি ক্রেতা বাচ্চাকে মুক্ত করে তাহলে (ক্রেতার সত্যায়ন ছাড়া) বিক্রেতার পিতৃত্ব দাবী বাতিল হবে।

দুই সূরতের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, (দাসী গর্ভের) ঔরস দাবীর ক্ষেত্রে সন্তান হলো মূল এবং মা হলো তার অনুবর্তী, যেমন একটু পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আর প্রথম সূরতে দাসী গর্ভের ঔরস দাবীর পথে প্রতিবন্ধক তথা মুক্তি সাব্যস্ত হয়েছে অনুবর্তী তথা মা-এর মাঝে। সুতরাং মূলের ক্ষেত্রে তথা সন্তানের ক্ষেত্রে ঔরস দাবীর সাব্যস্তি বাধাগ্রস্ত হবে না। আর মায়ের ক্ষেত্রে ঔরস দাবীর সাব্যস্তি সন্তানের ক্ষেত্রে নসব (বংশ পরিচয়) ও মুক্তি সাব্যস্ত হওয়ার অনিবার্য প্রয়োজন নয়; যেমন ধোকাগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তানের ক্ষেত্রে বাচ্চা তো (বংশ পরিচয়ের অধিকারী হয়ে) স্বাধীন হবে; অথচ মা তার মনিবের দাসী থেকে যাবে। তদ্রূপ যেমন বিবাহের মাধ্যমে সন্তান প্রসবকারিণী দাসীর ক্ষেত্রে।

আর দ্বিতীয় সূরতে মূলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সন্তানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে এবং অনুবর্তীর ক্ষেত্রে ঔরস দাবীর সাব্যস্তি বাধাগ্রস্ত হবে।

আর ক্রেতা কর্তৃক মুক্তিদান প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণ এই যে, মুক্তিদান (পরবর্তীতে) 'নাকচতা'র সম্ভাবনা রাখে না, যেমন (সন্তানের ক্ষেত্রে) বংশ পরিচয়ের অধিকার এবং (দাসী মাতার ক্ষেত্রে) সন্তানের মাতৃত্বের অধিকার নাচকতা গ্রহণ করে না। সুতরাং এই অধিকারদ্বয় ও মুক্তিদান উভয়টি এদিক থেকে সমান হয়ে গেলো। আর ক্রেতার পক্ষ থেকে প্রকৃত মুক্তিদান সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে দাসী মাতার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হচ্ছে মুক্তি লাভের অধিকার এবং সন্তানের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হচ্ছে বিক্রেতার অনুকূলে পিতৃত্ব দাবীর অধিকার। আর হক বা অধিকার হাকীকত বা প্রকৃত বিষয়ে মোকাবেলা করতে পারে না।

আর বিধানগত ক্ষেত্রে মুদাব্বার ঘোষণা করা মুক্তিদানের সমতুল্য। কেননা এটা নাকচতার সম্ভাবনা রাখে না। কারণ তার সত্তার সঙ্গে স্বাধীনতার আলামত সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

আর প্রথম সূরতে সাহেবায়নের মতে বিক্রেতা ক্রেতাকে বাচ্চার মূল্যাংশ ফেরত দেবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সমগ্র মূল্য ফেরত দেবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। যেমন দাসী মাতার মৃত্যুর সূরতে আমরা উল্লেখ করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি তার মালিকানায় জন্ম লাভকারী গোলাম বিক্রি করে অত:পর ক্রেতা তাকে অন্য একজনের কাছে বিক্রি করে, অত:পর প্রথম বিক্রেতা তাকে নিজের সন্তান বলে দাবী করে, তাহলে সে তার সন্তান হবে এবং বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা বিক্রয় নাকচতা গ্রহণ করে; কিন্তু সন্তানের ক্ষেত্রে (বিক্রেতার অনুকূলে) যে ঔরস দাবীর অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে, তা নাকচতা গ্রহণ করে না। সুতরাং সেটার জন্য বিক্রয় নাকচ হয়ে যাবে।

তদ্রূপ একই বিধান হবে যদি ক্রেতা ঐ বাচ্চার সাথে কিতাবাত চুক্তি করে কিংবা তাকে বন্ধক রাখে কিংবা তাকে শ্রমে নিয়োগ করে। কিংবা ঐ বাচ্চার দাসী মাতার

সাথে কিতাবাত চুক্তি করে কিংবা তাকে বন্ধক রাখে কিংবা তাকে বিবাহ দান করে এবং এরপর বিক্রেতার পক্ষ থেকে ঔরস দাবী উত্থাপিত হয়।

কেননা এ সকল উদ্ভূত বিষয়গুলো নাকচতা গ্রহণ করে; তাই এগুলো নাকচ হয়ে যাবে এবং বিক্রেতার পক্ষ থেকে উত্থাপিত দাবী বৈধ হবে।

পক্ষান্তরে পিছনে আলোচিত মুক্তিদান ও মোদাব্বার ঘোষণার বিষয়টি ভিন্ন এবং প্রথমে ক্রেতার দাবী উত্থাপন, অত:পর বিক্রেতার দাবী উত্থাপনের বিষয়টিও ভিন্ন। সেক্ষেত্রে বিক্রেতার পক্ষ থেকে নকচও সাব্যস্ত হবে না। কেননা ক্রেতার পক্ষ থেকে সাব্যস্ত বংশ পরিচয় নাকচতার সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং এটা তার মুক্তি দানের মত হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি দুই যমজ সন্তানের একটির নসব দাবী করে তাহলে তার পক্ষ থেকে উভয়ের নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

কেননা উভয়ে অভিন্ন বীর্য থেকে উৎপন্ন। সুতরাং দু'জনের মধ্য থেকে একজনের নসব সাব্যস্ত হওয়ার অনিবার্য দাবী হলো অন্য জনেরও নসব সাব্যস্ত হওয়া।

এর কারণ এই যে, যমজ অর্থ এমন দুটি সন্তান, যাদের জন্মের মাঝে ছয় মাসের কম ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয়টির গর্ভ সঞ্চারকে পরবর্তীতে উদ্ভূত বলে কল্পনা করা সম্ভব নয়। কেননা ছয় মাসের কম সময়ে কোন 'গর্ভকাল' নেই।

আর 'জামে ছগীর' কিতাবে রয়েছে; যদি কারো কাছে দুটি যমজ গোলাম থাকে যারা তার কাছে জন্ম লাভ করেছে। এরপর সে দুটি বিক্রি করে দিলো আর ক্রেতা তাকে আযাদ করে দিল, অত:পর বিক্রেতার দখলে বিদ্যমান গোলামের পিতৃত্ব দাবী করল তাহলে উভয়ে তার সন্তান হবে। এবং ক্রেতার আযাদ করা বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা গর্ভসঞ্চার ও পিতৃত্ব দাবী দুটোই মালিকানার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে যখন তার দখলে বিদ্যমান গোলামের নসব ও বংশ পরিচয়ে সাব্যস্ত হয়ে গেলো— কারণ মাসআলাটির রূপরেখা এরূপই নির্ধারণ করা হয়েছে; সুতরাং তা দ্বারা মূল গোলামটির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এর ফলে অপর গোলামটির ক্ষেত্রেও নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর অপর গোলামটির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সাব্যস্ত হওয়া অনিবার্য। কেননা উভয়ে যমজ। সুতরাং প্রকাশ পেয়ে গেলো যে, ক্রেতার আযাদ করা এবং ক্রয় জন্মগত স্বাধীন ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং তা বাতিল হবে।

পক্ষান্তরে বাচ্চা একটি হলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা সেক্ষেত্রে বিক্রেতার ঔরস দাবী অধিকারকে উদ্দেশ্য করেই আযাদ করা বাতিল হচ্ছে। আর এখানে ক্রয়কৃত গোলামের ক্ষেত্রে ক্রেতার মুক্তিদান বাতিল হয়েছে, উক্ত গোলামের স্বাধীনতার তথা মূল গোলামের স্বাধীনতার অনুবর্তী হওয়ার কারণে। সুতরাং মাসআলা দুটি পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

মূল গর্ভসঞ্চার যদি বিক্রেতার মালিকানায় না হয় তাহলে তার হাতে বিদ্যমান গোলামের নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বিক্রীত গোলামের ক্ষেত্রে বিক্রি নাকচ হবে না।

কারণ যুক্ত হওয়ার সমার্থক অবস্থা যেহেতু বিদ্যমান নেই সেহেতু এই দাবীটি বিক্রীত গোলামের ক্ষেত্রে মুক্তিদানের দাবী বলে গণ্য হবে। সুতরাং এই দাবী বিক্রেতার কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কারো দখলে যদি কোন শিশু থাকে আর সে বলে যে, এ হলো আমার অমুক অনুপস্থিত গোলামের সন্তান, এরপর বলে যে, সে আমার সন্তান, তাহলে সে কখনও তার সন্তান বলে গণ্য হবে না; এমনকি গোলাম তাকে তার সন্তান বলে অস্বীকার করলেও না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, গোলাম যদি অস্বীকার করে তাহলে সে মনিবের সন্তান হবে।

একই মতপার্থক্য হবে যদি বলে যে, সে অমুকের সন্তান তার 'শয্যায়' সে জন্ম লাভ করেছে। এরপর সে তাকে নিজের সন্তান বলে দাবী করে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, স্বীকারোক্তি গোলামের রদ করা দ্বারা রদ হয়ে যাবে। সুতরাং এমন হয়ে গেল যেন স্বীকারোক্তি ছিলই না। আর নসব সম্পর্কে স্বীকারোক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে রদ করলে রদ হয়ে যায়, যদিও নসব নাকচ করার সম্ভাবনা রাখে না। দেখুননা তাতে বল প্রয়োগ এবং পরিহাসও কার্যকর হয় বলে তাদ্বারা নসব সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যেন ক্রেতা বিক্রেতার নামে বিক্রীত গোলাম আযাদ করার স্বীকারোক্তি করল আর বিক্রেতা স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করলো। অত:পর ক্রেতা বললো আমি তাকে আযাদ করেছি। আযাতকৃত গোলামের 'ওয়ালা' ক্রেতার অভিমুখী হবে।

আর গোলাম যদি মনিবের স্বীকারোক্তিকে সত্যায়ন করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা সত্যায়নের পর সে অন্যের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত নসবকেও নিজের জন্য দাবী করছে।

তদ্রূপ গোলাম যদি সত্যায়ন বা অসত্যায়ন কিছুই না করে তাহলেও বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে তার পক্ষ হতে সত্যায়নের সম্ভাবনার ভিত্তিতে তার হক ও অধিকার ঐ সন্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং বিষয়টি লি'আনকৃত সন্তানের মত হল। অ-লি'আনকারীর পক্ষ থেকে তার নসব সাব্যস্ত হবে না। কেননা লি'আনকারীর নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অবকাশ রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, নসব এমন বিষয়, যা সাব্যস্ত হওয়ার পর নাকচ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। আর এ জাতীয় বিষয়ের স্বীকারোক্তি রদ করলেও

রদ হয় না। সুতরাং স্বীকারোক্তি রয়ে গেলো। ফলে তার দাবী উত্থাপন গ্রহণযোগ্য হবে না। **যেমন কেউ কোন লোকের বিপক্ষে কোন ছোট সন্তানের নসব সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করল আর কোন তোহমতের কারণে তার সাক্ষ্য রদ করা হলো। এরপর সাক্ষী তার নিজের জন্যই শিশু নসব দাবী করল।**

এটা এজন্য যে, স্বীকারোক্তির কারণে যার নামে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে তার সত্যায়নের সম্ভাবনা হেতু তার হক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এমনকি স্বীকারোক্তিকারীকে মিথ্যায়নের পর যদি তাকে সত্যায়ন করে তাহলেও তার পক্ষ থেকে নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তদ্রূপ ঐ স্বীকারোক্তির কারণে শিশুর হকও সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং যার নামে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, তার রদ করার দ্বারা রদ হবে না।

আর 'ওয়ালা'-এর মাসআলাটিও একই রকম মতবিরোধপূর্ণ। আর যদি মতৈক্য স্বীকার করে নেয়া হয় তাহলে আমাদের বক্তব্য এই যে, কখনো কখনো অধিকতর শক্তিশালী বিষয় উদ্ভূত হলে ওয়ালা বাতিল হয়ে যায়। যেমন ওয়ালাকে মায়ের দিক থেকে বাবার কওমের দিকে টেনে নেওয়া। আর এখানে মওকুফ ওয়ালা-এর ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী বিষয় উদ্ভূত হয়েছে। আর তাহলো ক্রেতার দাবী। সুতরাং তা দ্বারা ওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে। নসবের বিষয়টি ভিন্ন। যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মূলনীতি অনুসারে ঐ ব্যক্তির কৌশল হতে পারে, যে শিশুটাকে বিক্রি করছে। কিন্তু বিক্রির পর সে বাচ্চাটির ব্যাপারে কারো পক্ষ হতে ঔরস দাবীর আশংকা করছে; তাই সে অন্যের নামে নসবের স্বীকারোক্তি করার মাধ্যমে ঔরস দাবীর সুযোগ বন্ধ করে দিতে চায়।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, শিশু যদি একজন মুসলমান এবং একজন নাসরানীর হাতে থাকে আর নাসরানী বলে যে, এটি আমার পুত্র আর মুসলমান বলে যে, এটি আমার গোলাম; তাহলে শিশু নাসরানীর পুত্র বলে গণ্য হবে এবং স্বাধীন হবে।

কেননা ইসলাম হলো অগ্রাধিকার প্রদানকারী। আর অগ্রাধিকার প্রদান 'সমবিরোধ'-এর উপস্থিতি দাবী করে। অথচ এখানে 'সমবিরোধ' নেই। কেননা এ সিদ্ধান্তের মাঝেই শিশুর কল্যাণ নিহীত। কারণ এতে সে তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা লাভ করছে। আর পরিনামে ইসলামের সৌভাগ্য লাভ করবে। কারণ আল্লাহ্‌র একত্বের প্রমাণাদি সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে এর বিপরীত সিদ্ধান্তে শিশুর মুসলিমত্বের বিধান হবে অনুগামী রূপে এবং স্বাধীনতা থেকে হবে বঞ্চিত। কেননা তার স্বাধীনতা অর্জনের সামর্থ্য নেই।

আর যদি উভয়ের দাবী পিতৃত্বের দাবী হয়, তাহলে মুসলমান অগ্রাধিকার লাভ করবে।

এটা হবে ইসলামকে অগ্রাধিকার প্রদানের ভিত্তিতে আর এটা হলো দুই কল্যাণের মাঝে অধিকতর কল্যাণ।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কোন স্ত্রীলোক যদি কোন শিশু সম্পর্কে দাবী করে যে, এটা তার সন্তান তাহলে তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না কোন স্ত্রীলোক তার সন্তান প্রসবের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে।

মাসআলার অর্থ এই যে, স্ত্রীলোকটি স্বামীওয়ালী হয়। কেননা স্ত্রীলোকটি অন্যের উপর নসবের দায় আরোপ করছে। সুতরাং প্রমাণ ছাড়া তাকে সত্যায়ন করা হবে না।

পুরুষের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে নিজেই নসবের দায় বহন করছে।

অত:পর এক্ষেত্রে ধাত্রীর সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে। কেননা এখানে প্রয়োজন হলো শুধু সন্তান নির্ধারণ। আর নসব তো সাব্যস্ত হয়ে যাবে বিদ্যমান শয্যা দ্বারা।

আর বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) প্রসবের ক্ষেত্রে ধাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

আর যদি সন্তানের নসব দাবীকারিণী ইদ্দতরত থাকে তাহলে পূর্ণ প্রমাণ অপরিহার্য।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। তালাক পর্বে তা পর্যালোচিত হয়েছে।

আর যদি স্ত্রীলোকটি স্বামীওয়ালা বা ইদ্দত ওয়ালী না হয়, সে ক্ষেত্রে মাশায়েখগণ বলেছেন,তার কথায় তার পক্ষ হতে নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা এতে তার নিজেরই উপর দায় আরোপ করা হচ্ছে, অন্য কারো উপর নয়।

আর যদি সে স্বামী ওয়ালী হয় এবঙ দাবী করে যে, এই সন্তানটি এই স্বামীর ঔরস থেকে তার সন্তান আর স্বামী তাকে সত্যায়ন করে তাহলে সে উভয়ের সন্তান হবে, যদিও কোন ধাত্রী সাক্ষ্য প্রদান না করে।

কেননা স্বামী তার নসবের দায় গ্রহণ করে নিয়েছে। আর এতে প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

আর যদি সন্তানটি উভয়ের হাতে থাকে এবং স্বামী দাবী করে যে, এটা তার অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান কিংবা স্ত্রী দাবী করে যে, এটা তার অন্য স্বামীর ঔরসজাত সন্তান তাহলে উভয়ে সন্তান বলেই গণ্য হবে।

কেননা উভয়ের দখল বিদ্যমান থাকার কারণে কিংবা উভয়ের মাঝে শয্যা বিদ্যমান থাকার কারণে প্রকাশিত অবস্থা এই যে,সন্তানটি উভয়ের পক্ষ থেকে। অত:পর উভয়ের প্রত্যেকে অপর পক্ষের হক বাতিল করতে চাচ্ছে; সুতরাং অপর জনের বিপক্ষে তাকে সত্য বলে গণ্য হবে না।

এর উদারণ হলো এমন বস্ত্র যা দু'জন লোকের হাতে রয়েছে। আর উভয়ের প্রত্যেকে বলছে যে, এটা আমার এবং অন্য একজন লোকের মাঝে শরীকানা কাপড়; সেক্ষেত্রে কাপড়টি এই দুই (দলখদার) লোকের মাঝে শরীকানা হবে। তবে যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে সে স্বীকারোক্তিকারীর অংশে শরীকদার হয়ে যাবে। কেননা পাত্রটি শরীকানা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে এখানে সে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা নসব শরীকানা গ্রহণ-করে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন দাসী ক্রয় করে আর সে ক্রেতার ঔরসে কোন সন্তান প্রসব করে তারপর কোন এক লোক দাসীর হকদার প্রমাণিত

হয় সেক্ষেত্রে বিবাদ উপস্থাপনের দিনে সন্তানের যে বাজার মূল্য, পিতা ক্ষতিপূরণ রূপে তা প্রদান করবে।

কেননা সে হলো ধোঁকাগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান। ধোঁকাগ্রস্ত ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে দাসী সত্তার মালিকানার ভিত্তিতে কিংবা বৈবাহিক মালিকানা ভিত্তিতে কোন স্ত্রী লোকের সঙ্গে সহবাস করে এবং স্ত্রীলোকটি তার ঔরসে সন্তান প্রসব করে অত:পর অন্য কোন হকদার প্রমাণিত হয়। আর সাহাবা কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে ধোঁকাগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান বাজার মূল্যের বিনিময়ে স্বাধীন হবে।

তাছাড়া এই কারণে যে, উভয় পক্ষের কল্যাণ বিবেচনা করা অপরিহার্য। সুতরাং উভয়ের কল্যাণ বিবেচনা করে পিতার ক্ষেত্রে বাচ্চাটিকে জন্মগত স্বাধীন বিবেচনা করা হবে। আর তার দাবীদারের ক্ষেত্রে গোলাম বিবেচনা করা হবে।

অত:পর বাচ্চাটি যেহেতু তার কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া তার দখলে এসেছে, সুতরাং সে শুধু তাকে রোধ করে রাখার কারণে ক্ষতিপূরণ দান করবে, যেমন গসবকৃত দাসীর সন্তানের ক্ষেত্রে। এজন্য বিবাদ উত্থাপনের দিনের বাজারমূল্য বিবেচ্য হবে; কেননা সেটাই হলো রোধকরণ সাব্যস্ত হওয়ার দিন।

আর যদি শিশুটি মারা যায় তাহলে রোধকরণ সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে পিতার উপর কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না।

তদ্রূপ যদি শিশু কোন সম্পদ রেখে মারা যায়। কেননা উত্তরাধিকার সম্পদ শিশুর বিনিময় বা স্থলবর্তী নয়; বরং সম্পদ তার পিতার হবে। কেননা পিতার ক্ষেত্রে সে জন্মগত স্বাধীন। সুতরাং পিতা তার ওয়ারিছ হবে।

আর যদি পিতা ঐ শিশুকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তাকে তার বাজারমূল্য ক্ষতিপূরণ রূপে প্রদান করতে হবে। যেহেতু রোধ করা পাওয়া গেছে। তদ্রূপ একই বিধান হবে যদি অন্য কেউ হত্যা করে আর পিতা তার দিয়াত গ্রহণ করে। কেননা শিশুর বিনিময় সংরক্ষিত হওয়া পিতার জন্য শিশুটি সংরক্ষিত থাকারই মত। এবং তার বিনিময় রোধ করা তাকে রোধ করার মত। সুতরাং পিতা ঐ শিশুর বাজার মূল্য ক্ষতিপূরণ রূপে প্রদান করবে। সে জীবিত থাকলে যেমন হতো।

আর ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছ থেকে শিশুটির বাজারমূল্য ফেরত নেবে।

কেননা বিক্রেতা তাকে বিক্রীত দ্রব্যের নিরাপত্তা ও দোষ মুক্ততার নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলো। যেমন বিক্রয় মূল্য ফেরত নেয়ার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে عقر (বা সহবাস পণ)-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা তার উপর লাযিম হয়েছে দাসীর সম্ভোগ উশুল করার বিনিময়ে। সুতরাং সেটা সে বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে না।

সঠিক বিষয় আল্লাহই উত্তম জানেন।

كِتَابُ الْإِقْرَارِ

অধ্যায় ঃ স্বীকারোক্তি

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্বাধীন, সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যখন অন্যের কোন হক (পাওনা বা অধিকার) স্বীকার করে তখন তার স্বীকারোক্তি তার জন্য লাযিম হয়ে যায়; যা স্বীকার করেছে তা অজ্ঞাত হোক কিংবা পরিজ্ঞাত।

জেনে রাখুন যে, স্বীকারোক্তি অর্থ কোন হক (পাওনা বা অধিকার) এর সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে পরিজ্ঞাত করা। আর স্বীকারোক্তি হল (স্বীকারকারীর উপর স্বীকারকৃত বিষয়) লাযিমকারী। কেননা স্বীকারোক্তি স্বীকারকৃত বিষয়ের বিদ্যমানতার প্রমাণ। দেখুন না, নবী (সা) কীভাবে হযরত মাইয (রা)-এর উপর যিনা সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তির কারণে রাজম লাযিম করে দিলেন এবং (গামিদিয়া নাম্নী) ঐ স্ত্রী লোকটির উপর তার স্বীকারোক্তির কারণে রাজম লাযিম করে দিলেন।

আর স্বীকারোক্তি হচ্ছে সীমিত (কার্যকর) প্রমাণ। কেননা অন্যের উপর স্বীকারোক্তিকারীর কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং তার স্বীকারোক্তির কার্যকারিতা তার উপরই সীমিত থাকবে।

আর স্বাধীনতার শর্ত আরোপের কারণ এই যে, যেন তার সর্বব্যাপী স্বীকারোক্তি সিদ্ধ হয়।

কেননা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে যদিও স্বাধীন ব্যক্তির অনুবর্তী, কিন্তু নিষেধাজ্ঞা সম্পন্ন গোলামের অর্থ সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি সিদ্ধ নয়। অবশ্য হদ্দ ও কিছাছ সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি সিদ্ধ। কেননা গোলামের স্বীকারোক্তি (বিধানকে) অবশ্য সাব্যস্তকারী রূপে স্বীকৃত হয়েছে এ কারণে যে, দায়ন (বা ঋণ) এর সম্পর্ক হচ্ছে তার রাকাবাহ্ (দাসসত্তার) এর সঙ্গে। আর সেটা হচ্ছে মনিবের মালিকানাধীন সম্পদ। সুতরাং মনিবের বিপক্ষে তার স্বীকারোক্তি সত্য বলে মানা যাবে না। অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে তো মনিবের পক্ষ থেকেই মনিবের সম্পদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে।

হদ্দ ও কিছাছের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা গোলাম এ ব্যাপারে তার মৌলিক (মানব) স্বাধীনতার উপর বহাল থাকে; একারণেই হদ্দ ও কিছাছ সম্পর্কে গোলামের বিপক্ষে মনিবের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাপ্ত বয়স্কতা ও সুস্থ মস্তিষ্কতা অপরিহার্য। কেননা দায় গ্রহণের যোগ্যতা না থাকার কারণে বালক ও পাগলের স্বীকারোক্তি (বিধান) লাযিম নয়। তবে যদি বালক (ব্যবসা সম্পর্কে) অনুমতিপ্রাপ্ত হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা অনুমতির সূত্রে সে প্রাপ্তবয়স্কের অনুবর্তী হয়ে পড়ে।

আর স্বীকারকৃত বিষয়ের অজ্ঞতা স্বীকারোক্তির বৈধতাকে বাধাগ্রস্ত করে না। কেননা অজ্ঞাত অবস্থায়ও হক তার উপর লাযিম হতে পারে। যেমন কারো এমন কোন জিনিস নষ্ট করে ফেললো, যার বাজার মূল্য জানা সম্ভব নয়; কিংবা এমন কোন জখম করলো যার দিয়ত বা ক্ষতিপূরণ জানা নেই; কিংবা তার যিম্মায় এমন কিছু হিসাব অবশিষ্ট থাকলো না, তার জ্ঞানগণ্ডীতে আসে না, আর স্বীকারোক্তি মানে তো 'হক'-এর সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে খবর প্রদান। সুতরাং অজ্ঞাত বিষয়ের স্বীকারোক্তি (তথা খবর প্রদান) বৈধ হবে। পক্ষান্তরে যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, তার সম্পর্কে অজ্ঞতার বিষয়টি ভিন্ন : কেননা অজ্ঞাত ব্যক্তি হকদার হওয়ার যোগ্য নয়।

আর স্বীকারোক্তিকারীকে বলা হবে যে, অজ্ঞাত বিষয়টি বর্ণনা কর।

কেননা অজ্ঞাত রাখা তার দিক থেকেই হয়েছে, সুতরাং বিষয়টি এমনই হলো যেন কোন ব্যক্তি তার দুই গোলামের একজনকে আযাদ করলো।

যদি সে বর্ণনা না করে তাহলে কাযী তাকে বর্ণনা করতে বাধ্য করবেন।

কেননা তার বৈধ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তার উপর যা লাযিম হয়েছে তা থেকে দায়মুক্ত হওয়া তার কর্তব্য। আর তা সম্ভব বর্ণনা করার মাধ্যমে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি বলে অমুক আমার কাছে একটা জিনিস পাবে, তাহলে তাকে এমন একটা কিছু বলতে হবে যার (যত কমই হোক) মূল্যমান রয়েছে।

কেননা সে তার যিম্মায় কিছু ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে খবর দিয়েছে আর যে জিনিসের মূল্যমান নেই তা যিম্মায় ওয়াজিব হয় না। সুতরাং যদি সে মানহীন কিছু বর্ণনা করে তাহলে সেটা স্বীকারোক্তি থেকে সরে আসা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সে যদি বয়ানকৃত পরিমাণের চেয়ে বেশী দাবী করে তাহলে কসমসহ স্বীকারোক্তিকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা অতিরিক্ত পরিমাণ সম্পর্কে সেই হলো অস্বীকারকারী।

তদ্রূপ (অর্থমূল্য সম্পন্ন কিছু বর্ণনা করতে হবে) যদি সে বলে যে, আমার উপর অমুকের হক রয়েছে। এর কারণ সেটাই, যা আমরা বর্ণনা করেছি।

তদ্রূপ যদি সে বলে যে, আমি তার কাছ থেকে কিছু গসব করেছি। (জবর দখলের ক্ষেত্রে) লোক প্রচলনের উপর ভিত্তি করে এমন কিছু বর্ণনা করতে হবে যা 'মাল'রূপে গণ্য, যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

আর যদি বলে যে, অমুক আমার কাছে 'মাল' পাবে তাহলে ঐ মালের বর্ণনার ক্ষেত্রে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

কেননা সে-ই হচ্ছে অস্পষ্টতা সৃষ্টিকারী।

আর অল্প ও বেশী পরিমাণের ক্ষেত্রে তার কথাই হবে গ্রহণযোগ্য। কারণ অল্প ও বেশী সবটাই মাল। কেননা মাল বলে এমন বস্তুকে, যা দ্বারা সম্পদশালী হওয়া যায়। তবে এক দিরহামের কম পরিমাণের ক্ষেত্রে তার কথা সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। কেননা লোক প্রচলনে সেটাকে মাল বলে গণ্য করা হয় না।

আর যদি বলে 'বিরাট মাল' তাহলে দু'শ দিরহামের কমে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে না।

কেননা সে ('বিরাটত্ব' দ্বারা) বিশেষণকৃত মাল স্বীকার করেছে। সুতরাং বিশেষণকে বাতিল করা জায়েয হবে না। আর নিছাব পরিমাণ মালই হলো বিরাট মাল। একারণেই ঐ পরিমাণ মালের অধিকারীকে ঐ মালের কারণে মালদার বিবেচনা করা হয়, আর মালদার ব্যক্তি সমাজে বিরাট বলে গণ্য হয়।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা মতে দশ দিরহামের কমের ক্ষেত্রে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে না। আর সেটা হলো চুরির অপরাধে হস্ত কর্তনের নিছাব। কারণ, এই হিসাবে সেটা বিরাট যে তার বিনিময়ে সম্মানযোগ্য হক কেটে ফেলা হয়।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে কুদূরীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তের অনুরূপ মতও বর্ণিত হয়েছে।

আর এই বিধান হলো ঐ ক্ষেত্রে যখন সে (বিরাট মালের সঙ্গে) দিরহাম উল্লেখ করে। আর যদি দীনার উল্লেখ করে সেক্ষেত্রে বিশ দীনার দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। আর উট উল্লেখ করার ক্ষেত্রে পাঁচশটি উট দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। কেননা এটা হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ যাতে ঐ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর জিনিস দ্বারা যাকাত ওয়াজিব হয়।

আর যাকাতের মাল ছাড়া অন্য কোন মাল উল্লেখ করার ক্ষেত্রে নিছাবের মূল্য দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

আর যদি বহুবচন শব্দ যোগে 'বিরাট মাল' বলে তাহলে যে শ্রেণীর মাল উল্লেখ করবে, সেই শ্রেণীর তিনটি নিছাব দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

এ সিদ্ধান্ত হলো বহুবচনের সর্ব নিম্ন পরিমাণের বিষয় বিবেচনা করে।

আর যদি বলে, প্রচুর দিরহাম তাহলে দশ দিরহামের কমে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, আর ছাহেবায়নের মতে দু'শ দিরহামের কমে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না।

কেননা নিছাবের অধিকারী ব্যক্তিই হলো প্রচুর মালের অধিকারী। তাই তো তার উপর অন্যের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন অবশ্য কর্তব্য হয়। এর চেয়ে কম পরিমাণ মালের বিষয়টি ভিন্ন। (অর্থাৎ তাকে প্রচুর মালের অধিকারী বলে গণ্য করা হয় না।)

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, (আরবী ব্যাকরণের দিক থেকে) দশ হলো বহুবচন বাচক শব্দের চূড়ান্ত সংখ্যা। তাই দশ দিরহামের ক্ষেত্রে বলা হয় عشرة دراهم পক্ষান্তরে এগার দিরহামের ক্ষেত্রে বলা হয় احد عشرة درهما। সুতরাং শব্দগত দিক থেকে সেটাই হবে বহুবচন শব্দের সর্বোচ্চ পরিমাণ। কাজেই তার বক্তব্যকে সেদিকেই প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

আর যদি (বিশেষণহীন) শুধু বহুবচনের শব্দ دراهم বলে তাহলে সর্বনিম্ন পরিমাণ হবে তিন দিরহাম।

কেননা এটাই হলো বিশুদ্ধ বহুবচনের সর্বনিম্ন পরিমাণ।

তবে যদি সে তিনের অধিক বর্ণনা করে তাহলে সেটা গ্রহণ করা হবে।

কেননা শব্দটি সেই পরিমাণের সম্ভাবনা রাখে। আর (দিরহামের পরিমাণ) সাধারণভাবে প্রচলিত ওজনের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

আর যদি বলে এত এত দিরহাম, তাহলে এগার দিরহামের কমে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না।

কেননা (আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিতে) সেটা এমন দু'টি অস্পষ্ট শব্দ উল্লেখ করেছে, যার মাঝে সংযোজক অব্যয় নেই, আর (এই অস্পষ্ট সংখ্যার) ব্যাখ্যাকারীর দিক থেকে সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এগার।

আর যদি বলে এত এবং এত তাহলে একুশ দিরহামের নীচে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না।

কেননা সে এমন দু'টি অস্পষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেছে, যার মাঝে সংযোজক অব্যয় রয়েছে। আর (এই অস্পষ্ট শব্দ দু'টির) ব্যাখ্যাকারীর দিক থেকে সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো একুশ। সুতরাং প্রতিটি বিষয়কে তার ব্যাখ্যাকারীর সমতুল্য সংখ্যার উপর প্রয়োগ করা হবে।

আর যদি বলে এত দিরহাম তাহলে এক দিরহাম হবে।

কেননা এটাই হলো এক্ষেত্রে অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা।

আর যদি সংযোজক অব্যয় ছাড়া তিনবার বলে 'এত এত এত' দিরহাম তাহলে এগার দিরহাম হবে। কেননা এছাড়া এর কোন সমতুল্য সংখ্যা নেই।

আর যদি সংযোজক অব্যয় যোগে তিনবার বলে 'এত এবং এত এবং এত' তাহলে একশ একুশ দিরহাম হবে।

আর যদি চারবার বলে (এত এবং এত এবং এত এবং এত) তাহলে তার উপর একহাজার বৃদ্ধি করা হবে। কেননা সেটাই হলো তার সমতুল্য সংখ্যা।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আর যদি বলে, আমার উপর (عَلَيَّ) কিংবা আমার দিকে (قبلى) তার পাওনা রয়েছে, তাহলে এর দ্বারা সে ঋণের স্বীকারোক্তি করলো।

কেননা على অব্যয়টি অবশ্য সাব্যস্তকারী শব্দ। আর قبلى শব্দটি যিমান বা দায়বহনের ইঙ্গিত প্রদান করে। যেমন কাফালাহ্ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আর যদি স্বীকারোক্তিকারী উক্ত বক্তব্যের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় বলে যে, সেটা আমানত, তাহলে তাকে সত্য বলে গ্রহণ হবে। কেননা শব্দটি রূপকভাবে এই অর্থের সম্ভাবনা রাখে।

কেননা আমানতের হিফাযত করা হলো দায়যুক্ত। আর মাল হচ্ছে হেফাযতের পাত্র, সুতরাং যুক্ত অবস্থায় তার কথা সত্য বলে গণ্য করা হবে, বিযুক্ত অবস্থায় নয়।

হিদয়া গ্রন্থাকার বলেন, 'মুখতাছারুল কুদূরী' কিতাবের কোন কোন অনুলিপিতে قبلى সম্পর্কে রয়েছে যে, এটা হলো আমানত সম্পর্কে স্বীকারোক্তি। কেননা শব্দটি (ঋণ ও আমানত) উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এজন্যই কেউ যদি বলে যে, অমুকের দিকে আমার কোন হক নেই, তাহলে এটা ঋণ ও আমানত উভয় থেকে দায়মুক্তকরণ গণ্য হবে।

আর ঋণ ও আমানতের মধ্য থেকে আমানত হলো নিম্নতর, তবে প্রথমোক্ত সত্যমতই হলো অধিকতর বিশুদ্ধ।

আর যদি বলে عندى (আমার কাছে) বা معى (আমার সঙ্গে) কিংবা আমার বাড়ীতে কিংবা আমার ব্যাগে কিংবা আমার সিন্দুকে তাহলে তা হবে তার কবজায় বিদ্যমান আমানত সম্পর্কে স্বীকারোক্তি।

কেননা এই সব কথার অর্থ হলো (অন্যের) কোন কিছু তার হাতে থাকার স্বীকারোক্তি। আর তার হাতে বিদ্যমান বস্তু দায়বদ্ধ বস্তু এবং আমানতের বস্তু এই দুই প্রকার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে নিম্নতরটিই সাব্যস্ত হবে।

আর যদি কোন লোক তাকে বলে, আমার অনুকূলে তোমার উপর এক হাযার রয়েছে, আর (জবাবে) সে বলে; তুমি তা ওজন করে নাও কিংবা তা নগদ গ্রহণ করে নাও কিংবা ঐ বিষয়ে আমাকে সময় দাও কিংবা আমি তো তা আদায় করে দিয়েছি, তাহলে এটা স্বীকারোক্তি হবে।

কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'তা' সর্বনামটি দ্বারা দাবীতে উল্লেখকৃত এক হাযারের দিকে ইঙ্গিত হবে। সুতরাং সে যেন বললো, ঐ এক হাযার তুমি ওজন করে নাও, যা তোমার অনুকূলে আমার উপর রয়েছে। এজন্যই যদি ইঙ্গিতের সর্বনাম উল্লেখ না করে (শুধু ওজন করে নাও বা পরখ করে নাও বলে) তাহলে স্বীকারোক্তি হবে না। কেননা বক্তব্যটি দাবীতে উল্লেখকৃত এক হাযারের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়নি।

আর মেয়াদ চাওয়া অবশ্য সাব্যস্ত হকের ক্ষেত্রেই হতে পারে। আর পরিশোধ করা ওয়াজিব হওয়ার পরেই হয়। আর আমরা যে কারণ বর্ণনা করলাম সে প্রেক্ষিতে দায়মুক্ত করণের দাবী পরিশোধের দাবীরই অনুরূপ। ছাদাকা ও হেবা করার দাবীও তদ্রূপ।

কেননা মালিক বানানো পূর্ববর্তী অবশ্য সাব্যস্তিকে দাবী করে। তদ্রূপ যদি বলে যে, ঐ বিষয়ে তো আমি তোমাকে অমুকের হাওয়ালা করে দিয়েছি। কেননা এ বক্তব্যের অর্থ হলো ঋণকে এক দায় থেকে অন্য দায়-এ স্থানান্তরিতকরণ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি মেয়াদী সন স্বীকার করে আর যার অনুকূলে স্বীকার করা হয়েছে, সে ঋণের বিষয়ে তাকে সত্য বলে মেনে নেয়; কিন্তু মেয়াদের বিষয়কে সে অস্বীকার করে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তার উপর ঋণ লাযিম হবে।

কেননা সে নিজের উপর (কিছু পরিমাণ) মাল স্বীকার করেছে। আর নিজের অনুকূলে ঐ মালের বিষয়ে একটি হক দাবী করেছে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন তার হাতে বিদ্যমান একটি গোলাম সম্পর্কে স্বীকার করল (যে, তা অমুকের মালিকানার গোলাম) এবং ভাড়া দেয়ার দাবী করল।

পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট দিরহাম সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো দিরহামের মাঝে বিদ্যমান গুণ। সুতরাং সেটাসহ স্বীকারোক্তি সাব্যস্ত হবে। এই মাসআলাটি কাফালাহ্ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, মেয়াদ অস্বীকার করার ব্যাপারে তাকে কসম করানো হবে।

কেননা সে তার বিপক্ষে দাবীকৃত একটি হক অস্বীকার করছে। আর অস্বীকারকারীর উপরই কসম বর্তায়।

আর যদি বলে যে, তার অনুকূলে আমার যিম্মায় একশ এবং এক দিরহাম রয়েছে তাহলে সবটাই তার উপর দিরহাম রূপে সাব্যস্ত হবে। আর যদি বলে একশ এবং একটি কাপড় তাহলে একটি কাপড় অবশ্য সাব্যস্ত হবে। আর 'একশ'-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তার দিকেই রুজু করা হবে।

প্রথমটির ক্ষেত্রে এটাই হল কিয়াস আর শাফেয়ী (র)ও এই মত পোষণ করেন।

কারণ একশ শব্দটি অস্পষ্ট আর দিরহাম শব্দটাকে সংযোজক অব্যয় وا, দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে, এটা তার ব্যাখ্যা নয়। সুতরাং একশ শব্দটি তার অস্পষ্টতার অবস্থার উপর বহাল রয়েছে। যেমন দ্বিতীয় ছূরতের ক্ষেত্রে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে— আর সেটাই উভয় ছূরতের মাঝে পার্থক্যের কারণ—আরবী ভাষীরা প্রত্যেক সংখ্যার সাথে দিরহাম-এর পুনরুক্তিকে কঠিন মনে করে উভয় সংখ্যার শেষে উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করেছে। আর এই কঠিন মনে করা হলো ঐ ক্ষেত্রে, যেখানে তার ব্যবহার অধিক হয় আর ব্যবহারের আধিক্য হবে অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার 'কারণ'-এর আধিক্যের অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার আধিক্যের ক্ষেত্রে। আর দিরহাম দ্বীনারের ক্ষেত্রে এবং পরিমাপ ও ওজনী জিনিসের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে 'বস্ত্র' পরিমাপ করা হয় না এবং ওজনও করা হয় না। তাই তার অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার পরিমাণও বেশী হয় না। সুতরাং সেটা প্রকৃত অর্থের উপরই বহাল থাকবে (ثوبان)।

তদ্রূপ (একই বিধান হবে) যদি একশ ও দুটি কাপড় বলে, কারণ সেটাই যা আমরা বর্ণনা করেছি। পক্ষান্তরে যদি বলে একশ ও তিনটি কাপড় (ثلثة اثواب) তাহলে বিধান ভিন্ন হবে। কেননা সে দু'টি অস্পষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেছে এবং সংখ্যা দুটির পর একটি ব্যাখ্যাকারী শব্দ উল্লেখ করেছে। কারণ শব্দটাকে সংযোজক অব্যয় দ্বারা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং শব্দটি উভয় সংখ্যার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। কেননা ব্যাখ্যার প্রয়োজনের দিক থেকে উভয়টি সমান। সুতরাং সমগ্র সংখ্যাই কাপড়ের হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি 'ডোলায় বিদ্যমান খেজুর'-এই ভাষায় স্বীকারোক্তি করে তাহলে খেজুর ও ডোলা দুটোই তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

মাবসূত কিতাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বলে যে, (লোকটি বললো) আমি থলিয়ায় বিদ্যমান খেজুর গসব করেছি।

এর দলীল এই যে, ডোলা হলো খেজুরের পাত্র, আর পাত্রস্থ অবস্থায় কোন জিনিসকে গছব করা পাত্রটিকে বাদ দিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না। সুতরাং দুটোই তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

তদ্রূপ নৌকায় বিদ্যমান খাদ্য এবং বস্তায় বিদ্যমান গম সম্পর্কে একই কথা। পক্ষান্তরে যদি বলে, ডোলা থেকে গছব করেছি তাহলে বিধান ভিন্ন হবে। কেননা শব্দটি স্থানচ্যুত করার অর্থ প্রকাশ করে সুতরাং এটা হবে পাত্রচ্যুত করা বস্তু গসব করা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি 'আস্তাবলে বিদ্যমান পশু' এই শব্দে স্বীকারোক্তি করে, তাহলে শুধু পশুটি অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে আস্তাবল দায়যোগ্য নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্যের কিয়াস হিসাবে স্বীকারোক্তিকারী উভয়ের দায়বহন করবে। গৃহে বিদ্যমান খাদ্য সামগ্রী এই ভাষায় স্বীকারোক্তির মাসআলাটির হুকুম উক্ত মাসআলার অনুরূপ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি অন্যের অনুকূলে আংটি সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে তাহলে রিং ও পাথর দু'টোই অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

কেননা আংটি শব্দটি উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

আর কেউ যদি কারো অনুকূলে তলোয়ার সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তরবারি, কোষ এবং তলোয়ারের 'দোঘালী' সবটাই সে পাবে।

কেননা তলোয়ার শব্দটি এ সবকটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর যদি মশারী সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে তাহলে বস্ত্র ও খুঁটি সবই তার হবে। কেননা লোক প্রচলনে শব্দটি সবকটির উপর প্রযুক্ত হয়।

আর যদি বলে, রুমালে বিদ্যমান বস্ত্র গসব করেছি তাহলে উভয়টি তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে। কেননা বস্ত্র যেহেতু রুমালে পেঁচিয়ে রাখা হয় সেহেতু রুমালটি বস্ত্রের 'পাত্র' রূপে গণ্য হবে।

তদ্রূপ (দুটি কাপড় অবশ্য সাব্যস্ত হবে) যদি বলে যে, আমার যিম্মায় রয়েছে একটি কাপড়ের মাঝে বিদ্যমান একটি কাপড়। (একই হুকুম হবে)।

কেননা উপরের কাপড়টি (ভিতরের কাপড়ের) পাত্র। পক্ষান্তরে درهم فى درهم (দিরহামে দিরহাম) বললে একটি দিরহামই তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে। কেননা, তা হল মুদ্রা, পাত্র নয়।

আর যদি বলে, দশটি কাপড়ের মধ্যে একটি কাপড়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে একটি কাপড়ই লাযিম হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে এগারটি কাপড় লাযিম হবে।

কেননা মূল্যবান কাপড় হলে কখনো কখনো দশ দশটি কাপড়েও তাকে পেঁচানো হয়। সুতরাং এগুলোকে পাত্র বিবেচনা করা সম্ভব।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, ও অব্যয়টি 'মাঝে' অর্থেও ব্যবহৃত হয় আল্লাহ্ বলেছেন, فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ অর্থাৎ আমার বান্দাদের মাঝে শামিল হয়ে যাও সুতরাং (فى অব্যয়টির অর্থ নির্ণয়ে) সন্দেহ হয়ে গেলো। অথচ যিম্মার দায়মুক্তি হলো মূল অবস্থা।

তাছাড়া প্রকৃতিগতভাবে প্রতিটি কাপড় পাত্র হয় না, বরং পাত্রস্থ বস্তু হয়। সুতরাং বস্ত্রগুলোকে পাত্র বিবেচনা করা সম্ভব নয়, তাই প্রথম অর্থটিই প্রয়োগ ক্ষেত্র রূপে নির্ধারিত হয়ে যাবে।

আর কেউ যদি অংকের গুণ হিসাবে বলে, অমুকের অনুকূলে আমার যিম্মায় পাঁচে পাঁচ রয়েছে, তাহলে তার উপর পাঁচ দিরহাম অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

কেননা গুণ বস্তুর পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটায় না। আর হাসান বিন যিয়াদ বলেন, তার উপর পঁচিশ দিরহাম অবশ্য সাব্যস্ত হবে। তালাক প্রসঙ্গে আমরা বিষয়টি আলোচনা করেছি।

আর যদি সে বলে যে, আমি পাঁচে পাঁচ বলে পাঁচের সাথে উদ্দেশ্য করেছি। তাহলে দশ দিরহামে অবশ্য সাব্যস্ত হবে। কেননা শব্দ এর সম্ভাবনা রাখে।

আর যদি বলে যে, অমুকের অনুকূলে আমার উপর এক দিরহাম থেকে দশ (দিরহাম) পর্যন্ত যিম্মায় রয়েছে; কিংবা যদি বলে, এক দিরহাম থেকে দশ পর্যন্ত মধ্যবর্তী দিরহাম অবশ্য সাব্যস্ত রয়েছে। তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে নয় দিরহাম লাযিম হবে। অর্থাৎ সূচনা সংখ্যাটি এবং তার পরবর্তী সংখ্যাগুলো লাযিম হবে। আর সমাপ্তি সংখ্যাটি রহিত হয়ে যাবে।

আর ছাহেবায়ন বলেন, সমগ্র দশ লাযিম হবে। অর্থাৎ উভয় প্রান্ত সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর ইমাম যুফার (র) বলেন, তার উপর আট দিরহাম লাযিম হবে। দুই প্রান্তসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর যদি বলে তার জন্য রয়েছে আমার বাড়ী থেকে ঐ পরিমাণ, যা এই দেয়াল থেকে ঐ দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ, তাহলে সে উভয় দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ পাবে। দুই দেয়ালের কিছুই পাবে না। তালাক প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলীলসমূহ আলোচিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ

ইমাম কুদূরী বলেন ঃ কেউ যদি বলে, অমুক স্ত্রী লোকের গর্ভস্থ সন্তানের অনুকূলে আমার উপর এক হাযার দিরহাম রয়েছে। এবং (সূত্র হিসাবে) যদি বলে যে, অমুক তার অনুকূলে অছিয়ত করেছে কিংবা তার পিতার মৃত্যুর কারণে সে তার ওয়ারিছ হয়েছে, তাহলে এই স্বীকারোক্তি সিদ্ধ হবে।

কেননা সে এমন একটি কারণ স্বীকার করেছে, যা গর্ভস্থ সন্তানের অনুকূলে মালিকানা সাব্যস্তির উপযোগী।

এরপর যদি সেই অমুক নারী গর্ভস্থ সন্তানকে এমন সময়সীমার মধ্যে জীবিত অবস্থায় প্রসব করে যাতে বোঝা যায় যে, স্বীকারোক্তির সময় বাচ্চাটি গর্ভে বিদ্যমান ছিলো, তাহলে (যা সে স্বীকার করেছে তা) তার উপর লাযিম হয়ে যাবে।

আর যদি সে মৃত সন্তান প্রসব করে তাহলে স্বীকারকৃত মাল ওছিয়তকারীর এবং মূরিছ-এর হবে আর তার ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টিত হবে।

কেননা এটা মূলতঃ ঐ দু'জনের অনুকূলে স্বীকারোক্তি। গর্ভস্থ সন্তানের দিকে সেটা স্থানান্তরিত হয় শুধু প্রসবের পর। আর (এখানে) তা স্থানান্তরিত হয়নি।

আর যদি দুটি জীবিত সন্তান প্রসব করে তাহলে মাল উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে।

আর যদি স্বীকারকারী (প্রাপ্তির সূত্র হিসাবে) বলে, গর্ভস্থ সন্তান আমার কাছে বিক্রি করেছে কিংবা আমাকে ঋণ স্বরূপ দান করেছে তাহলে তার উপর কোন কিছু লাযিম হবে না।

কেননা সে একটি অসম্ভব কারণ উল্লেখ করেছে।

আর যদি (কারণ উল্লেখ না করে) স্বীকারোক্তিকে অস্পষ্ট রাখে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তা সহী হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সহী হবে।

কেননা স্বীকারোক্তি হলো (শরীয়তী) প্রমাণ বিশেষ। সুতরাং সেটাকে কার্যকর করা আবশ্যক। আর তা সম্ভব হবে স্বীকারোক্তিকে যোগ্য করণের উপর প্রযুক্ত করলে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, (সূত্রহীন) সাধারণ স্বীকারোক্তি 'ব্যবসার হেতু' সম্পর্কে স্বীকারোক্তির দিকে অভিমুখী হয়। একারণেই অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের স্বীকারোক্তিকে এবং দুই সর্বসম অংশীদারের একজনের স্বীকারোক্তিকে ব্যবসায়ের হেতু সম্পর্কে স্বীকারোক্তির উপর প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং অস্পষ্ট স্বীকারোক্তিটি ব্যবসার হেতু সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা করার মত হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন ব্যক্তির অনুকূলে কোন দাসীর কিংবা কোন বকরীর গর্ভ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার স্বীকারোক্তি সহী হবে এবং তার উপর তা লাযিম হবে।

কেননা এই স্বীকারোক্তির একটি গ্রহণযোগ্য দিক রয়েছে। আর তাহলো স্বীকারোক্তিকারী ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে ঐ সম্পর্কে অছিয়ত করা। সুতরাং স্বীকারোক্তিকে তার উপরই প্রয়োগ করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি ইচ্ছাধিকারের শর্তসহ স্বীকারোক্তি করে তাহলে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা ইচ্ছাধিকার তো হলো রহিত করার জন্য আর খবর প্রদান রহিতকরণ এর সম্ভাবনা রাখে না।

আর অবশ্য সাব্যস্তকারী শব্দ বিদ্যমান থাকার কারণে মাল তার উপর লাযিম হয়ে যাবে। আর এই বাতিল শর্ত বা এই জাতীয় কিছু আরোপ করার কারণে ঐ শব্দটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে না।

পরিচ্ছেদ ঃ ব্যতিক্রম সম্পর্কে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি তার স্বীকারোক্তির সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ব্যতিক্রম করে তাহলে তার ব্যতিক্রম করা সিদ্ধ হবে এবং অবশিষ্ট তার উপর লাযিম হবে।

কেননা পূর্ববর্তী মোট সংখ্যার সঙ্গে ব্যতিক্রম সংযুক্তির অর্থ হলো অবশিষ্ট সংখ্যা।

তবে সংযুক্তি অপরিহার্য। আর কম পরিমাণ কিংবা বেশী পরিমাণকে ব্যতিক্রম করা সমান, তবে যদি সমগ্রকেই ব্যতিক্রম করে তাহলে (পুরো) স্বীকারোক্তি তার উপর লাযিম হয়ে যাবে এবং ব্যতিক্রম করা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ব্যতিক্রম করার মাধ্যমে সে যেন ব্যতিক্রম পরবর্তী লব্ধ সংখ্যাকে (মূলত:) উচ্চারণ করেছে। অথচ এখানে ব্যতিক্রম পরবর্তী কোন সংখ্যা নেই। সুতরাং এটি হবে প্রত্যাহার করা।

আর তালাক অধ্যায়ে এর কারণ আলোচিত হয়েছে।

আর যদি বলে, তার জন্য আমার যিম্মায় একটি দীনার ছাড়া বা এক ধামা গম ছাড়া একশ দিরহাম রয়েছে; তাহলে এক দীনার বা এক ধামা গমের মূল্য বাদ দিয়ে তার উপর একশ দিরহাম লাযিম হবে।

এটা হলো ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত।

আর যদি বলে যে, তার জন্য আমার যিম্মায় একটি বস্ত্র বাদে একশ দিরহাম রয়েছে তাহলে ব্যতিক্রম করা সিদ্ধ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম সিদ্ধ হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম সিদ্ধ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর দলীল এই যে, ব্যতিক্রম করা বলে এমন প্রক্রিয়াকে, যা না হলে ব্যতিক্রমকৃত অংশটি মূল শর্তের অন্তর্ভুক্ত থাকতো। আর বিপরীত শ্রেণীর দুই বস্তুর ক্ষেত্রে তা হওয়া সম্ভব নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল এই যে, ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমকৃত উভয়টি মূল্যমানের দিক থেকে অভিন্ন শ্রেণীর হয়েছে।

শায়খায়নের দলীল এই যে, প্রথমটির ক্ষেত্রে মুল্যমানের দিক থেকে (দিরহাম ও দীনারের মাঝে) অভিন্ন শ্রেণী হওয়া বিদ্যমান রয়েছে।

দীনারের ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে কয়লা ও ওজনী বস্তুসমূহ গুণগতভাবে মূল্যমান রূপে বিবেচিত। কিন্তু বস্ত্র (রূপগত বা গুণগত) কোন দিক থেকেই মূল্য হিসেবে গণ্য নয়। একারণেই সাধারণ বিনিময় চুক্তির ক্ষেত্রে (মূল্যমান রূপে) বস্ত্র ওয়াজিব হয় না। আর যা মুল্য রূপে বিবেচিত হবে তা দিরহামের পরিমাণ নির্ধারণকারী হওয়ার যোগ্য হবে। সুতরাং সেই পরিমাণ মূল্য হিসাবে সেটা দিরহাম থেকে ব্যতিক্রম হবে। আর যা মূল্য রূপে বিবেচিত হতে পারে না, সেটা দিরহামের পরিমাণ নির্ধারণকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং দিরহাম থেকে ব্যতিক্রমকৃত অংশ অজ্ঞাত থেকে যাবে। ফলে ব্যতিক্রম করা সিদ্ধ হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি (কারো অনুকূলে) কোন হক সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে এবং তার স্বীকারোক্তির সঙ্গে সংযুক্তরূপে 'ইনশাআল্লাহ্' বলে তাহলে স্বীকারোক্তি তার উপর লাযিম হবে না।

কেননা 'আল্লাহ্র ইচ্ছা'-এর সঙ্গে ব্যতিক্রম করার অর্থ হলো ব্যতিক্রম করাকে বাতিল করা কিংবা সম্পৃক্ত করা। যদি প্রথমটি হয় তাহলে সেটাও প্রকারান্তরে বাতিল করা হলো। কারণ স্বীকারোক্তি শর্ত সম্পৃক্ত সম্ভাবনা রাখেনা। কিংবা তা এমন শর্ত, যার সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন, আমরা তালাক প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

পক্ষান্তরে যদি বলে যে, যখন আমি মারা যাবো কিংবা যখন মাসের শুরু হবে কিংবা যখন লোকদের সিয়াম শেষ হবে তখন অমুক আমার কাছে একশ দিরহাম পাবে, এটার বিধান ভিন্ন হবে।

কেননা (লোক প্রচলনে) এটা হলো মেয়াদ বর্ণনার সমার্থক। সুতরাং এটা হলো মেয়াদীকরণ, শর্তকরণ নয়। তাই যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে সে যদি উল্লেখিত মেয়াদ অস্বীকার করে তাহলে (স্বীকারকৃত) মাল তার উপর তাৎক্ষণিক লাযিম হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন বাড়ী সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে আর তার ঘরগুলিকে নিজের অনুকূলে ব্যতিক্রম করে তাহলে বাড়ী ও গৃহাদি স্বীকারোক্তি যার জন্য করা হয়েছে, তার হবে।

কেননা এই স্বীকারোক্তির গৃহ গুণগত ভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; শব্দগতভাবে নয়। আর ব্যতিক্রম হচ্ছে উচ্চারিত শব্দের মাঝে পরিবর্তন।

আর আংটির ক্ষেত্রে 'নাগিশ' এবং খেজুর বাগানের ক্ষেত্রে একটি খেজুর গাছ, বাড়ীর ক্ষেত্রে গৃহের সমতুল্য। কেননা এগুলোও পূর্ববর্তী শব্দে অনুবর্তী রূপে অন্তর্ভুক্ত থাকে, শব্দগতভাবে নয়।

পক্ষান্তরে, যদি বাড়ীর তৃতীয়াংশ কিংবা বাড়ীর একটি ঘর ব্যতিক্রম করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা এগুলো শব্দগতভাবেই বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত।

আর যদি বলে, এই বাড়ীর গৃহাদি আমার আর আঙ্গিনা অমুকের, তাহলে সে যেমন বলেছে, তেমনই হবে।

কেননা আঙ্গিনা ভূমি খন্ডকেই বলে, গৃহাদিকে নয়। সুতরাং যেন সে এমন বললো যে, এই বাড়ীর 'সাদাভাগ' অমুকের, গৃহাদি নয়। পক্ষান্তরে যদি আঙ্গিনার পরিবর্তে যমিন বলে তাহলে গৃহাদিও যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে তার হবে। কেননা যমিন সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করার অর্থ হলো গৃহাদি সম্পর্কেও স্বীকারোক্তি করা, যেমন বাড়ী সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করার ক্ষেত্রে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি বলে যে, তার অনুকূলে আমার যিম্মায় এক হাযার দিরহাম রয়েছে ঐ গোলামের মূল্য বাবদ, যা আমি তার কাছ থেকে খরিদ করেছি, কিন্তু এখনো 'কবজা' করিনি। এ ক্ষেত্রে যদি সে নির্ধারিত কোন গোলামের কথা উল্লেখ করে তাহলে যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, তাকে বলা হবে— যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহলে গোলামকে অর্পণ করে এক হাযার গ্রহণ কর; অন্যথায় তোমার জন্য কিছুই নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এই মাসআলাটির কয়েকটি ছূরত হতে পারে। তন্মধ্যে একটি এই, যা মতনে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যার পক্ষে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে তাকে সত্যায়ন করল এবং গোলামটিকে অর্পণ করল। এক্ষেত্রে হুকুম তা-ই, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

কেননা উভয়ের পারস্পরিক সত্যায়ন দ্বারা যা সাব্যস্ত হবে, তা প্রত্যক্ষভাবে সাব্যস্ত হয়।

আর দ্বিতীয় ছূরত এই যে, যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সে স্বীকারোক্তি কারীকে বললো, এই গোলাম তোমার গোলাম, এটাকে আমি তোমার কাছে বিক্রি করিনি, বরং আমি অন্য গোলাম বিক্রি করেছি।

এক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি করার উপর মাল লাযিম হবে। কেননা সে গোলামটি তার জন্য নিষ্কন্টক হওয়া সাপেক্ষে মাল সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছে, আর গোলাম তো তার জন্য নিষ্কন্টক হয়েছে। সুতরাং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর 'কারণ'-এর ভিন্নতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না।

আর তৃতীয় ছুরত এই যে, যার পক্ষে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে সে বললো, এই গোলাম আমার, আমি তোমার কাছে তা বিক্রি করিনি। এই ছুরতের বিধান এই যে, স্বীকারোক্তিকারীর উপর কোন কিছু লাযিম হবে না। কেননা সে গোলামের বিনিময় রূপেই শুধু মালের স্বীকারোক্তি করেছে। কাজেই গোলাম ছাড়া মাল তার উপর লাযিম হতে পারে না।

আর যদি এই বক্তব্যের সঙ্গে একথাও বলে যে, আমি তোমার কাছে অন্য গোলাম বিক্রি করেছি, সেক্ষেত্রে উভয়কে কসম করানো হবে।

কেননা যে স্বীকারোক্তি করেছে, সে নির্দিষ্ট ঐ গোলামকে অর্পণ করার দাবী জানাচ্ছে। আর অপর জন তা অস্বীকার করছে। পক্ষান্তরে যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সে অন্য একটি গোলাম বিক্রির বিনিময়ে এক হাযার দিরহাম পাওনার দাবী করছে। আর অপরজন তা অস্বীকার করছে। সুতরাং (অস্বীকারকারী হিসাবে) উভয়ে যখন কসম করবে তখন মাল পাওনা বাতিল হয়ে যাবে।

এই বিধান হবে তখন, যখন যে স্বীকারোক্তি করেছে সে নির্ধারিত কোন গোলামের কথা বলে; পক্ষান্তরে যদি নির্ধারণ না করে বলে যে, 'একটি গোলামের বিক্রির মূল্যবাবদ'...তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার উপর এক হাযার লাযিম হয়ে যাবে, আর 'আমি কবজা করিনি' তার এই বক্তব্য গ্রহণকরা হবে না। এই বক্তব্য সে যুক্তরূপে দিক কিংবা বিযুক্তরূপে। কেননা এটা হলো স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা। কেননা عَلَيَّ (আমার যিম্মায়) শব্দের প্রেক্ষিতে (বলতে হবে যে,) সে মাল ওয়াজিব হওয়া স্বীকার করেছে। অথচ অনির্ধারিত গোলামের ক্ষেত্রে দখল গ্রহণ অস্বীকার করার মূল থেকেই (মূল্যবাবদ) কোন মাল সাব্যস্ত হওয়াকে নাকচ করে। কেননা বিক্রয় দ্রব্য সম্পর্কে অজ্ঞতা চুক্তির সমকালীন হোক কিংবা পরবর্তীতে উদ্ভূত হোক, যেমন একটি গোলাম খরিদ করার পর তদৃশ অন্যান্য গোলামের সাথে মিশে যাওয়ার কারণে গোলামটির পরিচয় ভুলে গেলো-এই অজ্ঞতা বিক্রয় দ্রব্য হালাক হওয়াকে অবশ্য সাব্যস্ত করে। সুতরাং মূল্য পরিশোধের ওয়াজিব হওয়াকে রহিতকারী হলো আর যখন এরূপ হল, তখন এটা স্বীকৃতি প্রত্যাহার হবে। তাই তা সংযুক্ত রূপে কথিত হলেও সিদ্ধ হবে না।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি সংযুক্ত করে বলে তাহলে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে এবং তার উপর কোন কিছু লাযিম হবে না। আর যদি বিযুক্ত করে বলে তাহলে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে না, যদি যার জন্য

স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সে ব্যক্তি (মূল বিষয়টি মেনে নিয়ে) কোন গোলামের মূল্য হওয়ার কথা অস্বীকার করে।

আর যদি যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সে ব্যক্তি বলে যে, সে তার কাছে একটি সামান বিক্রি করেছে। সেক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

এর কারণ এই যে, স্বীকারোক্তিকারী নিজের উপর মাল ওয়াজিব হওয়া স্বীকার করেছে এবং তার একটি কারণ উল্লেখ করেছে, আর তা হলো বিক্রয়। এক্ষেত্রে যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, দাবীদার যদি সূত্র সম্পর্কে তার সাথে একমত পোষণ করে, অথচ অবস্থা এই যে, কবজা ছাড়া শুধু 'কারণ'-এর অস্তিত্ব লাভ দ্বারা মূল্যের ওয়াজিব হওয়া জোরদার হয় না। আর স্বীকারোক্তিকারী বিক্রয় দ্রব্যের কবজার কথা অস্বীকার করছে, সুতরাং তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে সে, 'কারণ' সম্পর্কে তাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে তাহলে স্বীকারোক্তিকারীর পক্ষ হতে 'একটি গোলাম খরিদ করার মুল্যবাবদ'- এই কথাটি হবে দিক পরিবর্তনকারী ব্যাখ্যা। কেননা তার বক্তব্যের প্রথম ভাগ ছিলো সাধারণ তবে ওয়াজিব হওয়ার জন্য। আর তার বক্তব্যের শেষ ভাগ কবজা না করার দিক বিবেচনা করে ওয়াজিব নাকচ হওয়ার সম্ভাবনা ধারণ করে আর দিক পরিবর্তনকারী ব্যাখ্যা সংযুক্ত অবস্থায় সিদ্ধ হয়, বিযুক্ত অবস্থায় সিদ্ধ হয় না।

আর যদি বলে যে, আমি তার কাছ থেকে একটি জিনিস খরিদ করেছি, তবে তা কবজা করিনি; সে ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা কবজা বিক্রয়ের অনিবার্য ফল নয়। পক্ষান্তরে বিক্রয়মূল্য ওয়াজিব হওয়ার অনিবার্য দাবী হলো কবজা সম্পন্ন হওয়া।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তদ্রূপ (একই হুকুম হবে) যদি বলে যে, "মদ বা শূকরের বিক্রয় মূল্য বাবদ"।

মাসআলাটির অর্থ এই যে, যদি সে বলে, অমুকের অনুকুলে আমার যিম্মায় এক হাযার দিরহাম রয়েছে মদ বা শূকরের মূল্য বাবদ, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তার উপর এক হাযার লাযিম হবে। আর তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হবে না, সংযুক্ত ভাবে বলুক কিংবা বিযুক্তভাবে। কারণ মদ বা শূকরের বিক্রয় মূল্য যেহেতু ওয়াজিব হয় না। অথচ তার বক্তব্যের প্রথমাংশ ছিলো ওয়াজিব হওয়ার জন্য; সেহেতু এটা হবে পূর্ব স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার।

আর সাহেবায়ন বলেন, যদি সংযুক্তভাবে বলে তাহলে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা সে তার বক্তব্যের শেষাংশ দ্বারা বর্ণনা করে দিয়েছে যে, তার বক্তব্যের প্রথমাংশ দ্বারা ওয়াজিবকরণের ইচ্ছা করেনি। সুতরাং বিষয়টি বক্তব্যের শেষে ইনশাআল্লাহ্ বলার মত হলো।

আমাদের বক্তব্য এই যে, সেটা হলো অজ্ঞাত শর্তের সাথে সম্পৃক্তকরণ, আর এটা হলো বাতিলকরণ।

আর যদি সে বলে যে, তার অনুকূলে আমার যিম্মায় এক হাযার দিরহাম রয়েছে, কোন সামানের বিক্রয় মূল্য বাবদ, কিংবা বলল যে, তুমি আমাকে এক হাযার দিরহাম করয প্রদান করেছিলে, তারপর বললো যে, সেগুলো যুক্ত কিংবা 'বানাহ্রাজা' (অচল) আর যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে সে বললো যে, সেগুলো উত্তম, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তার উপর উত্তম দিরহাম লাযিম হবে।

আর সাহেবায়ন বলেন, সংযুক্তভাবে বললে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে আর যদি বিযুক্তভাবে বলে তাহলে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে না। একই মতপার্থক্য হবে যদি বলে যে, এগুলো 'অচল দিরহাম' কিংবা এগুলো সীসা।

একই মতপার্থক্য হবে যদি বলে, কিন্তু সেগুলো দোষযুক্ত। তদ্রূপ একই মতপার্থক্য হবে যদি বলে যে, অমুকের অনুকূলে আমার যিম্মায় এক হাযার দোষযুক্ত দিরহাম রয়েছে— কোন সামানের বিক্রয়মূল্য বাবদ।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, এটা হলো দিক পরিবর্তনকারী ব্যাখ্যা, শর্ত ও ব্যতিক্রম করার মত এক্ষেত্রেও সংযুক্তির সাপেক্ষে সিদ্ধ হবে।

এটা দিক পরিবর্তনকারী এজন্য যে, প্রকৃত অর্থের দিক থেকে দিরহাম শব্দটি দোষযুক্তকে এবং রূপক অর্থের দিক থেকে অচলকে বোঝাবার সম্ভাবনা রাখে। তবে নিঃশর্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে শব্দটি 'পূর্ণ সচল দিরহামেরই' অভিমুখী হবে। সুতরাং এদিক থেকে এটা পরিবর্তনকারী ব্যাখ্যা হলো। আর বিষয়টি এমন বলার মতই হলো যে, কিন্তু এ গুলো 'পঞ্চ ওযনী'[১]।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, এটা হলো স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার। কেননা সাধারণ বিক্রয় চুক্তি দোষমুক্ততার গুণ দাবী করে। অথচ দোষযুক্ত ও ত্রুটিযুক্ত একটি দোষ। আর দোষযুক্ততার দাবী করার অর্থ হলো চুক্তি দ্বারা যা অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে, তার আংশিক থেকে সরে আসা। সুতরাং বিষয়টা এমন বলার মত হলো যে, আমি তোমার কাছে তা দোষযুক্ত অবস্থায় বিক্রি করেছি। আর ক্রেতা বলে যে, তুমি আমার কাছে তা দোষ মুক্ত অবস্থায় বিক্রি করেছো। তখন ক্রেতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। আর অচল দিরহাম তো মূল্য মুদ্রা-এর শ্রেণীভুক্ত নয়। আর বিক্রয় কার্যকর হয় মূল্য মুদ্রার উপর। সুতরাং অচল দিরহামের দাবী করার অর্থ হলো স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা।

পক্ষান্তরে তার বক্তব্য- 'কিন্তু তা পঞ্চ ওযনী' এই ব্যতিক্রম এ জন্য সিদ্ধ হবে যে, এটা হলো পরিমাণ সংক্রান্ত বিষয়, সচলতা ও উৎকৃষ্টতার বিষয়টি তা থেকে ভিন্ন।

কেননা কোন বস্তুর গুণগত দিককে ঐ বস্তু থেকে ব্যতিক্রম করা বৈধ নয়। যেমন বাড়ীর ক্ষেত্রে গৃহাদিকে ব্যতিক্রম করা।

---

১. অর্থাৎ প্রতিটি দশ দিরহাম পাঁচ মিছকাল ওজন সম্পন্ন অথচ স্বীকারোক্তিকারীর শহরের প্রচলিত মুদ্রা হলো 'সাতওযনী'। এ ক্ষেত্রে সংযুক্ত অবস্থায় বললে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয়, আর বিযুক্ত অবস্থায় তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয় না।

পক্ষান্তরে যদি বলে যে, অমুকের জন্য আমার যিম্মায় একটি গোলামের মূল্য বাবদ এক 'কুর' গম রয়েছে, কিন্তু তা নিকৃষ্ট গম। এক্ষেত্রে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে। নিকৃষ্টতা গমের একটি প্রকার, গমের দোষ নয়। সুতরাং নিঃশর্ত বিক্রয়চুক্তি নিকৃষ্টতা থেকে মুক্ত থাকা দাবী করে না।

ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে প্রাপ্ত যাহেরী রেওয়ায়েত ছাড়া এক বর্ণনা মতে যদি সংযুক্ত অবস্থায় বলে তাহলে দোষযুক্তের ক্ষেত্রে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে। কেননা করয কবজাকৃত মুদ্রার সদৃশকে ফেরত প্রদান ওয়াজিব করে, আর তা কোন সময় দোষযুক্ত হতেও পারে। যেমন গসবের (মুদ্রার) ক্ষেত্রে।

আর যাহিরে রেওয়ায়েতের কারণ এই যে, সাধারণত: উৎকৃষ্ট দিরহাম দ্বারাই লেনদেন হয়। সুতরাং নিঃশর্ত স্বীকারোক্তি সে দিকেই অভিমুখী হবে।

আর যদি বলে যে, অমুকের অনুকূলে আমার যিম্মায় এক হাজার দোষযুক্ত দিরহাম রয়েছে, আর সে বিক্রয় বা করয-এর কথা উল্লেখ করলো না, তাহলে কারো কারো মতে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে।

কেননা দিরহাম শব্দটি দোষযুক্তকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আর কেউ কেউ বলেন, তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে না; কেননা সাধারণ স্বীকারোক্তি লেনদেন চুক্তির দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। কারণ সেটাই শরীয়ত সম্মত। হারাম উপায়ে ব্যবহার করার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় না।

আর যদি বলে যে, তার কাছ থেকে আমি এক হাযার গছব করেছি কিংবা বললো যে, সে তা আমার কাছে আমানত রেখেছে, তারপর বললো যে, সেগুলো দোষযুক্ত বা অচল, তাহলে সংযুক্ত করে বলুক বা বিযুক্ত করে, তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে।

কেননা মানুষ হাতের ধারে যা পায় তাই গসব করে এবং তার মালিকানায় যা আছে তাই আমানত রাখে। সুতরাং গসব আমানত রাখার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতা দাবীকারী কিছু নেই। আর এ ক্ষেত্রে কোন প্রচলন নেই। সুতরাং তার বক্তব্যের শেষাংশ শ্রেণী বর্ণনা হবে এবং বিযুক্তরূপে উচ্চারণ করলেও তা বিশুদ্ধ হবে। এ কারণেই গসবকৃত বস্তু কিংবা গচ্ছিত বস্তু ফেরতদানকারী যদি দোষযুক্ত বস্তু হাজির করে তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে, গসবের ক্ষেত্রে করযের উপর কিয়াস করে বিযুক্ত বক্তব্যকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। কেননা উভয় ক্ষেত্রে কবজাই হচ্ছে দায় ওয়াজিবকারী।

আর যদি গসব বা আমানতের স্বীকারোক্তি প্রদানের পর সংযুক্তরূপে বলে যে, তা 'অচল' কিংবা সীসার, তাহলে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে। আর যদি বিযুক্তভাবে বলে তাহলে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। কেননা অচল দিরহাম মূলত: দিরহামের শ্রেণীভুক্ত নয়। তবে রূপকভাবে শব্দটি সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এটা হবে পরিবর্তনকারী ব্যাখ্যা, তাই উচ্চারণের ক্ষেত্রে সংযুক্তি অপরিহার্য।

আর যদি (বিক্রয় করয, গসব ও আমানত) এই সকল ক্ষেত্রে এক হাযার স্বীকার করে এরপর বিরতি দিয়ে বলে যে, কিন্তু তা এক হাযার থেকে এত কম, তাহলে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। আর যদি সংযুক্ত করে বলে তাহলে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে।

কেননা এটা হলো পরিমাণের ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রম করা সংযুক্ত অবস্থায় সিদ্ধ। পক্ষান্তরে দোষযুক্ত হওয়া দিরহামের একটি গুণগত অবস্থা, আর গুণাবলীর ব্যতিক্রম করা সিদ্ধ নয়। আর শব্দটি পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু গুণকে অন্তর্ভুক্ত করে না। আর আগেই আমরা বর্ণনা করেছি যে, ব্যতিক্রম করা হচ্ছে শব্দগত পরিবর্তন।

আর বিযুক্তি যদি শ্বাস আটকে যাওয়ার কারণে কথা বন্ধ হওয়ার অনিবার্য প্রয়োজনে হয়ে থাকে, তাহলে সে সংযুক্তকারীই হবে। কেননা তা পরিহার করা সম্ভব নয়।

কেউ যদি কোন বস্ত্র গসব করা স্বীকার করে তারপর দোষযুক্ত কোন বস্ত্র উপস্থিত করে, সেক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা গসব দোষযুক্ত বস্ত্রের সাথে বিশিষ্ট নয়।

আর কেউ যদি অন্য একজনকে বলে, আমি আমানতের মাল রূপে তোমার কাছ থেকে এক হাযার দিরহাম গ্রহণ করেছিলাম আর তা হালাক হয়ে গেছে; আর সে লোকটি বললো— না, বরং তুমি আমার কাছ থেকে গসব করে নিয়েছ, তাহলে সে যামিন হবে।

আর যদি বলে, তুমি তা আমানত রূপে আমাকে দান করেছ, আর সে বলে না, বরং তুমি অপহরণ করেছো, তাহলে স্বীকারোক্তিকারী যামিন হবে না।

উভয় বক্তব্যের মাঝে পার্থক্য এই যে, প্রথম ছূরতে সে দায়বদ্ধতার কারণ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। আর তা হলো (অন্যের মাল) নিয়ে নেওয়া। এরপর সে এমন বিষয় দাবী করেছে, যা তাকে দায়মুক্ত করে আর তা হলো অনুমতিক্রমে। অথচ অন্যজন অনুমতির বিষয়টি অস্বীকার করছে। সুতরাং কসমসহ তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ছূরতে কর্মকে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। আর সেই অপর ব্যক্তি তার বিপক্ষে দায়বদ্ধতার কারণ দাবী করছে। আর তা হলো গসব। সুতরাং কসমসহ গসব অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর এই বিধানের ক্ষেত্রে কবজা করা গ্রহণ করার মত। তদ্রূপ দান ও প্রদান একই কথা।

কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, যার জন্য স্বীকার করা হয়েছে, তাকে দান বা প্রদান করা তো স্বীকারোক্তিকারীর কবজা ব্যতীত হতে পারে না।

আমাদের জবাব এই যে, দান ও প্রদান কখনো কখনো বাধা দূর করে একান্ত করে দেয়া এবং তার সামনে রেখে দেয়ার মাধ্যমেও হয়।

আর যদি (মেনে নেয়া হয় যে,) দান ও প্রদান কবজা করা দাবী করে তাহলে (আমাদের বক্তব্য এই যে,) দাবীকৃত বিষয়টি অনিবার্যতার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং দায়বদ্ধতার কারণ রূপে সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তার বিবেচ্যতা প্রকাশ পাবে না।

পক্ষান্তরে যদি স্বীকারোক্তিকারী বলে যে, আমি তোমার কাছ থেকে তা আমানতরূপে নিয়েছি; আর অপরজন বলে যে না, বরং করয রূপে নিয়েছ, সেক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন হবে। অর্থাৎ গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি করলেও স্বীকারোক্তিকারীর কথাই এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা সেখানে উভয়ে একমত হয়েছে যে, স্বীকারোক্তিকারীর গ্রহণ অপর পক্ষের অনুমতিক্রমে হয়েছে, তবে যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সে দায়বদ্ধতার কারণ দাবী করছে, আর তা হলো করয; পক্ষান্তরে অপরজন তা অস্বীকার করছে; সুতরাং বিষয় দুটো পার্থক্যপূর্ণ হলো।

আর যদি বলে যে, এই এক হাযার অমুকের কাছে আমার আমানত ছিল, আর আমি তার কাছ থেকে তা নিয়েছি, তখন অমুক বললো, সেটা আমার; সে ক্ষেত্রে সে তা ফেরত নিয়ে নেবে।

কেননা স্বীকারোক্তিকারী অমুকের অনুকূলে কবজা স্বীকার করেছে। অতঃপর অমুকের বিপক্ষে ঐ এক হাযারের হকদারি দাবী করেছে। আর অমুক তা অস্বীকার করছে। সুতরাং অস্বীকারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি বলে যে, আমি আমার এই বাহনটি অমুককে ভাড়া দিয়েছিলাম, আর সে তাতে আরোহণ করেছে, অতঃপর তা ফেরত দিয়েছে। কিংবা বললো, আমি আমার এই কাপড় অমুককে ভাড়া দিয়েছিলাম, আর সে তা পরিধান করেছে; অতঃপর তা ফেরত দিয়েছে। আর অমুক বলে যে, তুমি মিথ্যা বলেছো, ঐ দুটো তো আমারই। সেক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ঐ ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যার কাছ থেকে বাহন ও কাপড় নেয়া হয়েছে। এটাই কিয়াসের দাবী। একই মতপার্থক্য রয়েছে (বাড়ী) ধার দেওয়া এবং বাস করতে দেয়ার ক্ষেত্রে।

আর যদি বলে, অমুক আমার এই কাপড়টি অর্ধ দিরহামে সেলাই করেছে, অতঃপর আমি তা 'কবজা' করেছি, আর অমুক বলে যে, এটা আমার কাপড়, তাহলে বিশুদ্ধ মতে সেটাও এই মতপার্থক্যপূর্ণ হবে।

কিয়াসের দলীল সেটাই, যা আমরা আমানত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছি।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, আর এটাই হলো (গচ্ছিত আমানত এবং এই ছুরতগুলোর মাঝে) পার্থক্যের কারণ, ভাড়া ও ধার প্রদানের ক্ষেত্রে কবজা হচ্ছে

১. অর্থাৎ আমার এই ঘরটি তোমাকে ধার দিয়েছিলাম এবং তোমাকে তাতে বাস করতে দিয়েছিলাম এবং তুমি তা আমাকে ফেরত প্রদান করেছো; আর সে বললো যে, এটা আমার ঘর।

অনিবার্যতা ভিত্তিক। চুক্তির বিষয় তথা উপকার লাভের অনিবার্য প্রয়োজনে তা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং অনিবার্য প্রয়োজনের বাইরে সেটাকে অবিদ্যমান ধরা হবে। তাই (ভাড়া ও ধারের দখলদারি সম্পর্কে) এই স্বীকারোক্তি তার অনুকূলে সাধারণ স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে না।

পক্ষান্তরে আমানতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাতে কবজা উদ্দেশ্যভুক্ত বিষয়। আর কারো কাছে আমানত রাখার অর্থ হলো উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কবজা সাব্যস্ত করা। সুতরাং আমানতের স্বীকারোক্তি করার অর্থ হলো যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে তার কবজা স্বীকার করে নেওয়া।

(উভয় ছূরতের মাঝে) পার্থক্যের আরেকটি কারণ এই যে, ভাড়া ও ধার প্রদান এবং বসবাস করানোর কথা বলার ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিকারী মূলত: তার পক্ষ থেকে সাব্যস্ত কবজা স্বীকার করলো। সুতরাং কবজার প্রকৃতি সম্পর্কে তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আমানতের বিষয়টি তেমন নয়। কেননা সেক্ষেত্রে সে বলেছে যে, তা আমানত রূপে ছিল। আর মালিকের পক্ষ থেকে প্রদান ছাড়াও আমানত হতে পারে। এমন কি যদি বলে যে, আমি তা অমুকের কাছে আমানত রেখেছিলাম, তাহলে সেটাও এই মতপার্থক্যপূর্ণ হবে।

(উভয় ছূরতের মাঝে বিধানগত) পার্থক্যের ভিত্তি কিন্তু আমানতের ক্ষেত্রে 'গ্রহণ' এর উল্লেখ এবং অপর দিকে অর্থাৎ ভাড়া ও ধার প্রদান এবং বসবাস করানোর ক্ষেত্রে গ্রহণের মুল্লেখ নয়। কেননা 'কিতাবুল ইকরার'-এ ইমাম মুহাম্মদ (র) অপর দিকের অর্থাৎ ভাড়া ও ধার প্রদান এবং বসবাস করানোর ক্ষেত্রেও মাসআলার স্বরূপ নির্ধারণে 'গ্রহণ' শব্দ উল্লেখ করেছেন।

ভাড়া ও ধার প্রদান এবং বসবাস করানোর ক্ষেত্রে প্রদত্ত এই সিদ্ধান্ত ঐ ছূরতের বিপরীত, যখন বলে যে, আমি অমুকের কাছ থেকে এক হাযার উশুল করেছি, যা তার কাছে আমার পাওনা ছিল। কিংবা (বললো যে,) তাকে আমি এক হাযার করয দিয়েছিলাম, পরে তা তার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি। আর যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সে তা অস্বীকার করল। সেক্ষেত্রে যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা ঋণসমূহ তার সদৃশ দ্বারা পরিশোধ করা হয়। আর ঋণের সদৃশ দ্বারা ঋণ পরিশোধ দায়যুক্ত কবজার মাধ্যমেই সাব্যস্ত হবে। সুতরাং যখন সে ঋণ উশুলের দাবী করলো তখন সে দায় সাব্যস্ত হওয়ার 'কারণ' স্বীকার করে নিল। অতঃপর সে কাটাকাটির ভিত্তিতে ঐ ঋণের মালিক হওয়ার দাবী করছে, যা সে যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, তার বিপক্ষে দাবী করছে। আর অপরজন তা অস্বীকার করছে।

পক্ষান্তরে এখানে (ভাড়া প্রদান ও অন্য দুটি ক্ষেত্রে) কবজাকৃত বস্তু হচ্ছে হুবহু ঐ জিনিস, যা ভাড়া প্রদানের এবং এই জাতীয় কিছুর (অর্থাৎ ধার প্রদান কিংবা বাস করার জন্য প্রদানের) দাবী করেছে। সুতরাং দুটি ছুরত পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

আর যদি স্বীকার করে যে, অমুক এই জমিতে ফসল বপন করেছে কিংবা বাড়ী তৈরি করেছে কিংবা এই আঙ্গুর গাছ লাগিয়েছে, আর এই সবই স্বীকারোক্তিকারীর দখলে রয়েছে, তখন অমুক এগুলোর মালিকানা দাবী করলো। কিন্তু স্বীকারোক্তিকারী বললো, না, বরং এসব আমার। আমি তোমার কাছে সাহায্য চেয়েছি আর তুমি সাহায্য করেছো, কিংবা তুমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করেছো। সেক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে অমুকের অনুকূলে কবজা স্বীকার করেনি; বরং তার পক্ষ থেকে কৃত একটি কর্ম সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছে। আর সেই কর্ম স্বীকারোক্তিকারীর কবজায় তার মালিকানায় থাকা অবস্থায় সম্পন্ন হতে পারে। সুতরাং বিষয়টি একথা বলার মত হলো যে, দর্জী আমার এই জামা অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে সেলাই করেছে; এর পর একথা বলেনি যে, আমি তার কাছ থেকে তা কবজা করেছি, তাহলে এটা কবজার স্বীকারোক্তি হবে না এবং স্বীকারোক্তিকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে শুধু দর্জীর পক্ষ থেকে কৃত একটি কর্মের স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। আর স্বীকারোক্তিকারীর কবজা থাকা অবস্থায় কখনো দর্জী কাপড় সেলাই করে থাকে, এটাও তদ্রূপ।

পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর স্বীকারোক্তি

কোন লোক যদি তার 'মৃত্যু-রোগ' কালে (অজ্ঞাত কারণ সম্পন্ন) কিছু ঋণ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে, আর অবস্থা এই যে, তার সুস্থাবস্থায় তার উপর কিছু ঋণ রয়েছে; আবার 'মৃত্যু-রোগ' কালে জানা কারণ সম্পন্ন কিছু ঋণও তার উপর সাবিম হয়েছে। এক্ষেত্রে সুস্থাবস্থায় ঋণ এবং জানা করণ সম্পন্ন ঋণ অগ্রবর্তী হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, 'মৃত্যুরোগ'কালীন ঋণ এবং সুস্থাবস্থায় ঋণ সমান হবে। কেননা ঋণ সাব্যস্তির কারণ সমান। আর তা হলো আকল ও দ্বীন থেকে উদ্ভূত স্বীকারোক্তি। আর অবশ্য সাব্যস্তির পাত্র হলো (স্বাধীন সুস্থমস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির) 'দায়গুণ' যা অন্যের হক ও অধিকারের দায়গ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্ন। সুতরাং এটা বেচাকেনা ও বিবাহশাদীর চুক্তি সম্পাদনের মত হলো।

আমাদের দলীল এই যে, স্বীকারোক্তিতে যদি অন্যের হক বাতিল করার দিক থাকে তাহলে সেটা প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। আর মৃত্যু রোগীর স্বীকারোক্তিতে তা রয়েছে।

কেননা সুস্থাবস্থার পাওনাদারদের হক এই মালের সাথে উশুল করার অধিকারসহ সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। একারণেই মৃত্যু রোগীকে এক তৃতীয়াংশের বাইরে দান করা এবং কমমূল্যে বিক্রি করা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। বিবাহের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা মৌলিক প্রয়োজনভুক্ত। তবে তা মোহরে মেছেল-এর বিনিময়ে হবে। তদ্রূপ সমমূল্যে বেচাকেনার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা পাওনাদারদের হক সম্পদ গুণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে; আকৃতির সঙ্গে নয়। পক্ষান্তরে সুস্থাবস্থায় তাদের হক (কোন ভাবেই) মালের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়নি। কেননা সে উপার্জনে সক্ষম, ফলে বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন সম্পদের উৎপাদন সম্পন্ন হতে পারে। আর এটা হলো অক্ষমতার অবস্থা। আর মৃত্যুরোগের প্রথমাবস্থা ও শেষাবস্থা দুটোই অভিন্ন। কেননা এটা হলো নিষেধাজ্ঞার অবস্থা। পক্ষান্তরে সুস্থ থাকার অবস্থা এবং মৃত্যুরোগের অবস্থা ভিন্ন। কেননা প্রথমটা হলো (শরীয়তের পক্ষ হতে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের) সক্ষমতার অবস্থা আর এটা হলো অক্ষমতার অবস্থা। সুতরাং দুটি অবস্থা পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

আর জানা কারণ সম্পন্ন ঋণগুলোকে এজন্য অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় যে, এগুলোর সাব্যস্তির ক্ষেত্রে অভিযোগ উত্থাপনের অবকাশ নেই। কেননা যা প্রত্যক্ষ প্রমাণিত, তা রদ করার কোন অবকাশ নেই। আর তা হলো এমন মালের বিনিময়, যে মালের সে (বিক্রির মাধ্যমে বা করণের মাধ্যমে) মালিক হয়েছে। কিংবা যা সে ভোগ করেছে এবং যা ওয়াজিব হওয়া তার স্বীকারোক্তি ছাড়া (কাযীর অবলোকনের মাধ্যমে বা বাইয়েনাহর মাধ্যমে) জানা গেছে। কিংবা মোহরে মেছেলের বিনিময়ে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছে; আর এ ঋণ হলো সুস্থ অবস্থার ঋণের মত, একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে না। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর যদি নিজের দখলে বিদ্যমান কোন বস্তু সম্পর্কে অন্যের অনুকূলে স্বীকারোক্তি করে তাহলে সুস্থাবস্থার পাওনাদারদের 'হক'-এর ক্ষেত্রে তা সিদ্ধ হবে না। কেননা সেটার সঙ্গে তাদের হক সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।

কোন পাওনাদারকে বাদ দিয়ে অন্য পাওনাদারের ঋণ আদায় করা মৃত্যুরোগীর জন্য জায়েয নেই। কেননা একজনকে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যদের হক বাতিল করা হয়। আর এ বিষয়ে সুস্থাবস্থার পাওনাদার এবং মৃত্যুরোগকালের জ্ঞাত কারণ সম্পন্ন পাওনাদাররা সমান। তবে রোগের সময় যা করয করেছিল সেটা যদি আদায় করে কিংবা রোগের সময় যা খরিদ করেছিলো তার মূল্য যদি পরিশোধ করে আর এই দেনার সাব্যস্তি যদি বাইয়েনাহ দ্বারা পরিজ্ঞাত হয় (তাহলে এই পরিশোধ সিদ্ধ হবে।)

ইমাম কুদুরী (র) বলেন, অগ্রবর্তিতা সম্পন্ন ঋণসমূহ আদায় করার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহলে সেটা ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় করা হবে, যা 'মৃত্যুরোগ'-এর অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে।

কেননা স্বকীয়ভাবে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য, শুধু সুস্থাবস্থার পাওনাদারদের হক রক্ষার ক্ষেত্রে তা রদ করা হয়েছিল, সুতরাং যখন তাদের হক বাকি থাকবেনা তখন এই স্বীকারোক্তির সিদ্ধতা প্রকাশ পাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি তার উপর তার সুস্থাবস্থার কোন ঋণ না থাকে তাহলে তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে।

কেননা তা অন্যের হক নষ্ট করাকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

আর যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সে ব্যক্তি ওয়ারিছদের থেকে অগ্রাধিকারী হবে। কেননা ওমর (রা) বলেছেন, اذا اقر المريض بدين جاز ذلك عليه فى جميع تركته —মৃত্যুরোগী যদি কোন ঋণ স্বীকার করে তাহলে তা তার উপর তার সমগ্র সম্পত্তিতে কার্যকর হবে।

তাছাড়া এই কারণে যে, ঋণ পরিশোধ হলো মৌলিক প্রয়োজনভুক্ত বিষয়। আর সম্পত্তির সাথে ওয়ারিছদের হক সম্পৃক্ত হয় মৌলিক প্রয়োজন থেকে ফারিগ হওয়ার শর্তে। এজন্যই তার কাফন দাফনের প্রয়োজনকে (ওয়ারিছদের হকের উপর) অগ্রবর্তী করা হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মৃত্যুরোগী যদি তার কোন ওয়ারিছের অনুকূলে (কোন নির্দিষ্ট বস্তুর বা কোন ঋণের) স্বীকারোক্তি করে তা সিদ্ধ হবে না, তবে যদি অন্য ওয়ারিছরা তাকে এ বিষয়ে সত্যায়ন করে (তাহলে হবে)।

ইমাম শাফেয়ী (র) তার দুই মতের একটিতে বলেছেন, তা সিদ্ধ হবে।

কেননা সত্যতার দিকটি অগ্রাধিকারযোগ্য হওয়ার কারণে ধরে নেয়া হবে যে, এটা হচ্ছে অন্যের হক প্রকাশকরণ। সুতরাং এটা অন্য কোন ব্যক্তির অনুকূলে স্বীকারোক্তি করার কিংবা অন্য কোন ওয়ারিছ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করা কিংবা কোন ওয়ারিছের অনুকূলে নষ্ট হয়ে যাওয়া আমানতকৃত মাল সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করার মত হল।

আমাদের প্রমাণ হলো নবী (সা) -এর বাণী : لا وصية لوارث ولا اقرارله بالدين (কোন ওয়ারিছের অনুকূলে অছিয়ত বা ঋণের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।)

তাছাড়া এই কারণে যে, তার মৃত্যুরোগ কালে তার মালের সাথে ওয়ারিছদের হক সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। একারণেই ওয়ারিছদের বিপক্ষে দান করা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়, সুতরাং দানের ব্যাপারে কোন একজন ওয়ারিছকে খাস করায় অবশিষ্ট ওয়ারিছদের হক নষ্ট হয়।

তাছাড়া মৃত্যু রোগের অবস্থা হলো সবকিছু থেকে বিমুখ হওয়ার অবস্থা, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক হলো (তার মালের সঙ্গে আত্মীয়দের হক) সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ।

তবে তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সম্পৃক্তি প্রকাশ পাবে না। কেননা সুস্থাবস্থায় তার সঙ্গে লেনদেনের প্রয়োজন ছিল। আর রোগের সময় স্বীকারোক্তি করা থেকে যদি সে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে যায় তাহলে মানুষ তার সঙ্গে লেনদেন করা থেকে বিরত থাকবে। পক্ষান্তরে ওয়ারিছের সঙ্গে লেনদেন কমই হয়।

অন্য কোন ওয়ারিছ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করার ক্ষেত্রেও এই সম্পৃক্তি প্রকাশ পাবে না। কেননা সেটারও তার প্রয়োজন রয়েছে।

অতঃপর (মৃত্যু রোগীর মালের সঙ্গে) এই সম্পৃক্তি হলো অবশিষ্ট ওয়ারিছদের হক। সুতরাং তারা যখন তাকে সত্যায়ন করবে তখন তারা নিজেরা নিজেদের হক বাতিলকারী হবে। সুতরাং তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে।

আর যদি সে তৃতীয় কোন ব্যক্তি সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে, তাহলে সমগ্র মাল সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করলেও আমাদের বর্ণিত কারণে তা জায়িয হবে।

আর কিয়াসের দাবী হলো হক তৃতীয়াংশের বাইরে জায়েয না হওয়া। কেননা শরীয়ত তার হস্তক্ষেপকে এক তৃতীয়াংশে সীমাবদ্ধ করেছে।

তবে সুক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে আমরা বলি, এক তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে যখন তার স্বীকারোক্তি বৈধ হলো তখন অবশিষ্ট মালের তৃতীয়াংশেও তার (স্বীকারোক্তিগত) হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে।

কেননা এটা হলো ঋণ আদায়ের পরবর্তী তৃতীয়াংশ। অতঃপর একই অবস্থা হবে। তারপরও একই অবস্থা হবে। এভাবে সমগ্র মালে সে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি (ওয়ারিছান বহির্ভূত) তৃতীয় কোন ব্যক্তির অনুকূলে (নির্ধারিত কোন বস্তু সম্পর্কে বা ঋণ সম্পর্কে) স্বীকারোক্তি করে অতঃপর বলে যে, সে আমার পুত্র, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার নসব ও বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে এবং তার অনুকূলে তার স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কোন তৃতীয় স্ত্রীলোকের অনুকূলে স্বীকারোক্তি করে, অতঃপর তাকে বিবাহ করে তাহলে তার অনুকূলে তার স্বীকারোক্তি বাতিল হবে না।

পার্থক্যের কারণ এই যে, নসবের দাবী গর্ভ সঞ্চারের সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, সে তার পুত্রের অনুকূলে স্বীকারোক্তি করেছে। কাজেই তা সিদ্ধ হবে না। বৈবাহিক সম্পর্ক অনুরূপ নয়। কেননা তা বিবাহ করার সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং তার স্বীকারোক্তি তৃতীয় একজন স্ত্রীলোকের অনুকূলে বলেই বহাল থাকবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি মৃত্যুরোগের সময় তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে অতঃপর তার অনুকূলে কোন ঋণ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে আর মারা যায় তাহলে সে ঋণ ও স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্য তার মীরাছের মধ্যে যা অপেক্ষাকৃত কম তাই পাবে।

কেননা ইদ্দত বিদ্যমান থাকার কারণে এই ঋণ স্বীকারের বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অভিযুক্ত। সেটা এই যে, ওয়ারিছদের জন্য স্বীকারোক্তি করার দরজা যেহেতু বন্ধ সেহেতু সম্ভবত: সে এই তালাক প্রদানে অগ্রসর হয়েছে, যাতে স্ত্রীর অনুকূলে তার প্রাপ্য মীরাছের অধিক পরিমাণ স্বীকার করা সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরের দুটির স্বল্পতরটির ক্ষেত্রে অভিযোগের অবকাশ নেই। সুতরাং তা-ই সাব্যস্ত হবে।

(নসব সম্পর্কে স্বীকারোক্তি)

কেউ যদি এমন কোন বালকের পুত্র হওয়া স্বীকার করে, যে বয়সের বালক তার মত বয়সের লোকের ঐরসে জন্মলাভ করতে পারে আর ঐ বালকের জ্ঞাত কোন বংশপরিচয় না থাকে, আর বালকও তাকে সত্যায়ন করে, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যদিও সে (স্বীকারোক্তি করার সময়) মৃত্যু রোগী হয়।

কেননা বংশ পরিচয় এমন বিষয়, যেটা শুধু তার নিজের উপরই লাযিম হয় (তাতে অন্যের উপর কিছু আরোপ করার দিক নেই।) সুতরাং ঐ বংশ পরিচয় সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি সিদ্ধ হবে।

আর তার মত বয়সের বালক তার মত বয়সের পুরুষের ঔরসে জন্ম গ্রহণের সম্ভাবনার শর্ত এ জন্য আরোপ করা হয়েছে, যাতে প্রকাশিত অবস্থার বিচারে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা না যায়।

আর ঐ বালকের জ্ঞাত বংশ পরিচয় না থাকার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা জ্ঞাত বংশ পরিচয় অন্যের থেকে বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

আর বালকের সত্যায়নের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা সে নিজ কর্তৃত্বাধীন রয়েছে। কারণ মাসআলাটি উপস্থাপন করা হয়েছে এমন বালক সম্পর্কে, যে নিজের কথা নিজে বলতে পারে। পক্ষান্তরে নিজের কথা নিজে প্রকাশ করতে পারে না, এমন ছোট শিশুর বিষয়টি ভিন্ন। যেমন ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আর মৃত্যুরোগের কারণে বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। কেননা বংশ পরিচয় হলো মৌলিক প্রয়োজনভুক্ত বিষয় আর মীরাছের ক্ষেত্রে সে অন্যান্য ওয়ারিছদের সাথে শরীক হবে।

কেননা যখন তার পক্ষ হতে বালকের বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হয়ে গেলে তখন জ্ঞাত ওয়ারিছের মতই হয়ে গেলো। সুতরাং সে অন্যান্য ওয়ারিছদের সাথে শরীক হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পিতা-মাতা সম্পর্কে, সন্তান সম্পর্কে, স্ত্রী সম্পর্কে এবং মনিব সম্পর্কে পুরুষের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য।

কেননা সে এমন বিষয় স্বীকার করেছে, যা শুধু তার নিজের উপর লাযিম হয়। তাতে অন্যের উপর নসব আরোপ করার দিক নেই।

তদ্রূপ আমাদের বর্ণিত একই কারণে পিতা-মাতা সম্পর্কে, স্বামী সম্পর্কে এবং মনিব সম্পর্কে স্ত্রী লোকের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে। তবে সন্তান সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে না।

কেননা তাতে অন্যের উপর অর্থাৎ স্বামীর উপর নসব আরোপ করা হয়। কারণ পিতা থেকেই নসব সাব্যস্ত হয়। তবে স্বামী তাকে সত্যায়ন করলে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এটা তার অধিকার। কিংবা ধাত্রী যদি ঐ শিশুর প্রসব সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে। কেননা এক্ষেত্রে ধাত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য। তালাক প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। বিষয়টি দাবী উত্থাপন পর্বে স্ত্রীলোকের স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আর এদের পক্ষ থেকে সত্যায়ন অপরিহার্য।

আর নসবের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিকারীর মৃত্যুর পরও সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা নসব মৃত্যুর পরও বহাল থাকে।

তদ্রূপ (স্বীকারোক্তিকারী স্বামীর মৃত্যুর পর) স্ত্রীর সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বিবাহ সংশ্লিষ্ট বিধান (মৃত্যুর পরও) বহাল থাকে। তদ্রূপ স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মীরাছ বিবাহের বিধানভুক্ত বিষয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সিদ্ধ হবে না। কেননা (স্ত্রীর) মৃত্যু দ্বারা বিবাহ সম্পর্ক কর্তিত হয়ে গেছে। একারণেই তো আমাদের মতে মৃত স্ত্রীকে গোসল দান করা স্বামীর জন্য জায়েয নয়। আর মীরাছের বিবেচনায় সত্যায়ন বৈধ হবে না। কেননা, স্বীকারোক্তির সময় মীরাছ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো না। বরং মৃত্যুর পর তা সাব্যস্ত হয়। অথচ সত্যায়ন স্বীকারোক্তি সূচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি পিতামাতা বা সন্তান ছাড়া অন্য কারো বংশ পরিচয় স্বীকার করে, যেমন ভাই ও চাচা, তাহলে নসবের ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে না।

কেননা তাতে অন্যের উপর বংশ পরিচয় আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে যদি স্বীকারোক্তিকারীর দূরবর্তী বা নিকটবর্তী কোন জ্ঞাত ওয়ারিছ বিদ্যমান থাকে তাহলে সে যার জন্য স্বীকার করা হয়েছে তার চাইতে মীরাছের অধিক হকদার হবে।

কেননা যখন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার নসব সাব্যস্ত হলো না তখন সে জ্ঞাত ওয়ারিছের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে না।

আর যদি স্বীকারোক্তিকারীর কোন ওয়ারিছ না থাকে তাহলে যার জন্য স্বীকার করা হয়েছে সে তার মীরাছের হকদার হবে।

কেননা ওয়ারিছ না থাকা অবস্থায় তার নিজের মালে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তার রয়েছে। দেখুন না, ওয়ারিছ না থাকা অবস্থায় স্বীকারোক্তিকারী তার সমগ্র মাল সম্পর্কে অছিয়ত করতে পারে। সুতরাং সে মৃতের সমস্ত মালের হকদার হয়ে যাবে। যদিও অন্যের উপর নসব আরোপের অবৈধতার কারণে তার পক্ষ হতে তার নসব সাব্যস্ত হবে না।

আর এই স্বীকারোক্তি প্রকৃত অছিয়ত নয়। একারণেই কেউ যদি কোন ভাই সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে (অর্থাৎ বলে যে, সে আমার ভাই) অতঃপর অন্য একজনের জন্য তার সমস্ত মাল অছিয়ত করে যায় তাহলে অছিয়তকৃত ব্যক্তি সমগ্র মালের এক তৃতীয়াংশ পাবে। অথচ প্রথমটি (অর্থাৎ স্বীকারোক্তিটি) যদি অছিয়ত হতো তাহলে উভয়ে অর্ধেক অর্ধেক করে শরীকদার হতো। তবে তা অছিয়তের পর্যায়ভুক্ত। একারণেই যদি সে মৃত্যুরোগের অবস্থায় কারো সম্পর্কে ভ্রাতৃত্বের স্বীকারোক্তি করে আর যার জন্য স্বীকার করা হয়েছে সে ব্যক্তি তাকে সত্যায়ন করে অতঃপর স্বীকারোক্তিকারী তার আত্মীয়তা সম্পর্ক অস্বীকার করে এবং পরে অন্য কোন মানুষের অনুকূলে তার সমস্ত মাল অছিয়ত করে তাহলে সমস্ত মাল অছিয়তকৃত ব্যক্তির জন্য হবে। আর যদি (অস্বীকৃতির পর) কারো অনুকূলে অছিয়ত না করে তাহলে তা বাইতুল মালের সম্পদ হবে।

কেননা তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা সিদ্ধ। (যেমন অছিয়ত প্রত্যাহার করা সিদ্ধ)। কারণ নসব তো সাব্যস্ত হয়নি; সুতরাং স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কারো যদি বাপ মারা যায় আর সে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভ্রাতৃত্বের স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার ভাইয়ের বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে না।

কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

তবে সে মীরাছে তার শরীক হবে।

কেননা তার স্বীকারোক্তি দু'টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রথমত: অন্যের উপর নসব আরোপ। অথচ অন্যের উপর তার কোন অধিকার নেই।

দ্বিতীয়তঃ সম্পদে তাকে শরীক করা। আর এ বিষয়ে তার কর্তৃত্ব রয়েছে। সুতরাং (সম্পদে অংশীদারিত্ব) সাব্যস্ত হবে। যেমন ক্রেতা বিক্রেতার বিপক্ষে আযাদ করার স্বীকারোক্তি করলো; সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার বিপক্ষে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে না। তাই ক্রেতা বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। তবে মুক্তির ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি দুটি সন্তান রেখে মারা যায়, আর অবস্থা এই যে, একজন ব্যক্তির কাছে তার একশ দিরহাম পাওনা রয়েছে, অতঃপর

দু'জনের একজন স্বীকারোক্তি করলো যে, তার আব্বা একশ দিরহাম থেকে পঞ্চাশ দিরহাম কবজা করেছে, তাহলে স্বীকারোক্তিকারী কিছুই পাবে না। আর অপর জন পঞ্চাশ দিরহাম পাবে।

কেননা এটা হলো মৃত পিতার বিপক্ষে ঋণের স্বীকারোক্তি। (কারণ ঋণ যেহেতু সদৃশ দ্বারা পরিশোধ করা হয়, সেহেতু) ঋণের উশুলকরণ হবে দায়বদ্ধ কবজা দ্বারা। সুতরাং তার ভাই যখন তা অস্বীকার করলো তখন ঋণ তার সমগ্র হিসসাকে গ্রাস করে ফেলবে। যেমন (আপন মূরিছ-এর বিপক্ষে ঋণের স্বীকারোক্তি করার ক্ষেত্রে) আমাদের মাযহাব।

বিষয়টি বেশীর চেয়ে বেশী এই হবে যে, তারা পরস্পর এই মর্মে সত্যায়ন করেছে যে. কবজাকৃত (অবশিষ্ট) মালে তাদের উভয়ের শরীকানা রয়েছে। কিন্তু স্বীকারোক্তিকারী যখন কবজাকারী ভাইয়ের কাছ থেকে তার (কথিত) হিসসা ফেরত নেবে তখন কবজাকারী দেনাদারের কাছ থেকে সেই পরিমাণ রুজু করবে। এরপর দেনাদার স্বীকারোক্তিকারীর কাছে সেই পরিমাণ রুজু করবে। সুতরাং প্রকারান্তরে ঘূর্ণনকে অনিবার্য করবে।

كِتَابُ الصُّلْحِ
অধ্যায় ঃ সন্ধি

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সন্ধি তিন প্রকার ঃ স্বীকারোক্তিসহ সন্ধি এবং নীরবতাসহ সন্ধি! আর তা এই যে, বিবাদী দাবী স্বীকারও করলনা এবং অস্বীকারও করলনা; আর অস্বীকৃতিসহ সন্ধি।

এর সব কটি জায়িয রয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা নিঃশর্তরূপে বলেছেন والصلح خير —সন্ধি করা উত্তম।

আর নবী (সা) বলেছেন, كل صلح جائز فيما بين المسلمين الا صلحا أحل حراما وحرم حلالا —মুসলমানদের মাঝে সম্পাদিত সকল সন্ধি বৈধ, তবে এমন সন্ধি যা কোন হারামকে হালাল করে কিংবা কোন হালালকে হারাম করে (তা নয়)।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, অস্বীকৃতি বা নীরবতার সাথে সন্ধি জায়িয নয়।

কারণ সেই হাদীছ, যা (এই মাত্র) আমরা বর্ণনা করলাম। আর আলোচ্য সন্ধি এই গুণসম্পন্ন। কেননা সন্ধির বিনিময়টি প্রদানকারীর জন্য হালাল এবং গ্রহণকারীর জন্য হারাম। আর এখন বিষয়টি পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

তাছাড়া এই কারণে যে, বিবাদী নিজের পক্ষ থেকে বিবাদ নিরসন করার জন্য মাল প্রদান করে থাকে, আর তা হলো ঘুষ।

আমাদের দলীল হলো উদ্ধৃত আয়াত এবং বর্ণিত হাদীসের প্রথমাংশ। আর শেষাংশের ব্যাখ্যা এই যে, এমন জিনিসকে হালাল করা, যা স্বকীয় সত্তায় হারাম ছিল; যেমন মদ, কিংবা এমন জিনিসকে হারাম করা যা স্বকীয় সত্তার হালাল ছিল, যেমন এই মর্মে (স্ত্রীর সঙ্গে) সন্ধি করা যে, সতীনের সঙ্গে সহবাস করবে না।

তাছাড়া এই কারণে যে, এটা হলো বিশুদ্ধরূপে উত্থাপিত দাবীর পর কৃত সন্ধি। সুতরাং তার বৈধতার স্বপক্ষে রায় প্রদান করা হবে। কেননা বাদী তার ধারণা মতে তার প্রাপ্য 'হক'-এর বিনিময়ে তা গ্রহণ করছে। আর এটা শরীয়ত সম্মত। আর বিবাদী

নিজের পক্ষ থেকে বিবাদ নিরসন করায় জন্য মাল প্রদান করছে। আর এটাও শরীয়ত সম্মত। কেননা মাল হচ্ছে মানুষের স্বীয় সত্তাকে রক্ষার উপকরণ। আর জুলুম রোধ করার জন্য ঘুষ প্রদান করাও জায়েয রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সন্ধি যদি স্বীকারোক্তিসহ সম্পন্ন হয়, তাহলে তাতে ঐ সকল বিষয় বিবেচনা করা হবে, যা ক্রয়-বিক্রয়ে বিবেচনা করা হয়, যদি মালের দাবীর বিপরীতে মাল দ্বারা সন্ধি হয়।

কেননা বিক্রয়ের মর্ম তাতে বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো চুক্তির পক্ষদ্বয়ের ক্ষেত্রে তাদের সম্মতিক্রমে মালের বিপরীতে মালের বিনিময়। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তি হলে তাতে শোফা কার্যকর হবে এবং দোষের কারণে তা ফেরত দেওয়া যাবে। আর তাতে শর্তগত ইচ্ছাধিকার এবং অবলোকনগত ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে এবং সন্ধি দ্রব্যের অজ্ঞতা সন্ধিকে ফাসিদ করে দেবে।.

কেননা (বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত) সন্ধি দ্রব্যের অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়। 'সন্ধি-বিষয়'-এর অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় না। কেননা তা দায় থেকে রচিত হয় (পক্ষান্তরে সন্ধি দ্রব্যটি দায়ভুক্ত হয়।)

আর সন্ধি দ্রব্যটি অর্পণের ক্ষমতা বিদ্যমান থাকার শর্ত রয়েছে।

আর যদি মালের দাবীর বিপরীতে উপকার লাভের বিনিময়ে সন্ধি হয় তাহলে তা ইজারা প্রদান বলে বিবেচিত হবে।

কেননা তাতে ইজারা এর মর্ম বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো মালের বিনিময়ে উপকার লাভের মালিকানা প্রদান। আর চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত মর্মই বিবেচ্য। (উচ্চারিত শব্দ বিবেচ্য নয়।)

সুতরাং তাতে মেয়াদ উল্লেখের শর্ত হবে এবং মেয়াদকালে দু'জনের একজনের মৃত্যুতে সন্ধি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা (মর্মগত দিক থেকে) এটা ইজারা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নীরবতা ও অস্বীকৃতিসহ কৃত সন্ধি বিবাদীর পক্ষে হবে কসম পরিহার করার জন্য এবং বিবাদ রহিত করার উদ্দেশ্যে। আর বাদীর পক্ষে হবে (তার প্রাপ্য হক-এর) বিনিময়ের অর্থে।

কারণ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর বাদী ও বিবাদীর ক্ষেত্রে সন্ধিচুক্তির বিধান ভিন্ন হতে পারে। যেমন বিক্রয় চুক্তির পক্ষদ্বয়ের ক্ষেত্রে এবং তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইক্কালাহ (বা বিক্রয় প্রত্যাহার) এর বিধান ভিন্ন হয়ে থাকে।

অস্বীকারের ক্ষেত্রে তো (কসম পরিহার করার এবং বিবাদ রহিত করার) এই বিষয়টি স্পষ্ট। নীরবতার ক্ষেত্রেও তাই। কেননা এখানে স্বীকারোক্তি এবং অস্বীকৃতি

দুটোরই সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সন্দেহের অবস্থায় সন্ধি দ্রব্যটি তার ক্ষেত্রে (প্রতিপক্ষের প্রাপ্য হকের) বিনিময় বলে সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি কোন বাড়ীর দাবীর বিপরীতে সন্ধি করে তাহলে তাতে (প্রতিবেশীদের পক্ষে) শোফা-অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ হলো, সন্ধি যদি অস্বীকৃতি বা নীরবতার সঙ্গে হয়ে থাকে। কেননা বিবাদী সেটাকে নিজের প্রকৃত হক হিসাবে গ্রহণ করছে (ক্রয় করছেনা) তবে মাল প্রদান করছে বাদীর বিবাদ রহিত করার জন্য। আর বাদীর ধারণা বিবাদীর উপর কার্যকর নয়।

পক্ষান্তরে যদি কোন বাড়ীর বিনিময়ে সন্ধি সম্পন্ন হয় তাহলে তাতে শোফা অধিকার সাব্যস্ত হবে।

কেননা বাদী তা মালের বিনিময়ে গ্রহণ করছে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে সেটা বিনিময় গ্রহণ হলো এবং তার ক্রয়ের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাতে শোফা অধিকার সাব্যস্ত হবে, যদিও বিবাদী তা অস্বীকার করছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি স্বীকারোক্তিসহ সন্ধি সম্পন্ন হয়, আর 'সন্ধি-বিষয়ের' আংশিক হকদার দাঁড়ায় তাহলে বিবাদী সন্ধি দ্রব্য থেকে বিনিময়ের অংশ পরিমাণ হিসসা রুজু করতে পারে।

কেননা স্বীকারোক্তিসহ সম্পন্ন সন্ধি বিক্রয়ের মতই একটি সাধারণ ও পূর্ণাঙ্গ বিনিময়। আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হকদার দাঁড়ানোর এই হুকুম।

আর যদি নীরবতা কিংবা অস্বীকৃতিসহ সন্ধি সম্পন্ন হয়, আর বিরোধপূর্ণ বস্তুটির হকদার দেখা দেয় তাহলে বাদী হকদারের বিরুদ্ধে বিবাদ পুনঃ উত্থাপন করতে পারে এবং বিবাদীকে সন্ধির বিনিময় (বা সন্ধি দ্রব্য) ফেরত দেবে।

কেননা বিবাদী নিজের বিপক্ষে বিবাদ রহিত করার জন্যই সন্ধির বিনিময় দ্রব্য খরচ করেছে। কিন্তু যখন অন্য মানুষের হকদারি প্রকাশ পায় তখন পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, বিবাদীর মোকাবেলায় দাবী ও বিবাদ উত্থাপনের অধিকার তার ছিলনা। সুতরাং সন্ধিদ্রব্যটি বাদীর হাতে বিবাদীর উদ্দেশ্যশূন্য অবস্থায় রয়ে গেলো। সুতরাং সে তা ফেরত নিবে।

আর যদি সন্ধি বিষয়ের অংশ বিশেষের দাবীদার দাঁড়ায় তাহলে সন্ধিদ্রব্যের ঐ পরিমাণ অংশ বিবাদীকে ফেরত দেবে এবং বিরোধ পূর্ণ বস্তুটির ব্যাপারে হকদারের বিপক্ষে পুনঃ বিবাদ উত্থাপন করতে পারবে।

(ফেরত দেয়ার কারণ এই যে,) এই পরিমাণের ক্ষেত্রে সন্ধি দ্রব্যটি বিবাদীর উদ্দেশ্য থেকে শূন্য হয়েছে।

আর যদি স্বীকারোক্তিসহ সম্পন্ন সন্ধিতে সন্ধিকৃত দ্রব্যের (সবটুকুর) হকদার দেখা দেয় তাহলে বিবাদী সম্পূর্ণ সন্ধিকৃত দ্রব্য ফেরত নেবে। কেননা এই সন্ধি হলো পরস্পর

বিনিময়। আর যদি সন্ধি দ্রব্যের অংশ বিশেষের দাবীদার দেখা দেয় তাহলে সেই পরিমাণ অংশ ফেরত নেবে।

আর যদি অস্বীকৃতি বা নীরবতাসহ সন্ধি সম্পন্ন হয় (আর সন্ধিকৃত দ্রব্যে সবটুকুর বা আংশিকের হকদার দেখা দেয়) তাহলে বাদী সর্বাংশে বা আংশিকের হকদারীর ক্ষেত্রে হকদারির পরিমাণ অংশে বাদী পুনঃ দাবী উথাপন করবে। কেননা দাবীটাই ছিল বদলকৃত বিষয়। পক্ষান্তরে বিবাদী যদি বাদীর কাছে অস্বীকারসহ কোন কিছু বিক্রি করে (আর সেই বিক্রীত দ্রব্যের হকদার দেখা দেয়) সেক্ষেত্রে সে (দাবীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না, বরং) দাবীকৃত বিষয়টি ফেরত নেবে। কেননা বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করার অর্থ হলো তার পক্ষ হতে (দাবীকৃত বস্তুর উপর) বাদীর হক স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু সন্ধির বিষয়টি তেমন নয়। কেননা সন্ধি কখনো কখনো বিবাদ রহিত করার জন্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আর যদি সন্ধির বিনিময় দ্রব্যটি (বাদীর হাতে) অর্পণের আগেই হালাক হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে বিধান হবে উভয় সূরতে হকদার বের হওয়ার ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিধানের অনুরূপ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি কেউ কোন বাড়ীতে হক দাবী করে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে তা বর্ণনা না করে অতঃপর ঐ হকের বিপরীতে সন্ধি করা হয় তার পরে বাড়ীর অংশ বিশেষের হকদার বের হয়, সে ক্ষেত্রে বাদী গ্রহণকৃত বিনিময় থেকে কিছুই ফেরত দেবে না।

কেননা তার দাবী অবশিষ্ট অংশের জন্য হতে পারে। পক্ষান্তরে যদি সমগ্র বাড়ীর হকদার বের হয় তাহলে সন্ধির সমগ্র বিনিময় দ্রব্য ফেরত দেবে। কেননা সেক্ষেত্রে সন্ধির বিনিময় দ্রব্যটি তার বিপরীতে সাব্যস্ত বস্তু থেকে শূন্য রয়েছে। যেমন আমরা বিক্রয় পর্বে আলোচনা করে এসেছি।

আর যদি কোন বাড়ী দাবী করে এবং সেই বাড়ীর কোন একটি খণ্ডের বিনিময়ে সন্ধি করে তাহলে সন্ধি সিদ্ধ হবে না। কেননা (বিনিময় রূপে) যা সে দখল করেছে সেটা হুবহু তার দাবীকৃত হক। সুতরাং অবশিষ্ট বাড়ীর ব্যাপারে সে তার দাবীতে বহাল থাকবে।

(এই সন্ধির বৈধতার জন্য) দুটি সূরতের যে কোন একটি সূরত কৌশলে জায়িয হতে পারে। হয় সন্ধির বিনিময় দ্রব্যের সংগে একটি দিরহাম বৃদ্ধি করে দেবে। আর সেটা তার অবশিষ্ট হকের বিনিময়ে হবে; কিংবা এই সন্ধির শেষে অবশিষ্ট অংশের দাবী থেকে বিবাদীর দায়মুক্তির কথা যুক্ত করবে।

মালের দাবীর বিপরীতে সন্ধি করা জায়িয

কেননা পিছনের আলোচনা অনুযায়ী এটা হলো বিক্রয়ের সমার্থক।

আর উপকার লাভের দাবীর বিপরীতেও জায়িয।

কেননা ইজারা চুক্তির (ভাড়া চুক্তির) মাধ্যমে উপকার লাভের মালিক হওয়া যায়। সুতরাং সন্ধির মাধ্যমেও তার মালিকানা লাভ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, সন্ধিকারীর পদক্ষেপকে যথা সম্ভব বৈধতা দানের জন্য সম্পাদিত সন্ধিকে তার নিকটতম ও সদৃশতম চুক্তির উপর প্রযুক্ত করতে হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (হত্যা বা তার নিম্নবর্তী) ইচ্ছাকৃত অপরাধ এবং ভুলক্রমে কৃত অপরাধের বিপরীতে সন্ধি করা সিদ্ধ।

প্রথমটির দলীল হলো আল্লাহ্‌র বাণী—

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

সুতরাং যাকে তার দীনী ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু অংশ মাফ করে দেয়া হয়, তখন কর্তব্য হবে সদাচারের সঙ্গে তা অনুসরণ করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত সন্ধি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর (নিকটতম ও সদৃশতম চুক্তি হিসাবে) এই সন্ধি হলো বিবাহের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং বিবাহে যা কিছু মোহর রূপে নির্ধারিত হতে পারে তা এই সন্ধিতে বিনিময় রূপে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা উভয়ের প্রতিটি হচ্ছে যা মাল নয় তার বিপরীতে মালের বিনিময়। তবে পার্থক্য এই যে, এখানে সন্ধির ক্ষেত্রে বিনিময় নির্ধারণ যদি (গুরুতর অজ্ঞতার কারণে) ফাসিদ হয়ে যায় তাহলে দিয়তের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। কেননা দিয়তই হলো হত্যার অবশ্য সাব্যস্ত বিধান।

আর যদি ইচ্ছাকৃত অপরাধের বিপরীতে মদের বিনিময়ে সন্ধি করে তাহলে তার পরিবর্তে অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা নিঃশর্ত ক্ষমা দ্বারা মাল ওয়াজিব হয় না। আর বিবাহের উভয় ক্ষেত্রে মাহরে মেছেল ওয়াজবি হয়। কেননা মোহরে মেছলই হলো বিবাহের মূল সাব্যস্ত বিধান এবং মাহর সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করলেও (শরীয়তের পক্ষ হতে) নির্ধারিতভাবে মাহরে মেছেল সাব্যস্ত হয়।

কুদুরীতে বর্ণিত বিধানের নিঃশর্ততায় হত্যা অপরাধ এবং হত্যা-নিম্ন অপরাধ সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এটা শোফা অধিকারের বিপরীতে মালের বিনিময়ে কৃত সন্ধি থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ এই সন্ধি সিদ্ধ হবে না। (এবং শোফা বাতিল হয়ে যাবে আর মাল ওয়াজিব হবে না।)

কেননা শোফা অধিকার মানে বিক্রীত দ্রব্যের মালিকানা লাভের অধিকার। আর মালিকানা লাভের পূর্বে ঐ পাত্রটিতে 'শফী'-এর কোন হক নেই।

পক্ষান্তরে কিছাছ্ অর্থ পাত্রটিতে (অর্থাৎ ঘাতকের দেহ সত্তায়) কিছাছ নামক কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে মালিকানা লাভ। সুতরাং পাত্রটির মালিকানায় বিপরীতে বিনিময় গ্রহণ করা সিদ্ধ হবে।

আর শোফা অধিকারের বিপরীতে সন্ধি করা যখন সিদ্ধ হলো না তখন শোফা অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বিমুখতা প্রকাশ করা এবং নীরবতা অবলম্বন করা দ্বারা তা বাতিল হয়ে যায়।

আর (সন্ধি বৈধ না হওয়ার ক্ষেত্রে) দেহসত্তার কাফালা শোফা অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং দেহসত্তার কাফালাহ্ এর বিপরীতে কৃত সন্ধি দ্বারা কোন মাল ওয়াজিব হবে না। তবে কাফালাহ বাতিল হওয়া সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে, যা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয়টির অর্থাৎ ভুলক্রমে কৃত অপরাধ-এর বিপরীতে সন্ধি জায়েয হওয়ার কারণ এই যে, এর অনিবার্য বিধান হলো মাল। সুতরাং এই সন্ধি বিক্রয় চুক্তির পর্যায়ভুক্ত হবে। তবে সন্ধির বিনিময় দ্রব্যটি দিয়তের পরিমাণের বেশী হতে পারবে না। কেননা সেটা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ। সুতরাং সেটাকে বাতিল করা জায়িয হবে না। বরং অতিরিক্ত পরিমাণকে ফেরত দিতে হবে।

কিছাছের বিপরীতে কৃত সন্ধিটি ভিন্ন। সেখানে সন্ধির বিনিময় দ্রব্যটি দিয়াতের পরিমাণের চেয়ে বেশী হতে পারে। কেননা কিছাছ মাল নয়; বরং সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে তার মূল্য নির্ধারণ হয়।

এটা তখন হবে, যখন দিয়তের নির্ধারিত পরিমাণ সমূহের কোন একটির উপর সন্ধি করবে। পক্ষান্তরে যদি অন্য কিছুর উপর সন্ধি করে তাহলে দিয়তের পরিমাণের চেয়ে বেশী করা জায়িয আছে। কেননা এটা হলো দিয়তের বিনিময় গ্রহণ। তবে সন্ধিচুক্তির মজলিসে সন্ধির বিনিময় দ্রব্যটির দখল গ্রহণ করা শর্ত হবে, যাতে (দিয়তের) অনির্দিষ্টের বিপরীতে (সন্ধির) অনির্দিষ্ট গ্রহণ না করে পৃথক হওয়া না পাওয়া যায়।

আর যদি কাযী দিয়তের পরিমাণসমূহের কোন একটির অনুকূলে ফায়সালা করে আর সে দিয়াতের অন্য শ্রেণীর পরিমাণের উপর অতিরিক্ততা সহ করে তাহলে জায়িয হবে। কেননা আদালতের ফায়সালার মাধ্যমে তার হক নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং এটা হবে প্রাপ্য হকের বিনিময় গ্রহণ। পক্ষান্তরে (আদালতের ফায়সালা ছাড়া নিজেদের থেকে) সন্ধির প্রারম্ভের অবস্থা ভিন্ন হবে। কেননা দিয়তের কোন একটি পরিমাণের উপর তাদের পারস্পরিক সম্মতি, পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালতের ফায়সালার সমপর্যায়ভুক্ত। সুতরাং শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী নির্ধারণ করা জায়িয হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'হদ্দ'- এর দাবীর বিপরীতে সন্ধি করা জায়িয নেই।

কেননা এটা আল্লাহ্‌র হক, দাবীদারের হক নয়। আর অন্যের হক-এর বিনিময় গ্রহণ বৈধ নয়। একারণেই যখন স্ত্রী লোক সন্তানের নসব দাবী করে তখন সন্ধির মাধ্যমে তার বিনিময় গ্রহণ বৈধ নয়। কেননা নসব হলো সন্তানের অধিকার, স্ত্রী-লোকটির অধিকার নয়।

তদ্রূপ সাধারণের রাস্তার উপর যা কিছু তৈরি করেছে, তার বিপরীতে সন্ধি করা বৈধ নয়।

কেননা এটা হলো জনসাধারণের অধিকার। সুতরাং কেউ আলাদাভাবে ঐ অধিকারের বিপরীতে সন্ধি করতে পারে না।

কুদূরীতে বর্ণিত 'হদ্দ' সম্পর্কিত বিধানের নিঃশর্ততায় 'হদ্দুল কাযাফ' (বা অপবাদের দন্ড) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেননা তাতে শরীয়তের হক প্রবল।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন পুরুষ যদি কোন স্ত্রী লোকের বিরুদ্ধে বিবাহের দাবী জানায় আর সে তা অস্বীকার করে; অতঃপর স্ত্রীলোকটি মাল খরচ করে তার সাথে সমঝোতা করে নেয়, যাতে সে দাবী ত্যাগ করে, তাহলে তা জায়িয হবে আর তা খোলা-এর সমার্থক হবে।

কেননা পুরুষটির ধারণার ভিত্তিতে পুরুষের দিক থেকে এটাকে খুল'আ হিসেবে বৈধতা দান করা সম্ভব। আর স্ত্রীলোকটির দিক থেকে এটাকে বিবাদ রহিত করার জন্য অর্থ ব্যয় রূপে বৈধতা দান করা সম্ভব।

ফকিহগণ বলেছেন, বান্দা ও আল্লাহ্‌র মাঝে মুআমালা হিসাবে কোন মাল গ্রহণ করা বৈধ হবে না; যদি তার দাবী বাতিল ও মিথ্যা হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন স্ত্রী লোক যদি কোন পুরুষের প্রতি বিবাহের দাবী করে আর পুরুষটি ঐ স্ত্রীলোককে পয়সা দিয়ে তার সাথে সমঝোতা করে তাহলে জায়িয হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মুখতাছারুল কুদূরী কিতাবের কোন কোন অনুলিপিতে এমনই উল্লেখ করেছেন। আর কোন কোন অনুলিপিতে বলেছেন, জায়িয হবে না।

প্রথমটির দলীল এই যে, এটাকে মাহরের পরিমাণ বৃদ্ধি বলে ধরা হবে। আর দ্বিতীয়টির দলীল এই যে, পুরুষ তাকে অর্থ প্রদান করেছে যেন সে দাবী পরিত্যাগ করে এখন তার পক্ষ থেকে দাবী পরিত্যাগকে যদি বিচ্ছেদ সাব্যস্ত করা হয় তাহলে প্রশ্ন এই যে, স্বামী তো বিচ্ছেদের জন্য বিনিময় প্রদান করে না। আর যদি এটাকে বিচ্ছেদ না ধরা হয় তাহলে অবস্থাটা তেমনই থাকবে, যেমন দাবীর পূর্বে ছিল। সুতরাং সন্ধির বিনিময় দ্রব্যের বিপরীতে কোন কিছু সাব্যস্ত হলো না। তাই তা সিদ্ধ হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন অজ্ঞাত পরিচয় লোকের বিরুদ্ধে যদি কেউ দাবী উত্থাপন করে যে, সে তার গোলাম আর লোকটি (দাবী প্রত্যাখ্যান করল)

তাকে মাল দিয়ে তার সাথে সন্ধি করে নেয় তাহলে তা বৈধ হবে। আর দাবীদারের ক্ষেত্রে এটা হবে মালের বিনিময়ে আযাদ করার মতো।

কেননা তার ক্ষেত্রে তার ধারণার ভিত্তিতে এভাবে তার পদক্ষেপকে সিদ্ধ করা সম্ভব। একারণেই মেয়াদের সাথে সম্পৃক্ত করে অনির্ধারিত কোন পশুর বিনিময়ে সন্ধি করা বৈধ হয়।

আর বিবাদীর ক্ষেত্রে এটা হবে বিবাদ রহিত করার জন্য অর্থ ব্যয়। কেননা সে তো নিজেকে জন্মগত স্বাধীন দাবী করছে। সুতরাং এই অর্থ ব্যয় বৈধ হবে। তবে দাবীদারের অনুকূলে 'ওয়ালা' সাব্যস্ত হবে না। কেননা গোলাম অস্বীকার করছে। তবে (সন্ধি সম্পন্ন করার পর) যদি সে এই মর্মে বাইয়েনাহ পেশ করে যে, লোকটি তার গোলাম তাহলে বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে এবং ওয়ালা সাব্যস্ত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম যদি কোন লোককে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করে তাহলে নিজের জানের বিপরীতে মালের বিনিময়ে সন্ধি করা তার জন্য জায়িয হবে না। আর যদি তার কোন গোলাম ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করে আর সে ঐ গোলামের বিপরীতে মালের বিনিময়ে সন্ধি করে তাহলে তা বৈধ হবে। (দুটি মাসআলার মাঝে) পার্থক্যের কারণ এই যে, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের দাসসত্তা তার তেজারীতে মাল রূপে গণ্য নয়। এজন্যই বিক্রয়ের মাধ্যমে গোলাম তার দাসসত্তায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সুতরাং মনিবের মালের বিনিময়ে দাড়ানোর মাধ্যমে সে নিজের দাসসত্তার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বরং নিজের দাসসত্তার ব্যাপারে সে তৃতীয় ব্যক্তি (বা পর মানুষ) বলে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে তার নিজের গোলাম তার তেজারতি মালের অন্তর্ভুক্ত এবং ঐ গোলামের দাসসত্তায় তার বিক্রয়গত হস্তক্ষেপ কার্যকর। সুতরাং দাড়ানোর হস্তক্ষেপও কার্যকর হবে।

এটা একারণে যে, কিছাছ দ্বারা দন্ডিত গোলাম যেন তার মালিকানাচ্যুত, অতঃপর এটা যেন তাকে ক্রয় করা। সুতরাং সে এই হস্তক্ষেপের অধিকারী হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি 'ইয়াহুদী' বস্ত্র গসব করে, যার মূল্য একশ দিরহামের কম; অতঃপর সে তা হালাক করে ফেলে, পরে সে একশ দিরহামের বিনিময়ে সন্ধি করলো, তবে তা জায়িয হবে, আবু হানীফা (র)-এর মতে।

আর সাহেবায়ন বলেন, মূল্যের অতিরিক্তটুকু বাতিল হয়ে যাবে। যদি তা এত বেশী পরিমাণ হয়, যাতে মানুষ এ পরিমাণ খেসারত বরদাশত করে না। কারণ এক্ষেত্রে মূল্যই ওয়াজিব হয়। আর তা নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং ঐ মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণটুকু 'রিবা' হবে।

পক্ষান্তরে যদি কোন দ্রব্যের বিনিময়ে সন্ধি করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা দুই বস্তুর শ্রেণী ভিন্নতার সময় অতিরিক্ততা প্রকাশ পায় না (সুতরাং রিবা সাব্যস্ত হবে না)।

তদ্রূপ যে পরিমাণ খেসারত মানুষ বরদাশত করে, তাও ভিন্ন; তা মূল্য নির্ধারণকারীদের মূল্য নির্ধারণের আওতায় পড়ে যায়। সুতরাং অতিরিক্ততা প্রকাশ পাবে না।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, হালাক হওয়া বস্তুতে মালিকের হক বহাল থাকে। একারণেই গসবকৃত ও হালাক হাওয়া বস্তুটি যদি গোলাম হয়, আর মনিব তার মূল্য গ্রহণ না করে তাহলে তার কাফনের দায়িত্ব মনিবের উপর বর্তায়। (গছবকৃত বস্তু হালাক হওয়ার পর) মালিকে হক গসবকৃত বস্তুর দৃশ্যত ও গুণগত সদৃশ এর দিকে স্থানান্তরিত হয়। কেননা নষ্ট করায় ক্ষতিপূরণ সদৃশ দ্বারাই হয়। তবে কাযীর বিচার দ্বারা ক্ষতিপূরণ মূল্যের দিকে স্থানান্তরিত হবে। সুতরাং কাযীর বিচারের পূর্বে উভয়ে যদি মূল্যের অধিক পরিমাণের উপর সম্মত হয়ে যায়, তাহলে এটা হবে তার প্রাপ্য হকের বিনিময় গ্রহণ। সুতরাং এটা রিবা হবে না। পক্ষান্তরে আদালতীর ফায়সালার পরে সন্ধি করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তখন তার হক মূল্যের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, গোলাম যদি দু'জন মানুষের মাঝে শরীকানা হয় এবং দু'জনের একজন তাকে আযাদ করে দেয়, আর সে সচ্ছল হয়, অতঃপর অন্যজন তার সাথে গোলামের অর্ধেক মূল্যের চেয়ে বেশী পরিমাণের উপর সন্ধি করে তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণটা বাতিল হবে।

এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। সাহেবায়নের মতে এ কারণে যা আমরা পূর্ববর্তী মাসআলায় বর্ণনা করেছি।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে উভয় মাসআলার মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, এই রকম আযাদ করার ক্ষেত্রে অবশিষ্ট গোলামের মূল্য আদায় করার বিষয়টি শরীয়তের বাণী দ্বারা সাব্যস্ত। আর শরীয়তের নির্ধারণ কাযীর নির্ধারণের চেয়ে কম নয়। সুতরাং তার উপর অতিরিক্ত করা বৈধ হবে না।

পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা সেখানে মূল্যের বিষয়টি 'নাছ' (শরীয়তের বাণী) দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

আর যদি আযাদকারী ব্যক্তি দ্রব্যের বিনিময়ে তার সাথে সমঝোতা করে তাহলে তা বৈধ হবে। কারণ আমরা বর্ণনা করেছি যে, (শ্রেণী ভিন্নতার ক্ষেত্রে) অতিরিক্ততা প্রকাশ পায় না।

পরিচ্ছেদ ঃ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সন্ধি করা এবং উকীল হয়ে সন্ধি করা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে তার পক্ষ থেকে সন্ধি করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, আর সে সমঝোতা করে তাহলে উকীলের উপর লাযিম হবে না মুআক্কিলের পক্ষ থেকে সে যা সমঝোতা করেছে। তবে যদি সে যামিন হয়ে যায় তাহলে লাযিম হবে।

আর সন্ধির নির্ধারিত মাল মুআক্কিলের উপর লাযিম হবে।

মাসআলাটির ব্যাখ্যা এই যে, সমঝোতা যদি ইচ্ছাকৃত খুনের বিপরীতে হয়; কিংবা সমঝোতা যদি ঐ ঋণের আংশিকের বিনিময়ে হয়, যে ঋণ বাদী দাবী করছে।

কেননা এ সমঝোতা হলো নিছক রহিতকরণ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উকীল শুধু মুআক্কিলের বার্তাবাহক এবং বক্তব্য উচ্চারণকারী হবে। সুতরাং তার উপর কোন দায় আসবে না। যেমন বিবাহের উকীলের ক্ষেত্রে। তবে যদি সে নিজেই যামিন হয়ে যায়। কেননা তখন দায় গ্রহণ চুক্তির কারণে সে দায়বদ্ধ হবে, সমঝোতা চুক্তির কারণে নয়। পক্ষান্তরে সমঝোতা যদি মালের বিপরীতে মালের বিনিময়ে হয়, তাহলে তা বিক্রয় চুক্তির পর্যায়ভুক্ত হবে। ফলে চুক্তির যাবতীয় হক উকীলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তখন মালের তাগাদা উকীলের কাছে হবে; মুআক্কিলের কাছে নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন লোক যদি তার পক্ষ থেকে তার নির্দেশ ছাড়া সমঝোতা করে তাহলে তার চারটি সূরত হতে পারে। যদি মালের বিনিময়ে সমঝোতা করে নিজেই যামিন হয়, তাহলে সমঝোতা সম্পন্ন হবে।

কেননা এই সমঝোতা দ্বারা বিবাদীর অনুকূলে শুধু দায়মুক্তি অর্জিত হয়েছে। আর দায়মুক্তির ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তি ও বিবাদী সমান। সুতরাং যদি সে দায় গ্রহণ করে তাহলে সে সমঝোতা চুক্তির মূল পক্ষ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যেমন (স্ত্রীর পক্ষ হতে) ফুযূলী (অনাহুত ব্যক্তি) খোলার বিনিময়ে দ্রব্যের দায় গ্রহণ করে।

আয় সমঝোতাকারী তৃতীয় ব্যক্তি বিবাদীর জন্য অনুগ্রহকারী হবে।

যেমন কেউ যদি স্বেচ্ছায় কারো ঋণ পরিশোধ করে। পক্ষান্তরে যদি তার আদেশে সমঝোতা করে (তাহলে রুজু করতে পারবে)।

আর দাবীকৃত বস্তুর কোন অংশ এই সমঝোতাকারী (তৃতীয়) ব্যক্তির হবে না। বরং তা ঐ (বিবাদী) ব্যক্তিরই হবে, যার কবজায় তা রয়েছে।

কেননা এই সমঝোতা চুক্তিকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে, রহিতকরণের ভিত্তিতে।

(সমঝোতাকারী (তৃতীয়) ব্যক্তি দাবীকৃত বস্তুর মালিক না হওয়ার) এই বিধানের ক্ষেত্রে বিবাদী স্বীকারোক্তিকারী বা অস্বীকারকারী হওয়াতে কোন পার্থক্য নেই।

তদ্রূপ যদি তৃতীয় ব্যক্তি বাদীকে বলে যে, আমি আমার এই এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে কিংবা আমার এই গোলামের বিনিময়ে তোমার সাথে সমঝোতা করছি, তাহলে সমঝোতা সিদ্ধ হবে এবং তা অর্পণ করা তার উপর লাযিম হবে।

কেননা সমঝোতাকে যখন সে নিজের মালের দিকে সম্পৃক্ত করেছে তখন সে তা অর্পণ করার দায় গ্রহণ করেছে। সুতরাং সমঝোতা সিদ্ধ হয়ে যাবে।

তদ্রূপ যদি বলে (আমি তোমার সাথে) এক হাযারের বিনিময়ে (সমঝোতা করলাম) এবং বাদীকে এক হাযার অর্পণ করে দেয়।

কেননা বাদীর হাতে অর্পণ করা তার অনুকূলে বিনিময় দ্রব্য নিষ্কন্টক হওয়া সাব্যস্ত করে। সুতরাং বাদীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার কারণে সমঝোতা চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

আর যদি বলে যে, আমি তোমার সাথে এক হাযারের বিনিময়ে সমঝোতা করলাম, (কিন্তু এক হাযার বাদীকে অর্পণ না করে) তাহলে সমঝোতা চুক্তি স্থগিত থাকবে। বিবাদী যদি তা অনুমোদন করে তাহলে বৈধ হবে এবং এক হাযার তার উপর লাযিম হবে। আর অনুমোদন না করলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা বিবাদীই হলো চুক্তির মূল পক্ষ। কারণ বিবাদ নিরসন তার অনুকূলেই অর্জিত হচ্ছে। তবে ফুযূলী ব্যক্তি নিজের দিকে দায়বদ্ধতা সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মূল পক্ষরূপে গণ্য হয়। সুতরাং যখন সে নিজের দিকে দায় সম্পৃক্ত করল না তখন সে বিবাদীর পক্ষ হতে চুক্তিকারী বলেই সাব্যস্ত হবে এবং তার অনুমোদনের উপর সেটার বৈধতা নির্ভর করবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আরেকটি সূরত এই যে, তৃতীয় ব্যক্তিটি বললো, আমি এই এক হাযারের বিনিময়ে কিংবা এই গোলামের বিনিময়ে তোমার সাথে সন্ধি করছি, **কিন্তু বস্তুটিকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করল না (সেক্ষেত্রে সমঝোতা সিদ্ধ হবে।)**

কেননা যখন সে অর্পণের জন্য বস্তুটিকে নির্ধারণ করলো তখন সে বাদীর অনুকূলে বস্তুটির নিষ্কন্টকতার দায় গ্রহণকারী হলো, সুতরাং তার এই বক্তব্য দ্বারা সমঝোতা চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

আর যদি গোলামটির হকদার দেখা দেয় কিংবা বাদী তাতে কোন দোষ পায় এবং গোলামটিকে ফেরত দিয়ে দেয়, তাহলে সমঝোতাকারীর উপর বাদীর কোন দায় **আরোপ করা চলবেনা।**

কেননা সে তো নির্ধারিত 'পাত্র' পরিশোধ করার দায় গ্রহণ করেছিলো, এছাড়া অন্য কিছুর দায় গ্রহণ করেনি। সুতরাং পাত্রটি যদি নিষ্কন্টক থাকে তাহলে সমঝোতা সম্পন্ন হবে। আর যদি ত্রুটি মুক্ত না হয় তাহলে সমঝোতাকারীর কাছে কোন কিছু রুজু করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে যদি নির্ধারিত দিরহাম-এর বিনিময়ে সমঝোতা করে এবং তার দায় গ্রহণ করে আর তা অর্পণ করে, অতঃপর ঐ দিরহামগুলোর হকদার দেখা দেয় কিংবা সেগুলোকে সে দোষযুক্ত দেখতে পায়, তাহলে সে তার কাছে রুজু করতে পারবে।

কেননা দায়গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে সে মূল পক্ষ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই তো তাকে নির্ধারিত দিরহাম অর্পণ করতে বাধ্য করা যায়। সুতরাং অর্পণকৃত দিরহাম যখন বাদীর অনুকূলে নিষ্কন্টক হলো না, তখন সে তার কাছে সন্ধির বিনিময় দ্রব্য দাবী করবে।

পরিচ্ছেদ ঃ ঋণের বিপরীতে সমঝোতা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, লেনদেন চুক্তি দ্বারা প্রাপ্য যে কোন মুদ্রাদ্রব্যের বিনিময়ে সমঝোতা সম্পন্ন হয়, সেটাকে বিনিময়রূপে গণ্য করা হবে না। বরং এই অর্থে গ্রহণ করা হবে যে, সে তার প্রাপ্য হক-এর অংশ বিশেষ উশুল করেছে আর অবশিষ্টাংশ রহিত করে দিয়েছে। যেমন কোন ব্যক্তির অন্য কারো কাছে এক হাযার দিরহাম পাওনা ছিলো, অতঃপর সে তার সাথে পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে সমঝোতা করল, তদ্রূপ যেমন কোন ব্যক্তির অন্য কারো কাছে উৎকৃষ্ট এক হাযার দিরহাম পাওনা ছিলো, আর সে তার সাথে 'দোষমুক্ত' পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে সমঝোতা করলো, তাহলে এই সমঝোতা সিদ্ধ হবে। যেমন সে তাকে নিজের আংশিক প্রাপ্য থেকে দায়মুক্ত করে দিলো।

এটাকে বিনিময় সাব্যস্ত না করার কারণ এই যে, আকল সম্পন্ন ব্যক্তির পদক্ষেপকে সিদ্ধতা প্রদানের যথা সম্ভব চেষ্টা করা কর্তব্য। আর বিনিময় হিসাবে এটাকে সিদ্ধতা দানের কোন উপায় নেই। কেননা তা 'রিবায়' পর্যবসিত হয়। তাই প্রথম মাসআলায় এটাকে আংশিক হক রহিতকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় মাসআলায় আংশিক হক এবং উৎকৃষ্টতার গুণ রহিতকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আর যদি মেয়াদ সম্পন্ন এক হাযারের বিনিময়ে সমঝোতা করে তবে তা জায়িয হবে এবং ধরা হবে যেন সে তার নিজস্ব হককে বিলম্বিত করেছে।

কেননা এটাকে বিনিময় সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, দিরহামকে অনুরূপ দিরহামের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করা জায়িয নেই। তাই এটাকে আমরা বিলম্বিত করণের উপর প্রয়োগ করেছি।

আর যদি (উদাহরণ স্বরূপ) এক মাসের মেয়াদে কিছু দীনারের বিনিময়ে সমঝোতা করে তাহলে জায়িয হবে না।

কেননা লেনদেন চুক্তির মাধ্যমে দীনার তার প্রাপ্য নয়। সুতরাং তা তার প্রাপ্য হককে বিলম্বিত করণের উপর প্রযুক্ত করা সম্ভব নয়। আর বিনিময় ছাড়া আর কিছু সাব্যস্ত করার অবকাশ নেই। অথচ বাকীতে দীনারের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা জায়িয নয়। সুতরাং সমঝোতা সিদ্ধ হলো না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি তার মেয়াদ সম্পন্ন এক হাযার দিরহাম পাওনা থাকে আর সে নগদ পাঁচশয়ের বিনিময়ে সমঝোতা করে তাহলে জায়িয হবে না।

কেননা মেয়াদীর চেয়ে নগদ উত্তম। আর চুক্তি দ্বারা নগদ পাওনা হয়নি। সুতরাং 'মেয়াদ' ঐ অংশের বিনিময়ে হবে যা তার থেকে হ্রাস করেছে। আর তা হয়ে যায় মেয়াদের বিনিময় গ্রহণ, যা হারাম।

আর যদি এক হাযার 'কৃষ্ণ দিরহাম' তার পাওনা থাকে, অতঃপর পাঁচশ 'শুভ্র দিরহামের' বিনিময়ে সমঝোতা করল তাহলে তা জায়িয হবে না।

কেননা লেনদেন চুক্তি দ্বারা তা প্রাপ্য হয় নি। আর শুভ্রতা হলো দিরহামের একটি অতিরিক্ত গুণ। সুতরাং এক হাযার হবে পাঁচশ দিরহামের এবং একটি অতিরিক্ত গুণের বিনিময়। আর তা হলো রিবা।

পক্ষান্তরে যদি এক হাযার শুভ্র দিরহামের বিপরীতে পাঁচশ কৃষ্ণ দিরহামের বিনিময়ে সমঝোতা করে তাহলে বৈধ হবে। কেননা এটা হলো পরিমাণ ও গুণ-এর দিক থেকে নিজের আংশিক হক রহিতকরণ।

তদ্রূপ যদি ঋণের সমপরিমাণের বিনিময়ে সমঝোতা করে, আর (ঋণের তুলনায়) সমঝোতার বিনিময় দ্রব্য উৎকৃষ্ট হয় তাহলে জায়িয হবে। কেননা এটা হলো সমপরিমাণের পরিবর্তে সমপরিমাণের বিনিময়। আর গুণের বিষয়টি বিবেচ্য নয়। তবে মজলিসের মধ্যে কবজা করা শর্ত হবে।

আর যদি বিবাদীর কাছে এক হাযার দিরহাম এবং একশ দীনার পাওনা থাকে, অতঃপর নগদ বা এক মাসের মেয়াদী একশ দিরহামের বিনিময়ে সমঝোতা করে, তাহলে সমঝোতা সিদ্ধ হবে।

কেননা সমগ্র দীনারকে এবং একশ কম এক হাযারকে রহিতকরণ সাব্যস্ত করা সম্ভব আর অবশিষ্ট একশকে মেয়াদ সম্পন্ন সাব্যস্ত করা সম্ভব। সুতরাং সমঝোতা চুক্তিকে বৈধতা দানের জন্য এটাকে বিনিময় সাব্যস্ত করা হবে না।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে রহিতকরণের গুণটি অধিকতর সুসাব্যস্ত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কারো যদি অন্য কারো কাছে এক হাযার দিরহাম পাওনা থাকে, আর সে দেনাদারকে বলে যে, তা থেকে পাঁচশ দিরহাম এই শর্তে আগামীকাল আমাকে পরিশোধ কর যে, অবশিষ্ট পরিমাণ থেকে তুমি দায়মুক্ত হবে, তাহলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এরপর আগামীকাল যদি তাকে পাঁচশ দিরহাম পরিশোধ না করে তাহলে এক হাযারের দায় প্রত্যাবর্তন করবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এক হাযার তার উপর প্রত্যাবর্তন করবে না।

কেননা এটা হলো নিঃশর্ত দায়মুক্তি। দেখুন না সে পাঁচশ দিরহামের পরিশোধকে মুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত করেছে। কেননা সে (আরবীতে) على অব্যয় উল্লেখ করেছে। আর তা বিনিময় সাব্যস্ত করে। আর পাঁচশ-এর পরিশোধ বিনিময় হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা। কেননা সেটা তো তার উপর প্রাপ্যই রয়েছে। সুতরাং এটার অস্তিত্ব অনস্তিত্বের মত হবে। ফলে নিঃশর্ত দায়মুক্তি বিদ্যমান থাকল। সুতরাং এক হাযার প্রত্যাবর্তন করবে না। যেমন দায়মুক্তির শব্দ দিয়ে বক্তব্য শুরু করার ক্ষেত্রে।

তারফায়নের দলীল এই যে, এটা হলো শর্ত দ্বারা আবদ্ধ দায়মুক্তি। সুতরাং শর্তের অনুপস্থিতি দ্বারা দায়মুক্তি অনুপস্থিত হবে। কেননা সে আগামীকাল পাঁচশ দিরহাম পরিশোধ করা দিয়ে বক্তব্য শুরু করেছে। আর তা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কারণ বিবাদীর দেউলিয়া হওয়ার আশংকা হতে পারে। কিংবা তার চেয়ে অধিকতর লাভজনক ব্যবসার পুঁজির মাধ্যম হতে পারে।

আর على অব্যয়টি বিনিময়ের অর্থজ্ঞাপক যেমন তেমনি শর্তের সম্ভাবনাপূর্ণ। কেননা শর্তের মধ্যে মোকাবেলার অর্থ রয়েছে। সুতরাং বিনিময়ের অর্থে প্রযুক্ত করা অসম্ভব হলে শর্তের অর্থে প্রযুক্ত করা হবে। তার পদক্ষেপ বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। কিংবা বলা যায় যে, শর্তের অর্থটি লোক প্রচলিত। আর দায়মুক্ত করণকে শর্ত দ্বারা আবদ্ধ করা হয়ে থাকে। যদিও শর্তের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। যেমন, হাওয়ালার বিষয়টি।

আর দায়মুক্তি দ্বারা বক্তব্য শুরু করার বিষয়টি ইনশাআল্লাহ্ আমরা ব্যাখ্যা করবো।

হিদায়া গন্থকার বলেন, এই মাসআলাটি কয়েকটি সূরত বিশিষ্ট। তন্মধ্যে একটি তা যা আমরা আলোচনা করেছি। আর দ্বিতীয়টি এই যে, পাওনাদার যদি বলে, আমি তোমার সাথে এক হাযারের বিপরীতে পাঁচশ-এর বিনিময়ে সমঝোতা করলাম, যা তুমি আগামীকাল আমাকে পরিশোধ করবে। আর তুমি অবশিষ্ট পরিমাণ থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এই শর্তে যে, যদি আগামীকাল আমাকে তা পরিশোধ না করো তাহলে তোমার উপর এক হাযারের দায় যথা অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে।

এর বিধান এই যে, বিষয়টি সে যেমন বলেছে, তেমনই হবে। কেননা শর্ত দ্বারা আবদ্ধ করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছে। সুতরাং তা কার্যকর হবে।

তৃতীয় সূরত এই যে, যদি সে বলে, তোমাকে আমি এক হাযারের পাঁচশ থেকে দায়মুক্ত করলাম এই শর্তে যে, পাঁচশ দিরহাম আমাকে আগামীকাল প্রদান করবে।

এ ক্ষেত্রে দায়মুক্তি সাব্যস্ত হয়ে যাবে, পাঁচশ দিরহাম প্রদান করুক বা না করুক। কেননা (দায়মুক্তির কথাকে অগ্রবর্তী করার কারণে বলা হবে যে,) প্রথমে দায়মুক্তিকে সে নিঃশর্ত রেখেছে। আর পাঁচশ দিরহামের পরিশোধ নিঃশর্ত বিনিময় হতে পারে না। তবে শর্ত হতে পারে। সুতরাং শর্ত দ্বারা আবদ্ধ করার বিষয়টিতে সন্দেহ এসেছে। সুতরাং তা শর্ত দ্বারা আবদ্ধ হবে না।

পক্ষান্তরে পাঁচশ দিরহাম পরিশোধের কথা দিয়ে বক্তব্য শুরু করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দায়মুক্তির বিষয়টি পাঁচশ-এর পরিশোধের সাথে যুক্ত অবস্থায় উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং এই হিসাবে দায়মুক্তির বিষয় নিঃশর্ত হয় যে, পাঁচশ দিরহামের পরিশোধ দায়মুক্তির বিনিময় হতে পারে। পক্ষান্তরে যেহেতু তা শর্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে সেহেতু দায়মুক্তি নিঃশর্ত হতে পারে না। সুতরাং সন্দেহের কারণে নিঃশর্ততা সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং দু'টি পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

চতুর্থ এই যে, যদি সে বলে, আমাকে পাঁচশ পরিশোধ করো এই শর্তে যে, তুমি অবশিষ্ট থেকে দায়মুক্ত। আর আদায় করার জন্য কোন সময় সে বেঁধে দিলো না।

এর বিধান এই যে, দায়মুক্ত করা সিদ্ধ হবে এবং ঋণ ফিরে আসবে না।

কেননা এটা হলো নিঃশর্ত দাযমুক্তকরণ। কারণ পরিশোধের জন্য যখন কোন সময় বেঁধে দিল না তখন পরিশোধের বিষয়টি বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য বলে সাব্যস্ত হলো না। কেননা পরিশোধ তো দেনাদারের উপর সময়সীমা ছাড়া ওয়াজিব রয়েছেই। সুতরাং দায়মুক্তির বিষয়টি আবদ্ধ হবে না। বরং পাঁচশ-এর পরিশোধকে বিনিময় বলে ধরা হবে। অথচ তা বিনিময় হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা।

পক্ষান্তরে (সময়াবদ্ধ) পূর্ববর্তী মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা আগামীকালের মধ্যে পরিশোধের শর্ত একটি বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য।

পঞ্চম সূরত এই যে, (সরাসরি শর্তবাচক অব্যয় দ্বারা যুক্ত করে) বলে, যদি তুমি পাঁচশ দিরহাম পরিশোধ কর কিংবা যখন তুমি পরিশোধ করবে। এ ক্ষেত্রে বিধান এই যে, দায়মুক্তকরণ বৈধ হবে না। কেননা দায়মুক্তিকে সে স্পষ্টভাবে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর দায়মুক্তিকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বাতিল। কেননা দায়মুক্তিতে মালিক বানানোর দিক রয়েছে। তাই অপর পক্ষ রদ করলে তা রদ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী সূরতটি ভিন্ন। কেননা সেখানে শর্ত স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করেনি। তাই সেটাকে শর্ত দ্বারা সম্পৃক্ত করার উপর প্রযুক্ত করা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি অন্য একজনকে বলে যে, আমি তোমার মাল সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করবো না যতক্ষণ না তুমি তা বিলম্বিত কর কিংবা আমার থেকে হ্রাস কর আর সে তা করল। তাহলে এটা বৈধ হবে এবং তার উপর তা লাযিম হবে।

কেননা পাওনাদার এটা করতে জবরদস্তি করেনি। আর মাসআলাটির অর্থ এই যে, যদি সে তা গোপনে বলে। পক্ষান্তরে প্রকাশ্যে যদি বলে তাহলে তাকে পাকড়াও করা হবে।

শরীকানার ঋণ

ঋণ যদি দুই শরীকের মাঝে বিদ্যমান হয়, আর তাদের একজন তার অংশের বিপরীতে একটি কাপড়ের বিনিময়ে সমঝোতা করে তাহলে তার শরীকদারের ইচ্ছাধিকার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে তার পাওনা অর্ধেকের ব্যাপারে দেনাদারকে তাগাদা করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে কাপড়ের অর্ধেক নিতে পারে। তবে যদি সমঝোতাকারী শরীকদার তার অনুকূলে চতুর্থাংশ ঋণের দায় গ্রহণ করে।

এ মাসআলায় মূলনীতি এই যে, দু'জনের মাঝে শরীকানার ঋণ থেকে একজন যদি কিছু গ্রহণ করে তখন কবজাকৃত অংশে অপর জনের শরীক হওয়ার অধিকার থাকে।

কেননা 'কবজা' দ্বারা ঋণটির মান বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ ঋণের সম্পদ গুণ হল কবজায় পরিণামের বিবেচনায়। আর এই বৃদ্ধি মূল 'হক'-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং এটা শরীকানার দাসীর ক্ষেত্রে সন্তান বৃদ্ধি এবং শরীকানার বৃক্ষের ক্ষেত্রে ফল বৃদ্ধির মত হলো। সুতরাং অপর শরীকের তাতে অংশ লাভের হক সাব্যস্ত হবে। তবে অংশগ্রহণের পূর্বে সেটা কবজাকারীর মালিকানায় বিদ্যমান থাকবে। কেননা নির্ধারিত বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে ঋণ থেকে ভিন্ন। আর সেটাকে সে তার হকের বদল রূপে গ্রহণ করেছে; সুতরাং সে তার মালিক হবে, এমন কি তাতে তার হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে। তবে সে তার শরীকের হিসসায় যামিন হবে।

আর শরীকানা ঋণ হল যা ওয়াজিব হয় অভিন্ন কারণে। যেমন একই চুক্তিতে ক্রয়কৃত দ্রব্যের মূল্য ও শরীকানা সম্পদের মূল্য এবং দু'জনের মাঝে লব্ধ মীরাছ। আর শরীকানা বস্তু (কারো দ্বারা) হালাক হওয়ার কারণে প্রাপ্ত মূল্য।

এই মূলনীতি যখন জানা গেলো তখন কিতাবে আলোচিত মাসআলা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, শরীকদারের অধিকার রয়েছে মূল ঋণের দেনাদারের কাছে তাগাদা করার।

কেননা দেনাদারের যিম্মায় তার পাওনা অবশিষ্ট রয়েছে। কারণ কবযাকারী তো তার পাওনা হিসসা কবযা করেছে। তবে তার শরীকানা দাবী করার অধিকার রয়েছে।

আর যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে কাপড়ের অর্ধেক গ্রহণ করতে পারে। কারণ তার শরীকানার হক রয়েছে, তবে যদি তার শরীকদার তার অনুকূলে ঋণের চতুর্থাংশের দায় গ্রহণ করে। (তখন অর্ধেক কাপড় গ্রহণের ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে না।)

কেননা তার হক তো এতটুকুর মধ্যেই রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দু'জনের একজন যদি ঋণ থেকে তার প্রাপ্য হিসসার অর্ধেক উশুল করে, তাহলে যে পরিমাণ সে কবজা করেছে তাতে শরীক হওয়ার অধিকার শরীকদারের থাকবে। কারণ তা-ই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

অতঃপর অবশিষ্ট ঋণের ব্যাপারে উভয়ে দেনাদারের কাছে রুজু করবে।

কেননা উভয়ে যখন কবজাকৃত অংশে শরীক হলো তখন অনিবার্যভাবেই অবশিষ্ট ঋণ শরীকানার উপর বহাল থাকবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দুই শরীকের একজন যদি ঋণ থেকে তার প্রাপ্য অংশের বিনিময়ে কোন পণ্য ক্রয় করে, তাহলে অপর শরীকের অধিকার থাকবে তার উপর ঋণের চতুর্থাংশের দায় আরোপ করার।

কেননা সে কাটাকাটির মাধ্যমে (কোনরূপ ছাড় দেয়া ছাড়া) তার হক পূর্ণরূপে কবজা করে নিয়েছে। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তি দরকষাকষির উপর। পক্ষান্তরে সমঝোতার ভিত্তি হলো ভ্রূক্ষেপ না করা ও ছাড় দেয়ার উপর। সুতরাং সমঝোতাকারীর উপর যদি ঋণের চতুর্থাংশে পরিশোধের দায় আরোপ করি তাহলে তা দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেজন্যই সমঝোতার মাধ্যমে কবজাকারী ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। যেমন আগে আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কাপড়ের উপর অপর শরীকদারের হক দাবী করার কোন উপায় নেই। কেননা সে তার নিজের পক্ষ হতে সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা সেটার মালিকানা লাভ করেছে। আর ঋণ উশুল করা সাব্যস্ত হয়েছে। (প্রত্যক্ষভাবে নয় বরং) পণ্যের মূল্য এবং ঋণের মাঝে কাটাকাটির মাধ্যমে।

আর আমাদের উল্লেখকৃত সকল সূরতে অপর শরীকদারের অধিকার রয়েছে দেনাদারের কাছে তাগাদা করার। কেননা দেনাদারের যিম্মায় তার হক বাকী রয়ে গেছে। কারণ, কবজাকারী প্রকৃত পক্ষে তার হিসসা উশুল করেছে; তবে তার শরীকানা দাবী করার ইচ্ছাধিকার রয়েছে; সুতরাং তার সাথে শরীক না হওয়ারও ইচ্ছাধিকার থাকবে।

অপর শরীকদার যদি কবযাকারীর কবযা মেনে নেয়, এরপর দেনাদারের কাছে যা অবশিষ্ট ছিলো তা হালাক হয়ে যায়; তাহলে তার অধিকার থাকবে কবযাকারীর কাছে শরীকানা দাবী করার।

কেননা সে তো শরীকদারের কবজা মেনে নিতে সম্মত হয়েছিলো এজন্য যে, দেনাদারের যিম্মায় যা রয়েছে, তা সে পুরোপুরি পাবে। অথচ তা নিরাপদ হয়নি।

আর যদি কাটাকাটি হয় ঐ ঋণের বিনিময়ে যা দেনাদারের অনুকূলে শরীকদারের প্রতিকূলে ইতিপূর্বে সাব্যস্ত ছিলো তাহলে অপর শরীকদার এই শরীকদারের কাছে রুজু করতে পারবে না। কেননা সে তার হিসসা দ্বারা ঋণ আদায়কারী হচ্ছে, ঋণ উশুলকারী হচ্ছে না।

দুই শরীকের একজন যদি দেনাদারকে তার অংশ থেকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে একই বিধান হবে। কেননা দায়মুক্ত করার অর্থ হলো 'হালাক' করা, উশুল করা নয়।

যদি সে দেনাদারকে নিজের প্রাপ্য অংশের আংশিক থেকে দায়মুক্ত করে দেয়, তাহলে অবশিষ্ট ঋণ অবশিষ্ট হিসসা অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

আর যদি দু'জনের একজন তার হিসসার তাগাদা বিলম্বিত করে, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) -এর মতে তা সিদ্ধ হবে। এটা তিনি বলেন সাধারণ (ও পূর্ণ) দায়মুক্তির উপর কিয়াস করে।

আর তারফায়নের মতে তা বৈধ হবে না। কেননা এটা কবজা করার পূর্বে ঋণকে ভাগ করা অনিবার্য করে।

আর যদি দুই শরীকের একজন দেনাদারের কাছ থেকে কোন বস্তু গসব করে নেয় কিংবা ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে ক্রয় করে অত:পর গসবকৃত বা ক্রয়কৃত বস্তুটি তার হাতে থাকা অবস্থায় হালাক হয়ে যায়, তাহলে এটাকে পাওনা অংশের কথা বলে গণ্য করা হবে।

আর নিজের পাওনা হিসসার বিনিময়ে কোন কিছুকে ভাড়া নেওয়া পাওনা অংশের কবজা গ্রহণ বলেই গণ্য হবে। তদ্রূপ ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে (দেনাদারের কোন বস্তু) জ্বালিয়ে ফেলাও (পাওনা অংশের) কবজা করা বলে গণ্য হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

পক্ষান্তরে জাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী পাওনা অংশের বিনিময়ে দেনাদারের স্ত্রীলোককে বিবাহ করার অর্থ হবে মাল হালাক করা।

তদ্রূপ ইচ্ছাকৃত অপরাধের পরিবর্তে ঋণের প্রাপ্য হিসাবে বিনিময়ে সমঝোতা করাকেও নিজের হিসসা নষ্ট করা বলেই গণ্য করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দাদন চুক্তির (সালাম চুক্তির) দাদন বস্তু (مسلم فيه) যদি দুই শরীকের মধ্যে হয়, আর দুজনের একজন যদি প্রদত্ত পুঁজির (নিজের অংশের) বিনিময়ে দাদন বস্তুর নিজের পাওনা হিসসার ব্যাপারে সমঝোতা করে নেয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তা জায়িয হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এই সমঝোতা বৈধ হবে।

এটাকে তিনি অন্য সকল ঋণের উপর কিয়াস করেন এবং ঐ সূরতের উপর কিয়াস করেন যখন দুজন লোক একটি গোলাম একই চুক্তিতে খরিদ করে অত:পর একজন তার হিসসার ক্ষেত্রে ইকালাহ (বা বিক্রয় প্রত্যাহার) করে।

তারফায়নের দলীল এই যে, যদি বিশেষভাবে তার হিসসার ক্ষেত্রে এই সমঝোতা স্থির হয় তাহলে যিম্মায় থাকা অবস্থায় (অর্থাৎ কবজা গ্রহণ করার পূর্বে) ঋণের বিভাজন সাব্যস্ত হয় (যা বৈধ নয়)। পক্ষান্তরে যদি উভয়ের হিসসার ক্ষেত্রে এই সমঝোতাকে সিদ্ধ ধরা হয় তাহলে অপর জনের সম্মতি বা অনুমোদন অপরিহার্য।

আর কোন নির্দিষ্ট বস্তু (যেমন গোলাম) খরিদ করার বিষয়টি ভিন্ন। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, দাদন বস্তু ঋণ রূপে অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে, দাদন চুক্তির মাধ্যমে আর চুক্তিটি অস্তিত্ব লাভ করেছে উভয়ের মাধ্যমে। সুতরাং দুজনের একজন এককভাবে সেই চুক্তি প্রত্যাহার করার অধিকারী হতে পারে না।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই সমঝোতা যদি বৈধ হয় তাহলে উশুলকৃত দাদন পুঁজিতে অপর শরীকদারও শরীক হবে। আর যখন সে তাতে তার শরীকদার হল তখন সমঝোতাকারী ঐ পরিমাণ দাদন বস্তুর ব্যাপারে দাদন গ্রহণকারীর কাছে রুজু করবে। ফলে তা দাদনচুক্তি রহিত হওয়ার পর পুন: সাব্যস্ত হওয়াকে অনিবার্য করবে।

পরবর্তী মাশায়েখগণ বলেছেন, এই মতপার্থক্য হবে তখন যখন উভয় শরীকদার নিজেদের পুঁজি মিশ্রিত করে চুক্তি সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে যদি পুঁজি মিশ্রিত না করে উভয়ে আলাদাভাবে চুক্তি সম্পন্ন করে তাহলে প্রথম সূরতে সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মত হবে।

তাখারুজ (হক থেকে খারিজ হওয়া) প্রসঙ্গে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মীরাছ যদি কয়েকজন ওয়ারিছের মাঝে বিদ্যমান থাকে এবং তারা তাদের একজনকে কিছু মাল দিয়ে মীরাছ থেকে খারিজ করে আর মীরাছ স্থাবর সম্পত্তি বা দ্রব্যাটি হয় তাহলে এটা জায়িয । তাকে প্রদত্ত মাল অল্প হোক বা বেশী।

কেননা এ পদক্ষেপকে বিক্রয় হিসেবে বিশুদ্ধতা দান সম্ভব।

আর এ সম্পর্কে হযরত উসমান (রা)-এর আছর (বা ছাহাবী বাণী) রয়েছে। কেননা তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর স্ত্রী তামাযির আশজাঈয়ার সাথে তার প্রাপ্য অষ্টমাংশের চতুর্থাংশ সম্পর্কে আশি হাযার দীনারের বিনিময়ে সমঝোতা করেছিলেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর মীরাছ যদি হয় রৌপ্য এবং তাকে প্রদান করে স্বর্ণ, কিংবা মীরাছ যদি হয় স্বর্ণ, আর তাকে প্রদান করে রৌপ্য তাহলে একই বিধান হবে।

কেননা এটা হলো এক শ্রেণীকে তার ভিন্ন শ্রেণীর বিনিময়ে বিক্রি। সুতরাং সমতা বিবেচ্য নয়। তবে একই মজলিসে উভয় পক্ষের কবজা বিবেচ্য হবে। কেননা এটা হলো 'ছারফ' চুক্তি। তবে যে ওয়ারিছের কাছে অবশিষ্ট মীরাছ রয়েছে সে যদি (মীরাছ তার দখলে থাকার বিষয়ে) অস্বীকারকারী হয়, তাহলে পূর্ববর্তী কবজাই যথেষ্ট হবে। (কবজা নবায়ন জরুরী হবে না)। কেননা এটা হল আমানতি কবজা। সুতরাং তা সমঝোতা কবজা এর স্থলবর্তী হবে না।

আর যদি মীরাছ স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং অন্যান্য দ্রব্য হয় আর রৌপ্য বা স্বর্ণের বিনিময়ে ওয়ারিছগণ তার সাথে সমঝোতা করে তাহলে যা তাকে প্রদান করেছে তার পরিমাণ তার ঐ শ্রেণীর প্রাপ্য হিসসা থেকে বেশী হতে হবে, যাতে তার ঐ শ্রেণীর প্রাপ্য হিসসা তার সমপরিমাণের বিনিময়ে হয়। আর অতিরিক্ত অংশ অবশিষ্ট মীরাছ থেকে তার প্রাপ্য হকের বিনিময়ে হয়।

এমন করা হবে রিবা থেকে বাঁচার জন্য। আর ঐ পরিমাণ অংশে উভয় পক্ষের দখল অপরিহার্য হবে, যা স্বর্ণ ও রৌপ্য থেকে তার প্রাপ্য হিসসার বিপরীতে হবে। কেননা এই পরিমাণ অংশে 'বায় ছারফ' হচ্ছে।

আর যদি সমঝোতার বিনিময় দ্রব্যটি (স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া) সাধারণ কোন দ্রব্য হয় তাহলে রিবার সম্ভাবনা না থাকার কারণে নিঃশর্ত রূপেই বৈধ হবে।

আর যদি মীরাছ হয় দিরহাম ও দীনার এবং সমঝোতার বিনিময়ও হয় দিহরাম ও দীনার, তাহলে (বিনিময় পরিমাণ) যেরূপই হোক সমঝোতা বৈধ হবে।

কেননা এক শ্রেণীকে তার ভিন্ন শ্রেণীর দিকে অভিমুখী করা হবে। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন করা হয়। তবে 'বায় ছারফ' হওয়ার কারণে (মজলিসে) উভয় পক্ষের কবজা শর্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি উত্তরাধিকার সম্পর্কে মানুষের কাছে প্রাপ্য ঋণও অন্তর্ভুক্ত থাকে আর সেটাকে তারা সমঝোতার অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এই শর্তে যে, সমঝোতাকারীকে তারা ঋণের প্রাপ্ত অধিকার থেকে খারিজ করবে আর ঋণ তাদের প্রাপ্য হয়ে যাবে, তাহলে এই সমঝোতা বাতিল গণ্য হবে।

কেননা এতে (পাওনাদারের পক্ষ হতে) দেনাদার ছাড়া অন্য কাউকে ঋণের মালিক বানানো হচ্ছে। আর সেই ঋণটাই হলো সমঝোতাকারীর হিসসা।

আর যদি ওয়ারিছগণ শর্ত আরোপ করে যে, সমঝোতাকারী দেনাদারদেরকে ঋণ থেকে দায়মুক্ত করে দেবে, আর ওয়ারিছগণ দেনাদারদের থেকে সমঝোতাকারীর হিসসা দাবী করবে না তাহলে সমঝোতা জায়িয হবে।

কেননা এটা হচ্ছে, নিজের প্রাপ্য রহিতকরণ। কিংবা যার কাছে ঋণ পাওনা ছিলো তাকেই ঋণের মালিকানা প্রদান আর তা জায়িয রয়েছে। বস্তুত: এটা সমঝোতাকে বৈধতা প্রদানের কৌশল বিশেষ।

আরেকটি কৌশল এই যে, ওয়ারিছগণ স্বেচ্ছাদাতা হিসাবে সমঝোতাকারীকে তার প্রাপ্য ঋণের অংশ আগেই পরিশোধ করে দেয়। উভয় অবস্থায় অবশিষ্ট ওয়ারিছগণের জন্য ক্ষতি। তবে সবচেয়ে উত্তম সূরত এই যে, সমঝোতাকারীকে তারা তার প্রাপ্য ঋণের হিসসা পরিমাণ করয প্রদান করবে। আর ঋণ ছাড়া অন্যান্য সম্পদ এর ক্ষেত্রে সমঝোতা সম্পন্ন করবে। আর সমঝোতাকারী ওয়ারিছদেরকে হাওয়ালা প্রদান করবে। যেন তারা দেনাদারদের কাছ থেকে তার প্রাপ্য ঋণের অংশ উশুল করে নেয়।

আর যদি উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ঋণ না থাকে আর উত্তরাধিকার সম্পত্তির প্রকার অজ্ঞাত থাকে। আর কায়লী বা ওজনী দ্রব্যের বিনিময়ে সমঝোতা হয় তাহলে কেউ কেউ বলেছেন, 'রিবা'-এর সম্ভাবনার কারণে তা বৈধ হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন তা বৈধ হবে। কেননা এটা হলো রিবা-এর সন্দেহের উপর সন্দেহ।

আর যদি উত্তরাধিকার সম্পত্তি কায়লী ও ওজনী ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য হয়; কিন্তু তা অজ্ঞাত দ্রব্য হয় তাহলে কেউ কেউ বলেন, তা বৈধ হবে না। কেননা এটা বিক্রয় (আর অজ্ঞাত দ্রব্যের বিক্রয় বৈধ নয়। এটা দায়মুক্ত করণ নয়) কেননা যে বিষয়ে সমঝোতা করা হয়েছে তা হলো নির্ধারিত দ্রব্য (আর নির্ধারিত দ্রব্য থেকে দায়মুক্তকরণ সাব্যস্ত হয় না)।

তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, এটা বৈধ হবে। কেননা সমঝোতাকৃত দ্রব্যটি অন্যান্য ওয়ারিছদের হাতে বিদ্যমান থাকার কারণে এই অজ্ঞতা বিবাদ অনিবার্যকারী হবে না।

আর যদি মাইয়েতের উপর উত্তরাধিকার সম্পত্তি বেষ্টনকারী ঋণ থাকে তাহলে সমঝোতা করা বৈধ নয়, মীরাছ বণ্টন করাও বৈধ নয়। কেননা ওয়ারিছগণ এই উত্তরাধিকার সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেনি।

পক্ষান্তরে ঋণ যদি বেষ্টন করা না হয় তাহলে ঋণ পরিশোধের পূর্বে সমঝোতা সম্পাদন উচিত হবে না। কেননা মাইয়েতের দিকটি অগ্রাধিকার যোগ্য। তবে যদি করে ফেলে তাহলে মাশায়েখগণ বলেছেন যে, তা বৈধ হবে। আর বণ্টন সম্পর্কে ইমাম কারখী বলেছেন যে, সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তা বৈধ হবে না, তবে সাধারণ কিয়াসের দৃষ্টিতে বৈধ হবে।

كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

অধ্যায় ঃ মোদারাবা

مضاربة শব্দটি ضرب ধাতু থেকে নিষ্পন্ন (যার আভিধানিক অর্থ বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন)। মোদারাবা চুক্তিটির এ নাম এজন্য করা হয়েছে যে, মোদারিব তার চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা মুনাফার অধিকারী হয়। আর উভয় পক্ষের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কেননা একদল মানুষ পুঁজিতে সচ্ছল; কিন্তু পুঁজি পরিচালনায় অজ্ঞ। আরেকদল মানুষ পুঁজি পরিচালনায় অভিজ্ঞ, কিন্তু পুঁজিহীন। সুতরাং এধরনের চুক্তির বৈধতা প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যাতে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ এবং ধনী ও দরিদ্র উভয়ের স্বার্থ রক্ষা হয়।

আর নবী (সা) যখন প্রেরিত হন তখন মানুষ এধরনের লেনদেন করতো এবং তিনি মানুষকে তার উপর বহাল রেখেছেন, এবং সাহাবা কেরাম এই চুক্তির মাধ্যমে লেনদেন করেছেন।

আর মোদারিবকে যে পুঁজি প্রদান করা হয় সেটা তার হাতে আমানত রূপে থাকে। কেননা সে বিনিময় বা নিশ্চয়তার সূত্র ছাড়া মালিকের অনুমতিক্রমে তা কবজা করেছে। আর এই পুঁজির ক্ষেত্রে সে পুঁজির বিনিয়োগকারী ওকীল হয়ে থাকে। কেননা সে পুঁজির মালিকের আদেশক্রমে তাতে পরিচালনা করে থাকে।

আর যখন সে মুনাফা অর্জন করবে তখন সে তাতে পুঁজি বিনিয়োগকারীর শরীকদার হবে। কেননা সে তার শ্রম দ্বারা মালের একাংশের তথা মুনাফার মালিকানা লাভ করেছে। তবে যখন মোদারাবা চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়, তখন মজুরি ভিত্তিক নিয়োগের দিকটি প্রকাশ পাবে, এবং শ্রমিক হিসাবে সদৃশ মজুরির হকদার হবে।

আর মোদারিব যদি সুনির্ধারিত শর্তের বিপরীত কাজ করে তাহলে সে 'গছবকারী' বলে বিবেচিত হবে। কেননা তার পক্ষ থেকে অন্যের মালের প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (শরীয়তের পরিভাষায়) মোদারাবা হচ্ছে দুই পক্ষের এক পক্ষ থেকে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে শরীকানার ভিত্তিতে সম্পন্ন চুক্তি।

এর উদ্দেশ্য হল মুনাফার মধ্যে শরীকানা। আর মুনাফার হকদারি সাব্যস্ত হয় এক পক্ষ থেকে পুঁজির বিনিময়ে এবং অন্য পক্ষ থেকে শ্রমের বিনিময়ে। আর শরীকানার শর্ত ছাড়া মোদারাবা হতে পারে না। তাই তো যদি পুঁজিদাতার অনুকূলে সমগ্র মুনাফার শর্ত আরোপ করা হয় তাহলে সেটা হবে 'বিদায়া চুক্তি' (পণ্য বিক্রয়ের জন্য নিয়োগ)। আর যদি মোদারিবের অনুকূলে সমগ্র মুনাফার শর্ত আরোপ করা হয় তাহলে সেটা হবে করয প্রদান।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন,আর মোদারাবা চুক্তি ঐ মাল ছাড়া সিদ্ধ হবে না, যে মালে শরীকানা সিদ্ধ হয়।

আর শরীকানা চুক্তি অধ্যায়ে তার বিবরণ গত হয়েছে।

আর যদি তাকে কোন দ্রব্য দিয়ে বলে যে,এটা বিক্রি কর এবং তার মূল্যে মোদারাবা ভিত্তিতে কাজ কর, তাহলে তা জায়িয হবে।

কেননা মোদারাবা চুক্তি ভবিষ্যতকালের সাথে সম্পৃক্তি গ্রহণ করে। এই হিসাবে যে, গুণগত দিক থেকে এটা হলো ওকীল নিয়োগ এবং ইজারা প্রদান সুতরাং তা বৈধ হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

তদ্রূপ যদি মোদারিবকে বলে যে, অমুকের কাছে আমার যে পাওনা মাল আছে তা কবজা কর এবং তা দ্বারা মোদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা কর, তাহলে পূর্ব বর্ণিত কারণে তা বৈধ হবে।

পক্ষান্তরে যদি বলে যে, তোমার যিম্মায় আমার যে পাওনা ঋণ রয়েছে সেটাকে পুঁজি বানিয়ে ব্যবসা কর তাহলে মোদারাবা চুক্তি বৈধ হবে না।

কেননা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এই ওকীল নিয়োগ বৈধ হবে না, যেমন বিক্রয় পর্বে (বিক্রয়ের ওকীল নিয়োগ অধ্যায়ে) আলোচিত হয়েছে।

আর সাহেবায়নের মতে যদিও এই প্রকার ওকীল নিয়োগ বৈধ, কিন্তু ক্রয়কৃত দ্রব্যে আদেশদাতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং এটা পণ্য দ্রব্যের মোদারাবা হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোদারাবার আরেকটি শর্ত এই যে, অর্জিত মুনাফা উভয়ের মাঝে পরিব্যাপ্ত হবে। কোন পক্ষই মুনাফা থেকে নির্ধারিত পরিমাণ দিরহামের হকদার হবে না।

কেননা এই শর্তারোগ উভয়ের মাঝে শরীকানা রহিত করে দেয়, অথচ শরীকানা বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। যেমন শরীকানা চুক্তির ক্ষেত্রে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, (উদারণ স্বরূপ) যদি অতিরিক্ত দশ দিরহামের শর্ত আরোপ করে, তাহলে মোদারিব (শ্রমিক হিসাবে) তার শ্রমের সমপরিমাণ মজুরি পাবে।

কেননা মোদারাবা চুক্তি ফাসিদ হয়ে গেছে। কারণ হয়ত সে এই পরিমাণ ছাড়া মুনাফাই অর্জন করতে সক্ষম হবে না। ফলে মুনাফার ক্ষেত্রে শরিকানা রহিত হয়ে যাবে।

আর সমপরিমাণ মজুরি ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, সে তার শ্রমের বিনিময় পেতে চেয়েছে, অথচ চুক্তি ফাসিদ হওয়ার কারণে সে তা পায়নি।

আর মুনাফা পুঁজিদাতার হবে। কেননা এটা হলো তার মালিকানাধীন বস্তুর বৃদ্ধি মোদারাবা চুক্তি সিদ্ধতা লাভ করেনি এমন প্রতিটি ক্ষেত্রে এটাই হলো বিধান।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে চুক্তির মজুরি শর্তকৃত পরিমাণকে অতিক্রম করতে পারবে না। ইমাম মুহম্মদ (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন, যেমন আমরা শরীকানা চুক্তি প্রসঙ্গে বর্ণনা করে এসেছি।

মাবসূত কিতাবের বর্ণনা মতে মুনাফা অর্জিত না হলেও মজুরি ওয়াজিব হবে কেননা (ব্যক্তিগত মজদূরের ক্ষেত্রে) শ্রম অর্পণ দ্বারা কিংবা (সাধারণ মজদূরের ক্ষেত্রে) কাজ অর্পণ দ্বারা শ্রমিকের মজুরি ওয়াজিব হয়ে যায়। আর এখানে কাজ পাওয়া গেছে

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মজুরি ওয়াজিব হবে না তিনি এটা বলেন, বিশুদ্ধ মোদারাবার উপর কিয়াস করে। অথচ (কার্যকারিতার ক্ষেত্রে) সেটা ফাসিদ মোদারাবারও ঊর্ধ্বে।

আর ফাসিদ মোদারাবার ক্ষেত্রে প্রদত্ত পুঁজি হালাক হওয়ার কারণে দায়সম্পন্ন হবে না। (এ বিধান হলো) বিশুদ্ধ মোদারাবার উপর কিয়াস করে।

তাছাড়া এই পুঁজি হলো এমন বস্তু যা দ্বারা কাজ করার জন্য মোদারিবকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আর যে কোন শর্ত মুনাফার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা সৃষ্টি করে তা মোদারাবা চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। কেননা তা দ্বারা মোদারাবা চুক্তির উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য ফাসিদ শর্ত যা, (মুনাফার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা সৃষ্টি করে না) তা মোদারাবা চুক্তিকে ফাসিদ করে না। বরং শর্তটি বাতিল হয়ে যায়। যেমন মোদারিবের উপর লোকসানের দায় বহনের শর্ত আরোপ করা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর পুঁজি মোদারিবের হাতে অর্পণকৃত হওয়া আবশ্যক। পুঁজিদাতার তাতে হস্তক্ষেপের কোন অধিকার থাকবে না।

কেননা এই পুঁজি তার হাতে আমানতরূপে থাকবে। সুতরাং তা তার হাতে অর্পণ করা অপরিহার্য হবে। এটা শরীকানা চুক্তির বিপরীত।

কারণ মোদারাবা চুক্তির ক্ষেত্রে পুঁজি প্রদত্ত হয় দুই পক্ষের এক পক্ষ থেকে আর শ্রম হয় অপর পক্ষ থেকে। সুতরাং পুঁজি শ্রমদানকারীর নিরংকুশ অধিকারে থাকা জরুরী, যাতে সে তাতে প্রয়োজনীয় মুআমেলা করতে সক্ষম হয়।

পক্ষান্তরে শরীকানা চুক্তির ক্ষেত্রে শ্রম হয় উভয় পক্ষ থেকে। সুতরাং সেখানে যদি দুজনের একজনের অনুকূলে নিরংকুশ কবজার শর্ত আরোপ করা হয় তাহলে শরীকানা চুক্তি সম্পন্ন হবে না।

আর পুঁজিদাতার উপর শ্রমদানের শর্ত আরোপ মোদারাবা চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। কেননা তা পুঁজির উপর মোদারিবের নিরংকুশ অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে

সে (ইচ্ছামত) ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না এবং চুক্তির উদ্দেশ্যে অর্জিত হবে না। পুঁজিদাতা প্রত্যক্ষ চুক্তিকারী হোক কিংবা চুক্তিকারী না হোক। যেমন (পুঁজিদাতা) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক হলো (আর তার অভিভাবক পর পক্ষ হতে চুক্তি সম্পাদন করলো)।

কেননা মালিক হিসাবে তার জন্য কবজা সাব্যস্ত। এখন উক্ত দখল যদি অব্যাহত থাকে তাহলে তা মোদারিবের হাতে অর্পণ করাকে বিঘ্নিত করবে।

তদ্রূপ মোদারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ দুজনের একজন, কিংবা 'ইনান' চুক্তিতে আবদ্ধ দুজনের একজন যদি মোদারাবা ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করে এবং অপর পক্ষের শ্রমদানের শর্ত আরোপ করে তাহলে মোদারাবা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা অপর পক্ষের মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে, যদিও পুঁজিদাতা নিজে চুক্তিকারী না হয়। আর মোদাবিরের পাশাপাশি চুক্তিকারীর শ্রমদানের শর্ত আরোপ করা যদিও সে পুঁজির মালিক না হয় মোদারাবা চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়,যদি ঐ চুক্তিকারী ঐ মালের ক্ষেত্রে মোদারাবা চুক্তি সম্পন্ন করার যোগ্যতাধারী না হয়, যেমন অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম। আর পিতা ও অছীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের এই যোগ্যতা রয়েছে যে, তারা নিজেরাই মোদারাবার ভিত্তিতে তাদের তত্ত্বাবধানের অধীন বালকের মাল গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং আংশিক মালের (অর্থাৎ আংশিক মুনাফার) বিনিময়ে তাদের উপর শ্রমদানের শর্ত আরোপ করা বৈধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যখন (স্থান, কাল ও পাত্র সম্পর্কে) নিঃশর্ত রূপে বিশুদ্ধ মোদারাবা চুক্তি সম্পন্ন হবে, তখন মোদারিব-এর জন্য বৈধ হবে বিক্রয় করা, ক্রয় করা, কাউকে ওকীল নিয়োগ করা, সফর করা, বিক্রয় করার জন্য কাউকে পণ্য প্রদান করা, এবং কারো কাছে আমানত রাখা।

কেননা মোদারাবা চুক্তি নিঃশর্তরূপে সম্পন্ন হয়েছে, আর তা দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো মুনাফা অর্জন, আর মুনাফা ব্যবসা ছাড়া অর্জিত হবে না। সুতরাং এই চুক্তি ব্যবসায়ের যাবতীয় প্রকারকে এবং ব্যবসায়ীদের যাবতীয় কর্মতৎপরতাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর ওকীল নিয়োগ ব্যবসায়ীদের কর্ম তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে আমানত রাখা বিক্রির জন্য পণ্য প্রদান করা এবং সফর করাও ব্যবসায়ীদের কর্ম কার্যের অন্তর্ভুক্ত। দেখুননা, যার কাছে আমানত রাখা হয়, সে ঐ মাল নিয়ে সফর করতে পারে। সুতরাং মোদারিব আরও স্বাভাবিকভাবেই তা করতে পারবে। কেন নয়? অথচ মোদারাবা শব্দটিই তা প্রমাণ করে। কারণ তা ضرب ধাতুমূল থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো সফর করা।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মোদারিব সফর করতে পারবে না।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মোদারিবকে যদি তার শহরে পুঁজি প্রদান করা হয় তাহলে সেই পুঁজি নিয়ে সে অন্য শহরে সফর করতে পারে না। কেননা এটা হলো বিনা প্রয়োজনে পুঁজিকে নষ্ট হওয়ার সম্মুখীন করা।

আর যদি মোদারিবকে তার শহর থেকে ভিন্ন কোন শহরে পুঁজি প্রদান করা হয়, তাহলে সে ঐ পুঁজি নিয়ে তার শহরের উদ্দেশ্যে সফর করতে পারে। কেননা সাধারণত:

মোদারিবের নিজের শহরে ব্যবসা করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তবে কিতাবে যে মতামত উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাই হলো যাহির রেওয়ায়েত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোদারিব অন্য কাউকে মোদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করতে পারে না। তবে যদি মূল পুঁজিদাতা তাকে অনুমতি প্রদান করে, কিংবা তাকে এ কথা বলে যে, তুমি তোমার নিজের মত অনুযায়ী কাজ কর।

কেননা কোন বস্তু তার সদৃশকে অন্তর্ভুক্ত করে না। কারণ শক্তির ক্ষেত্রে দু'টোই সমান। সুতরাং সেটার সুস্পষ্ট উল্লেখ বা তার হাতে নিঃশর্ত ক্ষমতা অর্পণ অপরিহার্য।

আর এটা ওকীল নিয়োগের অনুরূপ হবে। কেননা তাকে যে বিষয়ে ওকীল নিয়োগ করা হয়েছে সে বিষয়ে সে অন্য কাউকে ওকীল নিয়োগ করতে পারে না, তবে যদি মুআক্কিল তাকে বলে যে, তুমি তোমার মত অনুযায়ী কাজ করো।

আমানত রাখা এবং বিক্রির জন্য পণ্য প্রদান করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা মোদারাবা চুক্তি থেকে নিম্ন পর্যায়ের। সুতরাং মোদারাবা চুক্তি সে দু'টিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

করয প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ মোদারিবের সে অধিকার থাকবে না, যদিও তাকে বলা হয় যে, তুমি তোমার মত অনুযায়ী কাজ কর।

কেননা এ কথার উদ্দেশ্যে হলো ব্যবসায়ীদের কর্মকার্যভুক্ত বিষয়ে সাধারণ অনুমতি প্রদান। আর করয প্রদান তা নয়। বরং তা হেবা ও ছাদাকার ন্যায় স্বেচ্ছা প্রদান জাতীয় কাজ। সুতরাং তা দ্বারা মোদারাবার উদ্দেশ্যে তথা মুনাফা অর্জিত হবে না। কেননা (ফেরত নেয়ার সময়) করযের উপর অতিরিক্ত গ্রহণ বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে মোদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান ব্যাবাসয়ীদের কর্ম কার্যের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ শরীকানা চুক্তি সম্পাদন এবং নিজে মালের সাথে বিশ্রণ ও ব্যবসায়ীদের কর্ম কার্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এগুলো পুঁজিদাতার এই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পুঁজিদাতা যদি মোদারিবকে নির্দিষ্ট কোন শহরে কিংবা নির্দিষ্ট কোন পণ্যে ব্যবসা করার কথা বলে দেয় তাহলে তা লঙ্ঘন করা তার জন্য জায়িয হবে না।

কেননা মোদারাবা চুক্তি হচ্ছে মূলত: ওকীল নিয়োগ। আর (শহর বা পণ্য) বিশিষ্ট করে দেয়ার মধ্যে সার্থকতা রয়েছে, সুতরাং তা বিশিষ্ট হয়ে যাবে। তদ্রূপ মোদারিবের অধিকার নেই 'বিদাআহ'-এর ভিত্তিতে এমন কাউকে পুঁজি প্রদান করা, যে পুঁজি বা পণ্য ঐ শহর থেকে বের করে অন্য কোন স্থানে নিয়ে যাবে।

কেননা সে নিজে তা বের করে নেয়ার অধিকারী নয়। সুতরাং সেই কাজ সে অন্যের হাতেও অর্পণ করার অধিকারী হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি সে ঐ শহর ছাড়া অন্য কোন শহরে যায় এবং কিছু ক্রয় করে তাহলে সে পুঁজির দায় বহন করবে এবং ক্রয়কৃত পণ্য ও মুনাফা তার হবে।

কেননা সে পুঁজিদাতার আদেশ ছাড়া 'ব্যবহার' করেছে।

আর যদি কোন কিছু খরিদ না করে এবং পুঁজিদাতা যে শহর নির্ধারণ করে দিয়েছিল, সেই শহরে ফিরে আসে তাহলে মোদারিব দায় বহন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে, সে যদি আমানতের ক্ষেত্রে বিধি লঙ্ঘন করে, অত:পর লঙ্ঘন পরিত্যাগ করে দেয়।

আর প্রদত্ত পুঁজি মোদারাবা চুক্তির প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে।

কেননা পূর্ববর্তী চুক্তি অনুযায়ী সেটা তার দখলে রয়েছে।

তদ্রূপ একই বিধান হবে যদি মোদারিব পুঁজির কিয়দাংশ নির্ধারিত শহরে ফিরিয়ে আনে এবং পুঁজির কিয়দাংশ দ্বারা আনা পুঁজি এবং নির্ধারিত শহরে ক্রয়কৃত পণ্য মোদারাবা চুক্তির উপর বহাল থাকবে। কারণ সেটাই যা আমরা পূর্বে বলেছি।

এখানে (দায় বহনের জন্য) মোদারাবার পুঁজি দ্বারা নির্ধারিত শহরে কিছু ক্রয়ের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এটা হলো জামে ছাগীরের বর্ণনা। পক্ষান্তরে মাবসূতের বর্ণনা মতে শুধু পুঁজি বের করে নেয়া দ্বারাই দায়বহনকারী হবে, (ক্রয় করুক বা না করুক)। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, ক্রয় দ্বারা বহনের বিষয়টি স্থিতি লাভ করে। কেননা তাতে নির্ধারণকৃত শহরে পুঁজি ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দায় বহন ওয়াজিব হওয়া শুধু বের করে আনা দ্বারাই হয়ে যায়। সুতরাং (বলা যায় যে, জামে ছাগীর কিতাবে) ক্রয়ের শর্তারোপ হয়েছে, দায় বহনের স্থিতির জন্য; মূল ওয়াজিবের জন্য নয়।

(নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত হওয়ার) এ বিধান ঐ সূরতের বিপরীত, যখন পুঁজিদাতা বলে যে, এই শর্তে পুঁজি দিলাম যে, তুমি কুফার বাজার থেকে ক্রয় করবে। অর্থাৎ এই নির্ধারণ সিদ্ধ হবে না। কেননা একটি শহর তার অঞ্চলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও অভিন্ন অঞ্চলের মত গণ্য হয়। সুতরাং এই বিশিষ্টায়ন অর্থবহ হবে না। তবে যদি সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করে, যেমন বলে যে, তুমি এই বাজারে ব্যবসা কর, অন্য কোন বাজারে ব্যবসা করোনা। (তাহলে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে) কেননা সে সুস্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আর কর্তৃত্ব তার হাতেই রয়েছে।

আর বিশিষ্ট করার অর্থ ঐ কথা বলা যে, (এই শর্তে পুঁজি দিলাম যে,) তুমি এই ব্যবসা করবে কিংবা তুমি এই স্থানে ব্যবসা করবে।

তদ্রূপ যদি বলে, এই পুঁজি নাও, তা দ্বারা তুমি কুফায় ব্যবসা করবে। কেননা এই বাক্যটি হলো পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা। তদ্রূপ যদি ف অব্যয় যোগে বলে; فاعمل به في الكوفة -এই পুঁজি নাও, অনন্তর তার দ্বারা কুফায় ব্যবসা কর। কেননা ف অব্যয়টি সংযুক্তি বোঝায়। (মোট কথা বিশিষ্টতা জ্ঞাপক কোন কিছু থাকলে বিশিষ্ট হয়ে যাবে।) পক্ষান্তরে যদি و অব্যয় যোগে বলে, এই পুঁজি নাও এবং তা দ্বারা কুফায় ব্যবসা কর। তাহলে সে কুফায় এবং অন্যত্র ব্যবসা করতে পারবে। কেননা و অব্যয়টি হলো عطف এর জন্য। সুতরাং এটা হবে নিছক পরামর্শের পর্যায়ভুক্ত।

আর যদি বলে, এই শর্তে যে, তুমি অমুকের কাছ থেকে ক্রয় করবে এবং তার কাছে বিক্রি করবে তাহলে এই বিশিষ্টায়ন সিদ্ধ হবে। কেননা লেনদেনের ব্যাপারে তার প্রতি অতিরিক্ত অবস্থার কারণে এই বিশিষ্টায়ন অর্থপূর্ণ হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, এই শর্তে যে, তুমি উক্ত পুঁজি দ্বারা কুফাবাসীদের কাছ থেকে ক্রয় করবে। কিংবা ছারফ চুক্তিতে মাল প্রদান করে বললো যে, এই শর্তে পুঁজি দিলাম যে, তা দ্বারা তুমি মুদ্রা ব্যাপারীদের কাছ থেকে মুদ্রা ক্রয় করবে এবং তাদের কাছে বিক্রি করবে। আর সে কুফায় অ-কুফীদের কাছে বিক্রি করল কিংবা অ-মুদ্রা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করল তাহলে এটা বৈধ হবে। কেননা প্রথমটির অর্থবহতা হলো স্থানের সাথে বিশিষ্টকরণ। আর দ্বিতীয়টির অর্থবহতা হলো চুক্তির প্রকারের সাথে বিশিষ্টকরণ (আর তা ছারফচুক্তি) লোক প্রচলনে (উপরোক্ত দুই বক্তব্য দ্বারা) এটাই হলো উদ্দেশ্য। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, একইভাবে পুঁজিদাতা যদি মোদারাবা-এর জন্য কোন সময় নির্ধারিত করে দেয় তাহলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা মোদরাবা চুক্তির অর্থ হলো ওকীল নিয়োগকরণ। সুতরাং পুঁজিদাতা সময় নির্ধারণ করে দেবে। সে সময় দ্বারাই তা আবদ্ধ হবে। আর সময় নির্ধারণ করা অর্থবহ। কারণ এটা হলো কালের সঙ্গে বিশিষ্টকরণ। সুতরাং প্রকার (যেমন গম) এবং স্থান (যেমন কুফা) এর সঙ্গে বিশিষ্ট করণের মত হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোদারিবের অধিকার নেই এমন কোন দাসদাসী ক্রয় করা, যারা আত্মীয়তার কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে পুঁজিদাতার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা মোদারাবা চুক্তি মুনাফা অর্জনের জন্য নির্ধারিত। আর মুনাফা অর্জিত হবে বারবার লেনদেন দ্বারা। আর এ ক্ষেত্রে আযাদ হয়ে যাওয়ার কারণে তা সম্ভব হবে না।

এ কারণেই তো মোদারাবা চুক্তিতে এমন কিছু খরিদ করা অন্তর্ভুক্ত নয়, যার মালিকানা অর্জিত হয় না কবজার মাধ্যমে। যেমন মদ খরিদ করা এবং মুরদারের বিনিময়ে কিছু খরিদ করা। পক্ষান্তরে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেননা ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে ক্রয়কৃত বস্তুটি কবজা করার পর মোদারিব বিক্রি করতে পারে। সুতরাং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি সে তা করে তাহলে নিজের জন্য ক্রয়কারী হবে মোদারাবার সূত্রে নয়।

কেননা ক্রয় যখন ক্রেতার উপর কার্যকর অবস্থায় সম্পন্ন হয় তখন সেটাকে ক্রেতার উপর কার্যকর করা হয়। যেমন ক্রয়ের ওকীল যদি মুওয়াক্কিলের বিরুদ্ধাচরণ করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি পুঁজিতে মুনাফা হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য এমন গোলাম খরিদ করা জায়িয হবে না, যা তার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যায়।

কেননা ঐ গোলাম থেকে তার প্রাপ্য অংশটুকু আযাদ হয়ে যাবে. আর পুঁজিদাতার অংশটুকু ফাসিদ হয়ে যাবে। কিংবা আযাদ হয়ে যাবে: সুপ্রসিদ্ধ মতপার্থক্য অনুযায়ী। ফলে গোলামটির লেনদেন অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং মুনাফার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।

যদি মোদারিব ঐ ধরনের কোন গোলাম খরিদ করে তাহলে সে নিজে মোদারাবার পুঁজির দায় বহন করবে।

কেননা সে গোলামটি নিজের জন্য ক্রয়কারী হবে। সুতরাং মোদারাবার পুঁজি থেকে মূল্য পরিশোধ করার কারণে তার দায় বহন করবে।

আর যদি পুঁজিতে মুনাফার কোন অংশ না থাকে তাহলে ঐ ধরনের গোলাম খরিদ করা জায়িয হবে।

কেননা পুঁজিতে মোদারিবের অংশীদারি না থাকার কারণে তার পক্ষ থেকে আযাদ হবে না; বরং গোলামটির মাঝে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে কোন বাধা থাকবে না।

(মুনাফার অংশ নেই এমন পুঁজি দ্বারা) ক্রয় করার পর যদি ঐ গোলামের মূল্য বেড়ে যায় তাহলে ঐ গোলাম থেকে মোদারিবের হিসসা আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা (লব্ধ মুনাফার সূত্রে) সে তার নিকটাত্মীয়ের অংশ বিশেষের মালিক হয়েছে।

তবে পুঁজিদাতার অনুকূলে সে কোন দায় বহন করবে না।

কেননা মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে তার দিক থেকে কোন ভূমিকা নেই। তদ্রূপ মূল্যের অতিরিক্ত অংশে তার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারেও তার কোন ভূমিকা নেই। কেননা এটা এমন বিষয়, যা চুক্তির অনিবার্য বিধান রূপে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো. যেন সে অন্যের সঙ্গে ঐ গোলামের ওয়ারিস হলো।

আর গোলাম পুঁজিদাতার প্রাপ্য অংশের মূল্যের ব্যাপারে উপার্জনের চেষ্টায় নিয়োজিত হবে।

কেননা গোলামের সম্পদ গোলামের কাছে আটকা পড়েছে (যা পুঁজিদাতার মালিকানাভুক্ত) সে ব্যাপারে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত হবে।

যেমন মীরাছের ক্ষেত্রে। (ওয়ারিছদের একজনে তার অংশ আযাদ করলে)।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি অর্ধেক মুনাফার ভিত্তিতে মোদারিবের নিকট এক হাযার দিরহাম থাকে আর সে তা দ্বারা একটি দাসী ক্রয় করে, যার বাজার মূল্য এক হাযার দিরহাম, অতঃপর সে তার সঙ্গে সহবাস করে আর সে সন্তান প্রসব করে, যা এক হাযারের সমমূল্যের আর সে সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে. অতঃপর সন্তানের মূল্য দেড় হাযারে পৌছে যায় আর দাবীকারী মোদারিব সচ্ছল হয় তখন পুঁজিদাতা ইচ্ছা করলে গোলামকে এক হাযার দু'শ পঞ্চাশ দিরহামের ব্যাপারে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত করতে পারে। আর ইচ্ছা করলে তাকে আযাদ করতে পারে। (কিন্তু সচ্ছল মোদারিবকে দায়বহন করাতে পারবে না)।

এর কারণ এই যে, বিষয়টিকে বিবাহ শয্যার উপর প্রযুক্ত করে ধরে নেয়া হবে যে, বাহ্যত: তার দাবী বিশুদ্ধ। তবে (আযাদ হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সন্তানের দাবী করার ক্ষেত্রে) তা কার্যকর হবে না। কেননা আযাদ হওয়ার শর্ত তথা মালিকানা অনুপস্থিত। কারণ মুনাফার বিষয়টি প্রকাশ পায়নি। কারণ মা ও সন্তান উভয়ের প্রতিটি (পুঁজিদাতার দিক থেকে) পুঁজির বিনিময়ে প্রাপ্য হয়েছে। যেমন মোদারাবার মাল যদি বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং তন্মধ্যে প্রতিটি বস্তু পুঁজির সমপরিমাণ হয় তখন মুনাফা প্রকাশ পায় না, এটা তেমন। অতঃপর গোলামের মূল্য যখন পুঁজির পরিমাণের চেয়ে বেড়ে গেলো ও মুনাফাও প্রকাশ পেলো, তখন পূর্ববর্তী দাবীও কার্যকর হবে।

পক্ষান্তরে মোদারিব যদি সন্তানটিকে আযাদ করে দেয়, তারপর মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, তাহলে আযাদ করা কার্যকর হবে না। কেননা এটা হলো স্বতন্ত্রভাবে মুক্তিকে অস্তিত্বদান। সুতরাং মালিকানা বিদ্যমান না থাকার কারণে যখন মুক্তিদান বাতিল হয়ে গেলো তখন এরপরে মালিকানা সৃষ্টি হওয়ার কারণে তা কার্যকর হবে না।

পক্ষান্তরে এটা (অর্থাৎ সন্তানের পিতৃত্বের দাবী) হচ্ছে পূর্বে সংঘটিত বিষয়ের খবর প্রদান। (আর তা অন্যের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হলেও তার নিজের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে।) সুতরাং মালিকানা সৃষ্টি হওয়ার সময় তা কার্যকর হওয়া জায়িয হবে। যেমন যদি অন্যের গোলাম সম্পর্কে স্বাধীন হওয়ার স্বীকারোক্তি করল; এরপর তাকে খরিদ করল, (তখন তার স্বীকারোক্তি কার্যকর হবে)।

সুতরাং যখন দাবী সিদ্ধ হল এবং নসব সাব্যস্ত হল তখন বাচ্চার অংশ বিশেষের উপর তার মালিকানা বিদ্যমান হওয়ার কারণে সন্তানটি আযাদ হয়ে যাবে। আর পুঁজিদাতার অনুকূলে সন্তানের মূল্য থেকে কোন কিছুর দায় বহন করবে না।

কেননা তার মুক্তি সাব্যস্ত হয়েছে বংশ পরিচয় ও মালিকানা দ্বারা। আর মালিকানার অস্তিত্ব হয়েছে শেষে। সুতরাং বিধান তার সাথেই যুক্ত হবে। আর এ বিষয়ে মোদারিবের কোন ভূমিকা নেই। অথচ এটা হলো মুক্তিদানের দায়বহন, সুতরাং তার পক্ষ থেকে সীমা লংঘন সাব্যস্ত হওয়া অপরিহার্য, যা এখানে পাওয়া যায় নি।

তবে পুঁজি দাতার অধিকার থাকবে গোলামকে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত করার। কেননা গোলামের সম্পদগুণ গোলামের কাছে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

আবার উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিতকে সে আযাদও করে দিতে পারে। যেমন মুকাতাব গোলামের ক্ষেত্রে। —ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে।

আর পুঁজিদাতা তাকে এক হাযার দু'শ পঞ্চাশ দিরহামের ক্ষেত্রে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত করতে পারবে। কেননা এক হাযার তো পুঁজি হিসাবে তার হক। আর মুনাফা হয়েছে পাঁচশ দিরহাম। আর মুনাফা উভয়ের মাঝে অর্ধেক হিসাবে বন্টিত। এ কারণেই গোলাম এই পরিমাণের ক্ষেত্রে পুঁজিদাতার অনুকূলে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত হবে।

অতঃপর পুঁজিদাতা যখন গোলামের কাছ থেকে এক হাযার উশুল করবে তখন তার অধিকার থাকবে সন্তানের পিতৃত্বের দাবীদার মোদারিবের উপর মাতার বাজার মূল্যের অর্ধেকের দায় আরোপ করার।

কেননা গোলাম থেকে উশূলকৃত এক হাযার যখন পুঁজি রূপে তার হক বলে সাব্যস্ত হলো, কারণ উশূল করার ক্ষেত্রে সেটা মুনাফা থেকে অগ্রবর্তী, তখন প্রকাশ পেয়ে গেলো যে, দাসীর সমগ্রই হলো মুনাফা। সুতরাং দাসী উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে। আর একটি বিশুদ্ধ দাবী অগ্রবর্তী হয়ে আছে। (দাবীর সিদ্ধতার) কারণ বিবাহ দ্বারা সাব্যস্ত শয্যার বিদ্যমানতার সম্ভাবনা। তবে মালিকানা অবিদ্যমান হওয়ার কারণে উক্ত দাবীর কার্যকারিতা স্থগিত ছিল। সুতরাং যখন মালিকানা প্রকাশ পেল তখন উক্ত দাবী কার্যকর হয়ে যাবে এবং দাসীটি তার উম্মে ওয়ালাদ হবে এবং হিসসার দায়বহন করবে। কেননা এটি মালিকানা প্রাপ্তির দায় বহন। আর মালিকানা প্রাপ্তির দায়বহন (তার পক্ষ হতে) কোন ভূমিকার বিদ্যমানতা দাবী করে না; যেমন বিবাহের মাধ্যমে কোন দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করল, অতঃপর মীরাছ সূত্রে সে এবং অন্য একজন ঐ দাসীর মালিকানা লাভ করল তখন তাকে শরীকদারের হিসসার দায় বহন করতে হয়। এটাও তদ্রূপ। সন্তানের মূল্যের দায় বহনের বিষয়টি ভিন্ন; যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ মোদারিবের অন্য কারো সাথে মোদারাবা চুক্তি করা প্রসঙ্গ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোদারিব **যদি** অন্য **কাউকে** মোদারাবার ভিত্তিতে **অর্থ প্রদান করে, অথচ পুঁজিদাতা তাকে অনুমতি প্রদান করেনি, তাহলে শুধু পুঁজি প্রদান করার কারণে কিংবা দ্বিতীয় মোদারিবের হস্তক্ষেপ শুরু করার কারণে প্রথম মোদারিব দায়বহন করবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় মোদারিব মুনাফা অর্জন করে। যখন সে মুনাফা অর্জন করবে তখন প্রথম মোদারিব পুঁজিদাতার অনুকূলে দায়বহন করবে।**

এটা হলো ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে হাসান বিন যিয়াদ-এর বর্ণণা।

আর সাহেবায়ন বলেন, দ্বিতীয় মোদারিব যখন ঐ পুঁজি দ্বারা কাজ শুরু করবে তখনই প্রথম মোদারিব যামিন হয়ে যাবে; দ্বিতীয় মোদারিব মুনাফা অর্জন করুক বা না করুক।

আর এটা হলো যাহিরে রেওয়ায়াত। আর ইমাম যুফার (র) বলেন, পুঁজি শুধু প্রদান দ্বারাই দায়বহন সাব্যস্ত হয়ে যাবে, ব্যবসা শুরু করুক বা না করুক।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকেও এমন বর্ণনা রয়েছে। কেননা মোদারিবের যা অধিকার সেটা হলো আমানত রূপে রাখার জন্য প্রদান। অথচ এই প্রদান হয়েছে মোদারাবার ভিত্তিতে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই প্রদান হচ্ছে আমানত রাখা। তবে দ্বিতীয়জনের ব্যবসা শুরু করা দ্বারা এটা মোদারাবার জন্য হওয়া সুসাব্যস্ত হয়। সুতরাং এর পূর্বে অবস্থাটি পর্যবেক্ষণাধীন থাকবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, ব্যবসা শুরু করার পূর্বে এই প্রদান হলো আমানত রাখা আর ব্যবসা শুরু করার পর তা বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রদান। আর মোদারিবের উভয় কর্মের অধিকার রয়েছে। সুতরাং ঐ দুই কর্ম দ্বারা মোদারিব দায়বহনকারী হবে না। দ্বিতীয় মোদারিব যখন মুনাফা অর্জন করবে তখন মালের মধ্যে তার শরীকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তখন (পুঁজিদাতার মুনাফায় অন্যকে শরীক করার কারণে) সে যামিন হবে। যেমন, যদি মোদারাবার মালের সঙ্গে অন্য কোন মালের মিশ্রণ ঘটায়।

আর যামিন হওয়া এই সাব্যস্তি তখনই হবে, যখন মোদারাবা চুক্তিটি বিশুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যদি মোদারাবা চুক্তিটি ফাসিদ হয় তাহলে দ্বিতীয় জন ব্যবসা শুরু করলে প্রথম জন তার যামিন হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়জন শ্রমিক মাত্র। তার জন্য সমমানের মজুরি প্রাপ্য। সুতরাং তার পক্ষ থেকে কৃত ব্যবসা ও লব্ধ মুনাফা দ্বারা শরীকানা সাব্যস্ত হবে না।

অতঃপর কুদূরী কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথমজন দায়বহন করবে; দ্বিতীয়জনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারো কারো মতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী দ্বিতীয়জনের দায়বহন না করারই কথা। পক্ষান্তরে সাহেবায়নের মতে, দায়বহন করাবে। এটা বলা হচ্ছে আমানত গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে আমানত গ্রহণকারী সম্পর্কে তাদের মতপার্থক্যের ভিত্তিতে। আর কারো কারো মতে সর্বসম্মতিক্রমেই পুঁজিদাতার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

সে চাইলে প্রথমজনের উপর দায় আরোপ করবে, আবার চাইলে দ্বিতীয়জনের উপর দায় আরোপ করবে। এটাই প্রসিদ্ধ মাযহাব।

সাহেবায়নের মতে তো ঐ বিধান সুস্পষ্ট। তদ্রূপ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে।

তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দৃষ্টিতে এই মাসআলা এবং আমানত গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে আমানত গ্রহণকারীর মাসআলার মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, দ্বিতীয় আমানত গ্রহণকারী তা প্রথম জনের ফায়দার জন্য গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং সে দায়বহনকারী হতে পারে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মোদারিব নিজের ফায়দার জন্য ঐ পুঁজিতে কাজ করেছে। সুতরাং তার দায়বহনকারী হওয়ার বৈধতা রয়েছে।

অতঃপর পুঁজিদাতা যদি প্রথজনের উপর দায় আরোপ করে তখন প্রথমজন ও দ্বিতীয়জনের মাঝে সম্পন্ন মোদারাবা সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর উভয়ের মাঝে মুনাফা সেভাবেই বন্টিত হবে যেভাবে তারা শর্ত আরোপ করেছে।

কেননা এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, দায়বহনের মাধ্যমে প্রথম মোদারিব তখন থেকেই মোদারাবার মালের মালিক হয়ে পড়েছে। যখন সে বিধি লংঘন করে অন্যকে পুঁজি প্রদান করেছে, এমন পদ্ধতিতে যাতে পুঁজিদাতার সম্মতি ছিল না। সুতরাং নিজের প্রদানের মতই হলো।

আর যদি পুঁজিদাতা দ্বিতীজনের উপর দায় আরোপ করে তাহলে সে কৃত চুক্তি বলে প্রথমজনের কাছে রুজু করবে। কেননা সে তো তার জন্য শ্রম প্রদান করছে। যেমন (গচ্ছবকারীর পক্ষ থেকে) আমানত গ্রহণকারী

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, সে চুক্তির মাধ্যমে প্রথমজনের দিক থেকে ধোকায় পড়েছে।

আর মোদারাবা চুক্তি সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং মুনাফা উভয়ের মাঝে সেভাবেই বন্টিত হবে, যেভাবে তারা শর্ত করেছে।

কেননা ক্ষতিপূরণের মূল দায় হলো প্রথম জনের উপর। সুতরাং যেন পুঁজিদাতা প্রথমেই প্রথমজনের উপর দায় আরোপ করেছে। আর অর্জিত মুনাফা দ্বিতীয় জনের জন্য হালাল বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু প্রথম জনের জন্য হালাল বলে বিবেচিত হবে না।

কেননা দ্বিতীয়জন কৃত 'ব্যবসা কর্ম'-এর বিনিময়ে মুনাফার হকদার হয়েছে, আর তার ব্যবসা কর্মে কোন 'দোষ' নেই। পক্ষান্তরে প্রথম জন মুনাফার হকদার হচ্ছে ঐ মালিকানা সূত্রে, যা ক্ষতিপূরণ আদায়ের উপর ভিত্তিকৃত। সুতরাং তা কিছুটা হলেও দোষ থেকে মুক্ত নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পুঁজিদাতা যদি মোদারিবকে অর্ধেক মুনাফার শর্তে মোদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করে এবং অন্য কাউকে মোদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদানের অনুমতি দিয়ে থাকে। আর সেই সূত্রে সে কাউকে তৃতীয়াংশ মুনাফার শর্তে পুঁজি প্রদান করল, আর দ্বিতীয়জন ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করল। এখন মূল পুঁজিদাতা যদি একথা বলে থাকে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে যা কিছু মুনাফা দান করবেন তা আমাদের মাঝে অর্ধেক করে বন্টিত হবে, তাহলে মূল পুঁজিদাতা মুনাফার অর্ধেক পাবে, আর দ্বিতীয়জন এক তৃতীয়াংশ পাবে। আর প্রথমজন এক ষষ্ঠাংশ পাবে।

কেননা পুঁজির মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতি বিদ্যমান থাকার কারণে দ্বিতীয়জনকে মোদারাবার ভিত্তিতে অর্থ প্রদান সিদ্ধ হয়েছে। আর পুঁজিদাতা নিজের লব্ধ সমগ্র মুনাফার অর্ধেকের শর্ত আরোপ করেছে। ফলে প্রথম জনের জন্য শুধু অর্ধেক মুনাফা অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং তার চুক্তি সম্পাদন তার প্রাপ্য হিসসার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। আর সে দ্বিতীয়জনের জন্য তার হিসসা থেকে সমগ্র মুনাফার এক তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছে। সুতরাং সে সমগ্র মুনাফার তৃতীয়াংশ পরিমাণ (অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে) পেয়ে যাবে। ফলে এক ষষ্ঠাংশ শুধু অবশিষ্ট থাকবে এবং উভয়ের জন্য ঐ মুনাফা হালাল হবে। কেননা দ্বিতীয়জনের ব্যবসা কর্ম প্রথমজনের ফায়দার জন্য সম্পন্ন হয়েছে। যেমন কাউকে এক দিরহামের বিনিময়ে একটি কাপড় সেলাই করার জন্য মজদুর নিয়োগ করা হলো, আর সে অন্যাকে অর্ধেক দিরহামের বিনিময়ে নিয়োগ করল।

আর যদি পুঁজিদাতা বলে থাকে যে, আল্লাহ তোমাকে যে মুনাফা দান করবেন তা আমাদের মাঝে অর্ধেক করে বন্টিত হবে। তাহলে দ্বিতীয় মোদারিব সমগ্র মুনাফার এক তৃতীয়াংশ পাবে। আর অবশিষ্ট প্রথম মোদারিব ও পুঁজিদাতার মাঝে অর্ধেক করে বন্টিত হবে।

কেননা পুঁজিদাতা তাসাররুফের ক্ষমতা তার হাতে অর্পণ করেছে এবং প্রথম মোদারিব যে মুনাফা লাভ করবে তার অর্ধেক নিজের জন্য নির্ধারণ করেছে। আর প্রথমজন সমগ্র মুনাফার দুই তৃতীয়াংশ লাভ করেছে, সুতরাং দুই তৃতীয়াংশ উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে।

কিন্তু প্রথম সূরতটি ভিন্ন। কেননা পুঁজিদাতা সেখানে সমগ্র মুনাফার অর্ধেক নিজের জন্য নির্ধারণ করেছিল। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে বিধান পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

আর যদি পুঁজিদাতা বলে থাকে যে, যা কিছু মুনাফা তুমি লাভ করবে তা আমার ও তোমার মাঝে অর্ধেক করে বন্টিত হবে। এমতাবস্থায় সে অন্যকে অর্ধেক মুনাফার শর্তে পুঁজি প্রদান করল তাহলে দ্বিতীয়জন অর্ধেক মুনাফা পাবে। আর অবশিষ্ট অর্ধেক প্রথমজন ও পুঁজিদাতার মাঝে (অর্ধেক করে) বন্টিত হবে।

কেননা প্রথমজন দ্বিতীয় মোদারিবের জন্য অর্ধেক মুনাফার শর্ত নির্ধারণ করেছে; আর পুঁজিদাতার পক্ষ থেকে তার হাতে এ ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয়জন শর্তকৃত অর্ধেক মুনাফার অধিকারী হবে। আর পুঁজিদাতা নিজের জন্য ঐ মুনাফার অর্ধেক নির্ধারণ করেছে, যা প্রথমজন লাভ করবে, আর সে সমগ্র মুনাফার অর্ধেকই শুধু লাভ করেছে। সুতরাং ঐ অর্ধেক তাদের মাঝে বন্টিত হবে।

আর যদি পুঁজিদাতা বলে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা যা মুনাফা দান করবেন তার অর্ধেক আমার হবে। কিংবা বললো, যা কিছু 'বাড়তি' হবে তা আমার ও তোমার মাঝে অর্ধেক হবে। আর প্রথমজন যদি অন্যকে অর্ধেক মুনাফার শর্তে অর্থ প্রদান করে থাকে তাহলে পুঁজিদাতা অর্ধেক মুনাফা পাবে আর দ্বিতীয় মোদারিব অর্ধেক পাবে। আর প্রথম মোদারিব কিছুই পাবে না।

কেননা পুঁজিদাতা নিজের জন্য নিঃশর্ত 'বাড়তির' অর্ধেক নির্ধারণ করেছে। সুতরাং দ্বিতীয়জনের জন্য প্রথমজনের পক্ষ হতে অর্ধেক মুনাফার শর্ত নির্ধারণ তার প্রাপ্য অর্ধেকের সমগ্রের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং শর্ত মতে প্রথমজনের প্রাপ্য অর্ধেক মুনাফা দ্বিতীয় জনের প্রাপ্য হয়ে যাবে। আর প্রথম জন শূন্য হাতে বের হয়ে আসবে। যেমন কাউকে এক দিরহামের বিনিময়ে একটি কাপড় সেলাই করার জন্য মজদূর নিযুক্ত করা হলো, আর সে একই মজুরিতে অন্য একজনকে ঐ কাপড় সেলাই করার জন্য মজদূর নিযুক্ত করল।

আর যদি দ্বিতীয় মোদারিবের জন্য মুনাফার দুই তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করে থাকে তাহলে পুঁজিদাতা অর্ধেক মুনাফা পাবে আর দ্বিতীয় মোদারিব অবশিষ্ট অর্ধেক পেয়ে যাবে। তদুপরি প্রথম মোদারিব দ্বিতীয়জনের অনুকূলে নিজের মাল থেকে সমগ্র মুনাফার এক ষষ্ঠাংশের দায়বহন করবে।

কেননা সে দ্বিতীয় জনের জন্য এমন কিছুর শর্ত কবুল করেছে, যা পুঁজিদাতার প্রাপ্য। সুতরাং পুঁজিদাতার হকের ক্ষেত্রে ঐ শর্ত কার্যকর হবে না। কারণ তাতে পুঁজিদাতার হক বাতিল করা হয়। কিন্তু স্বকীয়ভাবে উক্ত শর্ত নির্ধারণ সিদ্ধ হয়েছে। কেননা উল্লেখকৃত পরিমাণটি পরিজ্ঞাত, এবং এমন চুক্তিতে তা স্থিত, যা সম্পাদনের অধিকার তার রয়েছে। আর সে দ্বিতীয় জনের জন্য নিরাপত্তার দায় গ্রহণ করেছে। সুতরাং সে দায় রক্ষা করা তার জন্য আবশ্যক হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, সে চুক্তির মাধ্যমে তাকে ধোকায় ফেলেছে। আর চুক্তির মধ্য দিয়ে ধোকার বেলা (ক্ষতিপূরণ উশুল করার জন্য) রুজু করার কারণ (রূপে বিবেচ্য)। এ কারণেই দ্বিতীয়জন তার কাছে রুজু করবে।

আর প্রথম মোদারিব (এখানে) ঐ ব্যক্তির নযীর, যাকে এক দিরহামের বিনিময়ে একটি কাপড় সেলাই করার জন্য মজদূর নিযুক্ত করা হলো, আর সে দেড় দিরহামের বিনিময়ে সেলাই করার জন্য ঐ কাপড় অন্য একজনকে দিল।

মোদারিব যদি পুঁজিদাতার জন্য মুনাফার এক তৃতীয়াংশের শর্ত নির্ধারণ করে, আর পুঁজিদাতার গোলাম তার সাথে কাজ করবে— এই শর্তে তার জন্য এক তৃতীয়াংশ মুনাফা নির্ধারণ করে আর নিজের জন্য এক তৃতীয়াংশ মুনাফা নির্ধারণ করে, তাহলে তা জায়িয হবে।

কেননা গোলামের শরীয়াত অনুমোদিত দখল ক্ষমতা রয়েছে। বিশেষতঃ যদি সে মনিবের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। আর গোলামের শ্রমদানের শর্ত গ্রহণ অনুমতি প্রদানেরই নামান্তর।

আর গোলামের দখল ক্ষমতা অনুমোদিত বলেই গোলাম কারো কাছে যা আমানত রেখেছে তা আমানত গ্রহণকারীর কাছ থেকে গ্রহণ করার ক্ষমতা মনিবের নেই, এমনকি গোলাম নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হলেও। আর এ কারণেই অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের কাছে মনিবের বিক্রয় করা জায়িয রয়েছে। বিষয়টি যখন এমনই হলো তখন পুঁজি অর্পণের ক্ষেত্রে এবং পুঁজি ও মোদারিবের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তুলে দেয়ার ক্ষেত্রে এই শর্ত আরোপের ব্যাপারে কোন বাধা থাকবে না।

পক্ষান্তরে পুঁজিদাতার উপর শ্রমদানের শর্ত আরোপ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা মোদারিবের হাতে পুঁজির নিরঙ্কুশ অর্পণের জন্য প্রতিবন্ধক, যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মোট কথা (উপরোক্ত সূরতে) মোদারাবা চুক্তি যখন সিদ্ধ হলো তখন শর্ত অনুযায়ী মুনাফার এক তৃতীয়াংশ মোদারিবের জন্য হবে। আর দুই তৃতীয়াংশ (পুঁজিদাতার) মনিবের জন্য হবে। কেননা গোলামের যিম্মায় ঋণ না থাকলে তার উপার্জন মনিবের হয়ে থাকে। আর যদি গোলামের যিম্মায় ঋণ থাকে তাহলে তা পাওনাদার হবে। এই বিধান হলো তখন, যখন উপরোক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী মনিব নিজে হয়।

আর যদি অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম অন্য কারো সাথে মোদারাবা চুক্তি সম্পাদন করে এবং মনিবের উপর শ্রমদানের শর্ত আরোপ করে তাহলে তা সিদ্ধ হবে না, যদি গোলাম ঋণমুক্ত হয়।

কেননা এটা হলো পুঁজির মালিকের উপর শ্রম দানের শর্ত আরোপ।

আর যদি গোলাম ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এই শর্ত আরোপ বৈধ হবে।

কেননা এ ক্ষেত্রে তার মতে মনিব হচ্ছে অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত, যেমন (পূর্বে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম বিষয়ক অধ্যায়ে) আলোচিত হয়েছে।

অব্যাহতি দান ও মুনাফা বণ্টন

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পুঁজিদাতা বা মোদারিব যদি মারা যায় তাহলে মোদারাবা বাতিল হয়ে যায়।

কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা হলো ওকীল নিয়োগের মত। আর মুআক্কিল বা উকীলের মৃত্যু 'ওয়াকালাত' চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। 'ওয়াকালাত'-এর ক্ষেত্রে মীরাছ কার্যকর হয় না, ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহ না করুন, পুঁজিদাতা যদি মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তাহলে মোদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা দারুল হরবে সংযুক্ত হওয়া মৃত্যুর পর্যায়ভুক্ত। দেখুন না, সে ক্ষেত্রে তার সম্পত্তি ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন হয়ে যায়।

আর দারুল হরবে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মোরতাদ পুঁজিদাতার মোদারিব-এর যাবতীয় কার্যকলাপ ক্ষমতা স্থগিত থাকবে।

কেননা সে তো পুঁজিদাতার জন্যই লেনদেন করে থাকে। মোদারিবের লেনদেন পুঁজিদাতার নিজের লেনদেনের মতই হলো।

আর যদি মোদারিব নিজে মোরতাদ হয় তাহলে মোদরাবা চুক্তি বহাল থাকবে।

কেননা (মানবতা ভিত্তিতে) মোরতাদের অধিকারে বিশুদ্ধ 'বক্তব্য ক্ষমতা' রয়েছে। আর পুঁজিদাতার মালিকানায় স্থগিতাবস্থা উদ্ভূত হয়নি। সুতরাং মোদারাবা বহাল থাকবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পুঁজিদাতা যদি মোদারিবকে অব্যাহতি প্রদান করে, আর সে অব্যহতি সম্পর্কে অবগত না হয় ফলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করে তাহলে তার এ লেনদেন বৈধ হবে।

কেননা সে হলো পুঁজিদাতার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ওকীল। আর ওকীলকে উচ্ছাকৃত অব্যাহতি দান ওকীলের অবগতি লাভের উপর মওকুফ থাকে।

আর যদি সে তার অব্যাহতি সম্পর্কে অবগত হয় এমন অবস্থায় যে, পুঁজি পণ্যের আকারে বিদ্যমান, তাহলে সে তা বিক্রি (করে পুজিকে মুদ্রায় রূপান্তরিত) করতে পারে; অব্যাহতি দান তাকে তা থেকে বাধা দিতে পারে না।

কেননা মুনাফার ক্ষেত্রে তার হক সাব্যস্ত হয়ে গেছে আর তা বণ্টনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। আর মুনাফা বণ্টন পুঁজি (কে পৃথক করার) উপর নির্ভর করে। আর তা বিক্রয়ের মাধ্যমেই তরল মুদ্রায় রূপান্তরিত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এরপর ঐ পণ্যের মূল্য দ্বারা অন্য কিছু ক্রয় করা জায়িয নয়।

কেননা অব্যাহতি কর্যকরি না হওয়া পুঁজিকে পৃথকীকরণের অনিবার্য প্রয়োজনে ছিল। আর পুঁজি নগদ মুদ্রায় রূপান্তরিত হওয়ার পর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং অব্যাহতি কার্যকর হবে।

আর যদি অব্যাহতি প্রদানের সময় পুঁজি দিরহাম-দীনার রূপে তরল মুদ্রায় বিদ্যমান থাকে তাহলে তাতে হস্তক্ষেপ করা তার জন্য জায়িয হবে না।

কেননা তার অব্যাহতি কার্যকর করায় মুনাফার ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য হক বাতিল করায় কোন দিক নেই। সুতরাং কার্যকারিতা স্থগিত রাখার কোন প্রয়োজন নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরী (র) এই যে বিধান উল্লেখ করেছেন, তা তখন হবে যখন বিদ্যমান পুঁজি প্রদত্ত পুঁজির সমশ্রেণীর হয়। পক্ষান্তরে যদি তা না হয়, যেমন বিদ্যমান পুঁজি হলো দিরহাম আর প্রদত্ত পুঁজি হলো দীনার কিংবা তার উল্টো হলো, সে ক্ষেত্রে তার অধিকার রয়েছে বিদ্যমান পুঁজিকে প্রদত্ত পুঁজির সমশ্রেণীর বিনিময়ে ছারফ বিক্রি করা। এ বিধান হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। কেননা তা তাড়া মুনাফা প্রকাশ পাবে না।

আর এটা হলো পণ্যের মত।

পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং পণ্যের মত জিনিস বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পুঁজিদাতার মৃত্যুর বিধানও একই হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দুজন যদি মোদারাবা চুক্তি থেকে পৃথক হয়ে যায়, এমন অবস্থায় যে পুঁজিতে মানুষের কাছে প্রাপ্য ঋণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, মোদারিব এর পুঁজি দ্বারা মুনাফা অর্জন করেছে; এ ক্ষেত্রে বিচারক তাকে ঋণ তাগাদা (করে উশুল) করতে বাধ্য করবে।

কেননা সে নিযুক্ত মজদূরের পর্যায়ভুক্ত। আর প্রাপ্ত মুনাফা হলো তার মজুরির মত।

আর যদি ঐ পুঁজি দ্বারা কোন মুনাফা অর্জন না করে থাকে তাহলে তাগাদা করা তার জন্য আবশ্যক হবে না।

কেননা সে নিছক ওকীল। আর স্বেচ্ছা দানকারীকে যা সে দান করেছে তা পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না।

তবে তাকে বলা হবে যে, ঋণ তাগাদা করার জন্য পুঁজিদাতাকে তুমি ওকীল নিযুক্ত কর।

কেননা চুক্তির দায়দায়িত্ব চুক্তিকারীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং তার পক্ষ থেকে ওকীল নিযুক্ত করা অপরিহার্য। আর পুঁজিদাতার ওকীল হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার হক নষ্ট না হওয়া।

'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) বলেছেন। যে, তাকে 'ওকীল নিযুক্ত কর' স্থলে 'হাওয়ালা কর' বলা হবে। তবে তার অর্থ হলো ওকীল নিয়োগ।

অন্য সকল 'ওয়াকালাত'-এর ক্ষেত্রেও একই বিধান ।

আর 'বিক্রয় কর্মী' ও দালালকে ঋণ তাগাদা করতে বাধ্য করা হবে। (কেননা সারাধরণত: তারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোদারাবার যে পুঁজি হালাক হবে, সেটা মুনাফা থেকে কাটা যাবে, পুঁজি থেকে নয়।

কেননা মুনাফা হলো পুঁজির অনুবর্তী। আর হালাক হওয়া মালকে অনুবর্তীর দিকে প্রত্যাবর্তিত করাই শ্রেয়। যেমন যাকাতের ক্ষেত্রে হালাক হওয়ার বিষয়টিকে নিসাবের অতিরিক্ত অংশের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হয়।

আর যদি হালাক হওয়া মাল মুনাফার পরিমাণ থেকে বেশী হয় তাহলে মোদারিবের উপর ক্ষতিপূরণের দায় নেই।

কেননা এ বিষয়ে সে হলো আমানতদার।

আর যদি এমন হয় যে, তারা মুনাফা ভাগ করে নেয়, আর মোদারাবা চুক্তি তখনো বহাল রয়েছে। এরপর আংশিক মাল কিংবা সমগ্র মাল হালাক হয়ে যায়, তাহলে বর্ণিত মুনাফা উভয়ে ফেরত প্রদান করবে যাতে পুঁজিদাতা তার পুঁজি উশুল করে নিতে পারে।

কেননা পুঁজি উশুল হওয়ার আগে মুনাফার বণ্টন বৈধ নয়। এটাই হলো মূল। আর এটার উপরই মুনাফার ভিত্তি এবং মুনাফা এটার অনুবর্তী।

সুতরাং মোদারিবেব হাতে যে মাল রয়েছে সেটা যখন আমানত হিসাবে হালাক হয়ে গেলো তখন প্রকাশ পেয়ে গেলো যে, উভয়ে মুনাফার নামে যা উশুল করেছে, তা পুঁজি থেকে করেছে। সুতরাং মোদারিব যা উশুল করেছে; সে তার যামিন হবে। কেননা সে নিজের জন্য নিয়েছে।

পক্ষান্তরে পুঁজিদাতা যা গ্রহণ করেছে তা তার পুঁজি থেকে হিসাব হবে।

পুঁজিদাতা তার পুঁজি উশুল করার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় সেটা উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে।

কেননা এটা হলো মুনাফা।

আর যদি পুঁজিতে কম পড়ে তাহলে মোদারিব তার যামিন হবে না।

এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর যদি মুনাফা বণ্টনের পর উভয়ে মোদারাবা চুক্তি রহিত করে ফেলে এরপর দ্বিতীয়বার মোদারাবার চুক্তি করা হয় আর মাল হালাক হয়ে যায়, তাহলে পূর্ববর্তী মোদারাবার মুনাফা উভয়ে ফেরত দিবে না।

কেননা প্রথম মোদারাবা শেষ হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়টি হলো নতুন চুক্তি। সুতরাং দ্বিতীয়টিতে মাল হালাক হওয়া প্রথম মোদারাবার মুনাফা বণ্টনকে ভঙ্গ করা অনিবার্য করে না। যেমন মোদারিবকে ভিন্ন পুঁজি প্রদান করার ক্ষেত্রে।

মোদারিব যা করতে পারবে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নগদে এবং বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করা মোদারিবের জন্য জায়িয রয়েছে।

কেননা এসবই ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং চুক্তির নি:শর্ততা তাকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

তবে যদি এত দীর্ঘ মেয়াদে বিক্রি করে যা ব্যবাসয়ীরা সাধারণত: করে না (তবে তা বৈধ হবে না)।

কেননা ব্যবসায়ী সমাজে প্রচলিত ও সাধারণ লেনদেনের অধিকার তার রয়েছে। এ কারণেই ব্যবসায়িক প্রয়োজনের আরোহণের পশু ক্রয় করতে পারে। আরোহণের জন্য নৌকা ক্রয় করতে পারে না। তদ্রূপ ব্যবসায়ীদের প্রচলন বিবেচনা করে তার নৌকা ভাড়া করার অধিকার থাকবে।

আর প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে মোদারাবার অর্থে ক্রয়কৃত গোলামকে সে ব্যবসা করার অনুমতি দিতে পারে। কেননা এটা ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত।

আর যদি নগদে বিক্রি করার পর মূল্য পরিশোধের জন্য সময় প্রদান করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা জায়িয হবে।

তারফায়নের মতে এ কারণে যে, বিক্রয়ের ওকীলের সে অধিকার রয়েছে। সুতরাং মোদারিব আরো স্বাভাবিকভাবেই সে অধিকার পাবে। তবে (সময় প্রদানের কারণে মূল্য হাতছাড়া হলে) মোদারিব দায়বহন করবে না। কেননা মোদারিব উক্ত বিক্রয়কে প্রত্যাহার করে নতুনভাবে ঐ ক্রেতার কাছে বাকিতে বিক্রি করতে পারে। কিন্তু বিক্রয়ের ওকীল তা করতে পারে না।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, কারণ এই যে, মোদারিব উক্ত বিক্রয় প্রত্যাহার করে বাকীতে বিক্রয় চুক্তি করতে পারে। পক্ষান্তরে ওকীল বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে না।

আর যদি সে মূল্য পরিশোধের বিষয়ে ক্রেতার পক্ষ থেকে সচ্ছল বা অসচ্ছল ব্যক্তি হাওয়ালা গ্রহণ করে তাহলে তা জায়িয হবে।

কেননা হাওয়ালা প্রদান ও গ্রহণ ব্যবসায়ীদের রীতিভুক্ত বিষয়। পক্ষান্তরে অছী যদি এতীমের মালের ব্যাপারে কারো হাওয়ালা গ্রহণ করে তা হলে বিধান ভিন্ন হবে। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে (বাচ্চার হক রক্ষার বিষয়ে) অধিকতর কল্যাণ বিবেচিত হবে। কেননা অছীর লেনদেন কল্যাণ বিবেচনার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, মোদারিব যে কার্য কলাপ করে তা তিন প্রকার। এক প্রকার হল যার অধিকার সে লাভ করে সাধারণ মোদারাবা চুক্তি দ্বারা। আর তা হচ্ছে মোদারাবা এবং মোদারাবার অনুবর্তী বিষয়সমূহ যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তন্মধ্যে একটি হলো ক্রয় বা বিক্রয়ের উকীল নিয়োগ করা। কেননা এর প্রয়োজন রয়েছে। আর বন্ধক প্রদান ও বন্ধক গ্রহণ করা। কেননা এটা হলো ভাড়ায় প্রদান ও ভাড়ায় গ্রহণ এবং (কারো কাছে) আমানত রাখা, বিক্রয় করার জন্য পণ্য প্রদান করা এবং পুঁজি বা পণ্য নিয়ে সফর করা । যেমন ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

আরেক প্রকার হলো এমন, যার অধিকার সাধারণত: মোদারাবা চুক্তি দ্বারা লাভ করা যায় না। বরং যখন বলা হয় যে, তুমি তোমার মতানুসারে কাজ কর তখন তার অধিকার লাভ করে আর তা হলো ঐ সব কর্ম, যা প্রথম প্রকারের সাথে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং প্রমাণ পাওয়া গেলে তার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। যেমন মোদারাবার ভিত্তিতে বা শরীকানার ভিত্তিতে অন্য কাউকে পুঁজি প্রদান। আর মোদারাবার মালকে নিজের বা অন্যের মালের সঙ্গে মিশ্রিত করা।

কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, পুঁজিদাতা তার শরীকানায় সম্মত হয়েছে। অন্য কারো শরীকানায় নয়। আর এগুলো হচ্ছে সাময়িক বিষয়, যার উপর ব্যবসা নির্ভরশীল নয়। সুতরাং তা সাধারণ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না, তবে পুঁজি বৃদ্ধির একটি দিক। আর এই দিক থেকে তা মোদারাবা চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং (পুঁজিদাতার সম্মতির) প্রমাণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তা মোদারাবা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর পুঁজিদাতার বক্তব্য "তুমি তোমার মত অনুযায়ী কাজ কর" সেটারই প্রমাণ।

আরেক প্রকার হলো এমন, যার অধিকার সাধারণ চুক্তির দ্বারা লাভ হয় না। এমন কি তুমি তোমার মত অনুসারে কাজ কর এই সম্মতি প্রকাশ দ্বারাও হয় না যতক্ষণ না পুঁজিদাতা সেটা স্পষ্ট উল্লেখ করবে। অর্থাৎ পুঁজি দ্বারা পণ্য ক্রয় করার পর ঋণে দিরহাম ও দীনারের বিনিময়ে কোন কিছু খরিদ করা এবং ঋণ ক্রয়ের সদৃশ ক্রয়।

কেননা তখন মাল ঐ পরিমাণের চেয়ে বেশী হয়ে যায় যে পরিমাণের উপর মোদারাবা চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং স্বভাবত:ই অতিরিক্ত পরিমাণ সংযোজনে সম্মত হবে না এবং নিজেকে ঋণের দায়ে আবদ্ধ করবে না।

আর যদি পুঁজিদাতা মোদারিবকে 'ঋণক্রয়ের' অনুমতি প্রদান করে তাহলে খরিদকৃত পণ্য তাদের মাঝে অর্ধেক করে হবে। যেমন সুনামের ভিত্তিতে শরীকানায় (شركة الوجوه) এবং হুণ্ডি গ্রহণের ক্ষেত্রে। কেননা এটাও এক ধরণের ঋণ গ্রহণ। তদ্রূপ মালের বিনিময়ে কিংবা মাল ছাড়া আযাদ করা এবং কিতাবাত চুক্তি সম্পাদন করা। কেননা এগুলো ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয় নয়। তদ্রূপ কর্য প্রদান হেবাকরণ ও ছাদাকা প্রদান। কেননা এগুলো নিছক অনুগ্রহ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোদারাবার মাল দ্বারা কোন দাস বা দাসীকে বিবাহ প্রদান করতে পারে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, দাসীকে বিবাহ দিতে পারে। কেননা এটা উপার্জনের একটি পন্থা। দেখুন না, তা দ্বারা মাহর অর্জিত হয়। আর ভরণ পোষণের দায় রহিত হয়।

তারফায়নের দলীল এই যে, এটা ব্যবসাসংক্রান্ত কাজ নয়। আর ব্যবসা চুক্তি ব্যবসার জন্য ওকীল নিয়োগের বিষয়টিকেই শুধু অন্তর্ভুক্ত করে।

সুতরাং কিতাবাত চুক্তি এবং মালের বিনিময়ে আযাদ করা সদৃশ হলো। কারণ এটাও অর্থ উপার্জন। কিন্তু যেহেতু তা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ নয়, সেহেতু তা মোদারাবা এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। দাসীকে বিবাহ দানও তদ্রূপ।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মোদারিব যদি মোদারাবার কিছু মাল পুঁজিদাতাকে 'বিদাআ' রূপে অর্পণ করে, আর পুঁজিদাতা তা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করে তাহলে মোদারাবা বহাল থাকবে।

আর ইমাম যুফার (র) বলেন, মোদারাবা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা পুঁজিদাতা নিজের মালের মধ্যে তাসাররুফ করছে। সুতরাং ঐ মালের ব্যাপারে সে ওকীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তাই সে নিজের মাল ফেরত গ্রহণকারী হবে। এ কারণেই তো শুরুতে পুঁজিদাতার উপর শ্রমদানের শর্ত আরোপ করা হলে মোদারাবা চুক্তি সিদ্ধ হয় না।

আমাদের দলীল এই যে, এখানে মোদারিব ও মোদাবারার মালের মাঝে ক্ষমতা অবাধকরণ পূর্ণ হয়েছে। আর যাবতীয় লেনদেন মোদারিবের হক রূপে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং লেনদেনের ক্ষেত্রে পুঁজিদাতা মোদারিবের ওকীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর মোদারিব কর্তৃক পুঁজিদাতাকে বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রদানের অর্থ হলো তার পক্ষ থেকে ওকীল নিয়োগ। সুতরাং এটা মোদারাবা চুক্তি ভেঙ্গে দিয়ে মাল ফেরত নেয়া বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে শুরুতে পুঁজিদাতার উপর শ্রমদানের শর্ত আরোপ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা মোদারিব ও মোদারাবার মালের মাঝে ক্ষমতা অবাধ্যকরণকে বাধাগ্রস্ত করে।

তদ্রূপ পুঁজিদাতাকে মোদারাবার ভিত্তিতে মাল প্রদানের বিষয়টিও ভিন্ন। এটা সিদ্ধ নয়। কেননা মোদারাবা সম্পন্ন হয় পুঁজিদাতার পুঁজি এবং মোদারিবের শ্রম-এর মাধ্যমে শরীকানার উপর। অথচ এখানে মোদাবিরের কোন পুঁজি নেই। সুতরাং এই মোদারাবা চুক্তিকে যদি আমরা বৈধতা দান করি তাহলে প্রকৃত বিষয় উল্টো হওয়া অনিবার্য হয়। আর দ্বিতীয় মোদারাবা চুক্তি যখন সিদ্ধ হলো না, তখন মোদাবিরের আদেশে পুঁজিদাতার শুধু শ্রমদান হলো। সুতরাং মোদারাবার ভিত্তিতে এই অর্থ প্রদানের কারণে প্রথম মোদারাবা চুক্তিটি বাতিল হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মোদারিব যদি তার শহরেই ব্যবসা করে তাহলে তার খরচপত্র মোদারাবার মাল থেকে নেয়া যাবে না। আর যদি অন্য শহরে সফর করে তাহলে তার পানাহার, পোশাক ও বাহন মোদারাবার মাল থেকে নির্বাহ করা হবে। 'বাহনের ক্ষেত্রে' কথাটির অর্থ হলো ক্রয় বা ভাড়ার মাধ্যমে বাহনের ব্যবস্থা করা।

পার্থক্যের কারণ এই যে, 'খরচপত্র' অবশ্য সাব্যস্ত হয় কাজে আবদ্ধ থাকার বিপরীতে। যেমন বিচারকের খরচ, স্ত্রীর খরচ। অথচ মোদারিব তো স্থায়ী নিবাসের কারণেই শহরে বাস করছে। পক্ষান্তরে যখন সফর করে তখন মোদারাবার কারণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং মোদারাবার মাল থেকে খরচ লাভের অধিকারী হয়। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমদাতার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেতো বিশ্চিত ভাবেই শ্রমের বিনিময়-এর হকদার হবে। সুতরাং নিজের মাল থেকে খরচ করার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। পক্ষান্তরে মোদারিবের তো মুনাফা ছাড়া কিছু প্রাপ্য নেই। আর তা অনিশ্চয়তা পূর্ণ। সুতরাং যদি সে নিজের মাল থেকে খরচ করে তাহলে তা দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তদ্রূপ ফাসিদ মোদারাবার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (ঐ ক্ষেত্রে) সে হলো মজদূর (বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমদাতা)।

তদ্রূপ বিদাআ-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে হলো স্বেচ্ছা শ্রমদানকারী।

আর যদি নিজের শহরে ফিরে আসার পর তার হাতে (খাবার বা অন্যান্য দ্রব্যের) কিছু থেকে যায় তাহলে তা মোদারাবার মালে ফেরত দিতে হবে।

কেননা প্রাপ্যতা শেষ হয়ে গেছে।

আর যদি সফরের কম দূরত্বে বের হয়, এভাবে যে, সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসে এবং নিজের পরিবার পরিজনের কাছেই রাত্রি যাপন করে, তাহলে সে শহরের বাজার ব্যবাসয়ীর পর্যায়ভুক্ত হবে। (সুতরাং খরচ পাবে না)। আর যদি নিজের পরিবারে রাত্রি যাপন করতে না পারে তাহলে তার খরচপত্র মোদারাবার মাল থেকেই হবে।

কেননা তার বের হওয়া মোদারাবার জন্যই ছিলো।

আর অবশ্য প্রাপ্য খরচ বলতে সেটাকেই বোঝানো হচ্ছে, যা নৈমিত্তিক প্রয়োজনে ব্যয় হয়। আর নৈমিত্তিক প্রয়োজন সেগুলোই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তার মধ্যে রয়েছে তার কাপড় ধোলাই এবং তার একজন (ব্যক্তিগত) কাজের লোকের পারিশ্রমিক এবং তার আরোহণের পশুর দানাপানি এবং যে সকল অঞ্চলে (বা মৌসুমে) সাধারণত প্রয়োজন পড়ে, সেখানের জন্য তেল (সাবানের) খরচ। যেমন হেজায অঞ্চল। আর এ সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করাই শুধু বৈধ হবে। সুতরাং স্বাভাবিকের সীমা ছাড়িয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করলে তার দায় সে নিজে বহন করবে। এ সিদ্ধান্ত ব্যবসায়ী সমাজে প্রচলিত রীতির উপর ভিত্তি করে।

পক্ষান্তরে অষুধপত্র তার নিজের মাল থেকে ব্যয় করবে।

এটা যাহির রেওয়ায়েত অনুযায়ী। আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা মতে অষুধের মূল্য খরচের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা এটা তার শরীর ঠিক রাখার জন্য ব্যয় করা হয়। আর শরীর ঠিক থাকা ছাড়া সে ব্যবসা করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং এটা সাধারণ খরচের মত হলো।

আর যাহির রেওয়ায়েতের দলীল এই যে, খরচের প্রয়োজন দ্বারা বোঝায় যা অবধারিত আর অষুধের প্রয়োজন অসুস্থতার উপসর্গের কারণে। এ কারণেই স্ত্রীর

ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর আর স্ত্রীর অষুধের খরচ তার নিজের মালের উপর অর্পিত।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মোদারিব যখন মুনাফা অর্জন করবে তখন পুঁজিদাতা ঐ মাল নিয়ে নিবে, যা মোদারিব পুঁজি থেকে খরচ করেছে।

আর যদি (নিজের প্রয়োজনে খরচ করার পর) মোরাবাহার (নির্ধারিত মুনাফার) ভিত্তিতে কোন পণ্য বিক্রি করে তাহলে ঐ পণ্যের পিছনে পরিবহন ও অন্যান্য খাতে যে ব্যয় করেছে সেটা হিসাবে ধরবে। কিন্তু নিজের উপর যা খরচ করেছে সেটা হিসাবে ধরা হবে না।

কেননা প্রথমোক্ত ব্যয় যোগ করার ব্যাপারে রীতি প্রচলিত রয়েছে, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে নয়।

তাছাড়া প্রথমোক্ত ব্যয়, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পণ্যের সম্পদগুণ বৃদ্ধিকে অনিবার্য করে। অথচ দ্বিতীয়টি তা করে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি মোদারিবের কাছে বিদ্যমান পুঁজির পরিমাণ **হয় এক হাযার আর সে তা দ্বারা কোন বস্ত্র ক্রয় করলো।** অত:পর নিজের **পক্ষ থেকে একশ দিরহাম খরচ করে ঐ বস্ত্র ধোলাই করল বা বহন করল,** আর তাকে **বলা হয়েছিল যে, তুমি তোমার মতানুযায়ী কাজ কর, তাহলে এই একশ দিরহামের ক্ষেত্রে সে স্বেচ্ছাদানকারী হবে।**

কেননা এটা হলো পুঁজিদাতার বিপক্ষে ঋণদান। সুতরাং মতানুযায়ী কাজ করার এই বক্তব্য সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। যেমন পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

আর যদি সে **বস্ত্রটিকে লাল রঙ্গে রঞ্জিত করে, তাহলে রঞ্জন** তাতে যে পুঁজি **বৃদ্ধি ঘটাবে তার বিপরীতে সে পুঁজিদাতার শরীকদার হবে।**

আর মোদারিব এই রঞ্জনের যামিন হবে ন। কেননা রক্তটা হচ্ছে বস্তুসত্তা সম্পন্ন মাল, যা রঞ্জিত দ্রব্যের সঙ্গে বিদ্যমান রয়েছে। সতুরাং ঐ রঞ্জিত বস্ত্র যখন বিক্রয় করা হবে তখন রঙের বিপরীতে প্রাপ্ত মূল্যাংশ মোদারিরে হবে। আর সাদা কাপড়ের বিপরীতে প্রাপ্ত মূল্যাংশ মোদারাবার ভিত্তিতে হবে।

ধৌলাই ও পরিবহনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ দুটি বস্তু সত্তাসম্পন্ন মাল নয়, যা পণ্যের সঙ্গে বিদ্যমান হতে পারে। এ কাণেই গছবকারী যদি গছবকৃত দ্রব্যে এই খাতে খরচ করে তাহলে তার এ কাজটা বেকার যাবে। পক্ষান্তরে যদি গসবকৃত দ্রব্য রঞ্জিত করে তাহলে তা রঞ্জন বেকার যাবে না।

যাই হোক, রঞ্জন দ্বারা সে যখন পুঁজিদাতার শরীকদার হয়ে গেলো, তখন 'তুমি তোমার মতানুযায়ী কাজ কর' এই বক্তব্য সেটাকে অন্তুর্ভুক্ত করবে। যেমন (মোদারাবার মালের সঙ্গে নিজের বা অন্যের মালের) মিশ্রণের বিষয়টিকে এ বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং সে বস্ত্রের ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি মোদারিবের নিকট অর্ধেক মুনাফার শর্তে সম্পন্ন মোদারাবার এক হাযার দিরহাম পুঁজি থাকে আর সে তা দ্বারা কাপড় খরিদ করে এবং দুই হাযার দিরহামে তা বিক্রি করে, অত:পর দুই হাযার দিরহাম দ্বারা একটি গোলাম খরিদ করে এবং নগদ মূল্য পরিশোধের পূর্বে ঐ দুই হাযার দিরহাম বিনষ্ট হয়ে যায়; তাহলে পুঁজিদাতা পনেরশ দিরহামের দায়বহন করবে। আর মোদারিব পাঁচশ দিরহামের দায়বহন করবে। আর গোলামের এক চতুর্থাংশের মালিকানা হবে মোদারিবের, আর তিন চতুর্থাংশ হবে মোদারাবাভুক্ত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উভয়ের মাঝে দায়বহনের এই বিভাজন যা ইমাম মুহম্মদ (র) উল্লেখ করেছেন, এটা (মূল বিধান নয়, বরং) বিধানের ফলশ্রুতি। কেননা চুক্তিসম্পাদনকারী হিসাবে পূর্ণমূল্য তো মোদারিবের উপরই বর্তাবে। তবে আমাদের সামনের বক্তব্য অনুযায়ী তার অধিকার থাকবে। পুঁজিদাতার কাছে পনেরশ দিরহাম রুজু করার ফলে শেষ বিবেচনায় মূল্য (তিন চতুর্থাংশ) পুঁজিদাতার উপরেই বর্তাচ্ছে।

এর কারণ এই যে, পণ্য (তথা বস্তুটি) যখন তরল মুদ্রায় পরিণত হলো মোদারিবের প্রাপ্য মুনাফা প্রকাশ পেল। আর তার পরিমাণ হচ্ছে পাঁচশ দিরহাম। এরপর যখন সে দুই হাযার দ্বারা একটি গোলাম খরিদ করল তখন দুই হাযারের বণ্টন হিসাবে সে গোলামের একচতুর্থাংশ মোদারাবার জন্য খরিদকারী হলো। আর যখন দুই হাযার দিরহাম বিনষ্ট হয়ে গেলো তখন আমাদের বর্ণিত কারণে গোলামের মূল্য মোদাবিরের উপরই অবশ্য সাব্যস্ত হবে। আর তার অধিকার থাকবে মূল্যের তিন চতুর্থাংশ পুঁজিদাতার কাছ থেকে রুজু করার। কেননা গোলাম খরিদ করার ব্যাপারে সে পুঁজিদাতার পক্ষ হতে নিযুক্ত ওকীল।

আর মোদারিবের হিসসা অর্থাৎ চতুর্থাংশ মোদারাবা থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা তার প্রাপ্য অংশটুকু তার উপরে দায় সম্পন্ন। অথচ মোদারাবার মাল হলো আমানতের মাল। আর উভয়ের মাঝে পরস্পর পার্থক্য রয়েছে।

আর গোলামের তিন চতুর্থাংশ মোদারাবার উপর বহাল থাকবে। কেননা তাতে এমন কোন গুণগত অবস্থা নেই, যা মোদারাবার পরিপন্থী।

আর মূলধন হবে দুই হাযার ও পাঁচশ দিরহাম। কেননা একবার সে এক হাযার প্রদান করেছে, আরেকবার এক হাযার ও পাঁচশ দিরহাম। তবে মোরাবাহার ভিত্তিতে এই গোলামকে শুধু দু'হাযার দিরহাম মূল্য ধরে বিক্রি করতে পারবে। কেননা মূলত: দুই হাযার দিরহাম দ্বারাই সে তা খরিদ করেছে।

আর উপরোল্লেখিত সিদ্ধান্তের ফলাফল প্রকাশ পাবে ঐ ক্ষেত্রে, যখন গোলামটি চার হাযারে বিক্রি করা হবে। কেননা তখন মোদারাবার অংশ হবে তিন হাযার এবং তা

থেকে মূলধন (আড়াই হাযার) তুলে নেয়া হবে। আর উভয়ের মাঝে মুনাফা হিসাবে পাঁচশ দিরহাম থাকবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, আর যদি তার কাছে এক হাযার দিরহাম পুঁজি থাকে, আর পুঁজিদাতা (কারো কাছ থেকে) পাঁচশ দিরহামে একটি গোলাম খরিদ করে এবং মোদারিবের কাছে সেটাকে এক হাজারে বিক্রি করে, তাহলে মোদারিব এটাকে পাঁচশ দিরহাম মূল্য ধরে মোরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে।

কেননা (মোদারিবের কাছে পুঁজিদাতার) এই বিক্রয়কে (উভয়ের) উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের কারণে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে, যাতে বান্দার প্রয়োজন পূর্ণ হয়। যদিও মূলত: এটা পুঁজিদাতার মালিকানাধীন বস্তু, তার মালিকানাধীন মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয়। তবে তাতে অবৈধতার একটা সন্দেহ রয়েছে। আর মোরাবাহা বিক্রয় (বাঁধা মুনাফার বিক্রয়)-এর ভিত্তি হলো আমানতের উপর এবং খেয়ানতের সন্দেহকেও পরিহার করার উপর। সুতরাং মূল্যদ্বয়ের স্বল্পতরটিকে বিবেচনা করা হয়েছে।

আর মোদারিব যদি একই হারে একটি গোলাম খরিদ করে এবং পুঁজিদাতার কাছে এক হাযার ও দুশ দিরহামে বিক্রি করে তাহলে পুঁজিদাতা সোটাকে একহাযার ও একশ দিরহাম মূল্য ধরে মোরাবাহা রূপে বিক্রি করতে পারবে।

কেননা মুনাফার অর্ধেকের ক্ষেত্রে তথা পুঁজিদাতার হিসসার ক্ষেত্রে এই (দ্বিতীয়) বিক্রয়কে অবিদ্যমান বিবেচনা করা হবে। ক্রয়-বিক্রয় পর্বে (মোরাবাহা অধ্যায়ে) বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি মোদারিবের নিকট অর্ধেক মুনাফার শর্তে সম্পাদিত মোদারাবার এক হাযার দিরহাম পুঁজি বিদ্যমান থাকে আর সে তা দ্বারা একটি গোলাম খরিদ করে, যার মূল্য দু' হাযার দিরহাম; অতঃপর গোলাম ভুলক্রমে কোন লোককে হত্যা করে বসে তাহলে 'মুক্তিপণের' তিন চতুর্থাংশ পুঁজিদাতার উপর বর্তাবে। আর এক চতুর্থাংশ মোদারিবের উপর বর্তাবে।

কেননা 'মুক্তিপণ' হল মালিকানার দায়। সুতরাং তা মালিকানার পরিমাণের ভিত্তিতে 'পরিমার্ণিত' হবে। আর উভয়ের মাঝে মালিকানা ছিল 'চতুর্থাংশ' ভিত্তিক।

কারণ মাল যখন 'একবস্তুতে' রূপান্তরিত হল যার মূল্য হচ্ছে দুই হাযার দিরহাম তখন মুনাফা প্রকাশ পেয়ে গেলো। আর তা হলো উভয়ের মাঝে বন্টিত এক হাযার দিরহাম আর পুঁজি হিসাবে পুঁজিদাতার হল এক হাযার দিরহাম। কেননা তার মূল্য হল দুই হাযার দিরহাম।

আর উভয়ে যখন ফিদয়া (বা মুক্তিপণ) প্রদান করবে তখন গোলামটি মোদারাবা থেকে বের হয়ে যাবে।

মোদারিবের হিসসা বের হওয়ার কারণ তো আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আর পুঁজিদাতার হিসসা বের হওয়ার বিষয়ে কাযীর ফায়সালা। কেননা এটা গোলামকে উভয়ের মাঝে বন্টন করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর বন্টন দ্বারা মোদারাবা শেষ হয়ে যায়।

(দুই হাযার নষ্ট হওয়া সংক্রান্ত) পূর্ববর্তী মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা সে ক্ষেত্রে সমগ্র মূল্য মোদারিবের উপর বর্তায়। যদিও তার রুজু করার হক থাকে। সুতরাং সেখানে বন্টনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

তাছাড়া (ভুলক্রমে হত্যাকারী) গোলাম তার অপরাধের কারণে উভয়ে মালিকানা থেকে 'বিচ্যুত' হওয়ার মত হয়ে গেল। আর মুক্তিপণ প্রদানের অর্থ হলো নতুনভাবে ক্রয় করা। সুতরাং গোলামটি উভয়ের মাঝে 'চারভাগ' ভিত্তিতে বন্টিত হবে, মোদারাবার ভিত্তিতে নয়। একদিন সে মোদারিবের খিদমত করবে এবং তিন দিন পুঁজিদাতার খিদমত করবে। পূর্ববর্তী মাসআলাটি ভিন্ন।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি মোদারিবের কাছে এক হাযার দিরহাম পুঁজি থাকে আর সে তা দ্বারা একটি গোলাম খরিদ করে। কিন্তু তা নগদ পরিশোধের পূর্বে এ হাযার হালাক হয়ে যায়। তাহলে পুঁজিদাতা ঐ মূল্য (মোদারিবকে) প্রদান করবে। আবার যদি (পরিশোধের পূর্বে) হালাক হয় তাহলে আবার প্রদান করবে। আবার হালাক হলে আবার প্রদান করবে; (এভাবে চলতে থাকবে)। আর পুঁজিদাতা মোদারিবকে যত পরিমাণ প্রদান করবে সবটা পুঁজিরূপে গণ্য হবে।

কেননা মোদারিবের হাতে এই মাল হল আমানত। আর আমানতের হুকুম দায় সাব্যস্তির বিপরীত। সুতরাং যতবার মাল হালাক হবে একের পর এক রুজু করতে থাকবে।

ক্রয়ের ওকীলের বিষয়টি ভিন্ন। ক্রয়ের পূর্বে মুআক্কিলের ওকীলের হাতে যদি মূল্য প্রদত্ত হয়ে থাকে। আর ক্রয়ের পর (মূল্য পরিশোধের পূর্বে) উক্ত মূল্য হালাক হয়ে যায় তাহলে ওকীল মুআক্কিলের কাছে একবার শুধু রুজু করতে পারে।

কেননা প্রথম রুজু করা দ্বারাই ওকীলকে নিজের হক উশূলকারী সাব্যস্ত করা সম্ভব। কেননা ওয়াকালাত দায়বদ্ধতার সাথে একত্র হতে পারে। যেমন গসবকারী যদি গসবকৃত গোলাম বিক্রয়ের উকীল হয়।

আর এই দূরত্বের ওয়াকালাতের ক্ষেত্রে ওকীল একবার শুধু রুজু করবে। পক্ষান্তরে যদি আগে ক্রয় করে এরপর মুআক্কিল ওকীলের হাতে মাল প্রদান করে আর তা হালাক হয়ে যায়, তাহলে রুজু করতে পারবে না।

কেননা নিছক ক্রয় দ্বারাই ওকীলের রুজু করার হক সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং ক্রয় করার পর মালের কবজা গ্রহণ দ্বারা তাকে হক উশূলকারী সাব্যস্ত করা হবে।

আর ক্রয়ের পূর্বে তার কাছে প্রদত্ত মাল তার হাতে আমানত রূপে থাকে। সুতরাং ক্রয়ের পরও সেটা আমানত রূপে বহাল থাকে। তাই এটা দ্বারা সে নিজের হক উশূল কারী হয়নি। সুতরাং ঐ মাল হালাক হলে সে একবার রুজু করতে পারবে। অতঃপর পুনঃরায় রুজু করতে পারবে না। কেননা হক উশূল করা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মতবিরোধ সম্পর্কে

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মোদারিবের কাছে যদি দুই হাযার দিরহাম থাকে, অথচ সে বলে যে, তুমি আমাকে এক হাযার প্রদান করেছো, আর আমি এক হাযার মুনাফা অর্জন করেছি। আর পুঁজিদাতা বলে যে, না, বরং আমি তোমাকে দুই হাযার দিয়েছি, সেক্ষেত্রে মোদারিবের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আবু হানীফা (র) প্রথমে বলতেন যে, পুঁজিদাতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। এটাই ইমাম যুফার (র) এরও মত।

কেননা মোদারিব পুঁজিদাতার বিপক্ষে মুনাফায় শরীকানার দাবী করছে। আর পুঁজিদাতা তা অস্বীকার করছে। আর অস্বীকারকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। পরবর্তীতে তিনি কিতাবে উল্লেখিত মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কেননা প্রকৃত পক্ষে মতবিরোধ হচ্ছে কবজাকৃত অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে। আর এরূপ ক্ষেত্রে কবজাকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হয়। কবজাকারী দায়বহনকারী হোক কিংবা আমানতবহনকারী। কেননা কবজাকৃত বস্তুর পরিমাণ সম্পর্কে সেই অধিক অবগত হবে।

আর যদি সেই সাথে মুনাফার পরিমাণ সম্পর্কেও মতবিরোধ করে তাহলে মুনাফা সম্পর্কে পুঁজিদাতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মুনাফার হকদারি সাব্যস্ত হয় শর্ত অনুযায়ী। আর শর্ত সাব্যস্ত হয় পুঁজিদাতার দিক থেকে।

আর দু'জনের যে কেউ অতিরিক্ত পরিমাণের দাবীর স্বপক্ষে বাইয়েনাহ পেশ করবে তার বাইয়েনাহ'গ্রহণ করা হবে।

কেননা বাইয়েনাহ কোন বিষয় সাব্যস্ত করার জন্যই হয়ে থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কারো কাছে যদি এক হাযার দিরহাম থাকে আর সে বলে যে, এটা অমুকের প্রদত্ত অর্ধেক মুনাফা ভিত্তিক মোদারাবার মাল। আর সে এক হাযার মুনাফা অর্জন করেছে; কিন্তু অমুক বলে যে, এটা বিদাআ (নিছক বিক্রয়ের জন্য প্রদত্ত) রূপে প্রদত্ত মাল তাহলে পুঁজিদাতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা মোদারিব পুঁজিদাতার বিপক্ষে নিজের কাজের মূল্যায়ন দাবী করছে, কিংবা পুঁজিদাতার পক্ষ থেকে একটি শর্ত বিদ্যমান হওয়ার দাবী করছে। কিংবা শরীকানায় দাবী করছে। আর সে তা অস্বীকার করছে।

আর যদি মোদারিব বলে যে, এই মাল তুমি আমাকে করয রূপে প্রদান করেছো আর মালের মালিক বলে যে, এটা বিদাআহ, কিংবা আমানত কিংবা

মোদারাবা রূপে প্রদত্ত মাল, তাহলে মালের মালিকের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর বাইয়েনাহ পেশ করার ক্ষেত্রে মোদারিবের বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা মোদারিব তার বিপক্ষে মুনাফার মালিক হওয়াব দাবী করছে। আর সে অস্বীকার করছে।

আর যদি পুঁজিদাতা একটি বিশেষে প্রকারে মোদারাবা সীমাবদ্ধ হওয়ার দাবী করে আর অপরজন বলে যে, তুমি নির্দিষ্ট কোন ব্যবসার কথা উল্লেখ করোনি, সে ক্ষেত্রে মোদারিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা মোদারাবার ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী ও নিঃশর্ত হওয়াই হলো মূল অবস্থা। আর বিশিষ্টতা আসে আরোপিত শর্তের কারণে। ওয়াকালাহ্-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাতে বিশিষ্টতাই হলো মূল অবস্থা।

আর যদি উভয়ের প্রত্যেকে এক প্রকার (ব্যবসার) দাবী করে তাহলে পুঁজিদাতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা উভয়ে বিশিষ্টতার ব্যাপারে একমত হয়েছে। আর অনুমতি পুঁজিদাতার দিক থেকে লব্ধ হয়। সুতরাং তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি উভয়ে বাইয়েনাহ পেশ করে তাহলে মোদারিবের বাইয়েনাহ গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তার নিজের উপর থেকে দায়বদ্ধতা নাকচ করার প্রয়োজন রয়েছে। পক্ষান্তরে অপরজনের বাইয়েনাহর প্রয়োজন নেই।

আর যদি উভয় বাইয়েনাতে আলাদা আলাদা সময় উল্লেখ করে তাহলে শেষ কসম উল্লেখকারীর বাইয়েনাহ অগ্রাধিকার লাভ করবে। কেননা দুই শর্তের দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে রহিত করে দেয়।

كِتَابُ الْوَدِيْعَةِ

অধ্যায় ঃ আমানত

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গচ্ছিত দ্রব্য যার কাছে গচ্ছিত রাখা হয় তার হাতে আমানত রূপে থাকে। যদি তা হালাক হয়ে যায়, তাহলে সে তার দায়বহন করবে না।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন,

ليس على المستعير غير المغل ضمان ولاعلى المستودع غير المغل ضمان (الدار قطني)

যে ধার গ্রহণ করেছে কিন্তু খেয়ানত করেনি তার উপর ক্ষতিপূরণের দায় নেই। তদ্রূপ যার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে; কিন্তু সে খেয়ানত (বা ত্রুটি) করেনি তার উপরও ক্ষতিপূরণের দায় নেই।

তাছাড়া এই কারণে যে, মানুষের প্রয়োজন রয়েছে। (নিজেদের মাল বিশ্বস্তলোকের কাছে) আমানত রাখার। এখন যদি আমরা তার উপর ক্ষতিপূরণের দায় আরোপ করি তাহলে মানুষ গচ্ছিত দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আমানত গ্রহণকারীর অধিকার রয়েছে তা নিজে হেফাজত করার এবং তার পরিবারভুক্ত লোকদের মাধ্যমে হেফাজত করার।

কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, সে ঐ পদ্ধতিতেই অন্যের মাল হেফাজত করার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করবে, যে পদ্ধতিতে নিজের মাল হেফাজত করে থাকে।

তাছাড়া নিজের পরিবারভুক্ত লোকদের হাতে মাল অর্পণ করা ছাড়া উপায়ও থাকে না। কেননা তার পক্ষে তো সব সময় বাড়িতে পড়ে থাকা কিংবা বাইরে যাওয়ার সময় মাল সাথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বোঝা যায় যে, আমানত প্রদানকারী এ বিষয়ে সম্মত রয়েছে।

আর যদি সে এদের পরিবর্তে অন্য কারো দ্বারা আমানতের মাল হেফাজত করে কিংবা এদের পরিবর্তে অন্য কারো কাছে গচ্ছিত রাখে তাহলে সে তার দায়গ্রহণ করবে।

কেননা আমানত প্রদানকারী তার সংরক্ষণে রাখতে সম্মত হয়েছে; অন্যের সংরক্ষণে নয়। আর আমানতের ব্যাপারে বিভিন্ন জনের সংরক্ষণ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

তাছাড়া কোন জিনিস তার সদৃশকে অন্তর্ভুক্ত করে না। যেমন ওকীল ঐ বিষয়ে অন্যকে ওকীল নিযুক্ত করতে পারে না। আর অন্যের হেফাজতে প্রদানের অর্থ হলো তার কাছে গচ্ছিত রাখা।

তবে যদি অন্য কারো সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে ভাড়া নেয় তাহলে নিজের সংরক্ষণ দ্বারা সংরক্ষণকারী বলেই গণ্য হবে।

ইমাম কুদূরী বলেন, যদি নিজের বাড়িতে আগুন লেগে যায় (কিংবা ডাকাত হানা দেয়) আর সে তা রক্ষা করার জন্য প্রতিবেশীর হাতে অর্পণ করে কিংবা সে জলযানে থাকে আর তা ডুবে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় এমতাবস্থায় অন্য কোন জলযানে তা ছুঁড়ে দেয় (তাহলে ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে না।)

কেননা এ অবস্থায় সংরক্ষণের পদ্ধতি হিসাবে এটাই নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং (সঙ্গত কারণেই) আমানত প্রদানকারী তাতে সম্মত হবে।

তবে এ বিষয়ে বাইয়েনাহ ছাড়া তার দাবী সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না।

কেননা সে ক্ষতিপূরণের দায়বহনের কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পর এমন অনিবার্য অবস্থার দ্বাবী করছে যা দায়বদ্ধতা রহিত করে। সুতরাং এটা ঐ অবস্থার মত হলো যখন সে দাবী করে যে, মালিকের পক্ষ হতে অন্যকারো কাছে আমানত রাখার অনুমতি দিন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি আমানতি মালের মালিক তা ফেরত চায় আর সে ফেরত প্রদানে বিরত থাকে; অথচ সে তা অর্পণ করতে সক্ষম ছিল, তাহলে সে এ আমানতের যামিন হবে।

কেননা বিরত থাকার মাধ্যমে সে সীমালংঘনকারী হয়েছে। এর কারণ এই যে,যখন সে ফেরত চেয়েছে, তখন বোঝা গেলা যে, এরপর সে-তার কাছে রাখতে সম্মত নয়। সুতরাং মালিকের থেকে তা আটক রাখার কারণে এর ক্ষতিপূরণের দায় তাকে বহন করতে হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আমানত গ্রহণকারী যদি আমানতি মালকে নিজের মালের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত করে ফেলে যে, তা পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না, তাহলে সে তার যামিন হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অতঃপর ঐ আমনতি মালের উপর আমানত প্রদানকারীর কোন অধিকার থাকবে না।

আর সাহেবায়ন বলেন, যদি সে আমানতের মাল সমশ্রেণীর সঙ্গে মিশ্রিত করে তাহলে আমানত প্রদানকারী ইচ্ছা করলে আমানত গ্রহণকারীর শরীকদার হতে পারবে। যেমন শুভ্র দিরহামকে শুভ্র দিরহামের সঙ্গে, কৃষ্ণকে কৃষ্ণ দিরহামের সঙ্গে গমকে গমের সঙ্গে এবং যবকে যবের সঙ্গে মিশ্রিত করল।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, বস্তুগত দিক থেকে তার হুবহু প্রাপ্য পর্যন্ত উপনীত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তার সাথে ভাগাভাগির মাধ্যমে গুণগতভাবে আপন প্রাপ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। সুতরাং এই মিশ্রণ কর্মটি একদিক থেকে বিনষ্টকরণ, কিন্তু অন্যদিক থেকে নয়। সুতরাং দু'টি দিকের যে দিকটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, মিশ্রণ হলো সর্বদিক থেকেই বিনষ্টিকরণ।

কেননা এটা এমন কাজ, যার পর তার হুবহু প্রাপ্য পর্যন্ত পৌছা সম্ভব নয়। আর ভাগাভাগির বিষয়টি বিবেচ্য নয়। কেননা এটা শরীকদারির আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা শরীকদারকে অনিবার্যকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আমানত প্রদানকারী যদি মিশ্রণকারীকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে মিশ্রিত দ্রব্যের উপর তার কোন অধিকার থাকবে না।

কেননা তার প্রাপ্য হলো অনির্ধারিত বস্তুতে, অথচ তা দায়মুক্ত করার কারণে রহিত হয়ে গেছে।

আর সাহেবায়নের মতে দায়মুক্ত করা দ্বারা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের ইচ্ছাধিকার রহিত হয়। সুতরাং মিশ্রিত দ্রব্যে শরীকানা নির্ধারিত হয়ে যাবে।

তিলের তেল, যয়তুন তেলের সাথে মিশ্রিত করা এবং যে কোন তরল পদার্থ তা থেকে ভিন্ন শ্রেণীর সাথে মিশ্রিত করা, মালিকের প্রাপ্যকে ক্ষতিপূরণের দায় লাভের দিকে অনিবার্য করে। আর এ দায় সাব্যস্তি সর্বসম্মিতক্রমে। কেননা এটা বাহ্যিকভাবে এবং গুণগতভাবে বিনষ্টিকরণ। কারণ শ্রেণী বিন্নতার কারণে বন্টন করা অসম্ভব।

বিশুদ্ধ মতে যবের সাথে গণের মিশ্রমের বিষয়টিও একই পর্যায়ভুক্ত। কেননা দুটির কোনটি অপরটির দানা থেকে মুক্ত হয় না। সুতরাং পৃথিকীকরণ ও বন্টনের বিষয়টি দুঃসাধ্য হবে।

আর যদি তরল পদার্থ সমশ্রেণীর সাথে মিশ্রণ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মালিকের অধিকার 'দায়' লাভের সাথেই বিশিষ্ট হয়ে যাবে। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে অংশগত দিক থেকে প্রবলকে বিবেচনা করার ভিত্তিতে অল্পতরকে অধিকতর এর অনুবর্তী করা হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সর্বাবস্থায় সে তার শরীকদার হবে। কেননা তার মতে কোন শ্রেণীর বস্তু সমশ্রেণীর বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে না। যেমন দুগ্ধপান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

এর সদৃশ মাসআলা হচ্ছে কিছু দিরহাম অনুরূপ দিরহামের সাথে দ্রবণের মাধ্যমে মিশ্রিত করা। কেননা দ্রবীভূত করার দ্বারা দিরহাম তরল হয়ে যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি আমানতি মাল তার নিজের কোন কর্ম ব্যতীত তার নিজের মালের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় তাহলে সে আমানতি মালের মালিকের শরীকদার হয়ে যাবে।

যেমন দুটি থলে ছিঁড়ে গিয়ে মিশ্রিত হয়ে গেলো। কেননা তার কোন 'কর্ম' বিদ্যমান না থাকায় সে ঐ মালের দায়বহন করবে না। সুতরাং (অনিবার্যভাবেই) উভয়ে শরীকদার হয়ে যাবে। আর এটা হলো সর্বসম্মত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আমানত গ্রহণকারী যদি আমানতি মালের কিছু অংশ খরচ করে ফেলে এরপর তার সদৃশ ফেরত প্রদান করে অবশিষ্ট মালের সঙ্গে মিশ্রিত করে ফেলে তাহলে সমগ্র মালের ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে।

কেননা সে নিজের মালের সঙ্গে অন্যের মাল মিশ্রিত করেছে। সুতরাং এই মিশ্রণের অর্থ দাঁড়াবে বিনষ্টিকরণ, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আমানত গ্রহণকারী যদি আমানতি মালের মধ্যে সীমালংঘন করে, যেমন বাহন ছিল, তাতে সে আরোহণ করল, কাপড় ছিল তা সে পরিধান করল, গোলাম ছিল সে তাকে খেদমতে লাগালো- কিংবা অন্য কারো কাছে গচ্ছিত রাখল অতঃপর সীমালংঘন দূরীভূত করে নিজের হাতে নিয়ে এলো, তাহলে ক্ষতিপূরণের দায়ভারও বিদূরিত হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, দায়ভার থেকে সে আর মুক্ত হবে না। কেননা সে যখন যামীন হয়ে গেল, তখন আমানতের চুক্তি রহিত হয়ে গেল। কারণ দুইয়ের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। সুতরাং মালিকের কাছে ফেরত প্রদান ছাড়া দায়মুক্ত হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, সংরক্ষণের আদেশ-সময় নিরপেক্ষ হওয়ার কারণে এখনো অব্যাহত রয়েছে।

আর আমানতি চুক্তির বিধান (তথা দায়হীনতা) 'রহিত' ছিল তার বিপরীত বিষয়ের সাব্যস্তির অনিবার্য কারণে। সেটা যখন বিদূরিত হলো তখন চুক্তির বিধান প্রত্যাবর্তন করবে। যেমন সে মাল হেফাজত করার উদ্দেশ্যে একমাসের জন্য তাকে ভাড়ায় নিযুক্ত করল আর সে মাসের এক অংশে সংরক্ষণ বর্জন করল, অতঃপর অবশিষ্ট অংশে সংরক্ষণ করল। তাতে মালিকের স্থলবর্তীর কাছে ফেরত প্রদান হাসিল হয়ে গেল।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অতঃপর আমানতের মালিক যদি আমানত ফেরত চায় আর সে আমানতের কথা অস্বীকার করে তাহলে সে তার দায়বহন করবে।

কেননা সে তার কাছে ফেরত চাওয়ার অর্থ এই যে, সে তাকে হেফাজত করার দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেছে। সুতরাং এরপর সে ধরে রাখার মাধ্যমে গসবকারী এবং মালিককে তার মাল থেকে রোধকারী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সে তার যামিন হবে। এরপর পুনরায় যদি সে স্বীকার করে নেয়, তাহলে দায়ভার বহন থেকে অব্যাহতি পাবে না। কেননা আমানতের চুক্তি রহিত হয়ে গেছে। কারণ ফেরত দাবী করার অর্থ হলো তার পক্ষ থেকে চুক্তি প্রত্যাহারকরণ, আর অস্বীকার করায় অর্থ হলো আমানত গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে চুক্তি রহিতকরণ, যেমন ওকীলের পক্ষ থেকে ওকালতের কথা অস্বীকার করা এবং চুক্তির পক্ষদ্বয়ের কোন একজনের বিক্রয় চুক্তিকে অস্বীকার করা। সুতরাং চুক্তি প্রত্যাহার সম্পন্ন হয়ে গেল।

কিংবা কারণ এই যে, আমানত গ্রহণকারী আমানত প্রদানকারীর উপস্থিতিতে নিজেকে অব্যাহতি দানের অধিকার রাখে, যেমন ওকীল মুআক্কিলের উপস্থিতিতে নিজেকে অব্যাহতি দানের অধিকার রাখে। আর চুক্তি যখন প্রত্যাহৃত হলো তখন

নবায়ন ছাড়া তা ফিরে আসবে না। সুতরাং এখানে মালিকের স্থলবর্তীর দিকে ফেরত দেওয়া পাওয়া গেল না।

পক্ষান্তরে চুক্তির পরিপন্থী আচরণ করে সম্মত আচরণে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি ভিন্ন।

আর যদি আমানতের মালিক ছাড়া অন্য কারো কাছে আমানতের বিষয় অস্বীকার করে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে ঐ আমানতি মালের যামিন হবে না। ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

কেননা অন্যের কাছে আমানতের কথা অস্বীকার করা হেফাজতের পন্থাবিশেষ। কেননা তাতে অন্য লোভকারীদের লোভের গোড়া কর্তন হয়।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমানত প্রদানকারীর উপস্থিতি ছাড়া কিংবা তার পক্ষ থেকে ফেরত চাওয়া ছাড়া সে নিজেকে অব্যাহতি দান করতে পারে না। সুতরাং আদেশ তথা চুক্তি বহাল থাকবে।

পক্ষান্তরে আমানত প্রদানকারীর উপস্থিতিতে অস্বীকারের বিষয়টি ভিন্ন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আমানত গ্রহণকারীর অধিকার রয়েছে আমানতের মালসহ সফর করার, যদিও তা পরিবহন ব্যয় সম্পন্ন হয়।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। সাহেবায়ন বলেন, পরিবহন ব্যয় সম্পন্ন হলে তার সে অধিকার নেই।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই তার সে অধিকার নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল হলো 'আদেশ'-এর নিঃশর্ততা। আর পথ যদি নিরাপদ হয় তাহলে খোলা মাঠও সংরক্ষণযোগ্য স্থান। এ কারণেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের মালের ক্ষেত্রে বাপ-বা অছী তা নিয়ে সফর করতে পারে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, যে সকল মালের ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় রয়েছে তা ফেরত নিতে মালিকের উপর পরিবহন ব্যয় আরোপিত হবে। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, সে তাতে সম্মত হবে না। সুতরাং সফরের বৈধতা পরিবহণ ব্যয়ঃহীনতার শর্তে শর্তযুক্ত হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) আমানতি মালের হেফাজতের বিষয়টি প্রচলিত হেফাজত পদ্ধতির সাথে বিশিষ্ট করেন। আর তা হল শহরে (বাড়ী ঘরে) হেফাজত করা। আর এটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হেফাজতকারী নিয়োগের মত হল।

আমাদের বক্তব্য এই যে, তার আদেশ পালনের অনিবার্য ফলরূপে তার মালিকানায় তার উপর ফেরত ব্যয় আরোপিত হচ্ছে। সুতরাং তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না।

আর স্বাভাবিক রীতি হলো (গচ্ছিত রাখার সময়) আমানত গ্রহণকারীদের শহরে অবস্থান করা। শহরে রেখে হেফাজত করা নয়। যেমন যারা মরুভূমিতে বাস করে তারা সেখানেই নিজেদের মাল হেফাজত করে। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হেফাজতের জন্য নিযুক্ত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো একটা বিনিময় চুক্তি। সুতরাং তা চুক্তির স্থানে অর্পণকে দাবী করে।

আমানত প্রদানকারী যদি গচ্ছিত দ্রব্য নিয়ে বের হতে নিষেধ করে আর সে বের হয় তাহলে সে যামীন হবে।

কেননা শহরে সংরক্ষণ যেহেতু অধিক কার্যকর সেহেতু এই শর্তারোপ অর্থবহ। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দুজন লোক যদি একজনের কাছে কোন কিছু আমানত রাখে, তারপর তাদের একজন এসে তার অংশ ফেরত চায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে অপর জন উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে তার অংশ দেবে না। আর সাহেবায়ন বলেন, তাকে তার হিসসা দিয়ে দিবে।

'জামে ছাগীর' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনজন লোক একজন লোকের কাছ থেকে এক হাযার দিরহাম আমানত রাখলো। এরপর দুজন গায়েব রইলো। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উপস্থিত জনের অধিকার নেই নিজের হিসসা গ্রহণের। আর সাহেবায়ন বলেন, তার সে অধিকার রয়েছে। এই মতপার্থক্য হলো কায়লী ও ও ওজনী বস্তুর ক্ষেত্রে। আর মোখতাছারুল কুদূরীতে উল্লেখিত শব্দ দ্বারা সেটাই উদ্দেশ্য।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, সে তার হিসসা ফেরত দেয়ার দাবী করেছে। সুতরাং তাকে তা প্রদানের আদেশ করা হবে। (কেননা সে তার হিসসার মালিক) যেমন শরীকানা ঋণের ক্ষেত্রে। এর কারণ এই যে, সে তাকে ঐ পরিমাণ প্রত্যপণের আদেশ করছে যা সে তার কাছে অর্পণ করেছে। আর তা হলো অর্ধেক। এ কারণেই তো তার অধিকার রয়েছে সুযোগ পেলে তার প্রাপ্য হিসসা নিয়ে নেওয়ার। সুতরাং তাকেও আদেশ করা হবে তার জিনিস দিয়ে দেয়ার।

ইমাম আবু হানীফা (র) -এর দলীল এই যে, সে তাকে অনুপস্থিত ব্যক্তির হিসসা প্রদানের দাবী করছে। কেননা সে তার কাছে পৃথকীকৃত হিসসা দাবী করছে, অথচ তার প্রাপ্য হক হলো অপৃথকীকৃত সমগ্র বস্তুতে। আর পৃথকীকৃত নির্ধারিত অংশে দুটি হক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বণ্টন ছাড়া তার হক পৃথক হবে না। আর আমানত গ্রহণকারীর বণ্টন করার কর্তৃত্ব নেই।

এজন্যই সর্বসম্মত মতে তার এই প্রদানকে বণ্টন বলে গণ্য করা হবে না। শরীকানার ঋণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে তার কাছে নিজের হক অর্পণের দাবী করছে। কারণ ঋণ তো তার সদৃশ দ্বারা পরিশোধ করা হয়।

আর প্রতিপক্ষের এই বক্তব্য যে, তার তো অধিকার রয়েছে নিজে নিয়ে নেয়ার। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, এর অনিবার্য ফল আমানত গ্রহণকারীকে ফেরত প্রদানে বাধ্য করা নয়। যেমন যদি কোন মানুষের কাছে তার এক হাযার দিরহাম আমানত থাকে, আর আমানত প্রদানকারীর যিম্মায় অন্য কারো এক হাযার দিরহাম পাওয়া থাকে, তাহলে তার পাওনাদারের অধিকার রয়েছে, যখন সে সুযোগ পায় তখন আমানত গ্রহণকারীর কাছ থেকে তা নিয়ে নেয়ার। কিন্তু আমানত গ্রহণকারীর অধিকার নেই পাওনাদারকে তা প্রদানের।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, একজন লোক যদি দুজনের কাছে বিভাজনযোগ্য কোন কিছু আমানত রাখে তাহলে দুজনের কারোই অধিকার নেই বস্তুটি অপর জনের কাছে প্রদানের। বরং দুজনে তা ভাগ করে নেবে। এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অর্ধেক হিফাজত করবে। আর যদি অবিভাজনযোগ্য হয় তাহলে দুজনের একজনের অধিকার রয়েছে অপরজনের অনুমতিক্রমে তা হিফাজত করার।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। তার মতে দুই জন বন্ধক গ্রহণকারী এবং দুই জন ক্রয় সংক্রান্ত ওকীল সম্পর্কেও অনুরূপ বিধান হবে, যদি একজন অপরজনের কাছে বন্ধকী দ্রব্য বা ক্রয়কৃত পণ্য অর্পণ করে।

সাহেবায়ন বলেন, উভয় সূরতেই একজনের অধিকার রয়েছে অপরজনের অনুমতিক্রমে বস্তুটি হিফাজত করার।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, আমানত প্রদানকারী উভয়ের আমানতদারি সম্পর্কেই সন্তুষ্ট রয়েছে। সুতরাং তাদের উভয়ের প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে অপরজনের হাতে অপর্ণ করার। এবং সে ক্ষেত্রে দায়বহন করবে না। যেমন অবিভাজনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে দায় বহন করে না।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, সে উভয়ের (যুগপৎ) হিফাজতে সম্মত রয়েছে; কিন্তু সমগ্র বস্তুর কোন একজনের একক হিফাজতে সম্মত নয়। কেননা হিফাজতের কর্মকে এমন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, যা বিভাজ গুণকে গ্রহণ করে তখন তা অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে, সমগ্রকে অন্তর্ভুক্ত করে না। সুতরাং মালিকের সম্মতি ছাড়া অপরের হাতে অর্পণ সাব্যস্ত হল। তাই প্রদানকারী দায়বহন করবে। কিন্তু কবজাকারী দায় বহন করবে না।

কেননা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে আমানত গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে আমানত গ্রহণকারী দায়বহন করবে না।

এটা অবিভাজনযোগ্য বস্তু থেকে ভিন্ন। কেননা সে যখন তাদের দুজনের কাছে তা আমানত রাখল। আর দিনরাতের সর্ব সময়ে ঐ বস্তুটির কাছে তাদের একত্র থাকা সম্ভব নয়। অথচ তাদের জন্য পালাক্রমে সংরক্ষণ করা সম্ভব, সুতরাং বোঝা যায় যে, মালিক কোন কোন অবস্থায় সমগ্র বস্তু একজনের হাতে অর্পণ করার ব্যাপারে সম্মত রয়েছে।

আমানতি মালের মালিক যদি আমানত গ্রহণকারীকে বলে যে, এটা তোমার স্ত্রীর হাতে অর্পণ করো না; কিন্তু সে তা অর্পণ করলো, তাহলে তাকে দায় বহন করতে হবে না।

'জামে ছাগীর' কিতাবে রয়েছে; যখন সে তাকে তার পরিবারভুক্ত কারো হাতে অর্পণ করতে নিষেধ করে, আর সে এমন কারো হাতে তা অর্পণ করে, যার হাতে অর্পণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই, তাহলে এই অর্পণের কারণে সে দায় বহন করবে না। যেমন আমানতি দ্রব্যটি বাহনের পশু। আর সে তাকে তার গোলামের হাতে তা অর্পণ করতে নিষেধ করল এবং যেমন গচ্ছিত দ্রব্যটি এমন বস্তু যা মেয়েদের হাতে হিফাজত করা হয় অথচ সে তাকে তার স্ত্রীর হাতে অর্পণ করতে নিষেধ করল।

আর এ-ই হলো প্রথম বর্ণনার প্রয়োগ মর্ম।

কেননা শর্তটি অর্থপূর্ণ হলেও তা রক্ষা করে সংরক্ষণ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সুতরাং তা অকার্যকর হবে।

আর যদি তার হাতে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে তারপরও তার হাতে প্রদান করে তাহলে দায়বহন করবে।

কেননা এমতাবস্থায় শর্তটি অর্থপূর্ণ। কারণ পরিবারভুক্তদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকে যাকে মালের ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় না। আর এই শর্তটি রক্ষা করেও হিফাজতের কাজ সম্পাদন করা সম্ভব, সুতরাং তা বিবেচনা করা হবে।

আর যদি বলে যে, তুমি আমানতি দ্রব্যটি এই গৃহে হিফাজত করো; কিন্তু সে তা বাড়ীর অন্য ঘরে হিফাজত করল, তাহলে সে যামিন হবে না।

কেননা শর্তটি অর্থবহ নয়। কারণ একই বাড়ীর দুই ঘর সংরক্ষণের দিক থেকে পার্থক্যপূর্ণ হয় না।

আর যদি অন্য বাড়ীতে সংক্ষণ করে তাহলে দায় বহন করবে।

কেননা দুই বাড়ী সংরক্ষণের দিক থেকে পার্থক্যপূর্ণ হয়। সুতরাং শর্তটি অর্থপূর্ণ হবে এবং শর্ত দ্বারা আবদ্ধ করা বিশুদ্ধ হবে।

আর যদি দুই ঘরের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়, যেমন যে বাড়ীতে ঘর দুটি রয়েছে তা বিরাট আর যে ঘরে হিফাজত করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে খোলামেলা, তাহলে শর্তটি গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যে ব্যক্তি কারো কাছে কোন কিছু আমানত রাখল, আর সে তা অন্য একজনের কাছে গচ্ছিত রাখলো এবং তা হালাক হয়ে গেলো। এ ক্ষেত্রে আমানত প্রদানকারী ব্যক্তি প্রথম জনের উপর দায় আরোপ করতে পারে, অপর জনের উপর দায় আরোপ করতে পারে না।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়ন (র) বলেন, সে দুজনের যাকে ইচ্ছা তার উপর দায় আরোপ করতে পারে। যদি সে প্রথম জনের উপর দায় আরোপ করে, তাহলে প্রথম জন অপর জনের কাছে রুজু করতে পারবে না। আর যদি সে অপর জনের উপর দায় আরোপ করে, তাহলে প্রথম জনের কাছে রুজু করতে পারে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, অপরজন এমন জনের হাত থেকে মাল গ্রহণ করেছে, যে ক্ষতিপূরণের দায় দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং সে-ও উক্ত দায় দ্বারা আবদ্ধ হবে। যেমন গাসিবের কাছ থেকে আমানত গ্রহণকারী।

আর এটা (দায় দ্বারা আবদ্ধ ব্যক্তির হাত থেকে গ্রহণ করা হলো) এ জন্য যে, মালিক তো অন্য কারো আমানতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলো না। সুতরাং প্রথম জন অন্যের হাতে অর্পণের মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘনকারী হলো। আর দ্বিতীয়জন গ্রহণ করার মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘনকারী হলো। সুতরাং মালিককে উভয়ের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তার উপর দায় আরোপ করার ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে।

তবে যদি সে প্রথম জনের উপর দায় আরোপ করে তাহলে প্রথমজন দ্বিতীয় জনের কাছে রুজু করতে পারবে না। কেননা প্রথম জন দায় বহনের মাধ্যমে বস্তুটির মালিক হয়ে গেছে। সুতরাং প্রকাশ পেয়ে গেলো যে, সে নিজের মালিকানার বস্তু আমানত রেখেছে।

আর যদি দ্বিতীয় জনের উপর দায় আরোপ করে তাহলে সে প্রথম জনের কাছে রুজু করবে। কেননা সে তো প্রথম পক্ষে দায়িত্ব পালনকারী। সুতরাং যে দায় তার উপর আরোপিত হয়েছে, সে বিষয়ে সে তার কাছে রুজু করবে। ইমাম আবু হানীফা

(র)-এর দলীল এই যে, সে একজন আমীন ও দায়হীন ব্যক্তির হাত থেকে মাল কবজা করেছে। কেননা শুধু প্রদান দ্বারা সে দায়বহনকারী হয়ে যায় না। যতক্ষণ না সে প্রদানকারীর কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায়। কেননা তাতে প্রথম জনের মতামত বিদ্যমান থাকে। সুতরাং (উভয়ের একত্র থাকা অবস্থায়) উভয়ের কারো কাছ থেকেই সীমা লঙ্ঘন পাওয়া যায়নি। যখন সে তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলো তখনই প্রথমজন দায়িত্বগ্রহণকৃত হিফাজত বর্জন করল। সুতরাং সে কারণে ক্ষতিপুরণের দায় বহন করবে।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় জন প্রথম অবস্থার উপরই বহাল রয়েছে। আর তার পক্ষ থেকে কোন 'কর্ম' সম্পন্ন হয়নি। সুতরাং সে দায় বহন করবে না। যেমন বাতাস যদি তার কোলে অন্য কারো কাপড় এনে ফেলে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কারো হাতে যদি এক হাযার দিরহাম থাকে, আর দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে দাবী করে যে, এটা তার। এটা সে ঐ ব্যক্তির কাছে আমানত রেখেছে। আর কবজাকারী ব্যক্তি তাদের (কারো) অনুকূলে কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে ঐ এক হাযার উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। আর কবজাকারী ব্যক্তির যিম্মায় আরো এক হাযার অবশ্য সাব্যস্ত হবে, যা উভয় দাবীদারের মাঝে বণ্টিত হবে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, উভয়ের দাবী বিশুদ্ধ। কেননা তা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং প্রসিদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে উভয়ের প্রত্যেকে অস্বীকারকারীর কাছে কসমের হকদার হবে। এবং প্রত্যেকের অনুকূলে তাকে আলাদা কসমে করানো হবে। কেননা উভয় হক ভিন্ন। আর দুই কসমের যে কোনটি দ্বারা কাযী (কসম করানো) আরম্ভ করলে তা জায়িয হবে। কেননা উভয়কে একত্র করা সম্ভব নয়। আর কারো অগ্রাধিকার নেই। আর যদি প্রথমে কসম করানোর ব্যাপারে দুই দাবীদার বিবাদ করে. তাহলে উভয়ের মনে সন্তুষ্টির জন্য এবং (কাযীর) একদিকে ঝুঁকে পড়ার অপবাদ নিরসনের জন্য উভয়ের মাঝে লটারী করা হবে।

অত:পর যদি সে একজনের জন্য কসম করে তাহলে অপর জনের জন্যও কসম করতে হবে। যদি সে কসম করে তাহলে তারা কিছুই পাবে না। কেননা তাদের কোন প্রমাণ নেই। আর যদি সে দ্বিতীয় জনের জন্য কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে প্রমাণ (তথা কসম করতে অস্বীকৃতি) বিদ্যমান থাকার কারণে তার অনুকূলে ফায়সালা করা হবে। আর যদি প্রথম জনের জন্য কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে দ্বিতীয় জনের জন্য তাকে কসম করানো হবে। আর অস্বীকৃতির কারণে প্রথম জনের অনুকূলে ফায়সালা প্রদান করা হবে না।

পক্ষান্তরে যদি দু'জনের একজনের অনুকূলে স্বীকারোক্তি করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা স্বীকারোক্তি স্বকীয়ভাবেই সাব্যস্তকারী প্রমাণ। সুতরাং স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে। পক্ষান্তরে কসমের অস্বীকৃতি প্রমাণরূপে গণ্য হয় আদালতের ফায়সালা প্রদানের সময়। সুতরাং দ্বিতীয় জনের জন্য কসম করানো পর্যন্ত ফায়সালাকে বিলম্বিত করা হবে, যাতে ফায়সালার দিক স্পষ্ট হয়ে যায়।

আর যদি দ্বিতীয় জনের জন্য কসম করতেও অস্বীকৃতি জানায় তাহলে উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে ফায়সালা করা হবে; যেমন কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা প্রমাণের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান; যেমন উভয়ে বাইয়েনাহ্ পেশ করার ক্ষেত্রে।

আর উভয়ের মাঝে বন্টনের জন্য তার উপর আরো এক হাযার দণ্ড আরোপ করা হবে। কেননা (আবু হানীফা (র)-এর মতে) কসমের পরিবর্তে নিজ থেকে অর্থ ব্যয় -এর স্বীকারোক্তির কারণে উভয়ের প্রত্যেকের জন্য সে হক সাব্যস্ত করেছে। আর এটা তার নিজের ব্যাপারে প্রমাণ রূপে গণ্য। আর ঐ এক হাযার উভয়ের মাঝে বণ্টন করার মাধ্যমে সে উভয়ের প্রত্যেকের অর্ধেক হক দ্বারা অপর জনের অর্ধেক হক আদায়কারী হলো। সুতরাং সে অর্ধেক হকের দণ্ড প্রদান করবে।

আর কসম অস্বীকার করার পর কাযী যদি প্রথম জনের অনুকূলে ফায়সালা জারি করে ফেলেন, 'জামে ছাগীর' কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম বাযদাবী (র) উল্লেখ করেছেন যে, দ্বিতীয় জনের জন্য- কসম করানো হবে। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে কাযী উভয়ের অনুকূলে (এক হাযারের) ফায়সালা করবেন।

কেননা প্রথম জনের অনুকূলে ফায়সালায় দ্বিতীয় জনের হককে বাতিল করে না। কারণ কাযী (কসম করানোর ব্যাপারে) প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন, হয় নিজস্ব বিবেচনায়, কিংবা লটারীর মাধ্যমে। আর -এর কোনটাই দ্বিতীয়জনের হক বাতিল করতে পারে না।

আর ইমাম খাসসাফ (র) বলেছেন যে, প্রথম জনের অনুকূলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে।

আর মাসআলাটির প্রনয়ণ হয়েছিলো গোলাম সম্পর্কে।

আর প্রথম জনের অনুকূলে কাযীর ফায়সালা কার্যকর করার কারণ এই যে, এটা ইজতিহাদের ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। কেননা কোন কোন মুজতাহিদ বলেছেন যে, কাযী প্রথম জনের অনুকূলে ফায়সালা দিয়ে দেবেন। দ্বিতীয় জনের জন্য কসম করানোর অপেক্ষা করবেন না। কেননা কসমের অস্বীকৃতি পরোক্ষভাবে স্বীকারোক্তি।

অত:পর দ্বিতীয় জনের জন্য কসম করানো হবে না, যে (আল্লাহর কসম করে বলো) এই গোলামটি আমার (অর্থাৎ দ্বিতীয় জনের) নয়। কেননা গোলামটি প্রথম জনের হয়ে যাওয়ার পর অস্বীকৃতি কোন অর্থবহতা বয়ে আনবে না। তবে কি এই মর্মে কসম করানো হবে যে, আল্লাহর কসম করে বলো যে, দ্বিতীয় জনের অনুকূলে তোমার প্রতিকূলে এই গোলামটি বা তার মূল্য সাব্যস্ত নয়, যার পরিমাণ এই এই, কিংবা তার চেয়ে কম পরিমাণও সাব্যস্ত নয়? ইমাম খাস্সাফ (র) বলেন, ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে তাকে এই মর্মে কসম করানো উচিত। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর ভিন্ন মত রয়েছে।

আর মতভিন্নতার কারণ এই যে, আমানত গ্রহণকারী যদি (কোন ব্যক্তির অনুকূলে) আমানতি দ্রব্যের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। অথচ আদালতের ফয়সালার কারণে সে গোলামটি অন্যকে প্রদান করে তাহলে ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে তাকে দায় বহন করতে হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর এটা হলো ঐ মাসআলার অনুসিদ্ধান্ত। আর তাতে কিছুটা অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহই অধিক জানেন।

كِتَابُ الْعَارِيَةِ

অধ্যায় ঃ 'আরিয়া (সাময়িক ধার) প্রদান

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, عارية বা কোন কিছু সাময়িক ধার দেয়া বৈধ রয়েছে।

কেননা এটা হলো এক প্রকার অনুগ্রহ। আর নবী (সা) ছাফওয়ান (বিন উমাইয়া) থেকে কিছু বর্ম আরিয়াত নিয়েছিলেন।

عارية অর্থ বিনিময় গ্রহণ ছাড়া উপকার লাভের মালিক বানানো।

ইমাম কারখী (র) বলতেন عارية অর্থ অন্যের মালিকানা বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধকরণ। কারণ এই যে اباحة শব্দ দ্বারা এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, আর তাতে মেয়াদ নির্ধারণের শর্ত নেই। অথচ অজ্ঞতার অবস্থায় মালিক বানানো সিদ্ধ নয়। তদ্রূপ তাতে নিষেধ কার্যকর হয়। আর ধার গ্রহণকারী ধারের বস্তুটি অন্যকে ইজারা দিতে পারে না।

আমাদের বক্তব্য এই যে, عارية শব্দটি মালিকানার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। কেননা عارية শব্দটি عرية থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ 'দান'। এ কারণেই تمليك (মালিকানা দান) শব্দ দ্বারা এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। আর বস্তু সত্তার মত বস্তুর উপকার মালিকানাযোগ্য।

আর মালিকানা প্রদান দুই প্রকার ঃ বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে এবং বিনিময় গ্রহণ ছাড়া।

বস্ত সত্তা উভয় প্রকার মালিকানা প্রদান গ্রহণ করে। সুতরাং বস্তুর উপকারও তা গ্রহণ করবে। উভয়ের মাঝে যোগসূত্র হলো প্রয়োজন মেটানো।

আর এই চুক্তির ক্ষেত্রে اباحة (মুবাহ করে দেওয়া) শব্দটিকে تمليك অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ اباحة শব্দ দ্বারা اجارة চুক্তি সম্পন্ন হয়। অথচ ইজারায় (বিনিময় নিয়ে বস্তুর উপকার লাভের) মালিকানা প্রদান করা হয়।

আর (আরিয়াতের মধ্যে) বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় না। সুতরাং এই অজ্ঞতা ক্ষতিকর হবে না।

তাছাড়া (عارية -এর ক্ষেত্রে) মালিকানা সাব্যস্ত হয় কবজা দ্বারা। আর কবজা গ্রহণ অর্থ উপকার লাভ; আর তখন অজ্ঞতা থাকে না।

আর নিষেধ করার অর্থ হল মালিকানা প্রদান থেকে বিরত রাখা। সুতরাং বস্তুর উপকার 'আরিয়া গ্রহণকারী মালিকনায় প্রবেশ করবে না।

আর ইজারা প্রদানের অধিকারী হবে না আরিয়া প্রদানকারীর অতিরিক্ত ক্ষতি রোধ করা যায়। যেমন পরে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন 'আরিয়া' সিদ্ধ হবে এ বক্তব্য দ্বারা যে, আমি তোমাকে 'আরিয়াত দিলাম'।

কেননা 'আরিয়া' চুক্তির ক্ষেত্রে এটা হলো স্পষ্ট শব্দ।

এবং (এ শব্দের দ্বারা যে,) আমি তোমাকে এই জমি খেতে দিলাম।

কেননা 'খেতে দেওয়া' কথাটি (রূপক ভাবে) 'আরিয়াতের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(আর এ শব্দের দ্বারা যে,) আমি তোমাকে এ কাপড়খানি ব্যবহারের জন্য এবং (এই শব্দ দ্বারা যে,) আমি তোমাকে এ বাহনে আরোহণ করালাম।

কেননা এ শব্দ দুটি প্রত্যক্ষভাবে বস্তু সত্তার মালিকানাদানের অর্থে ব্যবহৃত। তবে হেবা বা দানের নিয়ত না করার ক্ষেত্রে রূপকভাবে বস্তুর উপকার লাভের মালিকানা প্রদানের অর্থে প্রযুক্ত হবে।

এবং এ শব্দ দ্বারা যে, এ গোলাটিকে তোমার খিদমতের জন্য দিলাম।

কেননা এটা হলো তাকে গোলাম থেকে খিদমত গ্রহণের অনুমতি প্রদান।

(আর এ শব্দ দ্বারা যে,) আমার এই বাড়ীটি তোমাকে দিলাম বসবাসের জন্য। এর অর্থ হলো তোমার জন্য শুধু বসবাসের অধিকার রয়েছে। আর এ শব্দ দ্বারা যে, আমার এই বাড়ী তোমার জন্য তোমার জীবদ্দশায় বসবাসের জন্য।

কেননা সে এ ঘরের বসবাস তার জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। এবং বসবাসের শব্দটি ব্যবহার করেছে। তোমার জন্য কথাটির ব্যাখ্যা স্বরূপ। কেননা এ শব্দটি উপকার লাভের মালিকানা প্রদানের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং শেষযুক্ত শব্দের পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে সেই অর্থেই কথাটিকে প্রযুক্ত করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন,'আরিয়াত'প্রদানকারী 'আরিয়াতের বস্তুটি যখন ইচ্ছা ফেরত নিতে পারে।

কেননা নবী (সা) বলেছেন. المنحة مردودة والعارية مؤداة .

দুধ পানের জন্য প্রদত্ত জন্তু ফেরত দিতে হবে এবং আরিয়াতের বস্তুও ফেরত দিতে হবে।

তাছাড়া এই কারণ যে, বস্তুর উপকার যেভাবে উদ্ভূত হতে থাকে সেভাবে অল্প অল্প করে তার মালিকানা অর্জিত হতে থাকে। সুতরাং যে উপকার এখনো অস্তিত্ব লাভ

করেনি সেটার মালিক বানানোর সাথে অপর পক্ষের কবজা গ্রহণ সম্পন্ন হয়নি। সুতরাং এই মালিক বানানো থেকে সরে আসা সিদ্ধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর 'আরিয়াত আমানত হবে, যদি সীমা লঙ্ঘন ছাড়া হালাক হয়ে যায় তাহলে 'আরিয়াত গ্রহণকারী তার যামিন হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যামিন হবে । কেননা সে কোন হক অন্যের মাল নিজের জন্য কবজা করেছে। সুতরাং সে তার যামিন হবে। আর কবজা করার অনুমতি সাব্যস্ত হয়েছে উপকার লাভের প্রয়োজনে। সুতরাং প্রয়োজনের বাইরে অনুমতি সাব্যস্ত হবে না।

এ কারণেই তো তা ফেরত দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হয়।

আর এটি হলো দর নির্ণয়ের ভিত্তিতে কবজাকৃ পণ্যের মত।

আমাদের দলীল এই যে, (যে লফয দ্বারা ধারচুক্তি সম্পন্ন হয়, সেই) লফযটি যামিন হওয়ার বাধ্যবাধকতার প্রতি ইঙ্গিত করে না।

কেননা এই চুক্তিটি হলো বিনিময় ছাড়া বস্তুর উপকার লাভের মালিকানা প্রদাণের জন্য। কিংবা উপকার লাভ 'মুবাহ' করার জন্য।

আর কবজা গ্রহণের বিষয়টি অনুমতি সম্পন্ন হওয়ার কারণে সীমালঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হয়নি। অনুমতি যদিও উপকার লাভের জন্য সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু সেতো উপকার লাভের জন্য। কবজা করেছে। সুতরাং কবজা গ্রহণ সীমালঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হয়নি।

আর ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হয় নিজের জন্য ব্যয় বহুল করার দায়িত্ব থেকে। যেমন 'আরিয়াতের খরচ 'আরিয়াত গ্রহণকারীর উপর সাব্যস্ত হয়। মালিকের কবজা করার কারণে নয়।

আর 'দরনির্ণয় ও পছন্দ নির্ণয়'-এর জন্য কবজাকৃত পণ্য বিক্রয় চুক্তি বলে দায়সম্পন্ন হয়। কেননা চুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করা চুক্তিরই হুকুমভুক্ত। যেমন, যথাস্থানে (অর্থাৎ মাবসূত কিতাবে) তা আলোচিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'আরিয়াত গ্রহণকারীর অধিকার নেই যা সে 'আরিয়াত রূপে গ্রহণ করেছে তা ভাড়ায় প্রদান করার। যদি সেটি সে ভাড়ায় প্রদান করে, আর তা হালাক হয়ে যায়, তাহলে তাকে যামিন হতে হবে।

কেননা 'আরিয়াত প্রদান চুক্তি ইজারা প্রদান চুক্তির চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের। আর কোন কিছু তার চেয়ে উর্ধ্বতর বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না।

তাছাড়া যদি আমরা কৃত ইজারা চুক্তিকে বৈধতা দান করি তাহলে তা বাধ্যতামূলক রূপেই বৈধতা লাভ করবে। কেননা সেটা তখন আরিয়াত প্রদানকারীর পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের ভিত্তিতে হবে। আর সেটা বাধ্যতামূলক রূপে সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আরিয়াত প্রদানকারীর জন্য অধিকতর ক্ষতি রয়েছে। কারণ ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত ফেরত নেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এটাকে আমরা বাতিল সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং আরিয়াত গ্রহণকারী যদি সেটাকে ইজারা প্রদান করে তাহলে সেটাকে ইজারা গ্রহণকারীর কবজায় অর্পণ করার সময় থেকে তার যামিন হয়ে যাবে।

কেননা আরিয়াত চুক্তি যখন ইজারা প্রদানের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করল না তখন এটা গসব বলে সাব্যস্ত হবে।

আর যদি আরিয়াত প্রদানকারী ইচ্ছা করে তাহলে ভাড়ায় গ্রহণকারীকে যামিন বানাতে পারে। কেননা সে বস্তুটিকে মালিকের অনুমতি ছাড়া নিজের জন্য কবজা করেছে।

অত:পর যদি সে আরিয়াত গ্রহণকারীকে যামিন বানায় তাহলে ভাড়ায় গ্রহণকারীর কাছে সে রুজু করতে পারবে না।

কেননা প্রকাশ পেয়ে গেলো যে, সে নিজের মালিকানার বস্তু ইজারা প্রদান করেছে।

আর যদি আরিয়াত দানকারী ব্যক্তি ভাড়ায় গ্রহণকারীর উপর দায় আরোপ করে তাহলে সে ভাড়ায় প্রদানকারীর কাছে রুজু করতে পারবে, যদি সে না জেনে থাকে যে, এটা তার হাতে আরিয়াত হিসাবে ছিল। রুজু করার অধিকার সাব্যস্ত হচ্ছে ধোকার ক্ষতি রোধ করার জন্য। পক্ষান্তরে জেনে থাকলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে ব্যবহারকারীর ভিন্নতায় যদি বস্তুটিতে পরিবর্তন না আসে তাহলে আরিয়াত গ্রহণকারী ব্যক্তি বস্তুটিকে আরিয়াত প্রদান করতে পারে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার আরিয়াত প্রদানের অধিকার নেই। কেননা ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, এটা হলো বস্তুর উপকার লাভকে 'মুবাহ' করে দেওয়া। আর যার অনুকূলে মুবাহ করা হয়, সে (অন্যের জন্য) মুবাহ করার অধিকারী হয় না।

(ধার প্রদানের অর্থ সুবিধা ভোগের বৈধতা দান) এটা এ জন্য যে, বস্তুর উপকার লাভ মালিকানার ক্ষেত্র হওয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা তা অবিদ্যমান। ইজারার ক্ষেত্রে বস্তুর উপকারকে প্রয়োজনবশত: আমরা বিদ্যমান ধরে নিয়েছি। আর এখানে মুবাহ করণের দ্বারাই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়।

আমরা বলি, আরিয়াত প্রদানের অর্থ বস্তুর উপকারের মালিকানা প্রদান। যেমন, আগে উল্লেখ করেছি। সুতরাং আরিয়াত গ্রহণকারী আরিয়াত প্রদানেরও অধিকারী হবে। যেমন, যার অনুকূলে কোন গোলামের খিদমতের অছিয়ত করা হয়েছে।

আর ইজারার ক্ষেত্রে বস্তুর উপকারকে মালিকানার ক্ষেত্র হওয়ার উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছে। আরিয়াত প্রদানের ব্যাপারেও এটাকে প্রয়োজন নিরসনের জন্য মালিকানার ক্ষেত্র হওয়ার উপযুক্ত বিবেচনা করা হবে।

তবে যে বস্তু ব্যবহারকারীর ভিন্নতায় পরিবর্তিত হয় সে বস্তুর ক্ষেত্রে আরিয়াত প্রদান বৈধ না হওয়ার কারণ হলো আরিয়াত প্রদানকারীর অধিকতর ক্ষতি রোধ করা। কেননা সে তো শুধু আরিয়াত গ্রহণকারীর ব্যবহারের উপর সম্মত হয়েছে; অন্য কারো ব্যবহারের প্রতি সম্মত হয়নি। গ্রন্থকার বলেন, এটা তখন হবে যখন মালিকের পক্ষ থেকে নিঃশর্ত হবে।

আর আরিয়াত প্রদান চার প্রকারের রয়েছে।

প্রথমটি এই যে, মেয়াদ ও উপকার লাভ উভয় ক্ষেত্রে নিঃশর্ত থাকা। তখন আরিয়াত গ্রহণকারীর অধিকার থাকবে নিঃশর্তকে বিবেচনায় এনে বস্তুটি থেকে যখন ইচ্ছা এবং যে ধরনের ইচ্ছা উপকৃত হওয়ার।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, উভয় বিষয়ের শর্তযুক্ত হওয়া।

তখন শর্তায়নের বিষয়টি বিবেচনা করে তার অধিকার থাকবে না আরিয়াত প্রদানকারীর উল্লেখকৃত শর্ত লংঘন করার। তবে যদি শর্তের সদৃশ দ্বারা বা তার চেয়ে উত্তম কিছু দ্বারা শর্ত লংঘন করে (তাহলে তা করতে পারে।) আর (বহন করার ক্ষেত্রে) এক গম অন্য গমের সদৃশ।

তৃতীয় প্রকার এই যে, মেয়াদের ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত, কিন্তু উপকৃত হওয়ার ধরনের ক্ষেত্রে শর্তমুক্ত। আর চতুর্থ প্রকার হলো এর বিপরীত। এ দুই ক্ষেত্রে আরিয়াত প্রদানকারী যে শর্ত উল্লেখ করবে তা লংঘন করার অধিকার আরিয়াত গ্রহণকারীর থাকবে না।

সুতরাং যদি একটি বাহনের পশু আরিয়াত নেয় আর কোন শর্ত উল্লেখ না করে, তাহলে তার অধিকার থাকবে নিজে তাতে বহন করার এবং বহনের জন্য অন্যকে আরিয়াত প্রদানের। কেননা পার্থক্য পূর্ণ হয় না। তদ্রূপ তার অধিকার থাকবে নিজে আরোহণ করার এবং অন্যকে আরোহণ করতে দেওয়ার; যদিও বিভিন্ন জনের আরোহণ পার্থক্যপূর্ণ হয়ে থাকে।

কেননা আরিয়াত প্রদানকারী যখন উপকার লাভকারীকে শর্তমুক্ত রেখেছে। তখন আরিয়াত গ্রহণকারীর অধিকার থাকবে তা নির্ধারণ করার। তাই তো যদি সে নিজে আরোহণ করে ফেলে তাহলে অন্যকে আরোহণ করতে দেয়ার অধিকার থাকবে না। কেননা তার আরোহণ নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আর যদি অন্যকে আরোহণ করতে দেয় তাহলে তার নিজের আরোহণ করার অধিকার থাকবে না। যদি সে তা করে তাহলে সে যামীন হবে। কেননা আরোহণ করানোর বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে গেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দিরহাম ও দীনার, কায়লী ও ওজনী বস্তু এবং গণনার ভিত্তিতে আদান প্রদানের বস্তু আরিয়াত প্রদানের অর্থ হলো করয দেওয়া।

কেননা আরিয়াত প্রদানের অর্থ হলো বস্তুর উপকার লাভের মালিক বানানো। অথচ বস্তু সত্তা ক্ষয় করা ছাড়া এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আরিয়াত প্রদান এ ক্ষেত্রে বস্তু সত্তার মালিকানা প্রদান দাবী করে। আর তা হেবার মাধ্যমে কিংবা করযের মাধ্যমে হবে। আর করয হলো উভয়ের মাঝে নিম্নতর। সুতরাং সেটাই সাব্যস্ত হবে।

কিংবা কারণ এই যে, আরিয়াত প্রদানের ফলশ্রুতি হলো উপকার লাভ করা এবং মূল বস্তু ফেরত দেওয়া। সুতরাং সদৃশ ফেরত প্রদানকে মূল বস্তু ফেরত প্রদানের স্থলবর্তী করা হয়েছে।

মাশায়েখগণ বলেছেন যে, আর করয ধরা হবে তখনই যখন শর্তমুক্ত আরিয়াত দেয়া। কিন্তু যদি দিক নির্ধারণ করে দেয়, যেমন কিছু দিরহাম গ্রহণ করল সেগুলোকে পাল্লায় বাটখারা রূপে ব্যবহার করার জন্য কিংবা তা দ্বারা দোকান সজ্জিত করার জন্য তাহলে তা করয হবে না এবং নির্ধারিত উপকার লাভ ছাড়া তার আর কোন অধিকার থাকবে না। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, কোন কিছু বহন করার জন্য পাত্র ধরে নিলো। কিংবা কোমরে ধারণের জন্য কারুকাজ করা তলোয়ার ধরে নিলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি ভবন তৈরী করার জন্য বা বৃক্ষ রোপনের জন্য কোন জমি আরিয়াত নেয়, তাহলে তা জায়িয হবে। তবে আরিয়াত প্রদানকারীর অধিকার থাকবে তা ফেরত নেয়ার এবং ভবন বা বৃক্ষ উপড়ে ফেলতে তাকে বাধ্য করার।

ফেরত নেয়ার অধিকারের কারণ তো আমরা আগে বর্ণনা করেছি। আর এ উদ্দেশ্যে আরিয়াত প্রদানের বৈধতার কারণ এই যে, এটা সুপরিজ্ঞাত উপকার লাভ, ইজারা চুক্তির মাধ্যমে যার মালিকানা লাভ করা যায়। সুতরাং আরিয়াতের মাধ্যমেও তার মালিকানা লাভ করা যাবে।

আর যখন ফেরত নেওয়া সিদ্ধ হল তখন আরিয়াত গ্রহণকারী আয়িাত প্রদানকারীর ভূমি আবদ্ধকারী হয়ে যাবে। সুতরাং তাকে ভূমি খালি করাতে বাধ্য করা হবে।

অতঃপর যদি আরিয়াত চুক্তিকে মেয়াদযুক্ত না করে থাকে তাহলে আরিয়াত প্রদানকারীর উপর ক্ষতিপূরণের দায় সাব্যস্ত হবে না। কেননা আরিয়াত গ্রহণকারীকে প্রতারিত করা হয়নি। বরং সে আত্ম প্রতারিত হয়েছে। কারণ আরিয়াত প্রদানকারীর পক্ষ থেকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ছাড়াই সে চুক্তির নিঃশর্ততার উপর ভরসা করেছে।

আর যদি আরিয়াত চুক্তিকে মেয়াদযুক্ত করে থাকে এবং মেয়াদের আগে ফেরত নেয়, তাহলে আমাদের বর্ণিত কারণে ফেরত নেওয়া তো সিদ্ধ হবে; তবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তা মাকরূহ হবে। আর উপড়ে ফেলার কারণে ভবনের যে বৃক্ষের বা মূল্য কমেছে, আরিয়াত প্রদানকারী তার ক্ষতিপূরণের যামিন হবে।

কেননা মেয়াদ নির্ধারণ করার কারণে আরিয়াত গ্রহণকারী তার দিক থেকে ধোকাগ্রস্ত হয়েছে। কারণ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই তো স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং নিজের উপর থেকে ক্ষতি দূর করার জন্য সে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে।

ইমাম কুদূরী (র) মুখতাছার গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন।

আর হাকিম শহীদ (র) উল্লেখ করেছেন যে, ভুমির মালিক আরিয়াত গ্রহণকারীর অনুকূলে ভবন ও বৃক্ষের মূল্যের যামিন আর সেগুলো তার হয়ে যাবে। তবে আরিয়াত গ্রহণকারী যদি চায় যে, ভূমি মালিকের উপর ঐগুলোর মূল্যের দায় আরোপ না করে নিজেই তুলে নিয়ে যাবে তাহলে তার সে অধিকার থাকবে। কেননা এগুলো তার মালিকানাভুক্ত।

মাশায়েখগণ বলেছেন, উপড়ানো দ্বারা যদি ভূমির ক্ষতি হয় তাহলে ইচ্ছাধিকার হবে ভূমির মালিকের। কেননা সে হলো মূলবস্তুর অধিকারী, আর আরিয়াত গ্রহণকারী হলো অনুবর্তী ব্যক্তি। আর মাধ্যমে অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হবে।

আর যদি ফসল করার জন্য ভূমি আরিয়াত গ্রহণ করে থাকে; তাহলে মেয়াদ নির্ধারণ করুক বা না করুক ফসল কাটার আগ পর্যন্ত তার কাছ থেকে জমি ফেরত নিতে পারবে না। (বরং ইজারা হিসেবে তাকে ভোগ করতে দিবে)।

কেননা ফসলের তো একটা শেষ সময় জ্ঞাত রয়েছে। আর ভাড়ার বিনিময়ে জমি ছেড়ে দেয়ার মতও উভয়ের হকের রেয়ায়াত রয়েছে।

বৃক্ষ রোপণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার শেষ সময় জ্ঞাত নয়। সুতরাং মালিকের ক্ষতিরোধ করার জন্য তা উপড়ে ফেলা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আরিয়াতের বস্তু ফেরত দেয়ার খরচ আরিয়াত গ্রহণকারীর উপর হবে।

কেননা যেহেতু সে নিজের ফায়দার জন্য বস্তুটি কবজা করেছে সেহেতু সেটা ফেরত প্রদান করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর খরচ হলো ফেরত প্রদানের দায়ভুক্ত বিষয়।

সুতরাং সেটা তার উপরই হবে।

আর ভাড়ায় গ্রহণ করা বস্তু ফেরত প্রদানের খরচ ভাড়ায় প্রদানকারীর উপর বর্তাবে।

কেননা ভাড়ায় গ্রহণকারীর কর্তব্য হলো বস্তুটি খালি করে দেওয়া এবং দখল নেয়ার সুযোগ করে দেওয়া; ফেরত প্রদান করা নয়। কেননা ভাড়ায় গ্রহণকারীর কবজার ফায়দা গুণগতভাবে (ভাড়ার মাধ্যমে) ভাড়ায় প্রদানকারীর অনুকূলে নিরাপদ রয়েছে। সুতরাং ফেরত প্রদানের 'খরচ-দায়' ভাড়ায় গ্রহণকারীর উপর আসবে না।

গসব কৃত বস্তু ফেরত দেয়ার খরচ গসবকারীর উপর সাব্যস্ত হবে।

কেননা তার উপর ওয়াজিব হলো গসবকৃত বস্তুটি ফেরত দেওয়া এবং মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া, যেন মালিকের ক্ষতিরোধ হয়। সুতরাং ফেরত দেওয়ার 'খরচ-দায়' তার উপরই সাব্যস্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি বাহনের পশু আরিয়াত নেয় আয় তা মালিকের আস্তাবলে ফিরিয়ে দেয়, এরপর তা হালাক হয়ে যায়, তাহলে সে যামিন হবে না।

এটা সুক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। কিয়াস অনুযায়ী যামিন হবে। কেননা সে তা মালিকের কাছে ফেরত দেয়নি; বরং নষ্ট করেছে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, সে প্রচলিত নিয়মে 'অর্পণ' সম্পন্ন করেছে। কারণ আরিয়াত বস্তু মালিকের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়াই হলো রীতি। যেমন ঘরের সামান পত্র আরিয়াত নেয়া হয় অতঃপর তা বাড়ীতে পৌছে দেয়া হয়।

আর যদি বাহনের পশু মালিকের হাতে ফেরত দেয়। তাহলে মালিক তা বেঁধে রাখার জায়গায় ফিরিয়ে নেবে। সুতরাং তার ফেরত প্রদান সিদ্ধ হবে।

আর যদি কোন গোলাম আরিয়াত নেয় এবং মালিকের বাড়িতে তাকে ফিরিয়ে দেয় কিন্তু মালিকের হাতে অর্পণ না করে তাহলে আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে সে তার ক্ষতিপূরণের দায়বহন করবে না।

আর যদি গসবকৃত বস্তু কিংবা আমানতের বস্তু মালিকের বাড়ীতে ফেরত দেয় কিন্তু মালিকের হাতে অর্পণ না করে (আর হালাক হয়) **তাহলে সে যামিন হবে।**

কেননা গসবকারীর কর্তব্য হলো তার কৃতকর্মটি রহিত করা, আর সেটা রহিত হবে মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে, অন্য কারো কাছে প্রদানের মাধ্যমে নয়।

আর আমানতের বস্তুর ক্ষেত্রে মালিক বাড়ীতে ফেরত দেয়ার ব্যাপারে কিংবা তার পরিবারভুক্ত কারো হাতে ফেরত দেয়ার ব্যাপারে সম্মত নয়। কারণ তাতে সম্মত হলে তো (তাদেরকে বাদ দিয়ে) তার কাছে আমানত রাখলো না।

আরিয়াতের বস্তুর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে এই রীতি প্রচলিত রয়েছে। তাই তো আরিয়াতের বস্তুটি যদি অলংকার (বা এজাতীয় মূল্যবান কিছু) হয় তাহলে

আরিয়াত প্রদানকারীর হাতেই ফেরত প্রদান করতে হবে। কেননা আমরা যে প্রচলিত রীতির কথা বলেছি, এ ক্ষেত্রে এই প্রচলন নেই।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি বাহনের পশু আরিয়াত নেয়, আর নিজের গোলাম বা নিযুক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে তা ফেরত প্রদান করে তাহলে সে যামিন হবে না।

নিযুক্ত কর্মচারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাসিক বা বাৎসরিক বেতনে নিযুক্ত কর্মচারী। কেননা এটা হলো আমানতের বস্তু। সুতরাং সে নিজের পরিবারভুক্ত লোকদের মাধ্যমে তা হেফাজত করতে পারবে। যেমন আমানত দ্রব্যের ক্ষেত্রে।

দিন মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত মজদূরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে তার পরিবারভুক্ত নয়।

তদ্রূপ যদি সে পশুর মালিকের গোলাম বা কর্মচারীর মাধ্যমে তা ফেরত দেয়।

কেননা মালিক তাতে সম্মত থাকে। দেখুন না সে যদি মালিকের হাতে ফেরত দান করে তখন মালিক তার গোলামের (বা কর্মচারীর) হাতেই তা তুলে দেয়।

আর কেউ কেউ বলেছেন, দায়বহন না করার বিধান হলো ঐ গোলামের ক্ষেত্রে যে বাহনের পশু রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। আর কেউ কেউ বলেছেন, এই গোলামের ক্ষেত্রে এবং অন্য গোলামের ক্ষেত্রে একই বিধান। আর এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ।

কেননা মালিক তার পশুকে সব সময় অন্য গোলামের হাতে অর্পণ না করলেও মাঝে মধ্যে করে থাকে।

আর যদি অপরিচিত (অর্থাৎ পরিবার বহির্ভূত) কোন মানুষের মাধ্যমে ফেরত পাঠায় তাহলে সে যামিন হবে।

এই মাসআলাটি প্রমাণ করে যে, আরিয়াত গ্রহণকারী ইচ্ছাকৃতভাবে কারো কাছে আমানত রাখতে পারে না, যেমন কোন কোন মাশায়েখ (অর্থাৎ কারখী র) বলেছেন। পক্ষান্তরে একদল মাশায়েখ (অর্থাৎ ইরাকের মাশায়েখ) বলেছেন যে, সে তা করতে পারবে। কেননা আমানত রাখা আরিয়াত প্রদানের চেয়ে নিম্নতর কাজ। তারা আলোচ্য মাসআলাটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে আরিয়াত চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার কথা বলে।

তিনি আরো বলেছেন, কেউ যদি ফসলহীন খালি ভূমি ফসল করার জন্য আরিয়াত প্রদান করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে আরিয়াত গ্রহণকারী এভাবে লিখবে যে, তুমি আমাকে এই জমি খেতে দিয়েছ। আর সাহেবায়ন বলেন, এভাবে লিখবে যে, তুমি আমাকে আরিয়াত দিয়েছ।

কেননা আরিয়াত শব্দটি এই চুক্তির জন্য নির্ধারিত। আর নির্ধারিত শব্দ দ্বারা চুক্তিপত্র লেখা অধিকতর উত্তম। যেমন বাড়ি আরিয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, 'খেতে দেওয়া' শব্দটি উদ্দেশ্যকে অধিক প্রকাশ করে। কেননা এই শব্দটি ক্ষতি করার সাথে বিশিষ্ট। পক্ষান্তরে 'আরিয়াত দেয়া' শব্দটি এটাকে এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন জমিতে ঘর তোলা ইত্যাদি। সুতরাং এই শব্দে চুক্তিপত্র লেখা অধিক উত্তম হবে। বাড়ীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা বসবাস ছাড়া অন্য কাজে আরিয়াত দেয়া হয় না। সঠিক বিষয়ে আল্লাহ অধিক অবগত।

كِتَابُ الْهِبَةِ

অধ্যায় ঃ হেবা প্রসঙ্গ

হেবা একটি শরীয়ত সম্মত চুক্তি।

কেননা নবী (স) বলেছেন, تهادوا تحابوا -তোমরা পরস্পর হাদিয়া দেওয়া নেওয়া কর তাহলে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। আর হাদিয়া শরীয়ত সম্মত হওয়া বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত।

হেবা চুক্তি সম্পন্ন হয় ইজাব কবুল ও কবজা দ্বারা

ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব করা ও গ্রহণ করা) এর প্রয়োজনীয়তা এজন্য যে, এটা একটা চুক্তি। আর যে কোন চুক্তি ইজাব ও কবুল দ্বারা সংঘটিত হয়। আর কবজা এ জন্য জরুরী যাতে মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

বিক্রয়ের উপর কিয়াস করে ইমাম মালিক (র) বলেন, হেবা বস্তুতে কবজার পূর্বেই মালিকানা সাব্যস্ত হবে। ছাদাকা সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (স) বলেছেন, لايجوز الهبة إلا مقبوضة (কবজাকৃত অবস্থা ছাড়া হেবা জায়িয হবে না)।

'জায়িয হবে না' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'মালিকানা সাব্যস্ত হবে না'। কেননা কবজা ছাড়া হেবা জায়িয হওয়া সাব্যস্ত।

তাছাড়া এই কারণে যে, হেবা হলো দানমূলক চুক্তি। আর কবজার পূর্বে মালিকানা সাব্যস্ত করার অর্থ হলো দানকারীর উপর একটি বিষয় 'অবশ্য আরোপ' করা, যা সে দান করেনি। আর তা হলো অর্পণ করা। সুতরাং তা সিদ্ধ হবে না। অছিয়তের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা অছিয়তের ক্ষেত্রে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার সময় হলো মৃত্যুর পরে। আর যেহেতু (মৃত্যুর কারণে) বাধ্যবাধকতা গ্রহণের যোগ্যতা নেই, সেহেতু দানকারীর উপর বাধ্যবাধকতা আরোপের প্রশ্ন নেই। আর ওয়ারিছের হক অছিয়ত থেকে বিলম্বিত হয়। সুতরাং ওয়ারিছ তার মালিকানা লাভ করে না।

হেবা গ্রহীতা যদি হেবাকারীর অনুমতি ছাড়াই হেবা করার মজলিসে হেবাবস্তুটি কবজা করে তাহলে তা জায়িয হবে।

এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত।

আর যদি মজলিস থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর কবজা করে তাহলে জায়িয হবে না; তবে যদি হেবাকারী কবজার ব্যাপারে তাকে অনুমতি প্রদান করে (তবে জায়িয হবে)।

কিয়াসের দাবী হলো উভয় ক্ষেত্রেই তা জায়িয না হওয়া। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত।

কেননা কবজা করার অর্থ হেবাকারীর মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা। কারণ কবজার পূর্বে তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তার অনুমতি ছাড়া কবজা করা সিদ্ধ হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, হেবার ক্ষেত্রে কবজা করা (বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) কবুল করার পর্যায়ভুক্ত; এ হিসাবে যে, কবজা করার উপর হেবার হুকুম তথা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া নির্ভর করে। আর হেবা চুক্তি দ্বারা (হেবাকারীর) উদ্দেশ্যই হলো (হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির) মালিকানা সাব্যস্ত করা। সুতরাং হেবাকারীর পক্ষ থেকে ইজাবের (প্রস্তাব করার) অর্থই হলো তার পক্ষ থেকে কবজা করার ক্ষমতা প্রদান।

আর মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পর কবজা করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এখানে ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টিকে আমরা কবুলের সঙ্গে যুক্ত করে সাব্যস্ত করেছি। আর কবুলের বিষয়টি মজলিসের সঙ্গে আবদ্ধ, সুতরাং তার সঙ্গে যুক্ত বিষয়টিও মজলিসের সঙ্গে আবদ্ধ হবে।

পক্ষান্তরে যদি তাকে মজলিসে কবজা করা থেকে নিষেধ করে দেয়, তাহলে সেটাও ভিন্ন হবে। কেননা পরোক্ষ প্রমাণ স্পষ্ট বক্তব্যের মোকাবেলায় কার্যকর হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (وهبت) হেবা করলাম (نحلت) দান করলাম, (اعطيت) দিলাম ইত্যাদি কথা দ্বারা হেবা চুক্তি সংঘটিত হবে।

কেননা প্রথম শব্দটি তো হেবার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শব্দ। আর দ্বিতীয় শব্দটি হেবার অর্থে ব্যবহৃত। নবী (স) বলেছেন, اكل أولادك نحلت مثل هذا -তোমার সব সন্তানকে কি এর অনুরূপ দান করেছ? তদ্রূপ তৃতীয় শব্দটিও (রূপকভাবে) হেবার অর্থে ব্যবহৃত। তাই اعطاك الله এবং وهبك الله শব্দ দুটিকে একই অর্থে বলা হয়।

তদ্রূপ হেবা সংঘটিত হবে, যদি বলে- اطعمتك هذا الطعام (তোমাকে এ খাবার খেতে দিলাম) এবং جعلت هذا الثوب لك (এ কাপড়টি তোমার জন্য নির্ধারণ করলাম) এবং اعمرتك هذا الشيئ (এ বস্তুটিকে তোমার জীবদ্দশা পর্যন্ত তোমাকে দিলাম) তদ্রূপ যদি হেবার নিয়ত করে বলে, حملتك على هذه الدابة (আমি তোমাকে এই বাহনের উপর সওয়ার করালাম)।

প্রথম শব্দটির ক্ষেত্রে কারণ এই যে, اطعمت (খেতে দেয়া) শব্দটাকে যখন এমন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, যার বস্তুসত্তাটিকে ভক্ষণ করা যায়। (যেমন খাদ্য দ্রব্য) তখন

এ দ্বারা বস্তু সত্তাটির মালিকানা দান করাই উদ্দেশ্য হয়। পক্ষান্তরে যদি বলে اطعمتك هذه الأرض (এই জমিটি তোমাকে খেতে দিলাম) তখন তা দ্বারা আরিয়াত উদ্দেশ্য হবে। কেননা ভূমির বস্তুসত্তা ভক্ষণ করা যায় না। সুতরাং তা দ্বারা ভূমির ফসল ভক্ষণ করা উদ্দেশ্য হবে।

আর দ্বিতীয় বাক্যটিতে কারণ এই যে, (ل) 'লাম' অব্যয়টি মালিকানা সাব্যস্তকরণের জন্য ব্যবহৃত।

আর তৃতীয় শব্দটির ক্ষেত্রে প্রমাণ এই যে, নবী (স) বলেছেন,

فمن أعمر عمرى فهى للمعمرله ولورثته من بعده ٠

—কেউ যদি (কারো উদ্দেশ্যে) عمرى বলে তাহলে উমরাকৃত বস্তুটি উমরা প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য হয়ে যাবে এবং তার মৃত্যুর পর সেটা তার ওয়ারিসদের হয়ে যাবে।

তদ্রূপ যদি বলে جعلت هذه الدارلك عمرى (এই বাড়িটি তোমার জন্য উমরা করে দিলাম) কারণ তাই যা আমরা এই মাত্র বলেছি।

আর চতুর্থ বাক্যটির কারণ এই যে, বহন করালাম কথাটির প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ হলো 'আরোহণ করালাম'। সুতরাং প্রত্যক্ষ অর্থ হিসাবে এটা হবে আরিয়াত দেওয়া। কিন্তু শব্দটি হেবার অর্থকেও সম্ভাবনা রূপে ধারণ করে। যেমন বলা হয় حمل الأمير فلانا على فرس (আমীর অমুককে একটি ঘোড়ায় বহন করিয়েছেন) আর তা দ্বারা 'মালিক বানিয়েছেন' বোঝানো হয়। সুতরাং বক্তার নিয়তের সময় শব্দটিকে সেই অর্থেই প্রযুক্ত করা হবে।

আর যদি বলে كسوتك هذا الثوب (তোমাকে এই বস্ত্রটি পরিধান করালাম) তাহলে হেবা হবে।

কেননা এই শব্দ দ্বারা মালিকানা দান করা বোঝায়। (ইয়ামীন কসমের কাফফারা প্রসঙ্গে) আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন - أوكسوتهم (কিংবা তাদেরকে বস্ত্র পরিধান করানো)।

তদ্রূপ বলা হয় كسى الأميرفلانا ثوبا (আমীর অমুককে বস্ত্র পরিধান করিয়েছেন) অর্থাৎ বস্ত্রের মালিক বানিয়েছেন।

আর যদি দাসীর ক্ষেত্রে منحتك বলে তাহলে তা আরিয়াত হবে। এর দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস।

আর যদি বলে دارى لك سكنى هبة কিংবা دارى لك هبة سكنى (আমার এই বাড়ীটি বসবাসের উদ্দেশ্যে তোমাকে হেবা করলাম) তাহলে তা আরিয়াত হবে।

কেননা শব্দটি উপকার লাভের জন্য মালিকানা প্রদানের অর্থে সুস্পষ্ট। আর হেবা শব্দটি উপকার লাভের মালিকানা দানের সম্ভাবনা রাখে।

আবার বস্তুসত্তায় মালিকানা প্রদানের সম্ভাবনাও রাখে। সুতরাং সম্ভাবনাযুক্ত অর্থটিকে সুস্পষ্ট অর্থের উপর প্রযুক্ত করা হবে।

তদ্রূপ যদি প্রত্যক্ষ দানমূলক শব্দের আগে বা পরে বসবাস কিংবা আরিয়াত শব্দ ব্যবহার করে তাহলে তা আরিয়াত হবে।

কারণ তাই যা আমরা এইমাত্র বর্ণনা করেছি।

আর যদি বলে (دراى لك) هبة تسكنها (আমার বাড়ী তোমার জন্য হেবা, তাতে তুমি বাস করবে) তাহলে এটা হেবা হবে।

কেননা 'তুমি বাস করবে' 'কথাটিকে পরামর্শ রূপে গণ্য করা হবে, 'হেবা'-এর ব্যাখ্যা রূপে নয়। এ বাক্যটা হল হেবাকারীর হেবা করার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ।

পক্ষান্তরে هبة سكنى বক্তব্যে سكنى শব্দটি هبة এর অর্থগত ব্যাখ্যা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে জিনিস বিভাজনযোগ্য সেটা বিভক্ত এবং 'মালিকের ব্যবহারমুক্ত' না করে হেবা করা যায়িয হবে না। আর অবিভাজনযোগ্য বস্তু অনির্ধারিতভাবে দান করা জায়িয রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই জায়িয হবে। কেননা এটা হলো মালিকানা প্রদানের চুক্তি। সুতরাং অনির্ধারিত ভাবে এবং নির্ধারিতভাবে যে কোনভাবেই জায়িয হবে। যেমন সর্বপ্রকার বিক্রয় জায়েয হয়।

বিভাজনযোগ্য ক্ষেত্রের অনির্ধারিত হিবা এজন্য বৈধ যে, এজমালী বস্তু হেবার হুকুম তথা মালিকানা গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে। সুতরাং সেটা হেবার পাত্র হতে পারবে। আর এটা দানচুক্তি হওয়া বস্তুটির 'এজমালিত্ব' বাতিল করে না, যেমন করয ও অছিয়তের ক্ষেত্রে।

আমাদের দলীল এই যে, হেবার ক্ষেত্রে কবজার অপরিহার্যতা 'নাছ' দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং পূর্ণ কবজা সাব্যস্ত হওয়া শর্ত হবে। আর অন্য বস্তুকে হেবাকৃত বস্তুর সঙ্গে যুক্ত না করা হলে এজমালী বস্তুর পূর্ণ দখল অর্জন হয় না। অথচ সেই অন্য বস্তুটি হেবাকৃত নয়। (আবার হেবাকৃত বস্তু হতে পৃথকও নয়।)

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, অনির্ধারিত হেবাচুক্তিকে বৈধতা দান করার অর্থ হবে হেবাকারীর উপর এমন বিষয় অবশ্য আরোপ করা, যার বাধ্যবাধকতা সে গ্রহণ করেনি। আর সেটা হলো ভাগ করে নেওয়া। এ কারণেই কবজা গ্রহণের পূর্বে হেবার কার্যকারিতা নিষিদ্ধ; যাতে হেবাকারীর উপর অর্জন করার দায় লাযিম না হয়।

পক্ষান্তরে অবিভাজনযোগ্য বস্তুর হেবার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে অপূর্ণ কবজাই শুধু সম্ভব তাই অনিবার্য কারণে অপূর্ণ কবজাকে যথেষ্ট বিবেচনা করা হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ ক্ষেত্রে ভাগ করার ব্যয়ভার তার উপর আরোপিত হয় না।

আর বস্তুটিকে ব্যবহারযোগ্য করে দেয়া হেবা-কারীর উপর অবশ্য কর্তব্য হয়, ঐ বিষয়ে যেটা সে দান করেনি। অর্থাৎ উপকার লাভ আর হেবা বস্তু সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

আর অছিয়তের ক্ষেত্রে কবজা করা শর্ত নয়। বিশুদ্ধ বিক্রয়, ফাসিদ বিক্রয়, ছারফ বিক্রয় এবং সালাম বিক্রয় সম্পর্কেও একই কথা। অর্থাৎ এগুলোর ক্ষেত্রে কবজা করা নাছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। তাছাড়া এগুলো হচ্ছে দায়যুক্ত চুক্তি, সুতরাং বিভাজনের ব্যয়ভার আরোপিত হওয়া সেগুলোর উপযোগী হবে।

আর করয এক দিক দিয়ে দান। কিন্তু অন্য দিকে দায়যুক্ত চুক্তি। তাই উভয় সদৃশ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করে করযের ক্ষেত্রে আমরা অপূর্ণ কবজার শর্ত আরোপ করেছি, কিন্তু বিভাজনের শর্ত আরোপ করিনি। তদুপরি করযের ক্ষেত্রে কবজা বা দখল গ্রহণের বিষয়টি নাছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

আর যদি শরীকদারকে হেবা করল, তাহলে তা জায়িয হবে না। (অথচ এখানে বণ্টনের দায় নেই)।

কেননা (বিভাজনযোগ্য বস্তুতে) বিধান আবর্তিত হবে মূলত: ব্যাপ্ত থাকার উপর।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি একটি ব্যাপ্ত হিস্সা হেবা করে তাহলে তা ফাসিদ হবে।

কারণ সে-টাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

এর পর যদি বণ্টন করে অর্পণ করে তাহলে জায়িয হয়ে যাবে।

কেননা হেবা সম্পূর্ণতা লাভ করে কবজা দ্বারা আর তখন ব্যাপ্ততা বিদ্যমান নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি গমের মাঝে বিদ্যমান আটা বা সরিষার বিদ্যমান তেল হেবা করে তাহলে হেবা ফাসিদ হবে। এরপর যদি গম পিষে আটা অর্পণ করে (এবং দানা চিপে তেল অর্পণ করে) তবু জায়িয হবে না। দুধে বিদ্যমান ঘী সম্পর্কেও একই কথা।

কেননা (হেবা চুক্তি সম্পাদনের সময়) হেবাকৃত বস্তু অবিদ্যমান। এ কারণেই (গম) গসবকারী যদি (গম পিষে) আটা বের করে নেয় তাহলে ঐ আটার সে মালিক হয়ে যায়।

আর যা বিদ্যমান নেই তা মালিকানার ক্ষেত্র হতে পারে না। সুতরাং হেবা চুক্তিটি বাতিল হবে। এবং নতুনভাবে সম্পাদন ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী ছূরতটি ভিন্ন। কেননা 'ব্যাপ্ত' বস্তু মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্র হওয়ার যোগ্য।

ওলানে বিদ্যমান দুধ, দুম্বার পিঠে বিদ্যমান লোম ক্ষেত্রে বিদ্যমান ফসল এবং বৃক্ষে বিদ্যমান খেজুর হেবা করা ব্যাপ্ত বস্তু হেবা করার পর্যায়ভুক্ত। কেননা সংযুক্তির কারণে বৈধতা নিষিদ্ধ হয়েছে। কারণ এই সংযুক্তি কবজা ও দখল গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে; যেমন ব্যাপ্ত বস্তুতে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বস্তুটি যদি হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কবজায় থাকে তাহলে হেবা করা দ্বারাই সে তার মালিক হয়ে যাবে, যদিও দখল গ্রহণের নবায়ন না করা হয়।

কেননা বস্তুটি তার কবজায় রয়েছে, আর কবজাই হচ্ছে হেবা বস্তুর মালিকানার শর্ত।

পক্ষান্তরে মালিক যদি ঐ বস্তুটি তার কাছে বিক্রি করে তাহলে এই কবজা যথেষ্ট হবে না। কেননা বিক্রয় সূত্রে সাব্যস্ত কবজা হল দায়বদ্ধ কবজা। সুতরাং দায়হীন আমানতি কবজা তার স্থলবর্তী হতে পারবে না।

পক্ষান্তরে হেবার কবজা হল অ-দায়বদ্ধ। সুতরাং আমানতি কবজা তার স্থলবর্তী হতে পারবে।

আর বাপ যদি তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে কোন কিছু হেবা করে তাহলে শুধু চুক্তি দ্বারাই সে তার মালিক হয়ে যাবে।

কেননা সেটা পিতার কবজায় রয়েছে। সুতরাং সেটা হেবার কবজায় স্থলবর্তী হতে পারবে।

আর সেটা পিতার কবজায় থাকুক কিংবা পিতা যার কাছে আমানত রেখেছে, তার কবজায় থাকুক; তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা আমানত গ্রহণকারী; কবজা আমানত প্রদানকারীর কবজার অনুরূপ।

পক্ষান্তরে হেবাকৃত বস্তুটি যদি বন্ধক থাকে কিংবা গসবকৃত অবস্থায় থাকে কিংবা ফাসিদ বিক্রয়ের বিক্রয় দ্রব্য হয় তাহলে ভিন্ন বিধান হবে। কেননা সেটা হয় অন্যের হাতে আছে কিংবা অন্যর মালিকানায় আছে।

আর এসব ক্ষেত্রে সাদাকার হুকুম হেবার অনুরূপ।

তদ্রূপ মা যদি তাকে হেবা করে আর পিতার মৃত্যুর কারণে এবং কোন অছী নিযুক্ত না হওয়ার কারণে সে মায়ের পোষ্যভুক্ত হয়। একই ভাবে এমন সব চুক্তির ক্ষেত্রে এ বিধান হবে তার প্রতিপালন করছে।

আর যদি অন্য কোন ব্যক্তি তাকে হেবা করে তাহলে পিতার কবজার মাধ্যমেই হেবা পূর্ণতা লাভ করবে।

কেননা সন্তানের লাভ ও ক্ষতির মাঝে আবর্তিত বস্তুর মালিকানাও পিতা সন্তানের পক্ষ থেকে গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং শুধু লাভজনক বিষয়ের মালিকানা স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করতে পারবে।

আর যদি এতীমকে কোন কিছু হেবা করা হয় আর তার ওয়ালি তার পক্ষ থেকে তা কবজা করে; আর সেই ওয়ালি হলো পিতার নিযুক্ত অছী কিংবা এতীমের দাদা কিংবা দাদার নিযুক্ত অছী, তাহলে জায়িয হবে।

কেননা এরা পিতার স্থলবর্তী হওয়ার কারণে এতীমের উপর এদের কর্তৃত্ব রয়েছে।

আর যদি সে মায়ের প্রতিপালনে থাকে তাহলে সন্তানের অনুকূলে তার কবজা করা জায়িয হবে। কেননা তার হিফাজত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং তার মালের হিফাজত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জায়িয অভিভাবকত্ব স্বীকৃত রয়েছে। আর হেবার কবজা তার হিফাজত সংশ্লিষ্ট বিষয়। কেননা মাল ছাড়া তার জীবন ধারণ সম্ভব নয়। সুতরাং সন্তানের জন্য কল্যাণজনক জিনিস হস্তগত করার অধিকার প্রদান অপরিহার্য।

তদ্রূপ যদি সে কোন তৃতীয় ব্যক্তির প্রতিপালনে থাকে। কেননা ঐ সন্তানের উপর তার গ্রহণযোগ্য অধিকার রয়েছে। দেখুন না, অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি তাকে তার থেকে ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং সন্তানের জন্য যা শুধু লাভজনক সেটা কবযার অধিকার তার থাকবে।

আর সন্তান নিজে যদি হেবা বস্তুর কবজা করে তাহলে তা জায়িয হবে।

অর্থাৎ যদি সে (লাভ ক্ষতির) বোধ সম্পন্ন হয়। কেননা হেবার কবজা তার জন্য লাভজনক। আর সে কবজা করার যোগ্যতা সম্পন্ন।

আর ছোট মেয়েকে হেবা করার ক্ষেত্রে বাসর যাপনের পর তার অনুকূলে তার স্বামীর কবজা করা জায়িয হবে।

কেননা পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, পিতা তার যাবতীয় বিষয় তার হাতে অর্পণ করেছে। বাসর যাপনের পূর্বে বিষয়টি ভিন্ন হবে। আর পিতার জীবিত অবস্থায়ও স্বামী দখল গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মায়ের বিষয়টি এবং মা ছাড়া অন্য সকল প্রতিপালনকারীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিশুদ্ধ মতে পিতার মৃত্যু ছাড়া এবং বিচ্ছিন্ন অনুপস্থিতি ছাড়া তারা কবযা করতে পারে না।

কারণ এদের হস্তক্ষেপ ক্ষমতা হলো অনিবার্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে, পিতার অর্পণের ভিত্তিতে নয়। আর পিতার জীবদ্দশায় কোন অনিশ্চয়তা নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দু'ব্যক্তি যদি এক ব্যক্তিকে একটি বাড়ী হেবা করে তাহলে জায়িয হবে।

কেননা তারা দুজন সমগ্র রূপে তা অর্পণ করেছে আর সেও সমগ্ররূপে তার কবজা করেছে; সুতরাং এতে ব্যপ্ততা নেই।

আর যদি একজন দু'জনকে হেবা করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা জায়িয হবে না। আর সাহেবায়ন বলেন জায়িয হবে।

(সাহেবায়নের দলীল এই যে,) মালিকানা প্রদান যেহেতু অভিন্ন সেহেতু এটা হলো দুজনকে সমগ্রের হেবা। সুতরাং ব্যপ্তি সাব্যস্ত হওয়ার অবকাশ নেই। যেমন, যদি দুজন লোকের কাছে একটি বাড়ী বন্ধক রাখে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, এটা হলো উভয়ের প্রত্যেককে অর্ধেক হেবা করা। এ কারণেই তো যদি অভিভাজনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে একজন দুজনকে হেবা করে আর দু'জনের একজন কবুল করে তাহলে তা সিদ্ধ হয়।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে উভয়ের প্রত্যেকের জন্য অর্ধেকের ক্ষেত্রে মালিকানা সাব্যস্ত হচ্ছে। সুতরাং মালিকানা প্রদানের বিষয়টিও তেমন হবে। কেননা মালিকানা লাভ হচ্ছে মালিকানা প্রদানের হুকুম বা ফল। আর এই হিসাবে (অর্থাৎ

উভয়ের প্রত্যেকের জন্য অর্ধেকের ক্ষেত্রে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার (হিসাবে) 'ব্যাপ্তি' সাব্যস্ত হয়ে যায়।

বন্ধক রাখার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বন্ধকের বিধান হল আটক রাখা। আর উভয়ের প্রত্যেকের জন্য আটক রাখার অধিকার সাব্যস্ত হচ্ছে। সুতরাং ব্যাপ্তি বিদ্যমান নেই।

এ কারণেই বন্ধক প্রদানকারী যদি দুজনের একজনের ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলেও সে বন্ধকী দ্রব্যের কোন অংশ ফেরত নিতে পারবে না।

'জামে ছাগীরে' রয়েছে যে, যদি কেউ দু'জন অভাব গ্রস্তকে দশ দিরহাম সাদকা করে কিংবা হেবা করে তাহলে জায়িয হবে। পক্ষান্তরে যদি দুজন সচ্ছল ব্যক্তিকে ছাদকা করে বা হেবা করে তাহলে জায়িয হবে না।

আর সাহেবায়ন (র) বলেন, দুই টনীর ক্ষেত্রে জায়িয হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর (সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা এই যে, তিনি) হেবা ও ছাদাকা শব্দ দুটির প্রতিটিকে রূপকভাবে অন্যটির অর্থে গ্রহণ করেছেন। আর প্রতিটি শব্দেরই অপর শব্দটির অর্থ প্রদানের যোগ্যতা রয়েছে। কেননা উভয়ের প্রতিটি বিনিময় ছাড়া মালিকানা প্রদানের অর্থ প্রকাশ করে।

আর জামে ছাগীর কিতাবে বিধানের ক্ষেত্রে হেবা ও সাদাকার মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে মাবসূত কিতাবে সাদাকা ও হেবা শব্দ দুটিকে অভিন্ন গণ্য করেছেন। এবং বলেছেন, সাদাকাও হেবার অনুরূপ। কেননা সাদাকা ও হেবা দুটোই কবজার উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে ব্যাপ্তি উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধক হবে।

আর (জামে ছাগীরের) এই বর্ণনা মতে পার্থক্যের কারণ এই যে, সাদাকা দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুটি লাভের ইচ্ছা করা হয়। আর তিনি একজন। আর হেবা দ্বারা সচ্ছল ব্যক্তির সন্তুটি উদ্দেশ্য করা হয়, আর তারা দুজন।

আর কেউ কেউ বলেছেন, এটাই হলো। বিশুদ্ধ মত। আর মাবসূতে যে মাসআলা উল্লেখিত হয়েছে সেখানে সাদাকা দ্বারা দুজন ধনীকে ছাদাকা করা উদ্দেশ্য।

আর যদি দুজন লোককে একটি বাড়ী হেবা করে এভাবে যে, একজনের হলো দুই তৃতীয়াংশ আর অন্য জনের হলো এক তৃতীয়াংশ, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তা জায়িয হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, জায়িয হবে।

আর যদি দুজনের একজনকে অর্ধেক এবং অপরজনকে অর্ধেক হেবা করার কথা বলে, তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে এ সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর মূলনীতির উপর বহাল রয়েছেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) ও অনুরূপ (আপন মূলনীতির উপর বহাল) রয়েছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে পার্থক্যের কারণ এই যে, আংশিকতার বিষয়টিকে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা দ্বারা প্রকাশ পেয়ে যায় যে, তার ইচ্ছা হল আংশিকের মাঝে মালিকানা সাব্যস্ত করা। সুতরাং ব্যাপ্তি প্রকাশ পাবে এ কারণেই যদি দুজনের কাছে বন্ধক রাখে আর আংশিকতার বিষয়টি স্পষ্ট করে তাহলে তা জায়িয হয় না।

পরিচ্ছেদ ঃ যে হেবা রুজু করা যায় এবং যে হেবা রুজু করা যায় না

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন 'আজনাবী'কে হেবা দান করে সে তা ফেরত নিতে পারে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তা ফেরত নিতে পারবে না। কেননা নবী (সা) বলেছেন :

لايرجع الواهب هبته إلا الوالد فيما يهب لولده (النسائى وابن ماجة) ۔

হেবাকারী তার হেবা ফেরত নিতে পারবে না, তবে পিতা পুত্রকে প্রদত্ত হেবা ফেরত নিতে পারে।

তাছাড়া এই কারণে যে, ফেরত নেওয়া মালিকানা প্রদানের বিপরীত কাজ। আর কোন চুক্তি তার বিপরীত কবজার অবকাশ রাখেনা। তবে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মূলনীতি অনুযায়ী পুত্রকে প্রদত্ত পিতার হেবা ভিন্ন। কেননা পুত্র পিতার 'শরীর-অংশ' হওয়ার কারণে মালিকানা প্রদান পূর্ণতা লাভ করেনি।

আমাদের প্রমাণ নবী (সা)-এর বাণী :

الواهب أحق بهبته مالم يثب منها (أى لم يعوض) ۔

যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে এর বিনিময় দেওয়া না হয় ততক্ষণ হেবাকারী তার হেবার ব্যাপারে অধিক হকদার।

তাছাড়া এই কারণে যে, প্রচলিত রীতির প্রেক্ষিতে হেবাচুক্তির উদ্দেশ্য হলো বিনিময় লাভ করা। সুতরাং সেটা যখন সে পেল না তখন চুক্তি রহিত করার ক্ষমতা থাকবে। কেননা চুক্তিতো রহিতকরণ গ্রহণ করে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্যে হলো ফেরত নেয়ার ব্যাপারে তার একচ্ছত্রতা নাচক করা। এবং পিতার অনুকূলে ফেরত নেয়ার অধিকার সাব্যস্ত করা। কেননা প্রয়োজনের সময় সে পুত্রের মালের মালিকানা লাভ করতে পারে। এটাকেই ফেরত নেয়া বলা যায়। কিতাবে যে বলা হয়েছে, তার ফেরত গ্রহণের অধিকার রয়েছে -এর উদ্দেশ্য হলো বিধান বর্ণনা করা। তবে সেটা মাকরূহ হওয়া অবধারিত। কেননা নবী (সা) বলেছেন :

العائد فى هبته كالعائد فى قيئه ۔

হেবা ফেরত গ্রহণকারী নিজের বমি পুন: ফেরত ভক্ষণকারীর ন্যায়।

আর এটা বলা হয়েছে ঘৃণ্যতা বোঝানোর জন্য; (হুরমত বোঝানোর জন্য নয়)।

অত:পর হেবা ফেরত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে; তন্মধ্যে কিছু কিছু ইমাম কুদূরী উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন–

তবে যদি হেবা প্রাপ্ত ব্যক্তি হেবাকারীকে হেবার কোন বিনিময় প্রদান করে।

কেননা হেবা করার উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে গেছে।

কিংবা যদি সংযুক্তিপূর্ণভাবে তাতে কিছু বর্ধিত হয়।

কেননা সম্ভাব্যতা না থাকার কারণে অতিরিক্ত টুকু বাদ দিয়ে হেবা বস্তু ফেরত গ্রহণের সুযোগ নেই। আবার চুক্তিযুক্ত না হওয়ার কারণে অতিরিক্তটুকু ফেরত গ্রহণেরও সুযোগ নেই।

তিনি আরো বলেন, কিংবা দুই চুক্তিকারীর একজন যদি মৃত্যুবরণ করে।

কেননা হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে মালিকানা ওয়ারিছদের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। সুতরাং এটা তার জীবদ্দশায় মালিকানা হাত বদল হওয়ার মত হলো।

আর যদি হেবাকারী মারা যায় তাহলে তার ওয়ারিছ চুক্তির বিষয়ে 'আজনাবী' (বা তৃতীয় ব্যক্তি) গণ্য হবে। কেননা সে তো হেবা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মালিকানা প্রদান করেনি।

কিংবা যদি হেবা বস্তুটি হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়।

কেননা এই হাতবদল হেবাকারীর পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের কারণেই সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং সে তা ভঙ্গ করতে পারবে না।

তাছাড়া মালিকানার কারণ নতুন হওয়ায় মালিকানা নতুনত্ব লাভ করেছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি সে অন্য কাউকে খালিভূমি হেবা করে আর সে তার এক প্রান্তে খেজুর বৃক্ষ রোপণ করল কিংবা ঘর তৈরী করল কিংবা দোকান বানালো কিংবা গবাদি পশুর 'বাথান' বানালো, আর তা ভূমির মধ্যে 'বৃদ্ধি' বলে গণ্য হল তাহলে ঐ ভূমির কোন অংশ সে ফেরত নিতে পারবে না।

কেননা এটা হলো সংযুক্ত বৃদ্ধি।

আর ইমাম কুদূরীর বক্তব্য 'আর সেটা ভূমির মধ্যে বৃদ্ধি বলে গণ্য হলো' দ্বারা এদিকে ইশরা করা হয়েছে যে, দোকান কখনো এমন তুচ্ছ ও ছোট্ট হয় যে, সেটা কোনক্রমেই বৃদ্ধি বলে গণ্য হয় না। আর কখনো কখনো ভূমি এত বিরাট হয় যে, ঐ গুলিকে ভূমির একাংশের বৃদ্ধি বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং তা দ্বারা ভূমির অন্য অংশের ফেরত গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হবে না।

তিনি আরো বলেন, যদি অবিভাজিত অবস্থায় হেবা ভূমির অর্ধেক বিক্রি করে তাহলে অবশিষ্ট অংশে রুজু করতে পারবে।

কেননা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর পরিমাণ অনুযায়ী হবে। আর যদি হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হেবা ভূমির কোন অংশ বিক্রি না করে থাকে, তাহলে হেবাকারী অর্ধেক ভূমি ফেরত নিতে পারে। কেননা তার তো পুরো ভূমি ফেরত নেয়ার অধিকার রয়েছে। সুতরাং আরো স্বাভাবিকভাবেই ভূমির অর্ধেক ফেরত নিতে পারবে।

আর যদি কোন মাহরাম আত্মীয়কে হেবা দান করে তাহলে সে তা ফেরত নিতে পারবে না।

কেননা নবী (সা) বলেছেন :

إذا كانت الهبة لذى رحم لن يرجع فيها (رواه البيهقى) ·

হেবা যদি কোন মাহরাম আত্মীয়ের নামে হয় তাহলে তা রুজু করতে পারবে না।

তাছাড়া এই কারণে যে, হেবার উদ্দেশ্য হলো পিতা রেহমী (আত্মীয়তার হক আদায় করা) আর তা হাছিল হয়েছে।

তদ্রূপ (রুজু করতে পারবে না) স্বামী স্ত্রীর একজন অপরজনকে যা হেবা করেছে।

কেননা এই হেবার উদ্দেশ্য হল সম্পর্কের হক আদায় করা। যেমন আত্মীয়তার ক্ষেত্রে। তবে হেবাচুক্তির সময় এই উদ্দেশ্যের বিদ্যমানতার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। সুতরাং যদি স্ত্রী লোকটিকে কোন কিছু হেবা করার পর বিবাহ করে তাহলে ঐ হেবা রুজু করতে পারবে। পক্ষান্তরে হেবা দান করার পর যদি তাকে বায়ন তালাক দেয় তাহলে রুজু করতে পারবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি হেবাকারীকে বলে যে, এই জিনিসটি তোমার হেবার বিনিময়ে বা হেবার পরিবর্তে বা হেবার মোকাবেলায় গ্রহণ কর, আর হেবাকারী তা গ্রহণ করল, তাহলে ফেরত নেয়ার হক রহিত হয়ে যাবে।

কেননা হেবার উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে গেছে। আর এই শব্দগুলো একই অর্থ প্রদান করে।

আ যদি কোন আজনাবী (তৃতীয় ব্যক্তি) স্বেচ্ছাদান হিসাবে হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাকে কোন বিনিময় প্রদান করে আর হেবাকারী তা কবজা করে তাহলে রুজু করার হক বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা বিনিময়টি হলো হক রহিত করার জন্য। সুতরাং আজনাবীর পক্ষ থেকে তা সিদ্ধ হবে। যেমন খোলার বা সমঝোতার বিনিময় প্রদানের বিষয়টি।

আর যদি হেবার অর্ধেকের হকদার বের হয় তাহলে হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রদত্ত বিনিময়ের অর্ধেক ফেরত নেবে।

কেননা বিনিময়ের অর্ধের মোকাবেলায় হেবার যে অংশ ছিল তা তার অনুকূলে নিরপদ থাকেনি।

আর যদি বিনিময়ের অর্ধেকের হকদার বের হয় তাহলে হেবা রুজু করতে পারবে না। তবে অবশিষ্ট অংশ ফেরত দিয়ে তারপর রুজু করতে পারবে।

আর ইমাম যুফার (র) অপর বিনিময়ের উপর কিয়াস করে বলেন : হেবাকারী হেবা বস্তুর অর্ধেকে ফেরত নিতে পারবে।

আমাদের দলীল এই যে, অবশিষ্ট বিনিময়টুকু সূচনা কালে সমগ্র হেবাবস্তুর বিনিময় হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর হকদার বের হওয়ার সময় প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, এই অবশিষ্টটুকুই শুধু হেবাবস্তুর বিনিময় ছিল। তবে হেবাকারী ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। কেননা সমগ্র বিনিময়টুকু তার অনুকূলে নিরাপদ থাকার জন্যই সে তার ফেরত নেওয়ার হক রহিত করেছিল। অথচ সমগ্র বিনিময় তার অনুকূলে নিরাপদ থাকে নি। সুতরাং তার অধিকার থাকবে অবশিষ্ট বিনিময়টুকু ফেরত প্রদানের।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি একটি বাড়ী হেবা করে আর হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হেবাকারীকে হেবাবস্তুর অর্ধেকের বিনিময় প্রদান করে, তাহলে যে অর্ধেকের বিনিময় দেয়া হয়নি সেটা সে ফেরত নিতে পারে।

কেননা প্রতিবন্ধক অর্ধেকের সঙ্গে বিশিষ্ট রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, উভয়ের সম্মতি কিংবা বিচারকের ফায়সালা ছাড়া হেবা ফেরত নিতে পারবে না।

কেননা ফেরত নেয়ার বৈধতার বিষয়টি মুজতাহিদদের মতপার্থক্যপূর্ণ। আর ফেরত গ্রহণের মূলে দুর্বলতা রয়েছে।

আর হেবার (প্রচলিত) উদ্দেশ্যে হাছিল হওয়া না হওয়ার বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। সুতরাং পারস্পরিক সম্মতি বা আদালতের রায় দ্বারা ফায়সালা হওয়া অপরিহার্য।

তাই যদি হেবাগ্রস্ত গোলাম হয়, আর আদালতের ফায়সালায় পূর্বে হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি গোলামকে আযাদ করে দেয় তাহলে তার মুক্তিদান কার্যকর হবে।

আর যদি হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি গোলামকে আটকে রাখে এবং তার কাছে হালাক হয়ে যায় তাহলে সে দায়বহন করবে না। কেননা হেবাদ্রব্যে তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে।

তদ্রূপ (দায়বহন করবে না) যদি ফেরত দেয়ার ব্যাপারে আদালতের ফায়সালা হওয়ার পর হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে হালাক হয়। কেননা তার দখল গ্রহণের প্রথম অবস্থা ছিল দায়বিহীন। আর এটা হলো দায়বিহীন কবজা অব্যাহত থাকা।

তবে হেবাকারীর ফেরত চাওয়ার পর আটকে রাখলে দায়বহন করবে। কেননা এটা হলো সীমা লঙ্ঘন। আর যদি আদালত রায় বা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ফেরত নেয় তাহলে সেটা মূল থেকে হেবাচুক্তি রহিতকরণ হবে। তাই হেবাকারীর কবজা-এর শর্ত করা হবে না। এবং 'ব্যাপ্ত' বাস্তব ক্ষেত্রেও ফেরত গ্রহণ বৈধ হবে।

কেননা চুক্তিটি বৈধ রূপে এবং মূল থেকে রহিত করণের হক অবশ্য সাব্যস্তকারীরূপে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং রহিতকরণের মাধ্যমে সে এমন একটি হক উশূল করেছে, যা তার অনুকূলে সাব্যস্ত ছিল। সুতরাং (ব্যপ্ত মালিকানা সম্পন্ন এবং অব্যাপ্ত মালিকানা সম্পন্ন উভয় বস্তুতে) নি:শর্ত রূপে এই হক প্রকাশ পাবে।

ক্রেতার দখল গ্রহণের পর দোষজনিত কারণে ফেরত প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। সেখানে ক্রেতার হক সাব্যস্ত হয়েছিল বস্তুটির নিখুঁতত্ব বিষয়ে, রহিতকরণ বিষয়ে নয়। সুতরাং উভয় মাসআলা পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, হেবাকৃত বস্তু যদি নষ্ট হয়ে যায় এরপর তার কোন হকদার বের হয় আর হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সে যামিন বানায় তখন সে হেবাকারীর কাছে কোন ক্ষতিপূরণ রুজু করতে পারবে না।

কেননা এটা ছিল স্বেচ্ছাদানমূলক চুক্তি। সুতরাং হেবা বস্তুটির 'নিরাপদ হওয়া' গুণের হক তার উপর আরোপিত হবে না। আর সে হেবাকারীর পক্ষে কোন কাজ করেনি।

আর বিনিময়মূলক চুক্তির মাধ্যমে ধোকা, ফেরত চাওয়ার কারণ হয়ে থাকে। অন্য কোন চুক্তির মাধ্যমে ধোকা তো ফেরত পাওয়ার কারণ হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি বিনিময়ের শর্তে হেবা করে তাহলে উভয় বিনিময়ের ক্ষেত্রে মজলিশেই কবজার শর্ত হবে। আর ব্যক্তির কারণে হেবা বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা প্রাথমিক অবস্থায় এটা হলো হেবা। সুতরাং উভয়ে যদি পরস্পর দখল বিনিময় করে তাহলে হেবা চুক্তি ছহী হয়ে যাবে। অত:পর বিক্রয় -এর হুকুমভুক্ত হবে। আর দোষের কারণে বা প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছাধিকারের সূত্রে ফেরত দিতে পারবে এবং তাতে শোফার হক সাব্যস্ত হবে। কেননা শেষ অবস্থায় এটা হলো বিক্রয় চুক্তি।

আর ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, প্রাথমিক ও শেষ উভয় অবস্থায়ই তা বিক্রয়। কেননা তাতে বিক্রয়ের অর্থ তথা বিনিময়ের ভিত্তিতে মালিকানাদান বিদ্যমান রয়েছে। আর চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে গুণগত দিকই হলো বিবেচ্য। এজন্যই মনিব কর্তৃক গোলামের কাছে তার দাসসত্তাকে বিক্রয় করার অর্থ হয় আযাদ করা।

আমাদের দলীল এই যে, এই চুক্তি দুটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুতরাং উভয় সদৃশতাকে বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব উভয় দিককে একত্র করা হবে। আর এখানে তা সম্ভব। কেননা হেবার বিধান হলো কবজা পর্যন্ত মালিকানাকে বিলম্বিত করা। আর ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালিকানা বিলম্বিত হয়ে থাকে। আর বিক্রয়ের বিধান হলো মালিকানা অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে যাওয়া। আর বিনিময় প্রদানের কারণে হেবা অবশ্য সাব্যস্ত রূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই উভয়কে আমরা এখানে একত্র করেছি।

গোলামের কাছে তার দাস সত্তাকে বিক্রি করার বিষয়টি ভিন্ন।

কেননা সেখানে বিক্রয়ের দিকটি বিবেচনা করা সম্ভব নয়। কারণ সে নিজের মালিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

অনুচ্ছেদ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি 'গর্ভ' বাদ দিয়ে শুধু দাসীকে হেবা করে তাহলে হেবা ছহী হবে। কিন্তু ব্যতিক্রমকরণ বাতিল হবে।

কেননা ব্যতিক্রমকরণ ঐ ক্ষেত্রেই শুধু কার্যকর হয়, যেখানে চুক্তি কার্যকর হয়। অথচ 'গর্ভ'-এর ক্ষেত্রে হেবা চুক্তি কার্যকর হয় না। কারণ আমরা বিক্রয় পর্বে বর্ণনা করে এসেছি যে, এটা হলো দাসীর গুণ। সুতরাং এটা ফাসিদ শর্তে পাল্টে যবে। আর ফাসিদ শর্ত দ্বারা হেবা বাতিল হয় না। বিবাহ, খোলা ও ইচ্ছাকৃত হত্যা সম্পর্কে সমঝোতার ক্ষেত্রে এটাই
হলো বিধান। কেননা এগুলো ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না।

বিক্রয়, ইজারা ও বন্ধকী চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেগুলো ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

আর যদি গর্ভস্থ সন্তানকে আযাদ করার পর দাসীকে হেবা করে তাহলে তা জায়িয হবে।

কেননা গর্ভস্থ সন্তান তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকেনি। সুতরাং এটা দাসীকে হেবা করার সময় গর্ভস্থ সন্তানকে ব্যতিক্রম করার সদৃশ হলো।

আর যদি গর্ভস্থ সন্তানকে মোদাব্বার ঘোষণা করে অত:পর দাসীকে হেবা করে, তাহলে হেবা বৈধ হবে না।

কেননা এ ক্ষেত্রে গর্ভস্থ সন্তান হেবাকারীর মালিকানায় থেকে যাবে। সুতরাং এটা ব্যতিক্রম করণের সদৃশ হলো না। আর গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে হেবা কার্যকর করা সম্ভব হবে না, মোদাব্বার ঘোষণা করার কারণে। সুতরাং বিষয়টি ব্যাপ্ত বস্তুকে হেবা করা কিংবা এমন বস্তুকে হেবা করা হয়ে গেলো, যা মালিকের মালিকানার সাথে আবদ্ধ।

আর যদি এই শর্তে হেবা করে যে, হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হেবা কারীকে তা ফেরত প্রদান করবে কিংবা তাকে আযাদ করবে কিংবা তাকে উম্মে ওয়ালাদ বানাবে। কিংবা তাকে একটি বাড়ী এই শর্তে হেবা বা ছাদাকা করল যে, তার কিছু অংশ তাকে ফেরত দেবে কিংবা তার কিছু অংশ তাকে বিনিময় রূপে প্রদান করবে, তাহলে হেবা জায়িয হবে। কিন্তু শর্ত বাতিল হবে।

কেননা এ সকল শর্ত হেবা চুক্তির চাহিদার পরিপন্থী। সুতরাং তা ফাসিদ হবে। আর ফাসিদ শর্ত দ্বারা হেবা বাতিল হয় না। দেখুন না নবী (সা) উমরা (জীবদ্দশা পর্যন্ত দান করা) অনুমোদন করেছেন। কিন্ত উমরা রূপে দান কারীর শর্ত বাতিল করেছেন।

বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। (অর্থাৎ ফাসিদ শর্ত দ্বারা বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়)। কেননা নবী (সা) শর্তযুক্ত বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, ফাসিদ শর্ত 'রিবা'-এর পর্যায়ভুক্ত।

আর তা বিনিময় জাতীয় চুক্তিতে কার্যকর হয়, দান জাতীয় চুক্তিতে কার্যকর হয় না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কারো যদি অন্য একজনের কাছে এক হাযার দিরহাম পাওনা থাকে, আর সে বলে, যখন আগামীকাল হবে তখন তা তোমার জন্য (হয়ে যাবে।) কিংবা তুমি তা (পরিশোধের দায়) থেকে দায়মুক্ত। কিংবা বললো, তুমি যদি আমাকে অর্ধেক পরিশোধ কর তাহলে বাকি অর্ধেক তোমার। কিংবা বাকি অর্ধেক থেকে তুমি মুক্ত, তাহলে এ বক্তব্য বাতিল।

কেননা দায়মুক্তকরণ একদিক থেকে মালিকানা প্রদান। অন্যদিক থেকে তা হলো নিজের হক রহিতকরণ। আর ঋণের দেনাদার যে, তাকে ঋণ হেবা করার অর্থ দায়মুক্ত করা।

আর এটা এজন্য যে, প্রাপ্য ঋণ এক হিসাবে মাল। এই দিক থেকে এটা হল মালিকানা প্রদান করা।

আবার অন্য হিসাবে (মাল নয়,বরং) একটি গুণ। এই দিক থেকে এটা হল হক রহিতকরণ।

এই দুই দিক বিবেচনা করে আমরা বলেছি যে, এই প্রস্তাব রদ করলে রদ হয়ে যায়। আবার তা দেনাদারের কবুল করার উপর নির্ভর করে না। আর শর্তের সাথে সম্পৃক্তকরণ নিছক রহিতকরণ জাতীয় বক্তব্যের সাথে বিশিষ্ট, যেগুলো দ্বারা কসম করা হয়। যেমন তালাক ও গোলাম আযাদ করা। সুতরাং শর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি নিছক রহিতকরণ জাতীয় বক্তব্যের বাইরে যাবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'উমরা' দান বৈধ। এবং 'উমরা' প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য হবে তার জীবদ্দশা পর্যন্ত এবং তার পর হবে তার ওয়ারিছদের জন্য।

কারণ আমাদের বর্ণিত হাদীস।

আর উমরা অর্থ নিজের বাড়ীকে উমরাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য তার জীবদ্দশা পর্যন্ত নির্ধারণ করা। আর যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তখন তা উমরা দাতার মালিকানায় ফিরে আসবে।

তবে আমাদের বর্ণিত হাদীসের কারণে দান বৈধ হবে। আর শর্ত বাতিল হবে। আগেই আমরা বর্ণনা করেছি যে, হেবা ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে 'রোকবা' দানও বাতিল। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তা জায়িয।

কেননা দাতার এই বক্তব্য دارى لك (আমার বাড়ী তোমার)-এর অর্থ মালিকানা, প্রদান। পক্ষান্তরে তার পরবর্তী কথা رقبى হলো 'উমরা'-এর ন্যায় ফাসিদ শর্ত।

তারফায়নের দলীল এই যে, নবী (সা) 'উমরা' অনুমোদন করেছেন, কিন্তু 'রোকবা' বাতিল করেছেন।

তাছাড়া তারফায়নের মতে 'রোকবা' অর্থ একথা বলা যে, আমি যদি তোমার আগে মারা যাই তাহলে তা তোমার। শব্দটি مراقبة থেকে উৎপন্ন। যেন সে অপর পক্ষের মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছে। সুতরাং এটা হলো মালিকানাকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিশ্চিত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা। সুতরাং তা বাতিল হয়ে যাবে। যখন এটা সিদ্ধ হলো না। তখন তারফায়নের মতে তা আরিয়াত হয়ে যাবে। কেননা এটা তা দ্বারা নি:শর্তবাবে উপকৃত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে।

পরিচ্ছেদ ঃ ছাদাকা প্রসঙ্গ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ছাদাকাও হেবার মত, যা কবজা ছাড়া সিদ্ধ হয় না।

কেননা এটা হেবার মত স্বেচ্ছা দান। সুতরাং তা এমন ব্যাপ্ত বস্তুতে জায়িয হবে না, যা বিভাজনের সম্ভাবনা রাখে। এর কারণ আমরা হেবা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

আর সাদাকার ক্ষেত্রে ফেরৎ নেয়ার অবকাশ নেই।

কেননা সাদাকার উদ্দেশ্যে হলো ছাওয়াব; আর তা হাছিল হয়েছে।

অদ্রূপ যখন কোন ধনীকে সাদাকা করবে, সূক্ষ্ম কিয়াস মতে তা ফেরত নিতে পারবে না।

কেননা ইনাকে সাদকা করা ছাড়াও অনেক সময় ছাওয়াব উদ্দেশ্য করা হয়, আর তা অর্জিত হয়েছে।

অদ্রূপ গরীবকে হেবা করার পর ফেরত নেয়া যাবে না।

কেননা (গরীবকে হেবা করার) উদ্দেশ্য হল ছাওয়ার আর তা অর্জিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি মান্নত করে যে, সে তার মাল সাদাকা করবে তাহলে ঐ শ্রেণীর মাল সাদাকা করবে যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। আর যে মান্নত করে যে, তার মালিকানায় যা আছে তা সাদাকা করবে, তাহলে তার মালিকানার সমস্ত মাল সাদাকা করা তার উপর লাযিম হবে।

আর বর্ণিত আছে যে, এটা এবং প্রথমটা অভিন্ন আর কাযা বা বিচার সংক্রান্ত আলোচনায় মাল ও মালিকানা-এর মাঝে পার্থক্য এবং উভয় বর্ণনায় যুক্তি আলোচনা করেছি।

আর মান্নতকারীকে বলা হবে যে, এই পরিমাণ মাল ধরে রাখো যা কিছু মাল উপার্জন করা পর্যন্ত। তোমার এবং পোষ্য পরিজনের জন্য খরচ করবে।

যখন সে কিছুমাল উপার্জন করবে তখন যা খরচ করছিল সেই পরিমাণ সাদাকা করে দেবে। ইতিপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি।

كِتَابُ الْإِجَارَةِ

অধ্যায় ঃ ইজারা প্রসঙ্গ

ইজারা হল এমন চুক্তি, যা বিনিময়ের মাধ্যমে উপকার লাভের উপর সম্পন্ন হয়।

কেননা অভিধানে ইজারা অর্থ বস্তুর উপকার বিক্রি করা। আর কিয়াস তার বৈধতা অস্বীকার করে।

কেননা চুক্তিকৃত বিষয় হলো বস্তুর উপকার। আর তা তো অবিদ্যমান। আর যা ভবিষ্যতে অস্তিত্ব লাভ করবে, তার দিকে মালিকানা প্রদানের বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করা সহী নয়। তবে আমরা তা জায়িয রেখেছি এ বিষয়ে মানুষের প্রয়োজনের কার। এবং তার বৈধতা সম্পর্কে হাদীসের সাক্ষ্য রয়েছে। আর তা হলো নবী (সা)-এর বাণী—

اعطو الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ٠

মজদূরকে তার ঘাম শুকানোর আগে তার-মজুরি প্রদান কর। নবী (সা) আরো বলেছেন—

من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره ٠

যে কোন মজদূরকে কাজে নিয়োগ করবে সে যেন তাকে তার মজুরির পরিমাণ জানিয়ে দেয়।

আর চুক্তির ক্রিয়া চুক্তিকৃত উপকারের অস্তিত্ব লাভের সাথে সাথে ক্রমে ক্রমে সংঘটিত হতে থাকবে। আর (উদাহরণ স্বরূপ) ভাড়াকৃত বাড়ীকে বাড়ীর উপকার লাভের স্থলবর্তী করা হবে চুক্তিকে বাড়ীর দিকে সম্পৃক্ত করার দিক থেকে। যাতে চুক্তির ইজাব ও কবুল সংযুক্ত হয়ে যায়। অত:পর উপকারের অস্তিত্ব লাভের সময় মালিকানা লাভ এবং অধিকার লাভ-এর দিক থেকে চুক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পেতে থাকবে।

আর বস্তুর উপকার যদি পরিজ্ঞাত না হয় এবং মজুরি যদি পরিজ্ঞাত না হয়, তাহলে ইজারা চুক্তি বৈধ হবে না।

এর দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস।

তাছাড়া এই কারণে যে, চুক্তিকৃত বিষয় (তথা উপকারের অজ্ঞতা) এবং তার বিনিময় (তথা ভাড়ায় অজ্ঞতা) বিবাদ পর্যন্ত গড়াবে। যেমন বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য ও বিক্রয় দ্রব্যে অজ্ঞতা।

বিক্রয় চুক্তিতে যা মূল্য হতে পারে ইজারা চুক্তিতে সেটাই ভাড়া বা মজুরি হতে পারবে।

কেননা ভাড়া যা মজুরি হলো বস্তুর উপকার মূল্য। সুতরাং বিক্রয় দ্রব্যের মুল্যের সাথেই তা বিবেচিত হবে।

আর যা বিক্রয় দ্রব্যের মূল্য হতে পারবে না, তাও ইজারা চুক্তির ভাড়া হতে পারবে।

যেমন (গোলাম, বস্ত্র ইত্যাদি) সুতরাং উপরোক্ত বাক্য অন্যান্য গুলোর উপযোগিতা নাচক করে না। কেননা ভাড়া হচ্ছে মালজাতীয় বিনিময়।

আর বস্তুর উপকার লাভের বিষয়টি কখনো পরিজ্ঞাত হয় মেয়াদ দ্বারা। যেমন বসবাসের জন্য বাড়ী এবং চাষবাসের জন্য জমি ইজারা নেওয়া। তখন নির্দিষ্ট মেয়াদের উপর চুক্তি করা সিদ্ধ হবে, যে কোন মেয়াদ হোক।

কেননা মেয়াদ যখন পরিজ্ঞাত হবে তখন বস্তুর উপকার লাভের পরিমাণও পরিজ্ঞাত হবে, যদি উপকার লাভের বিষয়টি বিভিন্ন না হয়।

আর ইমাম কুদূরী (র)-এর বক্তব্য 'যে কোন মেয়াদ' দ্বারা এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী হোক কিংবা স্বল্প স্থায়ী হোক ইজারা জায়িয হবে। কেননা মেয়াদ তো জানাই রয়েছে। আর এর সম্ভাবনা আছে।

তবে ওয়াকফী যমির ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা জায়েয নয়; যাতে ইজারা গ্রহণকারী যমির মালিকানা দাবী করে না বসে। আর তিন বছরের বেশী যা সেটাই দীর্ঘ মেয়াদ। আর (ফতোয়ার ক্ষেতে) এটাই গৃহীত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর বস্তুর উপকার কখনো পরিজ্ঞাত হয়, স্বয়ং ইজারা চুক্তি দ্বারা। যেমন কোন লোককে বস্ত্র রঞ্জিত করার জন্য কিংবা সেলাই করার জন্য কেউ ভাড়ায় নিল কিংবা নির্ধারিত পরিমাণ বোঝা বহনের জন্য কিংবা নির্ধারিত দূরত্বে আরোহণের জন্য কোন জন্তু ভাড়া নিলো।

কেননা যখন বস্ত্রের প্রকার বলে দেবে এবং রঙের বর্ণ ও পরিমাণ বলে দেবে এবং সেলাইয়ের প্রকৃতি বলে দেবে আর বহনকৃত বোঝার পরিমাণ ও মালের প্রকার বলে দেবে এবং দূরত্ব বলে দেবে তখন উপকার লাভ পরিজ্ঞাত হয়ে যাবে। সুতরাং চুক্তি বৈধতা লাভ করবে।

কখনো এভাবে বলা হয় যে, ইজারা কখনো কাজের উপর চুক্তি রূপেও হয়ে থাকে যেমন ধোপা বা দর্জীকে ভাড়া নিযুক্ত করা হলো। সে ক্ষেত্রে কাজটা পরিজ্ঞাত হতে হবে। আর এটা হয়ে থাকে শরীকানা মজদূরের ক্ষেত্রে। আর কখনো হয় উপকার লাভের উপর চুক্তির মাধ্যমে। যেমন ব্যক্তিগত মজুদূরের ক্ষেত্রে। তখন কাজের সময় উল্লেখ করা অপরিহার্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর কখনো বস্তুর উপকার লাভ পরিজ্ঞাত হয় ইশারা দ্বারা নির্ধারণ করে দেওয়ার মাধ্যমে। যেমন এই খাদ্য সামগ্রী নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত বহনের জন্য কোন লোককে ভাড়ায় নেয়া হলো।

কেননা যখন তাকে বহনের বস্তু দেখিয়ে দেয়া হবে এবং যে স্থানে বহন করে নেয়া হবে তা জানিয়ে দেয়া হবে, তখন উপকার লাভের বিষয়টি পরিজ্ঞাত হয়ে যাবে। সুতরাং চুক্তি বৈধ হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ কখন ভাড়ার হকদার হবে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, শুধু চুক্তি দ্বারা মজুরি ওয়াজি হয় না। বরং তিনটি গুণের কোন একটি দ্বারা মজুরির হকদারি সাব্যস্ত হয়। তাড়াতাড়ি দেয়ার শর্ত দ্বারা এবং শর্তছাড়াই তাড়াতাড়ি প্রদান করা দ্বারা, কিংবা চুক্তিকৃত উপকার উশুল করা দ্বারা।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, স্বয়ং চুক্তি দ্বারা মজুরির মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কেননা চুক্তিকে বৈধতা দানের অনিবার্য প্রয়োজন বশত: অবিদ্যমান উপকার গুণগত ও বিধানগতভাবে বিদ্যমান হয়ে গেছে। সুতরাং তার বিপরীতে যে বিনিময় রয়েছে তাতে মালিকানার হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

আমাদের দলীল এই যে, আমরা আগেই বলে এসেছি যে উপকারের ক্রম অস্তিত্বের ভিত্তিতে চুক্তির কার্যকারিতা একটু করে ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হবে। আর ইজারা চুক্তি হলো একটি বিনিময় চুক্তি। আর বিনিময়ে দাবী হল উভয় বিনিময়ের মাঝে সমতা বিধান।

সুতরাং উপকারের দিকটি বিলম্বের অনিবার্য ফল হল অপর বিনিময় (অর্থাৎ মজুরির) দিকটিতে বিলম্ব হওয়া।

আর যখন উপকার উশুল করে নেবে তখন মজুরিতে মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে, সমতা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। তদ্রূপ যখন তাড়াতাড়ি পরিশোধের শর্ত আরোপ করা হয়; কিংবা শর্ত ছাড়াই তাড়াতাড়ি পরিশোধ করা হয়। কেননা ভাড়ায় গ্রহণকারীর হক হিসাবে সমতা সাব্যস্ত হয়। আর সে নিজেই তা বাতিল করেছে।

ভাড়ায় গ্রহণকারী যখন বাড়ীর দখল গ্রহণ করবে তখন সে তাতে বসবাস না করলেও তার উপর ভাড়া লাযিম হয়ে যাবে।

কেননা মূল উপকরাকে অর্পণ করা কল্পনা করা যায় না। তাই উপকারের ক্ষেত্রে অর্পণ করাকেই আমরা উপকার অর্পণের স্থলবর্তী করেছি। কেননা তা দ্বারাই উপকার লাভের সামর্থ্য সাব্যস্ত হয়।

অত:পর যদি কোন গসবকারী ভাড়াকৃত বস্তুটি তার হাত থেকে গসব করে নেয় তাহলে ভাড়া রহিত হয়ে যাবে।

কেননা ক্ষেত্র অর্পণকরাকে উপকার অর্পণ করার স্থলবর্তী করা হয়েছে উপকার লাভ সম্ভব হওয়ার কারণে। সুতরাং উপকার লাভের সম্ভাব্যতা যখন হাত ছাড়া হয়ে গেলো তখন অর্পণ করাও অবিদ্যমান হয়ে গেলো। আর চুক্তি রহিত হয়ে গেলো। সুতরাং ভাড়াও রহিত হয়ে যাবে।

আর নির্ধারিত মেয়াদের কিছু সময়ের মধ্যে যদি গসব সংঘটিত হয় তাহলে সেই পরিমাণে ভাড়া রহিত হবে।

কেননা মেয়াদের কিছু অংশে চুক্তি রহিত হয়েছে।

কেউ যদি কোন বাড়ী ভাড়ায় গ্রহণ করে তাহলে ভাড়ায় প্রদানকারীর অধিকার থাকবে তার কাছে প্রতিদিনের ভাড়া দাবী করার।

কেননা সে উদ্দীষ্ট উপকার উশুল করে নিয়েছে।

তবে ভাড়ায় গ্রহণকারী যদি চুক্তির মধ্যে ভাড়ায় প্রাপ্যতার সময় উল্লেখ করে থাকে।

কেননা এই উল্লেখ হলো মেয়াদ নির্ধারণের পর্যায়ভুক্ত। যমী ইজারার বিষয়টিও অনুরূপ।

তার কারণ আমরা বর্ণনা করেছি।

আর কেউ যদি (উদাহরণ স্বরূপ) মক্কায় গমনের জন্য উট ভাড়া নেয়, তাহলে উটের মালিক প্রত্যেক মনযিলের ভাড়া দাবী করতে পারে।

কেননা প্রত্যেক মনযিলের যাত্রা (আদালাভাবে) উদ্দেশ্য।

ইমাম আবু হানীফা (র) প্রথমে বলতেন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এবং সফর শেষ হওয়ার আগে মজুরি ওয়াজিব হবে না। ইমাম যুফার (র)-এরও এই মত।

কেননা মেয়াদের মধ্যে সমগ্র উপকারটুকু হলো চুক্তিকৃত বিষয়। সুতরাং মজুরি তার বিভিন্ন অংশের উপর বণ্টিত হতে পারে না। যেমন কর্ম হয় চুক্তিকৃত বিষয়।

পরবর্তী রুজুকৃত মতের কারণ এই যে, কিয়াসের দাবী তো হলো মুহূর্তে মুহূর্তে ক্রমান্বয়ে মজুরির প্রাপ্যতা সাব্যস্ত হওয়া, যাতে সমতা সাব্যস্ত হয়। তবে প্রতি মুহূর্তে দাবী করার ফল হবে অন্য কোন কাজের জন্য আবার না পাওয়া। এতে ভাড়ায় গ্রহণকারী তা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং প্রাপ্যতাকে আমরা উল্লেখিত পরিমাণ দ্বারা নির্ধারণ করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পূর্বে ধোপার বা দর্জীর মজুরি দাবী করার অধিকার নেই।

কেননা এ কাজের অংশবিশেষের মধ্যে উপকার হওয়া যায় না। সুতরাং তার বিপরীতে মজুরি ওয়াজিব হবে না।

তদ্রূপ যদি মজুরির বিনিময়ে নিয়োগকারীর বাড়ীতে কাজ করে তাহলে উপরোক্ত কারণে কাজ শেষ করার আগে মজুরি ওয়াজিব হবে না।

তবে যদি তাড়াতাড়ি পরিশোধের শর্ত আরোপ করে থাকে।

কেননা পূর্বে বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে আরোপিত শর্ত লাযিম হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি রুটির কারিগরকে এক দিরহামের বিনিময়ে এক 'কাফীয' আটার রুটি তৈরি করার জন্য তার বাড়ীতে ভাড়ায় নিযুক্ত করে তাহলে তন্দুর থেকে রুটি বের করার আগে মজুরির হকদার হবে না।

কেননা তন্দুর থেকে বের করা দ্বারা কাজের সম্পূর্ণতা হয়।

সুতরাং যদি বের করার আগে রুটি পুড়ে যায় কিংবা তার হাত থেকে পড়ে যায় তাহলে সে কোন মজুরি পাবে না।

কেননা অর্পণের পূর্বে নষ্ট হয়ে গেছে।

আর যদি বের করার পর তার কোন 'হস্তক্ষেপ' ছাড়া পুড়ে যায় তাহলে সে মজুরি পাবে।

কেননা রুটি তার ঘরে রাখার মাধ্যমেই সে অর্পণকারী হয়ে গেছে। আর তার উপর ক্ষতিপূরণে দায় আসবে না। কেননা তার পক্ষ থেকে কোন অপরাধ সাব্যস্ত হয়নি।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। কেননা এটা তার হাতে আমানত।

আর সাহেবায়ন (র)-এর মতে সেই রুটির সমপরিমাণ আটার যামিন হবে। আর সে কোন মজুরী পাবে না। কেননা এটা তার উপর দায়যুক্ত ছিল। সুতরাং প্রকৃত অর্পণের পরই শুধু সে দায়মুক্ত হবে। আর ইচ্ছা করলে সে তার উপর রুটির দায় আরোপ করতে পারে এবং রুটি তৈরির মজুরি প্রদান করতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন বাবুর্চিকে ভাড়ায় নিযুক্ত করে ওলীমার খাবার তৈরি করার জন্য তাহলে বেড়ে দেয়ার দায়িত্ব তার উপর প্রচলিত রীতির প্রেক্ষিতে।

ইমাম কুদূরী বলেন, কেউ যদি ইট তৈরি করার জন্য কোন ব্যক্তিকে মজুরিতে নিযুক্ত করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সেগুলি শুকোতে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিন্যস্ত করার পর মজুরির হকদার হয়ে যাবে।

আর সাহেবায়ন বলেন, (শুকোনের পর) সাজিয়ে দেওয়ার পর মজুরির হকদার হবে।

কেননা (শুকোনোর পর) সাজিয়ে দেওয়া তার কাজের সম্পূর্ণতার অংশ বিশেষ। কারণ এর আগে তা নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ নয়। সুতরাং এটা তন্দুর থেকে রুটি বের করার মতো হলো।

তাছাড়া প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মজদুরই এ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

আর যে বিষয়ে শরীয়তের 'নাছ' নেই, সে বিষয়ে প্রচলিত রীতিই হলো বিবেচ্য।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, শুকোনোর জন্য বিন্যস্ত করা দ্বারাই তার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। শুকোনোর পর সাজানো হল অতিরিক্ত কাজ। যেমন স্থানান্তর করা।

দেখুন না, সাজানোর পূর্বে কর্মস্থলে স্থানান্তর করার মাধ্যমে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব।

শুকোনোর জন্য বিন্যস্ত করার পূর্বের অবস্থাটি ভিন্ন। কেননা সেটা হলো বিক্ষিপ্ত মাটি। রুটির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তন্দুর থেকে বের করার আগে তা উপকার লাভ যোগ্য নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে কোন কারিগরের কাজের চিহ্ন যদি বস্তুটিতে দেখা দেয় যেমন ধোপা ও রঙ শ্রমিক, তাহলে তার অধিকার রয়েছে কাজ শেষ করার পর মজুরি উশুল করার জন্য বস্তুটি আটক রাখার।

কেননা চুক্তিকৃত বিষয় হচ্ছে একটি গুণ, যা কাপড়ে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সেটার বিনিময় উশুল করার জন্য আটক রাখার অধিকার তার থাকবে। যেমন বিক্রয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে।

যদি সে বস্তুটি আটক রাখার পর তার হাতে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার উপর কোন যামান আসবে না।

কেননা আটক রাখার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘনকারী নয়। সুতরাং আগে যেমন তার কাছে আমানত ছিল, তেমনি এখনো তার কাছে আমানত রূপেই থাকবে।

তবে সে মজুরি পাবে না। কেননা মালিকের হাতে অর্পণ করার পূর্বে চুক্তিকৃত বিষয় হালাক হয়ে গেছে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে আটক করার পূর্বেও বস্তুটি দায়যুক্ত ছিল। সুতরাং আটক করার পরও তা দায়সম্পন্ন হবে।

তবে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে, ইচ্ছা করলে সে কাজ না করা অবস্থায় কাপড়টির মূল্যের দায় তার উপর আরোপ করবে। এবং সে কোন মজুরি পাবে না। আর ইচ্ছা করলে সে কাজ করা অবস্থায় কাপড়টির মূল্যের দায় তার উপর আরোপ করতে পারে। আর সে মজুরি পারে। পরবর্তীতে (মজদূরের দায় বহন অধ্যায়ে) ইনশাআল্লাহ বিষয়টি আমরা আলোচনা করবো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে কারিগরের কাজের চিহ্ন বস্তুটিতে দেখা না যায়—যেমন বোঝা বহনকারী মজদূর কিংবা মাঝি, তার অধিকার নেই মজুরির জন্য বস্তুটিকে আটক রাখার।

কেননা কাজটাই হলো চুক্তিকৃত বিষয়। আর তা বস্তুটিতে বিদ্যমান নেই। সুতরাং (নিয়োগকারীর পক্ষ হতে) তার কাজ আটক রাখার কথা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং তার জন্য বস্তুটি আটক রাখার ক্ষমতা থাকবে না।

আর কাপড় ধোয়া বোঝা বহন করার সমতুল্য।

আর এটা পলাতক গোলামের মাসআলা থেকে ভিন্ন। কেননা ফেরত প্রদানকারীর অধিকার রয়েছে সে জন্য পারিশ্রমিক (চল্লিশ দিরহাম) উশুল করার জন্য গোলামটি আটক রাখার। অথচ গোলামের মাঝে তার কাজের কোন চিহ্ন নেই।

কেননা (মালিকের সম্পদরূপী) গোলাম নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আর পাকড়াওকারী তাকে নবজীবন দান করেছে। আর সে যেন গোলামটিকে তার কাছে বিক্রি করেছে। সুতরাং (বিক্রেতার মত) তার আটক রাখার অধিকার থাকবে।

(চুক্তিকৃত ব্যক্তি আটক রাখার) ব্যাপারে এই যা আমরা উল্লেখ করলাম, এটা আমাদের তিন ইমামের মাযহাব। আর ইমাম যোফার (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই তার আটক রাখার অধিকার থাকবে না।

কেননা নিযুক্তকারীর মালিকানার সঙ্গে চুক্তিকৃত বস্তুটি যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে (কারিগরের পক্ষ হতে) অর্পণ করা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আটক রাখার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

আমাদের দলীল এই যে, বস্তুটির সঙ্গে যুক্ততা হচ্ছে কাজ সম্পন্ন করার অনিবার্য প্রয়োজন। সুতরাং অর্পণ হিসাবে এই যুক্ততায় তার সম্পত্তি সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং আটক রাখার অধিকার রহিত হবে না। যেমন ক্রেতা যদি বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া কবজা করে নেয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নিযুক্তকারী যদি কারিগরকে নিজে কাজ করার শর্ত দেয় তাহলে অন্য কারিগর ব্যবহার করার অধিকার তার নেই।

কেননা চুক্তিকৃত বিষয়টি হলো কাজটি নির্দিষ্ট একটি পাত্রের সাথে (অর্থাৎ ঐ কারিগরের সাথে) যুক্ত হওয়া। সুতরাং স্বয়ং ঐ পাত্রের সঙ্গে যুক্ত কাজেরই সে অধিকারী হবে।

যেমন নির্দিষ্ট একটি পাত্রের সঙ্গে (অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ নির্দিষ্ট বাহন-পশুর সঙ্গে) যুক্ত (আরোহন) উপকার।

আর যদি কাজটিকে শর্তমুক্ত রাখে তাহলে তার অধিকার রয়েছে অন্য কাউকে কাজ করার জন্য মজদুর নিযুক্ত করার।

কেননা নিযুক্তকারীর প্রাপ্য হলো তার যিম্মায় অর্পিত কাজ। আর সে নিজের মাধ্যমে কিংবা অন্যের সহায়তা নেয়ার মাধ্যমে পূর্ণ করা তার পক্ষে সম্ভব। যেমন ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে।

কেউ যদি কোন লোককে ভাড়া করে যাতে সে বসরা গিয়ে তার পরিবার পরিজনকে নিয়ে আসে। আর সে বসরা গিয়ে দেখল যে, তাদের কেউ কেউ মারা গেছে, তখন সে অবশিষ্টদের নিয়ে এলো; তাহলে সে সেই হিসাবে মজুরি পাবে।

কেননা সে চুক্তিকৃত বিষয়ের আংশিক পূর্ণ করেছে; সুতরাং সেই পরিমাণ অনুযায়ী বিনিময়ের হকদার হবে।

ইমাম কুদূরীর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো যদি পরিবারের লোকসংখ্যা জানা থাকে।

আর যদি বসরায় অমুকের কাছে একটি চিঠি নিয়ে যাওয়ার এবং তার উত্তর নিয়ে আসার জন্য তাকে ভাড়া করে আর সে গিয়ে দেখলো যে, অমুক মারা গেছে; ফলে সে (ফিরে এসে) তার চিঠি তাকে ফেরত দিলো তাহলে সে মজুরি পাবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, সে যাওয়ার মজুরি পাবে। কেননা সে চুক্তিকৃত বিষয়ের আংশিক পূর্ণ করেছে। আর তা হল এ দূরত্ব অতিক্রম করা। এটা এ কারণে যে, বিনিময় দূরত্ব অতিক্রমের বিপরীতেই সাব্যস্ত। কেননা তাতে কষ্ট রয়েছে, চিঠি বহনের বিপরীতে সাব্যস্ত নয়। কেননা এর বোঝা হালকা।

শায়খায়নের মতে চুক্তিকৃত বিষয় হলো পত্র স্থানান্তর করা। কেননা সেটাই হলো উদ্দেশ্য। কিংবা উদ্দেশ্যের (তথা পত্রের বিষয়বস্তু জানবার) মাধ্যম। তবে বিধান (মজুরির অবশ্য সাব্যস্তির) পত্র স্থানান্তরের সঙ্গে যুক্ত। আর সে তা ভঙ্গ করেছে। সুতরাং মজুরি রহিত হয়ে যাবে। যেমন খাদ্য সামগ্রী বহন করে নিয়ে যাওয়ার চুক্তির ক্ষেত্রে।

এই মাসআলাটি পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

আর যদি পত্রটি সেখানে রেখে ফিরে আসে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই যাওয়ার মজুরি পাবে।

কেননা বহনের কর্মটি ভঙ্গ হয়নি।

আর যদি তাকে এজন্য ভাড়া করে যে, বসরায় অমুকের কাছে এই খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাবে, আর সে গিয়ে তাকে মৃত পেলো। ফলে (ফিরে এসে) ঐ খাদ্যদ্রব্য তাকে ফেরত দিল, তাহলে সে মজুরি পাবে না— সবার মত অনুযায়ী।

কেননা এটা হলো চুক্তিকৃত বিষয় আর তা হলো খাদ্যদ্রব্য বহন অর্পণ করা।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে চিঠির বিষয়টি ভিন্ন।

কেননা সেখানে চুক্তিকৃত বিষয় হলো দূরত্ব অতিক্রম করা— যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ কোন্ ইজারা চুক্তি বৈধ, আর কিসে চুক্তি লঙ্ঘন হবে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বসবাসের জন্য বাড়ী ও দোকান ভাড়া নেয়া জায়িয রয়েছে, যদিও তাতে কী কাজ করা হবে তা বর্ণনা না করে।

কেননা বসবাসই হলো বাড়ীর ব্যাপারে প্রচলিত ব্যবহার। সুতরাং চুক্তিটি সেদিকেই অভিমুখী হবে। আর সাধারণত: (বাসিন্দার পার্থক্যে) বসবাস পার্থক্যপূর্ণ হয় না। সুতরাং চুক্তি সিদ্ধ হবে।

আর চুক্তির নিঃশর্ততার কারণে তার যে কোন কাজ করার অধিকার রয়েছে। তবে সেখানে কর্মকার, ধোপা এবং আটা ভাঙ্গানোর কল বসাতে পারবে না।

কেননা এতে (বাড়ীর ও দোকানের) স্পষ্ট ক্ষতি রয়েছে। কারণ তা ভবনকে দুর্বল করে দেয়। সুতরাং চুক্তিটি এগুলো ছাড়া অন্যান্য-কাজের সাথে সীমিত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, চাষবাসের জন্য যমি ইজারা নেওয়া বৈধ।

কেননা এটা একটা উদ্দীষ্ট উপকার, যা যমির ক্ষেত্রে সুপ্রচলিত।

ভাড়ায় গ্রহণকারী সেচের পানি এবং-এর চলাচলের পথের অধিকারী হবে। যদিও চুক্তিতেও সে শর্ত করা না হয়।

কেননা ইজারা চুক্তি করাই হয় উপকার লাভের জন্য। আর এ দুটি ছাড়া উপকার লাভ সম্ভব নয়। সুতরাং সাধারণ চুক্তিতে এ দুটি অন্তর্ভুক্ত হবে। বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন।

কেননা বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হয় বস্তুসত্তার মালিকানা লাভ করা। বর্তমান অবস্থায় তার উপকার লাভ করা নয়। এজন্যই তো অশ্বশাবক এবং নোনা যমি বিক্রি করা জায়িয রয়েছে। অথচ ইজারা দেয়া জায়িয নেই। সুতরাং বিক্রয় চুক্তিতে 'অধিকারসমূহ' উল্লেখ করা ছাড়া এ দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে না। বিক্রয় পর্বে তা আলোচিত হয়েছে।

কী চাষ করা হবে তা উল্লেখ করা ছাড়া চুক্তি সিদ্ধ হবে না।

কেননা যমি কখনো চাষ করার জন্য আবার কখনো অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইজারা নেয়া হয়। আবার তাতে যা চাষ করা হয় তাও (প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে) পার্থক্যপূর্ণ হয়। সুতরাং নির্ধারণ করে নেয়া অপরিহার্য, যাতে বিবাদ না ঘটে।

কিংবা একথা বলতে হবে যে, তাতে যা ইচ্ছা তা চাষ করবে।

কেননা যখন ইচ্ছাধিকার তার কাছে অর্পণ করল তখন বিবাদ সৃষ্টিকারী অজ্ঞতা দূর হয়ে গেলো।

আর ভবন তৈরির জন্য বা খেজুর বৃক্ষ কিংবা অন্য কোন বৃক্ষ রোপণের জন্য খোলা স্থান ইজারা নেয়া জায়িয রয়েছে।

কেননা এটা এমন উপকার, যা যমি থেকে উদ্দেশ্য করা হয়।

অতঃপর যখন মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে ভবন বা বৃক্ষ উপড়ে ফেলা এবং যমি খালি করে অর্পণ করা তার জন্য আবশ্যক হবে।

কেননা ভবন বা বৃক্ষের স্থায়িত্বের নির্ধারিত সীমা নেই। সুতরাং তা বাকী রাখার অর্থ হবে যমির মালিকের ক্ষতি করা।

পক্ষান্তরে যদি মেয়াদ শেষ হয় আর ফসল হয় কোন সবজী, তাহলে সমপরিমাণ ভাড়ার পরিবর্তে সবজী পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ঐ যমিতে সবজী রেখে দেয়া হবে। কেননা এটার একটা পরিজ্ঞাত মেয়াদ রয়েছে। ফলে উভয় পক্ষের স্বার্থ বিবেচনা করা সম্ভব।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে যমির মালিক যদি উপড়ানো অবস্থায় ভবন ও বৃক্ষের যে মূল্য ভাড়ায় গ্রহণকারীকে ক্ষতিপূরণ রূপে দিয়ে সেটার 'মালিকানা' দখলে নিতে চায় তাহলে তার সে অধিকার রয়েছে।

আর এটা চারা ও বৃক্ষের মালিকের সম্মতিতে হতে হবে। তবে যদি তা উপভাতে গেলে যমির ক্ষতি হয় তাহলে তার অধিকার রয়েছে।

আর এটা চারা ও বৃক্ষের মালিকের সম্মতিতে হতে হবে। তবে যদি তা উপড়াতে গেলে যমির ক্ষতি হয় তাহলে ভাড়ায় গ্রহণ করার সম্মতি ছাড়াই সে তার মালিকানা গ্রহণ করতে পারবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কিংবা যদি সেটাকে নিজ অবস্থায় রেখে দিতে রাজী হয় তখন ভবন (বা গাছ) তার হবে আর যমি-এর হবে।

কেননা অধিকার হলো তার। সুতরাং সেটা উশূল না করার ক্ষমতা তার রয়েছে।

আর 'জামে ছাগীর' কিতাবে রয়েছে যে, যদি ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় আর জমিতে তরতাজা সবজী গাছ থাকে (যা বার বার ফলন দেয়, আর গাছ জমিতে থেকে যায়) **তাহলে তা উপড়ে ফেলতে হবে।**

কেননা তরতাজা সবজী গাছেরও শেষ সীমা নেই। সুতরাং তা বৃক্ষের সদৃশ হল।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আরোহণের জন্য কিংবা বোঝা বহনের জন্য পশু ভাড়া নেয়া জায়িয রয়েছে।

কেননা এটি জানা ও পরিচিত উপকার লাভ।

আর যদি আরোহণের বিষয়টিকে নিঃশর্ত রাখে তাহলে যাকে ইচ্ছা তাকেই সে আরোহণ করাতে পারবে।

এ সিদ্ধান্ত হলো নিঃশর্ততার বিষয়টি বিবেচনা করে।

তবে যদি নিজে আরোহণ করে ফেলে বা কোন একজনকে আরোহণ করায় তখন আর অন্য কাউকে আরোহণ করাতে পারবে না। কেননা সেটাই উদ্দেশ্য রূপে গোড়া থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর মানুষ আরোহণের ক্ষেত্রে পার্থক্যপূর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যেন শুরুতেই সে তার আরোহণের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছে।

তদ্রূপ যদি পরিধান করার জন্য কাপড় (বা পোশাক) ভাড়া করে আর আমাদের উল্লেখকৃত বিষয়ে নিঃশর্ততা অবলম্বন করে।

কেননা বক্তব্যটি নিঃশর্ত, আর পরিধানের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য হয়।

আর যদি বলে যে, (ভাড়া দিলাম) এই শর্তে যে, তাতে অমুক আরোহণ করবে, কিংবা পোশাক অমুক পরিধান করবে। এরপর সে অন্য কাউকে আরোহণ করাল বা পরিধান করাল, আর তাতে তা নষ্ট হয়ে গেলো, তাহলে সে যামিন হবে।

কেননা আরোহণ এবং পরিধানের ক্ষেত্রে মানুষ পার্থক্যপূর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং (মানুষ) নির্ধারণ করে দেয়া বৈধ। আর তার তা লংঘন করার অধিকার নেই।

এমনই বিধান ঐ সকল ক্ষেত্রে, যা ব্যবহারকারীর ভিন্নতায় বেশকম হয়। এর কারণ যা আমরা উল্লেখ করেছি।

পক্ষান্তরে যমি এবং ঐ সমস্ত বস্তু যা ব্যবহারকারীর পরিবর্তনে পার্থক্য হয় না। যদি তাতে কোন একজনের বসবাসের শর্ত আরোপ করে তাহলে তার অন্যকে বসবাস করানোর অধিকার রয়েছে। কেননা (ব্যবহারের ক্ষেত্রে) পার্থক্য না থাকার কারণে শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধকরণ অর্থবহ, নয় আর যে সব বিষয় ভবনের জন্য ক্ষতিকর তা এই চুক্তির বাইরে থাকবে। যেমন আমরা উল্লেখ করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি পশুর পিঠে যা বহন করবে তার নির্ধারিত পরিমাণ ও প্রকার উল্লেখ করে, যেমন বললো, পাঁচ কাফীয গম, তাহলে সে এমন জিনিসও বহন করতে পারবে, যা ক্ষতির দিক থেকে গমের মত বা তার চেয়ে কম। যেমন-যব বা তিল।

কেননা পার্থক্য না থাকার কারণে কিঙবা প্রথমটি থেকে উত্তম হওয়ার কারণে তা অনুমতির অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে গমের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর যা, তা বহন করার অধিকার তার থাকবে না। যেমন লবণ ও লোহা। কারণ তার সম্মতি নেই।

আর যদি সে তুলা বহন করার নাম বলে পশু ভাড়া করে, তাহলে সেই পরিমাণের লোহা বহন করার অধিকার তার থাকবে না।

কেননা সাধারণত: তা পশুর জন্য অধিক ক্ষতিকর হয়। কারণ লোহা পশুর পিঠের এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে। আর তুলা তার পিঠে ছড়িয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি সে তাতে আরোহণ করার জন্য ভাড়া নেয়, আর তার সাথে অন্য একজনকে সহযাত্রী রূপে আরোহণ করায়, ফলে পশুটি হালাক হয়ে যায় তাহলে সে তার অর্ধেক মূল্যের যামিন হবে। ওজন বিবেচিত হবে না।

কেননা অজ্ঞতার কারণে হালকা আরোহীও পশুকে জখম করে ফেলতে পারে, আবার আরোহণ-জ্ঞানের কারণে ভারী আরোহীও পশুর পিঠে হালকা হতে পারে।

তাছাড়া সাধারণত: মানুষ ওজনে পরিমাপিত হয় না। সুতরাং তার ওজন জানা সম্ভব হবে না। তাই আরোহীর সংখ্যা বিবেচনা করা হবে। যেমন অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর সংখ্যা বিবেচনা করা হয়।

আর যদি নির্ধারিত পরিমাণ গমন বহন করার জন্য পশু ভাড়া নেয়, কিন্তু তাতে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ বহন করে, ফলে তা হালাক হয়ে যায় তাহলে যে পরিমাণ ভার বৃদ্ধি করেছে তার যামিন হবে।

কেননা পশুটি অনুমোদিত এবং অনুমোদিত পরিমাণ দ্বারা হালাক হয়েছে। আর হালাক হওয়ার কারণ হলো ভার। সুতরাং ভারটি উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে।

তবে যদি এমন পরিমাণ বোঝা হয়, যা এ ধরনের পশু বহন করা সামর্থ্য রাখেনা তাহলে তখন পশুর সম্পূর্ণ মূল্যের যামিন হবে।

কেননা সাধারণ রীতি লংঘন করার কারণে এ বিষয়ে মোটেই অনুমতি নেই।

আর যদি পশুকে লাগাম ধরে টান দেয় কিংবা তাকে প্রহার করে আর এতে সে হালাক হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সে তার যামিন হবে। আর সাহেবায়ন বলেন, যদি প্রচলিত আচরণ করে থাকে তাহলে যামিন হবে না।

কেননা প্রচলিত আচরণ নিঃশর্ত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং এ আচরণ মালিকের অনুমতিক্রমেই হয়েছে। তাই সে তার যামিন হবে না।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, অনুমতি নিরাপদ হওয়ার শর্তে আবদ্ধ হবে। কেননা এ দু'টি পদক্ষেপ ছাড়াও পশুকে চালনা করা সম্ভব। ঐ দুটি পদক্ষেপ নেয়া হয় অতিরিক্ত গতি সৃষ্টির জন্য। সুতরাং নিরাপত্তার গুণ দ্বারা তা আবদ্ধ হবে। যেমন সাধারণের পথে চলাচলের ক্ষেত্রে।

আর যদি হীরা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য তা ভাড়া করে; কিন্তু হীরা অতিক্রম করে কাদেসিয়া পর্যন্ত গমন করে এরপর সেটাকে হীরায় ফিরিয়ে আনে, অতঃপর তা হালাক হয়ে যায় তাহলে সে যামিন হবে। পশুটিকে আরিয়াত নেয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা।

কেউ কেউ বলেছেন, মাসআলাটির ব্যাখ্যা এই যে, পশুটিকে শুধু যাওয়ার জন্য ভাড়া করেছিল, ফিরে আসবার জন্য নয়। যাতে হীরায় পৌছার সাথে সাথে ইজারা চুক্তি শেষ হয়ে যায়। সুতরাং ফিরে আসবার কারণে তা গুণগতভাবে মালিকের হাতে ফেরত বলে গণ্য হবে না।

পক্ষান্তরে যদি যাওয়া ও আসবার জন্য ভাড়া করে তাহলে ঐ আমানত গ্রহণকারীর মত হবে, যে বিধি লংঘন করেছে; অতঃপর পুনঃ বিধি পালন শুরু করেছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, বিধান নিঃশর্ত তার উপরই প্রযুক্ত হবে।

ভাড়ায় গ্রহণকারী এবং আমানত গ্রহণকারীর মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, আমানত গ্রহণকারী উদ্দেশ্যরূপেই হেফাযত করার জন্য আদিষ্ট। সম্মত অবস্থায় ফিরে আসার পর হেফাযত করার প্রদত্ত আদেশ বহাল থাকবে। সুতরাং মালিকের স্থলবর্তীর হাতে ফেরত দেয়া সাব্যস্ত হল।

আর ইজারা ও আরিয়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুবর্তী রূপে সংরক্ষণের নির্দেশ রয়েছে। মূল উদ্দেশ্য রূপে নয়। সুতরাং নির্ধারিত স্থান অতিক্রম করার কারণে যখন ব্যবহারের অধিকার শেষ হয়ে গেলো, তখন সে আর মালিকের স্থলবর্তী থাকলো না। সুতরাং ফিরে আসার মাধ্যমে সে ক্ষতিপূরণ থেকে দায়মুক্ত হবে না। এই মতামতই অধিকতর বিশুদ্ধ।

আর কেউ যদি পিঠের গদীসহ গাধা ভাড়া নেয়, এরপর ঐ গদী সরিয়ে এমন গদী বসায় যার অনুরূপ গাধার পিঠে বসানো হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর দায় আসবে না।

কেননা দ্বিতীয় গদীটি যদি প্রথমটির সদৃশ হয় তাহলে মালিকের অনুমতি সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কারণ এই দ্বিতীয় গদীটির সাথে ব্যবহার না করতে পারার চুক্তিকে সীমাবদ্ধ করায় কোন অর্থবহতা নেই। তবে দ্বিতীয়টি যদি প্রথমটির চেয়ে বেশী ওযনের হয়। তখন সে অতিরিক্ত ওযনের যামিন হবে।

আর যদি এ ধরনের গদী গাধার পিঠে বসানোর প্রচলন না থাকে তাহলে পুরো মূল্যের যামিন হবে।

কেননা মালিকের পক্ষ হতে প্রদত্ত অনুমতি এটাকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। সুতরাং সে অনুমতি লঙ্ঘনকারী হল।

আর যদি সে গাধার উপর এমন পালনা বসায় যার অনুরূপ পালান সাধারণত: গাধার পিঠে বসান হয় না, তাহলে সে যামিন হবে।

কারণ সেটাই, যা আমরা গাধার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি। আর এ ক্ষেত্রে যামিন হওয়া অধিকতর সংগত।

আর যদি এমন ধরনের পালান বসায় যার অনুরূপ গাধার পিঠে বসানো হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে পূর্ণ মূল্যের যামিন হবে। আর সাহেবায়ন বলেন, উভয়ের (ভারগত বা আয়তনগত) পার্থক্য হিসাবে যামিন হবে।

কেননা যদি এ ধরনের পালানে গাধার পিঠে বসানোর প্রচলন থাকে তাহলে তা এবং গদী এক সমান হবে। সুতরাং মালিক সে বিষয়ে সম্মত থাকবে। তবে যদি ওযনে গদীর চেয়ে ভারী হয়, তাহলে অতিরিক্ত ওযন পরিমাণে যামিন হবে। কেননা সে অতিরিক্ত ভার চাপানোর ব্যাপারে সম্মত ছিল না। সুতরাং বিষয়টি নির্ধারিত বোঝার ক্ষেত্রে একই শ্রেণীর অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর মত হল।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, পালান গদীর শ্রেণীভুক্ত নয়। কেননা পালান হলো বোঝা বহনের জন্য আর গদী (বা জিন) হল আরোহণের জন্য। তদ্রূপ এর মধ্যে একটি (পালান) গাধার পাঠে যতখানি ছড়িয়ে বসে অন্যটি ততখানি ছড়িয়ে বসেনা। সুতরাং সে চুক্তির বিপরীত আচরণকারী হল। যেমন গম বহনের শর্ত থাকা অবস্থায় লোহা বহন করল।

আর যদি অমুক পথ দিয়ে গম (বা অন্য কোন বোঝা) বহন করার জন্য একজন কুলীকে ভাড়া করে পরে সে অন্য পথে যায় যে পথে মানুষ চলাচল করে. আর সামান নষ্ট হল, তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণের দায় আসবে না। আর যদি (নির্দিষ্ট স্থানে) পৌছে যায় তাহলে সে মজুরি পাবে।

এটা হলো তখন যখন দু'পথের মাঝে কোন পার্থক্য না থাকে। কেননা পার্থক্যহীন অবস্থায় শর্তদ্বারা আবদ্ধ করা অর্থবহ নয়।

আর যদি পার্থক্য থাকে তাহলে সে যামিন হবে। কেননা শর্তারোপ অর্থবহ হওয়ার কারণে তা সিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ছিল। তবে মানুষের চলাচলপূর্ণ হওয়ার অবস্থায় যেহেতু পার্থক্য না থাকাটাই স্বাভাবিক; সেহেতু ইমাম মুহম্মদ (র) বিশদ বিশ্লেষণ করেনি।

আর যদি এমন পথ হয় যাতে তেমন লোক চলাচল নেই, আর সামান নষ্ট হয়, তাহলে সে যামিন হবে।

কেননা শর্ত দ্বারা আবদ্ধ করা সিদ্ধ ছিল। সুতরাং সে চুক্তির বিপরীত আচরণকারী হল।

আর যদি সে (সামান নির্ধারিত স্থানে) পৌছে দেয় তাহলে মজুরি পাবে।

কেননা গুণগতভাবে বিরুদ্ধাচরণ বিদূরিত হয়েছে; যদিও দৃশ্যত: তা বিদ্যমান রয়েছে।

আর যদি সে সমুদ্র পথে ঐ দ্রব্য বহন করে যা মানুষ স্থল পথে বহন করে তাহলে (হালাক হওয়ার অবস্থায়) সে যামিন হবে।

কেননা স্থলপথ ও জলপথে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

আর যদি সে (সামান) পৌছে দেয় তাহলে মজুরি পাবে।

কেননা উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে এবং (দৃশ্যত: না হলেও) গুণগতভাবে বিরুদ্ধাচরণ দূরীভূত হয়েছে।

আর কেউ যদি গম চাষ করার জন্য জমি ভাড়া নেয় আর তাতে সবজী চাষ করে, তাহলে জমির যা ক্ষতি হবে সে তার ক্ষতিপূরণের যামিন হবে।

কেননা সবজী জগত যমির জন্য গমের চেয়ে ক্ষতিকর। কারণ এর শিকড় বেশ ছড়ায় এবং বেশী সেচের প্রয়োজন হয়। সুতরাং নিকৃষ্টতম কর্ম দ্বারা চুক্তির বিরুদ্ধতা হল। তাই যমির যা ক্ষতি হলো তার যামিন সে হবে। আর মালিক কোন ভাড়া পাবে না। কেননা আগে আমরা সাব্যস্ত করে এসেছি যে, ইজারাদার যমি গসবকারী হয়ে গেছে।

কেউ যদি কোন দর্জীকে এক দিরহামের বিনিময়ে জামা সেলাই করার জন্য কাপড় দেয় আর সে তা দ্বারা কাবা সেলাই করে তাহলে কাপড়ের মালিক ইচ্ছা করলে কাপড়ের মূল্যের দায় তার উপর আরোপ করতে পারে। আর যদি ইচ্ছা করে তাহলে কাবা গ্রহণ করে তাকে তার কাজে সমপরিমাণ মজুরি প্রদান করতে পারে। তবে ঐ মজুরি এক দিরহাম অতিক্রম করবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, কাবা অর্থ এক পালা কোর্তা। কেননা এটাকে কাবার মত ব্যবহার করা হয়। আর কারো কারো মতে কাবা সাধারণ অর্থেই প্রযুক্ত হবে। কেননা উপকার লাভের ক্ষেত্রে কাবা ও জামা কাছাকাছি।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কাপড়ের মালিক দর্জীর উপর দায় আরোপ করবে। তার জন্য ইচ্ছাধিকার থাকবেনা। কেননা কাবা হলো জামার শ্রেণী থেকে ভিন্ন।

যাহিরে রেওয়ায়াতে বর্ণনার কারণ এই যে, এক দিক থেকে এটা জামা, কেননা তার মধ্যখানে বাঁধন আঁটা এবং জামার মত ব্যবহার করা সম্ভব। সুতরাং চুক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় দিকই রয়েছে। তাই কাপড় ওয়ালা দুদিকের যে দিকে ইচ্ছা ঝুঁকতে পারে। তবে অনুকূলতার দিকে দুর্বল হওয়ার কারণে সমপরিমাণ মজুরি ওয়াজিব হবে। আবার সেটা নির্ধারিত দিরহামকে অতিক্রম করতে পারবে না। সকল ফাসিদ ইজারার ক্ষেত্রে যেমন বিধান। ইনশাআল্লাহ্ ফাসিদ ইজারা অধ্যায়ে তা আমরা আলোচনা করবো।

আর যদি কাবা সেলাই করার আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে পায়জামা সেলাই করে তাহলে কোন কোন মতে ইচ্ছাধিকার ছাড়া শুধু যামিন বানাবে।

কেননা উপকার লাভের ক্ষেত্রে দুইয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, মূল উপকার লাভের ক্ষেত্রে অভিন্নতার কারণে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। আর বিষয়টি এমন হলো যে, তামার তশতরি তৈরি করার আদেশ দিল আর সে এর দ্বারা কবযা তেরি করল। সে ক্ষেত্রে আদেশদাতা ইচ্ছাধিকার লাভ করে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তাই হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ ফাসিদ ইজারা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (চুক্তির চাহিদা পরিপন্থী) শর্তসমূহ ইজারাকে ফাসিদ করে দেয়, যেমন বিক্রয় চুক্তিকে ফাসিদ করে।

কেননা এটা বিক্রয় চুক্তির পর্যায়ভুক্ত। দেখুন না (বিক্রয় চুক্তি মত) এটা এমন চুক্তি থাকে প্রত্যাহার করা যায় এবং রহিত করা যায়।

আর ফাসিদ ইজারার ক্ষেত্রে সমান মজুরি ওয়াজিব হয়, যা নির্ধারিত মজুরি অতিক্রম করবে না।

আর ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বস্তু বিক্রয়ের উপর কিয়াস করে বলেন, যে মাত্রারই যৌতুক সমপরিমাণ মূল্য ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল এই যে, বস্তুর উপকার গুণ স্বকীয়ভাবে মূল্যসম্পন্ন হয় না, বরং চুক্তি দ্বারা। কেননা মানুষের তার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং বিশুদ্ধ ইজারা চুক্তির মধ্যেই প্রয়োজন যথেষ্ট হবে। তবে ফাসিদ ইজারা বিশুদ্ধ ইজারার অনুবর্তী। সুতরাং বিশুদ্ধ ইজারা চুক্তিতে সাধারণত: যেটা বিনিময় রূপে সাব্যস্ত করা হয়, ফাসিদ ইজারাতেও সেটাকেই বিবেচনা করা হবে। কিন্তু তারা যখন ফাসিদ ইজারার ক্ষেত্রে একটি পরিমাণের উপর একমত হয়েছে তখন সাব্যস্ত হল যে, তার অতিরিক্ত পরিমাণের হক তারা রহিত করে দিয়েছে।

আর যদি সমমানের মজুরি (নির্ধারিত মজুরি থেকে) কম হয়, তাহলে নির্ধারণ ফাসিদ হওয়ার কারণে নির্ধারিত বাড়তি পরিমাণ ওয়াজিব হবে না। বিক্রয় চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বস্তু স্বকীয়ভাবেই মূল্যসম্পন্ন। আর সেই মূল্যই হলো চুক্তির মূল

ওয়াজিব বিধান। সুতরাং যদি নির্ধারণ সিদ্ধ হয় তাহলে অবশ্য সাব্যস্ত বিধান মূল বিধান থেকে নির্ধারিত পরিমাণের দিকে সরে যাবে। আর যদি নির্ধারণ সিদ্ধ না হয় তাহলে ওয়াজিব বিধান মূল বিধান থেকে সরবে না।

কেউ যদি প্রতিমাসে এক দিরহামের বিনিময়ে একটি ঘর ভাড়া করে তাহলে এক মাসের ব্যাপারে চুক্তি সিদ্ধ হবে। কিন্তু অন্যান্য মাসের ব্যাপারে চুক্তি ফাসিদ হবে। তবে যদি সমগ্র মাসগুলো পরিজ্ঞাত রূপে উল্লেখ করে তাহলে, ফাসিদ হবে না।

কেননা মুলনীতি এই যে, كل (সকল) শব্দটি যদি অনির্ধারিত পরিমাণের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে তা একটির দিকে অভিমুখী হয়। কেননা ব্যাপকতাকে আমলে আনা সম্ভব নয়। আর একটি মাস তো পরিজ্ঞাত। সুতরাং তার ব্যাপারে চুক্তি সিদ্ধ হবে।

যখন মাস শেষ হয়ে যাবে তখন বিশুদ্ধ চুক্তি শেষ হওয়ার কারণে উভয়ের প্রত্যেকের অধিকার থাকবে ইজারা চুক্তি ভঙ্গ করে দেয়ার।

আর যদি সমগ্র মাসগুলো পরিজ্ঞাত রূপে উল্লেখ করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা মেয়াদ জানা হয়ে গেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি দ্বিতীয় মাসের কিছু সময়ও বাস করে তাহলে ঐ মাসটিতে চুক্তি সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর ইজারাদাতার অধিকার থাকবে না দ্বিতীয় মাস শেষ হওয়ার আগে তাকে বের করে দেয়ার। পরবর্তী প্রতিটি মাসের শুরুতে (কিছু সময়) বাস করার পর একই বিধান হবে।

কেননা দ্বিতীয় মাসে বাস করার পর উভয়ের সম্মতিক্রমে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। তবে কুদূরী (র) কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন, সেটাই হলো কিয়াসের দাবী। কোন কোন মাশায়েখ সে দিকে ঝুঁকেছেন।

আর যাহিরে রিওয়ায়েতের বর্ণনা এই যে, দ্বিতীয় মাসের প্রথম রাতে এবং প্রথম দিনে উভয়ের প্রত্যেকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। কেননা শাব্দিক অর্থে প্রথম মুহূর্তের কথা বিবেচনা করা কিছুটা অসুবিধাজনক।

কেউ যদি একটি বাড়ী এক বছরের জন্য দশ দিরহামের বিনিময়ে ভাড়া নেয় তাহলে তা জায়িয হবে। যদিও প্রত্যেক মাসের মজুরির পরিমাণ বর্ণনা না করে।

কেননা মজুরি বন্টন ছাড়াই মেয়াদ নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং এক মাস ভাড়া নেয়ার মত হল, যা প্রতিদিনের ভাড়ার হিস্সা উল্লেখ না করলেও বৈধ হয়।

অতঃপর বছর মেয়াদের শুরু ধরা হবে ঐ সময় থেকে, যা উল্লেখ করবে। আর যদি কোন সময় উল্লেখ না করে তাহলে ইজারা চুক্তি সম্পন্ন করার সময় থেকে শুরু ধরা হবে।

কেননা ইজারার বিষয়ে সমস্ত সময় সমান। সুতরাং এটা কসম করা সদৃশ হলো। রোযার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা রাত্র রোযার সময় নয়।

অতঃপর চুক্তি যদি চাঁদ ওঠার সময় সম্পন্ন হয় তাহলে বছরের সমস্ত মাস চাঁদ দ্বারা গণনা করা হবে।

কেননা সেটাই হল (আরবী মাসের) মূল অবস্থা।

আর যদি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে হয় তাহলে প্রতি মাস দিন দ্বারা গণনা করা হবে।

এটা হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) -এর মতেও অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এবং এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর আর এক বর্ণনায় প্রথম মাসটি দিন দ্বারা গণনা করা হবে। আর অবশিষ্ট মাসগুলো চাঁদ দ্বারা গণনা করা হবে।

কেননা দিন গণনার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় প্রয়োজনে। আর সে প্রয়োজন রয়েছে প্রথম মাসটিতে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, প্রথম মাসটি যখন দিন দ্বারা সম্পন্ন হলো তখন অনিবার্যভাবেই দ্বিতীয় মাসটি দিন দ্বারা শুরু হবে। এভাবে বছরের শেষ পর্যন্ত চলবে। এর সমতুল্য মাসআলা হলো ইদ্দত; আর সে আলোচনা তালাক পর্বে বিগত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, হাম্মামের ভাড়া এবং হাজ্জাম (মোক্ষণকারী)-এর মজুরি গ্রহণ করা বৈধ হবে।

হাম্মামের ভাড়ার বৈধতার কারণ হল লোক প্রচলন। আর মুসলমানদের ইজমা হওয়ার কারণে অজ্ঞতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। নবী (স) বলেছেন, মুসলমানগণ যা উত্তম মনে করবেন আল্লাহ্‌র নিকটও তা উত্তম।

আর হাজ্জামের মজুরির বৈধতার দলীল এই যে, নবী (স) শিংগা লাগিয়েছেন এবং হাজ্জামকে মজুরি প্রদান করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, এটা হলো নির্ধারিত মজুরির বিনিময়ে নির্ধারিত কাজের উপর নিযুক্তকরণ। সুতরাং তা বৈধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পাঁঠা বা ষাড়ের পাল দেওয়ার মজুরি গ্রহণ করা বৈধ নয়।

অর্থাৎ স্ত্রী পশুকে সঙ্গম করানোর জন্য পুরুষ পশুকে ভাড়ায় দেয়া। এর দলীল হল নবী (স)-এর বাণী ঃ إن من السحت عسب التيس নর-পশুর পাল দেওয়া হারাম।

আর (হাদীসটির) উদ্দেশ্য হলো ঐ কাজের মজুরী গ্রহণ করা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আযান ও হজ্জের আর তেমনি ইমামত, কোরআন ও ফিকাহ্ শিক্ষা দানের উপর মজুরি গ্রহণ করা জায়িয নয়।

এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, যে কোন ইবাদতের কাজ মুসলমানের সাথে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের সাথে) বিশিষ্ট, আমাদের মতে তা আঞ্জাম দেয়ার উপর মজুরি গ্রহণ বা প্রদান জায়িয নয়।

আর শাফেয়ী (র)-এর মতে যে কোন আমল সম্পন্ন করা মজদূরের উপর শরীয়তের পক্ষ থেকে একান্ত ওয়াজিব রূপে নির্ধারিত নয় সেটার জন্য-মজুরি গ্রহণ ও প্রদান বৈধ হবে।

কেননা এটা হলো একটি পরিজ্ঞাত কাজের জন্য মজুরির বিনিময়ে নিযুক্তকরণ, যা সম্পন্ন করা তার উপর নির্ধারিত নয়। সুতরাং তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয হবে।

আমাদের দলীল হল নবী (স)-এর বাণী—

اقرؤوا القران ولا تاكلوا به ·

তোমরা কোরআন শিক্ষা দাও আর তার বিনিময়ে ভক্ষণ করনা। রাসূলুল্লাহ্ (স) ওছমান বিন আবুল আছ (রা)-কে বিশেষ যে অছিয়ত করেছিলেন তা এই ঃ

وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذن على الاذان أجراً ·

যদি তোমাকে মুআয্যিন রূপে নিযুক্ত করা হয় তাহলে আযানের মজুরি গ্রহণ কর না।

তাছাড়া কোন ইবাদত যখন সম্পন্ন হয় তখন আমলকারীর পক্ষেই তা গৃহীত হয়। এ কারণেই তার ইবাদত করার যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচ্য হয়। তাই অন্য কারো কাছ থেকে মজুরি গ্রহণ করা তার জন্য জায়িয হবে না। সালাত ও সিয়ামের ক্ষেত্রে যেমন।

তা ছাড়া শিক্ষাদান এমন একটি কর্ম, যা শিক্ষার্থীর মাঝে বিদ্যমান কিছু গুণ ছাড়া সম্পন্ন করতে শিক্ষাদানকারী সক্ষম নয়। সুতরাং সে এমন জিনিসের দায় গ্রহণ করেছে যা অর্পণ করতে সে সক্ষম নয়। সুতরাং তা সিদ্ধ হবে না।

তবে আমাদের কোন কোন মাশায়েখ বর্তমান যুগে কোরআন শিক্ষা দানের মজুরি গ্রহণ করা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কেননা দীনী বিষয়ে অলসতা প্রকট হয়ে গেছে। সুতরাং মজুরি গ্রহণে বিরত থাকায় কোরআনের হেফাজত কর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। আর এর উপরই ফতোয়া রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গান গাওয়া ও বিলাপ করার জন্য মজুরি গ্রহণ ও প্রদান বৈধ নয়। আর তেমনি হুকুম যাবতীয় 'খেলাধূলার' ব্যাপারে।

কেননা এটা হলো গোনাহের কাজে মজুরির বিনিময়ে নিযুক্তকরণ, আর চুক্তির মাধ্যমে গোনাহ্‌র কাজের প্রাপ্যতা সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে 'ব্যাপ্ত' বস্তুর ইজারা প্রদান করা বৈধ নয়। তবে অপর শরীকদারের কাছে দেওয়া জায়িয আছে।

আর সাহেবায়ন বলেন, ব্যাপ্ত বস্তু ইজারা প্রদান করা জায়িয।

ছূরত এই যে, তার বাড়ীর একটি (অনির্ধারিত) হিস্‌সা ভাড়া দিল, কিংবা এজমালী বাড়ীর নিজপ্রাপ্য হিস্‌সা শরীকদার ছাড়া অন্য কারো কাছে ভাড়া দিল।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, ব্যাপ্ত বস্তুর উপকার লাভের দিক রয়েছে; এ কারণেই ভাড়ায় গ্রহণকারী যদি বাস করে ফেলে তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে তাতে সমপরিমাণ ভাড়া অবশ্য সাব্যস্ত হয়।

আর সেটা অর্পণ করাও সম্ভব, মালিকের সামানপত্র সরিয়ে ফেলার মাধ্যমে কিংবা পালাক্রমে ব্যবহারের মাধ্যমে।

সুতরাং এটা অপর শরীকদারকে ভাড়ায় প্রদানের মত এবং দুই ব্যক্তিকে যুগপৎ ভাড়ায় প্রদানের মত হলো। আর বিক্রয়ের মতও হল।

আর আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে. সে এমন বস্তু ভাড়ায় প্রদান করেছে যা সে অর্পণ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তা জায়েয হবে না।

আর তা এই জন্য যে, ব্যাপ্ত বস্তু আলাদাভাবে অর্পণ করা কল্পনা করা যায় না। আর খালি করে দেয়াকে অর্পণ বিবেচনা করা হয়, সেটা (সুবিধা ভোগের জন্য) দখল গ্রহণের ক্ষমতা সাব্যস্তকারী হওয়ার কারণে। আর দখল গ্রহণের সক্ষমতা দানই হল সেই 'কর্ম' যার দ্বারা (সুবিধা ভোগের) দখল গ্রহণের সক্ষমতা অর্জিত হয়। অথচ ব্যাপ্ত বস্তুতে দখল গ্রহণের সক্ষমতা নেই।

বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে (মালিকানার জন্য) দখল গ্রহণের সক্ষমতা অর্জিত হয়।

আর পালাক্রমে ভোগের ব্যবস্থা নির্ধারণ (বা تهايؤ) এর বিষয়টি চুক্তির বিধানরূপে সাব্যস্ত হয় মালিকানার মাধ্যমে। আর চুক্তির বিধান চুক্তির পরেই সাব্যস্ত হয়। অথচ অর্পণের সক্ষমতা চুক্তির বৈধতার শর্ত। আর বিষয়ের শর্ত তার অগ্রবর্তী হয়। আর চুক্তির পরবর্তী বিষয়কে চুক্তির অগ্রবর্তী বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে যদি অপর শরীকদারের কাছে ইজারা প্রদান করে তাহলে সমগ্র উপকার লাভ তার মালিকানায় সম্পন্ন হবে। সুতরাং ব্যাপ্ততা থাকবে না। আর সম্পর্কের দিক ভিন্নতা উপকার লাভে ক্ষতি সাধন করে না।

তাছাড়া ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে হাসন বিন যিয়াদের বর্ণনা মতে তা জায়িয নয়।

পরবর্তীতে উদ্ভূত ব্যাপ্ততার বিষয়টি ভিন্ন। ইজারার অব্যাহত থাকার জন্য অর্পণের সক্ষমতা শর্ত নয়।

অদ্রূপ দু'জন লোককে যুগপৎ ইজারা প্রদানের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা অর্পণ এক সঙ্গে সম্পন্ন হবে। অতঃপর উভয়ের মাঝে মালিকানা বিভক্ত হওয়ার কারণে ব্যাপ্ততা উদ্ভূত হচ্ছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'স্তন্যদাত্রী'কে নির্ধারিত মুজুরির বিনিময়ে নিযুক্ত করা জায়িয রয়েছে।

কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, . فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

যদি তারা তোমাদের পক্ষ হতে স্তন্য দান করে তাহলে তাদের তাদের মজুরি দান কর।

তাছাড়া এই কারণে যে. এর উপর লোক প্রচলন নবী (স) -এর যামানায় এবং তার পূর্বে জারী ছিল এবং নবী (স) তাদেরকে এর উপর বহাল রেখেছেন।

অতঃপর কেউ কেউ বলেছেন যে, শিশুর সেবা ও লালন পালনের উপকারের উপর চুক্তিটি সম্পন্ন হবে। আর 'দুধ' এর প্রাপ্যতা সাব্যস্ত হবে অনুবর্তী রূপে। যেমন বস্ত্র রঞ্জণের ক্ষেত্রে বিষয়টি।

আর কারো কারো মতে, চুক্তি সম্পন্ন হবে দুধের উপর আর সেবা (ও লালন পালন) হবে অনুবর্তী।

এ কারণেই যদি সে শিশুকে বকরীর দুধ পান করায় তাহলে মজুরির হকদার হবে না। তবে প্রথমটি শরীয়তের সূক্ষ্মজ্ঞানের অধিকতর নিকটবর্তী।

কেননা ইজারা চুক্তি উদ্দেশ্যগতভাবে বস্তু সত্তা ক্ষয় করার উপর সম্পন্ন হতে পারে না। যেমন দুধ পান করার জন্য গাভী ইজারা নেয়া হলো।

বকরীর দুধ পান করানো বিষয়ে কৈফিয়ত আমরা পরে বর্ণনা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

আমাদের উল্লেখিত (স্তন্যদানের ইজারার বৈধতার) বিষয়টি যখন সাব্যস্ত হল তখন মজুরির বিনিময়ে খিদমতের জন্য নিযুক্ত করার উপর কিয়াস করে এ ক্ষেত্রেও মজুরির পরিমাণ পরিজ্ঞাত অবস্থায় ইজারা চুক্তি বৈধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী স্ত্রী লোকটির খাওয়া-পরার বিনিময়ে ইজারা বৈধ হবে। আর সাহেবায়ন বলেন, জায়িয হবে না।

কেননা মজুরির পরিমাণ অজ্ঞাত। সুতরাং বিষয়টি রুটি তৈরী করা এবং রান্নার জন্য স্ত্রী লোকটিকে মজুরির বিনিময়ে নিযুক্ত করার মত হল।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, এই অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় না। কেননা শিশুদের প্রতি স্নেহবশত: স্তন্যদাত্রীদের খরচের ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন লোকরীতিতে রয়েছে। সুতরাং গমের স্তূপ থেকে এক কাফীয গম বিক্রি করার মত হলো।

রুটি বানান ও রান্নার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ বিষয়ে অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়।

আর জামে ছাগীরের মতে, খাবারের বিষয়টি যদি দিরহামের হিসাবে উল্লেখ করে এবং পোশাকের ক্ষেত্রে পোশাকের প্রকার, মেয়াদ, গজ-পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা জায়িয হবে।

খাবারের বিষয়টি দিরহামের হিসাবে উল্লেখ করার অর্থ হলো মজুরি হিসাবে নির্ধারিত পরিমাণ দিরহাম উল্লেখ করল অতঃপর তার স্থলে খাবার দিল। এতে অজ্ঞতা থাকে না।

আর যদি (মজুরি হিসাবে) খাবারের কথা বলে তার পরিমাণও উল্লেখ করে দেয় তাহলেও জায়িয হবে। এর কারণ আমরা আগে বলেছি।

তবে খাবারের মেয়াদ উল্লেখ করার শর্ত নেই।

কেননা (মজুরি রূপ এই) খাবার এর গুণ মূল্য হিসেবে গণ্য।

আর মজুরি পরিশোধের স্থান উল্লেখ করা শর্ত হবে, (যদি বহন খরচ আবশ্যক হয়)।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। সাহেবায়ন ভিন্নমত পোষণ করেন। আর বিক্রয় পর্বে (বায় সালাম অধ্যায়ে) আমরা তা উল্লেখ করেছি।

আর পোশাকের ক্ষেত্রে পরিমাণ, শ্রেণী উল্লেখ করার পাশাপাশি মেয়াদ উল্লেখ করাও শর্ত হবে।

কেননা বস্ত্রের অবশ্য সাব্যস্তি যিম্মায় অনির্ধারিত ঋণরূপে স্থির হবে যদি তা বিক্রয় দ্রব্য আর তা মেয়াদ উল্লেখের ক্ষেত্রেই বিক্রয় দ্রব্য রূপে গণ্য হয়। যেমন 'বায়সালাম'-এর ক্ষেত্রে।

আর ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মজুরীতে নিয়োগকারীর অধিকার নেই স্তন্যদাত্রীর স্বামীকে তার সঙ্গে সহবাসে বাধা দেওয়ার।

কেননা সহবাস হলো স্বামীর অধিকার। সুতরাং নিয়োগকর্তা তার হক বাতিল করতে পারবেনা। দেখুন না ইজারা চুক্তির বিষয়টি স্বামীর অগোচরে হলে নিজের হক রক্ষা করার জন্য ইজারা চুক্তি রহিত করার অধিকার তার রয়েছে।

তবে মজুরীতে নিয়োগদাতা তার বাড়ীতে এসে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে বাধা দিতে পারবে। কেননা বাড়ী হলো নিয়োগদাতার হক।

আর যদি সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, আর তারা তার দুধের দ্বারা শিশুর ক্ষতি হওয়ার আশংকা করে তাহলে তাদের ইজারা রহিত করার অধিকার থাকবে।

কেননা গর্ভবতীর দুধ শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট করে। এ কারণেই স্তন্যদাত্রী অসুস্থ হলেও তাদের ইজারা চুক্তি রহিত করার অধিকার রয়েছে।

শিশুর খাবার প্রস্তুত করা স্তন্যদাত্রীর কর্তব্য।

কেননা শিশুর কল্যাণ সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম তার উপর অর্পিত।

মোট কথা এ ক্ষেত্রে যে বিষয়ে 'নাছ' নেই সে বিষয়ে প্রচলিত রীতি বিবেচ্য হবে। সুতরাং শিশুর কাপড় চোপড় ধোয়া, খাবার প্রস্তুত করা ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে প্রচলিত রয়েছে সেগুলো স্তন্যদাত্রীর দায়িত্বে থাকবে। তবে খাবার সংগ্রহ করার দায়িত্ব শিশুর পিতার।

ইমাম মুহম্মদ (র) যে উল্লেখ করেছেন যে, তেল ও সুগন্ধি স্তন্যদাত্রীর যিম্মায়, সেটা হল কুফাবাসীদের প্রচলিত রীতি।

আর যদি সে মেয়াদের মধ্যে বকরীর দুধ পান করায় তাহলে কোন মজুরি পাবে না।

কেননা সে ঐ কাজ সম্পন্ন করেনি, যা তার উপর প্রাপ্য ছিল। অর্থাৎ নিজ দুধ পান করানো। কেননা সে যা করেছে, তা হলো মুখে তরল পদার্থ (দুধ) ঢালা, স্তন্যদান নয়। সুতরাং চুক্তিতে নির্ধারিত কর্ম (স্তন্যদান) থেকে ভিন্ন কর্ম হওয়ার কারণে মজুরি ওয়াজিব হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি তাঁতীর কাছে সুতা দেয় যেন সে বোনা কাপড়ের অর্ধেকের বিনিময়ে বস্ত্র বয়ন করে তাহলে সে সমপরিমাণ মজুরি পাবে।

তদ্রূপ যদি সে গম বহন করার জন্য একটি গাধা ভাড়া নেয় এই শর্তে যে, ঐ গম থেকে এক কাফীয মজুরি রূপে পাবে, তাহলে ইজারা ফাসিদ হবে।

কেননা সে ঐ জিনিসের অংশ বিশেষকে মজুরি নির্ধারণ করেছে যা মজদূরের কর্ম দ্বারা বের হয়ে আসবে। সুতরাং গম পেষণকারীকে এক কাফীয আটা দেয়ার সমতুল্য হল। অথচ নবী (স) তা নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ গম পেষার জন্য একটি ষাঁড় ভাড়া নেয়া হলো এই শর্তে যে, ঐ গমের আটা থেকে এক কাফীয আটা মজুরি রূপে প্রদান করা হবে। এটা বিরাট এক মূলনীতি যা দ্বারা বহু ইজারা চুক্তির ফাসাদ জানা যায়। বিশেষতঃ আমাদের অঞ্চলে।

এটা জায়িয না হওয়ার ফিকহী কারণ এই যে, ইজারা গ্রহণকী ব্যক্তি নির্ধারিত মজুরি তথা বয়নকৃত কাপড়ের কিংবা বহনকৃত গমের অংশবিশেষ অর্পণ করতে সক্ষম নয়। কেননা এটার বিদ্যমানতা মজদূরের কর্ম দ্বারা সম্পন্ন হবে। সুতরাং অপরের সক্ষমতা দ্বারা তাকে সক্ষম গণ্য করা যায় না।

পক্ষান্তরে যদি এই গমের অর্ধেক অপর অর্ধেকের বিনিময়ে বহন করে তাহলে কোন মজুরি ওয়াজিব হবে না।

কেননা ইজারা গ্রহণকারী মজুরিকে এগিয়ে এনে বর্তমানেই মজুরির মালিক বানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং গমের বোঝা উভয়ের মাঝে সম্মলিত মালিকানা ভুক্ত হয়ে গেলো।

আর কেউ যদি একজন লোককে ভাড়ায় নিযুক্ত করে ঐ গমের বোঝা বহনের জন্য যা উভয়ের মাঝে শরীকানায় মালিকানাভুক্ত, তাহলে মজুরির ওয়াজিব হবে না।

কেননা বহনকৃত প্রতিটি অংশের ক্ষেত্রেই সে নিজের জন্য শ্রমদানকারী হবে, সুতরাং চুক্তিকৃত বিষয়ে অর্পণ করা সাব্যস্ত হবে না।

তবে মজুরি এক কাফিয অতিক্রম করবে না।

কেননা ইজারা যখন ফাসিদ হয়ে গেলো তখন নির্ধারিত মজুরি এবং সমপরিমাণ মজুরির স্বল্পতরটি ওয়াজিব হবে। কারণ সে নির্ধারিত মজুরির অতিরিক্ত পরিমাণটুকু হ্রাস করতে সম্মত হয়েছে।

পক্ষান্তরে উভয়ে যদি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের ক্ষেত্রে শরীকদার হয়, সেক্ষেত্রে ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে সমপরিমাণ মজুরির পরিমাণ যাই হোক সেটাই ওয়াজিব হবে।

কারণ নির্ধারিত মজুরির পরিমাণ অজ্ঞাত। সুতরাং নির্ধারিত পরিমাণ থেকে হ্রাস করা সিদ্ধ হয়নি।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে এই শর্তে নিযুক্ত করে যে, আজ এই দশ সা' আটার রুটি তৈরী করবে-এক দিরহামের বিনিময়ে, তাহলে এই ইজারা চুক্তি ফাসিদ।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর মাবসূত কিতাবের ইজারা অধ্যায়ে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, এই চুক্তি বৈধ।

কেননা শ্রমকে এ ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত বিষয় রূপে ধরা হবে। আর সময়ের উল্লেখ দ্রুততার জন্য ধরা হবে, যাতে চুক্তি বৈধ হয়ে যায়। সুতরাং অজ্ঞতা বিদূরিত হয়ে যাবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, চুক্তি কৃত বিষয়টি অজ্ঞাত। কেননা সময়ের উল্লেখ উপকারকে চুক্তিকৃত বিষয় হওয়া অনিবার্য করে। পক্ষান্তরে কাজের উল্লেখ সেটাকে চুক্তিকৃত বিষয় হওয়া সাব্যস্ত করে।

আর একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার প্রদানের অবকাশ নেই। কারণ নিযুক্তকারীর লাভ হল। দ্বিতীয়টিতে আর মজদূরের লাভ হল প্রথমটিতে। সুতরাং এই অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়াবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, যদি কাজ উল্লেখ করে আর বলে, আজকের মধ্যে, তাহলে ইজারা বৈধ হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে সময় কাজের কালগত পাত্র। সুতরাং কাজই হবে চুক্তিকৃত বিষয়। পক্ষান্তরে 'আজ' বললে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

তালাক প্রসঙ্গে এর সদৃশ মাসআলা বিগত হয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি জমি ইজারা নেয় এই শর্তে যে, জমি চাষ করবে, ফসল লাগাবে এবং সেচ দেবে, তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননা ফসল লাগানোর বিষয়টি তো চুক্তি দ্বারা প্রাপ্য হয়। আর চাষ ও সেচ ছাড়া ফসল করা সম্ভব নয়। সুতরাং চুক্তি দ্বারা এর প্রতিটি প্রাপ্য হবে। আর যে কোন শর্তের এরূপ গুণ হবে সেটা চুক্তির চাহিদাযুক্ত বিষয় হবে। সুতরাং ঐ শর্তের উল্লেখ চুক্তিকে ফাসিদ করবে না।

পক্ষান্তরে যদি যমি দুই চাষের কিংবা খাল-খনন করার কিংবা যমিতে সার দেয়ার শর্ত আরোপ করে তাহলে ইজারা চুক্তি ফাসিদ হবে।

কেননা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও এর প্রভাব বিদ্যমান থাকে, আর তা চুক্তির চাহিদাভুক্ত বিষয় নয়। আর তাতে চুক্তির পক্ষদ্বয়ের এক পক্ষের লাভ রয়েছে। আর যে শর্তের এই অবস্থা, তা চুক্তিকে অবশ্য ফাসিদ করে।

তাছাড়া এ ক্ষেত্রে জমি ইজারা প্রদানকারী মজদূরের শ্রম সুবিধাকে এমনভাবে ভাড়ায় গ্রহণকারী বলে সাব্যস্ত হয় যার প্রভাব চুক্তির মেয়াদ শেষে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এটা এক চুক্তির ভিতরে দুই চুক্তি সম্পাদন হল, যা নিষিদ্ধ।

অতঃপর কেউ কেউ বলেছেন, দুই কর্ষণ এর অর্থ হলো কর্ষিত অবস্থায় যমি ফেরত প্রদান। এটা ফাসিদ হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ ফসল করার জন্য দুই বার কর্ষণ করা। এই শর্ত ফাসিদ হবে ঐ সব অঞ্চলে, যেখানে এক কর্ষণেই ফসল করা যায়, আর মেয়াদ যদি হয় এক বছর।

পক্ষান্তরে মেয়াদ যদি তিন বছর হয় তাহলে দ্বিতীয় কর্ষণের উপকার পরবর্তী বছর বিদ্যমান থাকে না।

আর খাল খনন দ্বারা ছোট খাল উদ্দেশ্য নয়, বরং বড় খাল উদ্দেশ্য। এটাই বিশুদ্ধ মত, কেননা বড় খালের সুফল পরবর্তী বছরেও বিদ্যমান থাকে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, আর যদি চাষাবাদের জন্য অন্য একটি যমি ইজারা নেয় অন্য আর একটি যমির চাষাবাদের বিনিময়ে তাহলে তাতে কল্যাণ নেই। (কাজেই বৈধ হবে না)।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এটা জায়িয। একই বিধান হবে এক বাড়ীর বসবাসের বিনিময়ে আরেক বাড়ী বসবাসের জন্য ইজারা নেয়া এবং এক বস্ত্র ব্যবহারের বিনিময়ে আরেক বস্ত্র ব্যবহারের জন্য এবং এক বাহনের আরোহণের বিনিময়ে অন্য একটি বাহন আরোহণের জন্য ভাড়া নেয়া।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীল এই যে, (ইজারার ক্ষেত্রে) বস্তুর ফলাফল বস্তু সত্তার পর্যায়ভুক্ত। এ কারণেই তো এমন মজুরির বিনিময়ে ইজারা গ্রহণ করা জায়িয, যা ইজারা প্রদানকারীর যিম্মায় সাব্যস্ত হয়। আনার একে ঋণের বিনিময়ে আন বলে গণ্য করা হয় না।

আমাদের দলীল এই যে, আমাদের মতে শ্রেণীর অভিন্নতা এককভাবে 'নাসা' (বাকীতে বিক্রয়) কে হারাম করে দেয়। সুতরাং এটা বাকীতে কুহীস্থানী বস্ত্রের বিনিময়ে কুহীস্থানী বস্ত্র বিক্রয়ের ন্যায় হল। ইমাম মুহম্মদ এদিকেই ইশারা করেছেন।

তাছাড়া ইজারা চুক্তিকে শুধু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কিয়াসের বিপরীতে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ শ্রেণী অভিন্নতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিদ্যমান নেই।

পক্ষান্তরে উপকারের শ্রেণী অভিন্নতার বিষয়টি ভিন্ন।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, খাদ্য সামগ্রী যদি দু'জনের শরীকী মালিকানাভুক্ত হয় আর দু'জনের একজন অপরজনকে কিংবা তার গাধাকে নিজের হিস্সা বহনের জন্য ভাড়া করে আর সে সমগ্র বোঝা বহন করে তাহলে সে মজুরি পাবে না।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সে নির্ধারিত মজুরি পাবে। কেননা তার মতে বস্তুর উপকারিতা বস্তুসত্তার সমতুল্য। আর বস্তুসত্তাকে ব্যাপ্ত রূপে বিক্রি করা বৈধ। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, তার এবং অন্যের মাঝে শরীকানার বাড়ী তাকে খাদ্যসাম্রগী রাখার জন্য ভাড়া নিলো। কিংবা শরীকানার গোলামকে নিজের কাপড় সেলাই করার জন্য নিযুক্ত করণ।

আমাদের দলীল এই যে, দুই শরীকদারের একজন অপর শরীকদারকে বা তার গাধাকে এমন একটি কাজের জন্য ভাড়া নিলো যার পৃথক অস্তিত্ব নেই। কারণ বোঝা বহন করা একটি স্থূল কর্ম, যা ব্যাপ্ত বস্তুতে কল্পনা করা সম্ভব নয়। বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিক্রয় হচ্ছে একটি শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী কার্যকর।

আর যখন চুক্তিকৃত বিষয় অর্পণ করা কল্পনা করা যায় না, তখন মজুরি ওয়াজিব হবে না।

তাছাড়া যে বোঝা সে বহন করবে তার প্রতিটি অংশে অপরজন শরীক হবে। সুতরাং সে নিজের জন্য শ্রমদানকারী হবে। তাই অর্পণ সম্পন্ন হবে না।

শরীকানার বাড়ীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে চুক্তিকৃত বিষয় হলো বাড়ীর উপকারিতা। আর সে বাড়ীতে খাদ্য সামগ্রী না রাখলেও বাড়ীর উপকারিতা অর্পণ সম্পন্ন হয়।

গোলামের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সেখানে চুক্তিকৃত বিষয় হলো তার হিস্সার মালিকানার উপকারিতা। আর সেটা হল শরীয়তের হুকুমের বিষয়, যা ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করা সম্ভব।

কেউ যদি যমি ভাড়া নেয় আর এ কথা উল্লেখ না করে যে, তাতে চাষাবাদ করবে কিংবা অমুক প্রকার ফসল চাষ করবে তাহলে ইজারা ফাসিদ হবে।

কেননা যমি ফসলের উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ভাড়া নেয়া হয়। তদ্রূপ তাতে বিভিন্ন প্রকারের ফসল চাষ করা হয়। তার মধ্যে কোনটা যমির ক্ষতি করে আর কোনটায় যমির ক্ষতি করে না। সুতরাং চুক্তিকৃত বিষয় পরিজ্ঞাত হলো না।

অতঃপর যদি যমি চাষ করে আর নির্ধারিত মেয়াদ পার হয়ে যায়, তাহলে সে নির্ধারিত মজুরি পাবে। এটা হল সূক্ষ্ম কিয়াস। কিন্তু কিয়াস মতে তা জায়িয হবে না। এটাই ইমাম যুফার (রহ)-এর মত।

কেননা চুক্তিটি ফাসিদ রূপে সম্পন্ন হয়েছে; সুতরাং তা জায়িয রূপে পরিবর্তিত হবে না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অজ্ঞতা দূরীভূত হয়েছে। সুতরাং বৈধ রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাবে; যেমন চুক্তির অবস্থায় অজ্ঞতা বিদূরিত হওয়ার ক্ষেত্রে। আর বিষয়টি এমন হলো যে, অজ্ঞাত মেয়াদকে তা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে রহিত করে দিন। আর মেয়াদ-উর্ধ্ব ইচ্ছাধিকারকে মেয়াদের মধ্যে রহিত করে দিল।

কেউ যদি এক দিরহামের বিনিময়ে বাগদাদ পর্যন্ত গাধা ভাড়া করে; কিন্তু তাতে কী বহন করা হবে তা উল্লেখ না করে, এরপর মানুষ সাধারণত: যা বহন করে তাই বহন করল আর গাধাটি পথে মারা গেলো তাহলে সে ক্ষতির যামিন হবে না।

কেননা ইজারাকৃত বস্তুটি ইজারা গ্রহণকারীর হাতে আমানত হয়ে থাকে; এমন কি ইজারা চুক্তি ফাসিদ হলেও।

আর যদি বাগদাদ পর্যন্ত পৌছে তাহলে তার অনুকূলে নির্ধারিত মজুরি অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস; যেমন পূর্ববর্তী মাসআলায় আমরা উল্লেখ করেছি।

আর যদি বোঝা বহন করার পূর্বেই উভয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রথমোক্ত মাসআলায় ফসল করার পূর্বেই বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে ফাসাদ রোধ করার জন্য ইজারা চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া হবে। কেননা ইজারা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর বহন করার পূর্বে এবং চাষ করার পূর্বে ফাসাদ বিদ্যমান ছিল।

পরিচ্ছেদ ঃ মজদূরের দায় বহন

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মজদূর (শ্রমদানে নিযুক্ত ব্যক্তি) দুই প্রকার। শরীকী মজদূর এবং ব্যক্তিগত মজদূর। শরীকী মজদূর হল ঐ ব্যক্তি, যে কাজ করার পূর্বে মজুরির হকদার হয় না। যেমন রঙের কারিগর এবং ধোপা।

কেননা কাজ বা কাজের চিহ্ন যদি চুক্তিকৃত বিষয় হয় তাহলে সে সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করতে পারে। কারণ কোন এক ব্যক্তি তার 'কর্ম' ফলের একক হকদার হয় না। এদিক থেকেই তাকে শরীকী মজদূর বলা হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, প্রদত্ত বস্তুটি তার হাতে আমানত। যদি তা হালাক হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে কোন কিছুরই দায়বহন করবে না। তাহল ইমাম যুফার (র)-এর মত। আর সাহেবায়নের মতে সে ক্ষতির দায় বহন করবে। তবে বড় ধরনের বিপদের ক্ষেত্রে নয়। যেমন বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটা বা ভয়ংকর শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া।

সাহেবায়ন (রা)-এর দলীল হল হযরত ওমর (রা) ও হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তারা শরীকী মজদূরকে দায়বহন করাতেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, প্রদত্ত বস্তু হেফাজত করা তার উপর (মালিকের) প্রাপ্য হক। কেননা বস্তুটিকে হেফাজত করা ছাড়া কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং যদি এমন কারণে নষ্ট হয়, যা পরিহার করা সম্ভব, যেমন গসব বা চুরি, তাহলে ধরা হবে যে, এ ত্রুটি তার দিক থেকে হয়েছে। সুতরাং সে তার যামিন হবে। যেমন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাখা আমানত।

যে সকল বিপদ পরিহার করা সম্ভব নয় সেগুলির বিধান ভিন্ন। যেমন স্বাভাবিক মৃত্যু, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি। কেননা এ ক্ষেত্রে তার দিক থেকে কোন ত্রুটি নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, বস্তুটি তার হাতে আমানত। কারণ মালিকের অনুমতিক্রমেই কবজা করা হয়েছে। এ কারণেই অপরিহারযোগ্য বিপদের কারণে যদি হালাক হয় তবে সে তার যামিন হয় না।

পক্ষান্তরে দখলটি যদি দায়যুক্ত দখল হতো তাহলে উভয় অবস্থায় দায় আরোপ করা হতো, যেমন গসবকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে।

আর সংরক্ষণ তার উপর (মালিকের) প্রাপ্য হক হয়েছে, অনুবর্তী রূপে, উদ্দিষ্ট রূপে নয়। এ কারণেই তার বিপরীতে মজুরির কোন অংশ সাব্যস্ত হয় না।

পারিশ্রমিকের বিষয়ে আমানত রাখার হুকুম ভিন্ন। কেননা তার উপর সংরক্ষণ মালিকের প্রাপ্য হক হয়েছে উদ্দিষ্ট রূপে। এ কারণেই এর বিপরীতে মজুরি সাব্যস্ত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তার কাজ করতে গিয়ে যা নষ্ট হয় যেমন কাচতে গিয়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেলা এবং কুলীর পা পিছলে পড়ে যাওয়া এবং ভাড়ায় প্রদানকারী যে রশি দ্বারা বোঝা বাঁধে সে রশি ছিঁড়ে যাওয়া কিংবা জলযান চালাতে গিয়ে (পরিচালনাজনিত কারণে) তা ডুবে যাওয়া সেটা তার উপর দায়সম্পন্ন হবে।

ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার উপর কোন যামান আসবে না। কেননা সে তাকে নিঃশর্ত, রূপে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং দোষমুক্ত উভয় প্রকারের কাজ তার অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা ব্যক্তিগত মজদূর এবং ধোপার সহকারীর মত হল।

আমাদের দলীল এই যে, যে কাজ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত, সেটাই নিয়োগদাতার অনুমতি ভুক্ত হবে। আর সেটা হলো দোষমুক্ত কাজ। কেননা দোষমুক্ত কাজই হল বস্তুতে তার 'কর্ম চিহ্ন' স্থাপিত হওয়ার মাধ্যমে। আর প্রকৃতপক্ষে সেটাই হল চুক্তিকৃত বিষয়। এমন কি যদি সেই কর্ম চিহ্ন অন্য কারো কর্ম দ্বারা অর্জিত হয় তাহলেও মজুরি ওয়াজিব হবে। সুতরাং দোষসৃষ্টিকারী কাজ অনুমতিভুক্ত হবে না।

ধোবীর সহকারীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে হল স্বেচ্ছাকর্মী। সুতরাং তার কর্মকে দোষমুক্ততার শর্তে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কেননা সে ক্ষেত্রে সে স্বেচ্ছাকর্ম থেকে বিরত থাকবে।

আর আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে মজদূর মজুরির বিনিময়ে কাজ করছে। সুতরাং তার কর্মকে দোসমুক্ততার শর্তে আবদ্ধ করা সম্ভব।

ব্যক্তিগত মজদূরের বিষয়টিও ভিন্ন। এই অধ্যায়ের শেষে ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

আর রশি ছিঁড়ে যাওয়ার কারণ হলো তার স্বল্প গুরুত্ব প্রদান। সুতরাং সেটা তার নিজের কৃতকর্ম হল।

ইমাম কুদূরী বলেন, তবে যে সব আদম সন্তান জলযান ডুবিতে মারা যাবে, কিংবা বাহন থেকে পড়ে যাবে, তার হাঁকানো বা টানার কারণে হলেও তার উপর ক্ষতির দায় বহন সাব্যস্ত হবে না।

কেননা এটা হবে মানুষের জানের ক্ষতিপূরণ। আর সেটা চুক্তির মাধ্যমে ওয়াজিব হয় না; বরং অপরের কারণে ওয়াজিব হয়। এ কারণেই আকিলাহদের উপর তা ওয়াজিব হয়। অথচ চুক্তি সংক্রান্ত ক্ষতির দায় আকিলাহদের উপর আসে না।[১]

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি ফোরাত অঞ্চল থেকে একটি মটকা বহন করে নেয়ার জন্য একজন লোক ভাড়া করা হয়, আর পথিমধ্যে তা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে

১. عاقلة (আকিলাহ) প্রসঙ্গ সামনে আসবে।

যায়, তাহলে নিযুক্তকারীর ইচ্ছাধিকার হবে। ইচ্ছা করলে যেখান থেকে বহন করেছে সেখানকার মূল্য দায় তার উপর আরোপ করবে, আর সে কোন মজুরি পাবে না। আর ইচ্ছা করলে যে স্থানে ভেঙ্গেছে সেখানকার মূল্য দায় তার উপর আরোপ করবে এবং সেই হিসাবে তাকে মজুরি প্রদান করবে।

দায় আরোপের কারণ সেটাই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, আর মটকা পড়ে যাওয়ার কারণ হলো কুলীর পা পিছলে যাওয়া বা রশি ছিড়ে যাওয়া। আর এগুলো তারই কৃতকর্ম।

আর ইচ্ছাধিকার প্রদানের কারণ এই যে, পথিমধ্যে যখন ভেঙ্গে গেলো, আর 'বহন' হলো একটি অভিন্ন কর্ম, তখন বোঝা গেলো যে, এ দিক থেকে সীমালংঘনের বিষয়টি সূচনা থেকেই বিদ্যমান রয়েছে।

আর একটি কারণ হলো এই যে, বহনের সূচনা অংশ তার অনুমতিক্রমে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং সূচনা থেকে সীমা লংঘন হয়নি। বরং ভাঙ্গার সময় সীমা লঙ্ঘন হয়েছে। সুতরাং দু'টি অবস্থার যে কোনটিকে ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয় সূরতে নিযুক্তকারী যে পরিমাণ কাজ উশুল করেছে, সে পরিমাণ মজুরি মজদূর পাবে।

আর প্রথম সূরতে সে কোন মজুরি পাবে না। কেননা মূল থেকেই সে কোন কিছু উশূল করেনি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, শল্য চিকিৎসক যখন চিকিৎসা করে কিংবা পশুচিকিৎসক যখন অপারেশন করে আর স্বাভাবিক পরিমাণ স্থান অতিক্রম না করে তাহলে ঐ কারণে হালাক হলে তার উপর যামান আসবে না।

আর 'জামে ছাগীরে' রয়েছে, একজন পশু চিকিৎসক এক দানিক (দিরহামের ষষ্ঠাংশ)-এর বিনিময়ে 'পশুর অপারেশন' করল আর তাতে পশুটা হালাক হয়ে গেল, কিংবা একজন হাজ্জাম মনিবের অনুমতিক্রমে গোলামকে শিংগা লাগাল আর তাতে সে মারা গেল, তাহলে তার উপর যামান আসবে না।

বস্তুতঃ উভয় ইবারতের প্রতিটিতে অপরটির জন্য কিছুটা ব্যাখ্যা রয়েছে।[১]

আর দায় সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ এই যে, প্রতিক্রিয়ার বিস্তার পরিহার করা সম্ভব নয়। কেননা সেটা নির্ভর করে কষ্ট সহনের ক্ষেত্রে দেহ স্বভাবের শক্তি ও দুর্বলতার উপর। সুতরাং এই চুক্তিকে দোষমুক্ত কর্মের শর্ত দ্বারা আবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

আর পূর্বে আমাদের বর্ণিত কাপড় কাচা ইত্যাদি বিষয়গুলো ভিন্ন। কেননা কাপড়ে টেকসই গুণ ও চিকনত্ব চিন্তা করে বোঝা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে দোষমুক্ত কর্মের শর্ত আরোপ করা সম্ভব।

---

১. কেননা একটিতে স্বাভাবিক পরিমাণ অতিক্রম না করার শর্ত রয়েছে; আর অন্যটিতে অনুমতির শর্ত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর ব্যক্তিগত মজদূর হলো ঐ ব্যক্তি, যে নির্ধারিত মেয়াদে নিজেকে অর্পণ করা দ্বারা মজুরির হকদার হয়। এমন কি কাজ না করা সত্ত্বেও। যেমন এক ব্যক্তিকে খেদমতের জন্য বা মেষ চরানোর জন্য একমাস মেয়াদে নিযুক্ত করা হলো।

তাকে ব্যক্তিগত মজদূর বলা হয় এ কারণে যে, অন্য কারো জন্য কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কেননা এই মেয়াদে তার যাবতীয় 'কর্মফল' নিযুক্তকারীর প্রাপ্য হয়ে গেছে। আর মজুরি প্রাপ্য হয়। উপকার লাভের বিপরীত। এ কারণেই কাজ করার পর অর্পণের পূর্বে কারো দ্বারা বিনষ্ট হলেও মজুরি বহাল থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ব্যক্তিগত মজদূরের হাতে থাকা অবস্থায় যা নষ্ট হয় এবং তার কাজ দ্বারা যা নষ্ট হয় তার যামান তার উপর আসবে না।

প্রথমটির কারণ এই যে, প্রদত্ত বস্তুটি তার হাতে আমানত। কেননা সে তা নিযুক্তকারীর অনুমতিক্রমে কবজা করেছে। এ বিধান ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তো স্পষ্ট। সাহেবায়নের মতেও তাই। কেননা শরীকী মজদূরের উপর দায় আরোপ করা তাদের মতে মূলতঃ সূক্ষ্ম কিয়াসভিত্তিক, যাতে মানুষের মাল রক্ষা পায়; পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত মজদূর তো কাজ কবুল করে না। সুতরাং বস্তুটি নিরাপদ থাকাই স্বাভাবিক। তাই এ ক্ষেত্রে কিয়াসের ভিত্তিতেই আমল করা হবে। অর্থাৎ যামান আসবে না।)।

আর দ্বিতীয়টির কারণ এই যে, মজদূরের কর্মফল যখন নিযুক্তকারীর মালিকানাধীন হয়ে গেলো, এর পর যখন সে তাকে নিজের মালিকানায় কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিল তখন তা বৈধ হবে এবং সে তার স্থলবর্তী হয়ে যাবে। আর মজদূরের কর্ম তার নিয়োগকারীর সাথে প্রত্যাবর্তিত হবে; যেন সে নিজেই তা করেছে। এ কারণেই সে তার উপর দায় আরোপ করতে পারবে না। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ দুই শর্তের একটির ভিত্তিতে ইজারা চুক্তি

দর্জীকে যদি বলা হয় যে, যদি ফারসী ধরনের এ কাপড় সেলাই কর তাহলে এক দিরহামের বিনিময়ে, আর যদি রোমান ধরনে সেলাই কর তাহলে দুই দিরহামের বিনিময়ে, এটা জায়িয হবে। আর এ দুই কাজের যেটি করবে সেটির মজুরির হকদার হবে।

তদ্রূপ যদি রঙ-এর কারিগরকে বলে যে, যদি কুসুম রং দ্বারা রঞ্জিত কর তাহলে এক দিরহামের বিনিময়ে, আর যদি জাফরান দ্বারা রঞ্জিত কর তাহলে দুই দিরহামের বিনিময়ে।

তদ্রূপ একই বিধান হবে যদি দুটি বস্তুর মাঝে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে বলে যে, আমি তোমার কাছে এক মাসের জন্য পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে এই বাড়ীটি

কিংবা দশ দিরহামের বিনিময়ে ঐ বাড়ীটি ভাড়া দিলাম। অদ্রূপ যদি দুটি ভিন্ন দূরত্বের মাঝে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে বলে, তোমাকে এই বাহনটি কুফা পর্যন্ত এতোর বিনিময়ে আর ওয়াসিত পর্যন্ত এতোর বিনিময়ে ভাড়া দিলাম। অদ্রূপ একই বিধান হবে যদি (উপরোক্ত ক্ষেত্র গুলোতে) তিনটি জিনিসের মাঝে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে।

আর যদি চারটি জিনিসের মাঝে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে তাহলে বৈধ হবে না।

এ সকল বিষয়ে কিয়াস করা হয়েছে বিক্রয়ের উপর। আর কিয়াসের যোগসূত্র হল প্রয়োজন পূর্ণ করা। তবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারণের ইচ্ছাধিকারের শর্ত করা জরুরী পক্ষান্তরে ইজারার ক্ষেত্রে নির্ণয়ের ইচ্ছাধিকারের শর্ত করা জরুরী নয়।

কেননা কাজ সম্পন্ন করা দ্বারা মজুরি ওয়াজিব হয় আর তখন চুক্তিকৃত বিষয়টি পরিজ্ঞাত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বয়ং চুক্তি দ্বারাই মুল্য ওয়াজিব হয়। ফলে এমনভাবে অজ্ঞতা দেখা দেয় যে, ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত করা ছাড়া বিবাদ দূরীভূত হবে না।

আর যদি বলে যে, যদি আজ সেলাই কর তাহলে এক দিরহামের বিনিময়ে, আর যদি আগামীকাল সেলাই কর তাহলে অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে। এখন যদি আজ সেলাই করে তাহলে সে এক দিরহাম পাবে, পক্ষান্তরে আগামীকাল সেলাই করলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সে সমমানের মজুরি পাবে, তবে তা অর্ধ দিরহাম অতিক্রম করবে না। আর 'জামে ছাগীরে' রয়েছে অর্ধ দিরহাম থেকে কম হবে না, আবার এক দিরহাম থেকে বেশী হবে না।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে উভয় শর্ত জায়িয রয়েছে। আর ইমাম যুফার (র) বলেন, উভয় শর্ত ফাসিদ।

কেননা সেলাই এখানে অভিন্ন কর্ম (ভিন্নতা শুধু সময়ের) আর তার বিপরীতে বদল হিসেবে দুটি বদল উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বিনিময় অজ্ঞাত হয়ে গেল। কেননা 'আর'-এর উল্লেখ হচ্ছে তাড়াতাড়ি করার জন্য। আর আগামীকালের উল্লেখ হচ্ছে সহজতা দানের জন্য। সুতরাং প্রতিদিন দুটি মজুরির উল্লেখের সমাবেশ হল।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, 'আজ'-এর উল্লেখ হয়েছে সময় নির্দিষ্ট করার জন্য, আর 'আগামীকাল'- এর উল্লেখ হয়েছে চুক্তিকে পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য। সুতরাং প্রতিদিন দুটি মজুরির উল্লেখের সমাবেশ হচ্ছে না। তাছাড়া তাড়াতাড়ি করা ও বিলম্বিত করা দু'টো পৃথক উদ্দেশ্য রূপে বিবেচ্য। সুতরাং একে দুই প্রকারের ভিন্নতার পর্যায়ভুক্ত ধরা হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত অর্থে 'আগামীকাল'-এর উল্লেখ হলো সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য। আর 'আজ' কে সময় নির্ধারণের অর্থে প্রযুক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা একই চুক্তিতে সময় ও কাজের একত্র উল্লেখের কারণে তাতে চুক্তি ফাসাদ সাব্যস্ত হয়। আর এমন হলে

'আগামীকাল'-এ দুটি মজুরির উল্লেখ সাব্যস্ত হয়। কিন্তু আজ তা হয় না। সুতরাং প্রথম শর্তটি সিদ্ধ হবে এবং নির্ধারিত মজুরি ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শর্তটি ফাসিদ হবে এবং সমমানের মজুরি ওয়াজিব হবে; তা অর্ধ দিরহামকে অতিক্রম করবে না। কেননা দ্বিতীয় দিনের ক্ষেত্রে এটাই ছিল উল্লেখিত মজুরি।

'জামে ছাগীরের' বর্ণনায় রয়েছে যে, এক দরিহামের অতিরিক্ত হবে না, আবার অর্ধ দিরহামের কমও হবে না। কেননা প্রথম মজুরির উল্লেখ দ্বিতীয় দিন বিলুপ্ত হবে না। সুতরাং প্রথমটিকে বিবেচনা করা হবে তদুর্ধ পরিমাণকে রোধ করার জন্য আর দ্বিতীয় মজুরির উল্লেখকে বিবেচনা করা হবে কম-এর দিকটি রোধ করার জন্য।

আর যদি তৃতীয় দিন সেলাই করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে অর্ধ দিরহাম অতিক্রম করা যাবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত।

কেননা সে যখন অর্ধ দিরহামের বেশীর ক্ষেত্রে আগামীকাল পর্যন্ত বিলম্ব করতে সম্মত ছিল না, তখন সেই পরিমাণের বেশীর বিনিময়ে আগামীকালের পর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী না হওয়া আরো স্বাভাবিক।

আর যদি বলে যে, যদি তুমি এই দোকানে আতর বিক্রেতাকে বসাও তাহলে মাসে এক দিরহামের বিনিময়ে হবে, আর যদি কামারকে বসাও তাহলে দুই দিরহামের বিনিময়ে হবে, এটা জায়িয হবে। আর দুটোর যেটাই করবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সেটার সঙ্গে উল্লেখিত মজুরির হকদার হবে।

সাহেবায়ন বলেন, ইজারা চুক্তি ফাসিদ হবে।

তদ্রূপ একই মতপার্থক্য হবে যদি এই শর্তে একটি ঘর ভাড়া করে যে, যদি সে নিজে তাতে বাস করে তাহলে এক দিরহামের বিনিময়ে, আর যদি কামারকে বাস করায় তাহলে দুই দিরহামের বিনিময়ে; ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এটা জায়িয হবে। আর সাহেবায়ন বলেন, জায়িয হবে না।

আর যে ব্যক্তি এই মর্মে একটি বাহন ভাড়া করে হিরা পর্যন্ত এক দিরহামের বিনিময়ে, আর যদি তা পার হয়ে কাদিসিয়ায় যায় তাহলে দুই দিরহামের বিনিময়ে; এই চুক্তি জায়িয হবে।

এ মাসআলাটি (ইমাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের মাঝে) মতপার্থক্যপূর্ণ হতে পারে।

আর যদি বাহনটি এই শর্তে হিরা পর্যন্ত ভাড়া করে যে, যদি তার উপর এক 'কুর' পরিমাণ যব বহন করে তাহলে অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে আর যদি এক কুর গম বহন করে তাহলে এক দিরহামের বিনিময়ে তা জায়িয হবে; ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে। আর সাহেবায়ন বলেন জায়িয হবে না।

সাহেবায়নের মতামতের দলীল এই যে, চুক্তিকৃত বিষয়টি এখানে অজ্ঞাত। তদ্রূপ মজুরি হল দুটি পরিমাণের একটি পরিমাণ। আর তা অজ্ঞাত। আর অজ্ঞতা চুক্তির ফাসাদ অনিবার্য করে।

রোমান বা ফারসী ধরনের সেলাইয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা কাজের বিনিময়ে মজুরি সাব্যস্ত হচ্ছে আর কাজ সম্পন্ন হওয়ার সময় অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে

এই মাসআলাগুলোর মঞ্চ (ঘর) খালি করে দেওয়া এবং অর্পণ করা দ্বারাই ভাড়া অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং অজ্ঞতা বিদ্যমান থেকে যায়। আর এ তত্ত্বটাই হলো সাহেবায়নের মূলনীতি।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, ইজারা প্রদানকারী দুটি ভিন্ন ও বিশুদ্ধ চুক্তির মাঝে তাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করেছে। সুতরাং তা যেমন রোমী ধরনের ও ফারসী ধরনের সেলাইয়ের ক্ষেত্রে।

আর এটা (ভিন্ন দুই চুক্তি হওয়ার কারণ) এই কাপড় যে, তার নিজের বসবাস কামারকে বাস করানো থেকে ভিন্ন। দেখুননা নিঃশর্ত চুক্তিতে এটা অন্তর্ভুক্ত হয় না। এর সদৃশ অন্যান্য মাসআলাগুলো সম্পর্কে একই হুকুম।

আর ইজারা চুক্তি তো সম্পাদন করা হয় উপকৃত হওয়ার জন্য আর উপকারের সময় অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। আর যদি শুধু অর্পণ দ্বারাই মজুরি অবশ্য সাব্যস্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে দুই মজুরির স্বল্পতরটি ওয়াজিব হবে। কেননা সেটা নিশ্চিত।

পরিচ্ছেদ ঃ গোলামকে ইজারা প্রদান

কেউ যদি নিজের খিদমতের জন্য একটি গোলাম ইজারা নেয় তাহলে সেই গোলামকে নিয়ে সফর করার অধিকার তার নেই। তবে যদি সফর করার শর্ত আরোপ করে থাকে (তাহলে অধিকার পাবে।)

কেননা সফরের খেদমত অতিরিক্ত কষ্ট অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং নিঃশর্ত চুক্তি সেটা অন্তর্ভুক্ত করবে না।

এই অতিরিক্ত কষ্টের কারণেই তো সফরকে ওজর ধরা হয়েছে। সুতরাং সফরের শর্ত আরোপ করা অপরিহার্য। যেমন বাড়ীতে কামার বা ধোপাকে বাস করানোর ক্ষেত্রে। তাছাড়া উভয় খেদমতের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। সুতরাং (প্রচলনগত কারণে) বাড়ীর খেদমত যখন নির্ধারিত হয়ে গেলো তখন খেদমত অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। যেমন আরোহনের ক্ষেত্রে।

আর যদি নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত গোলামকে (মনিবের কাছ থেকে নয়, বরং স্বয়ং গোলামের কাছ থেকে এক মাসের জন্য ইজারা নেয় আর তাকে মজুরি প্রদান করে তখন ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তির অধিকার নেই তার কাছ থেকে মজুরি ফেরত নেয়ার।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, কাজ থেকে ফারিগ হয়ে যাওয়ার পর সূক্ষ্ম কিয়াস মতে আলোচ্য ইজারা চুক্তিটি বৈধ। কিয়াসের দাবী হলো জায়িয না হওয়া।

কেননা মনিবের অনুমতি নেই আর নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বিষয়টি এমন হল যে, ইজারা গ্রহণকারীর হাতে থাকা অবস্থায় গোলামটি হালাক হয়ে গেলো।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, গোলামের এই পদক্ষেপ নিরাপদে কাজ শেষ করার দিক বিবেচনায় উপকারী পদক্ষেপ। পক্ষান্তরে কাজের সময় গোলামের হালাক হওয়ার দিক বিবেচনায় ক্ষতিকর পদক্ষেপ। আর উপকারী পদক্ষেপের ক্ষেত্রে গোলাম (স্পষ্টতঃ) অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। যেমন হাদিয়া গ্রহণ করা।

আর যখন ইজারা চুক্তি বৈধতার কারণে মজুরি প্রদান করা বৈধ হল ইজারা গ্রহণকারীর অধিকার থাকবে না তার কাছ থেকে মজুরি ফেরত নেওয়ার।

আর কেউ যদি কোন গোলাম গসব করে এরপর গোলাম নিজেকে ইজারা প্রদান করল আর গাছিব বা জবর দখলকারী তার মজুরি গ্রহণ করে খেয়ে ফেললো, এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার উপর যিমান আসবে না। আর সাহবোয়ন বলেন, সে যামিন হবে।

কেননা সে মালিকের মাল তার অনুমতি ছাড়া খেয়েছে। কারণ পিছনের আলোচনা অনুযায়ী ইজারা চুক্তিটি সিদ্ধ হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, 'যিমান' অবশ্য সাব্যস্ত হয় সংরক্ষিত মাল নষ্ট করা দ্বারা। কেননা সংরক্ষণ দ্বারাই মালের মুল্যমান সাব্যস্ত হয়। অথচ আর এ মাল মনিবের জন্য গাসিবের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত নয়।

কেননা গোলাম তো নিজেকেই গাসিব থেকে সংরক্ষণ করতে পারেনি। তাহলে তার হাতের মাল কিভাবে সংরক্ষণ করতে পারবে ?

আর যদি মনিব হুবহু ঐ মজুরি বিদ্যমান অবস্থায় পায় তাহলে সে তা নিয়ে নিবে।

কেননা সে বস্তুতঃ নিজের মাল পেয়েছে।

আর সবার মতেই গোলামের জন্য মজুরি কবজা করা জায়িয হবে।

কেননা পিছনে আলোচনা হয়েছে যে, কাজ থেকে নিরাপদে অবসর হওয়ার দিক বিবেচনায় এই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সে অনুমতিপ্রাপ্ত হবে।

কেউ যদি একটি গোলামকে দুই মাসের জন্য মজদুর রূপে নিযুক্ত করে, এক মাস চার দিরহামের বিনিময়ে আরেক মাস পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে, তাহলে তা জায়িয হবে।

আর দুই মাসের প্রথম মাস চার দিরহামের বিনিময়ে হবে। কেননা ইজারা চুক্তিটিকে বৈধতা দান করার জন্য কিংবা প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করে প্রথমে উল্লেখকৃত মাসটিকে চুক্তি সংলগ্ন মাসের দিকে অভিমুখী করা হবে। সুতরাং দ্বিতীয়টি অনিবার্যভাবে প্রথমটির সংলগ্ন মাসের অভিমুখী হবে।

কেউ যদি একটি গোলাম এক মাসের জন্য এক দিরহামের বিনিময়ে নিযুক্ত করে, আর সে মাসের শুরুতে মজুরি কবজা করে, কিন্তু মাসের শেষে পলাতক বা অসুস্থ হয়, আর ইজারা গ্রহণকারী বলে যে, যখন আমি তাকে নিয়েছি তখন থেকেই সে পলাতক বা অসুস্থ ছিল, আর মনিব বলে যে, তুমি আমার কাছে আসার সামান্য পুর্বে এটা

ঘটেছে, তাহলে ইজারা গ্রহণকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তাকে সুস্থ অবস্থায় নিয়ে আসে তাহলে ইজারাদাতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা তারা এমন একটি বিষয়ে মতবিরোধ করছে যা উভয় অবস্থারই সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং বর্তমান অবস্থার বিচারেই বক্তব্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। কেননা বর্তমান অবস্থাটা একথা প্রমাণ করে যে, ইতিপূর্বেও তা বিদ্যমান ছিল। আর তা স্বকীয়ভাবে প্রমাণ হওয়ার যোগ্যতা না রাখলেও অগ্রাধিকার প্রদানকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এই মতপার্থক্যের মূল হল জলচক্রের পানি চালু থাকা এবং বন্ধ হওয়া সম্পর্কিত মতপার্থক্য।

পরিচ্ছেদ ঃ ইজারা দাতা ও ইজারা গ্রহণকারীর মাঝে মতপার্থক্য

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দর্জী ও কাপড়ের মালিকের মধ্যে যদি মতপার্থক্য হয় অর্থাৎ কাপড়ের মালিক বলে যে, আমি তোমাকে কাবা বানাতে বলেছি, আর দর্জী বলে জামার কথা, কিংবা কাপড়ের মালিক রঙ-কারিগরকে বলে যে, আমি তোমাকে লাল রঙে রঞ্জিত করতে বলেছি, কিন্তু তুমি হলুদ রঙে রঞ্জিত করেছ, আর রঙ-কারিগর বলে, না, বরং তুমি আমাকে হলুদ রঙের আদেশ করেছো; সে ক্ষেত্রে কাপড়ের মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা অনুমতি তো তার কাছ থেকেই আসবে। দেখুন না, সে যদি মূল অনুমতির বিষয়টিই অস্বীকার করে (বলে যে, এটা তোমার কাছে গচ্ছিত ছিল) সে ক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং গুণ তথা রঙের বিষয় অস্বীকার করলে তখনো তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

তবে তাকে কসম করানো হবে। কেননা সে এমন বিষয় অস্বীকার করেছে, যা যদি সে স্বীকার করতো তাহলে তার উপর তা লাযিম হয়ে যেতো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যখন সে কসম করবে তখন দর্জী যামিন হবে।

এর অর্থ সেটাই, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নিযুক্তকারীর ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে তার উপর কাপড়ের মূল্য দায় আরোপ করবে। আর ইচ্ছা করলে সেটা গ্রহণ করবে এবং তার সমপরিমাণের মজুরি প্রদান করবে।

তদ্রূপ কসম করার পর রঙ-এর ক্ষেত্রেও তাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। ইচ্ছা করলে সে তার উপর সাদা কাপড়ের 'মূল্য-দায়' আরোপ করবে। আর ইচ্ছা করলে হলুদ কাপড় নিয়ে তাকে এর সমমানের মজুরি প্রদান করবে, যা উল্লেখকৃত মজুরি অতিক্রম করবে না।

কুদূরীর কোন কোন অনুলিপিতে রয়েছে যে, রঙ তাতে যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছে কাপড় ওয়ালা তার দায়বহন করবে। কেননা কারিগর 'গসিব'-এর পর্যায়ভুক্ত।

আর যদি কাপড়ের মালিক বলে, তুমি আমার জন্য তা বিনা পারিশ্রমিকে তৈরি করেছো, আর কারিগর বলে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করেছি, তাহলে কাপড়ওয়ালার কথা গ্রহণযোগ্য।

কেননা কাপড়ের মালিক কারিগরের কাজের মূল্য সম্পন্নতা অস্বীকার করছে। কারণ চুক্তি দ্বারাই কাজ মূল্য সম্পন্ন হয়। আর সে মজুরির যিমান বিষয়টি অস্বীকার করছে। পক্ষান্তরে কারিগর তা দাবী করছে। আর অস্বীকারকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, লোকটি যদি তার সঙ্গে পেশাগত লেনদেনকারী হয়ে থাকে তাহলে সে সমমানের মজুরি পাবে; অন্যথায় পাবে না।

কেননা তাদের মাঝে পূর্ববর্তী মজুরিভিত্তিক লেনদেন পারিশ্রমিক দাবী করার দিকটিকে নির্ধারিত করে দিচ্ছে, যাতে বিষয়টি তাদের অভ্যস্ত অবস্থার উপর প্রযুক্ত হয়।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কারিগর যদি পারিশ্রমিক গ্রহণসহ এই পেশায় সুপরিচিত হয় তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা যখন সে এ কাজের জন্য দোকান খুলেছে তখন প্রকাশিত অবস্থা বিবেচনা করে এটাকে পারিশ্রমিক গ্রহণের প্রত্যক্ষ ঘোষণার স্থলবর্তী ধরা হবে।

কিয়াসের দাবী অবশ্য সেটাই যেটা ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন। কেননা সে অস্বীকারকারী। আর সাহেবায়নের সূক্ষ্ম কিয়াসের জবাব এই যে, প্রকাশিত অবস্থা হক রোধ করার যোগ্যতা সম্পন্ন। অথচ এখানে প্রয়োজন হলো মজুরীর প্রাপ্যতা প্রমাণ করায়। আল্লাহই অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ ইজারা রহিতকরণ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন বাড়ী ভাড়া নেয় আর তাতে এমন কোন দোষ দেখতে পায়, যা বসবাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহলে তার চুক্তি রহিত করার অধিকার রয়েছে।

কেননা চুক্তিকৃত বিষয় হলো বস্তুর উপকারিতা; আর তা ক্রমে ক্রমে অর্জিত হয়। সুতরাং যে দোষটি সে পেলো সেটা কবজার পূর্বে উদ্ভূত বলে গণ্য হবে। সুতরাং তা ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত করবে; যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

আর ইজারা গ্রহণকারী যখন উপকার লাভ করবে তখন প্রমাণিত হবে যে, সে দোষসহই সম্মত রয়েছে। সুতরাং পূর্ণ বিনিময় তার উপর লাযিম হবে; যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

আর যদি ইজারা দাতা দোষ দূর করার কাজ করে দেয় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে না। কেননা ইচ্ছাধিকারের কারণ দূর হয়ে গেছে।

ইজারায় বাড়ী যদি বিরান হয়ে পড়ে কিংবা যমির সেচ যদি বন্ধ হয়ে যায় কিংবা পেষণ যন্ত্রের পানি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইজারা রহিত হয়ে যাবে।

কেননা চুক্তিকৃত বিষয় বিদ্যমান থাকেনি। আর সেটা হলো কবজা পূর্ববর্তী বিশেষ উপকার। সুতরাং কবজার পূর্বে বিক্রয় দ্রব্য অবিদ্যমান হওয়ার মত হল এবং মজুরির বিনিময়ে নিযুক্ত গোলামের মৃত্যুর সদৃশ হল।

আমাদের কোন কোন আলিম বলেছেন, চুক্তিটি রহিত হবে না। কেননা বস্তুর উপকারিতা এমনভাবে অবিদ্যমান হয়েছে যে, তার প্রত্যাবর্তন কল্পনা করা সম্ভব। সুতরং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কবযার পূর্বে বিক্রিত গোলামের পলায়নের সদৃশ হল।

ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইজারাদাতা যদি সে ঘর পুনঃনির্মাণ করে তাহলে ইজারা গ্রহণকারীর অধিকার নেই (কবজা গ্রহণ থেকে) বিরত থাকার। ইজারাদাতারও অধিকার নেই (তাকে কবজা প্রদান থেকে অস্বীকার করার)। এটা ইমাম মুহম্মদ (র) এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট ঘোষণা যে, ইজারা চুক্তি রহিত হয়নি, তবে তা রহিতকরণযোগ্য।

আর যদি পেষণ যন্ত্রের পানি বন্ধ হয়ে যায়, আর ঘরটি এমন হয় যাকে 'পেষণযন্ত্র স্থাপন' ছাড়া অন্যভাবে কাজে লাগানো সম্ভব, তাহলে তার উপর সেই অংশ অনুপাতে ভাড়া অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

কেননা ঘরটি চুক্তিকৃত বিষয়ের অংশ বিশেষ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইজারা চুক্তিকারী দুই পক্ষের এক পক্ষ যদি মারা যায়, আর সে নিজেরই জন্য ইজারা চুক্তি সম্পাদন করে থাকে তাহলে ইজারা চুক্তি রহিত হয়ে যাবে।

কেননা এখনো যদি চুক্তি অব্যাহত থাকে তাহলে চুক্তি দ্বারা বস্তুর উপকারিতার যে মালিকানা তার লব্ধ হয়েছে সেটা চুক্তির প্রাপ্যরূপে চুক্তি বহির্ভুত পক্ষের মালিকানায় এসে যাবে।

কেননা মাইয়েত যা রেখে যায় মৃত্যুর মাধ্যমে তা ওয়ারিছের মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। আর ইজারা চুক্তির ক্ষেত্রে তা জায়িয নয়।

আর যদি অন্য কারো জন্য চুক্তি সম্পাদন করে থাকে তাহলে চুক্তি রহিত হবে না।

যেমন উকীল, অছী এবং ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী। কেননা রহিত না হওয়ার যে কারণের দিকে আমরা ইংগিত করেছি, তা এখানে বিদ্যমান নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইজারা চুক্তিতে ইচ্ছাধিকার শর্ত আরোপ করা বৈধ।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, জায়িয হবে না। কেননা ইচ্ছাধিকার যদি ইজারা গ্রহণকারীর হয় তাহলে চুক্তিকৃত বিষয় পূর্ণরূপে ফেরত প্রদান করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ তার কিছু অংশ তো ফওত হয়েই যাবে।

আর যদি ইচ্ছাধিকার ইজারাদাতার হয় তাহলে তার পক্ষেও চুক্তিকৃত বিষয় পূর্ণরূপে অর্পণ করা সম্ভব হবে না। আর এ দুটোই ইচ্ছাধিকারকে বাধা প্রদান করে।

আমাদের দলীল এই যে, এটা হলো লেনদেনমূলক চুক্তি। যাতে মজলিসেই কবজা করা প্রাপ্য হক নয়। সুতরাং তাতে ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপ করা বৈধ হবে, যেমন, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। আর উভয়ের মাঝে যোগসূত্র হলো (চিন্তাভাবনার) প্রয়োজন পূর্ণ করা।

আর ইজারার ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত বিষয়ের অংশবিশেষ ফওত হওয়া দোষজনিত ইচ্ছাধিকারের কারণে ফেরত দেওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে না। সুতরাং তেমনি শর্তজনিত ইচ্ছাধিকার (এ বিষয়টি ফেরত প্রদানকে বাধাগ্রস্ত করবে না)।

বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। আর ভিন্নতা এ কারণে যে, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমগ্র বিক্রয়দ্রব্য ফেরত প্রদান করা সম্ভব। ইজারার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সুতরাং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ ফেরতদানের শর্ত হবে, ইজারার ক্ষেত্রে নয়।

এ কারণেই ইজারাদাতা যদি কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর অর্পণ করে তাহলে ইজারা গ্রহণকারীকে দখল বুঝি নিতে বাধ্য করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আমাদের মতে ওজরাধির কারণে ইজারা চুক্তি রহিত করা যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, দোষ ছাড়া অন্য কোন ওজরে তা রহিত করা যাবে না। কেননা তাঁর মতে বস্তুর উপকারিতা বস্তুর সত্তার সমতুল্য, যার কারণে বস্তুর উপকারের উপর চুক্তি সম্পাদন করা জায়িয হয়। সুতরাং তা বিক্রয় চুক্তির সদৃশ হল।

আমাদের দলীল এই যে, বস্তুর উপকারিতাসমূহ কবজাকৃত নয়। অথচ সেটাই হচ্ছে চুক্তিকৃত বিষয়। সুতরাং ইজারার ক্ষেত্রে উদ্ভুত ওজর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কবজার পূর্বে উদ্ভূত 'দোষ'-এর পর্যায়ভুক্ত হবে। সুতরাং ওজর দ্বারা ইজারা চুক্তি রহিত হবে। কেননা চুক্তি রহিত করণকে বৈধতাদানকারী গুণ যোগসূত্র রূপে বিক্রয় ও ইজারা উভয়কে একত্র করছে। আর তা হল, চুক্তি দ্বারা প্রাপ্য সাব্যস্ত হয়নি এমন অতিরিক্ত ক্ষতি স্বীকার না করে চুক্তির বিধান অব্যাহত রাখা চুক্তিকারীর পক্ষে সম্ভব নয়। আর আমাদের মতে এটাই ওজরের অর্থ।

আর তা যেমন দাঁতের ব্যাথার কারণে দাঁত তোলা চিকিৎসককে কেউ পরিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করল, কিন্তু (তার আগেই) ব্যাথার উপশম হয়ে গেলো, তদ্রূপ ওলীমার খাবার রান্না করার জন্য পাচককে মজুরির বিনিময়ে নিযুক্ত করল, এদিকে স্ত্রী তার কাছ থেকে খোলা গ্রহণ করল, এ ক্ষেত্রে ইজারা চুক্তি রহিত হয়ে যাবে।

কেননা চুক্তি অব্যাহত রাখার অর্থ এমন অতিরিক্ত ক্ষতি তার উপর চাপিয়ে দেয়া যা-চুক্তি বলে তার উপর আরোপ যোগ্য নয়।

তদ্রূপ কেউ যদি ব্যবসা করার জন্য বাজারে দোকান নেয় আর তার পুঁজি নষ্ট হয়ে যায়। তদ্রূপ যদি কেউ দোকান বা বাড়ী ভাড়া দেয় এরপর সে দেউলিয়া হয়ে যায় এবং এত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, ভাড়া দেওযা বাড়ী বা দোকানের 'বিক্রয় মূল্য' ছাড়া ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়, তখন বিচারক চুক্তি রহিত করবেন এবং ঋণ পরিশোধের জন্য তা (বাড়ী বা দোকান) বিক্রির ব্যবস্থা করবেন।

কেননা চুক্তির বিধান অব্যাহত রাখায় ক্ষেত্রে এমন অতিরিক্ত ক্ষতি চাপানো হয়, যা চুক্তি বলে তার জন্য অবশ্য পালনীয় নয়। আর তা হলো (ঋণের কারণে) আটক হওয়া। কেননা হয়ত একথা বিশ্বাস করা হবে না যে, তার অন্য কোন মাল নেই।

অতঃপর ইমাম কুদূরী (র) এর বক্তব্য 'কাযী চুক্তি রহিত করবেন' এদিকে ইংগিত করে যে, চুক্তি রহিত করার জন্য আদালতের ফায়সালা অপরিহার্য হবে।

'যিয়াদাত' কিতাবে ঋণের ওজর সম্পর্কে ইমাম মুহম্মদ (র) এরূপই উল্লেখ করেছেন। তবে জামে ছাগীর কিতাবে তিনি বলেছেন, যে সব বিষয়কে আমরা ওজর বলে উল্লেখ করেছি, সেসব ক্ষেত্রে ইজারা রহিত হয়ে যাবে। এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এ ক্ষেত্রে আদালতের ফায়সালার প্রয়োজন নেই।

এর কারণ এই যে, এটা হলো কবজার পূর্বে বিক্রয় দ্রব্যে দোষ উদ্ভূত হওয়ার সমতুল্য। যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং চুক্তিকারী চুক্তি রহিত করার নিজস্ব অধিকার লাভ করবে।

আর প্রথমটির কারণ এই যে, এটা হলো ইখতিলাফী বিষয়। সুতরাং কাযীর পক্ষ হতে সিদ্ধান্ত প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। (যাতে বিবাদ দূর হয়।)

কেউ কেউ অবশ্য উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয় সাধন করে বলেছেন, ওজর যদি স্পষ্ট হয় তাহলে আদালতের ফায়সালার প্রয়োজন নেই। আর যদি সুস্পষ্ট না হয়, যেমন ঋণের বিষয়, তাহলে আদালতের ফায়সালার প্রয়োজন হবে। যাতে ওজর স্পষ্ট হয়ে যায়।

কেউ যদি সওয়ারিতে সওয়ার হয়ে সফর করার জন্য কোন সওয়ারি ভাড়া করে তারপর সফর না করার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে এটা ওজর বলে গণ্য হবে।

কেননা যদি সে চুক্তির বিধান অব্যাহত রাখে তাহলে সে অতিরিক্ত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কারণ হয়ত সে হজের জন্য সফর করতে চেয়েছিল অথচ হজের সময় চলে গেছে। কিংবা সে তার দেনাদারকে তাগাদা করতে যেতে চেয়েছিল অথচ সে নিজেই হাজির হয়ে গেছে। কিংবা ব্যবসার জন্য যেতে চেয়েছিল অথচ সে দরিদ্র হয়ে পড়েছে।

আর যদি ইজারাদাতার কোন অসুবিধা দেখা দেয় তাহলে সেটা ওজর নয়।

কেননা নিজে বসে থেকে তার 'শাগরিদ' বা নিযুক্ত কর্মচারীর হাতে সওয়ারি পাঠিয়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব।

ইজারাদাতা যদি অসুস্থ হয় এবং গৃহে বসে থাকতে রাজী হয় তাহলে একই উত্তর।

এটা হলো মাবসূতের বর্ণনা। পক্ষান্তরে ইমাম কারনী (র) এটাকে ওজর বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা এটা ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং অনিবার্য প্রয়োজনের সময় সে ক্ষতি তার থেকে রোধ করা হবে। স্বেচ্ছাকৃত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নয়।

কেউ যদি তার গোলামকে ভাড়ায় দেয় এরপর তা বিক্রি করে ফেলে তাহলে সেটা ওজর বলে গণ্য হবে না।

কেননা চুক্তির বিধান অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে তার তেমন কোন ক্ষতি হবে না। শুধু লাভ হাত ছাড়া হবে। আর সেটা অতিরিক্ত একটি বিষয়।

আর দর্জী যদি কোন (নবীস) বালককে মজুরির বিনিময়ে নিয়োগ করে এরপর সে পুঁজিহীন হয়ে পড়ে এবং কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে সেটা ওজর বলে গণ্য হবে।

কেননা তার উদ্দিষ্ট মূলধন যেহেতু হাতছাড়া হয়ে গেছে সেহেতু চুক্তির বিধান অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে তার ক্ষতি অনিবার্য হবে।

মাসআলাটির ব্যাখ্যা এই যে, দর্জী নিজের উদ্যোগে কাজ করে। পক্ষান্তরে যে দর্জী মজুরির বিনিময়ে কাজ করে তার পুঁজি তো হলো সুতা সুঁই ও কাঁচি। সুতরাং তার ক্ষেত্রে পুঁজিহীন ও নিঃস্ব হওয়া সাব্যস্ত হবে না।

আর যদি সে সেলাই কর্ম ত্যাগ করার এবং 'সারফ' (অর্থ বিনিময়) ব্যবসা করার ইচ্ছা করে তাহলে সেটা ওজর নয়।

কেননা তার পক্ষে সম্ভব বালককে সেলাইয়ের জন্য এক পাশে বসিয়ে দেয়া এবং নিজে অন্য পাশে বসে 'সারফ' ব্যবসা করা।

এটা ঐ অবস্থা থেকে ভিন্ন, যখন সেলাই কাজের জন্য দোকান ভাড়া নেয়, এরপর সেলাই কাজ ছেড়ে অন্য কাজে নিয়োজিত হওয়ার ইচ্ছা করে। মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) এটাকে ওজর বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা একজনের পক্ষে দুই কাজ একত্র করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সেখানে শ্রমদাতা হলো দু'জন। সুতরাং তাদের পক্ষে নিজ নিজ কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব।

কেউ যদি শহরে নিজের খেদমতের জন্য কাউকে নিযুক্ত করে এরপর সফর করার ইচ্ছা করে তাহলে সেটা ওজর বলে গণ্য হবে।

কেননা এটা অতিরিক্ত ক্ষতি অনিবার্য হওয়া থেকে মুক্ত নয়। কারণ সফরের অবস্থায় খেদমত অধিক কষ্টকর, আর সফর থেকে বিরত রাখাও ক্ষতিকর। আর এর কোনটাই চুক্তি বলে অবশ্য পালনীয় নয়। সুতরাং তা ওজর বলে গণ্য হবে।

একই বিধান হবে যদি নিঃশর্ত চুক্তি করে থাকে।

কেননা পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, এটা অবস্থিতির সাথে আবদ্ধ হবে।

পক্ষান্তরে যদি কোন ভূমি ইজারা প্রদান করে এরপর সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সেটাও ওজর হবে না। কেননা তার কোন ক্ষতি নেই।

কারণ ইজারাদাতার অনুপস্থিতির পরেও ইজারা গ্রহণকারীর পক্ষে সম্ভব চুক্তিকৃত বস্তু থেকে উপকার লাভ করা। হাঁ ইজারা গ্রহণকারী যদি সফরের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তা ওজর হবে। কেননা সে ক্ষেত্রে তাকে সফর থেকে বিরত রাখা হয় কিংবা বসবাস ছাড়াও ভাড়া চাপিয়ে দেয়া হয়। আর এটা ক্ষতি।

কতিপয় বিক্ষিপ্ত মাসআলা

কেউ যদি কোন যমি ইজারা নেয় কিংবা আরিয়াত নেয়, আর ফসল কাটার পর জমিতে থেকে যাওয়া ফসলে 'মুড়িতে' আগুন দেয় ফলে অন্য যমির 'কিছু' পুড়ে যায় তাহলে তার উপর ক্ষতির দায় আসবে না।

কেননা এই কারণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে সীমা লংঘনকারী নয়। সুতরাং সে নিজের বাড়ীতে কূপখননকারীর সদৃশ হল।

কারো কারো মতে এ সিদ্ধান্ত হবে যখন আগুন দেয়ার সময় বাতাস শান্ত ছিল, পরে তা পরিবর্তিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আগুন দেয়ার সময় যদি বাতাস অস্থির থাকে তাহলে দায়বহন করতে হবে। কেননা অগ্নি সংযোগকারী জানে যে, আগুন তার যমিতে স্থির থাকবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, দর্জী বা রঙকারিগর যদি তার দোকানে এমন কাউকে বসায় যাকে দিয়ে অর্ধেক মজুরির বিনিময়ে কাজ করানো হবে, এটা জায়িয আছে।

কেননা প্রকৃতপক্ষে এটা হলো সুনামভিত্তিক শরীকানা। কারণ দোকানদার তার সুনাম দ্বারা কাজ গ্রহণ করবে আর কারিগর তার দক্ষতা দ্বারা কাজ করবে। এভাবে স্বার্থ রক্ষা হবে। সুতরাং যা অর্জিত হবে তার পরিমাণ অজ্ঞতা চুক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

আর কেউ যদি এই শর্তে মক্কা পর্যন্ত কোন উট ভাড়া নেয় যে, তাতে একটি হাওদা বসানো হবে এবং দু'জন আরোহী নেয়া হবে, তবে তা বৈধ হবে, এবং সে প্রচলিত হাওদা ব্যবহার করতে পারবে।

আর কিয়াস মতে তা জায়িয হবে না। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত। এর কারণ (হাওদার ভার ও আয়তনগত অজ্ঞতা) তা কখনো কখনো বিবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, ইজারা চুক্তিটির মূল উদ্দেশ্য হলো আরোহী, আর তা পবিজ্ঞাত। হাওদা হল অনুবর্তী। আর তাতে যে অজ্ঞতা রয়েছে তা দুর হয়ে যাবে প্রচলিত হাওদা গ্রহণ দ্বারা। সুতরাং এই অজ্ঞতা বিবাদ পর্যন্ত গড়াবে না। একই বিধান হবে যদি উটের মালিক আরোহীদের বিছানা ও কাপড়চোপড়ের (সামান পত্রের) পরিমাণ না দেখে থাকে।

তিনি আরো বলেন, আর যদি উটওয়ালা নিজে হাওদা দেখে নেয় তাহলে সেটাই হবে সর্বোত্তম।

কেননা তা অধিকতর অজ্ঞতা বিদূরণকারী এবং সম্মতি সাব্যস্তকরণে অধিকতর নিকটবর্তী।

যদি নির্ধারিত পরিমাণ পাথেয় বহনের জন্য একটি উট ভাড়া নেয়, আর পথে তা থেকে কিছু আহার করে তাহলে যা আহার করেছে, তার পরিবর্তে সে সেই পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে পারে।

কেননা ইজারা গ্রহণকারী ইজারাদাতার প্রতি সমগ্র পথে নির্ধারিত পরিমাণ বোঝা বহনের হকদার হয়েছে। সুতরাং সে তা উশুল করতে পারে।

পাথেয় ছাড়া অন্যান্য কায়লী ও ওযনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

আর পাথেয় পুনঃ যোগ করা কারো কারো কাছে রীতিভুক্ত বিষয়। যেমন পানি পুনঃযোগ করার ক্ষেত্রে। সুতরাং নিঃশর্ততার উপর আমল করতে কোন বাধা নেই।

كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

অধ্যায় ঃ মোকাতাব

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যখন তার দাস বা দাসীর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের শর্ত আরোপ করে কিতাবাত করবে আর দাস বা দাসী তা গ্রহণ করবে তখন সে মোকাতাব হয়ে যাবে।

কিতাবাত চুক্তির বৈধতার প্রমাণ হলো আল্লাহ তাআলার বাণী—

فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۔

আর তোমরা তাদের সাথে কিতাবাত চুক্তি কর, যদি তাতে কল্যাণ দেখতে পাও।

আর ফকীহদের সর্বাম্মত মতে এটা ওয়াজিবী (বাধ্যতামূলক) আদেশ নয়, বরং মুস্‌তাহাব আদেশ। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা আয়াতকে শুধু মুবাহ করার অর্থে প্রয়োগ করলে ক্ষেত্রে 'কল্যাণ শর্ত' নিরর্থক হয়ে যায়। কারণ এই শর্ত ব্যতীতও কিতাবাত চুক্তি মুবাহ্ রয়েছে। মুস্‌তাহাব হওয়ার বিষয়টি ঐ শর্তের সাথে যুক্ত।

কারো কারো মতে আয়াতে উল্লেখিত কল্যাণ দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আযাদ হওয়ার পর তার দ্বারা যেন মুসলমানদের ক্ষতি না হয়। যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয় তাহলে তার সাথে কিতাবাত চুক্তি না করাই উত্তম, যদিও করলে তা বৈধ হবে।

আর গোলামের পক্ষ হতে কবুল করার শর্তারোপ এজন্য যে, তার উপর মাল লাযিম করা হচ্ছে। সুতরাং সে বিষয়ে তার দায়িত্ব গ্রহণ অপরিহার্য।

আর বিনিময়ের সমগ্র পরিমাণ পরিশোধ করা ছাড়া সে আযাদ হবে না। কেননা নবী (স) বলেছেন—

ايما عبد كوتب على مائة دينار فاداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ۔

যে কোন গোলামের সাথে এক'শ দীনারের শর্তে কিতাবাত করা হয় আর সে দশ দীনার ছাড়া সব আদায় করে ফেলেছে তবু সে গোলাম থেকে যাবে।

নবী (স) বলেছেন— المكاتب عبد مابقى عليه درهم ۔

মোকাতাব গোলাম থেকে যাবে যতক্ষণ তার যিম্মায় একটি দিরহামও থেকে যায়।

তবে মোকাতাবের আযাদ হওয়ার (সময় সম্পর্কে) সাহাবা কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা যা গ্রহণ করেছি সেটা হযরত যায়দ (রা)-এর মত।

নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করা দ্বারা মোকাতাব আযাদ হয়ে যাবে যদিও মনিব একথা না বলে থাকে যে, যখন তুমি তা পরিশোধ করবে তখন তুমি আযাদ।

কেননা চুক্তির বিধান সুস্পষ্ট রূপে ঘোষণা না করলেও তা সাব্যস্ত হয়ে যায়। যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

কিতাবাত চুক্তির নির্ধারিত পরিমাণ থেকে কিছু হ্রাস করা বাধ্যতামূলক নয় (তবে মনিবের জন্য তা উত্তম);বিক্রয় মূল্যের উপর কিয়াস করে এটা বলা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কিতাবাতের বিনিময় নগদ পরিশোধ করার শর্ত আরোপ করা জায়িয রয়েছে। আর মেয়াদী ও কিস্তির (শর্ত) করাও জায়িয রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, নগদ পরিশোধের শর্ত আরোপ করা জায়িয নয়; বরং কিস্তির সুযোগ দেওয়া কার্য। কেননা অল্প সময়ের মাঝে অর্পণ করতে সে অক্ষম। কারণ দাসত্বের কারণে। কিতাবাত চুক্তির পূর্বে তার মালিকনা লাভের যোগ্যতা ছিল না। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মূলনীতি অনুযায়ী 'বায় সালাম' চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (আযাদ হওয়ার সুবাদে) চুক্তির পূর্বে সে মালিকানা লাভের যোগ্য ছিল। সুতরাং সক্ষমতার সম্ভাবনা সাব্যস্ত রয়েছে। আর চুক্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা সক্ষমতা থাকার প্রমাণ। তাই চুক্তির পদক্ষেপ দ্বারা সক্ষমতা সাব্যস্ত হবে।

আমাদের দলীল হলো, সেই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ, যা ইতিপূর্বে আমরা তিলাওয়াত করেছি, যাতে কিস্তি প্রদানের শর্ত নেই।

তাছাড়া এই কারণে যে, এটা হলো বিনিময় চুক্তি। আর কিতাবাতের বিনিময়টি ল 'চুক্তির মাধ্যম' (معقودية) সুতরাং তার উপর সক্ষম হওয়ার শর্ত আরোপ না করার ক্ষেত্রে এটা বিক্রয় মূল্যের সদৃশ হবে।

আমাদের মূলনীতি অনুযায়ী 'বায় সালাম'-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে সালাম পণ্য হচ্ছে চুক্তিকৃত বিষয়। সুতরাং তার উপর সক্ষম থাকা অপরিহার্য।

তাছাড়া কিতাবাতের ভিত্তি হল শিথিলতার উপর। সুতরাং বাহ্যত: মনিব কর্তৃক তাকে সুযোগ প্রদানই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে 'বায় সালাম'-এর ভিত্তি হল কষাকষির উপর।

আর নগদ আদায়ের শর্তের ক্ষেত্রে (তাগাদা করার পর) পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকলেই তাকে দাসত্বের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক গোলাম যদি ক্রয়-বিক্রয়ের বোধসম্পন্ন হয়, তাহলে তার সঙ্গে কিতাবাত চুক্তি করা জায়িয হবে।

কেননা তার ক্ষেত্রে ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব প্রদান ও প্রস্তাব গ্রহণ) বিদ্যমান হতে পারে। কারণ বোধসম্পন্ন 'মানুষ' প্রস্তাব গ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্ন। আর এই মুআমেলাটি তার জন্য উপকারী।

এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র) আমাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর এই মতভিন্নতার ভিত্তি হলো অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের ব্যবসায়ের অনুমতি প্রদানের মাসআলা।

আর এ সিদ্ধান্ত ঐ অবস্থা থেকে ভিন্ন, যখন সে ক্রয় বিক্রয়ের বোধ রাখে না। কেননা তার পক্ষ থেকে প্রস্তাব গ্রহণ সাব্যস্ত হতে পারে না, ফলে চুক্তি সম্পাদিত হবে না। তাই তো অন্য কেউ যদি তার পক্ষ থেকে অর্থ পরিশোধ করেও দেয় তবু সে আযাদ হবে না। বরং পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত নেয়া হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি তার গোলামকে বলে যে, তোমার যিম্মায় আমি এক হাযার দিরহাম নির্ধারণ করলাম, যা তুমি কিস্তিতে আমাকে পরিশোধ করবে। প্রথম কিস্তি হবে এত, আর শেষ কিস্তি হবে এত। যখন তুমি তা পরিশোধ করবে তখন তুমি আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি অক্ষম হও তাহলে তুমি গোলাম থাকবে। তাহলে এটা হবে কিতাবাত চুক্তি।

কেননা সে কিতাবাতের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

আর যদি বলে যে, তুমি যদি প্রতিমাসে একশ দিরহাম করে এক হাযার আমাকে প্রদান কর তাহলে তুমি আযাদ। ইমাম আবু সোলায়মানের বর্ণনায় এটা কিতাবাত চুক্তি হবে। কেননা কিস্তি নির্ধারণ (মনিবের অনুকূলে গোলামের উপর ঋণ) অবশ্য সাব্যস্ত হওয়া প্রমাণ করে। আর তা কিতাবাত-এর মাধ্যমেই হতে পারে।

আর ইমাম আবু হাফছ কৃত মাবসূতের অনুলিপিতে রয়েছে যে, সে মোকাতাব হবে না। এ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে একবারে আদায় করার সাথে শর্ত করার উপর কিয়াস করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কিতাবাত চুক্তি যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন গোলাম মনিবের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে যাবে; তবে তার মালিকানা থেকে বের হবে না।

মনিবের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণ হলো কিতাবাত শব্দের (আভিধানিক) অর্থ সংযুক্তি সাব্যস্ত করা। সুতরাং তার নিয়ন্ত্রণ মালিকানাকে (যা এখন হাছিল হল) তার সত্তার মালিকানার সাথে (যা পরিশোধের সময় হাছিল হবে) যুক্ত করা হবে। কিংবা কিতাবাতের উদ্দেশ্য তথা 'বিনিময়' পরিশোধ সাব্যস্ত করা।

সুতরাং মোকাতাব ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকারী হবে এবং মনিব নিষেধ করা সত্ত্বেও সে সফর করতে পারবে।

আর মনিবের মালিকানা থেকে বের না হওয়ার কারণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীস।

তাছাড়া এই, কারণে যে, কিতাবাত চুক্তি হল, বিনিময় চুক্তি। আর বিনিময়ের ভিত্তি হল সমতা। অথচ তাৎক্ষণিক যুক্তি ছাড়া সমতা বিলুপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বিলম্বিত

করলে সমতা সাব্যস্ত হয়। কারণ গোলামের অনুকূলে এক প্রকার মালিকানা (তথা নিয়ন্ত্রণ মালিকানা) সাব্যস্ত হয়েছে। এর বিপরীতে মনিবের অনুকূলে গোলামের যিম্মায় এক প্রকার হক সাব্যস্ত হয়েছে। (অর্থাৎ কিতাবাতের বিনিময়)

এরপর যদি সে তাকে আযাদ করে দেয় তাহলে (কিতাবাতের সূত্রে নয়, বরং) আযাদ করার সূত্রে সে আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা মনিব তো তার দাসত্বের মালিক।

আর গোলামের যিম্মা থেকে কিতাবাতের বিনিময় রহিত হয়ে যাবে।

কেননা গোলাম তো শুধু তার অনুকুলে আযাদী হাছিল হওয়ার বিপরীত বিনিময় প্রদানের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছিল। আর তা বিনিময় ছাড়াই হাছিল হয়ে গেছে।

ইমাম কুদূরী বলেন, মনিব যদি তার মোকাতাব দাসীর সঙ্গে সহবাস করে তাহলে মনিবের উপর 'সহবাস বিনিময় অবশ্য' সাব্যস্ত হবে।

কেননা সে তার দেহসত্বার অংশগুলোর সঙ্গে (মনিবের তুলনায়) অধিকতর সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। যাতে সেই সুবাদে কিতাবাতের উদেশ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। আর মনিবের দিক থেকে কিতাবাতের উদ্দেশ্য হলো বিনিময় হস্তগত করা। আর দাসীর দিক থেকে উদ্দেশ্যে হল মনিবের বিনিময় লাভে উপর ভিত্তি করে মুক্তি অর্জন করা। আর সঙ্গম অঙ্গের সুযোগকে দেহসত্তার অংশভুক্ত ধরা হয়।

আর মনিব যদি তার উপর কিংবা তার সন্তানের উপর অপরাধ করে তাহলে মনিবের উপর অপরাধের দায় সাব্যস্ত হবে।

এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর যদি দাসীর মাল নষ্ট করে তাহলে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কেননা দাসীর উপার্জনের ব্যাপারে এবং দাসীর প্রাণ সত্তার ব্যাপারে মনিব আজনবীর (তৃতীয় ব্যক্তি) পর্যায়ভুক্ত। কারণ মনিবকে সেরূপ গণ্য না করা হলে মনিব তার জান-মাল নষ্ট করবে। ফলে চুক্তি দ্বারা উদ্দিষ্ট ফল লাভ করা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ফাসিদ কিতাবাত চুক্তি প্রসঙ্গে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুসলমান যদি তার গোলামের সাথে মদের বা শূকরের বিনিময়ে কিংবা গোলামের মূল্যের বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি করে তাহলে কিতাবাত চুক্তিটি ফাসিদ হবে।

প্রথমটির ক্ষেত্রে কারণ এই যে, মুসলমান মদ বা শূকরের হকদার হতে পারে না। কারণ তার জন্য সেটা 'মাল' নয়। সুতরাং তা 'বিনিময়' হতে পারে না, ফলে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কারণ এই যে, পরিমাণগত দিক থেকে এবং শ্রেণীগত দিক থেকে এবং গুণগত দিক থেকে গোলামের মূল্য অজ্ঞাত। সুতরাং অজ্ঞতা গুরুতর পর্যায়ে হল এবং কাপড়ের বিনিময়ে বা জন্তুর বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি করার মত হল।

তাছাড়া ফাফিদ কিতাবাত দ্বারা যা অবশ্য সাব্যস্তহয় এখানে তার প্রত্যক্ষ ঘোষণা রয়েছে। কারণ ফাসিদ কিতাবাত মূল্যকে অবশ্য সাব্যস্ত করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি সে মদ পরিশোধ করে তাহলে আযাদ হয়ে যাবে।

আর ইমাম যুফার (র) বলেন, মদের মূল্য আদায় করা ছাড়া আযাদ হবে না। কেননা ফাসিদ কিতাবাতের ক্ষেত্রে মূল্যটাই হল বিনিময়।

আর আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে, মদ পরিশোধ দ্বারা আযাদ হয়ে যাবে। কেননা এটা দৃশ্যগত বিনিময়। আবার মূল্য পরিশোধ দ্বারাও আযাদ হয়ে যাবে। কেননা সেটা গুণগত বিনিময়।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত যে, যদি বলে থাকে যে, যদি তুমি মদ বা শুকর প্রদান কর তাহলে তুমি আযাদ, তাহলে এ ক্ষেত্রে শুধু স্বয়ং মদ পরিশোধ দ্বারা মুক্ত হবে। কেননা সেক্ষেত্রে শর্তের সুবাদে মুক্তি হবে, কিতাবাত চুক্তির সুবাদে নয়। বিষয়টি মুরদারের বা রক্তের বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি করার মত হল।

আর যাহির রেওয়াতে এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

মদ ও শূকর এবং মুরদার ও রক্তের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, মদ ও শূকর মোটামুটি ভাবে মাল। সুতরাং এ দুটির ক্ষেত্রে কিতাবাত চুক্তির মর্ম বিবেচনা করা সম্ভব। আর কিতাবাত চুক্তির অবশ্য সাব্যস্ত বিধান হল শর্তকৃত বিনিময় আদায় করার সময় মুক্তি সাব্যস্ত হওয়া। পক্ষান্তরে মুরদার (ও রক্ত) কোন অবস্থাতেই মাল নয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে চুক্তির মর্ম বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই এতে শর্তের মর্ম বিবেচনা করা হবে। আর শর্তের মর্ম বিবেচনা করা সম্ভব হবে স্পষ্ট ভাবে শর্ত উল্লেখ করা হলে।

আর মদের বস্তুসত্তা পরিশোধ করা দ্বারা যখন আযাদ হয়ে যাবে তখন তার কর্তব্য হবে নিজের দাস সত্তার মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করা।

কেননা চুক্তি ফাসিদ হওয়ার কারণে নিজের দাসসত্তা ফেরত প্রদান করা তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ মুক্তি সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সুতরাং দাস সত্তার মূল্য ফেরত প্রদান করা ওয়াজিব হবে। যেমন ফাসিদ বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় দ্রব্য হালাক হয়ে গেলে (তার মূল্য ফেরত দেয়া ওয়াজিব হয়)।

তবে মূল্য চুক্তিতে নির্ধারণকৃত পরিমাণ থেকে কম হতে পারবে না। কিন্তু তার থেকে বেশী পরিমাণ হলে তা ওয়াজিব হবে।

কেননা এটা হলো ফাসিদ চুক্তি। সুতরাং বিনিময়কৃত দ্রব্য হালাক হলে তার মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে, পরিমাণ যাই হোক। যেমন ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। এটা এ কারণে যে, মনিব তো নির্ধারণকৃত পরিমাণের চেয়ে কমে সম্মত নয়। পক্ষান্তরে গোলাম নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ততে সম্মত রয়েছে, যাতে তার মুক্তি লাভের হক সম্পূর্ণ বাতিল না হয়ে যায়। সুতরাং দাসসত্তার মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে, তার পরিমাণ যাই হোক।

আর দাসসত্তায় মূল্যের বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি করলে মূল্য পরিশোধ করা দ্বারা আযাদ হয়ে যাবে। কেননা মূল্যটাই হলো কিতাবাত চুক্তির বিনিময়। আর মূল্যের ব্যাপারে চুক্তির মর্ম বিবেচনা করা সম্ভব। আর মূল্যে অজ্ঞতার প্রভাব দেখা দেবে চুক্তি ফাসিদ হওয়ার ক্ষেত্রে, (চুক্তি বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে নয়।)

পক্ষান্তরে একটি কাপড়ের বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি করলে কাপড় প্রদান করা দ্বারা আযাদ হবে না।

কেননা সে ক্ষেত্রে কাপড়ের শ্রেণী বিভিন্নতার কারণে চুক্তিকারীর উদ্দেশ্য অবগত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তার ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া ছাড়া মুক্তি সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, অদ্রূপ যদি গোলামের সাথে কোন নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি করে যা গোলামের মালিকানাধীন নয়, তাহলে কিতাবাত চুক্তি বৈধ হবে না।

কেননা সে তা অর্পণ করতে সক্ষম হবে না। এখানে ইমাম মুহম্মদ (র)-এর উদ্দেশ্য হলো এমন বস্তু, যা নির্ধারণ করলে নির্ধারিত হয়। সুতরাং মনিব বলে, এক এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে তোমার সাথে কিতাবাত করলাম আর তা গোলাম ছাড়া অন্য কারো মালিকানাধীন হয়, তাহলে কিতাবাত চুক্তি জায়িয হবে। কেননা দিরহাম বিনিময় চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয় না। সুতরাং কিতাবাত চুক্তির সম্পর্ক হবে গোলামের যিম্মায় সাব্যস্ত অনির্ধারিত দিরহামের সাথে এবং চুক্তি বৈধতা লাভ করবে।

হাসান বিন যিয়াদ ইমাম আবু হানীফা (র) হতে এই মত বর্ণনা করেছেন যে, তা জায়িয হবে এবং যখন সে ঐ বস্তুটির মালিক এবং মনিবের হাতে অর্পণ করবে তখন

আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি (তা অর্পণ করতে) ব্যর্থ হয়, তাহলে সে দাসত্বের দিকে ফিরে যাবে।

কেননা উল্লেখকৃত জিনিসটি মাল, আর অর্পণ করার সক্ষমতা 'কল্পনা' করা যায়। সুতরাং এটা (স্বামীর মালিকানা বহির্ভূত গোলামকে) মোহর ধার্য করার সদৃশ হল।

(প্রকাশিত বর্ণনা থেকে) আমাদের বক্তব্য এই যে, লেনদেন বিষয়ক চুক্তির ক্ষেত্রে বস্তুসত্তা হলো চুক্তিকৃত জিনিস। আর চুক্তিকৃত জিনিস অর্পণ করার সক্ষমতা চুক্তির সিদ্ধতার শর্ত, যদি চুক্তিটি রহিতকরণ যোগ্য হয় (এ শর্তটা বিবাহ চুক্তিকে পরিহার করার জন্য) যেমন বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে।

বিবাহের মোহরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিবাহের মূখ্য উদ্দেশ্য যা (অর্থাৎ সন্তান জন্মদান) সেটার ক্ষমতাই তো শর্ত নয়। সুতরাং যেটা অনুবর্তী সেটার ক্ষেত্রে তো আরো স্বাভাবিক ভাবেই সক্ষমতায় শর্ত হবে না।

তবে উক্ত বস্তুটির মালিক যদি গোলামের উদ্দেশ্যে কথিত মনিবের বক্তব্যকে অনুমোদন করে, তাহলে ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে চুক্তিটি জায়িয হবে।

কেননা অনুমোদনের ক্ষেত্রে তো বিক্রয় চুক্তিও বৈধ হয়। সুতরাং কিতাবাত চুক্তি আরো স্বাভাবিকভাবেই বৈধ হবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, (মালিক অনুমোদন করা সত্ত্বেও) জায়িয হবে না। এ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে অনুমোদন না দেয়ার অবস্থার উপর কিয়াস করে। যোগসূত্র এই যে (আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে) কিতাবাত চুক্তি (মোকাতাব গোলামের অনুকূলে) উপার্জনের মালিকানা সাব্যস্ত করে না। অথচ সেটাই (কিতাবাত চুক্তির তাৎক্ষণিক) উদ্দেশ্য। কেননা উপার্জনের মালিকানা সাব্যস্ত করা হয় তা থেকে পরিশোধ করার প্রয়োজনে। আর বিনিময়টি নির্ধারিত বস্তু হওয়ার ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন নেই। আর আগেই আমরা বর্ণনা করেছি যে, আলোচ্য মাসআলাটি নির্ধারিত বস্তু কেন্দ্রিক।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত যে, মালিক অনুমোদন দিক বা না দিক উল্লেখিত কিতাবাত চুক্তি বৈধ হবে।

তবে (মালিকের পক্ষ হতে) অনুমোদনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বস্তুটি মনিবের কাছে অর্পণ করা ওয়াজিব হবে। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে। আর উভয়ের মাঝে যোগসূত্র হল মাল হওয়ার কারণে (নির্ধারিত বস্তুটিকে বিনিময় রূপে) উল্লেখের বৈধতা।

আর যদি (মালিক অনুমোদন না করার পর) মোকাতাব নির্ধারিত বস্তুটির মালিকানা অর্জন করতে সক্ষম হয় সেক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সে তা পরিশোধ করলেও আযাদ হবে না।

এই বর্ণনা মতে পূর্ববর্তী চুক্তিটি সম্পন্ন হবে না। তবে যদি মনিব বলে যে, যদি তুমি (সেটি) আমাকে প্রদান কর তাহলে তুমি আযাদ। সেক্ষেত্রে শর্ত অস্তিত্বলাভ করার ফল হিসাবে সে আযাদ হবে। (কিতাবাত চুক্তির ভিত্তিতে নয়।)

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর পক্ষ থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তাঁর পক্ষ থেকে আরেকটি বর্ণনা এই যে, মনিব তা বলুক বা না বলুক (বস্তুটি তার হাতে অর্পণ করলে) আযাদ হয়ে যাবে। কেননা নির্ধারণকৃত মাল হওয়ার কারণে (পূর্ববর্তী কিতাবাত চুক্তি ফাসিদ হওয়া সত্ত্বেও সম্পন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং শর্তকৃত বস্তুটি আদায় করা দ্বারা সে আযাদ হয়ে যাবে।

আর যদি গোলামের হাতে বিদ্যমান (অর্থাৎ অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের হিসাবে তার উপার্জিত) কোন বস্তুর বিনিময়ে তার সাথে কিতাবাত চুক্তি করে তাহলে সে সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এটা الكتابة على الاعيان। (গোলামের উপার্জিত বস্তুর বিনিময়ে কিতাবাত)-এ মাসআলা নামে পরিচিত। মাবসূত কিতাবে তা আলোচিত হয়েছে। কিফায়াতুল মুনতাহী কিতাবে উভয় বর্ণনার কারণ আমরা আলোচনা করেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, আর মনিব যদি এই শর্তে একশ দীনারের বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি করে যে, মনিব গোলামকে একটি অনির্ধারিত গোলাম ফেরত প্রদান করবে, তাহলে কিতাবাত চুক্তি ফাসিদ হবে। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তা জায়িয হবে। এবং একশ দীনারকে মোকাতাবের মূল্য এবং একটি মধ্যস্তরের গোলামের মূল্যের মাপে (আনুপাতিক হারে) বণ্টন করা হবে। অত:পর তা থেকে মধ্যস্তরের গোলামের হিস্সা বাতিল হয়ে যাবে। আর অবশিষ্ট পরিমাণের হিনিময়ে সে মোকাতাব হবে। কেনন, নিঃশর্ত গোলাম কিতাবাত চুক্তির বিনিময় হওয়ার গোগ্যতা রাখে, তখন সেটা দ্বারা মধ্যস্তরের গোলাম উদ্দেশ্যে হবে। সুতরাং সেটা কিতাবাতের বিনিময় থেকে ব্যতিক্রম করা দুরুস্ত। যে কোন চুক্তির বিনিময় দ্রব্যের ক্ষেত্রে এটাই হলো মূলনীতি।

তারফায়নের দলীল এই যে, গোলামকে দীনার থেকে ব্যতিক্রম করা সম্ভব নয়। তার মূল্যকে ব্যতিক্রম করা যায়। আর গোলামের মূল্য অজ্ঞাত হওয়ার কারণে কিতাবাত চুক্তির বিনিময় হতে পারে না, সুতরাং তাতে ব্যতীতক্রমও করা যাবে না।

ইমাম কুদূরী বলেন, যদি গোলামের সঙ্গে গুণবর্ণনাহীন একটি প্রাণীর বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি করে, তাহলে কিতাবাত চুক্তি জায়িয হবে—সূক্ষ্ম কিয়াস মতে।

এর অর্থ এই যে, প্রাণীটির শ্রেণী বর্ণনা করা হলো কিন্তু প্রকার ও গুণ বর্ণনা করা হলো না।

আর সেটাকে মধ্যস্তরের জন্তুর দিকে অভিমুখী করা হবে এবং মনিবকে ...শ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে।

বিবাহ প্রসঙ্গে তা আলোচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি শ্রেণী আলোচনা না করে। যেমন শুধু 'জন্তু' বললো, তাহলে কিতাবাত চুক্তি জায়িয হবে না। কেননা জন্তু শব্দটি বিভিন্ন শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে অজ্ঞতা প্রকট হবে আর যদি শ্রেণী উল্লেখ করে গোলাম বা বা খাদিম বলে তাহলে এতে অজ্ঞতা সামান্য রয়েছে। আর এ ধরনের

সামান্য অজ্ঞতা কিতাবাতের ক্ষেত্রে সহনীয়। অর্থাৎ কিতাবাত চুক্তির বিনিময়ের অজ্ঞতাকে কিতাবাত চুক্তির মেয়াদের অজ্ঞতার উপর কিয়াস করা হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এটা জায়িয হবে না। এবং তাই হল কিয়াসের দাবী। কেননা কিতাবাত চুক্তি হলো বিনিময় চুক্তি। সুতরাং তা বিক্রয় চুক্তির সদৃশ হবে।

আমাদের দলীল এই যে,এটা অ-মালের বিপরীতে মালের বিনিময়, তবে এমনভাবে যে, সেই মালের উপর থেকে মালিকানা রহিত করা হয়। সুতরাং এটা বিবাহে সৃদশ হল। আর উভয়ের মাঝে যোগসূত্র এই যে, উদারতার উপর তাদের ভিত্তি। পক্ষান্তরে বিক্রয় চুক্তির ভিত্তি হল কষাকষির উপর।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, নাসরানী মনিব যদি তার গোলামের সঙ্গে মদের বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি করে তাহলে জায়িয হবে।

এর অর্থ এই যে, মদ যদি নির্ধারিত পরিমাণে হয় আর গোলাম যদি ফাসিক হয়। কেননা মদ তাদের জন্য মাল, যেমন সিরকা আমাদের জন্য। আর দুজনের মধ্যে যেই ইসলাম গ্রহণ করবে, মনিব মদের মূল্য পাবে। কেননা মদের মালিক বানানো এবং মদের মালিক হওয়া থেকে মুসলমান নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত। আর মদ অর্পণ করার ক্ষেত্রে তা-হয়ে থাক। কেননা মদ হলো অনির্ধারিত।

সুতরাং কিতাবাত চুক্তির বিনিময় অর্পণ করতে অক্ষম হবে। তাই তার উপর এর মূল্য ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে দুই যিম্মী যদি মদ কেনা বেচা করে আর একজন মুসলমান হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে, যেমন কেউ কেউ বলেছেন।

কেননা কিতাবাত চুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্য বিনিময় রূপে গণ্য হতে পারে। কারণ যদি একটি খাদিমের বিনিময়ে কিতাবাত করে আর তার মূল্য পরিশোধ করে তাহলে মনিবকে তা কবুল করতে বাধ্য করা হবে। সুতরাং মূল্যের উপর চুক্তির স্থিতি হতে পারে। পক্ষান্তরে বিক্রয় চুক্তি বস্তুর বাজার মূল্যের উপর সিদ্ধ রূপে সম্পন্ন হয় না। সুতরাং পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেল।

আর যদি খ্রিষ্টান মনিব মদের মূল্য কবজা করে তাহলে মোকাতাব আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা কিতাবাত চুক্তিতে বিনিময়ের মর্ম রয়েছে। সুতরাং দুই বিনিময় দ্রব্যের একটি যখন মনিবের হাতে পৌঁছে গেলো তখন অপর বিনিময় বস্তুটি গোলামের অনুকূলে নিরাপদ হয়ে যাবে। আর তা মুক্তি লাভের মাধ্যমে হবে।

পক্ষান্তরে গোলাম যদি মুসলমান হয় তবে কিতাবাত চুক্তি বৈধ হবে না।

কেননা মুসলমান মদের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য নয়। তবে যদি তা আদায় করে তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। আর ইতিপূর্বে তা আমরা বর্ণনা করেছি। আল্লাহই অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ : মোকাতাব যা করার অধিকার রাখে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোকাতাবের জন্য বিক্রয় করার, ক্রয় করার এবং সফর করার অধিকার রয়েছে ।

কেননা কিতাবাতের অবশ্য সাব্যস্ত বিধান এই যে, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার দিক থেকে সে স্বাধীন হবে। আর নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয় এমন নিরংকুশ মুআমেলার মালিকানা দ্বারা, যা তাকে তার উদ্দেশ্যে উপনীত করবে। আর সেট হলো চুক্তি বিনিময় পরিশোধের মাধ্যমে মুক্তি লাভ। আর ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সফর সম্পর্কে সুযোগ হয় না। তখন সফর করার প্রয়োজন হয়।

তার মুকাতাব ক্রয় মূল্যের চেয়ে কমদামে বিক্রি করার অধিকার রাখে। কেননা এটা ব্যবসায়ীদের প্রচলিত রীতি। কারণ ব্যবসায়ী একটি বিক্রয় চুক্তিতে ছাড় দেয়, অন্য চুক্তিতে লাভ করার জন্য।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি মনিব তার উপর শর্ত আরোপ করে যে, কুফা থেকে সে বের হতে পারবে না, তাহলে সুক্ষ্ম কিয়াস মতে সে বের হতে পারবে।

কেননা এটা হল চুক্তির চাহিদার পরিপন্থী শর্ত। আর চুক্তির চাহিদা হল নিরংকুশভাবে নিয়ন্ত্রণ মালিকানা লাভ করা আর তার নিজের সত্তার ব্যাপারে ও তার উপার্জনের ব্যাপারে বিশেষ অধিকার সাব্যস্ত হওয়া। সুতরাং শর্তটি বাতিল হবে আর চুক্তিটি সিদ্ধ হবে। কেননা এটা এমন শর্ত যা চুক্তির মূল স্তম্ভের (অর্থাৎ বিনিময় দ্রব্য দ্বয়ে) অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। আর এ ধরনের শর্ত দ্বারা কিতাবাত চুক্তি ফাসিদ হয় না। চুক্তি ফাসিদ হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তের এই শ্রেণী বিভাজন এজন্য যে, কিতাবাত চুক্তি যেমন বিক্রয় চুক্তির সদৃশ তেমনি বিবাহ চুক্তিরও সদৃশ। সুতরাং চুক্তির মূল্য স্তম্ভের অনুপ্রবিষ্ট শর্তের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বিক্রয় চুক্তির অনুবর্তী করেছি। যেমন অনির্দিষ্ট খেদমতের শর্ত আরোপ করল।

আর চুক্তির মূল স্তম্ভের অনুপ্রবিষ্ট নয় এমন শর্তের ক্ষেত্রে বিবাহ চুক্তির অনুবর্তী করেছি। দুই সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে এটাই হলো মূলনীতি।

কিংবা আমরা বলবো যে, গোলামের দিক থেকে কিতাবাত চুক্তির অর্থ হল মুক্তি লাভ, এতে রয়েছে মালিকানা, রহিতকরণ। আর বের না হওয়ার শর্তটি গোলামের সঙ্গে বিশিষ্ট। সুতরাং এই শর্তের ক্ষেত্রে কিতাবাত চুক্তিটিকে মুক্তিদান বিবেচনা করা হয়েছে। আর মুক্তি দান ফাসিদ শর্ত দ্বারা ফাসিদ হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিবের অনুমতি ছাড়া সে বিবাহ করতে পারবে না।

কেননা কিতাবাত চুক্তির অর্থ হলো মালিকানা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়োজনে নিষেধাজ্ঞা উন্মোচন। আর বিবাহ করা উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার মাধ্যম নয়। তবে মনিবের অনুমতিক্রমে তা বৈধ হবে। কেননা মালিকানা তো তারই রয়েছে।

আর সে হেবা করতে এবং সাদাকা করতে পারবে না; তবে সামান্য জিনিস করতে পারবে।

কেননা হেবা ও সাদাকা হচ্ছে স্বেচ্ছা দান। অথচ সে মালে মালিক না; যাতে অন্যকে মালিক বানাতে পারে। তবে সামান্য জিনিস ব্যবসায়ের অনিবার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কারণ গ্রাহকদের (মনোরঞ্জনের জন্য) আপ্যায়ন করা বা কোন কিছু 'আরিয়াত প্রদান করা ছাড়া উপায় থাকে না; যাতে ধনী ব্যবসায়ীরা তার কাছে আসে আর যে ব্যক্তি কোন কিছুর অধিকার লাভ করেছে, সে তার অনুবর্তী অনিবার্য প্রয়োজনেরও মালিকনাও লাভ করে।

আ সে কারো কফিল হতে পারে না।

কেননা এটা নিছক স্বেচ্ছা কর্ম যা ব্যবসায়ের বা উপার্জনের প্রয়োজনভুক্ত নয়। সুতরাং জানের ও মালের উভয় প্রকার কাফালা গ্রহণের সে অধিকার লাভ করবে না। কেননা এর সবটাই হলো স্বেচ্ছা কর্ম।

আর করয প্রদান করতে পারবে না।

কেননা এটা স্বেচ্ছা কর্ম, উপার্জনের অনুবর্তী কিছু নয়। যদি কোন কিছুর বিনিময়ে হেবা করে তাহলে সহী হবে না। কেননা প্রাথমিক অবস্থায় এটা সেচ্ছা দান।

মোকাতাব যদি তার দাসীকে বিবাহ দেয় তাহলে তা জায়িয হবে।

কেননা এই বিবাহ দ্বারা যেহেতু সে মাহরের মালিকানা অর্জন করে সেহেতু এটা হল মাল উপার্জন। সুতরাং তা কিতাবাত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তদ্রূপ তার গোলামের সঙ্গে কিতাবাত চুক্তি করা জায়িয হবে।

কিয়াসের দাবী অবশ্য জায়িয না হওয়া। এবং ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এরও এ মত।

কেননা কিতাবাত চুক্তির পরিণতি হল মুক্তি। আর মোকাতাব গোলাম আযাদ করার যোগ্যতা রাখে না। যেমন, অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দান (এর যোগ্য নয়)।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, কিতাবাত চুক্তি হল মাল উপার্জনের চুক্তি। সুতরাং সে তার অধিকারী হবে। যেমন দাসীকে বিবাহ দেওয়া এবং বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন। বরং কখনো কখনো তা বিক্রয় চুক্তির চেয়েও বেশী লাভজনক হয়। কেননা কিতাবাত চুক্তি লাভ তার হাতে বিনিময় পৌছার পরই শুধু মালিকানা লুপ্ত করে। পক্ষান্তরে বিক্রয় চুক্তি, তার হাতে বিনিময় আদায়ের আগেই মালিকানা বিলুপ্ত করে। এ কারণেই বাবা ও অছী বাচ্চার গোলামের সঙ্গে কিতাবাত চুক্তি করতে পারে।

অত:পর প্রথম মোকাতাব তার গোলাম এর জন্য ঐ সকল বিষয় অবশ্য সাব্যস্ত করবে, যা তার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে। তবে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা মোকাতাবের জন্য যা সাব্যস্ত হয়েছে তার চেয়ে বেশী সাব্যস্ত করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, প্রথম মোকাতাব আযাদ হওয়ার আগেই যদি দ্বিতীয় মোকাতাব তার অর্থ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে তার ওয়ালা সম্পর্ক (মূল) মনিবের সঙ্গে স্থাপিত হবে।

কেননা তার মাঝে মূল মনিবের এক ধরনের মালিকানা রয়েছে। এবং আনুষাঙ্গিকভাবে এই মুক্তিদানকে মূল মনিবের দিকে সম্পৃক্ত করার বৈধতা রয়েছে। সুতরাং চুক্তি সম্পাদনকারীর যোগ্যতার বিদ্যমানতার কারণে যখন তার দিকে মুক্তিদানের সম্পৃক্তি সম্ভব হল না তখন মূল মনিবের দিকে সম্পৃক্ত করা হবে। যেমন অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি কোন কিছু ক্রয় করে, তবে তার মালিকানা মনিবের অনুকূলে সাব্যস্ত হয়।

তিনি আরো বলেন, এরপর যদি প্রথম মোকাতাব অর্থ পরিশোধ করে এবং মুক্তিলাভ করে, ওয়ালা সম্পর্ক তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না।

কেননা মূল মনিবকে আযাদকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে গেছে। আর ওয়ালা সম্পর্ক আযাদকারী থেকে সরে আসে না।

আর যদি দ্বিতীয় জন প্রথম জনের মুক্তির পরে পরিশোধ করে তাহলে তার ওয়ালা সম্পর্ক প্রথম মোকাতাবের জন্য হবে।

কেননা কিতাবাত চুক্তি সম্পাদনকারী (প্রথম মোকাতাব) ওয়ালা সম্পর্ক লাভের উপযুক্ত। আর সেই হল মুক্তির উৎস সুতরাং ওয়ালা সম্পর্ক তার অনুকূলেই সাব্যস্ত হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মোকাতাব যদি তার গোলামকে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দান করে, কিংবা তার দাস সত্তাকে তার কাছেই বিক্রি করে, কিংবা গোলামকে বিবাহ করায়, তাহলে তা জায়িয হবে না।

কেননা এ জিনিসগুলো উপার্জনভুক্ত নয় এবং উপার্জনের অনুবর্তী বিষয়ও নয়। প্রথমটার কারণ এই যে, এটা হলো গোলামের দাস সত্তা থেকে মালিকান রহিতকরণ। এবং নিঃস্ব ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ সাব্যস্তকরণ। সুতরাং বিনিময় ছাড়া মালিকানা বিলুপ্তির সদৃশ হলো।

দ্বিতীয়টিও একই রকম। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটা হল মালের বিনিময়ে মুক্তিদান।

আর তৃতীয়টি হল গোলামের মূল্যমান হ্রাস করা এবং তার মাঝে দোষসৃষ্টি করা এবং তাকে মাহর ও ভরণ-পোষণের দায়গ্রস্ত করা।

দাসীকে বিবাহ দানের বিয়ষটি ভিন্ন। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মাহর লাভের কারণে এটা হল অর্থ উপার্জন।

তিনি আরো বলেন : তদ্রূপ পিতা এবং অছী শিশুর গোলামের ক্ষেত্রে মোকাতাবের সমতুল্য।

কেননা মোকাতাবের মত তারাও শিশুর অনুকূলে উপার্জন করার অধিকারী।

তাছাড়া দাসীকে বিবাহদান এবং কিতাবাত চুক্তি সম্পাদনে শিশুর জন্য কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু এদুটি ছাড়া অন্যগুলোতে শিশুর কল্যাণ নেই। অথচ তাদের অভিভাবকত্ব হল কল্যাণ ভিত্তিক।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে অনুমতি ছাড়া গোলামের পক্ষে এগুলোর কিছু করা জায়িয হবে না।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, সে তার দাসীকে বিবাহ দিতে পারে।

মোদারিব সমশরীকানার শীরকদার ও ইনান শরীকানার শরীকদার-এর বিষয়টিতেও এ মত পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামকে মোকাতাবের উপর কিয়াস করেছেন এবং ইজারা চুক্তির সঙ্গে বিবেচনা করেছেন।

তারফায়নের দলীল এই যে, অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম ব্যবসা করার অধিকারী। আর এটা (অর্থাৎ দাসীকে বিবাহদান) ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত কাজ নয়। পক্ষান্তরে মোকাতাব উপার্জনের অধিকারী। আর এটা উপার্জন।

তাছাড়া দাসীকে বিবাহ দান হচ্ছে যা মাল নয় তার বিপরীতে মালের বিনিময়। সুতরাং এটাকে কিতাবাত চুক্তির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে, ইজারা চুক্তির সঙ্গে নয়। কেননা ইজারা চুক্তি হলো মালের বিপরীতে মালের বিনিময়। এ কারণেই তো এরা কেউ গোলামকে বিবাহ করাতে পারে না।

পরিচ্ছেদ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোকাতাব যদি তার বাবাকে বা তার পুত্রকে ক্রয় করে তাহলে তারা তার কিতাবাত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা সে আযাদ করার যোগ্যতা সম্পন্নন না হলে কিতাবাত চুক্তি করার যোগ্যতা সম্পন। সুতরাং যথাসম্ভব নিকটাত্মীয়তার হক রক্ষা করার দিকটি সাব্যস্ত করার জন্য তাকে কিতাবাত চুক্তিকারী গণ্য করা হবে। দেখুন না, স্বাধীন ব্যক্তি যেহেতু আযাদ করার অধিকারী, সেহেতু তার বিপক্ষে এ ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

আর যদি সে এমন কোন মাহরাম আত্মীয়কে ক্রয় করে, যার সঙ্গে জন্মদান সম্পর্কে নেই, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে তার কিতাবাত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সাহেবায়ন (র) জন্মদানগত আত্মীয়তার উপর কিয়াস করে বলেন, যে সে কিতাবাত চুক্তিতে দাখেল হয়ে যাবে। কেননা আত্মীয়তার হক রক্ষার অবশ্য সাব্যস্তি উভয়কে একত্র করে। এ কারণেই স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুক্তিলাভের অধিকারের ব্যাপারে উভয় শ্রেণী পৃথক হয় না।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, মোকাতাবের উপার্জনের অধিকার রয়েছে, প্রকৃত মালিকানার অধিকার নেই, তবে উপার্জনই জন্মদানগত আত্মীয়তার ক্ষেত্রে রক্ষার হক লাভের জন্য যথেষ্ট। এ জন্যই তো উপার্জনে সক্ষম হলে তাকে পিতা ও সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য (শরীয়তের পক্ষ হতে) সম্বোধন করা হয়। এ দুজন ছাড়া অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়ের ক্ষেত্রে শুধু উর্পাজনকে যথেষ্ট মনে করা হয় না। এ জন্যই ভাইয়ের ভরণ-পোষণ শুধু সচ্ছল ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়।

তাছাড়া (জন্মদানগত সূত্র ছাড়া) এই মাহরাম আত্মীয়তা চাচাত ভাইদের দূর আত্মীয়তা এবং জন্মদানগত নিকটত্মীয়তার মধ্যবর্তী আত্মীয়তা। তাই মুক্তির ক্ষেত্রে আমরা এদেরকে দ্বিতীয়টির সঙ্গে যুক্ত করলাম এবং কিতাবাত ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত করলাম।

আর এটাই অধিক সংগত। কেননা কার্যকারিতার ক্ষেত্রে মুক্তি কিতাবাত চুক্তির চেয়ে অধিকতর দ্রুত। তাই তো দুই শরীকের একজন যদি কিতাবাত চুক্তি করে তাহলে অপরজন তা রহিত করতে পারবে। পক্ষান্তরে আযাদ অপর জনের তা রহিত করার অধিকার নেই।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন, মোকাতাব যদি নিজের উম্মে ওয়ালাদকে ক্রয় করে তাহলে উম্মে ওয়ালাদের সন্তানও কিতাবাত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা জায়িয হবে না।

এর অর্থ এই যে, যদি উম্মে ওয়ালাদের সঙ্গে তার সন্তানও থাকে। আর সন্তান কিতাবাত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রয় করা বৈধ না হওয়ার কারণ এই যে, এই বিধানের ক্ষেত্রে সে সন্তানের অনুবর্তী। নবী (সা) বলেছেন أعتقها ولدها (তার সন্তান তাকে মুক্তিদান করেছে)।

আর যদি উম্মে ওয়ালাদের সঙ্গে কোন সন্তান না থাকে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে একই বিধান হবে। কেননা সে তো উম্মে ওয়ালাদ। ইমাম আবু হানীফা (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

তাঁর দলীল এই যে, কিয়াসের দাবী হলো তার সঙ্গে সন্তান থাকা সত্ত্বেও তাকে বিক্রি করা জায়িয হওয়া। কেননা মুকাতাবের উপার্জিত মাল স্থগিত। সুতরাং তার মালের সঙ্গে এমন কোন বিধান সম্পৃক্ত হতে পারে না, যা রহিত হওয়ার যোগ্য নয়। তবে তার সঙ্গে যদি সন্তান থাকে তখন এই হক সাব্যস্ত হয়, সন্তানের মাঝে তা সাব্যস্ত হওয়ার ভিত্তিতে তার অনুবর্তী রূপে। পক্ষান্তরে সন্তান ছাড়া যদি উম্মে ওয়ালাদের মাঝে এই হক সাব্যস্ত হয়, তাহলে সেটা সাব্যস্ত হবে স্বকীয়রূপে এবং প্রাথমিকভাবে; অথচ কিয়াস তা নাচক করে।

আর যদি মোকাতাবের কোন দাসী তার ঔরসে কোন সন্তান প্রসব করে তাহলে ঐ সন্তান তার কিতাবাত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।

কারণ সেটাই, যা আমরা তার ক্রয়কৃত সন্তান প্রসঙ্গে বলেছি। সুতরাং ঐ সন্তানের হুকুম তার নিজের হুকুমের অনুরূপ হবে।

আর ঐ সন্তানের উপার্জন তার নিজের উপার্জন বলে গণ্য হবে।

কেননা সন্তানের উপার্জন হল মোকাতাবের উপপর্জন থেকে উপার্জিত। এবং নসব (ও পিতৃত্ব) দাবী করার পূর্বে এই বিধান কার্যকর থাকে। সুতরাং এই দাবীর কারণে সন্তানের উপার্জনের সঙ্গে তার বিশিষ্টতা রহিত হবে না।

অদ্রূপ একই বিধান হবে যদি মোকাবাত দাসী কোন সন্তান প্রসব করে।

কেননা 'অবিক্রয়যোগ্য' হওয়ার হক তার মাঝে 'স্থায়ী' রূপে বিদ্যমান। সুতরাং তার সন্তানের মাঝেও সেটা সম্প্রাসারিত হবে। যেমন মোদাব্বার হওয়া এবং উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার ক্ষেত্রে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি তার দাসীকে তার দাসের সঙ্গে বিবাহ দেয় এরপর উভয়ের সঙ্গে কিতাবাত চুক্তি করে, অত:পর ঐ স্বামীর ওরসে কোন সন্তান প্রসব করে তাহলে সন্তান দাসীর কিতাবাত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সন্তানের উপার্জন দাসীর হবে।

কেননা মায়ের অনুবর্তীতার অগ্রাধিকার রয়েছে। এ কারণেই দাসত্ব ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সে মায়ের অনুবর্তী হয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মোকাতাব যদি তার মনিবের অনুমতিক্রমে এমন কোন নারীকে বিবাহ করে, যে নিজেকে স্বাধীন বলে দাবী করে ,পরে সে মোকাতাব স্বামীর ঔরসে সন্তান প্রসব করে। অত:পর তার কোন হকদার বের হয়, তাহলে দাসীর সন্তানের দাস হবে। মোকাতাব তাদের মূল্য পরিশোধ করেও তাদের নিতে পারবে না।

অদ্রূপ একই বিধান হবে যদি মনিব তার গোলামকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করে (আর উপরোক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়)। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে স্ত্রী লোকটির সন্তনেরা স্বাধীন হবে।

কেননা এই অধিকার সাব্যস্তির কারণ সৃষ্টিতে মোকাতাব (ও গোলাম) স্বাধীন মনিবের সাথে শরীক হয়েছে। আর কারণটি হল প্রতারিত হওয়া। কেননা সে তো সন্তানদের স্বাধীনতা লাভের জন্যই এই স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয়েছিল।

শায়খায়নের দলীল এই যে, সন্তানটি জন্ম হয়েছে দুজন দাস ও দাসীর মাঝে। সুতরাং সেও দাস হবে। এটা এ কারণেই যে, মূলনীতি হলো, দাসত্ব ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সন্তান মায়ের অনুবর্তী হয়। পিতা স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে এই মূলনীতি আমরা বর্জন করেছি সাহাবা কেরামের ইজমা -এর কারণে। কিন্তু এটা তো সেই পর্যায়ভুক্ত নয়।

কেননা সেই মাসআলায় দাবীদার মনিবের হক নগদ মূল্য দ্বারা আবদ্ধ। অথচ ধোকাগ্রস্ত মোকাতাব বা গোলামের এই মাসআলায় মুক্তিলাভ পরবর্তী সময়ের সাথে বিলম্বিত মূল্য দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং এখানে বিধান মূলনীতির উপর বহাল থাকেব এবং সন্তান মোকাতাব বা গোলাম পিতার সঙ্গে যুক্ত হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মোকাতাব যদি মনিবের অনুমতি ছাড়া নিজের মালিকানা সূত্রে কোন দাসীর সঙ্গে সহবাস করে, অত:পর দাসীর কোন হকদার বের হয়, তাহলে তার উপর 'উকুর' (মোহর বিনিময়) ওয়াজিব হবে এবং কিতাবাত অবস্থায় তা তার কাছ থেকে নেয়া হবে। আর যদি বিবাহ সূত্রে সহবাস করে থাকে তাহলে স্বাধীন হওয়ার আগে নেয়া হবে না। ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম সম্পর্কেও একই হুকুম।

(মালিকানা সূত্র ও বিবাহ সূত্রের মাঝে) পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথম সূরতে ঋণের দায় মনিবের দায়িত্বে প্রকাশ পেয়েছে। কেননা ব্যবাসা ও তার অনুবর্তী বিষয়গুলো কিতাবাত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। আর (ক্রয়কৃত দাসীর সঙ্গে সহবাসের কারণে সাব্যস্ত) এই মাহর ব্যবসার অনুবর্তী রূপে গণ্য হবে। কেননা ক্রয় সূত্র না হলে তার উপর থেকে যিনার হদ্দ রহিত হতো না। আর হদ্দ রহিত না হলে মাহর ওয়াজিব হতো না।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ছুরতের ঋণের দায় মনিবের দায়িত্বে প্রকাশ পায়নি। কেননা বিবাহ উপার্জনভুক্ত কোন বিষয় নয়। সুতরাং কিতাবাত চুক্তি সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। যেমন কাফালাহ-এর ক্ষেত্রে।

তিনি আরো বলেন, মোকাতাব যদি ফাসিদ চুক্তির সূত্রে কোন দাসী ক্রয় করে অত:পর তার সঙ্গে সহবাস করে আর দাসীকে ফেরত প্রদান করে তাহলে কিতাবাত অবস্থায়ই তার কাছ থেকে 'উকুর' আদায় করা হবে। অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

কেননা এটা ব্যবসাভুক্ত বিষয়। কারণ ব্যবসার চুক্তিসমূহ কখনো সিদ্ধ হয়, কখনো অসিদ্ধ হয়। আর কিতাবাত চুক্তি এবং অনুমতি উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন ওকীল নিযুক্ত করার বিষয়টি। সতুরাং মাহরের ঋণ মনিবের দায়িত্বেই প্রকাশ পাবে।

পরিচ্ছেদ

মোকাতাব দাসী যদি মনিবের ঔরসে সন্তান প্রসব করে তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে; ইচ্ছা করলে কিতাবাত চুক্তি অব্যাহত রাখবে, আর ইচ্ছা করলে নিজেকে অক্ষম ঘোষণা করে উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যেতে পারে।

কেননা সে স্বাধীনতা লাভের দুটি সূত্র অর্জণ করেছে। একটি হলো বিনিময় পরিশোধের মাধ্যমে আশু স্বাধীনতা, আরেকটি হলো বিনিময় ছাড়া বিলম্বিত স্বাধীনতা। সুতরাং দুটির মাঝে সে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করবে।

আর তার সন্তানের নসব মনিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে এবং সে স্বাধীন হবে।

কেননা মনিব দাসীর সন্তানকে মুক্তিদানের অধিকার রাখে। আর দাসী মাঝে তার যে পরিমাণ মালিকানা রয়েছে, তা দাসীর মাধ্যমে সন্তান গ্রহণের বৈধতার জন্য যথেষ্ট।

দাসী যদি কিতাবাত চুক্তি বহাল রাখে তাহলে সে তার মনিবের কাছ থেকে মাহর গ্রহণ করবে। কেননা সে আপন সত্তায় এবং সত্তা সংশ্লিষ্ট সুবিধা সমূহের অধিকারী যেমন পূর্বে আমরা বলে এসেছি।

অত:পর (অর্থ পরিশোধের পূর্বে) মনিব যদি মারা যায় তাহলে সন্তানের জননী হওয়ার সূত্রে সে আযাদ হয়ে যাবে এবং কিতাবাত চুক্তির বিনিময় দায় তার থেকে রহিত হয়ে যাবে।

আর যদি দাসী মারা যায় এবং সম্পদ রেখে যায় তাহলে তা থেকে তার কিতাবাত চুক্তির অর্থ পরিশোধ করা হবে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে সেটা কিতাবাতের বিধান অনুযায়ী সন্তানের মীরাছ হবে।

আর যদি কোন মাল রেখে না যায় তাহলে সন্তানের উপর উপার্জন প্রচেষ্টার বিধান আরোপিত হবে না, কেননা সে তো স্বাধীন।

আর দাসী যদি অপর কোন সন্তান প্রসব করে (এবং মনিব নীরব থাকে) তাহলে ঐ সন্তানের নসব মনিবের উপর লাযিম হবে না। অবশ্য দাবী করলে ভিন্ন কথা। কেননা, (কিতাবাত চুক্তি বিদ্যমান থাকায়) তার সঙ্গে সহবাস করা মনিবের জন্য হারাম।

সুতরাং মনিব যদি নসব দাবী না করে আর অর্থ পরিশোধ ছাড়া দাসীর মৃত্যু হয় তাহলে এ দ্বিতীয় সন্তান উপার্জন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হবে। কেননা দাসীর অনুবর্তী রূপে সে মোকাতাব হয়েছে।

দাসীর মৃত্যুর পর মনিবও যদি মারা যায় তাহলে এই সন্তান স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা সন্তান হিসাবে সে তার উম্মে ওয়ালাদ মায়ের অনুবর্তী।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যদি তার উম্মে ওয়ালাদের সঙ্গে কিতাবাত চুক্তি করে তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননা মনিবের মৃত্যুর পূর্বে স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজন দাসীটির রয়েছে। আর তা কিতাবাত চুক্তির মাধ্যমে হতে পারে। আর সন্তানের মাতৃত্ব ও কিতাবাত চুক্তির মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা স্বাধীনতা লাভের দুটি সূত্র পর্যায়ক্রমে তার হাতে এসেছে।

অত:পর (অর্থ পরিশোধের পূর্বেই) যদি মনিবের মৃত্যু হয় তাহলে সন্তানের মাতৃত্বের সুবাদে আযাদ হয়ে যাবে। কেননা মনিবের মৃত্যুর সঙ্গে তার স্বাধীনতা সম্পৃক্ত ছিল। আর কিতাবাত চুক্তির বিনিময় তার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে।

কেননা বিনিময় সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য ছিল পরিশোধ করার সময় স্বাধীনতা লাভ করা। কিন্তু তার পূর্বেই যখন সে স্বাধীন হয়ে গেলো তখন উদ্দেশ্যটিকে মানিবের

অনুকূলে ধরে রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং বিনিময় রহিত হয়ে যাবে এবং কিতাবাত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ফায়দা ছাড়া সেটাকে বাকি রাখা সম্ভব নয়। তবে দাসীর উপার্জন এবং তার (ক্রয়কৃত) সন্তানগুলো তার অনুকূলে নিরাপদ থাকবে। কিতাবাত চুক্তির বিনিময়ের ক্ষেত্রে।

কেননা উম্মে ওয়ালাদের মাঝে কিতাবাত চুক্তির বিলুপ্তি ঘটলে সন্তানের ক্ষেত্রে এবং তার উপর্জিত মালের ক্ষেত্রে তা বহাল রয়েছে।

কারণ কিতাবাত চুক্তি রহিত হওয়ার উদ্দশ্যে হল দাসীর কল্যাণ। আর কল্যাণ তাতেই নিহিত যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর যদি মোকাতাব দাসী মনিবের মৃত্যুর আগে কিতাবাত চুক্তির বিনিময় পরিশোধ করে তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। (সন্তানের মাতৃত্বের সুবাদে নয়)।

কেননা কিতাবাত চুক্তি বহাল ছিল।

আর ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যদি তার মুদাব্বার দাসীকে মোকাতাব বানায় তাহলে তা জায়িয হবে।

আমরা যে প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছি সে কারণে।

আর কিতাবাত ও মোদাব্বার গুণের মাঝে বৈপরিত্য নেই। কেননা মোদাব্বারের মাঝে স্বাধীনতা বিদ্যমান নেই। শুধু (বিলম্বিত) স্বাধীনতার অধিকার বিদ্যমান রয়েছে।

আর যদি মনিব মারা যায় অথচ এই দাসী ছাড়া তার আর কোন মাল না থাকে তাহলে দুটি বিষয়ের মাঝে দাসীর ইচ্ছাধিকার থাকবে। তার মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ পরিশোধের ব্যাপারে উপার্জন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হবে কিংবা কিতাবাত চুক্তির সমগ্র বিনিময় পরিশোধ করবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, (তার ইচ্ছাধিকার থাকবে না, বরং) দুটির স্বল্পতরটি পরিশোধের ব্যাপারে চেষ্টায় নিয়োজিত হবে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তার মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ এবং কিতাবাত চুক্তির বিমিয়ের দুই তৃতীয়াংশের মাঝে সল্পতরটি পরিশোধ করার চেষ্টায় নিয়োজিত হবে।

সুতরাং ইচ্ছাধিকার ও পরিমাণ উভয় বিষয়েই মতপার্থক্য রয়েছে। পরিমাণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সঙ্গে রয়েছেন। পক্ষান্তরে ইচ্ছাধিকার নাকচ করার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সঙ্গে রয়েছেন।

ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি মুক্তিদানের বিভাজ্যতার অনুবর্তী। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুক্তি দান যেহেতু বিভাজ যোগ্য, সেহেতু দুই তৃতীয়াংশ গোলাম থেকে যাবে (কেননা সে তার সম্পদের শুধু এক তৃতীয়াংশে হস্তক্ষেপ করতে পারে)। আর এই দুই তৃতীয়াংশ মুক্তিলাভের দুটি বিনিময় সূত্র তার হাতে এসেছে। একটি মুদাব্বার হওয়ার সুবাদে অবিলম্বিত সূত্র। আরেকটি হল কিতাবাত চুক্তির সুবাদে বিলম্বিত সূত্র। সুতরাং তাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে।

পক্ষান্তরে সাহেবায়নের মতে যেহেতু তার একাংশ মুক্ত হওয়ার কারণে সমগ্র সত্তা মুক্ত হয়ে গেছে, সেহেতু সে এখন স্বাধীন। আর তার উপর দুটি মালের একটি ওয়াজিব হয়েছে। (আর তা হল কিতাবাত চুক্তির বিনিময় এবং দাস সত্তার মূল্য) সুতরাং অবধারিত ভাবেই সে স্বল্পতরটি গ্রহণ করবে। সুতরাং ইচ্ছাধিকার প্রদানের কোন অর্থ নেই।

পরিমাণ সম্পর্কে মুহম্মদ (র)-এর দলীল এই যে, মনিব কিতাবাত চুক্তির বিনিময়কে দাসীর দাস সত্তার সমগ্রের বিপরীতে সাব্যস্ত করেছে। আর মোদাব্বার হওয়ার সূত্রে এক তৃতীয়াংশ তার অনুকূলে নিরাপদ হয়ে গেছে। সুতরাং ঐ তৃতীয়াংশের বিপরীতে বিনিময় সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব । দেখুন না যদি তার অনুকূলে সমগ্র দাসসত্তা নিরাপদ হয়ে যেতো অর্থাৎ সম্পদে এক তৃতীয়াংশ দ্বারাই যদি সে বের হয়ে আসতে পারতো তাহলে কিতাবাত চুক্তির সমগ্র বিনিময় রহিত হয়ে যেতো। সুতরাং এখানে বিনিময়ের এক তৃতীয়াংশ রহিত হয়ে যাবে। তাই এর বিধান ঐ সূরতের মত হবে, যখন মোদাব্বার গুণ কিতাবাত চুক্তির পরে সাব্যস্ত হয়।

শায়খায়নের দলীল এই যে, কিতাবাত চুক্তির সমগ্র বিনিময় তার দাস সত্তার দুই তৃতীয়াংশের বিপরীতে সাব্যস্ত। তাই বিনিময় থেকে কোন অংশ রহিত হবে না।

এর কারণ এই যে, দৃশ্যত: ও শব্দগত উভয় দিক থেকে যদিও চুক্তির বিনিময় সমগ্র দাস সত্তার বিপরীতে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তবে গুণগতভাবে এবং ইচ্ছাগতভাবে তা আমাদের উল্লেখকৃত অবস্থার সাথে আবদ্ধ। কেননা প্রকাশ্যে সে এক তৃতীয়াংশ-এর স্বাধীনতার অধিকারী হয়ে গেছে আর এটা স্পষ্ট যে, মানুষ ঐ অংশের বিপরীতে আর্থিক দায় গ্রহণ করে না, যে অংশের স্বাধীনতার হকদার হয়ে পড়েছে।

আর এটা ঐ সূরতের মত হল, যখন তার স্ত্রীকে দুই তালাক প্রদানের পর এক হাযারের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান করে। এ অবস্থায় ইচ্ছাগত প্রমাণের সূরতে সমগ্র এক হাযার অবশিষ্ট এক তালাকের বিপরীতে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এখানেও তাই হবে।

পক্ষান্তরে কিতাবাত চুক্তি অগ্রবর্তী হলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। আর সেটা হলো এর পরবর্তী মাসআলা। কেননা কিতাবাত চুক্তির সময় যেহেতু কোন প্রাপ্যতা ছিল না সেহেতু বিনিময়টি সমগ্র দাস সত্তার বিপরীতে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং উভয় সূরত পার্থক্য হয়ে গেল।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যদি তার মোকাবাত দাসীকে মোদাব্বার ঘোষণা করে তাহলে 'তাদবীর' বৈধ হবে।

এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

তবে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে কিতাবাত চুক্তি বহাল রাখতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে নিজেকে অক্ষম ঘোষণা করতে পারে। তখন সে মোদাব্বার হয়ে যাবে।

কেননা দাস-দাসীর দিক থেকে কিতাবাত চুক্তিটি বাধ্যতামূলক নয়।

যদি সে কিতাবাত চুক্তি অব্যাহত রাখে আর মনিবের মৃত্যু হয় এমন অবস্থায় যে, এই দাসীটি ছাড়া তার অন্য কোন মাল নেই, তাহলে সে ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। ইচ্ছা করলে সেকিতাবাত চুক্তির অর্থের দুই তৃতীয়াংশ ব্যাপারে কিংবা নিজের মূল্যের দুই তৃতীয়াংশের ব্যাপারে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত হবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়ন (র) বলেন, উভয়ের মধ্যে স্বল্পতরটির ব্যাপারে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত হবে।

অর্থাৎ আমরা (মুক্তি দানের বিভাজ্যতার) যে বিষয় উল্লেখ করেছি, তার ভিত্তিতে এই সূরতে ইচ্ছাধিকার সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে পরিমাণের বিষয়টি সর্বসম্মত। এবং এর দলীল সেটাই, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি (যে, বিনিময়টি সমগ্র দাস হওয়ার বিপরীতে সাব্যস্ত হয়েছে)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যদি তার মোকাতাবকে আযাদ করে তাহলে সে তার মুক্তি দানের সূত্রে মুক্তি লাভ করবে।

কেননা তার মাঝে মনিবের মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে।

আর কিতাবাত চক্তির বিনিময় রহিত হয়ে যাবে।

কেনা সে তো মুক্তির বিপরীত তার দায় গ্রহণ করেছিল অথচ সেটা ছাড়াই তার মুকিক্ত অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং সেটা তার উপর লাযিম হবে না।

আর কিতাবাত চুক্তি মনিবের দিক থেকে যদিও বাধ্যতামূলক ছিল কিন্তু গোলামের সম্মতিক্রমে তা রহিত করা যায়। আর স্বভাবত:ই সে তার উপার্জনের নিরাপদতাসহ বিনা বিনিময়ে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তাতে সম্মত হবে। কেননা উপার্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে কিতাবাত চুক্তিকে আমরা বহাল রাখছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মনিব যদি এক বছরের মেয়াদে এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে তার সাথে কিতাবাত চুক্তি করে, এরপর পাঁচশ দিরহামের উপর তার সঙ্গে সমঝোতা করে তাহলে তা জায়িয হবে।

এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত।

কিয়াস মতে তা জায়িয হবে না। কেননা এটা হলো মেয়াদের বিনিময় গ্রহণ। আর মেয়াদ মাল নয়। পক্ষান্তরে ঋণটি হল মাল। সুতরাং এটা রিবা হবে। আর এ ধরণের কাজ স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং অন্যের মোকাতাবের ক্ষেত্রে জায়িয হয় না। (সুতরাং নিজের মোকাতাবের ক্ষেত্রেও জায়িয হবে না।)

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, মোকাতাবের ক্ষেত্রে মেয়াদকে এ হিসাবে মাল ধরা হয়েছে। কেননা সে মেয়াদ ছাড়া কিতাবাত চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তার জন্য মেয়াদকে মালের হুকম প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কিতাবাত চুক্তির বিনিময়টি এক হিসাবে গ্রহণ করা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং উভয়টি সমান হয়ে গেলো। আর এই সমতার কারণে রিবা হবে না।

তাছাড়া দ্বিতীয় দলীল এই যে, কিতাবাত চুক্তি এক হিসাবে চুক্তি; কিন্তু অন্য হিসাবে তা চুক্তি নয়। আর মেয়াদের বিষয়টি এক হিসাবে রিবা। (সুতরাং এটা হবে সন্দেহের মধ্যে সন্দেহ। পক্ষান্তরে দুইজন আযাদ ব্যক্তির মধ্যে যদি চুক্তি হয়, তবে হুকুম হবে ভিন্ন। কেননা, এটা সর্বদিক দিয়ে চুক্তি। সুতরাং এটা রিবা হয়ে যাবে। আর এর মধ্যে মেয়াদ সন্দেহ হিসাবে গণ্য।

তিনি আরো বলেন, মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তি যদি এক বছরের মেয়াদে দুই হাযার দিরহামের বিনিময়ে তার গোলামের সঙ্গে কিতাবাত করে আর গোলামের মূল্য হয় এক হাযার দিরহাম; এরপর মনিব মারা যায়, আর এই গোলাম ছাড়া তার অন্য কোন মাল না থাকে, আর ওয়ারিছগণ মেয়াদের বিষয়টি অনুমোদন না করে, তাহলে সে দুই হাযারের দুই তৃতীয়াংশ নগদ পরিশোধ করবে। আর অবশিষ্ট অংশ নির্ধারিত মেয়াদে আদায় করবে। কিংবা দাস অবস্থায় ফেরত যাবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এক হাযারের দুই তৃতীয়াংশ নগত আদায় করবে। আর অবশিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত মেয়াদে আদায় করবে।

কেননা মনিবের অধিকার রয়েছে মূল্যের অতিরিক্ত পরিমাণ বাদ দিয়ে তার মূল্য (তথা এক হাযার)-এর বিনিময়ে কিতাবাত করার। তাই সেটাকে বিলম্বিত করার অধিকার তার থাকবে।

সুতরাং বিষয়টি এমন হল যে, মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তি এক বছরের মেয়াদে তার স্ত্রীর সাথে 'খোলা' করল। কেননা তার তো বিনিময় গ্রহণ না করেও তালাক প্রদানে অধিকার ছিল।

শায়খায়নের দলীল এই যে, নির্ধারিত সমগ্র দু'হাযার দাস সত্তার বিনিময় বলে সাব্যস্ত হয়েছে। তাই তো তার উপর বিনিময়ে যাবতীয় বিধান প্রয়োগ করা হয়। আর ওয়ারিছের হক বিনিময়কৃত (দাস সত্তা)-এর সাথে যেমন সম্পৃক্ত হয়, তেমনি বিনিময়-এর সঙ্গেও সম্পৃক্ত হবে। অথচ মেয়াদ নির্ধারণের অর্থ গুণগতভাবে রহিত করা। সুতরাং তা সমগ্র বিনিময়ের এক তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে।

'খোলা'-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিনিময়টি সেখানে মালের বিপরীতে সাব্যস্ত নয়। সুতরাং ওয়ারিছদের হক যেমন বিনিময়কৃ বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় না, তেমনি বিনিময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে না।

এই মতপার্থক্যের নযীর হলো ঐ মাসআলাটি যেখানে মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তি এক বছরের মেয়াদে তিন হাযার দিরহামের বিনিময়ে তার বাড়ী বিক্রয় করল, অথচ তার মূল্য ছিল এক হাযার দিরহাম। অত:পর সে মারা গেলো। অপর ওয়ারিছগণ মেয়াদ অনুমোদন করল না। এ ক্ষেত্রে শায়খায়নের মতে ক্রেতাকে বলা হবে যে, তুমি সমগ্র মূল্যে দুই তৃতীয়াংশ নগদ আদায় কর আর এক তৃতীয়াংশ নির্ধারিত মেয়াদে আদায় কর। যদি তাতে সম্মত না হও তাহলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল কর।

আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে মূল্য পরিমাণ অর্থের ক্ষেত্রে তৃতীয়াংশায়নের ব্যাপারটি বিবেচ্য হবে। মূল্যের অতিরিক্ত পরিমাণের ক্ষেত্রে নয়। প্রমাণ সেটাই, আমরা পূর্বে যে সব বর্ণনা করেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মনিব যদি বছরের মেয়াদে এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে গোলামের সঙ্গে কিতাবাত করে, আর তার মূল্য হয় দুই হাযার আর ওয়ারিছগণ মেয়াদের বিষয়টি অনুমোদন না করে; তাহলে গোলামকে বলা হবে যে, মূল্যের এক তৃতীয়াংশ নগদ পরিশোধ কর; অন্যথায় তোমাকে দাস অবস্থায় ফেরত দেয়া হবে।

এটা ইমামদের সর্বসম্মত মত। কেননা এখানে রেয়ায়েত হয়েছে পরিমাণ ও মেয়াদ উভয় ক্ষেত্রে। সুতরাং তৃতীয়াংশের বিষয়টি উভয় ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে।

পরিচ্ছেদ : কোন গোলামের পক্ষ থেকে কারো কিতাবাত চুক্তি করা

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কোন স্বাধীন তৃতীয় ব্যক্তি যদি কোন গোলামের পক্ষ থেকে (এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে) কিতাবাত চুক্তি করে আর গোলামের পক্ষ থেকে তা আদায় করে দেয় তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। আর গোলামের কাছে এ খবর পৌছার পর সে যদি তা গ্রহণ করে তাহলে সে মোকাতাব হয়ে যাবে।

মাসআলাটির সূরত এই যে,স্বাধীন ব্যক্তি গোলামের মনিবকে বললো, তুমি তোমার গোলামের সঙ্গে এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে কিতাবাত কর এই শর্তে যে আমি যদি তোমাকে এক হাযার পরিশোধ করি তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে; তখন এই শর্তে মনিব তার সঙ্গে কিতাবাত করল। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি আদায় করলে শর্তের বিধান মতে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি গোলাম চুক্তিটি অনুমোদন করে তাহলে সে মোকাতাব হয়ে যাবে। কেননা কিতাবাত চুক্তিটি তার অনুমোদনের উপর স্থগিত ছিল। আর তার গ্রহণই হলো অনুমোদন।

আর যদি তৃতীয় ব্যক্তি এই কথা না বলে যে, যদি আমি তোমাকে এক হাযার পরিশোধ করি তাহলে সে আযাদ, তারপর সে এক হাযার পরিশোধ করলেও কিয়াস অনুযায়ী আযাদ হবে না।

কেননা এখানে শর্তের দিক নেই। আর চুক্তিটি গোলামের অনুমোদনের উপর স্থগিত রয়েছে।

তবে সূক্ষ্ম কিয়াস মতে আযাদ হয়ে যাবে। কেননা বক্তব্য দাতার পরিশোধের সাথে তার মুক্তির বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করার মধ্যে অনুপস্থিত গোলামের কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং এতটুকু বিধানের ক্ষেত্রে তা সিদ্ধ হবে। তবে গোলামের এক হাযার দিরহাম লাযিম হওয়ার ক্ষেত্রে চুক্তিটি স্থগিত থাকবে।

কারো কারো মতে এটাই হলো 'জামে ছাগীর' কিতাবে বর্ণিত মাসআলাটির সূরত।

আর যদি ঐ স্বাধীন ব্যক্তি বিনিময়ের অর্থ পরিশোধ করে তাহলে গোলামের কাছে রুজু করতে পারবে না।

কেননা সে তো সেচ্ছাদান কারী।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, গোলাম যদি নিজের পক্ষ থেকে এবং অন্য এক গোলামের পক্ষ হতে নিজের মনিবের সঙ্গে কিতাবাত করে আর দ্বিতীয় গোলাম অনুপস্থিত থাকে। অত:পর উপস্থিত বা অনুপস্থিত গোলাম বিনিময়ের অর্থ পরিশোধ করে তাহলে উভয়ে আযাদ হয়ে যাবে।

মাসআলটির অর্থ এই যে, গোলাম তার মনিবকে বললো আমার সঙ্গে আমার নিজের ব্যাপারে এবং অমুক অনুপস্থিত গোলামের পক্ষ থেকে এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে কিতাবাত করুন।

সূক্ষ্ম কিয়াস মতে এই কিতাবাত চুক্তি জায়িয রয়েছে। আর কিয়াস মতে গোলামের যেহেতু নিজের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে, সেহেতু নিজের ব্যাপারে তা সহী হবে। পক্ষান্তরে অনুপস্থিত গোলামের ক্ষেত্রে তা স্থগিত থাকবে। কেননা তার উপর তো এই গোলামের কর্তৃত্ব নেই।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে উপস্থিত ব্যক্তি সূচনা লগ্নে নিজের দিকে চুক্তি সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নিজের (চুক্তির) মূল ব্যক্তি রূপে এবং অনুপস্থিত গোলামকে অনুবর্তী রূপে উপস্থাপন করেছে। আর এই পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পাদন শরীয়ত সম্মত। যেমন দাসীর সঙ্গে কিতাবাত করা হলে তার সন্তানরাও অনুবর্তীরূপে তার কিতাবাত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে তা পরিশোধের মাধ্যমে তারাও মুক্ত হয়ে যায়। অথচ তাদের উপর বিনিময়ের কোন অংশ লাযিম হয় না। আর যখন এই পদ্ধতিতে চুক্তিটিকে বৈধতা প্রদান করা সম্ভব হল তখন উপস্থিত গোলাম চুক্তির ব্যাপারে একক কর্তৃত্ববান হল। সুতরাং মনিব সমগ্র বিনিময়ের ব্যাপারে তাকে তাগাদা করতে পারে। কেননা চুক্তির মূল ব্যক্তি হিসাবে বিনিময় তার উপরই বর্তায়। আর অনুপস্থিত গোলাম চুক্তির বিষয়ে অনুবর্তী হওয়ার কারণে বিনিময়ের কোন কিছু তার উপর বর্তাবে না।

তিনি আরো বলেন : তাদের দুজনের যে কেউ আদায় করলে উভয়ই আযাদ হয়ে যাবে এবং মনিবকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হবে।

উপস্থিত গোলামের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, বিনিময় পরিশোধ করা তো তারই কর্তব্য। আর অনুপস্থিত গোলামের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, যদিও বিনিময় তার উপর লাযিম নয়, তবু সে তো তা দ্বারা স্বাধীনতার মর্যাদা অর্জন করবে। সুতরাং বন্ধকী দ্রব্য 'আরিয়া' প্রদানকারীর মত হল। যখন আরিয়া প্রদানকারী (নিজের পক্ষ হতে) দেনাদারের ঋণ পরিশোধ করে দেবে তখন বন্ধক গ্রহীতাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। কেননা ধার প্রদানকারীর প্রয়োজন রয়েছে নিজের বস্তুটি মুক্ত করার; যদিও ঋণ পরিশোধ তার দায়িত্ব নয়।

তিনি আরো বলেন, দু'জনের যে কেউ পরিশোধ করুক সে অপর জনের কাছে রুজু করতে পারবে না।

কেননা উপস্থিত গোলাম তো তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত ঋণ পরিশোধ করেছে। আর অনুপস্থিত গোলাম হচ্ছে স্বেচ্ছা দানকারী। পরিশোধের জন্য সে বাধ্য ছিল না।

তিনি আরো বলেন : আর অনুপস্থিত গোলামের কাছে কোন পরিমাণ তাগাদা করার অধিকার মনিবের নেই।

এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

সুতরাং অনুপস্থিত গোলাম চুক্তিটি গ্রহণ করুক বা গ্রহণ না করুক, এতে কিছু এসে যায় না। উপস্থিত গোলামের অনুকূলে কিতাবাত চুক্তিটি কার্যকর থাকবে। কেননা অনুপস্থিত গোলামের কবুল করা ছাড়াই চুক্তিটি উপস্থিত গোলামের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। সুতরাং তার গ্রহণ দ্বারা প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে না।

যেমন কোন ব্যক্তি কারো পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া কাফীল হয়ে গেল। অত:পর তার কাছে এই খবর পৌছার পর সে তা অনুমোদন করল। তাতে কাফালাহ্‌র বিধান পরিবর্তিত হবে না। সুতরাং যদি কাফীল অর্থ পরিশোধ করে, তাহলে কাফীল প্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে সে রুজু করতে পারবে না। এখানে অনুপস্থিত গোলামের ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে।

তিনি আরো বলেন : দাসী যদি নিজের পক্ষ থেকে এবং তার দুই অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের পক্ষ থেকে কিতাবাত চুক্তি করে তাহলে তা বৈধ হবে। আর তাদের যে কেউ পরিশোধ করলে অপর জনের কাছে রুজু করতে পারবে না। আর মনিবকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হবে এবং সকলে মুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা চুক্তির ক্ষেত্রে সে নিজেকে মূল ব্যক্তি এবং তার সন্তানদের অনুবর্তী রূপে উপস্থাপন করেছে। যেমন প্রথম মাসআলায় আমরা বর্ণনা করেছি। আর বৈধতা লাভের ক্ষেত্রে আজনাবী থেকে মাতা অধিক হকদার।

পরিচ্ছেদ : শরীকানা গোলামের কিতাবাত

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন : দু'জন লোকের শরীকানায় যদি কোন গোলাম থাকে আর দুজনের একজন অন্য শরীকদারকে অনুমতি দেয় যে, এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে তার হিস্সার ক্ষেত্রে কিতাবাত করবে এবং কিতাবাতের বিনিময় কবজা করবে। অত:পর সে কিতাবাত করল এবং সে এক হাযারের অংশ বিশেষ কবজা করল; এরপর গোলাম অর্থ পরিশোধে অপরাগ হল তাহলে যে কবজা করেছে মাল তার হবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, গোলামটি উভয় শরীকদারের পক্ষ থেকে মোকাতাব হবে। আর মোকাতাব যে মাল আদায় করেছে তা উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে।

এর ভিত্তি এই যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কিতাবাত বিভাজনযোগ্য। সাহেবায়ন এতে ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন মুক্তিদানের ক্ষেত্রে। কেননা কিতাবাত চুক্তি এক দিক থেকে স্বাধীনতা সাব্যস্ত করে। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কিতাবাত শুধু অনুমতি প্রাপ্ত শরীকদারের হিস্সায় সীমাবদ্ধ থাকবে। কেননা তাঁর

মতে কিতাবাত বিভাজনযোগ্য। তবে অপর শরীকদারের পক্ষ থেকে অনুমতির সার্থকতা এই যে, তখন তার চুক্তি নাকচ করার অধিকার থাকবে না, যেমন অনুমতি প্রদান না করার ক্ষেত্রে অধিকার থাকবে। আর শরীকদারকে বিনিময়ের অর্থ কবজা করার অনুমতি প্রদানের অর্থ গোলামকে পরিশোধের অনুমতি প্রদান। সুতরাং সে গোলামের উপার্জন থেকে প্রাপ্ত নিজের অংশ মোকাতাবকে স্বেচ্ছাদানকারী হল। এ কারণে কবজাকৃত সমগ্র পরিমাণ তারই হবে।

আর সাহেবায়নের মতে নিজ অংশে কিতাবাতের অনুমতি প্রদানের অর্থ হল সমগ্র গোলামের কিতাবাতের অনুমতি প্রদান। কেননা কিতাবাত তাদের মতে বিভাজনযোগ্য নয়। সুতরাং অনুমতি প্রাপ্ত শরীকদার (তার নিজের) অর্ধেকের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ চুক্তিকারী আর অন্য অর্ধেকের ক্ষেত্রে ওকীল রূপে চুক্তিকারী হবে। তাই চুক্তি বিনিময় উভয়ের প্রাপ্য হবে। আর কবযাকৃত পরিমাণ উভয়ের মাঝে শরীকানা হবে। সুতরাং অপারগতার পরেও শরীকানা বহাল থাকবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, একটি দাসী যদি দু'জন পুরুষের মাঝে শরীকানা হয় এবং দু'জনে তার সঙ্গে সহবাস করে আর সে একটি সন্তান প্রসব করে এবং সহবাসকারী সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে, অত:পর অপরজন তার সঙ্গে সহবাস করে আর সে একটি সন্তান প্রসব করে এবং দ্বিতীয় সহবাসকারী সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাসী চুক্তির অর্থ পরিশোধে অপরাগ হয়ে পড়ে তাহলে সে প্রথম জনের উম্মে ওয়ালাদ হবে।

কেননা দু'জনের একজন যখন সন্তানের পিতৃপরিচয় দাবী করল তখন দাসীর মাঝে তার মালিকানা বিদ্যমান থাকবে কারণ তার দাবী। সিদ্ধ হবে এবং তার নিজের হিস্সা তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। কেননা কিতাবাত চুক্তি এক মালিকানা থেকে আরেক মালিকানায় হস্তান্তর গ্রহণ করে না, সুতরাং উম্মে ওয়ালাদ গুণ (সন্তান মাতৃত্ব) তার হিস্সার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন শরীকানার মোদাব্বার দাসীর ক্ষেত্রে।

এরপর যখন দ্বিতীয় জন দাসীর শেষ পুত্রটির পিতৃত্ব দাবী করল তখন বাহ্যত: তার মালিকানা বিদ্যমান থাকার কারণে তার দাবী সিদ্ধ হবে। এরপর যখন সে অপারগ হয়ে গেলো তখন ধরে নেয়া হবে যেন কিতাবাত চুক্তি ছিলইনা। তখন প্রকাশ পেয়ে যাবে যে, দাসীর সমগ্র সত্তা প্রথম জনের উম্মে ওয়ালাদ। কেননা মালিকানা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধক (তথা কিতাবাত চুক্তি) দূর হয়ে গেছে। আর তার সহবাস ছিল অগ্রবর্তী।

আর প্রথম সহবাসকারী তার শরীকদারের অনুকূলে দাসীর অর্ধেক মূল্যের যামিন হবে।

কেননা সে তার হিস্সার মালিক হয়ে গেছে। কেননা তার পক্ষ থেকে উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার পূর্ণতা সাধিত হয়েছে।

আর সে দাসী অর্ধেক মাহরের দায় বহন করবে।

কারণ সে শরীকানাধীন দাসীর সঙ্গে সহবাস করেছে।

আর তার শরীকদার (অর্থাৎ দ্বিতীয় সহবাসকারী) পূর্ণ মাহর ও সন্তানের মূল্য পরিশোধ করবে এবং সন্তানটি তার হবে।

কেননা সে ধোকাগ্রস্ত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত। কারণ সহবাসের সময় বাহ্যত: তার মালিকানা বিদ্যমান ছিল।

আর ধোকাগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তানের নসব তার অনুকূলেই সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এবং মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সন্তান স্বাধীন হয়ে যাবে। যেমন যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

তবে প্রকৃত পক্ষে সে অন্যের উম্মে ওয়ালাদের সঙ্গে সহবাস করেছে। সেজন্য পূর্ণ মাহর তার উপর লাযিম হবে। আর (অপরাগতা প্রকাশের পূর্বে) দুজনের যে কেউ মোকাতাব দাসীকে মাহরের অর্থ প্রদান করবে তা জায়িয হবে।

কেননা কিতাবাত বহাল থাকা অবস্থায় কবজা করার অধিকার হল তার। কারণ নিজের (সম্ভোগ অঙ্গের) উপকারসমূহ এবং তার বিনিময় তার সঙ্গেই বিশিষ্ট ছিল।

পরবর্তীতে দাসী যখন অপারগ হয়ে যায় তখন মাহর মনিবকে ফেরত প্রদান করবে। কেননা সে সম্ভোগ অঙ্গের উপকার লাভের ক্ষেত্রে তার বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে।

এই যা কিছু আমরা আলোচনা করলাম তা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মোহম্মদ (র) বলেন, সে প্রথম জনের উম্মে ওয়ালাদ হবে। আর দ্বিতীয় শরীকদারের সহবাস (পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে) জায়িয ছিল না।

কেননা প্রথমজন যখন সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করল তখন দাসী পুরোপুরি তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে গেলো।

কেননা সর্ব সম্মতিক্রমেই উম্মে ওয়ালাদগুণকে যথা সম্ভব পূর্ণতা প্রদান করতে হবে। আর এখানে কিতাবাত চুক্তিকে রহিত করার মাধ্যমে তাকে পূর্ণতা দান করা সম্ভব রয়েছে। কেননা কিতাবাত চুক্তি রহিত করণযোগ্য। সুতরাং দাসী ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার ক্ষেত্রে কিতাবাত চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। আর এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কিতাবাত চুক্তি বহাল থাকবে।

মোদাব্বার ঘোষণার বিষয়টি ভিন্ন।[১] কেননা মোদাব্বারার ঘোষণা রহিত হওয়া গ্রহণ করে না। এবং মোকাবাত গোলামকে বিক্রয়ের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা বিক্রয়কে বৈধতা দানের অর্থ হল কিতাবাত চুক্তিকে বাতিলকরা। কারণ ক্রেতা তার মোকাতাবগুণ বহাল সম্মত হবে না।

---

১ আবু হানীফা (র) যে বিরোধপূর্ণ মাসআলাটিকে শরীকানাধীন মুদাব্বার দাসীর উপর কিয়াস করেছেন, তার জওয়াবে এটি বলা হয়েছে। বক্তব্যের খোলাসা এই যে, আমরা বলে এসেছি যে, উম্মে ওয়ালাদ গুণকে যথা সম্ভব পূর্ণতা প্রদান করতে হবে। কিতাবাত চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিকে নাকচ করে পূর্ণতা বিধান সম্ভব হয়েছিল কিন্তু মোদাব্বার দাসীর ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কেননা মোদাব্বার ঘোষণাকে নাকচ করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রথম শরীকের উম্মে ওয়ালাদ বানানোর পর দ্বিতীয় শরীকদারও যদি দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানায় তবে তা উম্মে ওয়ালাদ হিসাবে [illegible]

আর যখন দাসীর সমগ্র সত্তা প্রথম সহবাসকারীর উম্মে ওয়ালাদ হয়ে গেলো তখন দ্বিতীয় জন অন্যের উম্মেওয়ালাদের সঙ্গে সহবাসকারী হল। সুতরাং সন্তানের নসব তার অনুকূলে সাব্যস্ত হবে না এবং সন্তানটির মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে তার অনুকূলে স্বাধীন হবে না।

তবে মালিকানায় সন্দেহ বিদ্যমান থাকার কারণে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। এবং সমগ্র মাহর তার উপর লাযিম হবে। কেননা সহবাস হদ্দ বা মাহর এ দুটি দণ্ডের কোন একটি দণ্ড থেকে খালি হতে পারে না।

আর (দাসীর ক্ষতিগ্রস্ততার ক্ষেত্রে) যখন কিতাবাত চুক্তি বহাল থাকবে এবং দাসীর সমগ্র সত্তা প্রথম জনের মুকাতাব হয়ে যাবে তখন কারো কারো মতে দাসীর উপর চুক্তির অর্ধেক বিনিময় লাযিম হবে।

কেননা যে ক্ষেত্রে মোকাতাব দাসী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না সে ক্ষেত্রে কিতাবাত চুক্তি রহিত হয়ে গেছে। আর অর্ধেক বিনিময় রহিত করার ক্ষেত্রে মোকাতাব দাসীর ক্ষতি নেই।

কেউ কেউ বলেন : আর কারো কারো মতে সমগ্র বিনিময় ওয়াজিব হবে। কেননা অনিবার্য প্রয়োজনে মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে শুধু কিতাবাত চুক্তি রহিত হয়েছে। সুতরাং অর্ধেক বিনিময় রহিত করার ক্ষেত্রে চুক্তির নাকচতা প্রকাশ পাবে না।

পক্ষান্তরে পূর্ণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে চুক্তি বহাল রাখায় মনিবের ফায়দা রয়েছে। যদিও তা রহিত হওয়া দ্বারা মোকাতাব দাসী ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।

আর মোকাতাব দাসীকেই মাহর প্রদান করা হবে।

কেননা সে তার (সম্ভোগ অঙ্গের) উপকারসমূহের বিনিময়ের সংগে বিশিষ্ট। তবে যখন সে অপরাগ হয়ে যাবে এবং দাসীর অবস্থায় ফেরত যাবে তখন মাহর মনিবের কাছে ফেরত দেবে। কেননা বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে; যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর বক্তব্যে কিয়াস অনুযায়ী প্রথম জন তার শরীকদারের অনুকূলে দাসীর মোকাতাব অবস্থার অর্ধেক মূল্যের যামিন হবে।

কেননা সে তার শরীকদারের হিস্‌সার মালিকানা লাভ করেছে, এমন অবস্থায় যে, দাসী মোকাতাব ছিল। সুতরাং প্রথমজন জন সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল, অর্ধেক মূল্যের দায় তাকে বহন করতে হবে। কারণ এটা হলো মালিকানা লাভের দায়।

আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মত অনুযায়ী দাসীর অর্ধেক মূল্য এবং কিতাবাত চুক্তির অবশিষ্ট বিনিময়ের অর্ধেকের মধ্য হতে স্বল্পতরটির যামিন হবে।

কেননা অপরাগতার বিবেচনায় তার শরীকদারের হক সাব্যস্ত হয় দাসীর অর্ধেক দাসসত্তায়। পক্ষান্তরে চুক্তির অর্ধপরিশোধের বিবেচনায় শরীকদারের হক সাব্যস্ত হয়

চুক্তির অর্ধেক বিনিময়ে। সুতরাং দুটি বিবেচনার মাঝে দ্বিধা থাকা অবস্থায় সহজতরটি সাব্যস্ত হবে।

আর যদি দ্বিতীয় শরীকদার সহবাস না করে বরং তাকে মোদাব্বার ঘোষণা করে অত:পর দাসী অপারগ হয়ে পড়ে তাহলে তাহলে মোদাব্বার ঘোষণা বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা মোদাব্বার ঘোষণা মালিকানার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় নি। সাহেবায়নের নিকট তো এর কারণ পরিষ্কার। কেননা উম্মে ওয়ালাদ ঘোষণাকারী অপারগতার পূর্বেই সে পূর্ণ মালিক হয়ে গেছে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে কারণ এই যে, অপারগতা দ্বারা প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, প্রথম সহবাসকারী সহবাসের সময় থেকেই দ্বিতীয় জনের হিস্সার মালিক হয়ে গেছে। সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেলো যে, মোদাব্বার ঘোষণা অন্যের মালিকানার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। আর মোদাব্বার ঘোষণার বৈধতা মালিকানার বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এসব সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা ধোকাগ্রস্ততার উপর নির্ভর করে। (মালিকানার উপর নয়) যেমন পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

তিনি আরো বলেছেন, আর দাসীটি প্রথম জনের উম্মে ওয়ালাদ হবে।

কেননা সে তার শরীকদারের হিস্সার মালিক হয়েছে। আর উম্মে ওয়ালাদ বানানো পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

আর সে তার শরীকদারের অনুকূলে দাসীর অর্ধেক মাহরের দায় বহন করবে।

কেননা সে শরীকানার দাসীর সঙ্গে সহবাস করেছে।

আর সে তার অর্ধেক মূল্যের দায় বহন করবে।

কেননা সে দাসীর দাস সত্তায় অর্ধেকের মালিক হয়ে গেছে। উম্মে ওয়ালাদ বানানোর মাধ্যমে। আর এটা হল মূল্যের বিনিময়ে মালিকানা লাভ।

আর সন্তানটি হবে প্রথম জনের।

কেননা সিদ্ধান্ত দানকারী মালিকানা বিদ্যমান থাকার কারণে তার পিতৃত্বের দাবী সিদ্ধ হয়েছে :

এটা সকলের মত। এবং এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর যদি উভয়ে দাসীর সাথে কিতাবাত করার পর তাদের একজন তাকে আযাদ করে দেয় এমন অবস্থায় যে, সচ্ছল রয়েছে, অতঃপর দাসী চুক্তির অর্থ পরিশোধে অপারগ হয়ে পড়ে তাহলে আযাদকারী এর শরীকের অনুকূলে দাসীর অর্ধেক মূল্যের দায় বহন করবে এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা সে দাসীর কাছ থেকে ফেরৎ নিবে। আর সাহেবায়ন বলেন, দাসীর কাছ থেকে ফেরৎ নিতে পারবে না।

কেননা যখন সে অক্ষম হয়ে পড়ল এবং তাকে দাস অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া হল তখন ধরে নেয়া হবে যে, সে যেন সবসময় (পূর্ণ) দাসীই ছিল (সাধারণ গোলামের কাছে আযাদকারী শরীকদারের) রুজু করা সম্পর্কে[১] এবং তিন ইচ্ছাধিকার সম্পর্কে[২] এবং দুটি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে[৩] যে মতপার্থক্য রয়েছে এক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত[৪] সে রকম মতপার্থক্যপূর্ণ হবে। যেমন মুক্তিদানের বিভাজ্যতার মাসআলাটি।[৫] আর মুক্তিদান প্রসঙ্গে আমরা এ মাসআলাটি বিশদ আলোচনা করেছি।

(উপরোক্ত সিদ্ধান্ত হল অপারগতা প্রকাশের পর)

পক্ষান্তরে অপারগতার পূর্বে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে নীরব শরীকদার আযাদকারীকে যামিন বানাতে পারবে না।

কেননা তাঁর মতে মুক্তিদান যখন বিভাজন গ্রহণ করে তখন মুক্তিদানের ফল এই হবে যে, 'মুক্তিদান' যে আযাদ করেনি, তার হিস্সাকে মোকাতাবের ন্যায় করে দেবে। সুতরাং তা ছাড়া অপরজনের হিসসা পরিবর্তিত হবে না। কেননা সে তো এর পূর্বেই মোকাতাব দাসী রয়েছে।

আর সাহেবায়নের মতে মুক্তিদান যেহেতু বিভাজন গ্রহণ করে না, সেহেতু (তার একাংশ মুক্তিদান করা দ্বারা) সমগ্র দাসী মুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং নীরব শরীকদার তার হিসসায় মোকাতাব অবস্থার মূল্যের দায় আযাদকারীকে বহন করাতে পারবে, যদি আযাদকারী সচ্ছল হয়। আর যদি অসচ্ছল হয় তাহলে গোলামকে উপার্জন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করবে। কেননা এটা হলো মুক্তিদানের দায়বহন, সুতরাং মুক্তিদাতার সচ্ছলতা অসচ্ছলতা দ্বারা দায়বহন ভিন্নতা লাভ করবে।

---

১. একটি গোলাম যদি দু'জনের মাঝে শারীকানা হয়, আর একজন তার হিস্সা আযাদ করে দেয় আর নীরব শরীকদার আযাদকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে তখন ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে আযাদকারী গোলামের কাছে তা রুজু করবে। সাহেবায়ন বলেন, সে গোলামের কাছে রুজু করতে পারবে না।

২. পক্ষান্তরে ইচ্ছাধিকারের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, নীরব শরীকদার তিনটি ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। ইচ্ছা করলে সে তার নিজের হিস্সা আযাদ করে দেবে। ইচ্ছা করলে গোলামকে তার হিসসার মূল্যের বিপরীতে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত করবে আর ইচ্ছা করলে আযাদকারী শরীকদারকে তার হিসসার মূল্যের যামিন বানাবে। পক্ষান্তরে সাহেবায়নের মতে (আযাদকারীর) সচ্ছলতার অবস্থায় দায়বহন করানো এবং অসচ্ছলতার অবস্থায় গোলামকে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত করা ছাড়া তার অন্য কোন ইচ্ছাধিকার নেই।

৩. আরেকটি ক্ষেত্র হল ওয়ালা সম্পর্ক। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে নীরব শরীকদার যদি নিজের হিসসা আযাদ করে দেয় বা গোলামকে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত করে তার ওয়ালা উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে। আর আযাদকারীকে যামিন বানালে ওয়ালা হবে আযাদকারীর। আর সাহেবায়নের মতে উভয় ক্ষেত্রে ওয়ালা সম্পর্ক এককভাবে আযাদকারীর অনুকূলে সাব্যস্ত হবে।

৪. উপরের তিনটি ক্ষেত্র যেমন মতপার্থক্যপূর্ণ হল তেমনি মতনের মাসআলাটিতেও একই মতপার্থক্য হবে।

৫. অর্থাৎ মুক্তিদানের বিভাজ্যতার মাসআলাটি যেমন মতপার্থক্যপূর্ণ, তেমনি এ ক্ষেত্রগুলোতেও মতপার্থক্য হবে। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুক্তিদানের বিভাজ্যতার সম্পর্কে যে মতপার্থক্য, তার ভিত্তিতেই আলোচ্য ক্ষেত্রগুলোতে মতপার্থক্য হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, গোলাম যদি দু'জন লোকের মাঝে শরীকানাধীন হয় আর দু'জনের একজন তাকে মোদাব্বার ঘোষণা করে, এরপর অন্যজন তাকে আযাদ করে দেয়, আর সে সচ্ছল হয় তাহলে মোদাব্বার ঘোষণাকারী ইচ্ছা করলে আযাদকারীকে গোলামটির মোদাব্বার অবস্থার অর্ধেক মূল্যের যামিন বানাতে পারে। আর ইচ্ছা করলে গোলামটিকে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে নিজের হিস্‌সা আযাদ করে দিতে পারে।

আর যদি দু'জনের একজন গোলামকে আযাদ করে অতঃপর অন্যজন তাকে মোদাব্বার ঘোষণা করে তাহলে আযাদকারীকে যামিন বানানোর অধিকার তার থাকবে না। বরং সে গোলামকে (তার হিসসার মূল্যের বিপরীতে) উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত করবে কিংবা গোলামকে আযাদ করে দেবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। এর কারণ এই যে, তাঁর মতে মোদাব্বার ঘোষণা বিভাজন গ্রহণ করে। সুতরাং একজনের মোদব্বার ঘোষণা তার নিজের হিসসাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে এর কারণে অপর জনের হিসসা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং তার ইচ্ছাধিকার রয়েছে আযাদ কবার, অপরজনকে যামিন বানানোর এবং উপার্জনে নিযুক্ত করার। যেমন তাঁর মাযহাব রয়েছে।

আর অপরজন যদি মুক্তিদান করে তাহলে যামিন বানানোর এবং উপার্জনে নিযুক্ত করার ইচ্ছাধিকার থাকবে না। আর তার মুক্তিদান তার নিজের অংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কেননা তাঁর মতে মুক্তিদান বিভাজন গ্রহণ করে। তবে তার মুক্তিদানের কারণে মোদাব্বার ঘোষণাকারী শরীকের হিসসা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং আযাদকারীকে সে তার হিসসার মূল্যের যামিন বানাতে পারে।

আর মোদাব্বার ঘোষণাকারীর মুক্তিদানের এবং মোদাব্বারকে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত করার ইচ্ছাধিকারও থাকবে, যেমন তাঁর মাযহাব রয়েছে।

আর (মোদাব্বার ঘোষণাকারী যদি দায় বহন করাতে চায় তাহলে) সে আযাদকারীকে তার হিসসার মোদাব্বার অবস্থার যামিন বানাবে। কেননা মুক্তিদান মোদাব্বার অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেছেন, অভিজ্ঞ মূল্য নিরূপণকারীদের মূল্য নিরূপণ দ্বারা মোদাব্বারের মূল্য জানা যাবে। আর কারো কারো মতে তার গোলাম অবস্থার মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ বিবেচ্য হবে।

কেননা গোলামের 'দাস উপকারিতা' তিন প্রকার ঃ

প্রথমতঃ বিক্রয় এবং তৎসদৃশ হস্তক্ষেপসমূহ (যা মালিকানা বিলুপ্ত করে, যেমন হেবা, সাদাকা, অছিয়ত, মীরাছ)

দ্বিতীয়তঃ সেবা গ্রহণ ও তৎসদৃশ ব্যবহারসমূহ (যা সুবিধা ভোগের সুযোগ দান করে, যেমন ইজারা প্রদান, আরিয়াত প্রদান ও সহবাস)

তৃতীয়তঃ মুক্তিদান ও তার অনুবর্তী বিষয়সমূহ (যেমন কিতাবাত উম্মে ওয়ালাদায়ন মোদাব্বার ঘোষণা, অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদান।)

মোদাব্বারের ক্ষেত্রে এই তিনটি থেকে বিক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। সুতরাং মূল্যের এক তৃতীয়াংশ রহিত হবে।

আর যখন সে আযাদকারী মূল্যের যামিন বানাবে তখন আযাদকারী দায় পরিশোধের মাধ্যমে ঐ হিসসায় মালিকানা লাভ করবেনা। কেননা মোদাব্বার গুণ এক মালিকানা থেকে অন্য মালিকানায় হস্তান্তর গ্রহণ করে না।

যেমন কেউ যদি মোদাব্বারকে গছব করে আর সে গছবকারীর হাত থেকে পালিয়ে যায়। (তখন গছবকারীর মূল্য পরিশোধ করার কারণে গোলামের মালিক হয় না)।

আর যদি দুই শরীকের একজন প্রথমে তাকে আযাদ করে দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে শরীকদার তিনটি ইচ্ছাধিকার লাভ করবে।

এরপর যদি অপরজন তাকে মোদাব্বার ঘোষণা করে তাহলে তার যামিন বানানোর অধিকার থাকবে না। শুধু মুক্তিদান বা উপার্জনে নিযুক্ত করার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

কেননা মোদাব্বারকে আযাদ করা যায় এবং উপার্জনে নিযুক্ত করা যায়।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, দু'জনের একজন যদি তাকে মোদাব্বার ঘোষণা করে তাহলে (পরবর্তীতে) অপরজনের আযাদ করা বাতিল হবে। কেননা সাহবোয়নের মতে মোদাব্বার ঘোষণা বিভাজন গ্রহণ করে না। বরং মোদাব্বার ঘোষণা দ্বারা সে অপরজনের হিসসার মালিকানা লাভ করবে এবং সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল, গোলামের অর্ধেক মূল্যের যামিন হবে। কেননা এটা হলো মালিকানা লাভের যামিন। সুতরাং সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা দ্বারা তা বিভিন্ন হবে না।

আর গোলাম অবস্থার অর্ধেক মূল্যের যামিন হবে। কেননা তার মোদাব্বার ঘোষণা গোলামটির পূর্ণ দাস অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।

আর যদি দু'জনের একজন (প্রথমে) তাকে আযাদ করে তাহলে (পরবর্তীতে) অপজনের মোদাব্বার ঘোষণা বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা মুক্তিদান বিভাজনযোগ্য নয়। সুতরাং গোলামের সমগ্র দাসসত্তা আযাদ হয়ে যাবে। ফলে মোদাব্বার ঘোষণা তার মালিকানার সঙ্গে যুক্ত হবে না। অথচ তা মালিকানার উপর নির্ভর করে।

আর আযাদকারী যদি সচ্ছল হয় তাহলে গোলামের অর্ধেক মূল্যের যামিন হবে। পক্ষান্তরে সে অসচ্ছল হলে গোলাম ঐ অর্ধেক মূল্যের বিপরীতে উপার্জনে নিযুক্ত হবে। কেননা এটা হলো মুক্তিদানের যামান। সুতরাং সাহেবায়নের মতে সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কারণে হুকুমের বিভিন্নতা হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ মোকাতাবের মৃত্যু এবং তার অপারগতা আর মনিবের মৃত্যু

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোকাতাব যদি কিস্তি পরিশোধে অপারগ হয়ে পড়ে তাহলে বিচারক তার অবস্থা বিবেচনা করবেন। যদি কারো কাছে তার ঋণ পাওনা থাকে, যা কবজা করতে পারবে, কিংবা যদি কোন সূত্র থেকে তার মাল আসার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাকে অপারগ ঘোষণা করার ব্যাপারে বিচারক তাড়াহুড়া করবেন না। বরং দুই দিন বা তিন দিন তার জন্য অপেক্ষা করবেন।

এ বিধান হল উভয় পক্ষের কল্যাণ বিবেচনা করে। আর তিন দিনই হলো সেই সময়, যা 'উত্তম' প্রকাশ করার জন্য শরীয়তের পক্ষ হতে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন বাদীর দাবী প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বিবাদীকে (তার বাইয়েনাহ উপস্থিত করার জন্য)। সময় দান এবং ঋণগ্রস্তকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য সময় দান। সুতরাং সময় তিন দিনের চেয়ে বাড়ানো হবে না।

আর যদি তার কোন সূত্র না থাকে আর মনিব তাকে অপারগ ঘোষণার দাবী জানায় তাহলে বিচারক তাকে অপারগ ঘোষণা করবেন এবং কিতাবাত চুক্তি রহিত করে দেবেন।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মত।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, পরপর দুই কিস্তি পার হওয়া পর্যন্ত কাযী তাকে অপারগ ঘোষণা করবেন না। কেননা হযরত আলী (রা) বলেছেন,

اذا توالى على المكاتب نجمان رُدَّ فى الرقّ ·

মোকাতাব যদি পরপর দু'বার কিস্তি খেলাফি হয়ে যায় তাহলে তাকে দাস অবস্থায় ফেরত দেয়া হবে।

হযরত আলী (রা) অপারগ ঘোষণার বিষয়টিকে এই শর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, এটা হল সহজসাধ্য চুক্তি। এ জন্যই মেয়াদী চুক্তি অধিকতর উত্তম।

আর (পরিশোধ) সাব্যস্ত হওয়ার অবস্থা হলো কিস্তির সময় শেষ হওয়ার পরের অবস্থা। সুতরাং গোলামের প্রতি 'সহজতা' সৃষ্টির জন্য একটা 'সময়' অবকাশ প্রদান করা অপরিহার্য। আর সর্বোত্তম সময় হল সেটা যার ব্যাপারে উভয় চুক্তিকারী একমত হয়েছে।

তারফায়নের দলীল এই যে, কিতাবাত চুক্তি রহিত করার 'কারণ' সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর তা হলো (পরিশোধের) অপারগতা। কেননা একটি কিস্তি পরিশোধে যে ব্যক্তি অপারগ সে দুটি কিস্তি পরিশোধে (দৃশ্যত:) অধিকতর অপারগ হবে। আর (অপারগতা যে রহিতকরণের কারণ) এটা এ জন্য যে, মনিবের উদ্দেশ্য হলো কিস্তি পরিশোধের সময় হওয়ার কালে মাল হস্তগত হওয়া। তা ফওত হয়ে গেছে। সুতরাং মনিব যদি শর্তকৃত উক্ত কিস্তির পাওয়া ছাড়া কিতাবাত চুক্তি অব্যাহত রাখতে সম্মত না হয়, তাহলে চুক্তি রহিত করা হবে।

দু'দিন বা তিন দিনের অবকাশ প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা পরিশোধের সক্ষমতা প্রদানের জন্য সেই অবকাশটুকু জরুরী। সুতরাং এটা বিলম্বিতকরণ নয়।

আর এ বিষয়ে সাহেবায়নের বর্ণিত বাণী- পরস্পর বিরোধী। কেননা ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর এক মোকাতাব দাসী কিস্তি পরিশোধে অপারগ হলে তিনি তাকে দাস অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে সাহাবা বাণী দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন রহিত হয়ে গেল।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মোকাতাব গোলাম যদি কাযী ছাড়া অন্য কারো কাছে চুক্তির কিস্তি পরিশোধে খেলাফ করে এবং নিজেকে অপারগ বলে স্বীকার করে, আর মনিব গোলামের সম্মতিক্রমে তাকে দাস অবস্থায় ফিরিয়ে আনে তাহলে তা জায়িয হবে।

কেননা উভয়ের সম্মতিক্রমে তো বিনা ওযরেই কিতাবাত চুক্তি রহিত করা যায়, সুতরাং ওযর অবস্থায় তো আরো স্বাভাবিকভাবেই রহিত করা বৈধ হবে।

আর গোলাম যদি রহিত করণে সম্মত না হয় তাহলে চুক্তি রহিতকরণের জন্য আদালতের ফায়সালা জরুরী হবে।

কেননা এটা হলো মনিবের দিক থেকে অবশ্য পালনীয় এবং (ইচ্ছাধিকারের শর্তমুক্ত) পরিপূর্ণ চুক্তি, সুতরাং আদালতের রায় কিংবা পারস্পরিক সম্মতি অপরিহার্য। যেমন কবজার পর দোষজনিত কারণে ফেরত প্রদানের বিষয়টি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোকাতাব যদি পরিশোধ করতে অপারগ (প্রমাণিত) হয় তাহলে সে দাস অবস্থার বিধানের দিকে ফিরে যাবে।

কেননা কিতাবাত চুক্তি রহিত হয়ে গেছে।

আর তার হাতে যে উপার্জিত সম্পদ রয়েছে, সেটা তার মনিবের হয়ে যাবে।

কেননা প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, এটা মনিবের গোলামের উপার্জন। এটা এজন্য যে, উক্ত সম্পদ গোলামের অনুকূলে কিংবা মনিবের অনুকূলে স্থগিত ছিল। এখন (অপারগতা প্রমাণিত হওয়ায়) স্থগিত অবস্থা বিদূরিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোকাতাব যদি মারা যায়, আর তার (পর্যাপ্ত) মাল থাকে, তাহলে কিতাবাত চুক্তি রহিত হবে না। বরং তার মাল থেকে তার উপর সাব্যস্ত দায় পরিশোধ করা হবে এবং তার জীবনের মুহূর্তগুলোর মধ্য হতে শেষ মুহূর্তটিতে সে মুক্ত হয়েছে বলে ফায়সালা দেয়া হবে। আর কিতাবাতের বিনিময় পরিশোধ করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তার ওয়ারিছরা মীরাছ সূত্রে পাবে এবং তার সন্তানাদি আযাদ হবে।

এটা হযরত আলী (রা) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর মত। এবং আমাদের ইমামগণ এমতই গ্রহণ করেছেন।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কিতাবাত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং সে গোলাম অবস্থায় মারা যাবে। আর যে সম্পদ সে রেখে যাবে সেটা তার মনিবের হবে। এ বিষয়ে তিনি সাহাবী হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা)-কে অনুসরণ করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, কিতাবাত চুক্তির উদ্দেশ্য হলো মুক্তি লাভ। আর তার মৃত্যুর কারণে সেটা সাব্যস্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সুতরাং কিতাবাত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। মুক্তি সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব হওয়ার কারণ এই যে, হয় মুক্তি তার মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য রূপে সাব্যস্ত করা হবে। কিংবা তার মৃত্যুর পূর্বে (জীবদ্দশার শেষ মুহূর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত অবস্থায়) সাব্যস্ত করা হবে। অথবা তার জীবিত অবস্থার উপর নির্ভর করে মৃত্যুর পর সাব্যস্ত হবে।

প্রথমটির কোন যৌক্তিকতা নেই। কেননা মুক্তি কার্যকর করার 'পাত্র' বিদ্যমান নেই।

দ্বিতীয়টিরও যৌক্তিকতা নেই। কেননা মুক্তি লাভের শর্ত তথা বিনিময়ের অর্থ পরিশোধ বিদ্যমান নেই।

তৃতীয়টিরও যৌক্তিকতা নেই। কেননা বর্তমানে সেটা সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব; অথচ কোন বিধান বর্তমানে সাব্যস্ত হওয়ার পর (অনিবার্য প্রয়োজনে) সেটাকে পিছনের সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়।

আমাদের দলীল এই যে, এটা হলো লেনদেন বিষযক চুক্তি। আর তা চুক্তির পক্ষদ্বয়ের একজনের অর্থাৎ মনিবের মৃত্যুতে বাতিল হয় না। সুতরাং অপরজনের (অর্থাৎ গোলামের) মৃত্যুতেও বাতিল হবে না। আর উভয় সূরতের মাঝে যোগসূত্র হলো হক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য চুক্তিকে বহাল রাখার প্রয়োজনীয়তা। বরং গোলামের ক্ষেত্রে তা আরো স্বাভাবিক। কেননা তার হক মনিবের হক থেকে অধিকতর জোরদার। কারণ গোলামের দিক থেকে চুক্তিটি অকাট্য।

আর মৃত্যু মালিকানাধীন হওয়াকে যতটা রোধ করে মালিকানাকে তার চেয়ে বেশী রোধ করে। সুতরাং (মৃত্যুর পরই তার মুক্তি সাব্যস্ত হবে এবং) তাকে গুণগতভাবে জীবিত ধরে নেয়া হবে। কিংবা পরিশোধ কারণ কে মৃত্যুপূর্ব লগ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্বাধীনতাকে সম্পৃক্ত করা হবে এবং তার স্থলবর্তীর পরিশোধকে তার নিজের পরিশোধ বলে গণ্য করা হবে। আর এ সবই বিবেচনা করা সম্ভব যার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ইলমুল খিলাফ শাস্ত্রে (প্রমাণ-বিতর্ক শাস্ত্রে) রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে না যায় কিন্তু কিতাবাত চুক্তি কালে জন্মগ্রহণকারী সন্তান রেখে যায়, তাহলে ঐ সন্তান পিতার কিতাবাত চুক্তি বিনিময় পিতার নির্ধারিত কিস্তি মত পরিশোধ করার জন্য উপার্জনে নিয়োজিত হবে। যখন সে পরিশোধ করার জন্য উপার্জনে নিয়োজিত হবে, যখন সে পরিশোধ করে ফেলবে তখন আমরা ফায়সালা দেবো যে, তার পিতা মৃত্যুপূর্ব লগ্নে মুক্তি লাভ করেছেন আর সন্তানও আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা মোকাতাবের সন্তান তার কিতাবাত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং তার উপার্জন মোকাতাবের উপার্জনতুল্য। সুতরাং পরিশোধের ক্ষেত্রে সে তার স্থলবর্তী হবে। এবং বিষয়টি পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে যাওয়ার সদৃশ হবে।

আর যদি কিতাবাত চুক্তিকালে ক্রয়কৃত সন্তান রেখে মারা যায় তাহলে ঐ সন্তানকে বলা হবে, হয় তুমি কিতাবাত চুক্তির বিনিময় নগদ পরিশোধ কর, নয়ত তোমাকে দাস অবস্থায় ফেরত দেয়া হবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর সাহেবায়ন (র) বলেন, কিতাবাত চুক্তিকালে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের উপর কিয়াস করে সেও পিতার মেয়াদ অনুযায়ী পরিশোধ করবে। উভয় সন্তানের মাঝে যোগসূত্র এই যে, উভয়ে পিতার অনুবর্তী রূপে কিতাবাত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত মোকাতাব। এ কারণেই মনিব এ সন্তানকে আযাদ করার অধিকার রাখে।

মোকাতাবের অন্য সমস্ত উপার্জিত সম্পদের বিষয়টি ভিন্ন (মনিব তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।)

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, এবং এটাই উভয় সূরতের মাঝে পার্থক্যের কারণ—চুক্তিতে মেয়াদের বিষয়টি শর্ত রূপে (যা চুক্তির মূল থেকে বহির্ভূত) সাব্যস্ত হয়। সুতরাং মেয়াদের শর্ত তার ক্ষেত্রেই সাব্যস্ত হবে, যে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর ক্রয়কৃত সন্তান চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কেননা চুক্তি তার দিকে সম্পৃক্ত হয়নি এবং চুক্তির বিধান তার দিকে বিস্তার লাভ করেনি। কারণ চুক্তিকালে সে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

কিতাবাত চুক্তিকালে জন্ম লাভকারী সন্তানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা কিতাবাতকালে সে পিতার দেহ সত্তায় যুক্ত ছিল। সুতরাং কিতাবাত চুক্তির বিধান তার দিকে বিস্তার লাভ করবে। আর যেহেতু সে চুক্তির বিধানভুক্ত হয়েছে সেহেতু সে চুক্তির কিস্তি পরিশোধের জন্য উপার্জনে নিয়োজিত হবে।

মোকাতাব যদি তার পুত্রকে ক্রয় করে, অতঃপর মারা যায় এবং কিতাবাত বিনিময় পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে যায়, তাহলে তার পুত্র তার ওয়ারিছ হবে।

কেননা যখন মোকাতাবের জীবদ্দশায় সর্বশেষ অংশে স্বাধীনতা লাভের সিদ্ধান্ত দেয়া হল, সেই সময়ে তার পুত্রের স্বাধীনতার ফায়সালা দেয়া হবে। কেননা কিতাবাত চুক্তিতে সে তার পিতার অনুবর্তী। সুতরাং সে স্বাধীন পিতার উত্তরাধিকার লাভকারী স্বাধীন পুত্র বলে গণ্য হবে।

তদ্রূপ একই বিধান হবে যদি মোকাতাব ও তার পুত্র অভিন্ন কিতাবাত চুক্তিবলে মোকাতাব হয়।

কেননা পুত্র যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাহলে সে তার পিতার অনুবর্তী হবে। আর যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাহলে একই চুক্তির অধীনে হওয়ার কারণে উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং যখন পিতার স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে সেই মুহূর্তে তারও স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মোকাতাব যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এক স্ত্রীর গর্ভ থেকে তার একটি সন্তান রয়েছে, আর সে কিতাবাত চুক্তির বিনিময় পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ পাওনা রেখে যায়, অতঃপর সন্তান কোন 'হত্যা অপরাধ' সংঘটিত করে, আর অপরাধের নির্ধারিত দন্ড (দিয়াত) আদালত ফায়সালার মাধ্যমে মায়ের আকিলাহদের (বেরাদরী) উপর আরোপ করা হয়, তাহলে এই ফায়সালাকে মোকাতাবের অপারগতার ফায়সালা বলে গণ্য করা হবে না।

কেননা এই ফায়সালা কিতাবাতচুক্তির বিধানকে সাব্যস্ত করছে। কেননা কিতাবাত চুক্তির দাবী হল মোকাতাবের সন্তানকে মায়ের মাওয়ালী (আযাদকারীদের) সঙ্গে যুক্ত করা এবং (সন্তানের অপরাধের) দিয়াত তাদের উপর সাব্যস্ত করা। তবে এমনভাবে যে, মোকাতাবের মুক্তিলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তখন সন্তানের ওয়ালা সম্পর্ক পিতার মাওয়ালীদের দিকে টেনে আনা হবে। আর এমন বিষয়ের ফায়সালা করা যা কিতাবাতের বিধানকে সাব্যস্ত করে তা মোকাতাবের অপারগতার ঘোষণা বলে সাব্যস্ত হতে পারে না।

পক্ষান্তরে মায়ের মাওয়ালী এবং পিতার মাওয়ালীদের মাঝে যদি তার ওয়ালা সম্পর্কের দাবী নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়, আর মায়ের মাওয়ালীদের অনুকূলে ওয়ালা সম্পর্কের ফায়সালা প্রদান করা হয়, তাহলে সেটা মোকাতাবের অপারগতার (এবং কিতাবাত চুক্তি রহিতির) ফায়সালা বলে গণ্য হবে।

কেননা এটা হলো ওয়ালা সম্পর্ক নিয়ে স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য রূপে প্রত্যক্ষ বিবাদ। আর ওয়ালা সম্পর্কের ভিত্তি হল কিতাবাত চুক্তি বহাল থাকা ও রহিত হওয়ার উপর। কেননা কিতাবাত চুক্তি যদি রহিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে মুকাতাবটি গোলাম রূপে মারা যাবে এবং ওয়ালা সম্পর্ক মায়ের মাওয়ালীদের মাঝে স্থগিত হবে। আর যদি কিতাবাত চুক্তি বহাল থাকে এবং তার সঙ্গে পরিশোধ যুক্ত হয়, তাহলে সে স্বাধীনরূপে মারা যাবে এবং ওয়ালা সম্পর্ক পিতার মাওয়ালীদের দিকে স্থানান্তরিত হবে।

আর মোকাতাবের মৃত্যুর পর কিতাবাত চুক্তি বহাল থাকা ও রহিত হয়ে যাওয়া ইজতিহাদী বিষয়। সুতরাং তার সঙ্গে যে আদালতি ফায়সালা যুক্ত হবে সেটা কার্যকর হবে। এ কারণেই এই ফায়সালাকে মোকাতাবের অপারগতার ফায়সালা বলে গণ্য করা হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মোকাতাব যে সকল সাদাকা গ্রহণ করেছে এবং মনিবকে পরিশোধ করেছে; মোকাতাব যদি অপারগ হয়ে যায়, তবে মনিবের জন্য তা হালাল হবে।

কেননা মালিকানার পরিবর্তন হয়েছে।

কেননা মোকাতাব সাদাকা রূপে এর মালিকানা গ্রহণ রয়েছে, আর মনিব মুক্তির বিনিময় হিসেবে এর মালিকানা গ্রহণ করেছে। আর এই মালিকানা পরিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে, হযরত বারীরা (রা) এর হাদীসে- هى لها صدقة ولنا هدية .

এটা তার জন্য সাদাকা, আর আমাদের জন্য হাদিয়া।

আর এটা ঐ সূরতের বিপরীত, যখন কোন দরিদ্র ব্যক্তি সাদাকা রূপে গ্রহণকৃত বস্তু ধনীর জন্য এবং হাশেমীর জন্য মোবাহ করে দেয়। কেননা যার জন্য মোবাহ করা হল সে মোবাহকারীর মালিকানা থেকে ব্যবহার করেছে। সুতরাং এখানে মালিকানা পরবর্তিত হয়নি। ফলে ধনীর জন্য ও হাশেমীর জন্য তা হালাল হবে না।

এর সদৃশ মাসআলা এই যে, ফাসিদ চুক্তি বলে ক্রয়কারী যদি ক্রয়কৃত বস্তুটি অন্য কারো জন্য মোবাহ করে দেয় তাহলে তার জন্য হালাল বলে বিবেচিত হবে না।

পক্ষান্তরে যদি তাকে মালিক বানিয়ে দেয় তাহলে (পরিবর্তিত মালিকানার কারণে) তার জন্য তা হালাল হয়ে যাবে।

আর যদি উক্ত সাদাকা দ্রব্য মনিবের কাছে পরিশোধ করার পূর্বে সে অপারগ হয়ে যায়, তাহলেও একই বিধান। (অর্থাৎ মনিবের জন্য হালাল হবে)।

ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মত অনুযায়ী এটা স্পষ্ট। কেননা তাঁর মতে অপারগতা দ্বারা মালিকানা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতেও একই বিধান হবে, যদিও তার মতে অপারগতা দ্বারা মনিবের (পূর্বলব্ধ) মালিকানাই স্থিত হয়।

কেননা স্বকীয়ভাবে সাদাকা মালে কোন নিকৃষ্টতা নেই। নিকৃষ্টতা হলো 'গ্রহণ কর্মে'। কারণ এটা হল নিজেকে হেয় করা। তাই বিনা প্রয়োজনে ধনীর জন্য তা জায়িয হবে না। আর হাশেমীর জন্য জায়িয হবে না তার অতিরিক্ত মর্যাদার কারণে। আর গ্রহণকর্মটি মনিবের পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়নি। সুতরাং এটা সেই মুসাফিরের মত হল, যে নিজের দেশে ফিরে এসেছে এবং সেই দরিদ্রের মত হল, যে সচ্ছলতা লাভ করেছে; অথচ তাদের হাতে পূর্বে গ্রহণকৃত সাদাকার কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সেটা তাদের জন্য হালাল হবে। এই ভিত্তিতে মোকাতাব যদি স্বাধীন হওয়ার পর মালদার হয়ে যায়, আর তার হাতে (পূর্বে গ্রহণকৃত) সাদাকার মাল অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলে তা তার জন্য হালাল হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, গোলাম যদি (অনিচ্ছাকৃত) হত্যা অপরাধ সংঘটিত করে, তারপর মনিব তার সঙ্গে কিতাবাত চুক্তি করে অথচ অপরাধের বিষয়টি মনিবের জানা ছিল না, অত:পর অপারগ হয়ে যায়, তাহলে মনিব হয় গোলামকে (নিহতের অভিভাকদের হাতে) অর্পণ করবে, নয়ত দিয়াত আদায় করবে।

কেননা এটাই হল গোলামের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে মূল বিধান। আর (কিতাবাতের সময়) মনিবের তো অপরাধ সম্পর্কে জানা ছিল না, যাতে বলা যায় যে, কিতাবাত চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে দিয়াত আদায়ের দিকটি সে গ্রহণ করেছে। তবে কিতাবাত চুক্তিটি অর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ছিল। সেই প্রতিবন্ধক যখন দূর হয়ে গেল, তখন মূল বিধান ফিরে আসবে।

তদ্রূপ (মনিবের ইচ্ছাধিকার থাকবে) যদি মোকাতাব (অনিচ্ছাকৃত) কোন অপরাধ সংঘটন করে আর অপরাধের দন্ড সম্পর্কে ফায়সালা হওয়ার পূর্বে সে অপারগ হয়ে যায়।

কারণ তা-ই যা আমরা বলেছি, অর্থাৎ প্রতিবন্ধক দূর হওয়া।

আর যদি কিতাবাত বিদ্যমান অবস্থায় তার বিপক্ষে অপরাধের দন্ড সম্পর্কে ফায়সালা জারি হয়ে যায়, অত:পর সে অপারগ হয়ে যায়, তাহলে তা তার যিম্মায় ঋণ থাকবে এবং সে ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে বিক্রি করা হবে, আদালতি ফায়সালার কারণে। কেননা, পাওনা হক দাস সত্তা থেকে তার মূল্যের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদের (র)-এর মত। পরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ মতের দিকে রুজু করেছেন। আগে তিনি মত পোষণ করতেন যে, আদালতের ফায়সালার পূর্বে অক্ষম হয়ে পড়লেও (অরপাধের দন্ড জনিত) ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে বিক্রি করা হবে। এটা ইমাম যুফার (র)-এরও মত।

কেননা অপরাধ সংঘটনের সময় গোলামকে অর্পণের বাধা তথা কিতাবাত চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার সময়ই মূল্য সাব্যস্তকারী রূপে সংঘটিত হয়েছে। যেমন মোদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের অপরাধের ক্ষেত্রে।

আমাদের দলীল এই যে, কিতাবাত চুক্তির বিনিময় পরিশোধ করতে পারবে কি পারবে না, এই অনিশ্চয়তার কারণে প্রতিবন্ধকটি বিদূরিত হওয়ার যোগ্য (বলে

বিবেচনা করা যায়) তবে (দাস সত্তা থেকে মূল্যের দিকে) বর্তমান অবস্থায় স্থানান্তর সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং সেটা আদালতের ফায়সালা কিংবা (মনিবের) সম্মতির উপর নির্ভর করবে।

আর এটা কবজার পূর্বে পালিয়ে যাওয়া বিক্রীত গোলামের মত হবে। অনিশ্চয়তার কারণে এবং ফিরে আসার সম্ভাবনার কারণে বিক্রয় চুক্তি 'রহিত' আদালতের ফায়সালার উপর নির্ভর করবে। এটাও তেমন হবে।

মোদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মোদাব্বার ঘোষণা এবং 'সন্তান-মাতৃত্ব' কোন অবস্থাতেই বিলুপ্তি গ্রহণ করে না।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন, মোকাতাবের মনিব যদি মারা যায় তাহলে কিতাবাত চুক্তি রহিত হবে না।

যাতে মোকাতাবের হক বাতিল্ করা অনিবার্য না হয়। কারণ কিতাবাত চুক্তি হল স্বাধীনতা লাভের কারণ। আর মানুষের হক লাভের 'কারণটি' অক্ষুণ্ন থাকা তার একটি হক।

আর তাকে বলা হবে যে, তুমি মনিবের ওয়ারিছদের কাছে মনিবের নির্ধারিত কিস্তিতে মাল পরিশোধ করতে থাকো।

কেননা সে (কিস্তিতে পরিশোধের) এই পদ্ধতিতে স্বাধীনতা লাভের অধিকারী হয়েছে। আর কারণটি এভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং এই গুণসহ তা বিদ্যমান থাকবে। এবং তাতে কোন পরিবর্তন আসবে না। তবে উশুল করার ক্ষেত্রে ওয়ারিছগণ মনিবের স্থলবর্তী হবে।

এখন কোন ওয়ারিছ যদি তাকে আযাদ করে দেয় তবে তা কার্যকর হবে না। কেননা সেতো গোলামটির মালিক হয়নি। এর কারণ এই যে, মালিকানা লাভের যতগুলো কারণ রয়েছে, তার কোনটি দ্বারাই মোকাতাবের মালিকানা অর্জন করা যায় না। সুতরাং উত্তরাধিকারের কারণ দ্বারাও মালিকানা লাভ করা যাবে না।

তবে সবাই যদি তাকে আযাদ করে দেয় তাহলে (সূক্ষ্ম কিয়াস মতে) আযাদ হয়ে যাবে। এবং কিতাবাত চুক্তির বিনিময় পরিশোধের দায় তার যিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে।

কেননা সকলের মুক্তিদানের অর্থ হবে কিতাবাত চুক্তির বিনিময় থেকে অব্যাহতি দান, যা তাদের নিজস্ব হক। আর তাতে উত্তরাধিকার কার্যকর হয়। সুতরাং মোকাতাব যখন কিতাবাত চুক্তির বিনিময় পরিশোধের দায় থেকে অব্যাহতি পেলো তখন সে আযাদ হয়ে যাবে, যেমন মনিব তাকে অব্যাহতি দিলে আযাদ হয়ে যেতো। তবে ওয়ারিছদের একজন তাকে আযাদ করলে সেটা তার প্রাপ্য হিস্সা থেকে অব্যাহতি দান গণ্য করা হবে না। কেননা মুক্তিদানকে আমরা অব্যাহতি দান বলে বিবেচনা করেছি তার মুক্তিদানকে বৈধতা প্রদানের অনিবার্য দাবী হিসাবে। অথচ বিনিময়ের অংশবিশেষ থেকে অব্যাহতি দানের কারণে কিংবা অংশ বিশেষ পরিশোধের কারণে মোকাতাবের মধ্যে চুক্তি দান সাবাস্ত হয় না, না তার অংশ বিশেষে, না তার সমগ্র সত্তায়। আর অন্যদের ওয়ারিছের হক বিদ্যমান থাকার কারণে (একজনের মুক্তিদানকে) সমগ্র সত্তা থেকে অব্যাহতি দান সাব্যস্ত করাও সম্ভব নয়। আল্লাহই অধিক অবগত।

كِتَابُ الْوَلَاءِ

অধ্যায় ঃ ওয়ালা সম্পর্ক

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ওয়ালা দু'প্রকার। একটা মুক্তি ভিত্তিক ওয়ালা, এটাকে নিয়ামত ভিত্তিক ওয়ালাও বলা হয়। এই ওয়ালা-এর কারণ হল তার মালিকানায় গোলামের মুক্তি সাব্যস্ত হওয়া। এটাই বিশুদ্ধ মত। এমনকি যদি উত্তরাধিকার সূত্রে তার কোন নিকটাত্মীয় তার পক্ষে আযাদ হয়ে যায়, তবে ওয়ালা তার অনুকূলেই সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় প্রকার হল চুক্তিভিত্তিক ওয়ালা।-এর কারণ হল পারস্পরিক সৌহার্দ্যের চুক্তি। জন্যই উপরোক্ত কারণ দ্বয়ের দিকে সম্পর্কিত করে মুক্তি ভিত্তিক ওয়ালা ও চুক্তি ত্তিক ওয়ালা বলা হয়। আর বিধানকে তার কারণের দিকে সম্পর্কিত করা হয়ে কে।

আর এ দুটি ওয়ালার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্য রয়েছে। আরবরা বিভিন্ন সূত্র ধরে পরস্পরের সাহায্য করতো। নবী (সা) উভয় প্রকার ওয়ালা দ্বারা সাহায্য গ্রহণকে বহাল রে ছেন, এবং বলেছেন,

إن مولى القوم منهم وحليفهم منهم ·

কোন গোষ্ঠীর আযাতকৃত গোলাম ঐ সম্পদায় ভুক্ত এবং কোন সম্প্রদায়ের শপথ মিত্র ঐ গোষ্ঠীভুক্ত।

এখানে حليف (বা শপথ মিত্র দ্বারা) موالاة (বা সৌহার্দ্য চুক্তির) 'মাওলা' উদ্দেশ্য। কেননা আরবরা সৌহার্দ্য চুক্তিকে শপথ দ্বারা জোরদার করতো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যদি তার গোলামকে আযাদ করে তাহলে গোলামের ওয়ালা মনিবের অনুকূলে সাব্যস্ত হবে।

কেননা নবী (সা) বলেছেন, الولاء لمن أعتق ·

ওয়ালার অধিকারী ঐ ব্যক্তি হবে, যে মুক্তিদান করেছে।

কারণ এই যে, মুক্তিদানের কারণেই পারস্পরিক সাহায্য লাভ হয়। ফলে আযাদকারী মনিব আদাযকৃত গোলামের দিয়াত আদায় করেন। পক্ষান্তরে তিনি যেহেতু গোলামের দেহসত্তাকে দাসত্ব বিলুপ্ত করার মাধ্যমে তাকে গুণগতভাবে জীবন দান

করেছেন, সেহেতু মনিব তার উত্তরাধিকার লাভ করবেন, এবং ওয়ালা সম্পর্ক জন্মদান সম্পর্কের ন্যায় হয়ে যাবে।

তাছাড়া (দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে) আরেকটি কারণ এই যে, 'দায়' বহনের কারণে উপকার সাব্যস্ত হয়।

তদ্রূপ স্ত্রী লোক তার গোলামকে আযাদ করার ক্ষেত্রে গোলামের ওয়ালার অধিকারী হবে।

কারণ আমাদের বর্ণিত হাদীস। আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত হামযা (রা)-এর এক কন্যার আযাদকৃত গোলাম তাঁর জীবদ্দশায় একটি কন্যাসন্তান রেখে মারা যায়, তখন নবী (সা) আযাদকৃত গোলামের উত্তরাধিকার সম্পদকে উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টন করেছিলেন।

ওয়ালার অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদান এবং অর্থ ছাড়া মুক্তিদান অভিন্ন হবে। কারণ, আমরা যে হাদীস উল্লেখ করেছি তা নি:শর্ত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি আযাদী প্রাপ্ত গোলাম শর্ত করে যে, সে 'ওয়ালাযুক্ত' হবে তাহলে শর্ত বাতিল হবে, এবং আযাদকারীর অনুকূলে ওয়ালা সাব্যস্ত হবে।

কেননা এটা হল 'নাছ' বিরোধী শর্ত। সুতরাং তা সিদ্ধ হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোকাতাব যখন কিতাবাতের বিনিময় পরিশোধ করবে তখন সে স্বাধীন হয়ে যাবে এবং তার মনিব ওয়ালার অধিকারী হবে। এমন কি মনিবের মৃত্যুর পর স্বাধীনতা লাভ করলেও।

কেননা মনিব কিতাবাত নামক 'কারণটি' সৃষ্টি করেছেন বলেই তার পক্ষ থেকে সে স্বাধীনতা লাভ করেছে, মোকাতাব পর্বে আমরা বিষয়টি যথাযথ বর্ণনা করেছি।

তদ্রূপ যে গোলামকে মুক্তিদানের অছিয়ত করা হয়েছে, কিংবা তার মৃত্যুর পর তাকে ক্রয় করে মুক্তিদানের অছিয়ত করা হয়েছে, তার ওয়ালা অছিয়তকারীর অনুকূলে হবে।

কেননা মূছী -এর মৃত্যুর পর অছীর কর্ম মূছীর কর্ম রূপেই গণ্য হয়। এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিধান অনুযায়ী মৃতের মালিকানাভুক্ত থাকে।

আর মনিব মারা গেলে তার সকল মোদাব্বার ও তার উম্মে ওয়ালাদ মুক্ত হয়ে যাবে। এর কারণ তা-ই যা আমরা ইতাক পর্বে আলোচনা করেছি।

আর তাদের ওয়ালা মনিবের জন্য হবে।

কেননা মোদাব্বার ঘোষণা ও উম্মে ওয়ালাদ বানানোর কারণে সে-ই তাদের আযাদ করেছে।

আর কেউ যদি তার মাহরাম আত্মীয়র মালিকানা লাভ করে সে তার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে।

এর কারণ আমরা ইতাক পর্বে আলোচনা করেছি।

আর তার ওয়ালা মনিবের জন্য হবে।

কেননা এখানে ওয়ালা লাভের কারণ বিদ্যমান। আর তা হল তার পক্ষ থেকে আযাদ হওয়া।

আর কারো গোলাম যদি অন্য কারো দাসীকে বিবাহ করে, আর দাসীর মনিব দাসীকে গোলাম কর্তৃক গর্ভবতী অবস্থায় মুক্তিদান করে তাহলে দাসী আযাদ হয়ে যাবে এবং তার গর্ভস্থ সন্তানও আযাদ হবে।

আর গর্ভস্থ সন্তানের ওয়ালা মায়ের মনিবের জন্য হবে। কখনো তার থেকে স্থানান্তরিত হবে না।

কেননা গর্ভস্থ সন্তান উদ্দেশ্য রূপেই মায়ের মুক্তিদাতার পক্ষ থেকে মুক্তি লাভ করেছে। কারণ সে তার মায়ের অংশ ছিল, যা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য রূপে মুক্তিদান গ্রহণের যোগ্যতা রাখে। সুতরাং মায়ের মনিব থেকে তার ওয়ালা সম্পর্ক কখনো স্থানান্তরিত হবে না— আমাদের বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করার প্রেক্ষিতে।

তদ্রূপ (একই বিধান হবে) যদি মুক্তিদানের সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ে সে সন্তান প্রসব করে।

কেননা মুক্তিদানের সময় গর্ভ বিদ্যমান থাকার নিশ্চয়তা রয়েছে।

কিংবা যদি দুটি সন্তান প্রসব করে, যাদের একটির প্রসব কাল ছয় মাসের কম হয়।

কেননা এরা এক সময়ে গর্ভসঞ্চার প্রাপ্ত যমজ।

আর স্ত্রী যদি গর্ভাবস্থায় কোন লোকের সঙ্গে মাওয়ালাত সম্পর্ক স্থাপন করে আর স্বামীও অন্য কারো সঙ্গে মাওয়ালাত সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে তার হুকুম ভিন্ন হবে। অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তানের ওয়ালার অধিকারী পিতার মাওলা হবে।

কেননা গর্ভস্থ সন্তান স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য রূপে মাওয়ালাতের ওয়ালার যোগ্য নয়। কারণ মাওয়ালাতের ওয়ালা সম্পন্ন হয় ঈজাব ও কবুল দ্বারা। আর গর্ভস্থ সন্তান ঈজাব ও কবুলের পাত্র নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দাসীটি যদি তার মুক্তি লাভের ছয় মাসের বেশী সময়ে সন্তান প্রসব করে তাহলে সন্তানের ওয়ালা মায়ের মাওলার জন্য হবে।

কেননা সে মায়ের মুক্তিলাভের পর মায়ের দেহসত্তায় যুক্ত থাকার কারণে মায়ের অনুবর্তী রূপে মুক্তিলাভ করেছে; সুতরাং ওয়ালার ক্ষেত্রেও সে তার মায়ের অনুবর্তী হবে। স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য রূপে সন্তানটির মুক্তি সাব্যস্ত হবে না। কেননা মুক্তি দানের সময় গর্ভ বিদ্যমান থাকার বিষয়টি নিশ্চিত নয়।

পরবর্তীতে পিতা যদি মুক্তি লাভ করে তাহলে পিতা তার সন্তানের ওয়ালা টেনে আনবে। আর তা মায়ের মনিব থেকে পিতার মনিবের দিকে স্থানান্তরিত হবে।

কেননা এখানে সন্তানের ক্ষেত্রে মুক্তি সাব্যস্ত হয়েছে, মায়ের অনুবর্তী রূপে। প্রথম সূরতটি ভিন্ন।

এভাবে ওয়ালা টেনে নেয়ার যৌক্তিকতা এই যে, ওয়ালা হচ্ছে নসব (বংশ পরিচয়)-এর পর্যায়ভুক্ত। নবী (সা) বলেছেন,

الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يرث ·

ওয়ালা হলো বংশ সম্পর্কের ন্যায়-এর বিক্রি, দান ও উত্তরাধিকার হতে পারে না।

আর বংশ পিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং ওয়ালাও পিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে।

তবে পিতার যোগ্যতা অবিদ্যমান থাকায় প্রয়োজনের তাকীদে ওয়ালা মায়ের মাওয়ালীদের দিকে সম্পৃক্ত হয়েছিল। অত:পর যখন সে মুক্তি লাভের মাধ্যমে যোগ্য হল তখন ওয়ালা তার দিকে ফিরে আসবে। যেমন লিআনগ্রস্ত মায়ের সন্তান প্রয়োজনের তাগিদে মাতৃ গোত্রের পরিচয়ে পরিচিত হয়। কিন্তু লিআনকারী যখন নিজের মিথ্যাচার স্বীকার করে তখন সন্তানের নসব তার দিকে সম্পৃক্ত হয়।

পক্ষান্তরে স্বামীর মৃত্যুর কারণে বা তালাকের কারণে ইদ্দতরত দাসী যদি মুক্তি লাভ করে এবং মৃত্যুর বা তালাকের সময় থেকে দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে যদি সন্তান প্রসব করে, তাহলে সন্তানটি এমনকি বাপ মুক্তি লাভ করলেও মায়ের মনিরেব দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।

কেননা মৃত্যুপরবর্তী সময়ে স্বামীর সঙ্গে গর্ভ সঞ্চারের সম্পৃক্তি সম্ভব নয়। তদ্রূপ বায়ন তালাকের পরেও সম্ভব নয়। কেননা ঐ সময় সহবাস হারাম। এমন কি রেজয়ী তালাকের পরেও সম্ভব নয়। কেননা সন্দেহজনক ভাবে সে তালাক প্রত্যাহারকারী হয়। সুতরাং গর্ভসঞ্চারকে বিবাহের অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং মুক্তিদানের সময় সন্তান গর্ভে বিদ্যমান ছিল বলে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সন্তানটি উদ্দেশ্য মূলকভাব মুক্তি লাভ করবে।

'জামে ছাগীর' কিতাবে রয়েছে, মুক্তিলাভকারিণী নারী যদি কোন গোলামকে বিবাহ করে আর সে সন্তান প্রসব করে, আর ঐ সন্তানেরা অপরাধ সংঘটন করে বসে, তাহলে তাদের দিয়াত মায়ের মনিবের উপর আরোপিত হবে।

কেননা তারা তাদের মায়ের অনুবর্তী রূপে মুক্তিলাভ করেছে। আর তাদের পিতার কোন নিকট আত্মীয় এবং মাওয়ালাী নেই। সুতরাং প্রয়োজনের তাকীদের মায়ের মাওয়ালীদের সঙ্গে তাদের যুক্ত করা হবে। যেমন আমাদের পূর্ব আলোচনা মতে লিআনগ্রস্ত মায়ের সন্তানের ক্ষেত্রে।

এরপর যদি পিতা মুক্তি লাভ করে, তাহলে সে সন্তানদের ওয়ালা নিজের দিকে টেনে আনবে। এর কারণ আমারা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

তবে মায়ের মাওয়ালীরা তাদের পরিশোধকৃত দিয়তের ব্যাপারে পিতার নিকট আত্মীয়দের কাছে রুজু করতে পারবে না।

কেননা তারা যখন তার দিয়াত পরিশোধ করেছে তখন ওয়ালা তাদের অনুকূলে সাব্যস্ত ছিল; পরবর্তীতে পিতার অনুকূলে ওয়ালা সাব্যস্ত হয় তার মুক্তি লাভের সময়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ অবস্থায়।

কেননা তার অনুকূলে ওয়ালা সম্পর্ক সাব্যস্ত হওয়ার কারণ অর্থাৎ তার মুক্তি সময়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ।

পক্ষান্তরে লিআনগ্রস্ত নারীর সন্তান যদি অপরাধ করে আর মাতৃ গোত্র তার দিয়ত পরিশোধ করে অত:পর লিআনকারী নিজের মিথ্যাচার স্বীকার করে, তখন মাতৃ গোত্র পিতার কাছে দিয়তের দাবী রুজু করতে পারবে। কেননা সেখান নসব গর্ভ সঞ্চারের সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত অবস্থায় সাব্যস্ত হয়। আর মাতৃ গোত্র দিয়ত পরিশোধ করার ব্যাপারে বাধ্য ছিল। সুতরাং তা রুজু করার অধিকার লাভ করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন স্বাধীন আজমী যদি কোন আরবের আযাদকৃত দাসীকে বিবাহ করে, আর দাসীটি আজমী স্বামীর ঔরসে সন্তান প্রসব করে তাহলে দাসীর সন্তানদের ওয়ালা দাসীর আযাদকারীদের অনুকূলে সাব্যস্ত হবে।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহম্মদ (র)-এরও এই মত।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, সন্তানের ক্ষেত্রে বিধান পিতার বিধানের অনুরূপ হবে।

কেননা তার নসব পিতার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন পিতা যদি আরবী হয়। তবে পিতা গোলাম হলে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা গুণগতভাবে সে মৃত।

তারফায়নের দলীল এই যে, মুক্তি ভিত্তিক ওয়ালা সম্পর্ক একটি শক্তিশালী সম্পর্ক এবং আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য। এ কারণেই বৈবাহিক সমকক্ষতার ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য হয়। পক্ষান্তরে আজমীদের নসব দুর্বল। কেননা তারা তাদের বংশ তালিকা সংরক্ষণ করেনি। এ কারণেই তাদের নিজেদের মাঝেও বৈবাহিক সমকক্ষতার ক্ষেত্রে বংশ পরিচয় বিবেচ্য নয়। আর দুর্বল শক্তিশালীর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।

পক্ষান্তরে পিতা আরব হলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা আবরদের বংশ পরিচয় শক্তিশালী এবং বৈবাহিক সমকক্ষতার বিধানের ক্ষেত্রে এবং দিয়তের দায় গ্রহণের ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য। কেননা আবরদের পারস্পরিক সাহায্য 'নসব'-এর ভিত্তিতে হয়। সুতরাং নসব তাদেরকে ওয়ালা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মতপার্থক্য হচ্ছে নি:শর্ত রূপে সাধারণ মুক্ত দাসীর ক্ষেত্রে। (ইমাম কুদূরী কর্তৃক) আরবের আযাদকৃত দাসী দ্বারা মাসআলার কাঠামো নির্ধারণ ঘটনাক্রমে হয়েছে।

'জামে ছাগীর' কিতাবে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আজমী কাফের কোন কাওমের আযাদকৃত দাসীকে বিবাহ করল। অত:পর আজমী ইসলাম গ্রহণ করল এবং কোন একজন লোকের সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক ওয়ালা সম্পর্কে আবদ্ধ হল। অত:পর 'মুক্ত দাসী'

সন্তান প্রসব করল; সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মায়ের মাওয়ালী সন্তাদের মাওয়ালী হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, পিতার মাওয়ালী সন্তানদের মাওয়ালী হবে।

কেননা ওয়ালা সম্পর্ক অধিকতর দুর্বল হলেও তা পিতার দিক থেকে বিবেচ্য। সুতরাং এটা (স্বাধীন) আজমী স্বামী এবং (স্বাধীন) আরব স্ত্রীর মাঝে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের মতই হল।

তারফায়নের দলীল এই যে, সৌহার্দ্যমূলক ওয়ালা সম্পর্ক অধিকতর সম্পর্ক রহিতকরণ গ্রহণ করে না। আর শক্তিশালীর মোকাবেলায় দুর্বল প্রকাশ লাভ করতে পারে না।

আর যদি পিতা-মাতা উভয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ওয়ালা-এর সম্পৃক্তি পিতৃ গোত্রের সঙ্গে হবে। কেননা উভয় পক্ষ সমান। তবে বংশ সম্পর্কের সঙ্গে ওয়ালা সম্পর্কের সাদৃশ্যের কারণে পিতার দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করবে। কিংবা এই জন্য যে, পিতা দ্বারা বেশী সাহায্য পাওয়া যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুক্তি ভিত্তিক ওয়ালা সম্পর্ক 'আছাবাহ সম্পর্ক' সৃষ্টি করে। সুতরাং মুক্তিদাতা মাওলা ফুফু ও খালার চাইতে মীরাছের অধিক হকদার হবে।

কেননা যে ছাহাবী গোলাম খরিদ করে আযাদ করেছিলেন তাকে সম্বোধন করে নবী (সা) বলেছিলেন, সে তোমার (দ্বীনি) ভাই এবং তোমার মাওলা। সে যদি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে সেটা তার জন্য কল্যাণজনক হবে। কিন্তু তোমার জন্য অকল্যাণজনক হবে। আর যদি সে তোমার প্রতি কৃতঘ্ন হয় তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণজনক হবে; কিন্তু তার জন্য অকল্যাণজনক হবে।

আর সে যদি কোন 'ওয়ারিছ' না রেখে মারা যায় তাহলে তুমি তার আছাবাহ হবে।

এই আছাবাহ সম্পর্কের ভিত্তিতেই নবী (সা) হযরত হামযার কন্যাকে তাঁর মুক্তি প্রাপ্ত গোলামের উত্তরাধিকার দান করেছিলেন। অথচ তার ওয়ারিছ (কন্যা) বিদ্যমান ছিল।

যাই হোক মুক্তিদাতা মাওলা যখন আছাবাহ হল তখন তাকে 'যাবীল আরহাম'-এর উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। হযরত আলী (রা) থেকে তা-ই বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের কোন বংশীয় আছাবাহ থাকে তাহলে সে মুক্তিদাতা থেকে অগ্রাধিকার লাভ করবে। কেননা মুক্তিদাতা হল শেষতম আছাবা।

এটা এজন্য যে, নবী (সা)-এর বক্তব্য ولم يترك وارثا (এবং কোন ওয়ারিছ রেখে যায়নি) সম্পর্কে আলিমগণ বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হল আছাবা ওয়ারিছ (নি:শর্ত ওয়ারিছ নয়।)-এর প্রমাণ হল (হযরত হামযার কন্যা সম্পর্কিত) দ্বিতীয় হাদীস। সুতরাং মুক্তিদাতা বংশীয় আছাবা থেকে পশ্চাদবর্তী হবে। যাবিল আরহাম থেকে পশ্চাদবর্তী হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের যদি কোন বংশীয় আছাবাহ থাকে তাহলে সে মুক্তিদাতা থেকে অগ্রবর্তী হবে।

এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি।

আর যদি তার কোন বংশীয় আছাবাহ না থাকে তাহলে তার 'মীরাছ' মুক্তিদাতার প্রাপ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র)-এর উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা এই যে, যদি ঐ গোলামের (কোন বংশীয় আছাবাহ না থাকে এবং) এমন নির্ধারিত হিস্‌সা ওয়ালা ওয়ারিছ না থাকে, যার আছাবাগত অবস্থাও রয়েছে। যদি আছাবাগত অবস্থার অধিকারী হিস্‌সাদার (যাবিল ফুরূয) ওয়ারিছ থাকে তাহলে নির্ধারিত হিস্‌সা লাভের পর অবশিষ্ট সম্পত্তিও সে পারে। কেননা আমাদের বর্ণিত হাদীস মতে সে হল 'আছাবা'। আর আছাবা ঐ ব্যক্তি হয়ে থাকে, যাদের দ্বারা বংশগত সম্পৃক্তির কারণে পারস্পরিক সাহায্য লাভ হয়। যেমন আগে আলোচনা হয়েছে। আর আছাবা (নির্ধারিত হিস্‌সা বণ্টনের পর) অবশিষ্ট সম্পত্তি লাভ করে।

আর যদি মুক্তিদাতা মাওলা মারা যায়, তারপর মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম মারা যায় তাহলে তার মীরাছ মাওলার পুত্ররা পাবে; কন্যারা পাবে না।

কেননা স্ত্রীলোকেরা শুধু তাদের ওয়ালা পাবে যাদের তারা আযাদ করেছে, কিংবা তাদের আযাদকৃতরা যাদের আযাদ করেছে কিংবা তারা যাদের মোকাতাব বানিয়েছে। কিংবা তাদের মোকাতাবরা যাদের মোকাতাব বানিয়েছে। এভাবেই নবী (সা) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের শেষে এই শব্দ এসেছে أو جر ولاء معتقهن (কিংবা যে তাদের আযাদকৃতের ওয়ালা সম্পর্ক টেনে আনে) আর ওয়ালা সম্পর্ক টেনে আনার ছূরত পূর্বে আমরা বলেছি।

তাছাড়া এই কারণে যে, মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের মাঝে মালিকত্ব ও শক্তি অর্জিত হয় তার মুক্তি দানকারিণীর মালিকানা থেকে। সুতরাং তার ওয়ালা তার মুক্তিদানকারিণীর দিকেই সম্পৃক্ত হবে। এবং মুক্তিদানকারিণীর মুক্ত গোলামের সঙ্গে যাদের সম্পৃক্তি হবে তাদের ওয়ালা সম্পর্কও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে।

নসবের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা নসবের ক্ষেত্রে সম্পৃক্তির কারণ হল 'শয্যাধিকার'। আর শয্যাধিকারী হল স্বামী। আর 'শয্যার' ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক মালিক নয় বরং মালিকানাধীন।

আর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের মীরাছ মুক্তিদাতা মাওলার পুত্রদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা মাওলার পর্যায়ক্রমে নিকটতর আছাবাদের প্রাপ্য হবে।

কেননা ওয়ালা উত্তরাধিকার যোগ্য নয়, যাতে যাবিল ফুরূযদের নির্ধারিত হিস্‌সার প্রশ্ন আসতে পারে। বরং ওয়ালা-এর ক্ষেত্রে সেই তার স্থলবর্তী হবে, যার দ্বারা সাহায্য লাভ হয়। সুতরাং মুক্তিদাতা যদি পিতা ও পুত্র রেখে মারা যায়, তখন ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে ওয়ালা পুত্রের হবে। কেননা আছাবা সূত্রে উভয়ের মাঝে পুত্রই অধিকতর নিকবর্তী। তদ্রূপ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ওয়ালা সম্পর্ক মুক্তিদাতা দাদার হবে, ভাইয়ের নয়। কেননা তাঁর মতে দাদা হল আছাবা সূত্রে অধিকতর নিকটবর্তী। তদ্রূপ ওয়ালা সম্পর্ক মুক্তিদাত্রীর পুত্রের অনুকূলে সাব্যস্ত হবে। ফলে সে-ই ওয়ারিছ হবে তার ভাইয়ের অনুকূলে নয়। এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি (অর্থাৎ আছাবাগত নৈকট্য।) তবে মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের অনিচ্ছাকৃত অপরাধের عقل বা দিয়ত মুক্তিদাত্রীর ভাইয়ের উপর বর্তাবে। কেননা ভাই হল তার পিতৃ গোত্রভুক্ত। আর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের অপরাধ মুক্তিদাত্রীর অপরাধের ন্যায়।

আর মুক্তিদাতা যদি একটি পুত্র এবং অন্য এক পুত্রের পুত্র (কন্যা নয়) রেখে মারা যায়, তাহলে মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের মীরাছ পুত্ররা পাবে, পুত্রের পুত্ররা নয়। কেননা ওয়ালা সম্পর্ক মুক্তিদাতার নিকতম পুত্রদের হবে। আর প্রত্যক্ষ ঔরসজাত পুত্রই হল নিকটতম। বেশ কয়েকজন সাহাবা থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাউদ ও অন্যারা।

সৌহার্দ্যমূলক মাওয়ালীদের ওয়ালা সম্পর্ক

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন লোক যদি কোন লোকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, আর নওমুসলিম তার সঙ্গে এই শর্তে সৌহার্দ্যমূলক ওয়ালা সম্পর্কে আবদ্ধ হয় যে, সে নওমুসলিমের ওয়ারিছ হবে এবং অপরাধ সংঘটিত হলে তার পক্ষ থেকে দিয়ত আদায় করবে। কিংবা অন্য কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাকে ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে ওয়ালা সম্পর্কের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাহলে (উভয় ক্ষেত্রে) ওয়ালা সম্পর্ক সিদ্ধ হবে। এবং তার (অপরাধের) দিয়ত (ওয়ালা সম্পর্কে আবদ্ধ) মাওলার উপর হবে।

আর নওমুসলিম যদি তাকে ছাড়া কোন ওয়ারিছ না রেখে মারা যায় তাহলে তার মীরাছ মাওলা পাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, চুক্তিনির্ভর মাওলা নির্ধারণ কোন কিছুই নয়। কেননা এতে বাইতুল মালের হক নষ্ট করা হয়। আর এ কারণেই অন্য ওয়ারিছদের ক্ষেত্রে তা সিদ্ধ হয় না। (সুতরাং বাইতুল মালের ক্ষেত্রেও সিদ্ধ হবে না, কেননা কোন ওয়ারিছ না থাকা অবস্থায় বাইতুল মাল ওয়ারিছ রূপে গণ্য হয়।)

বাইতুল মালের হক রক্ষার জন্যই শাফেয়ী (র)-এর মতে অছিয়তকারীর কোন ওয়ারিছ না থাকা অবস্থায়ও সমগ্র মাল সে অছিয়ত করতে পারে না। বরং একতৃতীয়াংশ মালের ক্ষেত্রেই তার অছিয়ত সিদ্ধ হয়।

আমাদের প্রমাণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ـ

আর যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, তাদেরকে (মীরাছে) তাদের প্রাপ্য অংশ দান কর।

আয়াতটি সৌহার্দ্যমূলক ওয়ালা সম্পর্ক প্রসঙ্গে অবতীর্ণ।

আর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে অত:পর তার সঙ্গে ওয়ালা সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। তিনি বললেন, তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর সেই হবে তার বিষয়ে অধিক হকদার।

আর এটি উভয় অবস্থায় দিয়ত ও মীরাছ সাব্যস্তির দিকে ইংগিত করে।

তাছাড়া তার মাল হলো তার হক, সুতরাং সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে তা ব্যয় করতে পারে।

আর বাইতুল মালে অর্পণ করা হয় কোন হকদার না থাকায় জরুরী অবস্থায়। এ কারণে নয় যে, বায়তুল মাল-এর হকদার।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওয়ালা সম্পর্কে আবদ্ধ লোকটি ছাড়া তার অন্য কোন ওয়ারিছ যদি থাকে তাহলে সে তার চেয়ে অধিক হকদার হবে। এমন কি উক্ত ওয়ারিছ যদি ফুফু বা খালা কিংবা অন্য কোন যাবিল আরহামও হয়।

কেননা সৌহার্দ্যমূলক ওয়ালা সম্পর্ক হলো তাদের দুজনের মাঝে কৃত একটি চুক্তি। সুতরাং তা তাদের দুজনের বাইরে অন্য কারো উপর লাযিম হবে না। আর যাবীল আরহাম ওয়ারিছ রূপে গণ্য।

আর সৌহার্দ্যমূলক ওয়ালা চুক্তিতে দিয়ত ও মীরাছের শর্ত উল্লেখ করা অপরিহার্য। যেমন ইমাম কুদূরী (র) তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

কেননা এ দুটো সাব্যস্ত হয় দায় গ্রহণ দ্বারা। আর দায় গ্রহণ হবে শর্তের মাধ্যমে।

সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের আরেকটি শর্ত এই যে, ওয়ালা চুক্তির প্রথম পক্ষ যেন আরব না হয়।

কেননা আরবদের পারস্পরিক সাহায্য লাভ হয় গোত্র দ্বারা। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে গোত্র সম্পর্ক ওয়ালা সম্পর্কের প্রয়োজন বিলুপ্ত করেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওয়ালা সম্পর্কের প্রথম পক্ষ ইচ্ছা করলে তার ওয়ালা সম্পর্ক চুক্তিবদ্ধ লোকটি থেকে অন্য কারো দিকে স্থানান্তরিত করতে পারে, যতক্ষণ না সে তার পক্ষ থেকে দিয়ত আদায় করে থাকে।

কেননা এটা অবশ্য পালনীয় চুক্তি নয়। যেমন অছিয়তের ক্ষেত্রে।

তদ্রূপ দ্বিতীয় পক্ষের অধিকার রয়েছে ওয়ালা সম্পর্ক থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করার। কেননা বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ওয়ালা চুক্তি নাকচ করার ক্ষেত্রে অপর পক্ষের উপস্থিত শর্ত। যেমন ওকীলকে ইচ্ছাকৃত বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে।

পক্ষান্তরে প্রথম পক্ষ যদি দ্বিতীয় পক্ষের উপস্থিতি ছাড়া তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সঙ্গে পুন: ওয়ালা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননা এটা হল অনিবার্য নাকচতা, ওয়াকালাহ এর ক্ষেত্রে অনিবার্য অব্যাহতির মত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দ্বিতীয় পক্ষ যদি প্রথম পক্ষের তরফ থেকে দিয়াত আদায় করে থাকে, তাহলে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দিকে ওয়ালা সম্পর্ক স্থানান্তরিত করার অধিকার তার নেই।

কেননা প্রথম পক্ষের সঙ্গে অন্যের হক সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া কাযী (দিয়তের ফায়সালার মাধ্যমে) তার ওয়ালা সম্পর্কের অনুকূলে ফায়সালা করেছেন।

তাছাড়া হেবার বিনিময়ের মত দিয়ত হল ওয়ালা সম্পর্কের একটি বিনিময়ের মত, যা প্রথম পক্ষ লাভ করেছে।

তদ্রূপ প্রথম পক্ষের সন্তান ওয়ালা সম্পর্ক পরিবর্তন করতে পারবে না।

তদ্রূপ দ্বিতীয় পক্ষ যদি প্রথম পক্ষের সন্তানের পক্ষ থেকে দিয়ত আদায় করে থাকে তাহলে প্রথম পক্ষ ও তার সন্তান, উভয়ের কারো ওয়ালা পরিবর্তন করার অধিকার থাকবে না। কেননা ওয়ালা সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তির ন্যায়।

তিনি আরো বলেন, আর মুক্তিনির্ভর ওয়ালা-সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুক্তি প্রাপ্ত মাওলার অধিকার নেই অন্য কারো সঙ্গে ওয়ালা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার।

কেননা এটা হল অবশ্য পালনীয় সম্পর্ক। আর তার বিদ্যমানতায় নিম্নতর ওয়ালা সম্পর্ক প্রকাশ পেতে পারে না।

كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

অধ্যায় ঃ বল প্রয়োগ

বল প্রয়োগের হুকুম তখনি সাবেত হবে, যখন তা এমন ব্যক্তি থেকে হয়, যে তার হুমকি দেয়া বিষয় কার্যকর করতে সক্ষম, চাই সে শাসক হোক কিংবা চোরই হোক।

কেননা মানুষ অন্যের চাপে পড়ে যা করে তাকে اكراه (বল প্রয়োগ) বলে। যাতে তার ইচ্ছাধিকার থাকে না কিংবা তার ইচ্ছাধিকার বিঘ্নিত হয়-তার কর্মযোগ্যতা থাকা সত্বেও।

আর বল প্রয়োগ তখনই সাব্যস্ত হবে যখন বল প্রয়োগের শিকার ব্যক্তি, তাকে প্রদত্ত হুকমি কার্যকর হওয়ার আশংকা করবে। আর আশংকা হয়, সক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে হুমকি প্রদানের ক্ষেত্রে। আর সক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়ার কালে শাসক ও অন্যেরা সমান।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) যে বলেছেন, "শাসক ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে বল প্রয়োগ সাব্যস্ত হয় না। কেননা প্রতিরোধ শক্তি তার হাতে। আর প্রতিরোধ শক্তি ছাড়া সক্ষমতা সাব্যস্ত হয় না।" এ সম্পর্কে মাশায়েখগণ বলেছেন যে, এটা হল যুগ ও সময়ের ভিন্নতা, দলীল প্রমাণের ভিন্নতা নয়। তাঁর যুগে শাকস ছাড়া অন্য কারো হাতে এমন ক্ষমতা ছিল না। এরপর সময় ও সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে।

অত:পর বল প্রয়োগ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বলপ্রয়োগকারীর সক্ষমতা যেমন শর্ত রয়েছে, তেমনি বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির মনে প্রদত্ত হুমকি কার্যকর হওয়ার আশংকা বিদ্যমান থাকারও শর্ত রয়েছে। আর আশংকার অর্থ তার মনে এই ধারণা প্রবল হওয়া যে, হুমকি দাতা অবশ্যই তা করে ফেলবে। যাতে যে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, সে ব্যাপারে 'বাধ্যকৃত' সাব্যস্ত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন লোককে যদি তার মাল বিক্রি করতে কিংবা কোন পণ্য ক্রয় করতে বল প্রয়োগ করা হয় কিংবা কারো অনুকূলে এক হাযার দিরহাম ঋণ স্বীকার করতে বাধ্য করা হয় কিংবা তার বাড়ী ভাড়া দিতে বাধ্য করা হয়, আর এসব বিষয়ে বাধ্য করা হয় হত্যার হুমকি দ্বারা কিংবা প্রচন্ড প্রহারের কিংবা আটক করার হুমকি দ্বারা (কিংবা ইজ্জত হানির হুমকি দ্বারা) ফলে সে বিক্রি করে বা ক্রয় করে তাহলে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। ইচ্ছা করলে সে (ক্রয় ও)

বিক্রয় বহাল রাখতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে তা রহিত করে বিক্রয় দ্রব্য ফেরত নিতে পারে।

কেননা এ সকল চুক্তির সিদ্ধতার জন্য শর্ত হলো পারস্পরিক সম্মতি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ·

— তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে ব্যবসা সমপন্ন হয়।

আর এসকল হুমকি দ্বারা বাধ্যকরণ সম্মতি বিলুপ্ত করে। সুতরাং চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি এক দুটি চাবুকাঘাতের কিংবা এক দু'দিনের আটকের হুমকি দ্বারা বল প্রয়োগ করে তাহলে اكراه -এর হুকুম সাব্যস্ত হবে না।

কেননা সাধারণ প্রচলনের দিকে লক্ষ্য করলে এসবের প্রয়োগ করা হয় না। সুতরাং তা দ্বারা اكراه বা বল প্রয়োগ সাব্যস্ত হবে না। তবে লোকটি সাব্যস্ত হবে না। তবে লোকটি যদি পদস্থ্ ও সম্মানী লোক হয় এবং বোঝা যায় যে, এ দ্বারা তার মান সম্মান ক্ষতিগ্রস্থ্ হবে, (তাহলে اكراه সাব্যস্ত হবে।) কেননা সম্মতি বিদ্যমান হয়েছে।

তদ্রূপ শিকারোক্তি প্রমাণ রূপে গণ্য। কেননা স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার দিকটি মিথ্যাবাদিতার দিকটির উপর অগ্রাধিকার পায়। তবে বল প্রয়োগের সময় ক্ষতিরোধ করার জন্য মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে।

অত:পর যদি বলপ্রয়োগকৃত অবস্থায় বিক্রি করে এবং বলপ্রয়োগকৃত অবস্থায় বিক্রয় দ্রব্য অর্পণ করে তাহলে আমাদের মতে তা দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

আর ইমাম যুফার (র) -এর মতে মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। কেননা এটা হল অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল (স্থগিত) বিক্রয়। দেখুননা, বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি অনুমোদন প্রদান করলে শুধু তা অনুমোদিত হয়। আর অনুমোদনের পূর্বে স্থগিত চুক্তি মালিকানা সাব্যস্ত করতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, বিক্রয়ের রোকন (বা মূল স্তম্ভ) বিক্রয়ের যোগ্যতা সম্পন্ন (সুস্থ্ মাস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক) ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে এবং বিক্রয়যোগ্য পাত্রের সাথে (অর্থাৎ শরীয়ত সম্মত মাল-এর সাথে) সম্পৃক্ত হয়েছে। তবে ফাসাদ এসেছে বিক্রয় -এর শর্ত তথা পারস্পরিক সম্মতি অবিদ্যমান থাকার কারণে। সুতরাং এটা ফাসিদকারী যাবতীয় শর্তের ন্যায় হল। সুতরাং কবজা সম্পন্ন হওয়ার সময় এই ফাসিদ চুক্তি মালিকানা সাব্যস্ত করবে। এমন কি ক্রেতা যদি বিক্রীত গোলামকে কবজা করে আযাদ করে দেয়; কিংবা তাতে এমন কোন হস্তক্ষেপ করে, যা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। (যেমন মোদাব্বার ঘোষণা ও উম্মে ওয়ালাদায়ন) তাহলে তা কার্যকর হয়ে যাবে। এবং ক্রেতার উপর বাজার মূল্য লাযিম হবে। যেমন সমস্ত ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

আর মালিকের অনুমোদন দ্বারা ফাসাদের কারণ বিদূরিত হয়। আর তা হলো বলপ্রয়োগ ও অসম্মতি। সুতরাং অনুমোদন দ্বারা বিক্রয় চুক্তি জায়িয হয়ে যাবে।

তবে বলপ্রয়োগের কারণে ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার ফেরত গ্রহণের হক রহিত হয় না।

অন্য সমস্ত ফাসিদ বিক্রয়-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেগুলিতে ফাসাদ এসেছে শরীয়তের হক ক্ষুন্ন হওয়ার কারণে। অথচ দ্বিতীয় বিক্রয়-এর সাথে বান্দার হক (দ্বিতীয় ক্রেতার হক) যুক্ত হয়ে পড়েছে। আর বান্দার প্রয়োজন ও মুখাপেক্ষিতার কারণে (আল্লাহ্ হকের উপর) বান্দার হক্ক অগ্রবর্তী।

পক্ষান্তরে এখানে ফেরত প্রদান করা হচ্ছে (বলপ্রয়োগকৃত) বান্দার হক-এর কারণে। আর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগকৃত বিক্রেতা এবং দ্বিতীয় ক্রেতা উভয়ে সমান। সুতরাং দ্বিতীয় জনের হকের কারণে প্রথম জনের হক বাতিল হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন : আর যে সকল আলিম প্রচলিত (ফেরত নেওয়ার শর্তে) বিক্রয়কে ফাসিদ বিক্রয় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাঁরা এটা বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিক্রয়ের মত গণ্য করেছেন। সুতরা এ বিক্রয়ের ক্রেতা যদি অন্য কারো কাছে তা বিক্রয় করে তাহলে ঐ বিক্রয় চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। কেননা এখানে ফাসাদ এসেছে সম্মতি অবিদ্যমান হওয়ার কারণে।

আবার কেউ কেউ চুক্তির পক্ষদ্বয়ের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করে এটাকে বন্ধক রাখা বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আর কেউ কেউ এটাকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন, রসিকতা করে চুক্তি সম্পাদন কারীর উপর কিয়াস করে।

তবে সমরকন্দের মাশায়েখগণ (মানুষের অনিবার্য) প্রয়োজনের কারণে এটাকে বৈধ বিক্রয় বলে সাব্যস্ত করেছেন, যার দ্বারা বিক্রয়ের কোন কোন হুকুম হাসিল হয়ে যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি স্বেচ্ছায় মূল্য গ্রহণ করে তাহলে সে যেন বিক্রয়কে অনুমোদন করল।

কেননা এটা বিক্রয়কে অনুমোদন করার প্রমাণ। যেমন স্থগিত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

তদ্রূপ যদি (বিক্রয় দ্রব্য) সেচ্ছায় অর্পণ করে।

অর্থাৎ বিক্রয়ের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু অর্পণ করার ব্যাপারে কোন চাপ ছিল না। এটাও অনুমোদনের প্রমাণ।

পক্ষান্তরে যদি অর্পণ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে শুধু হেবা করার জন্য বলপ্রয়োগ করা হয় আর সে (বাধ্য হয়ে) হেবা করে, অত:পর (স্বেচ্ছায়) অর্পণ করে তাহলে হেবা বাতিল (ফাসিদ) হবে।

কেননা বলপ্রয়োগকারীর উদ্দেশ্য হল (হেবা প্রাপ্ত ব্যক্তির বা ক্রেতার) হকদারি সাব্যস্ত, শুধু শব্দ উচ্চারণের বাধ্য করা নয়। আর হেবার ক্ষেত্রে হকদারি সাব্যস্ত হয় কবজা দ্বারা আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয় স্বয়ং বিক্রয়চুক্তি দ্বারা। এটাই স্বীকৃত মূলনীতি। সুতরাং হেবা সম্পর্কে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্পণের বিষয়টি বলপ্রয়োগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নয়।

তিনি আরো বলেন : আর যদি বল প্রয়োগের কারণে মূল্য গ্রহণ করে তাহলে তা অনুমোদন বলে গণ্য হবে না। বরং মুল্য যদি তার হাতে বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে সেটা ফেরত দিতে হবে।

কারণ বলপ্রয়োগের কারণে চুক্তিটি ফাসিদ হয়েছে।

তিনি আরো বলেন : আর যদি বিক্রয় দ্রব্য ক্রেতার হাতে নষ্ট হয়ে যায় আর অবস্থা এই যে, ক্রয় করার জন্য বল প্রয়োগ করা হয়নি; তাহলে বিক্রেতার অনুকূলে সে বাজার মূল্যের দায় বহন করবে।

মাসআলাটির অর্থ এই যে, বিক্রেতা বলপ্রয়োগকৃত ছিল।

কেননা ফাসিদ চুক্তির বিধান অনুযায়ী বিক্রয় দ্রব্যটি তার উপর মূল্য-দায় সম্পন্ন ছিল।

তবে বলপ্রয়োগকৃত বিক্রেতা ইচ্ছা করলে বলপ্রয়োগকারীর উপর মূল্যের দায় আরোপ করতে পারে।

কেননা বস্তুটিকে নষ্ট করার কারণ যে চুক্তি, সেটার বিষয়ে বিক্রেতা বলপ্রয়োগকারীর ব্যবহৃত যন্ত্রের মত ছিল। সুতরাং যেন সে বিক্রেতার মাল ক্রেতার হাতে তুলে দিয়েছে। সুতরাং সে তাদের দুজনের যাকে ইচ্ছা তাকে দায়বহন করতে পারে। যেমন, গছবকারী এবং গছবকারীর কাছ থেকে আরে গছবকারীর বিষয়টি।

আর যদি সে বলপ্রয়োগকারীর উপর দায় আরোপ করে তাহলে সে ক্রেতার কাছে বাজার মূল্য রুজু করবে। কেননা সে বিক্রেতার স্থলবর্তী হয়েছে।

আর যদি সে (প্রথম ক্রেতার পরবর্তী কোন) ক্রেতাকে দায় বহন করায় তাহলে বস্তুটিকে কেন্দ্র করে বারবার বিক্রয় চুক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে এই ক্রেতার ক্রয়ের পর যতগুলো ক্রয় হবে সব কটি ক্রয় কার্যকর হবে।

কেননা ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে বস্তুটির মালিক হয়ে গেছে। সুতরাং প্রকাশ পেলো যে, সে তার মালিকানার বস্তু বিক্রয় করেছে। কিন্তু দায় পরিশোধকারীর এই ক্রেতার পূববর্তী ক্রয় কার্যকর হবে না। কেননা এই ক্রেতার মালিকানা তার কবজা গ্রহণের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

পক্ষান্তরে বলপ্রয়োগকৃত মালিক যদি (বার বার সম্পন্ন) ঐ সকল চুক্তির কোন একটিকে অনুমোদন দান করে তাহলে ঐ চুক্তি পূর্ববর্তীও পরবর্তী সবগুলো চুক্তি সিদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা সে তার হক রহিত করেছে, আর তার হকই ছিল (চুক্তিগুলোর কার্যকরতার পথে) প্রতিবন্ধক। সুতরাং (প্রতিবন্ধক দূর হওয়ার পর) সকল চুক্তি সিদ্ধতার দিকে ফিরে আসবে। (সিদ্ধতা লাভ করবে।) আল্লাহ্ অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ

কাউকে যদি মুরদার খাওয়ার বিষয়ে, কিংবা মদ পানের বিষয়ে বলপ্রয়োগ করা হয়, আর ঐ বিষয়ে বাধ্য করা হয় আটক করার, বা লঘু প্রহারের কিংবা শেকল দিয়ে বাঁধার হুমকি দ্বারা তাহলে তার জন্য হালাল হবে না। কিন্তু যদি এমন কিছুর হুমকি প্রদান করে, যাতে জানের বা শরীরের অঙ্গসমূহের মধ্যে কোন অঙ্গ হানির আংশকা দেখা দেয় (তবে হালাল হবে।)

সুতরাং যদি সে জানের বা অঙ্গজ হানির আশংকা করে তাহলে তার অবকাশ রয়েছে বলপ্রয়োগকৃত কাজটি করার (অর্থাৎ মুরদার খাওয়ার এবং মদ পান করার)

রক্ত এবং শূকরের মাংসের ক্ষেতেও একই হুকুম।

কেননা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এসকল হারাম বস্তু গ্রহণ করা বৈধ হয়। যেমন প্রচন্ড ক্ষুধার অবস্থায়। কেননা হারামের আদেশ প্রয়োজনের পরবর্তী ক্ষেত্রে বিদ্যমান। আর প্রাণ হানির বা অঙ্গ হানির আশংকা ছাড়া প্রয়োজন সাব্যস্ত হয় না। এমন কি প্রচন্ড প্রহারের হুমকি প্রদানের ক্ষেত্রে যদি ঐ প্রহার দ্বারা প্রাণহানি বা অঙ্গহানির প্রবল আশংকা হয় তাহলেও তার জন্য তা হালাল হয়ে যাবে। যে বিষয়ে হুমকি দেয়া হয়েছে। সে বিষয়ে সবর করার অবকাশ তার নেই। সুতরাং যদি সবর করে আর তারা তার উপর প্রদত্ত হুমকি কার্যকর করে আর সে তা না খায় তাহলে সে গোনাহগার হবে।

কারণ তার জন্য যখন তা খাওয়া হালাল করে দেয়া হয়েছে, তখন সে বিরত থাকার মাধ্যমে তার প্রাণ হরণের ব্যাপারে অন্যকে সাহায্যকারী হল। কাজেই সে গোনাহগার হবে। যেমন প্রচণ্ড ক্ষুদার ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সে গোনাহগার হবে না। কেননা বস্তুগুলোর 'হুরমত' বিদ্যমান থাকার কারণে এটা হলো, রোখসাত। সুতরাং সে আযীমত (বা শরীয়তি বিধান) -এর উপর আমলকারী হবে।

আমরা বলি, অনন্যপায় অবস্থাটি নাছ দ্বারা ব্যতিক্র করা হয়েছে। আর ব্যতিক্র করার অর্থ হল ব্যতিক্রম পরবর্তী অবশিষ্ট বিষয়ের উচ্চারণ করা। সুতরাং ব্যতিক্রম অংশে হুরমতের আদেশ বিদ্যমান নেই। সুতরাং এটা হলো বৈধতা দান, অবকাশ প্রদান নয়।

অবশ্য এমতাবস্থায় বৈধতা থাকার বিষয়টি যদি তার জানা থাকে তাহলেই গোনাহগার হবে। কেননা হুরমতের সচ্ছতার মাঝে (হালাল হওয়ার বিষয়ে) অস্পষ্টতা রয়েছে। কারণ এসব জানা ফকীহদের কাজ। সুতরাং সাধারণ লোকদের অজ্ঞতার কারণে মানুষ গণ্য করা হবে। যেমন ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিকে কিংবা দারুল হরবে অবস্থান কালে (দ্বীনের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে শরীয়তের সম্বোধন সম্পর্কে অজ্ঞতাকে ওযর গণ্য কর হয়)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আল্লাহ্ না করুন, যদি আল্লাহর সাথে কুফরি করার জন্য কিংবা রাসূল (সা)-কে গালি দেওয়ার জন্য শৃঙ্খলিত করা আটক করা বা প্রহার করার হুমকি দ্বারা বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে এটাকে বলপ্রয়োগ বলে গণ্য করা হবে না, যতক্ষণ না প্রাণ সংশয় বা কোন অঙ্গ সংশয় সৃষ্টিকারী কোন বিষয় দ্বারা বল প্রয়োগ করা হয়।

কেননা এই মাত্র বর্ণিত কারণে এ সকল জিনিস দ্বারা বল প্রয়োগ করাকে মদ পানের ক্ষেত্রেও বলপ্রয়োগ বলে গণ্য কর হয় না। সুতরাং কুফরির ক্ষেত্রে আরো স্বাভাবিক কারণেই সেগুলো বলপ্রয়োগ বলে গণ্য হবে না। কেননা কুফরির হুরমত আরো কঠিন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সুতরাং যদি সে প্রাণহানি বা অঙ্গহানির আশংকা করে তাহলে তাদের আদিষ্ট কথা মুখে প্রকাশ করার অবকাশ তার রয়েছে। যদি সে মুখে তা প্রকাশ করে আর তার কলব ঈমানের বিষয়ে স্থির থাকে তাহলে তার উপর কোন গোনাহ্ নেই।

প্রমাণ হল, হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের হাদীস, যখন তিনি পরীক্ষায় পতিত হয়েছিলেন, তখন নবী (সা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন (কুফরি কথা মুখে আনার সময়) তোমার কলবকে কেমন পেয়েছিলে? তিনি বললেন, ঈমানের প্রতি সুস্থির ছিল। তখন নবী (সা) বললেন, তারা যদি আবার এরূপ বলপ্রয়োগ করে তাহলে আবার তা উচ্চারণ করবে।

এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে— . إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ

তবে যাদের বলপ্রয়োগ করা হয়েছে; অথচ তাদের কলব ঈমানের প্রতি সুস্থির রয়েছে।

তাছাড়া এই কারণ যে, এই বাহ্যিক উচ্চারণ দ্বারা প্রকৃত পক্ষে ঈমান বিলুপ্ত হয় না। কারণ অন্তরের বিশ্বাস বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে উচ্চারণ থেকে বিরত থাকায় প্রকৃত পক্ষে প্রাণহানি রয়েছে। সুতরাং বাহ্যিক উচ্চারণের দিকে তার ঝুঁকবার অবকাশ রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, আর যদি সে সবর করে, এমন কি তাকে হত্যা করা হয়, তবু সে কুফরি শব্দ উচ্চারণ না করে তাহলে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

কেননা খোবায়ব (রা) এরূপ হুমকির উপর সবর করেছিলেন। এমনকি তাঁকে সূলে চড়ানো হয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে سيد الشهداء (শাহীদুশ শুহাদা) উপাধী দিয়েছিলেন। এবং তার সম্পর্কে বলেছিলেন, هو رفيقى فى الجنة —জান্নাতে সে আমার সঙ্গী হবে।

তাছাড়া এই কারণে যে, তা হারাম হওয়া বহাল রয়েছে। আর দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তা উচ্চারণ থেকে বিরত থাকা হল আযীমাত (বা মূল শরীয়তি বিধান)।

পক্ষান্তরে হুরমতের বিধান থেকে ব্যতিক্রম করার পরবর্তী মাসআলাটি ভিন্ন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি প্রাণ সংশয় বা কোন অঙ্গসংশয় সৃষ্টিকারী কোন বিষয় দ্বারা হুমকি প্রদান পূর্বক কোন মুসলমানের মাল নষ্ট করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তার তা করার অবকাশ রয়েছে।

কেননা প্রয়োজনে অন্যের মাল ব্যবহারের বৈধতা রয়েছে। যেমন প্রচণ্ড ক্ষুধার অবস্থায়। আর এখানে প্রয়োজন সাব্যস্ত হয়েছে।

তবে মালের মালিকের অধিকার রয়েছে বলপ্রয়োগকারীর উপর দায় আরোপ করার।

কেননা যে ক্ষেত্রে অন্যের যন্ত্র হওয়া সম্ভব সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি বলপ্রয়োগকারীর যন্ত্র রূপে গণ্য হবে। আর মাল নষ্ট করা সেই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

আর যদি হত্যার হুমকি প্রদানের মাধ্যমে কাউকে হত্যা করার জন্য বল প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তার তা করার অবকাশ নেই। বরং তাকে হত্যা করা

পর্যন্ত সে সবর করবে। যদি (সবর না করে) তাকে হত্যা করে বসে তাহলে সেই গোনাহগার হবে।

কেননা যে কোন প্রয়োজনে (নির্ধারিত হক ছাড়া) কোন মুসলমানকে হত্যা করার এমন বিষয়, যার বৈধতা প্রদান করা হয় না। সুতরাং এই প্রয়োজনেও বৈধতা প্রদান করা হবে না।

তবে যদি হত্যাকাণ্ডটি ইচ্ছাকৃত ভাবে হয় কিছাছ আসবে বলপ্রয়োগকারীর উপর।

হিদয়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মত। ইমাম যুফার (র) বলেন, কিসাস বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির উপর আসবে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, দু'জনের কারো উপর আসবে না।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয়ের উপর কিসাস ওয়াজিব হবে।

ইমাম যুফার (র)-এর দলীল এই যে, 'হত্যাকর্মটি' প্রকৃতপক্ষে এবং দৃশ্যতঃ বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি থেকে সম্পন্ন হয়েছে। আর হত্যাকাণ্ডের হুকুম অর্থাৎ গোনাহ্ শরীয়ত তার উপরই সাব্যস্ত করেছে। অন্যের মাল নষ্ট করার ব্যাপারে বলপ্রয়োগের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (শরীয়তের পক্ষ হতে) নষ্ট করার হুকুম অর্থাৎ গোনাহ্ তার থেকে রহিত করে অন্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) এই দলীলই গ্রহণ করেছেন। তবে বলপ্রয়োগকারীর উপরও তিনি কিছাছ ওয়াজিব করেছেন। কেননা তার পক্ষ হতে হত্যার কারণ সৃষ্টি হয়েছে।

আর হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাঁর মতে কারণ সৃষ্টি করা প্রত্যক্ষ লিপ্ত হওয়ার হুকুমভুক্ত। যেমন, কিছাছের সাক্ষ্যপ্রদানকারীর ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তিকে গোনাহগার সাব্যস্ত করার দিক লক্ষ্য করলে হত্যাকর্ম এক হিসাবে তার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার বাধ্য করার দিক লক্ষ্য করলে এক হিসাবে বলপ্রয়োগকারীর দিকে সম্পৃক্ত করা যায়। সুতরাং উভয় দিকে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। (আর সন্দেহ দ্বারা কিছাছ রহিত হয়ে যায়)

আর তারফায়নের দলীল এই যে, নিজের জীবনকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সে তার স্বভাব দ্বারা হত্যাকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং যে ক্ষেত্রে তাকে হত্যাকারী যন্ত্র বা মাধ্যম গণ্য করা সম্ভব, সে ক্ষেত্রে সে তার যন্ত্র মাধ্যম বিবেচিত হবে। আর সেটা হল হত্যা কর্ম। যেমন তাকে নিহত ব্যক্তির উপর ফেলে দেয়া হল। কিন্তু নিজের দীনের ক্ষতি সাধনের অপরাধের দিক থেকে সে বলপ্রয়োগকারীর যন্ত্র বা মাধ্যম বিবেচিত হতে পারে না। সুতরাং গোনাহের ক্ষেত্রে হত্যাকর্মের সম্পৃক্তি তার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন আমরা মুক্তিদানের ব্যাপারে বলি।

আর (মুসলমান কর্তৃক) মাজূসীকে অন্যের বকরী জবেহ করার ব্যাপারে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে, নষ্ট করার বিষয়ে কর্মটি বলপ্রয়োগকারীর দিকে সম্পৃক্ত হবে। (কেননা নষ্ট করার ক্ষেত্রে সে বলপ্রয়োগকারীর যন্ত্র বা মাধ্যম হতে পারে।) কিন্তু জবেহ হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে নয়। বরং হারাম বিবেচিত হবে। এ বিষয়টিও অনুরূপ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি তাকে নিজের স্ত্রীকে তালাক প্রদানে বা নিজে গোলামকে আযাদ করতে বল প্রয়োগ করা হয় আর সে তা করে, তাহলে আমাদে মতে যে বিষয়ে তাকে বাধ্য করা হয়েছে তা কার্যকর হবে।

আমাদের মতে ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তালাক পর্বে বিষয়া আলোচিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর গোলামের বাজার মূল্যের জন্য সে বং প্রয়োগকারীর কাছে রুজু করবে।

কেননা নষ্ট করার দিক থেকে আযাদ করার কাজে সে বল প্রয়োগকারীর যন্ত্র বা মাধ্যম বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। সুতরাং নষ্ট করার কর্মটি তার দিকেই সম্পৃক্ত হবে। এবং বল প্রয়োগকারী সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল, তাকে দায়বহন করাতে পারে। আর উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া গোলামের জন্য আবশ্যকীয় নয়।

কেননা উপার্জন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া আবশ্য সাব্যস্ত হয় স্বাধীনতায় উপনীত হওয়ার জন্য কিংবা (তার দাস সত্তায়) অন্যের হক যুক্ত হওয়ার কারণে। এখানে দুটির কোনটি পাওয়া যায় নি।

আর বলপ্রয়োগকারী গোলামের কাছ থেকে মূল্যদায় রুজু করতে পারবে না। কেননা নষ্ট করার বিষয়ে সে নিজেই দায়ী।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তালাক যদি সহবাসের (এবং একান্ত মিলনের) পূর্বে হয়ে থাকে তাহলে সে স্ত্রী অর্ধেক মাহরের বিষয়ে (বল প্রয়োগকারীর কাছে) রুজু করতে পারবে। আর যদি বিবাহ চুক্তিতে নির্ধারিত কোন মাহর না থাকে তাহলে মুতআ উপঢৌকন প্রদানে তার যা খরচ হয়েছে, সেটা সে বল প্রয়োগকারীর কাছ থেকে রুজু করবে।

কেননা স্বামীর উপর যা (অর্ধমোহর বা 'মুতআ') সাব্যস্ত হয়েছে, তা রহিত হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল, যেমন স্ত্রীর দিক থেকে (কোন 'অপরাধ' হওয়ার কারণে) বিচ্ছেদ ঘটল। কিন্তু তালাকের দ্বারা উক্ত দায় নিশ্চিত হয়ে গেলো। সুতরাং এ দিক থেকে বলপ্রয়োগ মাল নষ্টকারী সাব্যস্ত হল। সুতরাং মাল নষ্টকারী হিসাবে তালাক কর্মটিকে বলপ্রয়োগকারীর দিকে সম্পৃক্ত করা হবে।

পক্ষান্তরে স্ত্রীর সঙ্গে যদি সহবাস করে থাকে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা মোহর তালাক দ্বারা নয়, বরং সহবাস দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

আর যদি কাউকে তালাক প্রদানের যা মুক্তিদানের উকীল বানাতে বাধ্য করা হয়, আর উকীল তা করে তাহলে বা কার্যকর হবে— সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী।

কেননা বলপ্রয়োগ চুক্তির মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী। আর ওয়াকালাহ ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না।

আর (স্বামী বা মনিব) বলপ্রয়োগকারীর কাছ থেকে (অর্ধেক মাহর বা গোলামের মূল্য) রুজু করবে। এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। কেননা বলপ্রয়োগকারীর উদ্দেশ্যে ছিল উকীলের পদক্ষেপ গ্রহণের সময় তার মালিকানা বিলুপ্ত হওয়া।

আর নযর ও মান্নতের (বৈধতা রোধ করার) ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না। (অর্থাৎ বলপ্রয়োগের মুখে নযর করলে নযর সাব্যস্ত হয়ে যায়।) কেননা নযর (একবার সম্পন্ন হওয়ার পর) নাকচতার সম্ভাবনা রাখে না।

আর নযর করা দ্বারা তার উপর যা লাযিম হলো তা বলপ্রয়োগকারীর কাছ থেকে রুজু করতে পারবে না।

কেননা দুনিয়াতে বান্দার পক্ষ হতে নযরের কোন তাগাদাকারী নেই। সুতরাং নযরকারীও দুনিয়াতে এ বিষয়ে অন্যের কাছে তাগাদা করতে পারে না।

তদ্রূপ ইয়ামীন (কসম) ও যিহার (মাতৃতুলনা)-এর ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ কার্যকর নয়। কেননা এদুটি রহিতকরণ যোগ্য নয়।

তদ্রূপ তালাক প্রত্যাহার ঈলা বা বর্জন এবং উচ্চারণ যোগে ঈলা প্রত্যাহার এসকল ক্ষেত্রেও একই বিধান। কেননা এগুলো পরিহাসের মাধ্যমেও বৈধ হয়।

আর স্বামীর দিক থেকে খোলা হচ্ছে (পরিণতির বিচারে) তালাক কিংবা (বর্তমানের বিচারো) ইয়ামীন। সুতরাং বলপ্রয়োগ কার্যকর হবেনা।

সুতরাং যদি স্ত্রীর পরিবর্তে স্বামীকে খোলার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় তাহলে খোলার বিনিময় স্ত্রীর উপর লাযিম হবে। কেননা সে দায় গ্রহণে সম্মত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি কাউকে যিনা করতে বাধ্য করা হয় তাহলে তার উপর 'হদ্দ' ওয়াজিব হবে।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। তবে শাসক যদি বাধ্য করে (তাহলে হদ্দ আসবে না)।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তার উপর হদ্দ লাযিম হবে না। হদ্দ ও শাস্তি পর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি তাকে মোরতাদ হওয়ার জন্য বলপ্রয়োগ করা হয় তাহলে তার স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

কেননা 'রিদ্দাহ' বা ধর্মত্যাগের সম্পর্ক হলো আকীদার সাথে। দেখুন না, যদি তার হৃদয় ঈমানের ব্যাপারে সুস্থির থাকে তাহলে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। আর তার কুফুরি আকিদা গ্রহণের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং সন্দেহের অবস্থায় বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হবে না।

এখন স্ত্রী যদি বলে যে, আমি তো তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, আর সে বলে যে, আমি তো কুফুরি প্রকাশ করেছি এমন অবস্থায় যে, আমার হৃদয় ঈমানের প্রতি সুস্থির ছিল, তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তার কথাই গ্রহণ যোগ্য হবে।

কেননা কুফুরির শব্দকে (শরীয়তের পক্ষ হতে) বিচ্ছেদের জন্য সাব্যস্ত করা হয়নি। বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হয় বিশ্বাসের পরিবর্তন দ্বারা। আর বল প্রয়োগের অবস্থায় বিশ্বাসের পরিবর্তন প্রমাণিত হয় না। সুতরাং তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

ইসলামের ব্যাপারে বলপ্রয়োগের বিষয়টি ভিন্ন। বলপ্রয়োগের মুখে ইসলাম গ্রহণ দ্বারা সে মুসলমান বলে গণ্য হবে। কেননা উচ্চারিত শব্দ অন্তরের বিশ্বাসের অনুরূপ

হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, আবার অনুরূপ না হওয়াও সম্ভাবনা রাখে, তখন (ধর্মত্যাগের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ এবং ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ) উভয় অবস্থায় আমরা ইসলামকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছি। কেননা ইসলাম প্রবল হয়, প্রবলিত হয় না।

আর (তার মুসলমান হওয়ার) এ সিদ্ধান্ত হল দুনিয়ার বিধান বর্ণনা হিসাবে। পক্ষান্তরে যদি ইসলামের আকীদা পোষণ না করে তাহলে তার ও আল্লাহ্‌র মাঝে সে মুসলমান বলে গণ্য হবে না।

আর যদি তাকে ইসলাম গ্রহণে বলপ্রয়োগ করা হয়, এবং তাকে মুসলমান বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। অত:পর সে ফুকুরিতে ফিরে যায় তাহলে (ধর্মত্যাগের কারণে) তাকে কতল করা হবে না।

কেননা (ইসলাম গ্রহণের পর ধর্মত্যাগ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে) সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর সন্দেহ কতলের হুকুম রোধ করে।

আর যদি কুফুরি শব্দ উচ্চারণে বাধ্যকৃত ব্যক্তি বলে যে, আমি বিগত কালের বিষয় সম্পর্কে (মিথ্যা) খবর প্রদান করেছি, আর আমি বিগত কালে কুফুরি পোষণ করিনি, তাহলে আদালতি ফায়সালা হিসাবে তার স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন হয়ে যাবে, 'দীনি বিধান' হিসাবে নয়।

কেননা সে স্বীকার করেছে যে, স্বেচ্ছায় এমন কাজ করেছে, যা করতে তাকে বাধ্য করা হয়নি। আর এই ধরনের স্বেচ্ছা উচ্চারণকারীর বিধান তা-ই, যা আমরা উল্লেখ করলাম।

আর যদি বলে যে, আমার কাছে যা চাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ কুফুরিকে অস্তিত্ব দান) সেটাই আমি ইচ্ছা করেছি, তবে আমার অন্তরে বিগত কালের খবর প্রদানের কথা কল্পনায় এসেছে তাহলে আইনতঃ ও ধর্মতঃ উভয় বিধানেই তার স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কেননা সে স্বীকার করেছে যে, কুফুরি সূচনা করেছে কুফুরির বিষয়কে উপহাস হিসেবে। কেননা কুফুরি সূচনাকরণ ছাড়াও আত্ম রক্ষার উপায় তার জানা ছিল।

এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই যদি তাকে সালীব (ক্রশ) কে সিজদা করতে কিংবা নবী মুহম্মদ (সা)-কে গালি দিতে বলপ্রয়োগ করা হয় আর সে তা করে এবং বলে যে, তার দ্বারা আমি আল্লাহকে সিজদা করার নিয়ত করেছি, এবং নবী (সা) ছাড়া অন্য মুহম্মদকে নিয়ত করেছি, তাহলে আইনতঃ তার স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, ধর্মত নয়।

পক্ষান্তরে যদি সালীবকেই সিজদা করে এবং নবী মুহম্মদ (সা)-কেই গালি দেয় এমন অবস্থায় যে, তার কল্পনায় আল্লাহকে সিজদা করার কথা এসেছে এবং নবী (সা) ছাড়া মুহম্মদকে গালি দেওয়ার কল্পনা এসেছে (কিন্তু তার নিয়ত করেনি) তাহলে আইনতঃ ও ধর্মতঃ তার স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এর কারণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর কিফায়াতুল মুনতাহী কিতাবে আমরা বিষয়টির আরো বিশদ আলোচনা করেছি। আল্লাহই ভাল জানেন।

كِتَابُ الْحَجْرِ

অধ্যায় ঃ হাজর (বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্তকারীর কারণ তিনটি : অপ্রাপ্ত বয়স্কতা, দাসত্ব ও মস্তিষ্ক বিকৃতি।

সুতরাং অভিভাবকের অনুমোদন ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর মুআমিলাহ এবং মনিবের অনুমোদন ছাড়া গোলামের মুআমিলাহ্ বৈধ হবে না। এবং স্থায়ী বিকৃত মস্তিস্ক ব্যক্তির মুআমিলাহ্ কোন অবস্থাতে বৈধ হবে না।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে কারণ তার বুদ্ধির স্বল্পতা; তবে অভিভাবকের অনুমতি তার যোগ্যতার পরিচায়ক।

দাসের ক্ষেত্রে কারণ হল মনিবের স্বার্থ রক্ষা করা, যাতে নিজের গোলাম থেকে উপকার লাভ নষ্ট না হয়ে যায়। এবং তার সাথে দেনা যুক্ত হয়ে তার দাসসত্তায় অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত না হয়ে যায়। তবে অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে বোঝা যাবে যে, মনিব তার হক ছাড়তে সম্মত আছে।

আর মস্তিষ্ক বিকৃতির সাথে মুআমিলার যোগ্যতা একত্র হতে পারে না। সুতরাং কোন অবস্থাতেই তার মুআমিলা বৈধ হবে না।

পক্ষান্তরে (প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থবুদ্ধি) গোলাম স্বকীয়ভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন।

আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের যোগ্যতা প্রত্যাশাপূর্ণ। এ কারণেই পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এদের মধ্যে কেউ যদি কোন কিছু বিক্রয় বা ক্রয় করে, আর সে ক্রয়-বিক্রয়-এর বোধ রাখে এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবেই তা করে, তাহলে অভিভাবকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। সে যদি তাতে কোন কল্যাণ দেখে তাহলে ইচ্ছা করলে তা অনুমোদন করতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে রহিত করতে পারে।

কেননা গোলামের ক্ষেত্রে মওকুফের কারণ হল মনিবের হক রক্ষা করা। সুতরাং এ বিষয়ে সে ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। আর শিশু বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে মওকুফের কারণ হল তাদের কল্যাণ রক্ষা করা। সুতরাং এ বিষয়ে তাদের অভিভাবকের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ চিন্তা করা হবে।

তবে এ দুজনের মাঝে বিক্রয় চুক্তির বোধ থাকা অপরিহার্য। যাতে বিক্রয় চুক্তি স্তম্ভ (ঈজাব ও কবূল) সম্পন্ন হয় এবং অভিভাবকের অনুমোদনের উপর স্থগিত অবস্থায় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে।

আর বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি কোন কোন সময় বিক্রয় -এর বোধ সম্পন্ন হতে পারে এবং উদ্দেশ্য রূপে তা সম্পাদন করতে পারে, যদিও ক্ষতির উপর কল্যাণকে অগ্রাধিকার প্রদানের যোগ্যতা তার থাকে না।

আলোচ্য ক্ষেত্রে বিকৃত মস্তিষ্ক দ্বারা প্রতিবন্ধী উদ্দেশ্য, যে অন্যের পক্ষ থেকে উকীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যেমন ওয়াকালাহ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি।

যদি বলা হয় যে, তোমাদের মতে মওকুফের বিষয়টিতো বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। আর ক্রয়ের ক্ষেত্রে তো ক্রয় সম্পন্নকারীর উপর তা কার্যকর হয়ে যাওয়াই হল মূলনীতি।

তার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তা ঠিক। তবে যদি তার উপর কার্যকারিতা আরোপ করার উপায় থাকে। (তবে কার্যকর হবে)। যেমন ফুযূলী (বা অনাহুত) ব্যক্তির ক্রয় করার ক্ষেত্রে।

কিন্তু এখানে (শিশু ও পাগলের ক্ষেত্রে) যোগ্যতা না থাকার কারণে কিংবা (গোলামের ক্ষেত্রে) মনিবের ক্ষতির কারণে কার্যকারিতা আরোপ করার সুযোগ নেই। তাই সেটি আমরা মওকূফ রেখেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এই তিনটি কারণ নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত করে, বক্তব্যের ক্ষেত্রে; কর্মের ক্ষেত্রে নয়।

কেননা বাহ্যতঃ ও চাক্ষুষভাবে কোন কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পরে তা ফেরতের কোন সুযোগ থাকে না। পক্ষান্তরে শরীয়ত দ্বারা সাব্যস্ত বক্তব্যের অবস্থা এর বিপরীত। কেননা এর বিবেক আর এর শর্ত হল ইচ্ছা ও নিয়ত।

তবে কর্ম যদি এমন হয় যার সঙ্গে সন্দেহজনিত কারণে নিরসনযোগ্য বিধান সম্পৃক্ত হয়. যেমন হদ্দ ও কিছাছ; তখন শিশু ও পাগলের ক্ষেত্রে ঐ বিষয়ে ইচ্ছাহীনতাকে সন্দেহ রূপে সাব্যস্ত করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, শিশু ও পাগলের সম্পাদিত চুক্তি সমূহ এবং তাদের স্বীকারোক্তি সিদ্ধ হবে না।

এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি।

আর তাদের তালাক ও মুক্তি দান কার্যকর হবে না।

কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, শিশু ও মানসিক ব্যক্তিগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক ছাড়া আর সকল তালাক কার্যকর।

আর মুক্তিদান নিছক ক্ষতি রূপে বিবেচ্য।

আর শিশুর পক্ষে তালাকের বিষয়ে কল্যাণ সম্পর্কে অবগত হওয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। কেননা তার কাম প্রবৃত্তি নেই।

আর কাম-প্রবৃত্তির বয়সে উপনীত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর যামিন হবে কিনা, সে সম্পর্কে অভিভাবকের নিশ্চিত অবগতি নেই

এ কারণেই তালাক ও মুক্তিদানের বিষয় দুটি অভিভাবকের অনুমোদনের উপর স্থগিত থাকবে না, এবং শিশু প্রত্যক্ষভাবে তা সম্পাদন করলেও তা কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুক্তি অভিভাবকের অনুমোদন দ্বারা কার্যকর হবে।

আর যদি শিশু ও পাগল কারো কোন কিছু নষ্ট করে ফেলে তাহলে তার ক্ষতিপূরণের দায় তাদের উপর লাযিম হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির হক রক্ষার উদ্দেশ্যে এ বিধান।

এর কারণ এই যে, ক্ষতিসাধন দায়সাব্যস্তকারী হওয়া ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যেমন কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তির উপর গড়িয়ে পড়ার কারণে সে মারা গেলো। কিংবা যেমন ঝুঁকে পড়া দেয়াল ধ্বসে পড়ে সম্পদহানি বা প্রাণহানি ঘটল এবং সাক্ষী রাখা হল।

পক্ষান্তরে বক্তব্যের ক্ষেত্রে ইচ্ছার বিদ্যমানতা শর্ত। যেমন আমরা বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পক্ষান্তরে গোলামের স্বীকারোক্তি তার নিজের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। কেননা তার আত্মযোগ্যতা রয়েছে। তবে মনিবের ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।

তার স্বার্থ রক্ষার জন্য এ বিধান। কেননা (মনিবের বিপক্ষে) তার স্বীকারোক্তির কার্যকারিতা তার দাস সত্তার সঙ্গে কিংবা তার উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর সবটাই হবে মনিবের মাল নষ্টকরণ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি সে কারো অনুকূলে কোন মালের পাওনা স্বীকার করে তাহলে স্বাধীনতা লাভের পর তা পরিশোধ করা তার উপর লাযিম হবে।

কেননা তার স্বীকারোক্তির যোগ্যতা বিদ্যমান এবং বাধা বিদূরিত হয়েছে। তবে বাধা বিদ্যমান থাকার কারণে বর্তমানে তার উপর লাযিম হবে না।

আর যদি কোন হদ্দ বা কিছাছ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে, তাহলে বর্তমানেই তার উপর তা লাযিম হবে।

কেননা প্রাণ সত্তার ক্ষেত্রে তাকে মূল স্বাধীনতার উপর বহাল রাখা হয়েছে। এ কারণেই গোলামের বিপক্ষে মনিবের স্বীকারোক্তি সিদ্ধ হয় না।

আর তার তালাক প্রদান কার্যকর হবে।

এর কারণ পূর্বের বর্ণিত হাদীস। তাছাড়া নবী (সা) বলেছেন,

لا يملك العبد والمكاتب شيئا إلا الطلاق .

গোলাম ও মোকাতাব তালাক ছাড়া আর কিছুর মালিক নয়। তাছাড়া এই কারণে যে, তালাকের বিষয়ে তার কল্যাণ সম্পর্কে সে অবশ্যই অবগত রয়েছে। সুতরাং সে তালাক প্রদানের যোগ্য হবে। আর তাতে মনিবের মালিকানা বাতিল করার বিষয় নেই এবং তার উপকার লাভ নষ্ট করার বিষয় নেই। কাজেই তা কার্যকর হবে। আল্লাহ অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ নির্বুদ্ধিতা ও অপব্যয় জনিত নিষেধাজ্ঞা

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, স্বাধীন, সুস্থমস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক নির্বোধ ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না। বরং তার সম্পদের ক্ষেত্রে তার হস্তক্ষেপ বৈধ হবে, যদিও সে অপব্যয়কারী ও ফাসাদকারী হয়, এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে বিনা ফায়সালায় মাল খরচ করে ফেলে।

তার ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, এবং ইমাম শাফেয়ী (র)-- এই মত—নির্বোধ ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে এবং তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করা থেকে তাকে বিরত রাখা হবে।

কেননা আকল বুদ্ধির চাহিদার বিপরীতে মাল খরচ করার মাধ্যমে সে নিজে অপব্যয়কারী হয়েছে।

সুতরাং শিশুর উপর কিয়াস করে তার কল্যাণ রক্ষার্থে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। বরং (তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ শিশুর তুলনায়) অধিক মুনাসিব হবে।

কেননা শিশুর ক্ষেত্রে অপব্যয় -এর সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে এর ক্ষেত্রে প্রকৃত অপব্যয় রয়েছে। এ কারণেই তো তার সম্পদ তার থেকে আটক রাখা হয়। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা আরোপ ছাড়া শুধু তার হাত থেকে দূরে রাখা কোন ফায়দা দেবে না। কেননা তার হাত থেকে যা দূরে রাখা হয়েছে, তা সে মুখের উচ্চারণ দ্বারা নষ্ট করে ফেলবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, সে শরীয়ত কর্তৃক সম্বোধনপ্রাপ্ত এবং আকল সম্পন্ন। সুতরাং বিবেচক ব্যক্তির উপর কিয়াস করে (একই কারণে) তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না।

এটা এজন্য যে, তার কর্তৃত্ব হরণ করার অর্থ তার মানবসত্তাকে বালিত করা এবং তাকে জন্তুর সঙ্গে যুক্ত করা। আর তা অপব্যয়ের ক্ষতির চেয়ে বেশী ক্ষতিকর। সুতরাং নিম্নতর ক্ষতিরোধ করার জন্য উচ্চতর ক্ষতি বরদাশত করা যায় না।

এজন্যই তো নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে যদি ব্যাপক ও সাধারণ ক্ষতিবোধ হয়, তাহলে তা জায়িয হবে, যেমন চিকিৎসক এবং পরোয়া মুফতি এবং দেউলিয়া ইজারাদান কারীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। এটা বৈধ বলে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

কেননা এটা হলো নিম্নতর ক্ষতি বরদাশত করে উচ্চতর ক্ষতি রোধ করা।

মাল তার হাত থেকে আটক রাখার উপর এটাকে কিয়াস করা যাবে না। কেননা শাস্তির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ মাল আটক রাখার চেয়ে কঠোর।

তদ্রূপ শিশুর উপরও কিয়াস করা যাবে না। কেননা সে নিজের কল্যাণের বিষয় দেখতে অক্ষম। পক্ষান্তরে এ ব্যক্তি নিজের কল্যাণের বিষয় দেখতে সক্ষম। আর শরীয়ত একবার সক্ষমতার উপকরণ (আকল, স্বাধীনতা ও প্রাপ্ত বয়স্কতা) দান করার মাধ্যমে তার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেছে। তবে তার মন্দ প্রয়োগের কারণে কল্যাণের বিপরীত আচরণ প্রকাশ পেয়েছে।

আর তার হাত থেকে মাল আটক রাখা অর্থবহ হবে। কেননা নিবুর্দ্ধিতার বেশীর ভাগ প্রকাশ হয় হেবা, স্বেচ্ছা দান ও ছাদকার ক্ষেত্রে। আর সেগুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করে সম্পদে কবজা থাকার উপর।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, আর কাযী যদি নির্বোধের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, অত:পর তার ফায়সালা অন্য কাযীর মজলিসে উত্থাপিত হয়, আর তিনি তার নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দেন এবং তাকে নিষেধাজ্ঞা মুক্ত করে দেন তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননা নিষেধাজ্ঞা আরোপের অর্থ হল কাযীর পক্ষ থেকে ফতোয়া প্রদান, রায় প্রদান নয়। দেখুন না, এখানে তো এমন কোন পক্ষ নেই, যার অনুকূলে বা প্রতিকূলে রায় প্রদান করা হয়েছে।

আর যদি এটাকে আদালতি রায় বলে স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তাহলে স্বয়ং আদালতি ফায়সালাটাই তো মতবিরোধপূর্ণ।

সুতরাং এ রায় আদালত কর্তৃক কার্যকর হওয়া আবশ্যক। তাই যদি নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর তার কোন হস্তক্ষেপ নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী কাযীর মজলিসে কিংবা অন্য কোন কাযীর মজলিসে উত্থাপিত হয়। আর তিনি তার হস্তক্ষেপ বাতিল হওয়ার ফায়সালা প্রদান করেন, অত:পর অন্য এক কাযীর মজলিসে বিষয়টি উত্থাপিত হয় (এবং তিনি নিষেধাজ্ঞা বাতিল করেন) তাহলে তার বালিতকরণ কার্যকর হবে। কেননা এর সঙ্গে নিষেধাজ্ঞার বাস্তবায়ন যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এরপর তা 'রদ' গ্রহণ করবে না।

অত:পর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বালক যদি নির্বোধ অবস্থায় বালেগ হয় তাহলে পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত তার সম্পদ তার হাতে অর্পণ করা হবে না। তবে এই বয়সের পূর্বে যদি সে তার সম্পদে কোন হস্তক্ষেপ করে বসে তাহলে তার হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে।

আর যখন সে পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হবে তখন তার সম্পদ তার হাতে অর্পণ করা হবে। এমন কি তার মাঝে বিবেচনা বোধ পাওয়া না গেলেও।

আর সাহেবায়ন বলেন, তার মাঝে বিবেচনা বোধ না পাওয়া পর্যন্ত কখনো তার সম্পদ তার হাতে অর্পণ করা হবে না। এবং তাতে তার হস্তক্ষেপ বৈধ হবে না।

কেননা রোধ করার হেতু হল নিবুদ্ধিতা, সুতরাং হেতু যতক্ষণ বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ বিধানও বিদ্যমান থাকবে। এবং এটা শৈশব বিদ্যমান থাকার মত হল।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, হাত থেকে মাল আটকে রাখার উদ্দেশ্য হল শিক্ষা দান করা। আর দৃশ্যতঃ ও সাধারণতঃ এই বয়সের পর মানুষ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। দেখুন না এ বয়সে তো সে কখনো কখনো দাদা হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এরপর আটক রাখার অর্থবহতা নেই। তাই অর্পণ করা লাযিম হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় এই যে, মাল রোধ করা হয়েছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাপ বিদ্যমান থাকার বিষয় বিবেচনা করে। আর সেটা প্রাপ্ত বয়স্কতার প্রাথমিক দিকে বিদ্যমান থাকে এবং দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা কেটে যায়। সুতরাং তখন রোধ করার বিধান বহাল থাকতে পারে না।

এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, যদি সে বিবেচনা অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তারপর নির্বোধ হয়ে পড়ে তাহলে তার থেকে মাল রোধ করা হবে না। কেননা এই নির্বুদ্ধিতা ও অবিবেচনা শৈশবের প্রভাবে নয়।

যাহ হোক এই অনুসিদ্ধান্ত আহরণ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতামতের ভিত্তিতে সম্ভব নয়। বরং এটা তার মতামতের ভিত্তিতে সম্ভব যিনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ বৈধ মনে করেন। সুতরাং সাহেবায়নের মতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ যখন সিদ্ধ হল তখন সে বিক্রয় করলে তার বিক্রয় কার্যকর হবে না। যাতে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সুফল রক্ষিত হয়। আর যদি বিক্রয় কার্যকর করার মধ্যে তার কোন কল্যাণ বিদ্যমান থাকে তাহলে বিচারক তা অনুমোদন করবেন।

কেননা বিক্রয় কর্মের মূল স্তম্ভ সম্পন্ন হয়েছে। আর স্থগিত রাখার বিধান ছিল তার কল্যাণ রক্ষার জন্য। এদিকে শাসককে তার কল্যাণ রক্ষাকারী রূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং ঐ হস্তক্ষেপে কল্যাণ রয়েছে কিনা সেটা তিনি বিবেচনা করবেন। যেমন ঐ শিশুর ক্ষেত্রে যে ক্রয় বিক্রয়ের বোধ রাখে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে সম্পাদন করতে পারে।

আর যদি কাযীর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে বিক্রি করে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তা জায়িয হবে। কেননা তাঁর মতে কাযীর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ অপরিহার্য। কারণ নিষেধাজ্ঞা ক্ষতি ও কল্যাণ দুই অবস্থার মাঝে আবর্তিত। আর তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তার কল্যাণের জন্য। সুতরাং কাযীর রায় প্রয়োজন।

আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে জায়িয হবে না। কেননা তাঁর মতে সে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত অবস্থায় বালিগ হয়েছে। কারণ নিষেধাজ্ঞার হেতু হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা (শিশুর ক্ষেত্রে) শৈশব যেমন।

একই মতপার্থক্য হবে যদি বিবেচক অবস্থায় বালিগ হয়, এরপর নির্বোধ হয়ে যায়।

আর (নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর) সে যদি কোন গোলামকে আযাদ করে তাহলে সাহেবায়নের মতে তার আযাদ করা কার্যকর হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে তা কার্যকর হবে না।

সাহেবায়নের নিকট মূলনীতি এই যে, যে কোন কার্যকে পরিহাস প্রভাবিত করে, নিষেধাজ্ঞাও তাকে প্রভাবিত করবে। আর যে কার্যকে পরিহাস প্রভাবিত করে না, নিষেধাজ্ঞাও তাকে প্রভাবিত করবে না।

কারণ নির্বোধ পরিহাসকারী সমমানের এদিক থেকে যে, তার কথাবার্তা বুদ্ধিমানদের বিপরীত ধারায় বের হয়, এটা আকল বুদ্ধির ক্রটির কারণে নয়, বরং খেয়াল খুশির অনুসরণের কারণে এবং আকল বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করার কারণে। নির্বোধ এর বিষয়টিও অনুরূপ।

আর মুক্তিদানের বিষয়ে যেহেতু পরিহাস প্রভাব সৃষ্টি করে না। সেহেতু নির্বোধের পক্ষ থেকে মুক্তিদান কার্যকর হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মূলনীতি এই যে, নির্বুদ্ধিতার কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, দাসত্বের কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনুরূপ। এ কারণেই নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর তালাক ছাড়া আর কোন হস্তক্ষেপ কার্যকর হয় না, যেমন দাসের ক্ষেত্রে। আর মুক্তিদান দাসের পক্ষ থেকে সিদ্ধ নয়। সুতরাং নির্বোধের পক্ষ থেকেও সিদ্ধ হবে না।

আর সাহেবায়নের মতে মুক্তিদান যখন সিদ্ধ হল তখন গোলামের কর্তব্য হবে তার মূল্যের জন্য উপার্জন করা। কেননা তার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল তার কল্যাণ রক্ষার জন্য। আর সেটা রক্ষা হবে মুক্তিদান নাকচ করার ক্ষেত্রে, কিন্তু তা অসম্ভব। সুতরাং মূল্য ফেরত প্রদানের মাধ্যমে গুণগতভাবে মুক্তি দান-এর 'ফেরত প্রদান' ওয়াজিব হবে। যেমন মৃতুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির উপন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে উপার্জন করা ওয়াজিব নয়। কেননা (এখানে) সেটা ওয়াজিব হলে আযাদকারীর প্রাপ্ত অধিকার রূপেই ওয়াজিব হবে। অথচ শরীয়তের 'উপার্জন প্রচেষ্টা' -এর ওয়াজিব হওয়া শুধু অ-যুক্তি দাতার হক রক্ষার জন্যই শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত।

আর যদি সে নিজের গোলামকে মোদাব্বার ঘোষণা করে তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননা মোদাব্বার ঘোষণা মুক্তির একটি হক সাব্যস্ত করে। সুতরাং সেটা প্রকৃত মুক্তির সাথে বিবেচিত হবে। তবে মুক্তিদানকারী মনিব বেঁচে থাকা পর্যন্ত তার উপর উপার্জন ওয়াজিব হবে না।

কেননা সে তো তার মালিকানায় বহাল রয়েছে।

আর যদি সে এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার মাঝে বিবেচনা বোধ পাওয়া যায়নি। তাহলে গোলাম তার মোদাব্বার অবস্থার মূল্য পরিশোধ করার জন্য উপার্জন করবে।

কেননা সে মনিবের মৃত্যুর কারণে মোদাব্বার অবস্থায় আযাদ হয়েছে। সুতরাং বিষয়টি এমন হবে, যেন মোদাব্বার ঘোষণার পর তাকে আযাদ করল।

আর যদি তার দাসী সন্তান প্রসব করে আর সে সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে তাহলে তার থেকে ঐ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

আর সন্তানটি স্বাধীন হবে এবং দাসীটি তার উম্মে ওয়ালাদ হবে।

কেননা নিজের বংশ রক্ষার জন্য তার উম্মে ওয়ালাদ বানানোর প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং উম্মে ওয়ালাদ বানানোর ক্ষেত্রে তাকে বিবেচনা বোধ সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে যুক্ত করা হবে।

আর যদি দাসীর সঙ্গে কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু সে বলে যে, এটা আমার উম্মে ওয়ালাদ, তাহলে সে উম্মে ওয়ালাদের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তাকে সে বিক্রি করতে পারবে না। এরপর যদি সে মারা যায় তাহলে সে দাসী তার সমগ্র মূল্যের ব্যাপারে উপার্জন করবে।

কেননা এটা হল (দাসীর) স্বাধীনতার স্বীকারোক্তি প্রদানের মত। কেননা দাসীর অনুকূলে সন্তানের সাক্ষ্য নেই।

পক্ষান্তরে প্রথম সূরতে সন্তান তার অনুকূলে সাক্ষী হিসাবে রয়েছে।

এই নির্বোধ মুক্তিদানকারী সদৃশ্য হল মৃত্যু শয্যায় শায়িত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যে, তার দাসীর সন্তানের পিতৃপরিচয়ে দাবী করে। তার ক্ষেত্রেও একই ব্যাখ্যা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি সে কোন স্ত্রী লোককে বিবাহ করে তাহলে তার বিবাহ বৈধ হবে।

কেননা বিবাহ চুক্তিতে পরিহাস কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না। তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, বিবাহ হল তার মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

আর সে যদি স্ত্রীর জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করে তাহলে তার পক্ষ হতে স্ত্রীর মোহরে মেছেল এর পরিমাণ নির্ধারণ বৈধ হবে।

কেননা এই পরিমাণ মোহর বিবাহের অনিবার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

এর অতিরিক্ত পরিমাণ বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা ঐ পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা নেই। আর নির্ধারণকৃত পরিমাণের দায় গ্রহণে তার জন্য কোন কল্যাণ নেই। সুতরাং অতিরিক্ত পরিমাণ সিদ্ধ হবে না। এবং সে মৃত্যু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মত হল।

আর যদি সে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেয় তাহলে স্ত্রীর অনুকূলে নির্ধারণকৃত মোহরের অর্ধেক ওয়াজিব হবে।

কেননা মোহরে মেছেলের পরিমাণ পর্যন্ত মোহর নির্ধারণ বৈধ রয়েছে।

তদ্রূপ যদি চারজন মহিলাকে বিবাহ করে কিংবা প্রতিদিন একজন করে বিবাহ করে তবে মাহরে মেছেল ওয়াজিব হবে।

এর কারণ আমরা আগে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নির্বোধের মাল থেকে যাকাত বের করা হবে।

কেননা তা তার উপর ওয়াজিব।

এবং (তার মাল থেকে) তার সন্তানদের জন্য তার স্ত্রীর জন্য এবং যে সকল 'যাবীল আরহামের' ভরণ-পোষণ তার উপর ওয়াজিব, তাদের জন্য খরচ করা হবে।

কেননা তার সন্তান ও স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখা তার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মীয়তার হক হিসাবে যাবিল আরহামের উপর খরচ করা তার উপর ওয়াজিব। আর নির্বুদ্ধিতার মানুষের প্রাপ্য হকসমূহ বাতিল করে না।

তবে কাযী যাকাত পরিমাণ অর্থ তার হাতে প্রদান করবেন, যাতে সে নিজে যাকাতের ক্ষেত্র ও খাতে ব্যয় করে। কেননা যাকাত যেহেতু একটি ইবাদত সেহেতু তার নিয়ত করা অপরিহার্য।

তবে কাযী তার সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠাবেন, যাতে সে যাকাতের অর্থ ভিন্নখাতে খরচ না করে। আর খরচের অর্থ কাযী তাঁর বিশ্বস্ত লোকের হাতে অর্পণ করবেন, যাতে সে বুঝে শুনে খরচ করে। কেননা এটা ইবাদত নয়। সুতরাং তার নিয়ত করার প্রয়োজন নেই।

এই আর্থিক দায়গুলো ঐ আর্থিক দায়ের বিপরীত যা সে কসম (ভঙ্গ) করে, বা ; করে বা যিহার করে নিজের উপর ওয়াজিব করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে তার উপর ওয়াজিব হবে না। বরং সওম পালন করে সে তার কসমের ও যিহারের কাফ্ফারা । করবে।

কননা কাফ্ফারা তার কতিপয় আচরণ দ্বারা ওয়াজিব হয়। এখন যদি আমরা এই দরজা খুলে দেই তাহলে এ পথে সে অর্থ নষ্ট করতে থাকবে। যে সকল আর্থিক দায় তার কর্ম ছাড়া প্রাথমিক ভাবেই ওয়াজিব হয়, সেগুলো এমন নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি সে ফরয হজ পালনের নিয়ত করে তাহলে তাকে তা থেকে বাধা প্রদান করা হবে না।

কেননা এটা তার নিজের কোন আচরণ ছাড়া আল্লাহ্র কর্তৃক ওয়াজিব করার কারণে তার উপর ওয়াজিব হয়েছে।

তবে কাযী হজের খরচ তার হাতে অর্পণ করবেন না। বরং একজন নির্ভরযোগ্য হাজীর হাতে অর্পণ করবেন, যে হজের সফরে তার প্রয়োজনে খরচ করতে থাকবে, যাতে সে অন্য কোন পথে তা নষ্ট না করে ফেলে।

আর যদি সে একটি ওমরার ইরাদা করে তাহলে তাকে তা থেকে বাধা দেওয়া হবে না।

এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। কেননা ওমরা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি একবারের বেশী হজ করতে চায় তাহলে তাকে বাধা দেয়া হবে।

তাকে হজ্জে কিরান করতে বাধা দেয়া যাবে না।

কেননা হজ ও ওমরা প্রতিটির জন্য আলাদা সফর করা থেকে তাকে বাধা দেয়া যায় না। সুতরাং দুটোকে একত্র করা থেকেও তাকে বাধা দেয়া যাবে না।

তদ্রূপ কোরবানীর জন্য উট বা গরু নিতে (ক্রয় করতে) তাকে বাধা দেয়া যাবে না।

উদ্দেশ্য হল মতপার্থক্যের স্থল থেকে দূরে থাকা। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর মতে 'বাদানাহ' ছাড়া অন্য কিছু যথেষ্ট হবে না। আর বাদানাহ্ মানে উট বা গরু।

আর যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন ইবাদত ও কল্যাণমূলক কাজে কিছু অছিয়ত করে, তাহলে তার একতৃতীয়াংশ মালের মধ্যে তা জায়িয হবে।

কেননা এটার বৈধতাতেই তার কল্যাণ রয়েছে। কারণ অসুস্থতার অবস্থা হল মাল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অবস্থা আর অছিয়ত তার জন্য (দুনিয়াতে) প্রশংসা বয়ে আনবে। কিংবা (আখেরাতে) ছাওয়াবের কারণ হবে।

কিফায়াতুল মুনতাহী কিতাবে এর চেয়ে অধিক অনুসিদ্ধান্ত আমরা উল্লেখ করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ফাসেক যদি তার মালের সুব্যবস্থাপক হয় তাহলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে না।

এটা হল আমাদের মত। আর পুরোনো ও আদি পাপ-অভ্যাস এবং নব উদ্ভূত পাপ-অভ্যাস সমান।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার প্রতি তিরস্কার ও শাস্তি হিসাবে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। যেমন নির্বোধের ক্ষেত্রে। এজন্যই তাঁর মতে তাকে (বিবাহ প্রদানের) অভিভাবকত্বের এবং সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য গণ্য করা হয়নি।

আমাদের প্রমাণ হল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ٠

যদি তাদের পক্ষ হতে বিবেচনা বোধ অনুভব কর তাহলে তাদের হাতে তাদের মাল অর্পণ কর।

আর তার পক্ষ থেকে এক প্রকার বিবেচনা বোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং (رشداً বা বিবেচনা বোধ) এই সাধারণ অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক (نكرة) শব্দটি যে কোন বিবেচনা বোধকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

তা ছাড়া আমাদের মতে ফাসিক তার ইসলামগুণের কারণে অভিভাবকত্ব লাভের যোগ্য। সুতরাং সে হস্তক্ষেপের কর্তৃত্বের অধিকারী অবশ্যই হবে। পিছনে (বিবাহ পর্বে) আমরা এ বিষয়টি 'প্রতিষ্ঠিত' করে এসেছি।

আর সাহেবায়নের মতে এবং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে উদাসীন ও সরল স্বভাবের কারণেও কাযী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন। সরল স্বভাবের অর্থ, যে ব্যবসা বাণিজ্যে ধোকা খায় আর মনের সরলতার কারণে তা থেকে সে বিরত থাকে না।

কেননা নিষেধাজ্ঞা আরোপে তার প্রতি কল্যাণ রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ বালেগ হওয়ার সীমা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বালকের বালেগ হওয়া সাব্যস্ত হবে স্বপ্নদোষ দ্বারা, গর্ভ সঞ্চারের সক্ষমতার দ্বারা এবং সহবাস কালে বীর্যপাত দ্বারা। যদি এগুলোর কোনটি না পাওয়া যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে যখন তার আঠারো বছর পূর্ণ হবে।

আর বালিকার বালেগ হওয়া সাব্যস্ত হবে ঋতুস্রাব দ্বারা, স্বপ্নদোষ হওয়া দ্বারা এবং গর্ভ সঞ্চার হওয়া দ্বারা। এর কোনটি যদি না পাওয়া যায় তাহলে যখন সতের বছর পূর্ণ হবে । এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত।

আর সাহেবায়ন (র) বলেন, বালক ও বালিকার যখন পনের বছর পূর্ণ হবে তখনই তারা বালেগ হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) থেকেও এরূপ এক বর্ণনা রয়েছে। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এরও এই মত।

বালক সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) থকে উনিশ বছরের কথাও বর্ণিত হয়েছে। তবে কেউ কেউ বলছেন যে, এর উদ্দেশ্য হল আঠারো বছর পূর্ণ করে উনিশতম বছরে উপনীত হওয়া। সুতরাং মূলত: কোন মতপার্থক্য থাকল না।

আর কারো কারো মতে এতে বর্ণনাগত মতপার্থক্য রয়েছে। কেননা কোন কোন অনুলিপিতে রয়েছে উনিশ বছর পূর্ণ করা পর্যন্ত।

আমালমত দ্বারা বালেগ হওয়া নির্ধারণের দলীল এই যে, বীর্যপাত ক্ষমতা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে বালেগ হওয়া সাব্যস্ত হয়। আর বীর্যপাত ছাড়া গর্ভসঞ্চার হওয়া বা করা সম্ভব নয়। তদ্রূপ গর্ভবতী হওয়ার বয়সে ঋতুস্রাব হওয়া। সুতরাং এই সবগুলোকে প্রাপ্ত বালেগ হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বালকের ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স বার বছর বালিকার ক্ষেত্রে নয় বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর বয়স সম্পর্কে সাহেবায়ন ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীল হল, ব্যাপক অভ্যাস এই যে, বালক-বালিকার ক্ষেত্রে বালেগ হওয়া এই সময় থেকে বিলম্বিত হয় না।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল হল আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : حتى يبلغ اشده (যতক্ষণ না সে তার 'শক্ত সমর্থ' অবস্থায় উপনীত হয়)। আর বালকে 'শক্ত সমর্থের' বয়স হল আঠারো বছর। তার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এরূপই বলেলেন এবং কুতাবী (র) তার অনুসরণ করেছেন। আর এটা হলো এ বিষয়ে কথিত সর্বনিম্ন পরিমাণ। সুতরাং এর উপরই বিধানের ভিত্তি করা হয়েছে। কারণ এতেই নিশ্চয়তা বিদ্যমান রয়েছে।

তবে বালিকাদের বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা অধিকতর দ্রুত হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা তাদের ক্ষেত্রে একবছর হ্রাস করেছি। কেননা এক বছর মৌসুম চতুষ্টয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা কোনটি অবধারিত ভাবেই স্বভাবের উপযোগী হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বালক বা বালিকা যদি বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হয় (বয়:সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়) এবং তার বালেগ হওয়ার বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে। আর সে বলে যে, আমি বালেগ হয়েছি তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এবং তার বিধানসমূহ বালেগদের বিধানের মত হবে।

কেননা এটা এমন একটা গুণগত অবস্থা, বাহ্যতঃ যা তাদের দিক থেকে ছাড়া অবগত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যখন তারা এ বিষয়ে খবর দেবে আর বাহ্যিক অবস্থা তাদের মিথ্যা সাব্যস্ত না করে তখন এ ব্যাপারে তাদের কথা গ্রহণ করে নেয়া হবে; যেমন ঋতুস্রাবের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের কথা গ্রহণ করে নেয়া হয়।

পরিচ্ছেদ ঃ ঋণ গ্রস্ততার কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, ঋণগ্রস্ততার কারণে আমি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবোনা। সুতরাং যখন কারো উপর বহু ঋণ লাযিম হয়ে পড়ে আর তার পাওনাদারেরা তাকে আটক করার এবং তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার দাবী জানায় তখন আমি তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবোনা।

কেননা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় তার মানব যোগ্যতাকে বাতিল করা হয়। তাই বিশেষ কোন ক্ষতি রোধ করার জন্য তা করা জায়িয হবে না।

সুতরাং যদি তার কোন সম্পদ থাকে তাহলে শাসক তাতে (ক্রয় বিক্রয়গত) কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

কেননা এটাও এক ধরণের নিষেধাজ্ঞা আরোপ। তাছাড়া এটা হল পারস্পারিক সম্মতি ছাড়া ব্যবসা। সুতরাং তা 'নাছ' দ্বারা বাতিল হবে।

তবে শাসক তাকে লাগাতার আটক করে রাখবেন যতক্ষণ না সে ঋণ পরিশোধের জন্য তার সম্পদ বিক্রয় করে।

এ সিদ্ধান্ত হল পাওনাদারদের হক পূর্ণ করার জন্য এবং তার (গড়িমসি জনিত) যুলুম রোদ করার জন্য।

সাহেবায়ন (র) বলেন, পাওনাদারেরা যখন দেউলিয়া দেনাদারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবী জানাবে তখন কাযী তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন এবং তাকে বিক্রয়, স্বীকাররোক্তি এবং আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত রাখবেন।

যাতে সে পাওনাদারদের ক্ষতি না করতে পারে।

কেননা নির্বোধের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বৈধতা আমরা দান করেছিলাম তার কল্যাণ বিবেচনা করে। আর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ রয়েছে পাওনাদারদের কল্যাণ বিবেচনা। কেননা হয়ত' সে তার মাল প্রতিপত্তিশালী লোকের কাছে বিক্রী করে দিবে। ফলে তাদের হক হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আর সাহেবায়ন যে বলেছেন, শাসক তাকে বিক্রয় থেকে বিরত রাখবেন এর অর্থ হলো, সমমূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করা থেকে। পক্ষান্তরে সদৃশ মূল্যে বিক্রয় পাওনাদারদের হক বাতিল করে না। আর বিরত রাখার উদ্দেশ্য হল তাদের হক রাক্ষা করা। সুতরাং সম মূল্যে বিক্রয় থেকে তাকে বিরত রাখা হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দেউলিয়া ব্যক্তি যদি তার মাল বিক্রয় করা থেকে বিরত থাকে তাহলে কাযী তার মাল বিক্রি করে পাওনাদারদের মাঝে হিস্সা অনুযায়ী বন্টন করে দেবেন। এটা সাহেবায়নের মত।

কেননা তার দেনা পরিশোধ করার জন্য বিক্রয় হলো তার উপর (পাওনাদারদের) হক। এ কারণে বিক্রির জন্য তাকে আটক রাখা হবে। সুতরাং যদি সে বিরত থাকে তাহলে কাযী তার স্থলবর্তী হয়ে তা করবেন।

যেমন, স্বামীর পুরুষাঙ্গ কর্তিত হওয়া এবং পুরুষত্বহীন হওয়ার ক্ষেত্রে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রতিপত্তিশালী ভুয়া দাবীদার খাড়া করার বিষয়টি নিছক ধারণা নির্ভর। আর পাওনাদার প্রাপ্য হলো ঋণ পরিশোধ। অথচ বিক্রয় পরিশোধের একমাত্র নির্ধারিত পথ নয়।

পক্ষান্তরে পুরুষাঙ্গ কর্তিত হওয়া এবং পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ হল বিকল্পহীন পথ। আর আটক করা (বিক্রয়ে বাধ্য করার জন্য নয়; বরং) ঋণ পরিশোধে বাধ্য করার জন্য কাযীর পছন্দমত একটি পথ মাত্র।

কিভাবে বিক্রয় সিদ্ধ হতে পারে ? আর যদি তা সিদ্ধ হয় তাহলে তো আটক করার অর্থ হবে পাওনাদারের হক বিলম্বিত করা এবং দেনাদারকে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে উভয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করা। সুতরাং তা শরীয়তসম্মত হতে পারে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি তার ঋণ হয় দিরহাম এবং তার হাতে দিরহাম বিদ্যমান থাকে তাহলে কাযী তার সম্মতি ছাড়াই ঋণ পরিশোধ করে দেবেন।

এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কেননা এ ক্ষেত্রে পাওনাদারের হক রয়েছে তার সম্মতি ছাড়া নিয়ে নেয়ার। সুতরাং কাযী পাওনাদারকে সাহায্য করতে পারেন।

আর যদি তার দেনা হয় দিরহাম, অথচ হাতে থাকে দীনার কিংবা বিষয়টি হয় এর বিপরীত, সেক্ষেত্রে কাযী ঋণ পরিশোধের জন্য তা বিক্রি করে দেবেন।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সূক্ষ্ম কিয়াস ভিত্তিক সিদ্ধান্ত। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কিয়াস ভিত্তিক সিদ্ধান্ত হল বিক্রি করতে পারবেন না। যেমন সাধারণ দ্রব্যের (এবং ভূ-সম্পত্তির) ক্ষেত্রে। এ কারণেই তো পাওনাদারের অধিকার নেই জোর করে তা নিয়ে নেয়ার।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, মূল্য মুদ্রা এবং সম্পদের সমতার দিক থেকে (দিরহাম ও দিনার) উভয়টি অভিন্ন। যদিও দৃশ্যতঃ উভয়টি ভিন্ন। সুতরাং অভিন্নতার বিচারে কাযীর জন্য হস্তক্ষেপের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে ভিন্নতার বিচারে পাওনাদারের নিজস্ব উদ্যোগে নিয়ে নেয়ার অধিকার রহিত করা হবে। -উভয় সাদৃশ্যতা কার্য করার প্রেক্ষিতে।

সাধারণ দ্রব্যের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা আকৃতিগত ও বস্তুগত উভয় দিক থেকে তার সঙ্গে 'ব্যবহার উদ্দেশ্য' জড়িত। পক্ষান্তরে মুদ্রা দ্রব্য হল মাধ্যম। সুতরাং উভয়ই পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রথমে মুদ্রাদ্রব্য বিক্রয় করা হবে। অতঃপর সাধারণ দ্রব্য বিক্রয় করা হবে, অতঃপর ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে সহজতর দিয়ে বিক্রয় শুরু করা হবে।

কেননা তাতে দেনাদারের স্বার্থ রক্ষা করে দ্রুত ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত হয়।

আর তার ব্যবহার্য পোষাকের এক প্রস্থ তার জন্য রেখে দিয়ে অবিশিষ্টগুলো বিক্রি করা হবে।

কেননা এক প্রস্থই যথেষ্ট। কারো কারো মতে অবশ্য দুই প্রস্থ। কেননা সে যখন তার কাপড় ধোবে তখন পরার জন্য এক প্রস্থ পোশাক অপরিহার্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নিষেধাজ্ঞার অবস্থায় সে যদি কারো অনুকূলে স্বীকারোক্তি করে তাহলে ঋণ পরিশোধের পর সেটা তার উপর লাযিম হবে, (তার আগে নয়)।

কেননা এই মালের সঙ্গে অগ্রবর্তীদের হক জড়িত হয়ে পড়েছে। সুতরাং সে অন্যের অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা দ্বারা তাদের হক বাতিল করতে পারবে না।

তবে (নিষেধাজ্ঞা অবস্থায় অন্যের) মাল নষ্ট করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা তো চাক্ষুষ বিষয়, যা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়।

আর যদি নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর সে নতুন কোন মাল অর্জন করে তাহলে সেই পরিমাণ মালের ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি কার্যকর হবে।

কেননা নিষেধাজ্ঞার সময় বিদ্যমান না থাকার কারণে এই মালের সঙ্গে তাদের হক জড়িত হয়নি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর দেনাদারের মাল থেকে তার নিজের জন্য, স্ত্রীর জন্য, ছোট ছোট সন্তানের জন্য এবং যে সকল যাবিল আরহামের ভরণ-পোষণ তার কর্তব্য, তাদের জন্য খরচ করা হবে।

কেননা তার মৌলিক প্রয়োজন পাওনাদারদের হকের চেয়ে অগ্রগন্য। তাছাড়া এটা হল অন্যের সাব্যস্ত হক। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা সেটাকে বাতিল করতে পারে না। এ কারণেই তো যদি সে বিবাহ করে তাহলে মাহরে মেছেলের পরিমাণের ক্ষেত্রে তার স্ত্রী অন্য পাওনাদারদের সমকক্ষ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি দেউলিয়া দেনাদারের কোন মালের খোঁজ না পাওয়া যায়, আর তার পাওনাদারেরা তাকে আটক করার দাবী জানায় আর সে বলে যে, আমার কোন মাল নেই, তাহলে শাসক তাকে এমন সকল ঋণের বিপরীতে আটক করবেন, যার দায় সে কোন চুক্তি বলে গ্রহণ করেছে। যেমন মাহর ও কাফিল হওয়ার চুক্তি।

এই কিতাবে 'কাযীর আচরণ বিধি' পর্বে এই প্রাপ্যটির সার্বিক আলোচনা আমরা করেছি। সুতরাং এখানে তার পুনরালোচনা আমরা করবো না।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে অবশেষে ইমাম কুদূরী বলেছেন, তদ্রূপ দেনাদার যদি এই মর্মে বাইয়েনাহ পেশ করে যে, তার কোন মাল নেই;– এ বক্তব্যের অর্থ হল শাসক তাকে মুক্ত রাকবেন। কেননা সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত অবকাশ প্রদান আবশ্যক।

আটকাবস্থায় যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে আটকাবস্থায় থাকবে, যদি তার সেবা ও চিকিৎসা তত্ত্বাবধানের জন্য কোন খাদেম থাকে। আর যদি তা না থাকে তাহ-লে প্রাণনাশ পরিহারের জন্য শাসক তাকে বের হতে দেবেন।

আর পেশাদারকে আটকাবস্থায় তার পেশায় নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না, যাতে তার মন অতিষ্ঠ হয়ে ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধ হয়। এটাই বিশুদ্ধ মত।

পক্ষান্তরে যদি তার দাসী থাকে, আর আটকস্থলে সহবাসের সুযোগ পাওয়ার মত স্থান থাকে তাহলে তাকে সহবাস থেকে বিরত রাখা যাবে না। কেননা এটা হলো দুই শারীরিক প্রয়োজনের একটি। সুতরাং এটাকে অন্যটি পূরনের উপর কিয়াস করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আটকাবস্থা থেকে তার বের হওয়ার পর তার ও তার পাওনাদারদের মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হবে না, বরং তারা তার পিছনে লেগে থাকবে। তবে তাকে লেনদেন করা থেকে এবং সফর করা থেকে বাধা প্রদান করতে পারবে না।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لصاحب الحق يد ولسان (دار قطنى) —পাওনাদারের হাত ও মুখের অধিকার রয়েছে।

এখানে 'হাত' দ্বারা লেগে থাকার অধিকার এবং 'মুখ' দ্বারা তাগাদা করার অধিকার বোঝানো হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তারা তার উদ্বৃত্ত উপার্জন নিয়ে নেবে এবং হিস্সা অনুপাতে সেটা নিজেদেরে মাঝে বন্টন করবে।

কেননা গুণগত শক্তিতে তাদের সবার হক সমান।

আর সাহেবায়ন বলেন, শাসক যদি তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করেন তাহলে তিনি তার ও পাওনাদারের মাঝে বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন, যতক্ষণ না তারা এই মর্মে বাইয়েনাহ পেশ করে যে, তার মাল রয়েছে।

কেননা তাদের মতে দেউলিয়া ঘোষণা করায় সিদ্ধতা রয়েছে। সুতরাং তখন অসচ্ছলতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত অবকাশের হকদার হয়ে যাবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে দেউলিয়া ঘোষণা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আল্লাহর দেয়া সম্পদ আসে ও যায়। তাছাড়া মাল থাকার বিষয়ে সাক্ষীদের অবগতি শুধু বাহ্যগতই হতে পারে। সুতরাং তা আটকাদেশ রোধ করার উপযুক্ত হবে। পিছনে লেগে থাকার অধিকার বাতিল করার উপযুক্ত হবে না।

আর ইমাম কুদূরীর বক্তব্য 'এতে যদি বাইয়েনাহ পেশ করে' দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয় যে, সচ্ছলতা প্রমাণের বাইয়েনাহ অসচ্ছলতা প্রমাণের বহিয়েনাহ থেকে অগ্রগন্য হবে। কেননা প্রথমটি দ্বিতীয়টি থেকে অধিক বিষয় প্রমাণ করে। কেননা ইনসানের মূল অবস্থা হল অসচ্ছলতা।

আর পিছনে লেগে থাকা প্রসঙ্গে ইমাম কুদূরী (র) .এর বক্তব্য 'তাকে তারা লেনদেন থেকে এবং সফর থেকে বিরত রাখতে পারবে না' প্রমাণ করে যে, সে যেখানে ঘুরবে তারা তার সঙ্গে সেখানে ঘুরবে। কিন্তু তাকে এক স্থানে বসিয়ে রাখতে পারবে না। কেননা এটা তো সেখানে আটক করে রাখার নামান্তর।

আর যদি দেনাদার (খাদ্য গ্রহণ ও প্রাকৃতিক) প্রয়োজনে তার ঘরে প্রবেশ করে তাহলে পাওনাদার তার পিছনে পিছনে যেতে পারবে না, বরং বের হওয়া পর্যন্ত তার বাড়ীর দরজায় বসে থাকবে।

কেননা মানুষের জন্য একটা নির্জন ও একান্ত স্থান অপরিহার্য।

আর যদি দেনাদার আটক থাকা পছন্দ করে এবং পাওনাদার তার পিছনে লেগে থাকা পছন্দ করে তাহলে ইচ্ছাধিকার পাওনাদারের হবে। কেননা সেটাই উদ্দেশ্য অর্জনে অধিক কার্যকর। কারণ সেতো দেনাদারের প্রতি অধিক জটিলতা সৃষ্টিই পছন্দ করে।

তবে কাযী যদি বুঝতে পারেন যে, পেছনে লেগে থাকা দ্বারা তার সুস্পষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। যেমন পাওনাদার তাকে তার বাড়ীতে পর্যন্ত প্রবেশ করতে দিবে না, তখন তার ক্ষতি রোধ করার জন্য কাযী তাকে আটক করবেন।

আর যদি কোন স্ত্রীলোকের কাছে কোন পুরুষের পাওনা থাকে তাহলে সে পুরুষ তার পিছনে লেগে থাকতে পারবে না।

কেননা তাতে পর নারীর সঙ্গে একান্তে থাকা হয়। বরং সে একজন বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক পাঠাবে, যে তার পিছনে লেগে থাকবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি দেউলিয়া হয়ে যায় আর তার কাছে কোন লোকের নির্দিষ্ট সামান দ্যিমান থাকে যা সে লোকটি থেকে খরিদ করেছে, তহলে সামানের মূল্যের ব্যাপারে পাওনাদারদের সমকক্ষ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বিক্রেতার দাবী সাপেক্ষে কাযী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন।

অতঃপর বিক্রেতার বিক্রয় চুক্তি রহিত করার ইচ্ছাধিকার রয়েছে। কেননা ক্রেতা মূল্য পরিশোধে অপারগ হয়ে পড়েছে। সুতরাং এই অপারগতা তার অনুকূলে রহিত করণের অধিকার সাব্যস্ত করবে। যেমন বিক্রীতা বিক্রয় দ্রব্য অর্পণে অপারগ হওয়ার ক্ষেত্রে।

এটা এ কারণে যে, বিক্রয় হচ্ছে একটি বিনিময় চুক্তি। আর তার দাবী হল সমতা। আর এটা 'বায় সালামের' মত হল।

আমাদের দলীল এই যে, ক্রেতার দারিদ্র্য পরিশোধকৃত দিরহাম-দীনারের বস্তু সত্তা ফেরত অর্পণের অপারগতা সাব্যস্ত করেছে। অথচ চুক্তি বলে মুদ্রায় নির্ধারিত বস্তুসত্তা প্রাপ্য নয়। সুতরাং সেই বিচারে চুক্তি রহিত করার অধিকার সাব্যস্ত হবে না। চুক্তি দ্বারা তো প্রাপ্য হল যিম্মায় সাব্যস্ত একটি গুণ তথা ঋণ। আর ক্রেতা কর্তৃক মুদ্রার বস্তুসত্তা কবজা দ্বারা উভয়ের মাঝে গুণগত বিনিময় সাব্যস্ত হয়। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে এটাই হল প্রকৃত সত্য। সুতরাং বিবেচনা করা আবশ্যক হবে। তবে যেখানে বিনিময় সাব্যস্ত করা অসম্ভব, যেমন 'বায় সালাম'। কেননা 'বায় সালামের' ক্ষেত্রে বদল করা নিষিদ্ধ। সুতরাং সেখানে বস্তু সত্তাকে অনির্ধারিত (ঋণ) সত্তার বিধান প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহই অধিক অবগত।

كِتَابُ الْمَأْذُوْنِ

অধ্যায় ঃ অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম

اذن শব্দের আভিধানিক অর্থ হল অবগত করানো। আর শরীয়তের পরিভাষায় اذن অর্থ (দাসত্ব দ্বারা সাব্যস্ত) নিষেধজ্ঞা তুলে নেওয়া এবং মানবের হক রহিত করা। এটা আমাদের ব্যাখ্যা। (ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন)।

আর অনুমতি লাভের পর গোলাম তার নিজের জন্য মুআমেলা করতে পারে আপন যোগ্যতা বলে।

কেননা দাসত্বের পরও সে তার বচন শক্তি দ্বারা এবং ভালো মন্দের পার্থক্যকারী আকল দ্বারা মুআমেলা সম্পাদনের যোগ্য থেকে যায়। তবে মনিবের হক রক্ষার জন্য তাকে মুআমেলা করা থেকে বিরত রাখা হয়।

কেননা গোলামের মুআমেলার অধিকারের অর্থ হল তার দাস সত্তার সঙ্গে কিংবা উপার্জনের সঙ্গে ঋণ যুক্ততা লাযিম হওয়া। অথচ তার দাস সত্তা এবং তার উপার্জন হচ্ছে মনিবের মাল। সুতরাং মনিবের অনুমতি অপরিহার্য, যাতে তার সম্মতি ছাড়া তার হক বাতিল না হয়।

এ জন্যই যে সকল দায় তার সাথে যুক্ত হয় তা সে মনিবের কাছ থেকে রুজু করতে পারে না।

আর অনুমতি সময়াবদ্ধতা গ্রহণ করে না। সুতরাং যদি গোলামকে একদিনের জন্য অনুমতি প্রদান করে তাহলে তা সব সময়ের জন্য অনুমতি হবে, যতক্ষণ না পুনঃ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কেননা হক রহিতকরণের বিষয়গুলো সময়াবদ্ধতা গ্রহণ করে না।

আর প্রত্যক্ষ শব্দ দ্বারা যেমন অনুমতি সাব্যস্ত হয় তেমনি পরোক্ষভাবেও হয়। যেমন মনিব তার গোলামকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখে নীরব থাকল। আমাদের মতে তাতে সে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আর এতে কোন পার্থক্য নেই যে, সে মনিবের মালিকানধীন বস্তু বিক্রি করুক, কিংবা আজনবীর অনুমতিক্রমে বা বিনা অনুমতিতে তার মাল বিক্রি করুক, তদ্রূপ বিক্রয় চুক্তিতে বিক্রি করুক, কিংবা ফাসিদ চুক্তিতে বিক্রি করুক।

কেননা এরূপ 'কর্মরত' অবস্থায় যেকেউ তাকে দেখবে; ঐ বেষয়ে তাকে অনুমতি প্রাপ্তই ধারণা করবে, ফলে তার সাথে চুক্তি সম্পাদন করবে এবং অনুমতিপ্রাপ্ত না হলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আর মনিব যদি এতে সম্মত না হতো তাহলে লোকদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই তাকে বাধা দিত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যদি তার গোলামকে ব্যবসায়ের নিঃশর্ত ও সাধারণ অনুমতি প্রদান করে তাহলে সকল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তার যাবতীয় লেনদেন বৈধ হবে।

এই মাসআলার অর্থ এই যে, মনিব তাকে বললো, আমি তোমাকে ব্যবসায়ের অনুমতি দিলাম; বিশেষ কোন ব্যবসায়ের সাথে অনুমতিকে বিশিষ্ট করল না।

এর কারণ এই যে, ব্যবসা একটি সাধারণ শব্দ যা সমগ্র 'শ্রেণী'কে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং সকল প্রকারের বস্তু -যা তার ইচ্ছা হয় ক্রয় এবং বিক্রয় করতে পারবে। কেননা ক্রয়-বিক্রয় হল ব্যবসার মূল।

আর যদি সামান্য ক্ষতিতে বিক্রয় বা ক্রয় করে তাহলে তা জায়িয হবে।

কেননা সামন্য ক্ষতি থেকে (সব সময়) বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

তদ্রূপ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বিরাট ক্ষতিতেও জায়িয হবে। সাহেবায়ন ভিন্নমত পোষণ করেন।

সাহেবায়ন বলেন, বিরাট ক্ষতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা স্বেচ্ছা দানের সমতুল্য।

এ কারণেই মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিরাট ক্ষতিতে ক্রয়-বিক্রয় তার মালের এক তৃতীয়াংশে বৈধ বিবেচিত হয়। সুতরায় প্রদত্ত অনুমতি এটাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। এটি হেবার মত।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, বিষয়টি বিরাট ক্ষতিতে ক্রয়-বিক্রয় করাও ব্যবসা। আর গোলাম নিজে যোগ্যতা বলে মুআমেলা করছে। সুতরাং সে স্বাধীন ব্যক্তির মত। অনুমতিপ্রাপ্ত বালকের ক্ষেত্রেও একই মতপার্থক্য।

আর অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি তার মৃত্যুশয্যায় হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি করে তাহলে সেটা তার সমগ্র মাল থেকেই বিবেচিত হবে।

যদি তার যিম্মায় কোন ঋণ না থাকে। আর যদি ঋণ থাকে তাহলে ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সমগ্র সম্পদ থেকে বিবেচিত হবে।

কেননা এ বিষয়ে স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ সম্পদে সীমাবদ্ধ করার কারণ হল ওয়ারিছদের হক রক্ষা করা। অথচ গোলামের কোন ওয়ারিছ নেই।

আর ঋণ যদি গোলামের হাতের সমস্ত মালকে বেষ্টন করে ফেলে তাহলে ক্রেতাকে বলা হবে, হ্রাসকৃত সমগ্র পরিমাণ পরিশোধ কর, অন্যথায় বিক্রীত দ্রব্য ফেরত দাও; যেমন স্বাধীন ব্যক্তির ব্যাপারে।

আর গোলাম 'বায় সালাম' করতে পারে এবং **অন্যের সালাম চুক্তি গ্রহণ করতে পারে। কেননা এটা ব্যবসা। আর সে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ওকীল নিযুক্ত করতে পারে।**

কেননা অনেক সময় সে নিজে অবসর নাও পেতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর সে বন্ধক রাখতে পারে এবং বন্ধক গ্রহণ করতে পারে।

কেননা এ দু'টো ব্যবসায়ের অনুবর্তী বিষয়। কারণ এ দু'টো ঋণ পরিশোধের এবং ঋণ উত্তোলনের জন্য সহায়ক।

আর আবাদ করার জন্য যমি গ্রহণ করতে পারে এবং মজুরির বিনিময়ে মজদুরদের নিযুক্ত করতে পারে এবং ঘর ভাড়া নিতে পারে।

কেননা এ সবই ব্যবসায়ের কর্মভুক্ত বিষয়।

আর যমি চাষাবাদের জন্য নিতে পারে।

কেননা এতে মুনাফা অর্জন রয়েছে।

এবং খাদ্যশস্য খরিদ করে তার যমিতে ফসল ফলাতে পারে॥

কেননা এটা দ্বারা মুনাফা উদ্দেশ্য করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الزارع تياجر ربه। -চাষী তার রবের সঙ্গে ব্যবসা করে।

আর সে 'ইনানের' শরীকানা চুক্তি করতে পারে এবং মোদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করতে পারে এবং পুঁজি গ্রহণ করতে পারে।

কেননা এটা ব্যবসায়ীদের প্রথাভুক্ত বিষয়। তদ্রূপ আমাদের মতে তার অধিকার রয়েছে নিজেকে মজুরীর নিনিময়ে খাটানোর। ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, গোলাম নিজের দাস সত্তার উপর চুক্তি করার অধিকারী নয়। সুতরাং সে নিজের দাস সত্তার মুনাফার উপরও চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না। কেননা মুনাফা তার দাস সত্তার অনুবর্তী।

আমাদের দলীল এই যে, তার দাস সত্তা হলো তার মূল পুঁজি। সুতরাং পুঁজি হিসাবে সে তার দাস সত্তার যেমন ইচ্ছ মুআমেলা করতে পারে। তবে যদি তার মুআ-মেলা অনুমতিকে বিলুপ্ত করে দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন নিজেকে বিক্রি করা। কেননা বিক্রয় দ্বারা সে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তদ্রূপ নিজেকে বন্ধক রাখা। কেননা তা দ্বারা সে আটক হয়ে যাবে। ফলে মনিবের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। পক্ষান্তরে নিজেকে মজুরীতে নিযুক্ত করা দ্বারা সে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হয় না এবং তা দ্বারা মনিবের উদ্দেশ্য অর্থাৎ মুনাফা অর্জিত হয়। সুতরাং সে এর অধিকারী হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যদি তাকে অন্যান্য পণ্য ছাড়া নির্দিষ্ট একটি পণ্যের ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করে তাহলে সে সকল প্রণ্যর ক্ষেত্রে অনুমতিপ্রাপ্ত হবে।

ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, শুধু সেই প্রকারের ক্ষেত্রেই অনুমতিপ্রাপ্ত হবে।

একই মতপার্থক্য হবে যখন মনিব অন্য একটি প্রকারের ক্ষেত্রে মুআমেলা থেকে তাকে নিষেধ করে দেয়।

তাঁদের দলীল এই যে, অনুমতি প্রদানের অর্থ হল মনিবের পক্ষ থেকে তাকে ওকীল নিযুক্ত করা এবং স্থলাভিষিক্ত করা। কেননা সে তো মনিবের পক্ষ থেকেই কর্তৃত্ব লাভ করে। আর মুআমেলার বিধান অর্থাৎ মলিকানা মনিবের জন্যই সাব্যস্ত হয়, গোলামের জন্য নয়। এ কারণেই তো মনিব গোলামের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের অধিকার রাখে। সুতরাং মনিব তাকে যে ক্ষেত্রে বিশিষ্ট করে দেবে, সে ক্ষেত্রেই সে বিশিষ্ট থাকবে। যেমন মোদারিব-এর হুকুম।

আমাদের দলীল এই যে, অনুমতি প্রদানের অর্থ হল, নিজের হক রহিত করা এবং নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া, যেমন আমরা পূর্বে বলে এসেছি। আর তখন গোলামের (মনিব সূত্রে প্রাপ্ত) মলিক সত্তা প্রকাশ পায়। সুতরাং সেটা এক প্রকার বাদ দিয়ে আরেক প্রকারের সাথে বিশিষ্ট হবে না।

ওকীলের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে অন্যের মালের মধ্যে লেনদেন করে। তাই মা-লের মালিকের দিক থেকে তার অনুকূলে কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হয়।

আর মুআমেলার বিধান অর্থাৎ মালিকানা প্রত্যক্ষভাবে গোলামের জন্য সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই উপার্জিত মালকে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে এবং 'ভরণ পোষণ'-এর ক্ষেত্রে ব্যয় করার অধিকার তার রয়েছে। আর যে পরিমাণ থেকে গোলাম মুখাপেক্ষাহীন হবে (অর্থাৎ যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত হবে) সে পরিমাণের ক্ষেত্রে মনিব গোলামের স্থলবর্তীরূপে মালিকানা গ্রহণ করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি মনিব তাকে নির্দিষ্ট একটা বস্তুর ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করে তাহলে সে 'অনুমতিপ্রাপ্ত' গোলাম নয়।

কেননা এটা হলো নিজের সেবায় নিযুক্ত করণ। এর অর্থ এই যে, তাকে পরিধানের কাপড় ক্রয় করতে বললো, কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্য ক্রয় করতে বললো।

এটা এজন্য যে, যদি শুধু এতটুকুতেই সে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হয়ে যায়, তাহলে তো সেবায় নিযুক্ত করার পথই বন্ধ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে সে যদি বলে যে, তুমি প্রতি মাসে আমাকে এ পরিমাণ শস্য এনে দিবে, কিংবা আমাকে এক হাযার পরিশোধ করবে, আর তুমি স্বাধীন-তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা মনিব তার কাছে মাল তলব করেছে। আর উপার্জন ছাড়া মাল আসবে না।

কিংবা যদি বলে, তুমি রঞ্জন কারিগররূপে কিংবা ধোবী রূপে বস, (তাহলেও অনুমতিপ্রাপ্ত হবে।)

কেননা এর অর্থ হল ঐ দুই কাজের জন্য অপরিহার্য দ্রব্যটি ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা। আর এটি হল 'প্রকার'। সুতরাং সে সকল 'প্রকারেই' অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের ঋণ সম্পর্কে ও গসব সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করা জয়িয রয়েছে। তদ্রূপ আমানতের দ্রব্যাদি সম্পর্কেও।

কেননা স্বীকারোক্তি হল ব্যবসায়ের অনুবর্তী, কারণ তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য না হলে মানুষ তার সঙ্গে বেচা-কেনা ও লেনদেন পরিহার করবে।

আর (স্বীকারোক্তি কালে) স্বীকারোক্তিকারী যদি সুস্থ অবস্থায় থাকে তাহলে তার যিম্মায় ঋণ থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। পক্ষান্তরে মৃত্যু শয্যায় থাকলে সুস্থাবস্থার ঋণ অগ্রবর্তী হবে, যেমন স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে। আর এমন কোন বিষয়ে স্বীকারোক্তি করা যা ব্যবসা ছাড়া অন্য কারণে মাল ওয়াজিব করে, (যেমন বিবাহের মাহর ইত্যাদি) সে ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা ঐ ক্ষেত্রে সে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্তেরই মত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তার বিবাহ করার অধিকার নেই।

কেননা এটা ব্যবসা নয়।

তদ্রূপ সে তার গোলামদেরকে বিবাহ দিতে পারবে না।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, সে তার দাসীকে বিবাহ দিতে পারবে। কেননা এটা হলো দাসীর সম্ভোগ উপকার লাভের বিপরীতে মাল অর্জন করা। সুতরাং এটা দাসীকে মুজুরির বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করার মত হল।

তরফায়নের দলীল এই যে, অনুমতি শুধু 'ব্যবসাকর্ম'কে অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ এটা ব্যবসা নয়। এজন্যই তো সে গোলামকে বিবাহ করাতে পারে না।

অনুমতিপ্রাপ্ত বালক, মোদারিব, ইনান শরীকানায় শরীক, এবং (অভিভাবক হিসাবে) পিতা বা অছী সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সে তার গোলামের সাথে কিতাবাত চুক্তি করতে পারে না।

কেননা এটা ব্যবসা নয়। কারণ ব্যবসা হল মালের বিপরীত মালের বিনিময়। অথচ কিতাবাত চুক্তিতে বিনিময়টি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিপরীতে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তা ব্যবসার সংজ্ঞাভুক্ত হবে না।

তবে মনিব যদি তাকে অনুমতি প্রদান করে আর তার যিম্মায় কোন ঋণ না থাকে (তাহলে হবে)।

কেননা মনিব তাকে কিতাবাত চুক্তির অধিকার প্রদান করলো। সুতরাং এ বিষয়ে গোলাম মনিবের স্থলবর্তী হবে এবং এর দায়দায়িত্ব মনিবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। কেননা কিতাবাত চুক্তির ক্ষেত্রে ওকীল নিছক বার্তাবাহক হয়ে থাকে।

তিনি আরো বলেন, অর্থের বিনিময়ে মুক্তি প্রদান করতে পারবে না।

কেননা সে যখন কিতাবাত চুক্তি করতে পারে না, তখন মুক্তি দান আরও স্বাভাবিক পথেই করতে পারবে না।

আর সে করয প্রদান করতে পারবে না।

কেননা এটা হেবার মত নিছক স্বেচ্ছাদান।

আর সে বিনিময়সহ কিংবা বিনিময় ছাড়া কোন প্রকার হেবা করতে পারবে না। অদ্রূপ সাদাকা করতে পারবে না।

কেননা এগুলো হল প্রত্যক্ষ দান, (বিনিময় মুক্ত হেবার) সূচনা ও সমাপ্তি উভয় দিক থেকে, কিংবা (বিনিময়যুক্ত হেবায়) শুধু সূচনার দিক থেকে। সুতরাং তা ব্যবসার অনুমতির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে সামান্য খাবার হাদিয়া দিতে কিংবা যে তাকে খাইয়েছে তাকে আপ্যায়ন করতে পারবে।

কেননা প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের মনোরঞ্জনের জন্য এটা ব্যবসায়ের অনিবার্য প্রয়োজনভুক্ত বিষয়। অনুমতিবিহীন গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার পক্ষে তো (ব্যবসায়ের) মূল অনুমতিই নেই। সুতরাং ঐ বিষয়ে কিভাবে সাব্যস্ত হতে পারে যা ব্যবসায়ের প্রয়োজনভুক্ত।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, অনুমতিবিহীন গোলামকে তার মালিক যদি দিনের খাবার দেয় আর সে তার কোন বন্ধু-বান্ধবকে ঐ খাবার দাওয়াত দেয় তাহলে এতে কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যদি তাকে এক মাসের খাবার প্রদান করে তাহলে দাওয়াত দিতে পারবে না।

কেননা তারা যদি মাস শেষ হওয়ার আগেই তা খেয়ে ফেলে তাহলে মনিব তা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

আলিমগণ বলেছেন, স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ী থেকে সামান্য পরিমাণ সাদাকা করতে পারে। যেমন রুটি বা এ জাতীয় কিছু। কেননা সাধারণ রীতিতে তা নিষিদ্ধ নয়।

তিনি আরো বলেন ঃ অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম দোসজনিত কারণে ঐ পরিমাণ মূল্য কমাতে পারে যা ব্যবসায়ীরা কমিয়ে থাকে।

কেননা এটা ব্যবসায়ীদের রীতিভুক্ত বিষয়। আর অনেক সময় চুক্তি রহিত করে নতুনভাবে দ্রব্য ফেরত নেয়ার চেয়ে মূল্য কমিয়ে ছেড়ে দেয়া অধিক কল্যাণজনক হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে দোষ ছাড়া মূল্য কমিয়ে দেয়ার বিষয়টি স্বেচ্ছাদান। তাই এটা ব্যবসায়ীদের রীতিভুক্ত বিষয় নয়। চুক্তিপূর্ব সময়ে মূল্য হ্রাস করার বিষয়টিও এমন নয়। কেননা কখনো কখনো এর প্রয়োজন হয়, যেমন আমরা বলে এসেছি।

আর সে নিজের পাওনা ঋণের মেয়াদ প্রদান করতে পারে।

কেননা এটা ব্যবসায়ীদের রীতিভুক্ত বিষয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তার যাবতীয় ঋণ তার দাস সত্তার সঙ্গে জড়িত থাকবে। (ঋণ পরিশোধ করার জন্য কাযীর তত্ত্বাবধানে) পাওনাদারদের অনুকূলে তাকে বিক্রি করা যাবে। কিন্তু মনিব যদি ঋণ পরিশোধের বিনিময়ে তাকে ছাড়িয়ে নিতে চায় (তবে করা যাবে না)।

ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তাকে বিক্রি করা যাবে না। তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার ঋণ পরিশোধের জন্য তার উপার্জিত দ্রব্য বিক্রি করা যাবে।

ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল এই যে, মনিবের অনুমতি প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল, যে মাল ছিল না সেই মাল হাছিল করা, যে মাল তার ছিল তা

হাতছাড়া করা নয়। আর সেটা সম্ভব হবে গোলামের উপার্জিত দ্রব্যের সঙ্গে ঋণকে সম্পৃক্ত করা দ্বারা। সুতরাং যদি উপার্জিত দ্রব্যের কিছু অংশ ঋণ পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত থাকে, তা মনিব লাভ করবে। গোলামের দাস সত্তার সঙ্গে ঋণকে সম্পৃক্ত করলে মনিবের উদ্দেশ্য হাছিল হবে না।

কারো মাল নষ্ট করাজনিত বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা এক ধরণের অপরাধ। আর অপরাধের বিপরীতে দাস সত্তা হাতছাড়া করা অনুমতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

আমাদের দলীল এই যে, গোলামের যিম্মায় যে ঋণ ওয়াজিব হয়েছে তার বাধ্যবাধকতা মনিবের হকের ক্ষেত্রেও প্রকাশ পাবে। সুতরাং তা উশুল করার জন্য গোলামের দাস সত্তার সঙ্গেই সম্পৃক্ত হবে। যেমন, বস্তু নষ্ট করার কারণে সাব্যস্ত ঋণের ক্ষেত্রে।

আর উভয়ের মাঝে যোগসূত্র হলো মানুষের ক্ষতি রোধ করা। এটা এজন্য যে, এই ঋণের কারণ হল ব্যবসা । আর ব্যবসা হল মনিবে অনুমতিভুক্ত বিষয়। আর উশুলের দিক থেকে গোলামের দাস সত্তার সঙ্গে ঋণের সম্পৃক্তি মানুষকে গোলামের সঙ্গে লেনদেনে উদ্বুদ্ধ করবে। সুতরাং এদিক থেকে এটা মনিবের উদ্দেশ্যে রূপে গণ্য হতে পারে।

আর (যে বিক্রয় দ্রব্যের কারণে ঋণ সাব্যস্ত হয়েছে সেই) বিক্রয় দ্রব্য মনিবের মালিকানাভুক্ত হওয়া দ্বারা মনিবের ক্ষেত্রে ক্ষতি গ্রস্ততা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আর উপার্জিত দ্রব্যের সঙ্গে ঋণের সম্পৃক্তি তার দাস সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্তির বিরোধী নয়। সুতরাং উভয়ের সঙ্গেই ঋণ সম্পৃক্ত হবে।

তবে উশুল করার ক্ষেত্রে উপার্জিত দ্রব্য দ্বারা শুরু করা হবে। যাতে পাওনাদারের হক পূর্ণ করা এবং মনিবের উদ্দেশ্য অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হয়। আর উপার্জিত দ্রব্য না থাকা অবস্থায় দাস সত্তা থেকেই উশুল করা হবে।

কুদূরী কিতাবে উল্লেখিত 'তার যাবতীয় ঋণ' দ্বারা উদ্দেশ্যে হল ব্যবসা সূত্রে ওয়াজিব ঋণ। কিংবা ব্যবসা সমতুল্য সূত্রে ওয়াজিব ঋণ। যেমন ক্রয় বিক্রয়, ইজারা প্রদান, ইজারা গ্রহণ, গসবকৃত বস্তুর দায়বহন, গচ্ছিত দ্রব্য এবং আমানতি দ্রব্য যখন সে তা অস্বীকার করে এবং হকদার হওয়ার পর ক্রয়কৃত দাসীর সঙ্গে সহবাসের কারণে সাব্যস্ত 'সঙ্গম মাহর'। কেননা এই সঙ্গম মাহর ক্রয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কারণ ক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (কাযী যখন গোলামকে বিক্রি করবে তখন) তার মূল্য তাদের মাঝে তাদের প্রাপ্য হিস্সা অনুসারে বণ্টিত হবে।

কেননা দাস সত্তার সঙ্গে তাদের হক যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এটা মাইয়েতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির সঙ্গে ঋণের সম্পৃক্ততার মত হল।

আর যদি তার ঋণগুলো হতে কিছু অতিরিক্ত থেকে যায় তাহলে স্বাধীনতা লাভের পর গোলামের কাছে তা তলব করা হবে।

কেননা ঋণ তার যিম্মায় সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ তার দাস সত্তা দ্বারা তা পূর্ণ আদায় হয়নি।

আর দ্বিতীয়বার তাকে বিক্রি করা হবে না।

যাতে গোলামকে বিক্রি করা অসম্ভব না হয়ে পড়ে। (কেননা দ্বিতীয় বিক্রির প্রশ্ন থাকলে প্রথম ক্রয়ের ক্ষেত্রেই কেউ আগ্রহী হবে না)। অথবা যাতে ক্রেতার ক্ষতি রোধ করা যায়।

আর তার ঋণ তার উপার্জিত দ্রব্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। চাই তা ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে উপার্জিত হোক কিংবা তার পরে।

আর যে হাদিয়া গ্রহণ করবে তার সঙ্গেও ঋণ সম্পৃক্ত হবে। কেননা 'মালিকানা বস্তু' গোলামের প্রয়োজন থেকে মুক্ত হওয়ার পরই শুধু মনিব 'মালিকানা বস্তুতে' গোলামের স্থলবর্তী হবে। অথচ এখনো তা প্রয়োজনমুক্ত হয়নি।

ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে মনিব গোলামের হাত থেকে যা নিয়ে নিয়েছে সেটার সঙ্গে ঋণ সম্পৃক্ত হবে না।

কেননা মনিবের অনুকূলে মুক্ত থাকার শর্ত বিদ্যমান ছিল।

আর ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পরও মনিবের অধিকার রয়েছে। (গোলামের কাছ থেকে তার ধার্যকৃত) তার সমপরিমাণ উপার্জন (যেমন আগে নিতো)।

কেননা মনিবকে যদি সে অধিকার না দেওয়া হয় তাহলে তো সে গোলামের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দিবে। তখন উপার্জন হবে না (ফলে পাওয়ানাদার ক্ষতিগ্রস্থ হবে)। সমপরিমাণ উপার্জনের অতিরিক্ত যা তা পাওয়াদারদের ফিরিয়ে দেবে। কেননা অতিরিক্ত পরিমাণ তার প্রয়োজন নেই। অথচ পাওনাদারদের হক অগ্রগণ্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মবিন যদি গোলামের (অনুমতি প্রত্যাহার করে তার) উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাহলে বাজারে সেটা প্রকাশ পাওয়া (এবং জানাজানি হওয়া)পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবেনা।

কেননা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে তা দ্বারা লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ তখন তাছের হক গোলামের মুক্তি পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিলম্বিত হয়ে যাবে। কারণ (আগেই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার ফলে) ঋণের সম্পর্ক তার দাস সত্তার সঙ্গে এবং তার উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। অথচ তারা তো সেই আশায় তার সঙ্গে বেচা কেনা করেছিল।

বাজারের অধিকাংশ লোকের জানা হলো শর্ত। সুতরাং যদি দু'একজন লোক থাকা অবস্থায় বাজারে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দেয়া হয় তাহলে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না। এ অবস্থায় যদি লোকেরা তার সঙ্গে লেনদেন করে তাহলে তা জায়িয হবে। এমনকি যে দু'একজন তার নিষেধাজ্ঞার কথা জেনেছে তারা লেনদেন করলেও তা জায়িয হবে।

আর যদি মনিব নিজের বাড়িতে অধিকাংশ বাজারের লোকের উপস্থিতিতে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাহলে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। আসল বিবেচ্য হলো নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক প্রচার ও জানাজানি। তখন তাই সকলের অবগতির স্থলবর্তী করা হবে। যেমন রাসূলগণের পক্ষ হতে রিসালাতের বাণী পৌছানোর ক্ষেত্রে।

আর গোলাম নিজে নিষেধাজ্ঞার বিষয় অবগত হওয়া পর্যন্ত অনুমতিপ্রপাত থাকবে। ওকীল যেমন বরখাস্তের বিষয় না জানা পর্যন্ত (ওকীল রূপে বহাল থাকে)।

এটা এ কারণে যে, তা না হলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা মুক্তি লাভের পর তার নিজস্ব মাল থেকে ঋণ পরিশোধ করা তার উপর লাযিম হবে। অথচ তাতে সে সম্মত ছিল না।

আর নিষেধাজ্ঞা ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচার শর্ত হবে, যদি অনুমতি বিষয়টিও ব্যাপক প্রচারিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে, অনুমতি বিষয়টি শুধু গোলামই জানতো; অত:পর তার জ্ঞাতসারে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল, তাহলে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। কেননা এতে কারো কোন ক্ষতি নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যদি মারা যায়, কিংবা পাগল হয়ে যায়, কিংবা মোরতাদ অবস্থায় দারুল হরবে চলে যায় তাহলে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম অনুমতি বিহীন হয়ে যাবে।

কারণ এ অনুমতি বাধ্যতামূলক ছিল না। আর যে, মুআমেলা বাধ্যতামূলক না হয় তার স্থায়িত্বকে সূচনা বিধান প্রদান করা হয়। এটাই হল মূলনীতি। সুতরাং অনুমতির স্থায়িত্বের অবস্থায়ও অনুমতি প্রদানের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। অথচ মৃতু দ্বারা এবং মস্তিষ্কবিকৃতি দ্বারা তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তদ্রূপ দারুল হরবে যুক্ত হওয়া দ্বারা। কেননা এটা গুণগত মৃত্যু। এ কারণেইতো তার ওয়ারিছদের মাঝে তার মাল বণ্টন করে দেয়া হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গোলাম যদি পলায়ন করে তাহলে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সে অনুমতিপ্রাপ্ত রূপে বহাল থাকবে। কেননা পলায়ন অনুমতির সূচনার বিরোধী নয়, সুতরাং অনুমতির স্থায়িত্বেরও বিরোধী হবে না। এটা গসবের মত হল।

আমাদের দলীল এই যে, পলায়ন হল নিষেধাজ্ঞা পরোক্ষ প্রমাণ। কেননা মনিব তাকে শুধু এমনভাবে অনুমতি প্রাপ্ত দেখতে রাজী হবে যে তার উপার্জন দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়।

পলাতক অবস্থার অনুমতির সূচনায় বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিপরীতের (অনুমতির) সুস্পষ্ট ঘোষণা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় (নিষেধাজ্ঞা) পরোক্ষ প্রমাণ বিবেচ্য নয়।'

গসবের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা গসবকারীর হাত থেকে তা হাতিয়ে আনা (আইনত:) সহজ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অনুমতিপ্রাপ্ত দাসী যদি তার মনিবের, 'ঔরসে' সন্তান জন্ম দেয় সেটা তার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপের শামিল হবে।

ইমাম যুফার (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি স্থায়িত্বের অবস্থাকে (উম্মে ওয়াদের) প্রাথমিক অনুমতির উপর কিয়াস করেন।

আমাদের দলীল এই যে, বাহ্যিক অবস্থা এটাই যে, সন্তার জন্মদানের পর সে তাকে (বাইরের পরিবেশ থেকে) রক্ষা করবে। সুতরাং উম্মে ওয়ালাদ হওয়া হলো

নিষেধাজ্ঞা রীতিগত পরোক্ষ প্রমাণ। উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে অনুমতির প্রাথমিক বিষয়টি ভিন্ন। কেননা প্রত্যক্ষ ঘোষণা পরোক্ষ প্রমাণকে বিলুপ্ত করে। আর যদি উম্মে ওয়ালাদের যিম্মায় ঋণ চেপে বসে তাহলে মনিব তার মূল্যের দায়বহন করবে। কেননা সে এমন 'ক্ষেত্র' নষ্ট করেছে, যার সঙ্গে পাওয়ানাদারদের হক সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার কারণেই বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়েছে। অথচ বিক্রির মাধ্যমেই পাওয়ানাদারদের হক আদায় করা হয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, অনুমতিপ্রাপ্ত দাসী যদি তার দাস সত্তার মূল্যের চেয়ে বেশী ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে; অত:পর মনিব তাকে মোদাব্বার ঘোষণা করে তাহলে সে অনুমতিপ্রাপ্ত অবস্থায় বহাল থাকবে।

কেননা নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ অনুপস্থিত। কারণ মোদাব্বারকে (বাইরের পরিবেশ থেকে) রক্ষার প্রচলন নেই। আর মোদাব্বার ঘোষণা ও অনুমতির মাঝেও কোন বিরোধ নেই। আর উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে আমরা যে কারণ বলেছি, সেই কারণ এখানেও মনিব দাসীর মূল্যের দায় বহন করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যখন গোলামের অনুমতি প্রাপ্তি রহিত করা হল তখন ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার হাতে বিদ্যমান মালের ব্যাপারে গোলামের স্বীকারোক্তি বৈধ হবে।

এর অর্থ এই যে, তার হাতের মাল সম্পর্কে সে স্বীকারোক্তি করল যে, তা অন্য কারো আমানত কিংবা তার কাছ হতে গসবকৃত। কিংবা তার নিজের যিম্মায় বিদ্যমান কোন ঋণের স্বীকারোক্তি করল। তাহলে তার হাতে বিদ্যমান মাল থেকে তা পরিশোধ করা হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে না।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, স্বীকারোক্তির বৈধতা যদি অনুমতির কারণ হয় তাহলে সেটা নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বিলুপ্ত হয়েছে, আর যদি গোলামের লব্ধ নিয়ন্ত্রণক্ষমতার কারণে হয় তাহলে সেটাও নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বাতিল হয়েছে। কেননা নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত গোলামের কবজা বিবেচ্য নয়। সুতরাং বিষয়টি ঐ সময়ের মত হল, যখন মনিব গোলামের স্বীকারোক্তির পূর্বে গোলামের হাত থেকে তার উপার্জন নিয়ে নেয়। কিংবা ঐ সময়ের মত হল, যখন অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়ার কারণে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়ে যায়। (এই দুই ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়)।

এ কারণেই নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর দাস সত্তার ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি (অর্থাৎ যে পরিমাণ ঋণ স্বীকার করলে তাকে বিক্রি করা অনিবার্য হয়ে পড়ে) সিদ্ধ হয় না।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, গোলামের (লব্ধ) 'হস্তক্ষমতাই' হল তার স্বীকারোক্তিকে বৈধতাদানকারী। এজন্য অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের 'হাত' থেকে মনিব যা নিয়ে নেয়, সেটার ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি সিদ্ধ হয় না। আর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরও তার প্রকৃত কবজা বিদ্যমান রয়েছে। (কেননা আলোচনা হচ্ছে তার হাতে বিদ্যমান মালের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে) আর নিষেধাজ্ঞার কারণে গুণগতভাবে

কবজা বাতিল হওয়ার শর্ত হল কবজাকৃত মাল তার প্রয়োজন থেকে মুক্ত হওয়া। অথচ তার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ।

পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি পূর্বে গোলামের হাত থেকে মনিবের মাল নিয়ে নেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (সেখানে) প্রকৃত ভাবে এবং গুণগতভাবে মনিবের কবজা বিদ্যমান সুতরাং তার স্বীকারোক্তি দ্বারা তা বাতিল হবে না।

তদ্রূপ তার দাস সত্তায় মনিবের মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং মনিবের সম্মতি ছাড়া তার স্বীকারোক্তি দ্বারা বাতিল হবে না।

আর এটা গোলামকে অন্যের কাছে বিক্রি করার মাসআলা থেকে ভিন্ন। কেননা মালিকানায় পরিবর্তনের কারণে (গুণগতভাবে) গোলামেরও পরিবর্তন হয়েছে। যেমন [বারীরা (রা)-এর হাদীস থেকে] জানা গেছে। সুতরাং মনিবের মালিকানার সূত্রে গোলামের জন্য যে অনুমতি ও কবজা সাব্যস্ত হয়েছিল, তা বহাল থাকবে না।

(মালিকানার পরিবর্তন দ্বারা গোলামের পরিবর্তন হয়েছে) এজন্যই বিক্রয়ের পূর্বে যে সকল লেনদেন সে করেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এখন সে বিবাদী হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি তার মাল ও তার দাস সত্তাকে বেষ্টন করে ফেলে, এ পরিমাণ ঋণ তার উপর লাযিম হয়ে যায় তাহলে মনিব গোলামের হাতে বিদ্যমান মালের মালিক হবে না। আর মনিব যদি গোলামের উপার্জিত কোন গোলামকে আযাদ করে, তাহলে তা আযাদ হবে না। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। পক্ষান্তরে সাহেবায়ন বলেন, মনিব গোলামের হাতে বিদ্যমান সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। আর (মনিব যে গোলামকে আযাদ করেছে) সে আযাদ হয়ে যাবে এবং আযাদকৃত গোলামের মুল্য দায় মনিব বহন করবে।

কেননা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের উপার্জনে মনিবের মালিকানা লাভের কারণ পাওয়া গেছে। আর তা হল গোলামের দাস সত্তার মালিকানা। এ কারণেই তো সে তাকে আযাদ করতে পারে এবং অনুমতিপ্রাপ্ত দাসীর সঙ্গে সহবাস করতে পারে। আর এটা হল দাস সত্তার পূর্ণ মালিকানার প্রমাণ । ওয়ারিছদের মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা (মুরিছের পরিত্যক্ত সম্পদে) তার মালিকানা সাব্যস্ত হয় মুরিছের কল্যাণ রক্ষা করার জন্য। আর পরিত্যক্ত সম্পদ ঋণবেষ্টিত অবস্থায় মুরিছের কল্যাণ হল ওয়ারিছদের মালিকানা সাব্যস্তির বিপরীতে। পক্ষান্তরে (গোলামের দাস সত্তায় এবং তার উপার্জিত সম্পদে) মনিবের মালিকানা গোলামের কল্যাণ বিবেচনা করে সাব্যস্ত হয়নি।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, (গোলামের হাতে বিদ্যমান সম্পদে) মনিবের মালিকানা সাব্যস্ত হয় গোলামের স্থলবর্তী রূপে, যখন ঐ সম্পদ গোলামের প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, ওয়ারিছের মালিকানা সম্পর্কে যেমন আমরা সুসাব্যস্ত করে এসেছি।

পক্ষান্তরে ঋণবেষ্টি মাল হল গোলামের প্রয়োজন দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং ঐ মালে মনিব গোলামের স্থলবর্তী হতে পারে না।

যখন (সাহেবায়নের মতে গোলামের হাতে বিদ্যমান সম্পদে মনিবের) মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এবং [ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে] মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ার

বিষয়টি জানা গেল তখন (মনিব কর্তৃক গোলামের হস্তস্থিত গোলামকে মুক্তি দানের সাব্যস্তি ও অ-সাব্যস্তির বিষয়টিও জানা হয়ে গেল, কেননা মুক্তিদান হল মালিকানার অনুসিদ্ধান্ত।

সাহেবায়নের মতে যখন মুক্তিদান কার্যকর হয় তখন মলিক পাওনাদারদের অনুকূলে গোলামের মূল্যদায় বহন করবেন। কেননা তার সাথে তাদের হক সম্পর্কিত হয়ে গেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি ঋণ গোলামের হাতে বিদ্যমান মালকে বেষ্টনকারী না হয়, তাহলে তিন ইমামের সবার মতেই মনিবের মুক্তিদান বৈধ হবে।

সাহেবায়নের মতে তো বিষয়টা স্পষ্ট। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতেও তাই। কেননা গোলামের হাতে বিদ্যমান মাল যৎসামান্য ঋণ থেকে সাধারণত: মুক্ত হয় না। সুতরাং এটাকে যদি (মনিবের মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে) প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত করি তাহলে গোলামের অপার্জিত সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার উপায় বন্ধ হয়ে যাবে, এবং (মনিবের পক্ষ হতে ব্যবসায়ের) অনুমতি প্রদানের যে উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হবে।

এ কারণেই সামান্য ঋণ ওয়ারিছের মালিকানাকে রোধ করে না, কিন্তু বেষ্টনকারী ঋণ তা বাধাগ্রস্ত করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (অনুমতিপ্রাপ্ত ঋণগ্রস্ত) গোলাম যদি মনিবের কাছে কোন বস্তুকে তার সমপরিমাণ বিক্রয় করে তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননা গোলামের যিম্মায় যদি তার উপার্জনকে বেষ্টনকারী ঋণ থাকে তাহলে মনিব তার উপার্জনের ক্ষেত্রে আজনবীর (তৃতীয় ব্যক্তির) মত হয়ে থাকে।

আর যদি লোকসান দিয়ে বিক্রি করে তাহলে তা জায়িয হবে না।

কেননা লোকসানের ক্ষেত্রে সে অভিযোগগ্রস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি আজনবীর কাছে হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে অভিযোগ (প্রমাণসম্মত উপার্জন) এর অবকাশ নেই।

তদ্রূপ মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি যদি ওয়ারিছের কাছে কোন বস্তুকে তার সমপরিমাণ মূল্যে বিক্রি করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তা জায়িয হবে না। কেননা ঐ বস্তুর স্বয়ং বস্তুসত্তার সঙ্গে অন্যান্য ওয়ারিছের হক সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে: এমনকি তাদের যে কারো অধিকার রয়েছে সম্পত্তির ঋণ পরিশোধ করে একক পক্ষে তা হস্তগত করার।

পক্ষান্তরে পাওনাদারদের হক (বস্তুটির স্বয়ং বস্তু সত্তার সঙ্গে জড়িত হয় না, বরং) শুধু বস্তুটির মূল্য সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং গোলাম ও মৃত্যুমুখী রোগীর বিষয়টি পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেল।

সাহেবায়ন বলেন, যদি সে মনিবের কাছে লোকসান দিয়ে বিক্রি করে তাহলে বিক্রি জায়িয হবে তবে মনিবকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। ইচ্ছা করলে সে (বিক্রয়মূল্যকে পূর্ণ বাজার মূল্যে উপনীত করে) মূল্যহ্রাস বিলুপ্ত করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে দিতে পারে।

আর উভয় মাযহাব অনুসারে সামান্য মূল্য হ্রাস এবং বিরাট মূল্য হ্রাস দুটোই সমান।

ইচ্ছাধিকার সহ বিক্রয়ের বৈধতার কারণ এই যে, (লোকসানসহ বিক্রয় থেকে) বিরত থাকার কারণ হল পাওনাদারদের ক্ষতি রোধ করা। আর এ দ্বারা তাদের ক্ষতি রোধ হয়ে যায়।

এটা আজনবীর কাছে সামান্য মূল্য হ্রাসে বিক্রি করা থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ সেটা বৈধ হয়, মূল্য হ্রাস বিলুপ্ত করার আদেশ দেয়া হবে না। পক্ষান্তরে মনিবকে সে আদেশ করা হয়।

কেননা সামান্য মূল্য হ্রাস সহ বিক্রি, স্বেচ্ছাদান ও বিক্রি এ দুয়ের সম্ভাবনার মাঝে আবর্তিত হয়। (স্বেচ্ছাদান তো হলো প্রকৃত মূল্য থেকে কিছু পরিমাণ হ্রাস করার কারণে, আর বিক্রয় হলো) সামান্য পরিমাণ মূল্য হ্রাস ও মূল্য নিরূপণ কারীদের মূল্য নিরূপণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে। সুতরাং অভিযোগের সম্ভাবনার কারণে মনিবের কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা স্বেচ্ছাদান বিবেচনা করেছি। (যা গ্রহণ যোগ্য নয়) আর আজনাবীর ক্ষেত্রে তোহমতের অবকাশ না থাকার কারণে সেটাকে আমরা স্বেচ্ছাদান গণ্য করেছি না।

অদ্রূপ আজনাবীর কাছে বিরাট মূল্যহ্রাস সহ বিক্রয় করার বিষয়টিও ভিন্ন। অর্থাৎ সাহেবায়নের মতে তা মোটেই বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে মনিবের ক্ষেত্রে জায়িয হবে। তবে তাকে মূল্য হ্রাস বিলুপ্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

কেননা সাহেবায়নের মূলনীতি অনুযায়ী মনিবের অনুমতি ছাড়া গোলামের পক্ষ থেকে মূল্যহ্রাসের পদক্ষেপ বৈধ নয়। আর আজনাবীর কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমতি থাকার কথা নয়। পক্ষান্তরে মনিব নিজে চুক্তি সম্পন্ন করে অনুমতিদানকারী হয়েছ তবে পাওনাদারদের হক রক্ষা করার জন্য বিলু করা হয়। এ দুইটি পার্থক্য সাহেবায়নের মূলনীতি অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যদি কোন কিছু তার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের কাছে সমপরিমাণ বা কম মূল্যে বিক্রি করে তবে বিক্রয় বৈধ হবে।

কেননা গোলাম ঋণগ্রস্ত হলে মনিব তার উপার্জনের ব্যাপারে আজনাবী হয়ে যায়। যেমন (কিছু পূর্বে) আমরা বলে এসেছি। আর এ বিক্রয়ে তোহমতের কোন অবকা নেই।

তাছাড়া এ বিক্রয় অর্থবহও বটে। কেননা গোলামের উপার্জনে এমন জিনিস অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যা তাতে ছিল না। এবং মনিব মূল্য গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে; অথচ এই সক্ষমতা তার ছিল না। আর হস্তক্ষেপের বৈধতা ফায়দা বয়ে আনে।

আর মনিব যদি মূল্য গ্রহণের পূর্বে গোলামের কাছে বিক্রয়দ্রব্য অর্পণ করে দেয় তাহলে মূল্য বাতিল হয়ে যাবে। কেনন নিজের হাতে আবদ্ধ থাকার দিক থেকে দ্রব্যটির বস্তু সত্তায় মনিবের হক বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে অর্পণের মাধ্যমেই সেই হক রহিত হওয়ার পর যদি মনিবের হক বহাল থাকে তাহলে সেটা থাকবে ঋণঅবস্থায়; আর মনিব তার গোলামের উপর ঋণ সাব্যস্ত করতে পারে না।

পক্ষান্তরে মূল্য যদি (মুদ্রা দ্রব্য না হয়ে) সাধারণ দ্রব হয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে(অর্থাৎ মনিব তা উশুল করবে এবং পাওনাদারদের চেয়ে বেশী হকদার হবে।)

কেননা চুক্তির মাধ্যমে তা নির্ধারিত হয়ে যায়। (সুতরাং মনিব দ্রব্যটির হুবও বস্তু সত্তার মালিক হয়েছে) এবং দ্রব্যটির হুবহু বস্তু সত্তার সঙ্গে মনিবের মালিকানা বহাল থাকার বৈধতা রয়েছে, (কেননা মনিবের মালিকানাভুক্ত দ্রব্য গোলামের হাতে থাকতে পারে। যেমন মনিব কোন দ্রব্য তার কাছে গচ্ছিত রাখল)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি মনিব মূল্য উশুল করা পর্যন্ত বিক্রয় দ্রব্যটি আটক রাখে তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননাা বিক্রয় দ্রব্যে বিক্রেতার আটকাধিকার রয়েছে। একারণেই (মূল্য) উশুল করার পূর্বে)। বিক্রয় দ্রব্যটির ব্যাপারে সে সমস্ত পাওনাদার থেকে বেশী হকদার হয়। আর ঋণের সম্পর্ক যদি কোন নির্ধারিত বস্তুর সঙ্গে হয় তাহলে গোলামের উপর মনিবের ঋণগত হক সাব্যস্ত হতে পারে।

আর মনিব যদি বস্তুটিকে বাজারমূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে বিক্রি করে তাহলে অতিরিক্ত মূল্য বাদ দেয়ার আদেশ দেয়া হবে কিংবা চুক্তি ভেঙ্গে দিতে হবে।

যেমন গোলামের দিক থেকে বিষয়টি আমরা বর্ণনা করেছি। কেননা অতিরিক্ত অংশের সঙ্গে পাওনাদারদের হক সম্পৃক্ত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যদি অনুমতি প্রাপ্ত গোলামকে আযাদ করে দেয় আর তার যিম্মায় (অনুমতি সংশ্লিষ্ট) ঋণ থাকে তাহলে মুক্তিদান বৈধ হবে।

কেননা গোলামের মাঝে তার মালিকানা গোলামের মূল্যদায় বহন করবে। কেননা বিক্রয় সূত্রে এবং বিক্রয় মূল্য থেকে উশুল সূত্রে যে জিনিসের সঙ্গে পাওনাদারদের হক সম্পৃক্ত ছিল সে জিনিসটা মনিব নষ্ট করে ফেলেছে।

এরপর যে ঋণ অবশিষ্ট থাকবে আযাদী লাভের পর গোলামের কাছে তার তাগাদা করা হবে।

কেননা ঋণ তার যিম্মায় সাব্যস্ত হয়েছে। আরদায় বহন রূপে মনিবের উপর ততটুকুই লাযিম হবে যতটুকু সে নষ্ট করেছে। সুতরাং অবশিষ্ট টুকু গোলামের যিম্মায় থেকে যাবে যেমন আগে ছিল।

আর ঋণ যদি তার মুল্যের চেয়ে কম হয় তাহলে মনিব শুধু ঋণের দায় বহন করবে। এছাড়া কিছু নয়।

কেননা পাওনাদারদের হক শুধু ঋণ পরিমাণের সঙ্গে জড়িত।

পক্ষান্তরে মনিব যদি অনুমতিপ্রাপ্ত মোদাব্বারকে বা উম্মে ওয়লাদকে আযাদ করে, আর তাদের যিম্মায় ঋণ থাকে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা বিক্রয়ের মাধ্যমে উশুল করার সূত্রে তাদের দাস সত্তার সঙ্গে পাওনাদাদের হক সম্পৃক্ত হয়নি। সুতরাং মনিব তাদের হক নষ্টকারী হয়নি। তাই যে কোন দায়বহন করবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মনিব যদি তার গোলামকে 'ঋণবেষ্টিত' অবস্থায় বিক্রি করে দেয়, আর ক্রেতা তাকে কবজা করে এবং তাকে গায়েব করে ফেলে

তাহলে পাওনাদারগণ ইচ্ছা করলে বিক্রেতাকে গোলামের বাজার মূল্যের যামিন বানাতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে ক্রেতাকেও যামিন বানাতে পারে।

কেননা গোলামের সঙ্গে তাদের হক জড়িত হয়েছে। তাই তো মনিব তাদের ঋণ আদায় করে না দিলে তাকে বিক্রি করার অধিকার তাদের রয়েছে।

এখন বিক্রেতা মনিব বিক্রয়ের এবং অর্পণের মাধ্যমে তাদের হক নষ্ট করেছে,পক্ষান্তরে ক্রেতা দখল গ্রহণ এবং গায়েব করে তাদের হক নষ্ট করেছে। সুতরাং দায় আরোপ করার ব্যাপারে তাদেরকে ইচছাধিকার প্রদান করা হবে।

আর যদি তারা ইচ্ছা করে তাহলে বিক্রয়কে অনুমোদন করে মুল্য গ্রহণ করতে পারে।

কেননা হক হল তাদের আর পরবর্তী অনুমোদন পূর্ববতী অনুমতির মত। যেমন বন্ধকী দ্রব্যের (বন্ধক গ্রহীতার অনুমোদন ছাড়া বিক্রয় করার) ব্যাপারে।

পাওনাদারেরা যদি বিক্রেতা মনিবকে মূল্যদান বহন করায়, অত:পর দোষজনিত কারণে মনিবকে গোলাম ফেরত দেয়া হয় তাহলে মনিব পাওনাদারের কাছ থেকে মূল্য ফেরত আনতে পারে।

তখন পাওনাদারদেরহক গোলামের দাসসত্তায় সাব্যস্ত হবে। কেননা মনিবের উপর দায় আরোপের কারণ তথা বিক্রয়ও অর্পণ বিদূরিত হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে মনিব সেই গসব কারীর মত হল, যে গসবকৃত বস্তু বিক্রি ও অর্পণ করল এবং মালিকের অনুকূলে মূল্যদায় বহন করল, অত:পর দোষজনিত কারণে গসবকৃত বস্তুটি তাকে ফেরত দেয়া হল। এমতাবস্থায় গসবকারী বিক্রেতার অধিকার থাকে মালিককে বস্তুটি ফেরত দিয়ে (ক্ষতিপূরণ রূপে আদায়কৃত) মূল্য ফেরত চেয়ে নেয়ার। এখানে মনিবের ক্ষেত্রেও তাই হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মনিব যদি ঋণের বিষয়টি অবগত করে কোন লোকের কাছে গোলামটি বিক্রি করে তাহলে পাওনাদারদের বিক্রয় রদ করার অধিকার রয়েছে। (যদি বিক্রয় মূল্য দ্বারা তাদের ঋণ উশুল না হয়।)

কেননা গোলামের সাথে তাদের হক সম্পৃক্ত রয়েছে। আর সেটা হল গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করা এবং তার দাস সত্তা থেকে উশুল করা। আর দুটোর প্রতিটিতে আলাদা ফায়দা রয়েছে। প্রথমটি হল পূর্ণ তবে উপার্জন কালের সাথে বিলম্বিত। আর দ্বিতীয়টি অসম্পূর্ণ তবে অবিলম্বিত। কিন্তু মনিবের বিক্রয়ের কারণে তাদের এই ইচ্ছাধিকার হাত ছাড়া হয়ে যায়। এ কারণে তাদের বিক্রয় রদ করার অধিকার রয়েছে।

মাশায়েখগণ বলেন, এর ব্যাখ্যা এই যে, তাদের হাতে যদি গোলামের বিক্রয়মূল্য না পৌছে থাকে। পক্ষান্তরে যগি বিক্রয়মূল্য তাদের হাতে পৌছে যায় আর এ বিক্রয়ে 'মূল্যহ্রাস' না থাকে তাহলে তাদের রদ করার হক নেই। কেননা তাদের হক তাদের কাছে পৌছে গেছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, বিক্রেতা (মনিব) যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে পাওনাদারদের মাঝে এবং ক্রেতার মাঝে 'বিবাদ' সম্পর্ক হবে না।

অর্থাৎ ক্রেতা যদি গোলামের যিম্মায় **ঋণ থাকার কথা অস্বীকার করে। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, ক্রেতা পাওনাদারদের (আইনগত) প্রতিপক্ষ হবে এবং পাওনাদারদের অনুকূলে ঋণ সাব্যস্তির ফায়সালা করা হবে।**

একই মতপার্থক্য হবে যদি কেউ একটি ঘর ক্রয় করে আর কোন লোককে তা হেবা করে এবং অর্পণ করে আর হেবাকারী ক্রেতা গায়েব হয়ে যায়। অত:পর শোফা দাবীদার উপস্থিত হয়। এ ক্ষেত্রে তারফায়নের মতে হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (শোফা দাবীদারের আইনত:) প্রতিপক্ষ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। শোফার ক্ষেত্রে সাহেবায়নের পক্ষ থেকে অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, সে তো নিজের অনুকূলে মালিকানা দাবী করেছে। সুতরাং যে কেউ তার দখলি জিনিসের দাবীদার হবে, সে তার প্রতিপক্ষ হবে।

তারফায়নের দলীল এই যে, উত্থাপিত দাবীটি চুক্তি রহিত করণের দাবীকে অন্তর্গভুক্ত করে। অথচ তা সম্পন্ন হয়েছে বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে। সুতরাং দাবী অনুযায়ী বিক্রয় রহিত করণের অর্থ হবে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে ফায়সালা করা।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কোন লোক যদি শহরে এসে বলে যে, আমি অমুকের গোলাম। এরপর সে ক্রয়-বিক্রয় শুরু করে তাহলে ব্যবসায়ের যাবতীয় দায় তার উপর লাযিম হবে।

কেননা যদি সে (তার উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে) মনিবের অনুমতি প্রদানের খবর দিয়ে থাকে, তাহলে এই খবর প্রদান তার বিপক্ষে প্রমাণ হবে। আর যদি একথা না বলে থাকে তাহলে (আমরা বলবো যে,) তার মুআমেলা বৈধ হবে। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, নিষেধাজ্ঞাসম্পন্ন গোলাম নিষেধাজ্ঞার দাবী অনুযায়ী আচরণ করবে। আর লেন-দেন জাতীয় ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করাই হল মূলনীতি, যাতে বিষয়টা মানুষের জন্য সংকুচিত না হয়ে যায়। (সুতরাং তার মুআমেলা তার বিপক্ষে প্রমাণ হবে।)

তবে তার মনিব উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত (ঋণ পরিশোধের দায়ে) তাকে বিক্রি করা যাবে না।

কেননা তার দাস সত্তার ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে না। কারণ দাস সত্তা হল মনিবের একান্ত হক। তার উপার্জনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা গোলামের হক। যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

মনিব যদি উপস্থিত হয়ে বলে যে, সে অনুমতিপ্রাপ্ত, তাহলে ঋণ পরিশোধ বাবদ তাকে বিক্রয় করা হবে।

কেননা (অনুমতির স্বীকারোক্তির কারণে) মনিবের ক্ষেত্রে ঋণের দায় প্রকাশ পেয়েছে।

আর যদি বলে যে, সে নিষেধাজ্ঞাসম্পন্ন, তাহলে তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা সে গোলামের মূল অবস্থার দাবী করছে (এবং আরোপিত অবস্থা অস্বীকার করছে।)

পরিচ্ছেদ ঃ

বালকের অভিভাবক যদি বালককে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করে তাহলে ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের মত হবে, যদি সে ক্রয়-বিক্রয়ের বোধসম্পন্ন হয়; ফলে তার মালের ক্ষেত্রে তার মুআমেলা কার্যকর হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কার্যকর হবে না। কেননা তার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে তার অপ্রাপ্তবয়স্কতার কারণে। সুতরাং সেটা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান থাকবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, (অনুমতি লাভের পরও) সে 'অভিভাবকাধীন', এ কারণেই অভিভাবক তার পক্ষ থেকে লেনদেন করতে পারে এবং সে তার প্রতি নিষেধাজ্ঞার মালিক রয়েছে। সুতরাং সে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে পারে না। কেননা এতদুভয়ের মাঝে বিরোধ রয়েছে।

সুতরাং বিষয়টি তালাক প্রদান ও মুক্তি দানের মত হল। (যা অভিভাবকের অনুমতি সত্ত্বেও কার্যকর হয় না।)

অপ্রাপ্তবয়স্কদের সওম ও সালাতের বিষয়টি ভিন্ন, (তা বৈধতা লাভ করে) কেননা এ দু'টি অবিভাবক দ্বারা সম্পন্ন হয় না। অদ্রূপ ইমাম শাফেয়ী (র) এর মূল নীতি অনুযায়ী (কল্যাণ কর্মে দান সংক্রান্ত বাচ্চার) অছিয়তের বিষয়টিও ভিন্ন।

সুতরাং (এ তিনটি ক্ষেত্রে) তার পক্ষ হতে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয় অভিভাবক নিজে সম্পাদন করতে পারে। সুতরাং এখানে সেই প্রয়োজন নেই।

আমাদের দলীল এই যে, শরীয়তসম্মত মু'আমেলা, মু'আমেলার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি থেকে তার উপযুক্ত ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ব্যবসা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে) শরীয়ত সম্মত কর্তৃত্ব সূত্রে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সুতরাং তার বাস্তবায়ন অপরিহার্য হবে। যেমন, 'প্রমাণ-বিতর্ক শাস্ত্রে' তার 'সপ্রমাণ' আলোচনা হয়েছে।

আর শৈশব অবস্থা নিষেধাজ্ঞার কারণ হয়েছে, ভাল-মন্দের বোধের অনুপস্থিতির কারণে, শৈশব গুণের স্বকীয় কোন কারণে নয়। কিন্তু অভিভাবকের অনুমতির দিকে লক্ষ্য রেখে (বলা যায় যে), বিচক্ষণতা বিদ্যমান হয়েছে। এরপরও অবিভাবকের কর্তৃত্ব

বহাল থাকে নাবালকের কল্যাণের দিক লক্ষ্য করে, এবং নাবালকের অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনার দিক লক্ষ্য করে, যাতে দু'দিক থেকেই বালকের কল্যাণ অর্জিত হয়।

তালাক প্রদান ও মুক্তি দানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা নিছক ক্ষতিকর। সুতরাং বালককে (শরীয়তের পক্ষ হতে) উক্ত হস্তক্ষেপ গ্রহণের উপযুক্ত করার মত শুধু উপকারী বিষয়ে অনুমতির পূর্বেই তাকে উপযুক্ত গণ্য করা হয়েছে।

আর ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি লাভ ও ক্ষতির মাঝে আবর্তিত। সুতরাং অনুমতির পর তাকে এর যোগ্য গণ্য করা হবে, অনুমতির পূর্বে নয়।

তবে অনুমতির পূর্বে অবিবাবকের অনুমোদনের উপর নির্ভর করবে। কেননা তা কল্যাণমূলক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর স্বকীয়ভাবে মু'আমেলার সিদ্ধতা রয়েছে।

আর কুদূরী কিতাবে ولى (বা অভিভাবক) শব্দের উল্লেখে, পিতা এবং পিতার অনুপস্থিতিতে দাদা ও পিতার নিযুক্ত অছী, বিচারক ও শাসক-এদের অন্তর্ভুক্ত করে। পক্ষান্তরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধান (বা তার স্থলবর্তী ব্যক্তি) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা কাযী নিয়োগের ক্ষমতা তার হাতে নয়।

আর শর্ত হল এতটুকু বোধসম্পন্ন হওয়া যে, বিক্রয় মালিকানা রহিত করে এবং মুনাফা আনয়ন করে।

আর অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের সঙ্গে উপমা দান এ কথা প্রমাণ করে যে, গোলামের ক্ষেত্রে যে সকল আহকাম সাব্যস্ত হবে বালকের ক্ষেত্রেও তা সাব্যস্ত হবে।

কেননা অনুমতি দানের অর্থ হল নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া। আর 'অনুমতি প্রাপ্ত' আত্মযোগ্যতা বলেই লেনদেন করে, সে গোলাম হোক বা বালক হোক। সুতরাং তার মু'আমেলা প্রকার বিশেষকে বাদ দিয়ে প্রকার বিশেষের সাথে আবদ্ধ করা যায় না।

আর অভিভাবকের পক্ষ থেকে (মু'আমেলা করতে দেখেও) নীরবতা অবলম্বন দ্বারা সে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যেমন গোলামের ক্ষেত্রে।

বালকের হাতে তার উপার্জিত যে সম্পদ রয়েছে, সে বিষয়ে বালকের স্বীকারোক্তি সিদ্ধ হবে। অদ্রূপ যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী উত্তরাদিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পর্কেও তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন গোলামের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হয়।

অনুমতিপ্রাপ্ত বালক তার গোলামকে বিবাহ করাতে পারে না এবং তার সঙ্গে কিতাবাত চুক্তি করতে পারে না। যেমন অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের ক্ষেত্রে।

আর যে মানসিক প্রতিবন্ধী ক্রয়-বিক্রয়ের বোধ রাখে সে বালকের মত, পিতার এবং (পিতার অনুপস্থিতিতে) দাদার ও অছীর অনুমতি দ্বারা অনুমতিপ্রাপ্ত হবে। অন্যদের দ্বারা নয়। যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। আর তার বিধানে বালকের বিধানের অনুরূপ। আল্লাহ অধিক অবগত।

كِتَابُ الْغَصْبِ

অধ্যায় ঃ গসব সম্পর্কে

غصب (গসব) এর আভিধানিক অর্থ হল অন্যের কাছ থেকে কোন জিনিস জোরপূর্বক গ্রহণ। আরবী ভাষা-ভাষীদের মাঝে এই অর্থেই তার ব্যবহার রয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় গসব অর্থ মালিকের অনুমতি ছাড়া মূল্য সম্পন্ন ও সম্মানযোগ্য মাল এমনভাবে দখল করা, যাতে মালিকের কবজা বিলুপ্ত হয়। সুতরাং অন্যের গোলামকে খেদমতে লাগানো এবং বাহনের পিঠে বোঝা চাপানো (বা আরোহণ) গসব বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কারো বিছানায় বসে পড়া গসব নয়।

অতঃপর গসব যদি অন্যের মালিকানা জানা সত্ত্বেও হয় তাহলে তার বিধান হল গোনাহ ও দন্ড। আর যদি জানা ছাড়া হয় তাহলে বিধান হল ক্ষতিপূরণের দায় বহন।

কেননা এটা হল বান্দার হক। সুতরাং তা তার ইচ্ছা থাকা না থাকার উপর নির্ভর করেবে না। তবে কোন গোনাহ হবে না। কেননা ভুলবশত কর্ম শরীয়তের পক্ষ থেকে রহিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি এমন জিনিস গসব করে, যার (আকৃতিগত ও গুণগত) সদৃশ রয়েছে; যেমন কায়লী দ্রব্য ও ওজনী দ্রব্য। আর তা যদি তার হাতে হালাক হয়ে যায় তাহলে উক্ত বস্তুর সদৃশ পরিশোধ করা তার দায়িত্ব হবে।

কোন কোন অনুলিপিতে রয়েছে, 'উক্ত বস্তুর সদৃশের দায় বহন করতে হবে; তবে উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

এটা এ কারণে যে, 'সদৃশ' পরিশোধ করাই হল ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .

কেউ যদি তোমাদের উপর সীমালজ্ঘন করে তাহলে তোমরা তার উপর সীমালঙ্ঘন কর। তোমাদের উপর তার সীমা লঙ্ঘনের সদৃশ দ্বারা ।

তাছাড়া এই কারণে যে, সদৃশই হল অধিকতর ইনসাফপূর্ণ। কারণ তাতে শ্রেণী ও সম্পদ গুণ দু'টোরই বিবেচনা হয়। সুতরাং এতে ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি সে উক্ত বস্তুর সদৃশ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের বিবাদ উত্থাপনের দিন বস্তুটির যে মূল্য ছিল, সেই মূল্য পরিশোধ করা তার কর্তব্য হবে।

এটা হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, গসব করার দিনের মূল্য পরিশোধ করবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বস্তুটি বাজার থেকে 'নাই' হওয়ার দিনের মূল্যের কথা বলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, যখন তা বাজার থেকে 'নাই' হয়ে গেলো তখন সেটা 'অসদৃশ' বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলো। সুতরাং দায় বহনের কারণ সম্পন্ন হওয়ার দিনের মূল্য বিবেচ্য হবে। কেননা সেটাই হল দায় সাব্যস্তকারী।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর দলীল এই যে, যিম্মায় ওয়ারিশ হল সদৃশ বস্তু। তবে অবিদ্যমানতার কারণে তা মূল্যের দিকে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং অবিদ্যমানতার দিনের মূল্য বিবেচ্য হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, মূল্যের দিকে স্থানান্তর নিছক অবিদ্যমানতা দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। এ কারণেই যার কাছ থেকে গসব করা হয়েছে, সে ব্যক্তি যদি পরবর্তীতে ঐ শ্রেণীর বস্তু পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়, তাহলে তার সে ইচ্ছাধিকার রয়েছে, এবং কাযীর ফায়সালা দ্বারা মূল্যের দিকে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং উত্থাপনের এবং রায় প্রদানের দিনের মূল্য বিবেচ্য হবে।

অসদৃশ বস্তুর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে কারণ সংঘটিত হওয়ামাত্র মূল কারণ (তথা গসব) দ্বারাই মূল্য দাবী করা হয়। সুতরাং কারণ সংঘটিত হওয়ার সময় বস্তুটির বিদ্যমান মূল্য বিবেচনা করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যে বস্তুর সদৃশ নেই, সে ক্ষেত্রে তার উপর ওয়াজিব হবে গসব করা দিনের মূল্য পরিশোধ করা।

'অসদৃশ' হওয়ার অর্থ হল ভারসাম্যপূর্ণ গণনীয় বস্তু।

কেননা শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রাপ্য হক বিবেচনা করা যখন অসম্ভব হল তখন যথাসম্ভব ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করার জন্য শুধু সম্পদগুণের দিকটি বিবেচনা করা হবে।

পক্ষান্তরে প্রায় সমমানের গণনীয় বস্তু কয়েলী বস্তুর মত হবে। সুতরাং পার্থক্য কম থাকার কারণে সে ক্ষেত্রে তার সদৃশ ওয়াজিব হবে।

যব মিশ্রিত গমের ক্ষেত্রে মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা এর সদৃশ নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গসবকারীর অবশ্য কর্তব্য হল গসবকৃত বস্তুই ফেরত দেয়া।

অর্থাৎ যতক্ষণ তা বিদ্যমান থাকে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, على اليد ما اخذت حتى ترد (رواه اصحاب السنن الاربعه)

'হাত' যা নিয়েছে ফেরত দেয়া পর্যন্ত তা দায়বদ্ধ থাকবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

لا يحل لاحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولاجاداً فان أخذه فليرده عليه (رواه ابو داؤد والترمذى)

কারো জন্য হালাল নয় পরিহাস করে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার ভাইয়ের মাল নিয়ে নেওয়া। যদি তা নিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই যেন তাকে তা ফিরিয়ে দেয়।

তাছাড়া এই কারণে যে, 'কবজা' স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ্যপূর্ণ একটি হক। আর গসব মালিকের 'হস্তক্ষমতা' নষ্ট করে দেয়। সুতরাং গসবকৃত বস্তুটির 'বস্তুসত্তা' ফেরত প্রদান করে তার কবজা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর সেটাই মূল মৌলিকভাবে ওয়াজিব। যেমন আলিমগণ বলেছেন। পক্ষান্তরে মূল্য প্রদান হল স্থলবর্তীরূপে অব্যাহতি লাভের উপায়।

কেননা সেটা ত্রুটিপূর্ণ। সম্পূর্ণতা হল বস্তুর বস্তু সত্তা ও সম্পদ গুণ ফেরত প্রদানের মাঝে।

তবে কারো কারো মতে মৌলিকভাবে ওয়াজিব হল মূল্য প্রদান আর বস্তু সত্তা ফেরত প্রদান হলো অব্যাহতি লাভের উপায়।

কোন কোন বিধানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটির যথার্থতা প্রকাশ পায়।

আর ওয়াজিব হল যে স্থলে সে গসব করেছে সে স্থানে ফেরত প্রদান করা।

কেননা স্থানের পার্থক্যে মূল্যের তারতম্য হয়ে থাকে।

যদি সে গসবকৃত বস্তু হালাক হয়ে গেছে দাবী করে, তাহলে শাসক (বা বিচারক) ঐ সময় পর্যন্ত তাকে আটক রাখবেন, যতক্ষণ না তিনি নিশ্চিত হন যে, বস্তুটি বিদ্যমান থাকলে অবশ্যই সে তা প্রকাশ করতো। কিংবা যতক্ষণ না বাইয়েনা পেশ করা হয়। অতঃপর তিনি তার বিপক্ষে বস্তুটির 'বদল' ফেরত প্রদানের ফায়সালা জারি করবেন।

কেননা ওয়াজিব হল মূল বস্তুটির ফেরত প্রদান। আর হালাক হয় কোন উদ্ভূত কারণ দ্বারা। সুতরাং সে স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত একটি উদ্ভূত কারণ দাবী করছে। তাই (বিনা প্রমাণে) তার কথা গ্রহণ করা হবে না। যেমন (ক্রেতা হিসেবে) কোন একটি দ্রব্যের মূল্য দায় থাকা অবস্থায় সে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার দাবী করল। তখন তার দাবীর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। যখন হালাক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে, তখন বস্তুটি ফেরত প্রদান করা তার যিম্মা থেকে রহিত হবে, এবং তার বদল তথা মূল্য ফেরত প্রদান করা তার উপর লাযিম হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অস্থানান্তর ও স্থানান্তরযোগ্য বস্তুতে গসব সাব্যস্ত হয়।

কেননা গসবের প্রকৃত অর্থ স্থানান্তরযোগ্য বস্তুতে সাব্যস্ত হয়, স্থাবর বস্তুতে হয় না। কেননা স্থানান্তর দ্বারাই কবজার বিলুপ্তি সাধিত হয়।

আর যদি সে ভূ-সম্পত্তি গসব করে আর সেটা তার কবজায় হালাক হয়ে যায় তাহলে সে তার যামিন হবে না।

এটা হল ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মত।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, সে যামিন হবে। আর এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর প্রথম দিকের মত। ইমাম শাফেয়ী (র)-ও তাই বলেন।

কেননা গসবকারীর কবজা সাব্যস্ত হয়েছে। আর তার অনিবার্য ফল হল মালিকের কবজা বিলুপ্ত হওয়া। কেননা একই অবস্থায় একই ক্ষেত্রে দু'টি কবজা একত্র হওয়া অসম্ভব। সুতরাং মালিকের হস্ত ক্ষমতার বিলুপ্তি এবং অন্যের হস্ত ক্ষমতার সাব্যস্ত—এ দু'টি গুণ পাওয়া গেল, আর এর নামই হল গসব। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। সুতরাং (গুণদ্বয়ের দিক থেকে) এটা স্থানান্তরযোগ্য বস্তু হয়ে গেল এবং আমানতী ভূ-সম্পত্তি অস্বীকার করার মতই হল

শায়খায়নের দলীল এই যে,গসবের সংজ্ঞা হল বস্তু সত্তায় কোন হস্তক্ষেপ দ্বারা মালিকের হস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত করার সাথে সাথে নিজের হস্তক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা। আর এইটি সমগ্র বিষয় ভূসম্পত্তিতে কল্পনা করা যায় না। কেননা মালিককে ভূসম্পত্তি থেকে বের করা ছাড়া মালিকের কবজা বিলুপ্ত হবে না। অথচ বের করাটা মালিকের সত্তায় হস্তক্ষেপ, ভূসম্পিত্তিতে হস্তক্ষেপ নয়। সুতরাং এটা মালিককে তার পশু সম্পদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মত হল।

পক্ষান্তরে স্থানান্তর যোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে স্থানান্তর হচ্ছে বস্তুর মাঝে কৃত 'কর্ম'। আর সেটাই হল গসব।

আর অস্বীকার করার মাসআলাটির উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে আমাদের বক্তব্য এই যে, সেখানে (অর্থাৎ আমানতের ক্ষেত্রে) দায়বহন সাব্যস্ত হয়। তার উপর লাযিম হেফাযত বর্জন করার কারণে। আর অস্বীকার করার মাধ্যমে সে তা বর্জন করেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গসবকারীর কার্যকলাপের কারণে কিংবা তার বসবাসের কারণে সম্পত্তির যে ক্ষতি হবে, সকলের মতেই তাকে তার দায় বহন কতে হবে।

কেননা এটা হল নষ্ট করা। আর নষ্ট করা দ্বারা স্থাবর সম্পত্তির দায় বহন করতে হয়। যেমন যদি তার মাটি সরিয়ে নেয়। কারণ এটা হল বস্তু সত্তায় কৃত কর্ম।

আর কুদূরী (র) ক্ষতির যে কথা বলেছেন, তাতে তার বসবাসের কারণে বা পেশাগত কাজের কারণে বাড়ী ধসে পড়ার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর কেউ যদি কোন বাড়ী গসব করে এবং তা বিক্রি করে অর্পণ করে। আর তা স্বীকারও করে কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতার গসবের কথা অস্বীকার করে আর বাড়ী ওয়ালারও কোন প্রমাণ নেই, তাহলে গসব সংক্রান্ত মতপাথর্ক্যের মত এখানেও মতপার্থক্য রয়েছে। এটাই বিশুদ্ধ মত।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আর যদি চাষাবাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে যে পরিমাণ ক্ষতি হবে 'দণ্ড' বহন করবে।

কেননা সে ভূমির আংশিক নষ্ট করেছে। সুতরাং তার মূলধন (তথা বীজ ও 'খরচ' ও অর্থদণ্ড) উৎপাদিত ফসল থেকে নিয়ে নেবে, আর উদ্বৃত্ত থাকলে তা সাদকা করে দেবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা হল, ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, উদ্বৃত্ত অংশ সাদাকা করতে হবে না। উভয়য় পক্ষের দলীল আমরা একটুপর উল্লেখ করবো।

তিনি আরো বলেন, স্থানান্তর যোগ্য বস্তু যখন গসবকারীর হাতে তার কোন কর্মে কিংবা তার কর্ম ছাড়া হালাক হয়ে যায় তখন সে তার দায় বহন করবে।

কুদুরী (র)-এর অধিকাংশ অনুলিপিতে রয়েছেঃ যদি গসবকৃত বস্ত হালাক হয়ে যায়। আর তা দ্বারা স্থানান্তরের যোগ্য বস্তুই উদ্দেশ্য। কেননা আগে বলা হয়েছে যে, স্থানান্তর যোগ্য বস্তুতেই গসব সাব্যস্ত হয়।

(দায় সাব্যস্ত হবে) এটা এজন্য যে, বস্তুটি পূর্ববর্তী গসব এর কারণে তার দায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। কেননা সেটাই হল কারণ। আর তা ফেরত প্রদানে অপারগতার সময় মূল্য ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। কিংবা ঐ কারণের দ্বারাই অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এ জন্যই গসবের দিনের মূল্য বিবেচ্য হয়।

আর যদি তার হাতে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ক্ষতির পরিমাণ দায় বহন করবে।

কেননা গসব করার কারণে তার সমগ্র অংশ (ও সমগ্র গুণ) গসবকারীর দায়ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং যখন তার বস্তুসত্তা ফেরত প্রদান অসম্ভব হবে তখন তার মূল্য ফেরত প্রদান করা অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে গসবের স্থানে ফেরত প্রদানের সময় যদি বস্তু মূল্য কমে যায়, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা এটার অর্থ হল বস্তুটির প্রতি লোকের চাহিদা কম হওয়া, বস্তুটির কোন অংশ ফওত হওয়া নয়।

অদ্রূপ বিক্রয় দ্রব্যের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সেটা হল চুক্তিজনিত দায় বহন। পক্ষান্তরে গসব অর্থ কবজা করা। আর কর্মজনিত ক্ষতির কারণে গুণেরও দায় বহন করতে হয়। চুক্তিজনিত কারণে গুণের দায় বহন করতে হয় না। যেমন পূর্বে তা জানা গিয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরী (র)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল রিবা মুক্ত দ্রব্য পক্ষান্তরে রিবা ভুক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে মূল বস্তু ফেরত নেয়ার পাশাপাশি ক্ষতির দায় আরোপ করা যায় না। কেননা সেটা রিবার দিকে গড়ায়।

তিনি বলেন ঃ কেউ যদি কোন গোলামকে গসব করে। অত:পর তাকে উপার্জনে খাটায় আ সে কাজ তাকে দুর্বল করে ফেলে হানির দায় বহন করতে হবে। কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। আর মজুরি সে সাদাকা করে দেবে।

হেদোয়া গ্রন্থকার বলেন, এটা তারফায়নের মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, মজুরি সাদাকা করতে হবে না।

একই মতপার্থক্য হবে যদি অতিরিক্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি আরিয়াতের বস্তুকে ইজারা দেয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, মজুরি তার দায়মুক্ত অবস্থায় এবং তার মালিকানায় অর্জিত হয়েছে। দায়ভূক্তির বিষয়টি তো পরিষ্কার। তদ্রূপ দায় পরিশোধকৃত বস্তুটিও মালিকানাভুক্ত অবস্থায় অর্জিত হয়েছে। কেননা আমাদের মতে দায়বদ্ধ বস্তুগুলো দায় পরিশোধ করার মাধ্যমে গসবের সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মালিকানাভুক্ত হয়।

তারফায়নের দলীল এই যে, মজুরিটি অর্জিত হয়েছে মন্দ কারণ দ্বারা। আর সেটা হল অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ। আর যে অর্জিত মালের অবস্থা এই , তার উপায় হল সাদাকা করা।

কেননা শাখারূপে নির্গত বস্তু মূলের গুণকে ধারণ করে থাকে।

আর পিছনের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত মালিকানা মূলত: ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা। সুতরাং তা দ্বারা মন্দত্ব বিলুপ্ত হবে না।

আর যদি গসবকারীর হাতে গোলামটি হালাক হয়ে যায়, এবং সে তার দায় বহন করে তাহলে দায় পরিশোধ করার ব্যাপারে লব্ধ মজুরি দ্বারা সাহায্য নিতে পারবে।

কেননা মজুরিতে মন্দত্ব ছিল মালিকের হকের কারণে। এ জন্যই তো গসবকারী যদি গোলামসহ লব্ধ মজুরি মালিককে আদায় করে দেয় তাহলে মালিকের জন্য তা ভোগ করা হালাল হয়। সুতরাং মালিকের কাছে গোলামের মূল্যদায় পরিশোধ করার মাধ্যমে মন্দত্ব দূরীভূত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে গসবকারী যদি গসবকৃত গোলাম বিক্রি করে (এবং মূল্য কবজা করে) আর ক্রেতার হাতে গোলামটি হালাক হয়ে যায়, এরপর গোলামের কোন হকদার বের হয় আর ক্রেতা হকদারের অনুকূলে মূল্যদান বহন করে তখন ক্রেতার কাছে বিক্রয় মূল্য ফেরত দিতে গিয়ে গসবকারী তার অর্জিত মুজরি দ্বারা সাহায্যে নিতে পারবে না। কেননা অর্জিত মুজরিতে সৃষ্ট মন্দত্ব ক্রেতার প্রাপ্য হকের কারণে নয়, (বরং হকদারের হকের কারণে) যদি ঐ অর্জিত মুজুরি ব্যবহার করা ছাড়া কোন উপায় না পায় তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা সে সেটার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। সুতরাং সে সেটাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে। পরে যদি সে মাল অর্জন করে তাহলে ঐ পরিমাণ সাদাকা করে দেবে, যদি কিক্রয় মূল্য ভোগ করার সময় সে সচ্ছল হয়ে থাকে। আর যদি অসচ্ছল হয়ে থাকে তাহলে তাকে কিছু সাদাকা করতে হবে না। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি এক হাযার দিরহাম গসব করে এবং এর দ্বারা একটি দাসী ক্রয় করে, অত:পর দুই হাযারে দাসীটি বিক্রয় করে, তাহলে সে

সমগ্র মুনাফা সাদাকা করে দেবে। এরপর এ দুই হাযার দিয়ে একটি দাসী ক্রয় করে এবং তাকে তিন হাযার দিরহামে বিক্রী করে, তা হলে সে সমস্ত মুনাফা সাদাকা করে দেবে।

তারফায়নের মতে, এর মূলনীতি এই যে, গসবকারী এবং আমানত গ্রহণকারী যদি গসবকৃত বস্তুতে আমানতের দ্রব্যে হস্তক্ষেপ করে এবং মুনাফা অর্জন করে তাহলে তারফায়নের মতে সেই মুনাফা তাদের জন্য হালাল হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন।

পূববর্তী মাসআলায় এর দলীল আলোচনা বিগত হয়েছে। আর আমানতের ক্ষেত্রে তারফায়নের সিদ্ধান্ত অধিক স্পষ্ট। কেননা আমনতী দ্রব্যের ক্ষেত্রে যেহেতু দায় বহনের কারণ বিদ্যমান নেই; সেহেতু মালিকানা হস্তক্ষেপ পূর্ব সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। সুতরাং আমানতের ক্ষেত্রে নিজের মালিকানায় হস্তক্ষেপ সাব্যস্ত হবে না।

অত:পর এ বিষয়টি ঐ ক্ষেত্রে স্পষ্ট, যা ইশারা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যা ইশারা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, যেমন মুদ্রা দ্রব্যদ্বয় (তথা দিরহাম দীনার) সে ক্ষেত্রে জামে ছাগীর উপরোক্ত বক্তব্য 'তা দ্বারা ক্রয় করল'— দ্বারা এদিকে ইশারা হবে যে, সাদাকা করা তখনই ওয়াজিব হবে, যখন মুদ্রা দ্রব্যের দিকে ইশারা করে ক্রয় করবে এবং তা থেকেই মূল্য পরিশোধ করবে। পক্ষান্তরে যদি ঐদিকে ইশারা করে আর অন্য মুদ্রা দ্বারা মূল্য পরিশোধ করে কিংবা ঐ মুদ্রা মূল্য পরিশোধ করে কিন্তু অন্য মুদ্রার দিকে ইশারা (পূর্বক ক্রয়) করে কিংবা নিঃশর্ত রূপে মূল্য নির্ধারণ করে, আর ঐ মুদ্রা মূল্য পরিশোধ করে তাহলে মুনাফা তার জন্য হবে।

ইমাম কারখী (র) এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা ইশারা যখন নির্ধারিত হওয়া সাব্যস্ত করে না, তখন মূল্য পরিশোধ দ্বারা তা জোরদার হওয়া দরকার যাতে মন্দত্ব সাব্যস্ত হয়।

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, দায় পরিশোধ করার পূর্বে এবং পরে সর্ব অবস্থায় মুনাফা তার জন্য হালাল হবে না। আর এটি হল গ্রহণযোগ্য মত। কেননা জামে ছাগীর জামে কাবীর ও মাবসূত কিতাবে সাদাকা করার সিদ্ধান্তকে নি:শর্ত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি (গছবকৃত) এক হাযার দ্বারা দুই হাযার দিরহামের সমমূল্যের একটি দাসী ক্রয় করে, অত:পর তা হেবা করে দেয়। কিংবা খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে তা আহার করে ফেলে তাহলে কিছু সাদাকা করতে হবে না।

এটা তাঁদের সবার মত। কেননা শ্রেণী অভিন্নতার ক্ষেত্রে মুনাফা প্রকাশ পায়।

পরিচ্ছেদ ঃ গসবকারীর কর্ম দ্বারা গসবকৃত বস্তুর পরিবর্তন

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গসবকারীর কর্ম দ্বারা যদি গসবকৃত বস্তুর এমন পরিবর্তন হয় যে, বস্তুটির নাম বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বস্তুটির প্রধান উপকারিতা বিদূরিত হয়ে যায় তাহলে বস্তুটি যার কাছ থেকে গসব করা হয়েছে তার মালিকানা

বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর গসবকারী তার মালিক হয়ে যাবে এবং সে তার যামীন হবে। তবে বস্তুটির বিনিময় পরিশোধ করা পর্যন্ত তা দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য হালাল নয়। যেমন কেউ একটি বকরী গসব করে তা জবেহ্ করল এবং ভুনা করল বা তরকারী রান্না করল। কিংবা গম গসব করে তা আটা করল কিংবা লোহা গসব করে তা দ্বারা তলোয়ার (বা অন্য কিছু) তৈরি করল, কিংবা পিতল গসব করে তা দ্বারা কোন পাত্র তৈরি করল।

এ সবই হলো আমাদের মত। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ কারণে মালিকের হক রহিত হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তবে মালিক যদি আটা গ্রহণ করা পছন্দ করে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে গছবকারীর উপ গুণগত লোকসানের দায় আরোপ করতে পারবে না। কেননা এটা রিবার দিকে গড়বে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে সে যামিন হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে, গসবকৃত বস্তুটি থেকে মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত হবে; তবে তার ঋণ পরিশোধের জন্য সেটাকে বিক্রি করা হবে। এবং মৃত্যুর পর পাওনাদারদের চাইতে সে-ই সেটার বেশী হ্দকার হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীল এই যে, বস্তুটি তো বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তার মালিকানা বিদ্যমান থাকবে এবং গসবকারীর কৃত 'কর্ম' তার অনুবর্তী হবে। যেমন বাতাস উড়িয়ে গমকে অন্য কারো পেষণ যন্ত্রে নিয়ে ফেলল এবং গম পিষ্ট হয়ে গেল। গসবকারী কর্ম বিবেচ্য হবে না। কেননা সেটা নির্দিষ্ট নিষিদ্ধ কর্ম। সুতরাং সেটা মালিকানার 'কারণ' রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য হবে না। যেমন পূর্বে তা জানা হয়েছে। সুতরাং কর্মটি সম্পূর্ণ অবিদ্যমান হওয়ার মত হল। আর গসবকৃত বকরী জবেহ করে চামড়া ছাড়িয়ে টুকুরো টুকরো করার মত হল। (এতে গসবকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হয় না।)

আমাদের দলীল এই যে, গসবকারী তাতে এমন 'কর্ম' সৃষ্টি করেছে, যা নতুন মূল্যমান সাব্যস্ত করে। সুতরাং এই সৃষ্টি কর্ম মালিকের হককে একদিক থেকে বিলুপ্ত করে দেয়। দেখুন না বস্তুটির নাম পরিবর্তিত হয়ে যায়। এবং বস্তুটির প্রধান মুনাফা রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সৃষ্ট কর্মটির ক্ষেত্রে গসবকারীরহক সর্বতোভাবে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং গসবকারীর হক মালিকের আদি হক এর উপর অগ্রগণ্য হবে, যা একদিক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আর গসবকারীর কর্মকে আমরা এ হিসাবে মালিকানার কারণ সাব্যস্ত করছিনা যে, তা নিষিদ্ধ কর্ম; বরং এই হিসাবে যে, তা হচ্ছে (মূল্যমান সম্পন্ন) একটি কর্ম সৃষ্টিকরণ। (জবেহকৃত) বকরীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা জবেহ করা ও চামড়া ছাড়ানোর পরও তার 'বকরী' নাম বহাল থাকে।

আর নাম বাকি থাকা দ্বারা মালিকের হক বাকি থাকা এবং নাম বিলুপ্ত হওয়া দ্বারা মালিকের হক বিলুপ্ত হওয়া এই প্রমাণ নীতি উল্লেখিত সমস্ত মাসয়ালাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এর উপর অন্যান্য মাসআলার অনুসিদ্ধান্ত নির্ণত হয়। সুতরাং তা স্মরণ রাখ।

ইমাম কুদূরী (র)-এর বক্তব্য বস্তুটির বিনিময় আদায় না করা পর্যন্ত তা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয হবে না। এটা হল সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল। কিয়াসের দাবী হল তার জন্য সেটা জায়িয হওয়া। এটাই ইমাম হাসান বিন যিয়াদ (র) ও ইমাম যুফার (র)-এর মত। আর ফকীহ আবুল লায়ছ (র)-এর সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

এর প্রমাণ হল গসবকারীর অনুকূলে হস্তক্ষেপের নি:শর্ত মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। দেখুন না সে যদি তা হেবা করে বা বিক্রি করে তাহলে বৈধ হয়।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হল মালিকের সম্মতি ছাড়া জবেহকৃত ও ভুনাকৃত বকরী সম্পর্কে নবী (সা)-এর নির্দেশ اطعموها الاسارى। (বন্দীদের তা খাইয়ে দাও।)

এখানে সাদাকার আদেশ মালিকের মালিকানা বিলুপ্তি এবং মালিককে সন্তুষ্ট করার পূর্বে গসবকারী তা থেকে উপকৃত হওয়ার হুরমত প্রমাণ করে।

তা ছাড়া এই কারণে যে, উপকার লাভের বৈধতা দানের অর্থ হবে গসবের পথ খুলে দেয়া। সুতরাং ফাসাদের মূল কেটে দেয়ার উদ্দেশ্যে সন্তুষ্টি সাধনের পূর্বে উপকার লাভ হারাম হওয়ার সিদ্ধান্ত দেয়া হবে।

আর 'হুরমত' (হারাম হওয়া) সত্ত্বেও তার বিক্রয় ও হেবা কার্যকর হওয়ার কারণ হল মালিকানা বিদ্যমান থাকা। যেমন ফাসিদ মালিকানার ক্ষেত্রে।

পক্ষান্তরে যখন বিনিময় আদায় করে দেবে তখন তার জন্য বস্তুটি থেকে উপকৃত হওয়া হালাল হয়ে যাবে। কেননা বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে মালিকের হক পরিশোধ হয়ে গেছে। সুতরাং পারস্পরিক সম্মতিপূর্ণ লেনদেন সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

তদ্রূপ মালিক যদি তাকে দায়মুক্ত করে দেয়। কেননা দায়মুক্ত করা দ্বারা মালিকের হক রহিত হয়ে গেছে।

তদ্রূপ (উপকৃত হওয়া বৈধ হবে) যদি আদালতের ফায়সালার মাধ্যমে গসবকারী বিনিময় পরিশোধ করে কিংবা শাসক তার থেকে দায় উশুল করে (মালিককে প্রদান করে) কিংবা মালিক (গচ্ছিত সম্মতি ছাড়া) তার থেকে দায় উশুল পাওয়া গিয়েছে। কারণ কাযী (বা শাসক) তো মালিকের দাবী ছাড়া ফায়সালা করবেন না।

একই মতপার্থক্য রয়েছে যদি সে গম গসব করে জমিতে তা বপন করে কিংবা আঁটি গসব বরে তা রোপন করে।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে দায় পরিশোধ করার পূর্বেই এ দুটি জিনিস থেকে উপকার লাভ করা বৈধ হবে। কেননা সর্বদিক থেকেই বস্তু দুটিকে হালাক করা বিদ্যমান হয়ে গেল।

পূর্ববর্তী বকরীর মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা সেখানে একদিক থেকে বস্তু সত্তা বিদ্যমান রয়েছে।

গম বপন করার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে উদ্বৃত্ত ফসল সাদাকা করতে হবে না। তারফায়ন ভিন্নমত পোষণ করেন। এ বিধানের মূলনীতি তা- যা আগে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি রূপা বা সোনা গসব করে এবং তা দ্বারা দিরহাম-দীনার বা পাত্র তৈরি করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এগুলো থেকে মালিকের মালিকানা রহিত হবে না। বরং মালিক তা নিয়ে নেবে। আর গসবকারী কিছুই পাবে না।

আর সাহেবায়ন (র) বলেন গসবকারী সেগুলোর মালিক হয়ে যাবে, আর তার উপর ঐ রূপা ও সোনার সমপরিমাণ অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

কেননা সে তাতে মূল্যমান সম্পদ কর্ম সৃষ্টি করেছে, যা একদিক থেকে মালিকের হক বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

দেখুন না সে রূপা ও সোনা গাগিয়ে ফেলেছে এবং কিছু উদ্দেশ্য হাতছাড়া হয়ে গেছে। আর স্বর্ণ ও রৌপ্য খণ্ড মোদারাবা ও শরীকানা লেনদেনের ক্ষেত্রে পুঁজি ও মূলধন হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা; পক্ষান্তরে মুদ্রায় রূপান্তরিত হওয়ার পর সে যোগ্যতা রাখে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, বস্তুসত্তা এখনো সর্বদিক থেকে বহাল রয়েছে। দেখনুনা স্বর্ণ রৌপ্য নাম এখনো বাকি রয়েছে। এবং তার মূলগুণ হচ্ছে মূল্যগুণ এবং ওজনগুণ আর সেটা বিদ্যমাণ রয়েছে। আর এই ওজনগুণের কারণেই তাতে রিবার বিধান কার্যকর হয়।

মূলধন হওয়ার যোগ্যতা হল কর্মগুণ, বস্তুগুণ নয়।

তদ্রূপ তাতে সৃষ্ট কর্ম সর্বাবস্থায় মূল্যমান সম্পন্ন নয়। কেননা এটাকে যখন তার সম শ্রেণীর মোকাবেলায় লেনদেন করা হয় তখন তার ভিন্ন মূল্য মান থাকে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি সেগুন কাঠ গসব করে তার উপর ঘর বানায় তাহলে তা থেকে মালিকের মালিকানা লুপ্ত হয়ে যাবে এবং গসবকারীর উপর তার মূল্যদায় লাযিম হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মালিকের তা ফেরত নেয়ার অধিকার থাকবে। আর উভয় পক্ষের দলীল আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

এ বিষয়ে আমাদের আরেকটি দলীল এই যে, ইমাম শাফেয়ী (র) এ মত গ্রহণ করেছেন, তাতে ঘর ভাঙ্গার মাধ্যমে গসবকারীর ক্ষতিসাধন হয় যার, কোন ক্ষতিপূরণ নেই। পক্ষান্তরে আমরা যে মত গ্রহণ করেছি, তাতে মালিকের ক্ষতি মূল্য দ্বারা পূরণ হয়। সুতরাং বিষয়টি গসবকৃত সূতা দ্বারা নিজের দাসীর বা দাসের পেট সেলাই করার মত হল; কিংবা গসবকৃত কাঠখণ্ড জলযানে যুক্ত করার মত হল।

ইমাম কুদুরী (র)-এবং ফকীহ আবু জাফর হিন্দোয়ানী (র) বলেন, ঘর ভাঙ্গা হবে না, যদি সেগুন কাঠকে ঘরে তৈরি করা হয়। আর যদি স্বয়ং সেগুন কাঠের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় তাহলে ভাঙ্গা হবে। কেননা এতে গসবকারী সীমা লঙ্ঘনকারী হবে।

কিন্তু কুদূরী কিতাবের সিদ্ধান্ত সেটাকে রদ করছে। আর তা-ই অধিকতর বিশুদ্ধ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি অন্যের বকরী জবেহ করে তাহলে বকরীর মালিকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে গসবকারী বকরীর মূল্য দায় বহন করবে এবং বকরীটি তাকে অর্পণ করে দেবে। আর ইচ্ছা করলে (বকরী নিয়ে নেবে এবং যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে) সেই পরিমাণ ক্ষতির দায় বহন করাবে। আর উটের বেলায়ও এ-ই বিধান। তদ্রূপ যদি বকরীর বা উটের পা কেটে ফেলে।

এটাই হল যাহির রিওয়ায়েত। এর দলীল এই যে, এক হিসাবে জবেহ করার অর্থ হল নষ্ট করে দেওয়া এবং তা এই বিবেচনায় যে, কিছু উদ্দেশ্য হাত ছাড়া হয়ে গেছে। যেমন বহন করা, দুধ দেয়া, প্রজনন অব্যাহত থাকা। আবার কিছু বহাল রয়েছে আর তা হল গোশ্‌ত। সুতরাং এটা কাপড়ে বড় ধরনের ছেঁড়াফাড়ার মত হল।

আর জন্তুটি যদি 'মাংস ভক্ষণ যোগ্য' না হয় আর গসবকারী তার পর কেটে ফেলে তাহলে মালিক তাকে পূর্ণ জন্তুর মূল্যদায় বহন করাতে পারে। কেননা এখানে সম্পূর্ণ নষ্ট করা পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে গোলামের হাত বা পা কাটার বিষয়টি ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে সে কর্তিত অংগের দিয়তসহ সেটি ফেরত দিতে পারে। কেননা মানুষ হাত বা পা কাটার পরও উপকারযোগ্য থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কাপড় সামান্য ছিঁড়ে ফেলে তাহলে সে ক্ষতির দায় বহন করবে। আর কাপড় মালিকের থাকবে।

কেননা বস্তুটি সর্বদিক থেকে বিদ্যমান রয়েছে। শুধু তাতে দোষ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ক্ষতিটুকুর দায় সে বহন করবে।

আর যদি বেশী পরিমাণ ছিঁড়ে ফেলে, যাতে তার সাধারণ উপকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কাপড়ের মালিক গসবকারীর কাপড়ের সমগ্র মূল্যের দায় বহন করতে পারে।

কেননা এই দিক থেকে এ কাজটা হল নষ্ট করার সমতুল্য, যেন সে কাপড়টা পুড়ে ফেলেছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সমগ্র মূল্যের দায় আরোপ করার অর্থ হলো কাপড়টা গসবকারীকে ছেড়ে দিতে হবে। আর ইচ্ছা করলে কাপড়টা নিয়ে ক্ষতির দায় আরোপ করাবে। কেননা একদিক থেকে এটা হলো দোষযুক্তকরণ। কারণ বস্তুটি এখনো বাকি রয়েছে। তদ্রূপ কিছু উপকারিতা বহাল রয়েছে।

অত:পর কুদূরী কিতাবে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বেশী ছেঁড়া মানে যা সাধারণ উপকারিতা নষ্ট করে দেয়। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, বেশী ছেড়া মানে যার কারণে বস্তুর কিছু অংশ ফওত হয়ে যায় এবং উপকারিতার 'শ্রেণীসত্তা' নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ বস্তুর অংশ বিশেষ এবং উপকারিতার অংশবিশেষ বহাল থাকে। আর সামান্য ছেঁড়া মানে যার কারণে উপকারিতার কোন কিছু ফওত না হয়। শুধু তাতে দোষ সৃষ্টি হয়।

কেননা মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) কাপড় কাটাকে বেশী ক্ষতি বলে গণ্য করেছেন। অথচ তা দ্বারা উপকারিতার অংশ বিশেষ ফওত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন যমি গসব করে এবং তাতে চারা লাগায় বা ভবন তৈরি করে তাহলে বলা হবে ভবন ও চারা উপড়ে ফেল এবং জমি ফেরত দাও।

কেননা নবী (স) বলেছেন, ليس لعرق ظالم حق ·

যালিম বৃক্ষ রোপনকারীর কোন হক নেই।

তাছাড়া এই কারণে যে, যমির বস্তু সত্তা বিদ্যমান থাকায় যমির মালিকের মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। আর (শরীয়তের দৃষ্টিতে) অস্থাবর সম্পত্তিতে গসব সাব্যস্ত হয় না। অথচ মালিকানা উদ্ভূত হওয়ার জন্য কোন কারণ অপরিহার্য (যা গসবকারীর অনুকূলে এখানে নেই)। সুতরাং যমিকে যে আবদ্ধ রেখেছে তাকে যমি খালি করার আদেশ দেয়া হবে। যেমন অন্যের পাত্রকে নিজের খাবার দ্বারা আবদ্ধকারীকে আদেশ দেওয়া হয়।

আর যদি তা উপড়ে ফেললে যমির ক্ষতি হয় তাহলে মালিক গসবকারীর অনুকূলে ভবনের বা বৃক্ষের উপড়ানো অবস্থায় মূল্য দায় বহন করতে পারে। আর বৃক্ষ ও ভবন যমির মালিকের হয়ে যাবে।

কেননা এতে উভয়ের কল্যাণ বিবেচনা এবং উভয়ের ক্ষতিরোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) এর বক্তব্য উপড়ানো অবস্থায় তার মূল্য'—এর অর্থ (উপড়ানো পরবর্তী অবস্থার মূল্য নয়, বরং) যে ভবন বা বৃক্ষকে উপড়ে ফেলতে হবে সেগুলোর (দাঁড়ানো অবস্থার) মূল্য। কেননা গসবকারীর হক ঐ ভবন ও বৃক্ষে সাব্যস্ত হয়েছে, যা উপড়ে ফেলতে হবে। কারণ এই যমিতে এগুলোর স্থায়িত্ব নেই। সুতরাং ভবন ও বৃক্ষহীন অবস্থায় যমির মূল্য নির্ধারণ করতে হবে অতঃপর ঐ ভবন ও বৃক্ষসহ যমির মূল্য নির্ধারণ করা হবে সেগুলোকে উপড়ে ফেলার আদেশ দানের অধিকার যমির মালিকের রয়েছে, এতদোভয়ের মধ্যবর্তী অতিরিক্ত মূল্যটুকুর দায় যমির মালিক বহন করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কাপড় গসব করে তা লাল রঙে রঞ্জিত করে কিংবা ছাতু গসব করে তা ঘী দ্বারা মেখে ফেলে তখন কাপড় ও ছাতুর মালিকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে গসবকারীকে সাদা কাপড়ের এবং ঐ পরিমাণ ছাতুর মূল্য দায় বহন করাবে এবং এ রঞ্জিত কাপড় ও ঘী মাখা ছাতু গসবকারীকে হাওয়ালা করে দেবে। আবার ইচ্ছা করলে ঐ দুটি নিজে নিয়ে নেবে এবং রঞ্জন ও ঘী দ্বারা তাতে যে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তার ক্ষতিপূরণ গসবকারীকে প্রদান করবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) কাপড় সম্পর্কে বলেন, কাপড়ের মালিক ইচ্ছা করলে কাপড় রেখে দিয়ে গসবকারীকে যথাসম্ভব রং তুলে নেয়ার কথা বলতে পারে। এটা তিনি বলেন, ভিটিতে ঘর তৈরির ছুরতের উপর কিয়াস করে।

কেননা (এখানেও) পৃথকীকরণ সম্ভব। ছাতুতে মাখা ঘী-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা পৃথক করা সম্ভব নয়।

আমাদের দলীল সেটাই যা আমরা বর্ণনা করেছি যে, তাতে উভয় পক্ষের কল্যাণ বিবেচনা রয়েছে।

আর কাপড়ের মালিকের (এবং ছাতুওয়ালার) ইচ্ছাধিকার প্রদানের কারণ এই যে, সে হল মূল বস্তুর অধিকারী (পক্ষান্তরে রঙ ও ঘী হল পরবর্তীতে যুক্ত অনুবর্তী)

ভিটিতে তৈরি ঘরের (ও রোপিত বৃক্ষের) বিষয়টি ভিন্ন। কেননা উপড়ানোর পর জিনিসগুলো তার হবে। পক্ষান্তরে রঙ তো তুলতে গেলে 'নাই' হয়ে যাবে।

তদ্রূপ কাপড় বাতাসে উড়ে গিয়ে রঞ্জিত হওয়ার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা রঙওয়ালার কোন অপরাধ নেই, যাতে তার উপর কাপড়ের মূল্য দায় আরোপ করা যায়। বরং মূল জিনিসের (তথা কাপড়ের) মালিক মূল্য পরিশোধ করে রঙ-এর মালিক হয়ে যাবে।

ইমাম আবু ইছমাত (র) মূল মাসআলাটি (অর্থাৎ গাছিব কর্তৃক বস্ত্র রঞ্জিত করার মাসআলা) সম্পর্কে বলেছেন, "আর যদি কাপড়ের মালিক ইচ্ছা করে তাহলে কাপড়টি বিক্রি করবে এবং সাদা অবস্থায় কাপড়ের যা মূল্য তা সে নেবে আর রঞ্জনের ফলে তাতে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তা রঙওয়ালা নেবে।"

কেননা তার তো অধিকার রয়েছে মূল্য শোধ করে রঙ-এর মালিকানা গ্রহণ না করার। আর রঙ-এর মালিকানা থেকে বিরত থাকা অবস্থায় বিক্রয়ের মাঝেই উভয় পক্ষের কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে যায়।

এই সমাধান বস্ত্র নিজে নিজে রঞ্জিত হওয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে।

আর বস্ত্র রঞ্জিত করা এবং রঞ্জিত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমরা যা উল্লেখ করেছি তাতে ছাতুর ব্যাপারে সিদ্ধান্তের কারণ স্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে পার্থক্য এই যে, ছাতু

সদৃশ শ্রেণীভুক্ত হওয়ার কারণে সমপরিমাণ ছাতুর দায় বহন করবে আর বস্ত্র মূল্যসাপেক্ষ বস্ত্র হওয়ার কারণে তার মূল্যের দায় বহন করবে।

মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) বলেছেন, ছাতুর মূল্য দায় বহন করবে। কেননা ভাজার (ও পেষার) তারতম্যের কারণে ছাতু পার্থক্যপূর্ণ হয়। সুতরাং সেটা সদৃশ শ্রেণীভুক্ত হবে না।

আর কেউ কেউ বলেন, মাবসূতে বর্ণিত মূল্যের দ্বারা সমপরিকাণ উদ্দেশ্য। আর (গসবকৃত বস্তুর) সদৃশকে (গসবকৃত বস্তুর) মূল্য বলার কারণ এই যে, সদৃশ বস্তুটি গসবকৃত বস্তুটির স্থলবর্তী হয়।

আর হলুদ রঙ লাল রঙের মত। তবে যদি কালো রঙ দ্বরা রঞ্জিত করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সেটা হবে কাপড়ের (ক্ষতি) আর সাহেবায়নের মতে হবে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি।

আর কেউ কেউ বলেন, এটা (মত পার্থক্য নয় বরং) যুগ-পার্থক্যের মতভেদ। আর কেউ কেউ বলেন, কাপড় যদি এমন হয়, কালো রঙ যার ক্ষতি করে তাহলে এটা বলে গণ্য। আর যদি কাপড় এমন হয়, কালো রঙ যার মূল্যবৃদ্ধি করে তাহলে তা লাল রঙের মত। অন্যত্র (অর্থাৎ কারখী রহঃ সংকলিত 'মুখাতাছা' কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে) এটা আলোচিত হয়েছে।

আর যদি কাপড় এমন হয় লাল রঙ যার 'মূল্য ক্ষতি' করে; যেমন কাপড়টির মূল্য ছিল ত্রিশ দিরহাম আর রঞ্জনের পর এর মূল্য কমে হল বিশ দিরহাম, সে ক্ষেত্রে ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, লাল রঙ যে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি করে সে কাপড়ের দিকে লক্ষ্য করা হবে। যদি বর্ধিত মূল্য পাঁচ দিরহাম হয় তাহলে কাপড় ওয়ালা (গসবকারী থেকে) কাপড় ও পাঁচ দিরহাম গ্রহণ করবে। কেননা দুই পাঁচ এর একটি রঙ-এর ক্ষতিপূরণ হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন বস্তু গসব করে তা গায়েব করে ফেলে অতঃপর মালিক তার উপর ঐ বস্তুর মূল্যদায় আরোপ করে তখন গসবকারী ঐ বস্তুর মালিক হয়ে যাবে।

এটা আমাদের মত ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, এভাবে সে বস্তুটির মালিক হবে না। কেননা গসব হল নিছক সীমা লঙ্ঘন। সুতরাং তা মালিকানার কারণ হতে পারে না। যেমন (মোদাব্বারের গসব করে গায়েব করার ক্ষেত্রে)।

আমাদের দলীল এই যে, বস্তুটির মালিক (বস্তুটির) সমগ্র বিনিময়ের মালিক হয়ে গেছে। আর বিনিময়কৃত বস্তুটি (مبدل) মালিকের মালিকানা থেকে গসবকারীর মালিকানায় স্থানান্তরযোগ্য। সুতরাং সে তার মালিকানা লাভ করবে, যাতে তার ক্ষতি রোধ করা যায়।

মোদাব্বার-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মোদাব্বারের হক বিবেচনায় তার মালিকানা স্থানান্তরযোগ্য নয়।

তবে আদালতের ফায়সালার মাধ্যমে অবশ্য মোদারব্বার ঘোষণা রহিত করা যায়। কিন্তু রহিত করণের পর বিক্রয় চুক্তি সাধারণ গোলামের সঙ্গে যুক্ত হবে, (মোদাব্বারের সঙ্গে নয়)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর গায়েবকৃত বস্তুটির মূল্য সম্পর্কে কসমসহ গসবকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা মালিক অতিরিক্তের দাবী করবে, আর গসবকারী তা অস্বীকার করবে। আর অস্বীকারীর বক্তব্যই কসমসহ গ্রহণযোগ্য হয়।

তবে মালিক যদি তার চেয়ে অধিক মূল্যের পক্ষে বাইয়েনাহ্ পেশ করে তাহলে তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা সে অবশ্য সাব্যস্তকারী প্রমাণ দ্বারা তার দাবী প্রমাণিত করেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পরবর্তীতে বস্তুটি যদি প্রকাশ পায় আর দেখা যয় যে, যে পরিমাণ দায় সে বহন করেছে, বস্তুটির মূল্য-তার চেয়ে বেশী। অথচ সে মালিকের দাবী ও উপস্থাপিত বাইয়েনাহ-এর ভিত্তিতে কিংবা নিজের কসম-অস্বীকৃতির ভিত্তিতে উক্ত দায় বহন করেছে তাহলে মালিকের কোন ইচ্ছাধিকার থাকবে না। বস্তুটি গসবকারীর হয়ে যাবে।

কেননা এমন কারণ দ্বারা গসবকারীর মালিকানা সম্পন্ন হয়েছে, যার সঙ্গে মালিকের সম্মতি যুক্ত রয়েছে; কারণ সে তো ঐ পরিমাণই দাবী করেছিল।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি কসমসহ গসবকারীর বক্তব্যের ভিত্তিতে দায় বহন হয়ে থাকে তাহলে মালিকের ইচ্ছাধিকার থাকবে, ইচ্ছা করলে সে পূর্ববর্তী দায় বহনকেই বহাল রাখবে আর ইচ্ছা করলে বস্তুটি ফেরত নিয়ে বিনিময় ফেরত প্রদান করবে।

কেননা এই পরিমাণের ব্যাপারে মালিকের সম্মতি সম্পন্ন হয়নি। কারণ সে এর চেয়ে বশীর দাবী করছে, তবে বাইয়েনাহ না থাকার কারণে সে দাবীকৃত পরিমাণের কম গ্রহণ করেছে।

পক্ষান্তরে এই শেষ ছুরতের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাওয়া বস্তুটির মূল্য যদি দায় বহনের সম পরিমাণ বা তার কম হয় তাহলে যাহিরে রেওয়ায়াতে একই বিধান হবে। এবং (যুক্তির বিচারে) এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ।

ইমাম কারখী (র) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, মালিকের ইখ্তিয়ার থাকবে না।

কেননা মালিকের সম্মতি সম্পন্ন হয়নি। কারণ সে যা দাবী করেছে, তা তাকে দেয়া হয়নি। আর সম্মতি না থাকার কারণেই ইখ্তিয়ার সাব্যস্ত হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন গোলাম গসব করে এবং বিক্রি করে আর মালিক তার উপর গোলামের মূল্যদায় আরোপ করে তাহলে তার বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি সে গোলামকে আযাদ করে তারপর মূল্যদায় বহন করে তাহলে তার আযাদ করা বৈধ হবে না।

কেননা গসবকৃত বস্তুতে গসবকারীর মালিকানা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। কারণ তা অনিবার্য প্রয়োজন বসতঃ পূর্ববর্তী গসবকারীর মালিকানা গোলামের উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়; গোলামের সন্তানদের ক্ষেত্রে নয়। আর অসম্পূর্ণ মালিকানা বিক্রয় কার্যকর করার জন্য তো যথেষ্ট, কিন্তু মুক্তিদান কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট নয়; যেমন মোকাতাবের মালিকানা (অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে বিক্রয়ের জন্য যথেষ্ট, মুক্তি দানের জন্য নয়।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গসবকৃত দাসীর সন্তান এবং তার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ও অন্যান্য বৃদ্ধি এবং গসবকৃত বাগানের ফল গসবকারীর হাতে আমানত রূপে থাকবে। যদি তা নষ্ট হয় তাহলে তার উপর দায় আরোপিত হবে না। তবে যদি সে ঐ বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করে থাকে, কিংবা মালিক তা ফেরত দাবী করা সত্ত্বেও না দিয়ে থাকে (তাহলে দায় বহন করতে হবে।)

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, গসবকৃত বস্তু বা প্রাণীর বর্ধিত যা কিছু তা গসবকারীর হাতে দায়বদ্ধ অবস্থায় থাকবে। বর্ধিতটুকু যুক্ত অবস্থায় হোক (যেমন সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য) কিংবা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় হোক (যেমন সন্তান)।

কেননা এক্ষেত্রে গসব সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ অন্যের মালের মাঝে তার সম্মতি ছাড়া কবজা প্রতিষ্ঠিত করা। যেমন, হারাম থেকে বের করে নেয়া হরিণ যদি তার কাছে থাকা অবস্থায় বাচ্চা প্রসব করে তাহলে বাচ্চা তার উপর দায়বদ্ধ অবস্থায় থাকবে।

আমাদের দলীল এই যে, গসব অর্থ অন্যের মালের মাঝে এমনভাবে নিজের কবজা প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে মালিকের কবজা বিলুপ্ত হয়, যেমন পূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি। অথচ এই বর্ধিত ক্ষেত্রে মালিকের কবজা তো সাব্যস্ত ছিল না, যাতে গসবকারীর তা বিলুপ্ত করার প্রশ্ন আসতে পারে।

আর যদি 'সন্তান দাসীর অনুবর্তী', এই হিসাবে সন্তানের উপর মালিকের কবজা সাব্যস্ত বলেও বিবেচনা করা হয়, তাহলেও আমরা বলবো যে, গসবকারী তার কবজা বিলুপ্ত করেনি। কেননা বাধা দিয়ে না রাখাই স্বাভাবিক। এমনকি মালিকের ফেরত দাবীর পর যদি সন্তানকে বাধা দিয়ে রাখে তাহলে সে তার দায় বহন করবে। তদ্রূপ যদি সে বাচ্চার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করে, (তাহলে দায় বহন করতে হবে) যেমন কুদূরী কিতাবে বলা হয়েছে।

আর সীমালঙ্ঘনের অর্থ এই যে, (দাসীর বা পশুর) বাচ্চাকে হালাক করে ফেললো কিংবা (জন্তুর বাচ্চাকে) জবেহ করে খেয়ে ফেললো, বা বিক্রি করে দখল বুঝিয়ে দিল।

আর হারাম থেকে বের করে আনা হরিণের বাচ্চা যদি হারামে ফেরত পাঠানোর দক্ষতা লাভের আগেই হালাক হয়ে যায় হাহলে তাকে বাচ্চার মূল্য দায় বহন করতে হবে না। কেননা সে তো বাচ্চাকে রোধ করেনি। বরং হারামে ফেরত পাঠানোর সক্ষমতা লাভের পর যদি হালাক হয় তাহলে বাচ্চার দায় বহন করতে হবে। কেননা হকদার তথা শরীয়তের পক্ষ হতে ফেরত দাবী করার পর রোধ করা সাব্যস্ত হয়েছে।

আমাদের অধিকাংশ মাশায়েখ এই মত গ্রহণ করেন। আর যদি (হরিণের বাচ্চার দায় বহন সম্পর্কিত) সিদ্ধান্তটি নিঃশর্ত হয় তাহলে (আমাদের বক্তব্য এই যে,) এটা হল অপরাধের দায় বহন। এ কারণেই (বাচ্চা একটি হওয়ার পর) অপরটি যদি একাধিক হয় তাহলে দায় বহনও একাধিক হয়। তদ্রূপ শিকার করতে সাহয্য করা এবং ইশারা করার কারণে দায় ওয়াজিব হয়। সুতরাং তার চেয়ে উচ্চতর ক্ষেত্রে তথা নিরাপত্তা লাভের অধিকারীর উপর কবজা আরোপ করার ক্ষেত্রে আরো স্বাভাবিকভাবেই দায় ওয়াজিব হওয়ার কথা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গসবকারীর কাছে থাকা অবস্থায় সন্তান প্রসব করার কারণে দাসীর যে 'মূল্য ক্ষতি' হবে তা গসবকারীর দায়ভুক্ত হবে। তবে সন্তানের মূল্য যদি ক্ষতিপূরণের জন্য পরিপূরক হয় তাহলে সন্তান দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা হবে, এবং গসবকারীর দায় থেকে ক্ষতিপূরণ রহিত হয়ে যাবে।

আর ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সন্তান দ্বারা ক্ষতি পূরণ করা যাবে না। কেননা সন্তান তো তার মালিকানভুক্ত। সুতরাং তা তার মালিকানাভুক্ত আরেকটি জিনিসের ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। (হারাম থেকে বের করা) যেমন হরিনের বাচ্চার ক্ষেত্রে। তদ্রূপ যেমন ফেরত দেয়ার পূর্বে সন্তানটি হালাক হওয়ার ক্ষেত্রে। অথবা যেমন, (দাসী) মাতার মৃত্যু হওয়ার পর সন্তানের মূল্য ক্ষতিপূরণের জন্য যথেষ্ট হয়।

আর বিষয়টি এমন হল যে, অন্যের বকরীর পশম কাটা হল। কিংবা অন্যের বৃক্ষের ডাল কাটা হল (আর তদস্থলে অন্য পশম বা অন্য ডাল গজাল) কিংবা অন্যের

গোলামকে খোজা করা হল (ফলে তার মূল্য বৃদ্ধি হল) কিংবা তাকে কোন বৃত্তি শিক্ষা দেয়া হল আর শিক্ষা তাকে স্বাস্থ্যহীন করে ফেলল কিন্তু শিক্ষা তার মূল্য বৃদ্ধি করল, (এসব বিষয় সৃষ্টি ক্ষতির ক্ষতিপূরণ হয় না)।

আমাদের দলীল এই যে, মূল্য বৃদ্ধি ও মূল্য ক্ষতি দু'টোরই কারণ অভিন্ন। অর্থাৎ সন্তান প্রসব বা গর্ভ সঞ্চারে যেমন মতপার্থক্য রয়েছে। আর কারণ অভিন্নতার ক্ষেত্রে ক্ষতির দিকটি বিবেচ্য হয় না। সুতরাং তা দায় ওয়াজিব করবে না।

আর বিষয়টি এমন হল, যেন একটা স্বাস্থ্যবতী দাসী গসব করল, আর সে শীর্ণ হয়ে গেল, এরপর আবার স্বাস্থ্যবতী হল, কিংবা তার সামনের দাঁত পড়ে গেল, অতঃপর তা গজাল কিংবা গসবকারীর হাতে থাকা অবস্থায় গসবকৃত গোলামের হাত কেটে দেয়া হল আর সে গোলামের ক্ষতিপূরণ আদায় করল, এবং গোলামসহ ক্ষতিপূরণ মনিবের কাছে পৌছে দিল। তাহলে ঐ ক্ষতিপূরণ কি কর্তনের ক্ষতির স্থলবর্তী বিবেচনা করা হবে।

আর হরিণের বাচ্চার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি অগ্রহণযোগ্য। তদ্রূপ মায়ের মৃত্যুর ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্তটি অগ্রহণযোগ্য। (বরং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বাচ্চা দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা গ্রহণযোগ্য হত)।

আর দ্বিতীয় মাসআলাটির প্রমাণ বিশ্লেষণ এই যে, প্রসব মায়ের মৃত্যুর কারণ নয়। কেননা প্রসব সাধারণতঃ মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায় না।

তদ্রূপ ফেরত প্রদানের পূর্বে সন্তান মারা যাওয়ার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা দায় মুক্ত হওয়ার জন্য মূলের স্থলবর্তী তথা সন্তানও ফেরত প্রদান জরুরী (কিন্তু মৃত্যুর কারণে সেটা সম্ভব হল না)।

আর খোজাকরণকে বৃদ্ধি বলে গণ্য করা হয় না। কেননা তা হল ফাসিকের উদ্দেশ্যমূলক কুপ্রথা। এছাড়া অন্য সমস্ত মাসআলায় কারণ অভিন্নতা নেই। কেননা (বকরীতে) ক্ষতির কারণ হল কর্তন, আর মূল্য বৃদ্ধির কারণ হল তার 'বৃদ্ধি' আর গোলামের ক্ষেত্রে মূল্য ক্ষতির কারণ হল শিক্ষা, অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধির কারণ হল তার বোধ ও বুদ্ধির বৃদ্ধি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি একটি দাসীকে গসব করে তার সঙ্গে যিনা করে, আর সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তারপর সে দাসীটিকে ফেরত দেয় আর দাসীটি নেফাসকালে মারা যায় তাহলে গসবকারী দাসীর গর্ভসঞ্চারের দিনের মূল্যদায় বহন করবে। তবে স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে গসবকারীর উপর কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। সাহেবায়ন (র) বলেন, দাসীর ক্ষেত্রেও তাকে দায় বহন করতে হবে না।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, ফেরত প্রদান সিদ্ধ হয়েছে। আর ফেরত প্রদানের পর এমন কারণে দাসীর মৃত্যু হয়েছে, যা মালিকের কবজায় থাকা অবস্থায় উদ্ভূত হয়েছে। আর তা হল প্রসব। সুতরাং গসবকারী দায় বহন করবে না। যেমন গসবকারীর কাছে জ্বরাক্রান্ত হল। অতঃপর গসবকারী তাকে ফেরত দিল, আর মনিবের হাতে এসে মারা গেল। কিংবা যেমন গসবকারীর হাতে থাকা অবস্থায় দাসী যিনা করল, অতঃপর তাকে সে ফেরত দিল, আর মালিকের কবজায় যাওয়ার পর তাকে দোররা লাগানো হল, আর তাতে তার মৃত্যু হল। (এ দু'টি ক্ষেত্রে গসবকারীর উপর দায় আরোপিত হয় না।।

তদ্রূপ ক্রেতা একটি দাসী ক্রয় করল, যে বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হয়েছে (কিন্তু ক্রেতার তা জানা ছিল না) অতঃপর দাসী ক্রেতার কাছে এসে প্রসব করল এবং নেফাস কালে মারা গেল তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য রুজু করতে পারবে না।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, দাসীটিকে সে এমন অবস্থায় গসব করেছে যে, তার মাঝে হালাক হওয়ার কারণ সৃষ্টি হয়নি। অথচ সে তাকে এমন অবস্থায় ফেরত দিয়েছে যে, তার মাঝে হালাক হওয়ার কারণ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সেভাবে ফেরত দেয়া হল না যেবাবে সে গসব করেছিল। সুতরাং ফেরত দেয়া সিদ্ধ হল না।

বিষয়টি এমন যে, গসবকারীর কবজায় থাকা অবস্থায় হত্যাপরাধ করেছে; আর মালিকের কাছে ফেরত আনার পর ঐ অপরাধের কারণে তাকে কতল করা হল; কিংবা অনিচ্ছাকৃত হত্যাপরাধের কারণে 'অপরাধের শিকার' ব্যক্তির অভিভাবকের হাতে দাসীকে তুলে দিতে হয়েছে, এ দু'টি ক্ষেত্রে মালিক গসবকারীর কাছ থেকে দাসীর পূর্ণ মূল্য ফেরত নিতে পারে। এটাও মেতনি হবে।

স্বাধীন নারীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা স্বাধীন নারী (যেহেতু মাল নয় সেহেতু তাকে) গসব করা দ্বারা মূল্য দায় সাব্যস্ত হয় না, যাতে ফেরত দেয়ার অসিতার কারণে গসবের ক্ষতিপূরণ দায় অব্যাহত থাকার প্রশ্ন আসতে পারে।

পক্ষান্তরে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য সাব্যস্ত কর্ম হল (ফেরত দেয়া নয়, বরং) সূচনাগত অর্পণ, আর আমরা যা উল্লেখ করেছি (অর্থাৎ যে অবস্থায় গসব করেছে সে অবস্থায় ফেরত প্রদান) সেটা ফেরত দানের সিদ্ধতার শর্ত।

আর যিনা হচ্ছে এমন দোররাঘাতের কারণ, যা ব্যথাদায়ক, কিন্তু জখমকারক নয় এবং মৃত্যুদায়কও নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণটি গসবকারীর কবজায় থাকা সম্পন্ন হয়নি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গাসিব যা গসব করেছে সেটার উপকারের দায় সে বহন করবে না। তবে সেটাকে ব্যবহার করার কারণে যদি তার মূল্য ক্ষতি ঘটে তাহলে সেই ক্ষতির দায় তাকে বহন করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, গসবকৃত বস্তুটির উপকারের দায় তাকে বহন করতে হবে। সুতরাং (উপকারের) সমপরিমাণ মজুরি ওয়াজিব হবে।

আর উপকার সে ভোগ করুক কিংবা অব্যবহৃত রেখে নষ্ট করুক, তাতে উভয় মাযহাবের সিদ্ধান্তে কোন পার্থক্য নেই।

আর ইমাম মালিক (র) বলেন, যদি সে তা ভোগ করে তাহলে সমপরিমাণ মজুরি ওয়াজিব হবে। আর যদি তা অব্যবহৃত অবস্থায় রেখে দেয় তাহলে তার উপর কোন দায় আসবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীল এই যে, (বস্তুর ন্যায়) বস্তুর উপকারসমূহ মূল্যমান সম্পন্ন মাল। তাই চুক্তির বিপরীতে তা দায় সম্পন্ন হয়। সুতরাং গসবের বিপরীতেও তা দায় সম্পন্ন হবে।

আমাদের দলীল এই যে, গসবকৃত বস্তুর উপকারসমূহ গসবকারীর মালিকানায় অর্জিত হয়েছে। কেননা সেটা তার নিয়ন্ত্রণে আসার পর উদ্ভূত হয়েছে, মালিকের নিয়ন্ত্রণে থাকাকালে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। কারণ বস্তুর উপকারসমূহ হচ্ছে বস্তুর স্থায়িত্বহীন গুণ বিশেষ। সুতরাং সে তার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তার মালিকানা অর্জন করবে। আর মানুষ তার মালিকানাধীন জিনিসের দায় বহন করে না।

কিভাবে তা হতে পারে, যেখানে সেগুলোকে গসব করা এবং নষ্ট করা সাব্যস্ত হয়নি। কেননা সেগুলোর তো স্থায়িত্ব নেই।

তাছাড়া উপকারসমূহ বস্তুর সদৃশ নয়। কেননা, এগুলি ত্বরিৎ বিলীন হয়ে যায় আর বস্তু বিদ্যমান থাকে।

বিধানের এসকল 'উৎস হেতু' المختلف। কিতাবে আলোচিত হয়েছে।

আর আমরা এতে একমত নই যে, বস্তুর উপকারসমূহ (বস্তুর ন্যায়) স্বকীয়ভাবে মূল্যমান সম্পন্ন। বরং বস্তুর উপকারকে কেন্দ্র করে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সময় প্রয়োজন বশত: সেগুলোকে মূল্যমান সম্পন্ন বিবেচনা করা হয়। অথচ এ ক্ষেত্রে চুক্তির অস্তিত্ব ঘটেনি। তবে তার ব্যবহারের কারণে যা ক্ষতি হবে সেটা তার উপর দায় সম্পন্ন হবে। কেননা সে বস্তুর কিছু কিছু অংশ হালাক করেছে।

পরিচ্ছেদ ঃ মূল্যমান রহিত বস্তুর গসব

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুসলমান যদি যিম্মীর মদ বা তার শূকর হালাক করে তাহলে তাকে তার দায়বহন করতে হবে। কিন্তু কোন মুসলমানের এগুলো হালাক করলে দায় বহন করবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যিম্মীর এগুলোর ক্ষেত্রেও দায় বহন করবে না।

একই মতপার্থক্য হবে। যদি এক যিম্মী আরেক যিম্মীর এগুলো নষ্ট করে কিংবা এক যিম্মী যদি আরেক যিম্মীর কাছে এগুলো বিক্রি করে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল এই যে, মুসলমানের ক্ষেত্রে এগুলোর মূল্যমান রহিত হয়েছে। সুতরাং যিম্মীর ক্ষেত্রেও রহিত হবে। কেননা বিধানের ক্ষেত্রে তারা আমাদের অনুবর্তী। সুতরাং এ দুটি হালাক করার কারণে মূল্যমান সম্পন্ন মাল ওয়াজিব হবে না, আর তা হল ক্ষতিপূরণ রূপে আদায়কৃত মাল।

আমাদের দলীল এই যে, যিম্মীদের ক্ষেত্রে এগুলোর মূল্যমান বহাল রয়েছে। কেননা তাদের জন্য মদ আমাদের জন্য সিরকার অনুরূপ এবং তাদের জন্য শূকর আমাদের জন্য বকরীর অনুরূপ। আর আমাদের আদেশ করা হয়েছে তাদেরকে তাদের দীনের উপর ছেড়ে দেয়ার জন্য আর যেহেতু যিম্মায় চুক্তির কারণে তলোয়ার রহিত হয়ে গেছে সেহেতু বাধ্যতামূলক আরোপ সম্ভব নয়। সুতরাং মূল্যমান যখন রয়ে গেল তখন মালিকানাধীন মূল্য সম্পন্ন মাল নষ্ট করাও বিদ্যমান হল। সুতরাং গসবকারীকে তার দায় বহন করতে হবে।

মুরদার ও রক্তের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা কোন ধর্মের অনুসারী (ধর্মতঃ) এ দুটির মূল্যমানে বিশ্বাস করে না। তবে মদ সদৃশ শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মদের মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা মুসলমানকে তার মালিকানা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ মালিকানায় আসা তার জন্য মর্যাদাকর।

পক্ষান্তরে দুই যিম্মীর মাঝে লেনদেন হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন।

কেননা যিম্মী মদের মালিকানা গ্রহণ ও মালিকানা প্রদান থেকে নিষেধকৃত নয়। এটা দুই যিম্মীর মাঝে 'রিবা'-এর লেনদেন থেকে ভিন্ন। কেননা তা তাদের সঙ্গে কৃত যিম্মী চুক্তি থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছিল। তদ্রূপ যিম্মীর মালিকানাধীন মোরতাদ গোলামের বিষয়টিও ভিন্ন (অর্থাৎ মুসলমান যদি যিম্মীর মোরতাদ গোলামকে হালাক করে তাহলে সে তার মূল্য দায় বহন করবে না।

কেননা যিম্মীর মোরতাদ গোলামকে ছেড়ে দেয়ার নিশ্চয়তা তাদেরকে আমরা দেই নি। কারণ তাতে দ্বীনকে লঘু বিষয়ে পরিণত করা হয়।

তদ্রূপ ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লা ছাড়া জবাইকৃত পশু যদি এমন ব্যক্তির হয় যে তাকে হালাল মনে করে সেটার সিদ্ধান্তও ভিন্ন হবে (অর্থাৎ হানাফী যদি কোন শাফেয়ীর অনুরূপ পশু নষ্ট করে ফেলে তাহলে হানাফীকে তার মূল্য দায় বহন করতে হবে না) কেননা তাদের সঙ্গে প্রমাণের ভিত্তিতে বিতর্ক করার কর্তৃত্ব রয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি কেউ কোন মুসলমান থেকে মদ গসব করে, অত:পর সিরকায় রূপান্তরিত করে; কিংবা মুরদারের চামড়া গসব করে, অত:পর

সে তা পাকা করে; তখন মদের মালিক ইচ্ছা করলে কোন বিনিময় প্রদান ছাড়া সিরকা গ্রহণ করতে পারে। তদ্রূপ পাকা করায় চামড়ায় যা মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে, সে তা ফেরত প্রদান করে তা নিয়ে নিতে পারে।

প্রথম সূরতের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এই যে, যদি (কোন কিছুর মিশ্রণ ছাড়া) শুধু রোদ থেকে ছায়ায় এবং ছায়া থেকে রোদের আনা নেয়ার প্রক্রিয়া দ্বারা সিরকায় রূপান্তরিত করে।

তদ্রূপ দ্বিতীয় সূরতে উদ্দেশ্য এই যে, যদি এমন কোন দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা চামড়া পাকা করে, যার মূল্য রয়েছে; যেমন বিভিন্ন গাছের ছাল বা রস (এবং রাসায়নিক দ্রব্য)।

পার্থক্য এই যে, মদকে এভাবে সিরকায় পরিণত করার অর্থ হল তাকে পবিত্র করা, নাপাক কাপড় ধোয়ার মত। ফলে তা মালিকের মালিকানায় থেকে যাবে। কেননা এ দ্বারা সম্পদ হওয়া সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে পাকা করা দ্বারা চাড়মার সঙ্গে গসবকারীর মূলমান সম্পদ 'মাল' সংযুক্ত হয়। যেমন কাপড়ের রঙ। সুতরাং পাকা করা চামড়া রঙ্গিন কাপড়ের মত হবে। এ কারণেই সিরকা কোন কিছু বিনিময় ছাড়া গ্রহণ করবে। আর চামড়া গ্রহণ করবে পাকাকরার মাধ্যমে যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তা পরিশোধ করে। এর বিবরণ এই যে,জবাই করা। কাঁচা চামড়ার মূল্য লক্ষ্য করা হবে, অত:পর পাকা করা অবস্থায় তার মূল্য লক্ষ্য করা হবে। এবং সে উভয়ের মধ্যবর্তী অতিরিক্ত পরিমাণের দায় বহন করবে।

আর গসবকারী তার হক উশুল করার জন্য চামড়া আটক রাখতে পারে। (মূল্য উশুল করার জন্য) বিক্রয় দ্রব্য আটক রাখার মত।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, আর গসবকারী যদি সিরকা ও চামড়া নষ্ট করে ফেলে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সিরকার দায় বহন করবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে চামড়ার দায় বহন করবে না। আর সাহেবায়ন (র) বলেন, গসবকারী পাকা করা অবস্থায় চামড়ার দায় বহন করবে এবং পাকা করার যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে মালিক তা গসবকারীকে প্রদান করবে।

আর যদি গসবকারীর হাতে চামড়া নিজে নিজেই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, গসবকারী তার দায় বহন করবে না।

(নষ্ট করার ক্ষেত্রে) সিরকার দায় বহনের কারণ এই যে, সেটা যখন মালিকের মালিকানায় বহাল রয়েছে, আর তাহল মূলমান সম্পদ মাল। সুতরাং নষ্ট করার কারণে সেটার দায় বহন করতে হবে। এবং ঐ সিরকার সদৃশ সিরকা ওয়াজিব হবে। কেননা সিরকা হল সদৃশ শ্রেণীভুক্ত।

আর চাড়মা নষ্ট করার ক্ষেত্রে সাহেবায়নের দলীল এই যে, সেটা মালিকের মালিকানায় বিদ্যমান রয়েছে। তাই তো মালিকের তা ফেরত নেয়ার অধিকার রয়েছে, আর তা মূল্যমানসম্পন্ন মাল। সুতরাং হালাক করার কারণে পাকা অবস্থায় সেটার মূল্যদায় বহন করবে এবং পাকা করায় তার বর্ধিত মূল্য মালিক সেই গসবকারীকে প্রদান করবে, যেমন যদি কাপড় গসব করে তা রঞ্জিত বস্ত্রের দায় বহন করবে। আর তাতে যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় মালিক তা গাসিবকে প্রদান করবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় দলীল এই যে, এটা হল অবশ্য ফেরতযোগ্য বস্তু। সুতরাং যখন সে মালিকের ফেরত পাওয়ার উপায় বিনষ্ট করে দিল, তখন বস্তুটির মূল্য বস্তুটির স্থলবর্তী হবে। যেমন, আরিয়াতে গৃহীত বস্তুর ক্ষেত্রে (আর আরিয়াত গ্রহণকারী যখন মালিকের ফেরত পাওয়ার সুযোগ নষ্ট করে দেয় তখন তার স্থলবর্তী রূপে মূল্য ওয়াজিব হয়।)

আর এর দ্বারা মাসআলাটি নিজে নিজের নষ্ট হওয়ার মাসআলা থেকে পৃথক হয়ে যায়।

আর সাহেবায়নের বক্তব্য পাকা করায় তাতে যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তা প্রদান করবে এটা (আদান প্রদানের ক্ষেত্রে) শ্রেণী ভিন্নতার উপর প্রযুক্ত হবে। পক্ষান্তরে শ্রেণী অভিন্নতার ক্ষেত্রে চামড়ার ক্ষতিপূরণ ঐ পরিমাণ বিয়োগ করে দেবে এবং অবশিষ্টটুকু নিয়ে নেবে। কেননা গসবকারীর কাছ থেকে একবার নেয়ার পর তাকে তা ফেরত প্রদানে কোন উপকার নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, চামড়ার মূল্যমান অর্জিত হয়েছে গসবকারীর কর্ম দ্বারা। আর তার 'কর্মটি' মূল্যমান সম্পন্ন হয়েছে তাতে মূল্যমান সম্পন্ন মাল ব্যবহার করা দ্বারা। এ কারণেই পাকা করায় তাতে যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তা উশুল করা পর্যন্ত গসবকারী ঐ চামড়া আটক রাখতে পারে। সুতরাং চামড়ার মূল্যমান হচ্ছে গসবকারীর হক। আর মূল্যমানতার ক্ষেত্রে চামড়া হল গসবকারীর পাকা করা 'কর্মের' অনুবর্তী।

অত:পর এখানে মূল্য যেটা (অর্থাৎ গসবকারীর পাকা করার কর্ম) সেটাই দায় সম্পন্ন নয়। সুতরাং অনুবর্তী যেটা সেটাও দায় সম্পন্ন হবে না। যেমন তার কোন কর্ম ছাড়া নিজে নিজে হালাক হওয়ার ক্ষেত্রে।

চামড়া বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ফেরত দানের ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তখন তা মালিকানায় অনুবর্তী হয়। আর মালিকানার ক্ষেত্রে চামড়া গসবকারী পাকা করা কর্মের অনুবর্তী নয়। কেনন মালিকানা তো পাকা করার পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, যদিও তা মূল্যমান সম্পন্ন মাল ছিল না।

জবাইকৃত পশুর চামড়া এবং কাপড়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ঐ দুটির মূল্যমান পাকা করার ও রঞ্জনের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তা গসবকারীর কর্মের অনুবর্তী হবে না।

আর যদি মূল্যমান সম্পন্ন বস্তু দ্বারা পাকা করা চামড়া বিদ্যমান থাকে, আর এই অবস্থায় মালিক তা গসবকারীর কাছে ছেড়ে দিতে চায় এবং তার উপর মূল্যদায় আরোপ করতে চায়, তাহলে কারো কারো মতে সর্বসম্মতিক্রমে তার মূল্য জায়িয হবে না। কেননা (পরিশোধন ছাড়া স্বকীয়ভাবে) চামড়ার কোন মূল্য নেই। কাপড়ের রঙের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা কাপড়ের নিজস্ব মূল্য রয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার জন্য তা করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে সাহেবায়নের মতে তা জায়িয রয়েছে।

(মতপার্থক্য থাকার প্রমাণ এই) কেননা মালিক যদি গসবকারীর জন্য তা ছেড়ে দেয় এবং তার উপর মূল্যদায় আরোপ করে তাহলে গসবকারী তা ফেরত দিতে অপারগ হয়ে যাবে। সুতরাং এটা নষ্ট করা সূরতের মতই হল। আর সে ক্ষেত্রে অনুরূপ মর্তপার্থক্য রয়েছে। যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

আবার কেউ কেউ বলেন, মালিক গসবকারীর উপর পাকাকৃত চামড়ার মূল্যদায় আরোপ করবে। আর পাকা করায় তাতে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তা সে গসবকারীকে প্রদান করবে। যেমন নষ্ট করার মাসআলায়।

আর কেউ কেউ বলেন, জবাইকৃত পশুর পাকা না করা চামড়ার মূল্যদান তার উপর আরোপ করবে।

আর যদি এমন কিছু দ্বারা সে পাকা করে যার কোন মূল্য নেই, যেমন মাটি কিংবা রৌদ্র তাহলে সেটা কোন বিনিময় ছাড়াই মালিকের হয়ে যাবে। কেননা সেটা কাপড় ধোয়ার মত হল।

আর যদি (এ অবস্থায়) গসবকারী তা নষ্ট করে ফেলে তাহলে পাকাকৃত অবস্থার চামড়ার মূল্যদায় বহন করবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, জবাইকৃত পশুর পাকা না করা চামড়ার মূল্যদায় বহন করবে।

কেননা চামড়ার পাকা করার গুণ সে-ই অর্জন করেছে। সুতরাং সে তার দায় বহন করবে না।

প্রথমোক্ত মতের দলীল এই যে, আর সেটাই অধিকাংশের মত– পাকা করার গুণ চামড়ার অনুবর্তী। সুতরাং সেটাকে পৃথক রূপে বিবেচনা করা যাবে না। আর মূল্য (চামড়া) যখন দায় সম্পন্ন হবে তখন গুণও দায় সম্পন্ন হবে।

আর যদি মদের মধ্যে লবণ ফেলে সে সিরকা বানায় সে ক্ষেত্রে আলিমগণ বলেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা গসবকারীর মালিকানাভুক্ত হয়ে যাবে। তবে গসবকারীর অনুকূলে মালিকের উপর কোন দায় আরোপিত হবে না।

আর সাহেবায়নের মতে মালিক তা ফেরত নেবে এবং লবণ তাতে যে মূল্যবৃদ্ধি করেছে তা গসবকারীকে প্রদান করবে। যেমন চামড়া পাকা করার ক্ষেত্রে।

এখানে এর অর্থ এই যে, লবণ পরিমাণ সিরকা প্রদান করবে। আর যদি মালিক তা গসবকারীকে ছেড়ে দিতে চায় এবং গসবকারীর উপর দায় আরোপ করতে চায় তাহলে বিধান সেটাই হবে যা চামড়া পাকা করার ক্ষেত্রে দুই মতে বলা হয়েছে।

আর যদি তা হালাক করে ফেলে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে গসবকারী তার দায় বহন করবে না। সাহেবায়ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন চামড়া পাকা করার ক্ষেত্রে।

আর যদি মদে সিরকা মিশিয়ে সিরকা তৈরি করে তা ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে তা মিশ্রণ মাত্র সিরকা হয়ে যাবে এবং গসবকারীর মালিকানাধীন হয়ে পড়বে এবং তার উপর কোন দায় আসবে না। কেননা এর অর্থ হবে মূল্যমানহীন অবস্থায় তা হালাক করা।

পক্ষান্তরে যদি অল্প সিরকা মিশ্রিত করার কারণে বেশ কিছু সময় পরে তা সিরকায় পরিণত হয় তাহলে তা উভয়ের মাঝে তাদের মালের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টিত হবে। কেননা পরবর্তী গুণ অনুসারে এটা হলো সিরকার সাথে সিরকার মিশ্রণ। আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মূলনীতি অনুসারে এটা হালাক করা নয়।

আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উভয় অবস্থায় তা গসবকারীর হবে এবং তার উপর কোন দায় আসবে না। কেননা তাঁর মতে স্বয়ং মিশ্রণটাই হলো হালাককরণ। আর (মুসলমানের মদ) হালাক করার ক্ষেত্রে দায় সাব্যস্ত হয় না। কেননা সে মূলতঃ নিজের সিরকা হালাক করেছে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে প্রথম অবস্থায় হালাক করার কারণে দায় বহন করবে না। কারণ সেটাই যা আমরা বর্ণনা করেছি। আর দ্বিতীয় অবস্থায় দায় বহন করবে। কেননা সে অন্যের মালিকানায় জিনিস হালাক করেছে।

আর কোন মাশায়েখ কিতাবে বর্ণিত সিদ্ধান্তকে নিঃশর্ততার উপর প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ সকল অবস্থায় কোন বিনিময় ছাড়াই সিরকা নিয়ে নেবে। কারণ নিক্ষিপ্ত (সিরকা বা লবণ) মদের মাঝে হালাককৃত হয়েছে। সুতরাং তা মূল্যমান সম্পন্ন থাকবে না।

এ বিষয়ে মাশায়েখগণের অনেক মত বর্ণিত হয়েছে। কিফায়াতুল মুনতাহী কিতাবে তা আমরা উল্লেখ করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন মুসলমানের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলে যেমন সারিন্দা, তবলা, বাঁশি বা দফ (ঢোল) কিংবা নেশাকর খেজুরের

আরক কিংবো জ্বাল দিয়ে অর্ধেক করা খেজুরের আরক ফেলে দেয় তাহলে তাকে মূল্যদায় বহন করতে হবে। আর এসব বস্তু বিক্রি করা জায়িয হবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে দায় বহন করতে হবে না। আর এগুলো বিক্রি করা জায়িয হবে না।

কারো কারো মতে, ইমাম হানীফা (র) ও সাহেবায়ন (র) -এর মাঝে মতপার্থক্য হলো বিনোদনের দফ ও তবলা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে গাজীদের (সামরিক) তবলা এবং যে দফ বিবাহ অনুষ্ঠানে বাজানো জায়িয, সেটা নষ্ট করলে সবার মতেই দায় বহন করতে হবে।

আর কারো কারো মতে দায়বহন সম্পর্কে ফতোয়া সাহেবায়নের মতানুসারে রয়েছে।

سكر মানে খেজুর ভিজান এমন কাঁচা (অজ্বাল দেয়া) পানি, যা গাঢ় হয়েছে (অর্থাৎ নেশাকর হয়েছে)।

منصف মানে যা জ্বাল দেওয়ার কারণে অর্ধেকে পরিণত হয়েছে।

আর সামান্য জ্বাল দেয়া পানি, যাকে باذق বলা হয়- সম্পর্কে দায় আরোপ ও বিক্রয় বৈধতা বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে দু'টি মত রয়েছে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, এগুলোকে পাপ কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং মদের মত এগুলোর মূল্যমান বাতিল হয়ে যাবে।

তাছাড়া সে যা করেছে তা সৎকাজের আদেশ রূপেই করেছে আর তা শরীয়তের বিধান দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং সে তার দায় বহন করবে না। যেমন ইমামের অনুমোদনে করলে দায় বহন করতে হয় না। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, এগুলো হচ্ছে মাল। কারণ উপকার লাভের যে সকল বৈধ উপায় রয়েছে, সে সবের জন্য এগুলোর যোগ্যতা রয়েছে, যদিও উপকার লাভের অবৈধ উপায়গুলোর জন্যও এগুলো উপযোগী। সুতরাং এটি গায়িকা দাসীর মত হল।

এটা একারণে যে, ফাসাদ সৃষ্টি হয় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন কর্তার কর্ম দ্বারা। সুতরাং তা কোন বস্তুর মূল্যমান রহিত করা সাব্যস্ত করে না।

আর বিক্রয়ের বৈধতা এবং দায় আরোপ নির্ভর করে সম্পদগুণ ও মূল্যমানের উপর।

আর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সৎ কাজের আদেশ করা শাসকদের উপর ন্যস্ত। কেননা তাদের শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যদের উপর ন্যস্ত হয়েছে মুখে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া।

তবে এগুলোর বিনোদন অনুপযোগী অবস্থার মূল্যদায় সাব্যস্ত হবে। যেমন গায়িকা দাসীর ক্ষেত্রে।

লড়াইয়ের পাঠা, উড়ানোর কবুতর, লড়াইয়ের মোরগ এবং খোজা দাস-ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজের অনুপযোগী অবস্থায় এগুলোর যা মূল্য সেটাই দায় রূপে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে তাই হবে।

منصف ও سكر এর ক্ষেত্রে তাদের মূল্য দায় সাব্যস্ত হবে। এগুলোর সমপরিমাণ সাব্যস্ত হবে না।

কেননা মুসলমানকে এগুলোর বস্তুসত্তায় মালিকানা অর্জন থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যদিও মালিকানা অর্জন করলে জায়েয হয়ে যায়।

এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যখন নাছরানীর ছলীব (ক্রুশ) নষ্ট করে ফেলল। এক্ষেত্রে অক্ষত ক্রুশ অবস্থায় তার যা মূল্য সেটা দায়রূপে সাব্যস্ত হবে। কেননা নাছরানীকে তো তার দীনের উপর বহাল রাখা হয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি উম্মে ওয়ালাদ বা মোদাব্বার বাঁদীকে গসব করে আর সে তার হাতে মারা যায় তাহলে মোদাব্বার বাঁদীর মূল্যদায় বহন করবে; কিন্তু উম্মে ওয়ালাদের মূল্যদায় বহন করবে না।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, উভয়ের মূল্যদায় বহন করবে।

কেননা সর্বসম্মতিক্রমে মোদাব্বার বাঁদীর সম্পদ গুণ মূল্যমান সম্পন্ন। আর উম্মে ওয়ালাদের সম্পন্ন গুণ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মূল্যমান সম্পন্ন নয়। পক্ষান্তরে সাহেবায়নের মতে মূল্যমান সম্পন্ন। আর উভয় পক্ষের দলীল এই কিতাবের ইতাক (মুক্তিদান) পর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

॥ আল্‌হামদুলিল্লাহ্ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত হল॥

ইফাবা-২০০৬-২০০৭-প্র/৯৩৮২(উ)-৩.২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
ইসলামী আইন ও ফিকাহ্ শাস্ত্র বিষয়ক কয়েকটি বই

বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক	পৃষ্ঠা	মূল্য
ফাতাওয়া ও মাসাইল (১ম ও ২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৪১২	২৪০.০০
ফাতাওয়া ও মাসাইল (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৪৬২	২১০.০০
ফাতাওয়া ও মাসাইল (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৩০২	১৪০.০০
ফাতাওয়া ও মাসাইল (৫ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৪৩২	২২৫.০০
ফাতাওয়া ও মাসাইল (ষষ্ঠ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৫৭৬	২৩০.০০
আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)	আল্লামা বুরহান উদ্দীন মারগীনানী	৩৭৯	২০০.০০
আল-হিদায়া (২য় খণ্ড)	আল্লামা বুরহান উদ্দীন মারগীনানী	৫৫৬	১৭০.০০
আল-হিদায়া (৪র্থ খণ্ড)	আল্লামা বুরহান উদ্দীন মারগীনানী	৫৯৮	২৬৮.০০
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৬৩৮	২৪০.০০
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৭২০	২৭৪.০০
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৬৪৬	২৩০.০০
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৮৫৬	৩২০.০০
ইসলামী আইন	এ. এ. ফৈজী	৩৯০	৫০.০০
আল-ফিকহুল আকবর	ইমাম আবূ হানীফা (র)	৯৬	৩২.০০
ইসলামের দণ্ডবিধি	গাজী শামসুর রহমান	৭০৪	১৮৯.০০
বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (১ম খণ্ড ১ম ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	৮১৬	২৫৫.০০
বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (২য় খণ্ড ২য় ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	১০০৮	২৭২.০০
বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৭৭৪	২৪৫.০০
ইসলামে বাণিজ্য আইন	এ. বি. এম. হুসাইন	৬৪	২৫.০০
Islamic Law	Ghazi Shamsur Rahman	৭১৮	৯০.০০